# সন্দেশ ১০০ গল্প একশো

শিশু সাহিত্য সংসদ

# সন্দেশ ১০০
# গল্প একশো

# সন্দেশ ১০০ গল্প একশো

সম্পাদনা
অশোককুমার মিত্র
প্রসাদরঞ্জন রায়

শিশু সাহিত্য সংসদ

SANDESH EKSHO GALPO EKSHO

(A Selection of Hundred Stories from Hundred Years of *Sandesh*)

*ed. by Ashoke Kumar Mitra, Prasadranjan Roy*

ISBN : 978-81-7955-283-4



প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল

অলংকরণ : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সুকুমার রায়

সত্যজিৎ রায়

অলয় ঘোষাল

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০১৭

**প্রকাশক** : দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

**মুদ্রক** : এ. পি. প্রিন্টার্স, ৮/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০৬৭

## সূচি

# প্রকাশকের কথা

পিতা থেকে প্রপৌত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে সন্দীপ রায় চার পুরুষের হাতে ‘সন্দেশ’ চলছে এক-শো বছর ধরে। ১৯১৩ সালে যখন উপেন্দ্রকিশোর ‘সন্দেশ’ প্রথম প্রকাশ করেন তার আগে ‘সখা’, ‘বালক’, ‘সখা ও সাথী’, ‘মুকুল’ প্রভৃতি শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলি বাজার মাতিয়েছিল, কিন্তু ‘সন্দেশে’র আবির্ভাব হল পূর্বসূরীদের সকল গরিমাকে ম্লান করে, আশা দেবীর ভাষায় ‘দিগ্বিজয়ী’র মতো। বাংলা শিশু সাহিত্যের যে সমৃদ্ধতর রূপ আজ আমরা দেখতে পাই তাতে এই পত্রিকার অবদান অনেকখানি। এতে লিখেছেন দিকপাল সব শিশু সাহিত্যিকেরা। গল্প প্রবন্ধ ছড়া কবিতা। এক-শো বছরে বিপুল তার সম্ভার। এর থেকেই কিছু গল্প বেছে নিয়েছেন সম্পাদকদ্বয়- এক-শো বছরের এক-শোটি গল্প।

আশা করি এই সংকলনটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

দেবজ্যোতি দত্ত

*কলকাতা*

*জানুয়ারি ২০১৫*

# তিন পর্বের সন্দেশি গল্প

'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশের একশো বছর পূর্ণ হল। একশো বছর বটে-তবে একটানা নয়; নানা কারণে মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে, ফের পুঃনপ্রকাশ হয়েছে। তবে তৃতীয় পর্বে ফিনিক্স পাখির মতো পুনর্জন্মের পর প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাসে একটানা পঞ্চাশ বছরের বেশি পেরিয়ে এল, তার চলার গতিতে স্থবিরতা বা বিরতির কোনো চিহ্ন নেই। শতবর্ষ ধরে তিন পর্বে প্রকাশিত এই পত্রিকা থেকে একশোটি গল্প বেছে নিয়ে প্রকাশ অনুক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হল। এর কিছু গল্প অনেকের চেনা, আবার অনেক গল্প কালের ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে তাদের গায়ে 'সন্দেশ'-এর স্বাদটুকু রয়েছে। পত্রিকার একশো বছরের যাত্রাপথের সঙ্গী হয়ে এই সংকলনের পাঠক 'সন্দেশ'-এর সুঘ্রাণ ও সুস্বাদটুকু পেলে 'সন্দেশি' গল্পের পালাবদলের চেহারাটি বুঝে নিতে পারবেন-সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই প্রয়াস।

বাংলা ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে ছোটোদের পত্রিকার জগতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'সন্দেশ' নামে তাঁর স্বপ্নের পত্রিকাটি প্রকাশ করলেন, যা তাঁর দীর্ঘদিনের ইচ্ছার ফসল আর প্রকাশমাত্র তা বাংলার ছোটোদের মনে স্বপ্নের বীজ বুনে চলল। তারা এ পত্রিকাটিকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

এমন পত্রিকার ভাবনা তিনি দীর্ঘকাল ধরে করে আসছিলেন। পত্রিকায় কী কী বিষয়ে লেখা থাকবে, সে সব লেখা কেমন ভাবে লেখা হবে, গল্প-কবিতা ছাড়াও নানা ধরনের লেখা থাকবে-যা স্বাদু আর পুষ্টিকরও বটে। তাই বিভাগীয় রচনার বিষয়ও তাঁকে ভেবে ঠিক করতে হল। পত্রিকার মুদ্রণ পরিপাট্য আর অঙ্গ সৌষ্ঠব বিষয়েও তাঁর ধারণা অতি স্পষ্ট ছিল। তিনি নিজে ছিলেন উন্নত মানের ব্লক প্রস্তুতকারক, মুদ্রণ বিশারদ এবং তাঁর ছিল শিল্পী মন-চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন। ছোটোদের মন বুঝতেন বলে তাদের মনের মতন করে গল্প বলতেন, ছবিও এঁকে দিতেন। বইয়ের বিন্যাস ও মুদ্রণ যথাযথ না হলে তাঁর মনে অসন্তুষ্টি জন্মাত। লীলা মজুমদার জানিয়েছেন যে সিটি বুক সোসাইটি প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত'-এর মুদ্রণ তাঁর মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল। ব্লক প্রস্তুতি যত্নশীল হাতে না হওয়ায় ছবির প্রতিরূপ যথাযথ পরিস্ফূট হয়নি, অন্তত লেখক-চিত্রকরের রুচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। পরে সব ক-টি বই-ই ইউ রায় অ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং নিজস্ব প্রকাশনী থেকে বই প্রকাশ করে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস অর্জন করে পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। তাই কী রচনা-বৈশিষ্ট্যে, কী অলংকরণে, কী তার পাতার বিন্যাসে পূর্ব প্রকাশিত ছোটোদের সকল পত্রিকাকে কয়েক যোজন পিছনে ফেলে 'সন্দেশ' এগিয়ে গিয়েছিল।

'সন্দেশ' প্রকাশের সময় তাঁর সামনে সম্ভাব্য পাঠক হিসেবে 'টুনটুনির বই'-এর পাঠক-পাঠিকাদের মুখগুলি ভেসে উঠত। 'সন্দেশ'-কে তিনি ওই বয়সিদের মতো করে সাজাতেন লেখায়-রেখায়-রঙে। প্রতি সংখ্যার লেখা নিয়ে তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা থাকত, লেখাগুলোর আদর্শ রূপ তিনি দেখতে পেতেন। তাই অধিকাংশ লেখা নিজেকেই রচনা করতে হত। প্রথম সংখ্যায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রথম কবিতাটি ছাড়া অবশিষ্ট সব লেখা তাঁরই রচনা-কথাবার্তা, সংবাদ প্রভৃতি বিভাগীয় রচনা, এমনকী গানের স্বরলিপিখানিও। পরের সংখ্যায়

প্রসন্নময়ী দেবীর কবিতা ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পটি ছাড়াও ধাঁধা সমেত অপর সমস্ত লেখাই তাঁর। ক্রমে 'সন্দেশ'-এর রচনার একটি আদর্শ মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হলে পরিবারের সদস্যদের অনেককে লেখায় অনুপ্রাণিত করেছেন, পরিচিত লেখককুলকেও। তার ফলে অন্যান্য রচনার মতো 'সন্দেশ'-এর গল্পেরও একটি বিশেষ ঘরানা তৈরি হল।

রবীন্দ্রনাথ প্রবাসে 'সন্দেশ'-এর প্রথম সংখ্যা পেয়েছিলেন সুকুমার রায় মারফত এবং পত্রিকার জন্য তিনি কিছু লেখার প্রতিশ্রুতিও দেন। বন্ধু উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় অবশ্য তিনি 'সন্দেশ'-এ লেখার অবকাশ পাননি, পরে সুকুমারের সম্পাদনাকালে কবিতা লিখেছেন কয়েকটি, এমনকী তাঁর নিজের হস্তাক্ষরে 'এক যে ছিল চাঁদের কোণায় চরকা-কাটা বুড়ি' ব্লক করে 'সন্দেশ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। তবে গদ্য লিখেছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সন্দেশ'-এ, সুকুমারের ভাই সুবিনয়ের সম্পাদনায়। ১৩৩৮-এ নতুন ব্যবস্থাপনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয়, সুবিনয়ের উপর ছিল সম্পাদনার দায়িত্ব। প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটি ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্ভট রসের রচনা 'সে'-এর প্রথম কিস্তি। তিনটি কিস্তি তিনি লিখেছিলেন এবং তার সবটাই আমরা এখানে প্রকাশ করেছি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বছরের 'সন্দেশ'-এ দু-টি সংখ্যায় 'সূর্যিমামার ঘর' নামে একটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ লেখেন। পরে তাঁর লেখা 'খাতাঞ্চির খাতা' ধারাবাহিক ছাপা হয়। তবে তাঁর লেখা গল্প 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত হয়নি, তাই এই সংকলনে তিনি অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র গল্প 'সন্দেশ'-এর জন্যই রচিত এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত।

উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশ'-এর পরিকল্পক, রূপকার, প্রথম যুগের প্রধান লেখক ও চিত্রকর এবং ৩৩টি সংখ্যার সম্পাদক। এ কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন তাঁর ভাই কুলদারঞ্জন রায়-তিনি ছিলেন অসাধারণ ভাষাশিল্পী, পৃথিবীর নানা দেশের পুরাণ ও লোককথার গল্প ভাষান্তর করে আমাদের পাতে পরিবেশন করেছেন 'সন্দেশ'-এর মাধ্যমে। অনুবাদে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'সন্দেশ'-এর আবির্ভাবকালে সুকুমার ছিলেন কারিগরি শিক্ষার জন্য বিলেতে। তাঁর বন্ধু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ও ('প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র) তখন উচ্চশিক্ষার্থে বিলেতে। সুকুমারের অনুরোধে তিনি 'ভবম হাজাম' গল্পটি লেখেন এবং তার জন্য সুকুমার ছবি এঁকে দেন। এই ছবির মাধ্যমে 'সন্দেশ'-এ সুকুমারের আত্মপ্রকাশ, অবশ্য দেশে ফিরে তাঁর কলম ঝরনার মতন সহস্রধারায় ঝরেছে 'সন্দেশ'-কে পুষ্ট করতে, বাংলা শিশুসাহিত্যকেও। এই তিনজন (উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন ও সুকুমার) অজস্র লিখেছেন 'সন্দেশ'-এর প্রথম পর্বে। তাই এই সংকলনের গল্প নির্বাচনে আমরা মাত্র এই তিনজনেরই একাধিক গল্প বেছে নিয়েছি।

পরিবারের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য উপেন্দ্রকিশোরের কনিষ্ঠ ভাই প্রমদারঞ্জন। তিনি ছিলেন ভারতের সার্ভেয়ার-জেনারেল অফিসের পদস্থ কর্মচারী। জরিপের কাজে তিনি দীর্ঘদিন উত্তর-পূর্ব ভারত ও বর্মার বনাঞ্চলে ক্যাম্প করে দিন কাটিয়েছেন। সেই বর্ণময় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা তাঁর 'বনের খবর' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল 'সন্দেশ'-এ। তার একটি অংশ এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোরের অন্যান্য পুত্র-কন্যাদের সকলেই-পুত্র সুবিনয় ও সুবিমল আর কন্যা সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা লিখতেন চমৎকার। সুখলতা দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের লেখা লিখেছেন। তিনি ছবিও আঁকতেন, 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সময়হারা' কবিতাটি তাঁরই কলমের আঁচড়ে অলংকৃত। পুণ্যলতা লিখেছেন বেশ কিছু প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও গল্প। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিকথা 'ছেলেবেলার দিনগুলি' পাঠকদের মনে দাগ কেটেছিল। শান্তিলতা স্বল্পায়ু ছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিতা ও গল্প প্রকাশ পায় 'সন্দেশ'-এ।

সুবিনয়ের কলম গদ্যে-পদ্যে সমান চলত-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর কত যে তথ্যবহুল রচনা আছে তার সংখ্যা নিরূপিত হয়নি। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সুবিমল প্রবন্ধ লিখে শুরু করেন, পরে লিখেছেন গল্প ও স্মৃতিকথা। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কুলদারঞ্জনের কন্যা মাধুরীলতা ও ইলা আর সুবিনয়ের গৃহিণী পুষ্পলতা। তার উপর ছিলেন সুকুমারের মেজদাদামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর একটি মজার গল্প আমরা উদ্ধৃত করেছি।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, প্রথম পর্বের 'সন্দেশ' প্রকাশ পায় ১৩২০ সনের বৈশাখ মাসে, চলেছে একটানা ১৩৩৩, কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত। এর মধ্যে প্রথম ৩৩টি সংখ্যার (পৌষ, ১৩২২ পর্যন্ত) সম্পাদনা করেছেন উপেন্দ্রকিশোর, যদিও শেষ দিকে সুকুমারই ছিলেন প্রধান লেখক। উপেন্দ্রকিশোরের আমলে কিন্তু কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন, সুকুমার, সুখলতা, ইলা রায় ছাড়া অন্যান্য পারিবারিক লেখকরা প্রকাশিত হননি। তাঁদের অধিকাংশেরই আবির্ভাব সুকুমারের সম্পাদনাকালে। সুকুমার 'সন্দেশ' সম্পাদনা করেন ১৩২২ সনের মাঘ সংখ্যা থেকে ১৩৩০ সনের ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত। তাঁর নেতৃত্বে উপেন্দ্রকিশোরের শিশুপাঠ্য পত্রিকা রাতারাতি রূপান্তরিত হয় কিশোরপাঠ্য পত্রিকায়। সুকুমারের 'সন্দেশ'-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় সীতা দেবীর 'নিরেট গুরুর কাহিনী' আর প্রিয়ম্বদা দেবীর 'পঞ্চুলাল', তবে এ সংকলনে এই উপন্যাস দু-টির স্থান হয়নি। তাঁর আমলে 'সন্দেশ'-এ গল্প লিখেছেন প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্রনাথ দে, প্রিয়ম্বদা দেবী, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ বসু, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতা দেবী, অমরেন্দ্রনাথ বসু, ললিতচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, উমা গুপ্তা, সুধীররঞ্জন খাস্তগীর, প্রণবকুমার রায়, গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। এ ছাড়াও 'সন্দেশ'-এর লেখক হিসেবে আবির্ভাব লীলা রায় (মজুমদার)-এর। প্রথম পর্বের শেষ ভাগে সুকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর পর সম্পাদকের দায়িত্ব নেন সুবিনয়। তিনি সম্পাদক ছিলেন ১৩৩০ সনের আশ্বিন সংখ্যা থেকে ১৩৩৩ সনের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত। তারপরই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে 'সন্দেশ' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়, দেনার দায়ে বিকিয়ে যায় 'সন্দেশ'-এর সত্ত্ব, ইউ রায় অ্যান্ড সন্স, এমনকী গড়পার রোডের বাড়ি পর্যন্ত! এ আমলে পারিবারিক গল্পকারের তালিকায় যুক্ত হন পুণ্যলতার কন্যা কল্যাণী চক্রবর্তী। এ ছাড়া গল্প লিখেছেন শ্রীঅশোক (চট্টোপাধ্যায়), নবেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুনির্মল বসু, মণীশ ঘটক, নির্মলা রায়, জলধর সেন, রবীন্দ্রনাথ সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্যভূষণ, বিমলানন্দ রায়, সুকুমার ঘোষ প্রমুখ।

প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর 'সন্দেশ' আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হয় ১৩৩৮-এর আশ্বিনে আর তার শেষ প্রকাশ ১৩৪২-এর আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায়। সুধাবিন্দু বিশ্বাসের উদ্যোগেই এই পর্যায়ের 'সন্দেশ' প্রকাশ পায়। সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করেন তিনি ও সুবিনয়, কখনো যৌথভাবে, আবার কখনো একাকী। সুধাবিন্দু বিজ্ঞানের ছাত্র, অনেক প্রবন্ধ লিখলেও গল্পও লিখেছেন সুন্দর। সুবিনয়, সুবিমল ও লীলা মজুমদার বেশ কয়েকটি গল্প লেখেন, তবে সুবিনয় পারিবারিক লেখায় পুষ্ট পত্রিকার ধারাটিকে অনেকাংশে ভেঙে দেন, কারণ ততদিনে ছোটোদের সাহিত্যের আসরে অনেক যোগ্য লেখক এসে গেছেন। তাঁরা সানন্দে 'সন্দেশ'-এ গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা ধরনের লেখায় তাকে পুষ্ট করেছেন। প্রথম পর্বেই লিখেছিলেন জলধর সেন, শোভনলাল-মোহনলাল ভ্রাতৃদ্বয় এবং সুনির্মল বসু। তাঁরা তো রইলেনই, সেই সঙ্গে যোগ দিলেন

শিবরাম চক্রবর্তী (যদিও একটি কবিতার মাধ্যমে তাঁর আগেই আত্মপ্রকাশ), অখিল নিয়োগী, বন্দে আলি মিয়া, ননীগোপাল মজুমদার, হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু ইত্যাদি অনেকেই। সমর দে এবং যতীন সাহা মূলত শিল্পী, তবে 'সন্দেশ'-এ তাঁরাও গল্প লিখেছেন আর তার নজির এই সংকলনে পাওয়া যাবে।

এর পর প্রায় ২৭ বছর 'সন্দেশ' প্রকাশনা বন্ধ ছিল। আবার নতুন করে 'সন্দেশ'-এর তৃতীয় পর্ব শুরু হয় রবীন্দ্রশতবর্ষ উদযাপনের মাসে (মে, ১৯৬১)। সত্যজিতের মা সুপ্রভা রায়ের প্রবল উৎসাহ ছিল এ ব্যাপারে, অবশ্য তিনি এই তৃতীয় পর্বের 'সন্দেশ' দেখে যেতে পারেননি। সত্যজিৎ ও তাঁর বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় এই নতুন পর্যায়ের 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই পুণ্যলতা চক্রবর্তী লেখেন 'পুরোনো সন্দেশের কথা'। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন 'কত্তাবাবা', দু-টি অসাধারণ ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু হয়-লীলা মজুমদারের 'টং লিং' আর গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পিকলুর সেই ছোটকা'। দু-টি চমৎকার প্রবন্ধ বেরোল-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জেনি মেমসাহেব নয়' আর অমল দাশগুপ্তের 'মহাকাশে মানুষ'। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছোটোদের জন্য কলম ধরে সত্যজিৎ লিখলেন এডওয়ার্ড লিয়ারের Jumblies অবলম্বনে 'পাপাঙ্গুল'। প্রথম বছরেই লেখক তালিকায় দেখা গেল সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, আশাপূর্ণা দেবী, সুকুমার দে সরকার, পূর্ণেন্দু পত্রী প্রভৃতি বিশিষ্ট নাম। গৌরী চৌধুরী (পরে ধর্মপাল) লিখলেন 'মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র', আর এক নতুন লেখিকা শিবানী রায়চৌধুরীর 'ইন্তাবিলের পুঁথি' সাড়া ফেলে দিল। নলিনী দাশের চার কিশোরী 'গোয়েন্দা গণ্ডালু'র কাহিনি প্রথম প্রকাশ পেল। সত্যজিৎ লিয়ার আর লুইস ক্যারলের আরও কয়েকটি ছড়া অনুবাদ করে পুজো সংখ্যায় লিখলেন প্রোফেসর শঙ্কুর প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি', পরে প্রকাশ পেল 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' আর 'টেরোড্যাকটিলের ডিম'।

তবে সাড়া জাগলেও ব্যবসায়িক সাফল্য এল না সেরকম। ১৯৬৩ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সরে গেলেন; যৌথ সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন সত্যজিৎ রায় ও লীলা মজুমদার; 'সন্দেশ'-এর মালিকানা গেল 'সুকুমার সাহিত্য সমবায়' নামে লেখক-শিল্পীদের সমবায় প্রতিষ্ঠানের হাতে; ধর্মতলার ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিয়ে 'সন্দেশ' অফিস উঠে এল ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউয়ে নলিনী দাশের বাড়িতে (আজও আছে সেই ঠিকানায়)। নলিনী দাশ গোড়া থেকেই সম্পাদকীয় দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন, ১৯৭৪ সালে অবসর গ্রহণের পর এলেন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদকরূপে। এই তিন সম্পাদকের সম্পাদনাকাল ছিল ১৯৯২ সালে সত্যজিতের মৃত্যু পর্যন্ত। নানা দিক থেকেই এই কাল পর্যায়কে 'সন্দেশ'-এর দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তিন সম্পাদকই লেখায় (এবং সত্যজিতের ক্ষেত্রে রেখায়) উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন 'সন্দেশ'-কে। লীলা মজুমদারের নাটিকা 'লঙ্কা-দহন পালা' আর 'বালী-সুগ্রীব কথন' ছাড়াও 'সন্দেশ'-এ বেরোয় তাঁর 'মাকু', 'নেপোর বই', 'হাওয়ার দাঁড়ি', 'বাতাস বাড়ি' আর অজস্র গল্প। সত্যজিতের 'অনাথবাবুর ভয়', 'সদানন্দের খুদে জগৎ', 'সেপ্টোপাসের খিদে', 'পটলবাবুর ফিল্মস্টার' প্রভৃতি অসাধারণ গল্প তো ছিলই, ১৯৬৫ সালে বেরোয় তাঁর প্রথম ফেলুদা-কাহিনি 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি', তার পরে আরও অনেকগুলি। সত্যজিতের আরেক জনপ্রিয় চরিত্র তারিণীখুড়োর বেশ কয়েকটি গল্প স্থান পেয়েছে 'সন্দেশ'-এ, যেমন পেয়েছে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের অনেক গল্প। নলিনী দাশের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'গোয়েন্দা গণ্ডালু' সিরিজ তো প্রকাশ পেয়েইছে, তা ছাড়াও আছে তাঁর 'মরুপ্রাসাদের রহস্য' বা 'নিশীথরাতের

ঘোড়সওয়ার’ প্রভৃতি গল্প। এই তিন দিকপালই শিশুসাহিত্যের জন্য ‘বিদ্যাসাগর পুরস্কার’ পেয়েছেন, অনেকটাই ‘সন্দেশ’-এ প্রকাশিত তাঁদের লেখার জন্য। প্রথম পর্বের ‘উপেন্দ্রকিশোর-কুলদারঞ্জন-সুকুমার’-এর মতন একই যুক্তিতে এঁদেরও একাধিক গল্প নির্বাচিত হতে পারত। তা হয়নি, কারণ এই পর্বে যোগ্য লেখকদের সংখ্যা অনেক এবং ‘লীলা-সত্যজিৎ-নলিনী’-র লেখার সঙ্গে আজকের পাঠকসমাজ অনেক বেশি পরিচিত।

‘সন্দেশ’-এর দুর্দিন ঘনিয়ে আসে ১৯৯২-এ সত্যজিতের ও পরের বছর নলিনীর মৃত্যুর পর। লীলা মজুমদার কিছুদিন একা ও প্রায় দশ বছর সত্যজিৎ-গৃহিণী বিজয়া রায়ের সঙ্গে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৪১০ সনের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা (অর্থাৎ অক্টোবর, ২০০৩) থেকে দশ বছরের বেশি সম্পাদনার দায়িত্ব সামলাছেন উপেন্দ্রকিশোরের চতুর্থ প্রজন্ম সন্দীপ রায়। সঙ্গে সহ-সম্পাদক, যৌথ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলীতে কাজ করেছেন আরও অনেকে।

‘সন্দেশ’-এর এই তৃতীয় পর্বেও পারিবারিক লেখকদের একটা ভূমিকা ছিল। নলিনী দাশ ছাড়াও লীলা মজুমদারের দাদা প্রভাতরঞ্জন রায়, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসাদরঞ্জন রায় ও নলিনীর পুত্র অমিতানন্দ দাশ লিখেছেন নিয়মিত। সন্দীপও লিখেছেন বেশ ক-টি প্রবন্ধ ও ছাপার জন্য তৈরি করে দিয়েছেন অনেকগুলি সিনেমার স্ক্রিপ্ট। এ ছাড়াও লিখেছেন লীলার কন্যা কমলা চট্টোপাধ্যায় ও নাতনি শ্রীলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতরঞ্জনের কন্যা সুনন্দা রায়চৌধুরী ও নাতনি সুমনা রায়চৌধুরী, সারদারঞ্জনের প্রপৌত্রী সুদতী রায়, সুজয় সোম প্রমুখ কয়েকজন। তবে তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ‘সন্দেশ’কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ‘সন্দেশি’ এক লেখকদল-যার গুরুত্বপূর্ণ সভ্য ছিলেন গৌরী ধর্মপাল, শিশিরকুমার মজুমদার, অজেয় রায়, রেবন্ত গোস্বামী, মঞ্জিল সেন প্রমুখ লেখকরা এবং আজও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন অমিতানন্দ দাশ, প্রসাদরঞ্জন রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, অরুণিমা রায়চৌধুরী, ভবানীপ্রসাদ দে, লায়লী দাশ, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, রাহুল মজুমদার, রূপক চট্টরাজ, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অশোককুমার মিত্র, রঞ্জনপ্রসাদ প্রমুখ লেখকরা। ‘সন্দেশ’-এ লেখার জগতে লীলা মজুমদার টেনে এনেছিলেন রণজিৎ রায়, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ ভিন্ন জগতের অধিবাসীদের। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একমাত্র গল্প লিখেছেন এখানেই। এর বাইরেও বাংলার অধিকাংশ বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশ পেয়েছে ‘সন্দেশ’-এ। পূর্বোল্লিখিতদের বাদ দিলেও সে তালিকায় আসবে সৈয়দ মুজতবা আলি, জসীমউদ্দীন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, স্বপন বুড়ো, শৈল চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, অন্নদাশঙ্কর রায়, শঙ্খ ঘোষ, মতি নন্দী, মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেবসেন, বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, বিমল কর, শৈলেন ঘোষ, বাণী বসু, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুনীল জানা, বলরাম বসাক এবং আরও অনেকে। সন্দেশ-গ্রাহকদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী, যশোধরা রায়চৌধুরী প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত লেখকরা।

এই বিশাল তালিকার মধ্যে থেকে সম্পাদকরা বেছে নিয়েছেন ১০০ বছরের সময়সীমায় ১০০টি গল্প। আশা করি গল্পগুলি পড়ে পাঠকরা ‘সন্দেশি’ স্বাদ পাবেন আর তা সাহায্য করবে শতবর্ষ অতিক্রান্ত সংস্থাটিকে আগামী দিনে পথ চলতে।

এই সংকলনের গল্প-সংগ্রহে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন দেবাশিস সেন, সম্পাদকদের তিনি ধন্যবাদার্হ। সম্পাদকদের কৃতজ্ঞতা রইল মূল পাঠের উৎসগুলির প্রতি-‘সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস’-এর ডিজিটাল আর্কাইভ আর সন্দীপ রায় ও অশোককুমার

মিত্রের ব্যক্তিগত সংগ্রহ। অজস্র ধন্যবাদ 'শিশু সাহিত্য সংসদ' আর তার দুই কর্ণধার দেবজ্যোতি ও চন্দনা দত্তকে এই বই প্রকাশের গুরুভার গ্রহণ করার জন্য।

ভুল-ভ্রান্তির দায়িত্ব অবশ্যই সম্পাদকদের। আমরা নিশ্চিত যে প্রাণপাত পরিশ্রম সত্ত্বেও কিছু ভুল নিশ্চয়ই রয়ে গেছে। পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবার দায়িত্বও আমাদের।

অশোককুমার মিত্র

প্রসাদরঞ্জন রায়

*জানুয়ারি, ২০১৫*

*কলকাতা*




# উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সেই যে দেশের মেয়েদের খুকির মতন ছোট্ট ছোট্ট পা হয়, আর ছেলেরা মাস্টারের দিকে পিছন ফিরে পড়া বলে; যে দেশের লোকেরা বাঁকা চোখে মিটমিট করে তাকায়, আর কাঠি দিয়ে ভাত আর আরশুলার চাটনি খেয়ে, সেই কাগজের ফানুসগুলো বানায়;-সেই চীন দেশে চাঙের বাড়ি ছিল।

চাঙের বাপ ছিল দোকানদার; সে তার দোকানে বসে লাল লাল ফানুস আর রেশমি পাখা বেচত। চাং ছোট্ট ছেলেমানুষ, সে তার পুঁথি বগলে করে পাঠশালে পড়তে যেত। সে দেশের অক্ষরগুলো দেখতে জাহাজের মতো। চাং পাতলা কাগজের উপর সরু তুলি দিয়ে সেইরকম অক্ষরে চমৎকার কবিতা লিখত। তার গুরুমশাইয়েরা সেই কবিতা পড়ে ভারি আশ্চর্য হয়ে যেতেন; তেমন কবিতা আর কেউ কখনো লেখেনি।

দেখতে দেখতে চাং বড়ো হল, তার পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেল।

তখন চাঙের বাপ বলল, 'লেখাপড়া তো হয়েছে, এখন দোকানে এসে কাজ কর।'

চাং বলল, 'বাবা, দোকানের কাজ আমার একটুও ভালো লাগে না। আমাকে বিদেশে যেতে দাও, আমি করে খাব।'

চাঙের বাপ বলল, 'তাও কি হয়!'

চাং আর কিছু বলল না, কিন্তু তার মন বড়ো খারাপ হয়ে গেল। সে পেট ভরে খায় না, হেসে কথা কয় না, আর খালি জিনিস বেচে তার দাম নিতে ভুলে যায়। কাজেই তার বাপ আর কী করে? সে বলল, 'আচ্ছা বাবা, তোর যেখানে ভালো লাগে সেখানে যা।'

চাং অমনি তিন হাত উঁচু এক লাফ দিল, আর দু-হাতে করে বার বার তার বাপের পায়ের ধুলো নিল। সেই দিনই সে তার মা-বাপের কাছে বিদায় হয়ে, তার ছোট্ট পুঁটুলিটি বগলে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে বন্দরে, এমনি করে সে সমুদ্রের ধারে এসে দেখল যে বড়ো বড়ো জাহাজ সব বাঁধা রয়েছে, তারা পাল খাটিয়ে সমুদ্র পার হয়ে পৃথিবীর নানান জায়গায় যাবে।

চাং বলল, 'বাঃ! এর একটা জাহাজে চড়ে গেলে কী মজাই হবে।' তখনই সে একটা জাহাজের মাঝিকে গিয়ে বলল, 'মাল্লা চাই? আমি মাল্লার কাজ করতে এসেছি।'



সেই জাহাজের মাল্লা হয়ে সে তো সমুদ্রে চলল, কিন্তু সে যেমন মজা হবে মনে করেছিল, তার কিছুই হল না। খানিক দূর গিয়েই সেই জাহাজ ঢেউ খেয়ে দুলতে লাগল; আর তখন চাং ভাবল বুঝি তার নাড়িভুঁড়ি সব বমি হয়ে যাবে। তারপর যেই সে একটু সামলে নিয়েছে, অমনি এমন ঝড় এল যে, ঝড় যাকে বলে। ঢেউয়ের ঘাড়ে ঢেউ চড়ে পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে সেই জাহাজের উপর ভেঙে পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে জাহাজখানি গুঁড়ো হয়ে মাঝিমাল্লা সব কে কোথায় গেল, চাং তার কিছুই বুঝতে পারল না। সে খালি দেখতে পেল যে জাহাজের মাস্তুলটা তার কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সে প্রাণপণ করে সেইটাকে আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর ঝড় থেমে গেলে সে দেখল যে মাস্তুলটা তাকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে ডাঙায় ঠেকেছে। সেইখানেই সে বালির উপরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের ভিতরে কোনখান দিয়ে রাত কেটে গেছে চাং তা টের পায়নি। সকাল বেলায় জেগে সে দেখল তার চারধারে মেলাই লোক জড়ো হয়েছে। তাদের সকলেরই ভারি মজার চেহারা, আর বড্ড জমকালো পোশাক। তাদের মধ্যে একজন দেখতে খুব সুন্দর, আর তার জামায় আর পাগড়িতে আর ঘোড়ার সাজে খালি হিরা মোতি আর পান্না ঝলমল করছে। তিনি সেই দেশের রাজার ছেলে। তিনি চাংকে দেখে বললেন, 'আহা, না জানি তুমি কত কষ্ট পেয়েছ। তুমি কোথা থেকে আসছ?'

চাং বলল, 'আমার বাড়ি চীন দেশে। ঝড়ে জাহাজ ডুবে এইখানে এসে পড়েছি।'

যেই এই কথা বলা, অমনি রাজার ছেলে কী খুশি যে হলেন, আর চাংকে কত যে যত্ন করতে লাগলেন, কী বলব! সে দেশের লোকে আর কখনো চীন দেশের লোক দেখেনি; তারা খালি শুনেছে যে চীনেরা বড়োই বুদ্ধিমান। রাজপুত্র মনে করলেন, 'ওঃ! কী আশ্চর্য! একটা জ্যান্ত চীনে মানুষ আমাদের দেশে এসেছে। একে নিয়ে বাবাকে না দেখালেই নয়।'

তাঁরা তখনই চাংকে একটা চমৎকার ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলেন। চাং তাতে বসে সবে ভাবছে, 'এইবারে বেশ মজা হবে' অমনি ঘোড়া তাকে নিয়ে ঝুপ করে সমুদ্রের ভিতরে ঢুকে গেল, তাকে ভালো করে 'মাগো' বলবারও সময় দিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, জলে ডুবে কোথায় সে দম আটকে মারা যাবে, না, তার বদলে দেখল যে সে যারপরনাই আরামে, আর সকলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে; জল তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্রের তলায় এমন সুন্দর দেশ আছে, চাং তার কিছুই জানত না। সে মনে করত, তার চীন দেশই সকলের চেয়ে সুন্দর, কিন্তু এখন দেখল যে এদেশের কাছে সে

দেশ কিছুই নয়। আর সে দেশের যে রাজবাড়ি, তা দেখে তো সে আর কথাই কইতে পারল না। রামধনুর রং দিয়ে, ঝিনুকের ঝিকিমিকি দিয়ে সে বাড়ি তৈরি করেছে। সেই বাড়িতে সমুদ্রের রাজা থাকেন। তিনি বুড়ো মানুষ; তাঁর দাড়ি গোঁফ দুধের মতন সাদা আর রেশমের মতো ফুরফুরে। এমন সুন্দর মানুষ আর কেউ কখনো দেখেনি। চাং বড্ড থতমত খেয়ে গিয়েছিল, তার বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকি ধড়াস ধড়াস করছিল; কিন্তু রাজামশাইকে দেখে তার ভয় চলে গেল। রাজামশাইও তাকে দেখে ভারি খুশি হলেন, আর বললেন, 'আমি শুনেছি, তোমাদের দেশের লোক ভারি বুদ্ধিমান আর তারা চমৎকার কবিতা লিখতে পারে। আচ্ছা, আমার এই বাড়িটার কথা দিয়ে একটা কবিতা লেখো তো।'

চাঙের মতো কবিতা তো আর কেউ লিখতে পারত না, কাজেই সে তখনই কাগজ কলম নিয়ে বসে মস্ত একটা কবিতা লিখে ফেলল। তেমন সুন্দর কবিতা আর সে নিজেও কখনো লেখেনি। রাজামশাই সেই কবিতা পড়ে এতই খুশি হলেন যে, তিনি ঘাড় নেড়ে হাত নেড়ে সুর করে বার বার খালি সেটাকে পড়তেই লাগলেন। চাংকে তিনি বাড়িঘর হাতি-ঘোড়া লোকজন জমিদারি কত কিছু তো দিলেনই; তাতেও তাঁর মন উঠল না, শেষে নিজের মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। সে মেয়েটি দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি সে লক্ষ্মী, তেমনি তার বুদ্ধি। তারপর বছরের পর বছর চাঙের সুখে কেটে গেছে। তাদের যারপরনাই সুন্দর দু-টি খোকা হয়েছে। চাঙের মতন সুখী লোক আর নাই, খালি এককথায় তার মনে বড়ো দুঃখ। যতই দিনের পর দিন যাচ্ছে, ততই তার মন তার বাপ-মাকে দেখবার জন্য পাগল হচ্ছে। তাদের কথা ভেবে তার চোখের জল পড়ে। শেষে সে একদিন রাজার মেয়েকে বলল, 'চলো না, একবার আমাদের দেশে যাই। আমার মাকে আর বাবাকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছে।'

রাজার মেয়ে বলল, 'হায়! আমরা কী করে যাব? এদেশের বাইরে গেলেই যে আমরা মরে যাই।'

চাং বলল, 'তাই তো, তাহলে আর কী করে হয়।'

রাজার মেয়ে বলল, 'আমরা নাই-বা গেলাম, তুমি তোমার মা-বাপকে দেখে এসো। কিন্তু দেখো, যেন এক বছরের বেশি দেরি কোরো না; তাহলে কিন্তু আমি কাঁদতে কাঁদতে মরেই যাব।'

তারপর রাজার মেয়ে এক থলে মণিমুক্তা আর একখানি ছোট্ট আরশি এনে চাংকে দিয়ে বলল, 'এই থলেটি আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে দিয়ো, আর এই আরশিখানি যত্ন করে তোমার সঙ্গে রেখো। দেশে গিয়ে তোমার যখনই ইচ্ছা হবে তখনই এই আরশির ভিতরে আমাকে দেখতে পাবে।'

তখন সুন্দর একখানি গাড়ি সেজে এল; সেই গাড়িতে করে রাজার মেয়ে চাংকে সমুদ্রের ধারে এনে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। সেখানে চীনদেশের অনেক জাহাজ ছিল, চাং তার একটাতে চড়ে দেশে এল।

কিন্তু হায় হায়! দেশে এসে চাং দেখল যে তাদের সে বাড়িতে আর তার বাপ-মা নাই। দোকানটি আগুনে পুড়ে গিয়েছে, আর তার সঙ্গে তাদের আর যা কিছু ছিল, সব গিয়েছে; একটি ঘটি-বাটিও বাঁচে নাই। তার বাপ-মা এখন একটা পচা গলিতে একখানি কুঁড়ে ঘরে থাকে, ভিক্ষা করে খায়, অনেক দিনই তাও পায় না।

অনেক কষ্টে চাং তাদের খুঁজে বার করল। তারা তো মনে করেছে চাং আর নাই, আর তাই ভেবে এতদিন ধরে তার জন্যে চোখের জল ফেলেছে। এর মধ্যে যখন চাং এসে তাদের প্রণাম করল, তখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের মনে হল যেন তাদের আর কোনো দুঃখ নাই। চাংও তখন হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। যাহোক, সে কোনোমতে একটু শান্ত হয়েই ছুটে গিয়ে বাজার থেকে ভালো ভালো খাবার কিনে নিয়ে এল। বাজারে যতদূর ভালো খাবার পাওয়া যায়, তাই দিয়ে মা-বাপকে বেশ করে খাইয়ে তারপর সে সেই রাজার মেয়ের দেওয়া মণির থলিটি নিয়ে তাদের জন্যে বাড়ি খুঁজতে বেরোল।



সে সব মণির একটি একটি দিয়ে সাতটি রাজাকে কিনে ফেলা যায়। তার মা-বাপ যেমন কষ্টে ছিল, দেখতে দেখতে তাদের তেমনি সুখ হয়ে গেল। তারা যখন শুনল যে এত ধনের সবই সেই সমুদ্রের রাজার মেয়ে তাদের দিয়েছে, তখন তারা দিন-রাত খালি হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

তারপর থেকে দিন খুব সুখেই যায়, চাং বাপ-মায়ের সেবা করে, আর রোজই সেই আরশিটি নিয়ে দেখে রাজার মেয়ে ভালো আছে কি না। দিন কতক তার মুখখানি বেশ হাসি হাসি দেখা গেল, তারপর থেকে মনে হল যেন তার চোখ দু-টি ছল ছল করছে। তা দেখে চাঙের মনে ভারি কষ্ট হল, সে আর দেশে চুপ করে বসে থাকতে পারল না। তারপর দিনই সে বাপ-মাকে বলল যে, 'আমার যাবার সময় হয়েছে, তোমরা খুশি হয়ে আমাকে যেতে দাও।' তারাও তাকে অনেক আশীর্বাদ করে বিদায় দিল।

তারপর তাদের ওখান থেকে চাং সমুদ্রের ধারে এসে জাহাজ ভাড়া করতে গেল। জাহাজের মাঝি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবে?'

তখন তো চাঙের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল; সে যেখানে যাবে, সে জায়গার নাম সে জানে না। সে জাহাজ ডুবে সেখানে গিয়ে পড়েছিল, কিন্তু কোনোদিন তার নাম শুনে নাই; কাউকে জিজ্ঞাসাও করে নাই। সে খালি জানত সেটা একটা দ্বীপ। কাজেই সে আর কী করে, সে মাঝিকে বলল, 'তোমরা যত দ্বীপের কথা জান, সেই সব দ্বীপ আমাকে দেখিয়ে আনবে।'

মাঝি কত দ্বীপে জাহাজ নিয়ে গেল, কিন্তু তার একটাকেও চাং তার সেই দ্বীপ বলে চিনতে পারল না। এদিকে বছর প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, রাজার মেয়ের চোখ দু-টি দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। চাং বলল, 'হায় হায়, এখন উপায়?'

বলতে-না-বলতেই চাং চমকে উঠল। সে শুনল যেন জলের ভিতর থেকে কে তাকে ডাকছে, 'বাবা, বাবা!' সে চেয়ে দেখল, তারই নিজের ছেলে দু-টি তাকে তাদের ছোট্ট ছোট্ট হাত দু-খানি দিয়ে ডাকছে, আর সেই জলের ভিতর থেকে তাকে চুমো খাচ্ছে। তারা বলল, 'বাবা, আমাদের পিছু পিছু তোমাদের জাহাজ চালিয়ে নিয়ে এসো, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে মা আমাদের পাঠিয়েছেন।'

বলে সেই খোকা দু-টি ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করতে করতে মাছের মতন ছুটে জাহাজের আগে আগে চলল, আর মাঝিমাল্লারা পালের উপর পাল তুলে দিয়ে সবাই মিলে প্রাণপণে 'হেঁইয়ো' করে দাঁড় টেনে তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল। আর একটু পরেই চাং লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরে থামো, থামো, এই যে আমার সেই দ্বীপ।' বলেই চাং ঝনাৎ ঝনাৎ করে তাদের এক থলির জায়গায় তিন থলি টাকা বকশিশ দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই দ্বীপে নামল। মাঝিমাল্লারা খুশি হয়ে তাকে সেলাম করতে করতে জাহাজ ভাসিয়ে চলে গেল, আর তখনই তার ছেলে দু-টি হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার কোলে লাফিয়ে উঠল।

রাজার মেয়ে তো এর কত দিন আগে থাকতেই গাড়ি নিয়ে সেখানে এসে ভাবছিল, চাং কেন আসছে না। চাংকে দেখে সে কত যে খুশি হল, কী বলব! তারপর তারা গিয়ে রাজার বাড়িতে পৌঁছালে দেশের লোক আর রাজা নিজেও কম খুশি হলেন না। চাংও অবিশ্যি খুবই খুশি হল। সে কিছুই বলল না বটে, কিন্তু কবিতা লিখল হাজার দুই-তিন।

*বৈশাখ ১৩২০*




# সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক ছিল ধোপা তার নাম হাবু। তার ছিল এক গাধা। ধোপারা যেমন গাধার পিঠে কাপড়ের বস্তা দিয়ে নিয়ে যায় সেও তেমনি করত। তাই নিয়ে তার গিন্নি কত ঠাট্টা কত বকাবকি করত তার ঠিক নেই। বলত, ‘দেখো রাজবাড়ির ধোপার কেমন সুন্দর ঘোড়া-সে ঘোড়ায় করে কাপড় নিয়ে যায় তার ছেলেরাও কখনো কখনো তার উপর সওয়ার হয়ে বেড়িয়ে বেড়ায় আর তোমার কিনা এই গাধা নিয়েই কারবার-তোমার হল কী?’ সে বেচারা গিন্নির লাঞ্ছনায় তিতি-বিরক্ত হয়ে স্থির করল এবার যেন তেন প্রকারেণ একটা ঘোড়া কিনতে হবে। এক মাসে তার অনেক কষ্টে ৫টি টাকা জমেছিল। সেই টাকা ক-টি হাতে করে বাজারময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। যার কাছে ঘোড়া কেনবার কথা বলে সেই তাকে হাঁকিয়ে দেয়-বলে, ‘৫ টাকায় আবার ঘোড়া কিনতে এসেছে, মিনসের রকম দেখো না?’

সে মুখ চুন করে বাড়ি ফিরছে, এমন সময় একজন নাপিতের সঙ্গে দেখা হল। নাপিত জিজ্ঞাসা করল, ‘কেন ভাই তোমার কী হয়েছে? অমন মুখভার করে চলেছ কোথায়?’ হাবু বলল, ‘আর ভাই কী বলব-আমি একটা ঘোড়া কিনতে চাই-ঘোড়া না হলে আমার গিন্নি আমাকে খেয়েই ফেলবে-আমি যার কাছে কিনতে যাই সেই আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আমি কত খেটেখুটে এই ৫ টাকা জমালুম-সবটাই কড়ায়-গণ্ডায় দিতে প্রস্তুত তবু কেউ আমার কথায় কান দেয় না। কী করি বলো দেখি নাপিত ভায়া?’ নাপিত বলল, ‘তা ভাবনা কীসের? আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তোমাকে ঘোড়া না দিতে পারি ঘোড়ার ডিম এনে দিচ্ছি-সে ডিম ফুটলে এমন সুন্দর বাচ্চা হবে যে, যে দেখবে তার তাক লেগে যাবে। তুমি একটু বসো আমি এখনই তোমাকে এনে দিচ্ছি।’

কাছেই নাপিতের কুঁড়ে ঘর ছিল, সেখানে গিয়ে বেশ একটা বড়ো কুমড়ো বের করল, তার উপর ভালো করে চুন মাখিয়ে ধোপার কাছে এনে হাজির, ‘এই দেখো ভাই, তোমার জন্য ডিম এনেছি। এর দাম অনেক, কিন্তু বন্ধুতার খাতিরে তোমাকে সস্তা দিচ্ছি, আমাকে এই ৫ টাকা দিলেই হবে। এটা ৭-৮ দিন রোদ্দুরে রাখতে হবে, তারপর ফুটলে এর থেকে এমন ঘোড়ার বাচ্চা বেরোবে যে তুমি তখনই তার উপর চড়ে দৌড়ে বেড়াতে পারবে।’ এই বলে হাবুর কাছ থেকে পঞ্চমুদ্রা নিয়ে পিটটান দিল।

হাবু তো ভারি খুশি, সে তখুনি ডিম মাথায় করে নিয়ে চলল। যেতে যেতে তার মনে নানান খেয়াল উঠতে লাগল-কেমন সুন্দর বাচ্চা হবে-যখন বড়ো হয়ে তার উপর চড়ে বেড়াব আর যখন টক টক করে গিন্নির সামনে দিয়ে চড়ে যাব, তাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে। আর আমাকে খোঁটা দিতে পারবে না। বলতে বলতে সে সত্যই এমন দ্রুতবেগে ছুটল যে ডিমটা মাথা থেকে পড়ে ছরকুটে গেল।

সেই সময় কাছ থেকে একটা শেয়াল যাচ্ছিল। তাকে দেখে হাবু ভাবল, ‘এই বুঝি বাচ্চা বেরিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে’-এই ভেবে তার পিছনে পিছনে ছুটল, এই ধরে আর কি। যখন ধর ধর হল তখন শেয়ালটা দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে দে ছুট। তাকে হাবু আর ধরতে পারল না। কাজেই খালি হাতে ঘরে ফিরে যেতে হল। মাথা হেঁট করে গিন্নির কাছে গিয়ে উপস্থিত। বৃত্তান্তটা শুনে গিন্নি জ্বলেপুড়ে মরেন আর কি। ‘এই বুঝি তোমার ঘোড়া। ধিক তোমাকে! টাকা যা কিছু কষ্টেসৃষ্টে জমিয়েছিলে তাও জলে ঢেলে এলে। আমাদের এ মাসটা চালানো ভার। হাবার গাধাই সাজে-ঘোড়া কিনতে যাওয়া তার পক্ষে বামনের চাঁদে হাত বাড়াবার মতন। আমি আগেই জানতুম তুমি হাজার মাথা খুঁড়লেও তার কোনো ফল হবে না।’

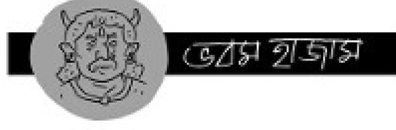
এদিকে শেয়াল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তার বাড়ি পৌঁছোল আর পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ধোপার কথা রাষ্ট্র করে দিল। শেয়ালদের এক খণ্ড সভা বসল। পরে অনেক মন্ত্রণার পর শেয়ালের যুক্তিতে যা স্থির হল সভাপতি বলে দিলেন।

প্রথমে এই, যে দিনের বেলায় বেরোতে হলে শেয়ালদের ন্যাজ গুটিয়ে বেড়াতে হবে।

দ্বিতীয় এই, যে সকাল-সন্ধ্যা যে যত পার চেঁচিয়ে ডাক ছাড়বে আর যখনই হোক এক জনের ডাক শুনলে দশজনে তাতে যোগ দিয়ে সকলকে সাবধান করে দেবে। এই নিয়মে না চললে ধোপার হাতে কোনোদিন তোমাদের প্রাণটা খোয়াতে হবে তা বলা যায় না। সেই অবধি শেয়ালদের মধ্যে এই নিয়মগুলি চলিত হয়ে গেল।

ধোপা যদিও আপনার ঘরে গিন্নির কাছে অপদস্থ কিন্তু শেয়াল মহলে তার খুব মান, তার নামে সকলেই সশঙ্কিত।

*জ্যৈষ্ঠ ১৩২০*




## কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল রাজা, সে এক ভারি প্রকাণ্ড রাজা। তাঁর হাতিশালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতি গোয়ালে গোরু আস্তাবলে ঘোড়া-কী? এ সব জান? এ সব তো সব রাজার আছে? তা একটু আবার শোনো না-তাঁর ভাঁড়ার ভরা ইঁদুর, পুকুর ভরা ব্যাং, আরও কত কিছু ছিল, আর মাথায় দুটো ছাগলের মতো শিং। বেচারা রাজার তো শিং নিয়ে মহা মুশকিল, পাছে লোকে দেখে এই ভয়েই অস্থির। তাঁর মাথার চুল খুব লম্বা ছিল আর তার উপর প্রকাণ্ড এক মুকুট। কোনো রকম করে শিংটা চাপা দিয়ে রাখতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু চুল আর কত লম্বা রাখা যায়, তাতেও যে লোকে যা তা বলতে আরম্ভ করে। কাজেই রাজা আর কী করেন মাঝে মাঝে চুল কাটান; কিন্তু যে নাপিত যায় সে আর ফিরে আসে না; রাজামশাই কোনো একটা ছুতোনাতা করে তার মাথাটি উড়িয়ে দেন। কাজেই আর কোনো নাপিত আসতে চায় না, রাজার বাড়ি যাওয়ার হুকুম এলেই কোনোরকমে ক্ষুর কাঁচি পুঁটলিপাঁটলা নিয়ে তাঁর দেশ ছেড়ে পালায়। শেষে এক ছোকরা নাপিত টাকার লোভে রাজার বাড়ি গেল। নাপিতের নাম ভবম হাজাম (হিন্দুস্থানি নাপিত কিনা,-তারা নাপিতকে বলে হাজাম)।

ভবম এসে তো বেশ করে রাজার চুল কাটছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে কিনা রাজার মাথায়-বাপরে-এয়া বড়ো দুই শিং! সে তো তাই দেখে একেবারে হতভম্ব। তার পর সে কোনোরকমে রাজার চুল কাটা সারল। কিন্তু বেচারার এই সব দেখে মাথা ঠিক ছিল না, সে রাজার মাথায় টিকি রাখতে ভুলে গেল। আর যায় কোথায়? রাজা বললেন, 'তবে রে বেটা বেয়াদব, আমার মাথায় শিখা রাখিসনি যে? এক্ষুনি তোর গর্দান নেব।'

নাপিত তো ভয়ে কাঠ। সে বলল, 'দোহাই হুজুর, এটা বড়োই ভুল হয়ে গেছে; তবে টিকি, বিশেষ করে রাজা লোকের টিকি, ও ফের খুব শিগগির গজাবে; কিন্তু হুজুর, আমি গরিব মানুষ, আমার মাথা গেলে আর গজাবে না'-কিন্তু সে আর কে শোনে? তার পর নাপিত অনেক হাতে পায়ে ধরল, শেষে বুঝিয়ে বলল যে তার মাথা কাটা গেলে আর কোনো নাপিত কখনো রাজবাড়িতে আসবে না। তখন রাজা আর কী করেন, বললেন, 'যা, কিন্তু খবরদার আমার শিঙের কথা কাউকে বলিসনে, বললেই তোর দফা শেষ করব।'

নাপিত তো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরে পালাল আর রাজার বাড়ির মুখোও হল না।

এখন, নাপিতের পেটে কথা থাকে না। কাজেই এই রাজার শিঙের কথাও ভবম নাপিতের পেটে আর থাকতে চায় না। নাপিত প্রাণের দায়ে তাকে জোরজবরদস্তি করে অনেক চেপে রাখতে চেষ্টা করল কিন্তু সে কিছুতেই চাপা গেল না, মাঝে থেকে এই ঠেলাঠেলির চোটে ভবমের পেটটা ফুলতে লাগল। দিন যায়, নাপিতের পেটও যায় যায়।

সেটা ফুলে ফুলে ঢোল, ক্রমে ঢাকাই জালা হয়ে উঠল। শেষে নাপিত তার এক নানির (দিদিমা) কাছে গেল। গিয়ে বলল, 'নানি, টাকার লোভে একজায়গায় গিছলাম, সেখানে একটা কথা জেনেছি; এখন তার চোটে মাথা যায় কি পেট যায়।'

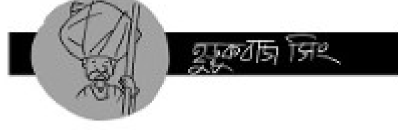
নানি বলল, 'কী হয়েছে খুলেই বল না কেন?' ভবম বলল, 'অত বলবার জো নেই আর না বললেও তো দেখছ কী হচ্ছে।'

নানি তখন তাকে বলে দিল যে, 'শহরের মাঝে যে প্রকাণ্ড বট গাছ আছে তার কোটরে ঢুকে তোর কথাটা বলে আয়গে।' ভবম তখন গাছের কোটরে ঢুকে চুপে চুপে বলে এল, 'আরে বাসরে, রাজার মাথায় এয়া বড়ো দুই শিং!!' আর অমনি তার পেট ফাঁপাও সেরে গেল।

তারপর একদিন রাজার বাড়ি মহা ধুমধাম। রাজার মেয়ের বিয়ে। অনেক জায়গা থেকে কত ঢাক ঢোল কত বাজনা এসেছে। তার মধ্যে ছিল এক ঢোল সেটা সেই শহরের মাঝের বট গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। যখন বিয়ের আসর খুব জমেছে, বরযাত্রী এসে পড়েছে, চারিধারে লোকে লোকারণ্য, তখন সকলে শুনল, রাজার নহবতখানায় সানাই কাঁসর আর ঢোল মিলে নানান সুরে কী যেন বলছে। সানাই তার মিহি সুরে তান ধরেছে, 'রাজাকে দুই শিং! রাজাকে দুই শিং!' কাঁসর অমনি ক্যান ক্যান করে বলছে, 'কিন্নে কহা? কিন্নে কহা?' (কে বলেছে, কে বলেছে) আর ঢোল গুরুগম্ভীর আওয়াজ করে বলছে 'ভবম হাজাম নে, ভবম হাজাম নে' (ভবম নাপিত বলেছে)!

আর কোথা যায়! চারিধারে হুলস্থুল-লোকে যা-তা বলতে আরম্ভ করল। রাজা তো রেগে আগুন হয়ে নাপিতকে কাটতে হুকুম দিলেন। কিন্তু নাপিত কি আর সেখানে থাকে? সে সেই সর্বনেশে ঢোলের কাণ্ড দেখে আগেই কোথায় সরে পড়েছে। কাজেই, তাকে আর তখন ধরে কে? রাজামশায়ের লম্ফঝম্প আর শিং নাড়াই সার হল।

*শ্রাবণ ১৩২০*




## উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক রাজার ছিল দুই পালোয়ান, ‘দুড়ুমপটাশ সিং’ আর ‘হুড়ুকবাজ সিং’।

দুড়ুমপটাশ সিং সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা, আর জোয়ানও তেমনি। সে একদিন রাজার আস্তাবলে হেঁচে ফেলেছিল, সেই হাঁচির চোটে রাজার পক্ষীরাজ ঘোড়া পাঁচ মাইল দূরে ঠিকরে পড়ে মারা গেল।

হুড়ুকবাজ সিং ছিল মোটে তিন হাত লম্বা, কিন্তু তার মাথার পাগড়িটা ছিল সাত হাত উঁচু, আর তার বর্শাখানি ছিল একটি আস্ত বাঁশ। আর সে কথা কইত ভারি লম্বা-চওড়া। আর আর পালোয়ানরা বলছিল, তারা ভারী ভারী জোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়েছে, তা শুনে অমনি হুড়ুকবাজ বলে উঠল, ‘মানুষের সঙ্গে কুস্তি লড়া তো ভারি একটা কথা! তোরা কেউ ভূতের সঙ্গে কুস্তি লড়েছিস?’



পালোয়ানরা তা শুনে বড়োই বোকা বনে গেল-তাদের কেউ কখনো ভূতের সঙ্গে কুস্তি লড়েনি! তা শুনে হুড়ুকবাজ বলল, তবে শোন।-

‘আগে আমি ছ-হাত উঁচু এয়া বড়ো জোয়ান ছিলাম। তখন বাঘের লেজ ধরে ঘুরিয়ে আছাড় মেরেছি, আর লাথি মেরে হাতি তাড়িয়েছি। পালোয়ানরা কেউ আমার সঙ্গে লড়তে চাইত না, বাঘ ভালুক আমায় দেখলেই ছুটে পালাত। আমি দেশে-বিদেশে কত জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম; যেখানে যাই, সব পালোয়ান ভাগে-আমি খালি বলি কার সাথে লড়ব? শেষে শিরখুল্লাদের (যাদের মাথা খালি, অর্থাৎ বাঙালি) দেশে একজন বলল, লড়তে চাও? ওই কালীমাইর মন্দিরে রাত্রে যেয়ো, তা হলেই লড়তে পাবে। আমি কি তাতে ডরাই? ঠিক সেই রাত্রেই আমি গিয়ে সেখানে হাজির। গিয়ে দেখি সেখানে মস্ত

এক ভূত বসে আছে, তার টেড়া টেড়া (বাঁকা বাঁকা) পা, বড়ো বড়ো কান আর লাল লাল সাড়ে তিনটা চোখ! সেটা আমায় দেখেই খেঁকিয়ে এল, আমিও অমনি তাল ঠুকে তার সঙ্গে লড়াই দিলাম। সে লড়াই চলল সতেরো দিন সতেরো রাত, তারপর ভূতের পুত কেঁউ কেঁউ করে ভেগে গেল। কিন্তু বেটা কী ভারীই ছিল! তার চাপনে আমি ছ-হাত জোয়ান তিন হাত হয়ে গেলাম।'

একথা শুনে তো পালোয়ানদের ভারি তাক লেগে গেল; তখন থেকে তারা হুড়ুকবাজ সিংকে বড্ডই মানে। এর মধ্যে হয়েছে কী, পাঠান-বাদশার মুলুক থেকে 'ঝুররল হুল্লোড় খাঁ' বলে এক পালোয়ান এসেছে, সে সকালে উঠে সতেরো সের দই আর এগারো সের পেঁড়া দিয়ে জল খায়! সে এসেই রাজাকে সেলাম ঠুকে বলল, 'আপনার পালোয়ানদের সাথে লড়াই করব।'

রাজার কুস্তিগিরদের সর্দার ছিল দুড়ুমপটাশ সিং; লড়তে হলে সেই আগে ঝুররল হুল্লোড় খাঁর সঙ্গে লড়বে। দুড়ুমপটাশ সিং কিন্তু খাঁ সাহেবকে দেখেই বিকট মুখ সিটকিয়ে দু-হাতে পেট চেপে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল, বলল, 'উঃ , উঃ ! আমার পেটে বড্ড দরদ হয়েছে।' সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল গেল, তবু দুড়ুমপটাশের পেটের দরদ সারেই না।

রাজা বললেন, 'আমার মান তো যায় যায়, শিগগির আর কাউকে ডাক।' তা শুনে সবাই বলল, 'মহারাজ! হুড়ুকবাজ সিং আছে বেজায় জোয়ান, তাকে ডাকুন।' অমনি হুড়ুকবাজকে ডেকে আনা হল; রাজা তাকে বললেন, 'এই পাঠানের সঙ্গে তোমাকে লড়তে হবে।'

হুড়ুকবাজ বলল, 'এ আর কি বেশি কথা, কাল সকালেই আমি লড়ব। আজ আমার বরত (ব্রত) আছে, মুসলমানকে ছুঁলে নষ্ট হবে।'

রাজা বললেন, 'সেই বেশ; কালকে লড়াই হবে।'

তারপর রাজার কাছ থেকে ঘরে এসেই হুড়ুকবাজ বলল, 'বাপ রে! আর না; এই বেলা পালাই। ও বেটার সঙ্গে লড়তে গেলে আমাকে দু আঙুলে ধরে তক্ষুনি নস্যি করে ফেলবে।' বলে, চুপিচুপি ঘোড়ায় চড়ে কসে চাবুক মেরে চম্পট।

সেই ঘোড়া তাকে নিয়ে গিয়ে থামল এক মন্দিরের সামনে। সেই মন্দিরে বাবা চিলম তোড় বলে বড়ো ভারি এক সন্ন্যাসী থাকতেন, হুড়ুকবাজ তাঁর সামনে গিয়েই লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে মস্ত এক প্রণাম করে ফেলল।

সন্ন্যাসী তাতে যারপরনাই খুশি হয়ে বললেন, 'তুই কী চাস বাপু?' হুড়ুকবাজ বলল, 'বাবা, এক পালোয়ানের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। যদি বাবা দয়া করেন, তবে তাকে গিয়ে হারাই।' সন্ন্যাসী বললেন, 'আচ্ছা তুই ফিরে যা। তুই যখন লড়বি, আমি নিজে তোর হয়ে 'পহিলি হাঁথ' মারব।'

'পহিলি হাঁথ' মানে প্রথম যে থাপ্পড়টা মারবে সেইটে। হুড়ুকবাজ সন্ন্যাসীর কথা শুনে খুশি হয়ে সেই রাত্রেই ফিরে এল।

তারপর সকাল বেলায় তো কুস্তি আরম্ভ হয়েছে। হুড়ুকবাজের মনে এখন খুবই ভরসা, সে জানে সন্ন্যাসী তার হয়ে 'পহিলি হাঁথ' মারবে। পাঠান পালোয়ান ভালো করে তার সামনে আসতে-না-আসতেই অমনি সে 'জয় বাবা চিলম তোড়' বলে লাফিয়ে উঠে তার ঘাড়ে এক 'রদ্দা' (থাপ্পড়) বসিয়েছে। সে কি যে সে রদ্দা? স্বয়ং বাবা চিলম তোড় তাতে

জোর দিয়েছিলেন। তার চোটে পাঠান বেচারা সাতষট্টি পাক ঘুরে, তেতাল্লিশটা ডিগবাজি খেয়ে, রাজা প্রজা সবাইকে উলটিয়ে ঠিকরে ভিড়ের বাইরে গিয়ে পড়ে, দাঁতে দাঁতে লেগে মূর্ছা গেল। তারপর সে অনেক কষ্টে সেখান থেকে উঠে সেই যে ছুট দিল, আর নিজের দেশে না গিয়ে থামল না।

তখন তো আর হুড়ুকবাজের আদরের সীমাই রইল না, রাজা সেইখানেই তাকে সেনাপতি করে দিলেন। আরও ঢের বেশি দিন বেঁচে থাকলে হয়তো সে রাজার মেয়ে বিয়ে করতেও পারত, কিন্তু সেটি আর বেচারার কপালে ঘটল না।

একদিন রাত্রে রাজবাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে হুড়ুকবাজ এক বেড়ালের লেজ মাড়িয়ে দেয়, তাতে বেড়াল রেগে চোঁ বোঁ করে তাকে তিন চড় লাগায়। তা খেয়ে দু-দিনের ভিতরে সে মরে গেল।

মরবার আগে সকলে জিজ্ঞেস করল যে, 'বেড়ালটাকে এক চড় দিয়ে মেরে ফেললে না কেন?' তাতে হুড়ুকবাজ বলল,

'শের মারা থাপ্পড় সে ময় ফির হাথিকা তোড়া দাঁত,
অওর ভগায়া মিয়াঁ হুল্লোড় খাঁকো মারকে এক হি হাঁথ।
লড়া বঙ্গাল মুল্ক মে জাকর ভূত সে সত্রাহ দিন,
অওর লড়াইমে মারা এতনা আদমি, কোই ন সকই গিন।
সারে জনম ভর কিয়া ময়নে প্যেহলোয়ানি অ্যায় সে,
অব বিল্লি মারকে নাম বদনামি বোল ময় করুঁ ক্যায়সে?'

অর্থাৎ

'ভেঙেছি বুনো হাতির দাঁত আর বাঘ মেরেছি চড়ে,
তাড়িয়েছি মিয়াঁ হুল্লোড় খাঁকে একটিই থাপ্পড়ে।
হারল লড়ে বাংলা দেশের ভূত, সতেরো দিন অন্তে,
আর মেরেছি যুদ্ধে এত লোক যে কেউ পারেনি গুনতে।
করে এমনতর পালোয়ানি সারা জনম ধরে,
বল শেষে বেড়াল মেরে নামটা খারাপ করি কেমন করে?'

*অগ্রহায়ণ ১৩২০*




# প্রমদারঞ্জন রায়

হাতি যে কেমন বেখাপ্পা জানোয়ার, এবারে তার কথা কিছু বলব। আমরা পাকোয়া নদীর ধারে এসেছি। নদীটি ৭০-৮০ হাত চওড়া হবে, তাতে এক কোমর জল। নদীর ধারে হাতির পায়ের তাজা দাগ একটির পিছনে আর একটি, তার পিছনে আর একটি, এমনি করে একদল হাতি গিয়েছে। পায়ের দাগ দেখে আমি বললাম, '৫-৭টা হাতি হবে।' লুশাই বুড়ো খানিক বেশ ভালো করে দেখে বলল, '৪০-৪৫টার কম নয়। ঠিক দাগে দাগে পা ফেলে গিয়েছে, তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।'

সারাদিন জলে জলে চলে আমার কাপড়চোপড় সব ভিজে গিয়েছিল। আমি নদীর ধারে পাহাড়ের গায় ঠেসান দিয়ে বসে জুতো-মোজা খুলতে লাগলাম, লুশাইটিকে বললাম, 'পারে গিয়ে তাঁবুর জায়গা দেখো!' লুশাই ওপরে চলে গেল, শ্যামলাল খালাসিও বন্দুকটি নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে গেল; আমি বসে বসে হু-উঁ-উঁ করে চেঁচিয়ে পিছনের লোকদের ডাকতে লাগলাম। খাবারওয়ালা খালাসি তাদের সঙ্গে; আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

বার দুই 'হুঁ-উঁ-উঁ' করে চেঁচিয়েছি অমনি ঠিক আমার মাথার উপরের পাহাড় থেকে একটা হাতি 'হুঁ-উঁ-উঁ' করে উঠল। আর আমার কাছ থেকে ৫০-৬০ হাত দূরে আরও অনেকগুলো হাতি গুড়গুড় শব্দ করে তার জবাব দিতে লাগল! আমি আবার চেঁচালাম, হাতিগুলোও আবার ঠিক তেমনি করতে লাগল! আবার চেঁচালাম, আবারও তাই। একটা পাহাড়ের উপর থেকে হুঁ-উঁ-উঁ করে ওঠে, আরগুলো নালার কাছ থেকে গুড়গুড় করে আর নাকে ফোঁস ফোঁস করে।

এমন সময় আমার মাথার উপর থেকে মড়মড় করে বাঁশ ভাঙার আওয়াজ হতে লাগল, আর ওপর থেকে শ্যামলাল আর লুশাই বুড়ো ব্যস্ত হয়ে আমাকে ডাকতে লাগল, 'চলে এসো। চলে এসো!' ৩-৪টা হাতি আমার আওয়াজ শুনে দেখতে আসছে, এটা কীরকম জানোয়ারের ডাক। আমার মাথার ১০০-১২৫ গজ উপর অবধি এসেছে!

আমি তাড়াতাড়ি নদীর এপারে এসে শ্যামলালের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে গুলি ভরে, নদীর কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালাম; শ্যামলাল আর লুশাই বুড়ো খুব চেঁচামেচি করতে লাগল; তা শুনে হাতিগুলো দৌড়ে গিয়ে আবার পাহাড়ে উঠল। তারপর অনেকক্ষণ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু আর হাতি দেখতে পেলাম না। হাতির আওয়াজ কিন্তু ক্রমাগতই শোনা যাচ্ছিল, আর নদীর জল একেবারে ঘোলা হয়ে গিয়েছিল।

চারটা-সাড়ে চারটার সময়ে সব লোকজন এল; নদীর ওপারে বন কেটে তাঁবু খাটানো গেল; খুব বড়ো বড়ো ধুনি আর পাহারারও ব্যবস্থা হল। আমার সঙ্গে দুটো হাতি ছিল। মাহুতেরা রোজ তাদের চরে খাবার জন্যে বনে ছেড়ে দেয়, আজ আমাদের কাছেই বেঁধে রাখল। ছেড়ে দিলে বুনো হাতিতে তাদের ভুলিয়ে নিয়ে যাবে, নাহয় মেরে ফেলবে।

লুশাইরা শুকনো শুকনো বাঁশের মশাল বানিয়ে লম্বা লম্বা কাঁচা বাঁশের আগায় বেঁধে নিল। রাত্রে হাতি এলে ওই মশাল জ্বালিয়ে সেই লম্বা বাঁশের বাঁট ধরে সামনে ঘুরিয়ে তাকে তাড়াবে-এমনি করে লুশাই দেশে খেত থেকে হাতি তাড়ায়।

সে রাত্রে আর হাতির জ্বালায় ঘুম হয়নি। অন্ধকার হতেই তারা আমাদের কাছে এল, আর বোধ হয় ধুনির আলোতে আমাদের হাতি দুটোকে দেখতে পেয়ে তাদের মনে ভারি খটকা লাগল যে, এ দুটো আবার ওখানে কী করছে! ৫-৭টা হাতি মিলে এপারে আসবার জন্য এক-একবার এসে নদীতে নামে। তারা নদীর মাঝামাঝি আসতে-না-আসতেই আমাদের হাতি দুটো ছটফট করতে আর চ্যাঁচাতে থাকে। অমনি আমাদের লোকেরা প্রাণপণে মশাল ঘুরিয়ে সকলে মিলে বিকট চিৎকার করতে করতে ছুটে যায়, আর হাতিগুলো ছুটে গিয়ে আবার বনে ঢোকে। সারাটা রাত এইভাবে কাটল। ভোরের বেলায় কতগুলো হাতি পুবের পাহাড়ে আর কতগুলো পশ্চিমের পাহাড়ে উঠে গেল।

সকালে উঠে, চা খেয়ে, জিনিসপত্র বেঁধে, আমরাও পথ ধরলাম। সেই পুবের পাহাড়ে আমাদেরও যেতে হবে। যেমন রোজ যাই, তেমনি চলেছি-লুশাই বুড়ো আগে আগে, তার পিছনে আমি, আমার পিছনে শ্যামলাল, খাবারওয়ালা আর আমার চাকর গঙ্গারাম।

খানিক দূর এসে একটা ঝিল পেলাম, তাতে জল নাই, কিন্তু কাদা খুবই। আমরা বলাবলি করছি, কেমন করে কোনদিক দিয়ে পার হব। আর অমনি সেই ঝিলের মাঝে শরবনের আড়াল থেকে একটা হাতি উঠে, বাঁশবন ভেঙে সে যা হুড়মুড় করে ছুট! পাহাড়পর্বত যেন সব একেবারে ভেঙে পড়ল।

যাহোক, এতে আমাদের এই উপকার হল যে, কোনখান দিয়ে ঝিল পার হতে হবে সেটুকু আর বুঝতে বাকি রইল না। সেই হাতির পায় পায় আমরা ঝিলের ওপারে চলে গেলাম। তখন লুশাই জিজ্ঞাসা করল, 'কোন দিকে যাব?' আমি বললাম, 'যেদিকে হাতিটা গিয়েছে সেই দিকে।' সেই দিকেই হাতির পায়ের দাগ আর বাঁশ ভাঙা দেখে চলতে লাগলাম। তারপর খানিকটা পাহাড়ে উঠে বন্দুকটা শ্যামলালের হাতে দিলাম।

লুশাই বুড়ো আগে গিয়ে পাহাড়ের উপরে পৌঁছোল; পৌঁছিয়েই সে ডেকে বলল, 'মস্ত দোয়াল (হাতির রাস্তা)! কোনদিকে যাব?' আমি বললাম, 'পূর্বদিকে যাও, উপরের দিকে।' সেইভাবে সে হাত ৫০-৬০ গিয়েছে, আমিও ততক্ষণে এসে দোয়ালে পৌঁছিয়েছি, শ্যামলাল আমার হাত ৪-৫ পিছনে, গঙ্গারাম আর অন্য খালাসিটি আর একটু পিছনে।

দোয়াল ধরে উপরের দিকে সবে হাত ৮-১০ গিয়েছি, এমন সময় সামনে ভয়ংকর একটা গোলমাল, বাঁশ ভাঙার হুড়মুড় আর জানোয়ারের গর্জন, আর লুশাইয়ের চিৎকার। আমি বললাম, 'ক্যা হ্যায় রে?' শ্যামলাল পিছন থেকে বলল, 'গণ্ডা (গণ্ডার) হোগা হুজুর।'

সামনের দিকে চেয়ে দেখি লুশাই বুড়ো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নামছে, আর তার পিছনে প্রকাণ্ড হাতি শুঁড় তুলে কামানের গোলার মতো আসছে।

তা দেখে আমি 'বন্দুক লাও' বলে হাত বাড়িয়েছি, কিন্তু বন্দুক আর আসে না; চেয়ে দেখি শ্যামলাল লম্বা দিবার ফিকির করছে। দুই লাফে তাকে গিয়ে ধরে, দুই থাপ্পড় দিয়ে বললাম, 'ভাগতা কাঁহা?' তারপর তার কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে উপরের দিকে ছুটলাম। বন্দুক হাতে নিয়েই মনে হল তার এক নালে ছিটা, এক নালে মাত্র গুলি। দৌড়াচ্ছি আর টোটা বদলাচ্ছি। বদলানো কি যায়? তাড়াতাড়িতে এক সেকেন্ডের কাজ পাঁচ মিনিটেও হতে চায় না।

যাহোক, কোনোমতে ছিটা বদলে গুলি তো ভরা হল। দৌড়াচ্ছি তখনও তাতে আবার উপরে উঠতে হচ্ছে-মাটির দিকে চেয়ে, নইলে পড়ে মরবার ভয়। গুলি ভরে সামনের দিকে চাইলাম। সর্বনাশ। লুশাই বুড়ো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হাতে দা ছিল, হাতির সামনে তাতে কোনো কাজ দেবে না বলে সেটা ফেলে দিয়েছে, দিয়ে রাস্তার মাঝখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতি তার কাছ থেকে ৯-১০ হাত মাত্র দূরে-এই ধরল!

সেখানের রাস্তায় দুটো মোড় ছিল, আমার চোখের সামনেই হাতির কপালটা। আর কথা নাই; বন্দুক তুলেই দে সেই কপালে গুড়ুম করে ছেড়ে। হাতি কিন্তু থামেনি, এক পা আরও চলে এসেছে।

এবারে তার পাঁজর আমার সামনে। বন্দুক আমার তোলাই ছিল। গুড়ুম করে দিলাম সেই পাঁজরে আর এক নালা ঝেড়ে। এবারে ওষুধ ধরল। আওয়াজও করা, আর যা চিৎকার হাতির! পাহাড় বন সব থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা, সেখান থেকে ঘুরে কয়েক পা ছুটে গিয়েই কুড়ুঙ্গের ভিতর হুড়মুড় করে পড়ল। আর যা চিৎকার!

আমি দুই গুলি মেরেই পথ ছেড়ে তাড়াতাড়ি আর দুটো গুলি ভরে নিয়েছি। আর হাতির পিছনে আর একটা মেরেছিও। কিন্তু সেটা বাঁশে আটকে গিয়ে আর হাতির গায়ে লাগতে পারেনি।

বিপদ তো কেটে গেল, এখন চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। লুশাই বেচারা সেইখানেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। আমার কাছ থেকে সে ৬ ধাপ মাত্র দূরে। আর যেখানে হাতিটাকে গুলি মেরেছিলাম সে জায়গাটা লুশাইয়ের কাছে থেকে মোটে ৩ ধাপ। হাতির শুঁড়টা আমার মনে হচ্ছিল যেন ঠিক লুশাইয়ের মাথার উপরেই ছিল। পিছনে চেয়ে দেখি ২০-২৫ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গঙ্গারাম, শ্যামলাল আর অন্য খালাসিটা ঠক ঠক করে কাঁপছে আর খালি বলছে, 'বাবারে বাবা!' 'ওরে বাবারে! ওরে বাবারে!' তারা এগোয়ও না পালায়ও না। গঙ্গারামের বড়োই দুর্দশা! বেচারার মুখে যেন আর কথা বেরোচ্ছে না- ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মাঝে মাঝে বলছে 'বাবারে বাবা। এত্তা বড়া কপাল।' হাতির ওই কপালটাই খালি তার চোখে পড়ছে।

আমি লুশাইটির কাছে গেলাম। বেচারা প্রাণের তো আশা ছেড়েই দিয়েছিল। আমি কাছে যেতেই আমার পা জড়িয়ে ধরল।-মুখে তার কথা নাই।

তখনও হাতিটার চিৎকারে বনজঙ্গল কাঁপছে; আর যেদিক দিয়ে সে গিয়েছিল, তাতে খালি রক্ত আর রক্ত।

## ২

আমরা হাতির কাছ থেকে লুশাই বুড়োকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত রয়েছি, ততক্ষণে আমাদের বাকি লোক সব এসে পৌঁছিয়েছে! তারা তো বন্দুকের আওয়াজ শুনে ভারি ফুর্তি করতে করতে আসছে যে আজ খুব করে হরিণের মাংস খাবে। এসেই সামনে পেয়েছে শ্যামলাল, গঙ্গারাম আর খাবারওয়ালা খালাসিকে আর তাদের মুখে ভালো করেই শুনেছে ব্যাপারখানা কীরকম। তখন আর কারোর মুখে হাসি নাই। লুশাই দোভাষী একজন ছিল, সে আরও কয়েকজন কুলিকে নিয়ে দেখতে গেল হাতিটা কী করছে; দু-চারজন খালাসিও তাদের সঙ্গে গেল।

খানিক দূর গিয়েই তারা চেঁচামেচি লাগিয়েছে। তারপরেই দোভাষী আর দুইজন লুশাই ছুটে এসে বলল, 'চল! হাতিটা যেন কুড়ুঙ্গের ভিতর পড়ে আছে। আমরা খাই হাতির মাংস!' আমি কিন্তু কিছুতেই তাতে রাজি হলাম না; বললাম, 'বিপদ কেটে গেছে, লোকটার প্রাণ বেঁচেছে, এই ঢের; আর হাতির মাংস খেয়ে কাজ নেই।'

তখন তারা বন্দুকটা চাইল। তাও দিলাম না দেখে শুধু দা কুড়ুল নিয়েই গেল। তারপর তারা কুড়ুঙ্গের দিকে খানিক দূর নেমে গিয়েছে, অমনি আবার চেঁচামেচি, আর তারপরেই আবার তারা ছুটে এসে হাজির। বলে, 'শিগগির এসো, শিগগির এসো! হাতির বাচ্চা!'

ছোট্ট একটা বাচ্চা, যেখান দিয়ে হাতিটা কুড়ুঙ্গের মধ্যে গিয়ে নেমেছে, সেইখান দিয়ে নামছে। ওই হাতিটারই বাচ্চা-হাতিটা কুনকি ছিল। বাচ্চাটার এক পায় চোট-টোট লেগে থাকবে, তাই খোঁড়াচ্ছে। দোভাষী দৌড়ে গিয়ে তার শুঁড় ধরেছিল, আর ব্যস্ত হয়ে আর সকলকেও ধরবার জন্য ডাকছিল, কিন্তু কারও যেতে ভরসা হয়নি। বাচ্চা হলে কী হবে? হাজার হোক, হাতির তো বাচ্চা! সে ঢিপঢাপ খালি দোভাষীকে ঢুঁ মারতে লাগল আর তার ওই ছোট্ট ছোট্ট পায় লাথি। দোভাষী তাতে থতমত খেয়ে ছুটে এসেছে খবর দিতে।

ওই বাচ্চাটির খাতিরেই তার মা বুড়ো লুশাইকে মারতে গিয়েছিল। সন্তানের মায়া! বাচ্চাটি চলতে পারেনি বলে সে তাকে নিয়ে দলের পিছনে পড়ে যায়। তারপর বুড়ো গিয়ে হঠাৎ তার সামনে পড়তেই বোধ হয় বেচারির মনে হল যে, 'যা! হতভাগা বুঝি তবে আমার বাচ্চাকে ধরে নিতে এসেছে!'

হাতি বড়ো বেখাপ্পা জানোয়ার! এর সম্বন্ধে একটা কথা বলছি, শোনো। একটা পাহাড়ের উপর কোনো গ্রাম নাই। একজন সাহেব সেখানে জরিপের কাজ করতে গিয়েছিলেন। উঁচু পাহাড় পথ নাই, আবার বেজায় জঙ্গল। পাহাড়ে হাতির ভয়ও খুব আছে।

সকালে উঠে সাহেব একজন আমিনের কাজ দেখতে বেরিয়েছেন। লোকজনদের বলে গিয়েছেন যে পাহাড়ের সকলের চেয়ে উঁচু চূড়াটার ঠিক নীচেই যেন তাঁবু লাগায়। পথ নাই, তাই হাতির পথ ধরে লোকজনেরা খচ্চরে করে সাহেবের জিনিসপত্র নিয়ে উপরে উঠল। বিকালে সেই চূড়াটার নীচে পৌঁছিয়ে তারা দেখল যে সেখানে বেশ জল আছে, তাই তারা সেইখানেই তাঁবু ফেলল।

এদিকে সাহেব কাজে বেরিয়েছেন। তিনিও সেই জায়গায় আসবেন, তবে তাঁকে বনজঙ্গল ঘুরে আমিনদের কাজ দেখতে দেখতে আসতে হবে। সেদিন কিন্তু সাহেবের তাঁবুতে পৌঁছানো ঘটল না। বনের ভিতর ঘুরে ঘুরে তার আগেই রাত হয়ে গেল। অন্ধকারে চলতে না পেরে সাহেব আর তাঁর সঙ্গের লোকেরা পাহাড়ের উপরেই এক জায়গায় গাছের ধুনা জ্বেলে শুয়ে রইলেন, ভাবলেন সকালে উঠে তাঁবু যাওয়া যাবে।

এদিকে তাঁবুতে সকলে পথ চেয়ে আছে কখন সাহেব আসবেন; কিন্তু সাহেবের দেখা নাই। ডাকাডাকি করে করে বেচারাদের গলা ভেঙে গেল, কিন্তু সাহেব ঢের দূরে-সে ডাক শুনতে পেলেন না। শেষে তারা সাহেবের আশা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে রইল।

অনেক রাত্রে খচ্চরগুলোর হুটোপুটিতে তাদের ঘুম ভেঙেছে। তারা ভাবল, ব্যাপারখানা কী? বলে যেই তাদের একজন খালাসি তাঁবুর দরজা একটু ফাঁক করে গলা বার করেছে, অমনি দেখে যে, বাবারে! এয়া বড়ো দাঁতওয়ালা হাতি, তার পিছনে আরও হাতি। সে আস্তে আস্তে সকলকে সাবধান করে দিয়ে সেই তাঁবুর পিছনের দিক দিয়ে বেরোতে যাবে, অমনি হাতিটাও তাঁবুর উপর এসে পড়েছে। তখন সকলে গড়িয়ে খাদের ভিতরে ঢুকে

কোনোমতে প্রাণ বাঁচাল, আর হাতিগুলো সেই রাস্তায় রাস্তায় চলে গেল। তাঁবুটার যা কিছু তাদের সামনে পড়েছিল, সব তারা শুঁড় দিয়ে ছুড়ে ছুড়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল। খচ্চরগুলো রাস্তার উপরেই বাঁধা ছিল, তারা সকলেই দড়ি ছিঁড়ে পালাল; খালি একটা খচ্চর মজবুত নতুন রশি দিয়ে বাঁধা ছিল, সে বেচারা তা ছিঁড়তেও পারেনি, পালাতেও পারেনি। হাতিরা সেটাকে মাড়িয়ে একেবারে পিষে দিয়ে গেল। পরদিন সাহেব তাঁবুতে ফিরে তো অবাক!

*বৈশাখ* ১৩২১




# অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য

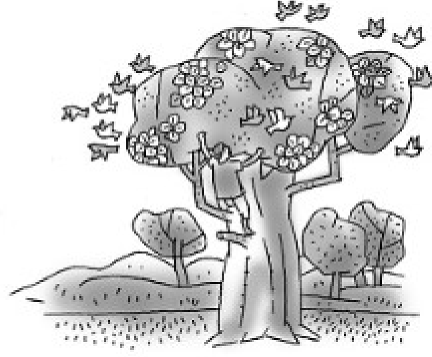
এক ছিল তাঁতি। সে যেমনি বোকা তেমনি কুঁড়ে, তাই তার স্ত্রী রোজ নিজে বাজার করে আনত। একদিন স্ত্রীর বড়ো অসুখ হল তাই সে তাঁতিকে বলল, 'আজ তুমি বাজার করে আনো।' তখন তাঁতি ছাতা মাথায় দিয়ে বাজার করতে চলল। যাবার সময় তার স্ত্রী ছাতার আগায় পয়সা বেঁধে দিল, আর বলে দিল, 'খানিক দূরে গেলেই দেখবে একজায়গায় খুব গোলমাল হচ্ছে, সেইটেই বাজার।' তাঁতি তো একটুখানি গিয়েই দেখে একটা গাছের ডালে মেলা পাখি বসেছে আর খুব কিচিরমিচির করছে। দেখেই সে বলল, 'এই তো খুব গোলমাল হচ্ছে-নিশ্চয়ই এইটে বাজার। এখন তবে পয়সা বার করি।' ওই যা! পয়সা তো ছাতার আগায় বাঁধা রয়েছে! মাথার উপর ছাতা, তার উপরে পয়সা-পয়সা পাড়বে কেমন করে? হাত উঁচু করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটাও উঁচু হয়। তখন সে লাফ দিয়ে পয়সাটা ধরতে গেল; কিন্তু একী! ছাতাটাও সঙ্গে সঙ্গে লাফায় কেন? তাঁতি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসল। এমন সময় সে হঠাৎ দেখতে পেল সামনে মই রয়েছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি মইয়ের উপর চড়তে গেল। কিন্তু সে যতই উঁচুতে ওঠে ছাতাটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠতে থাকে! তখন তার স্ত্রীর উপর ভারি রাগ হল, কেন সে এত উঁচুতে পয়সা বেঁধে দিল যে মই দিয়েও পাড়া যায় না?

তখন সে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে বলল, 'বাজারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কীরকম বুদ্ধি? এত উঁচুতে পয়সা বেঁধে দিয়েছ যে, মই লাগিয়েও পাড়া গেল না।' তখন তার স্ত্রী মাথা থেকে ছাতা নামিয়ে পয়সাগুলো তার হাতে দিল-আর তাকে খুব করে বকে দিল। তাঁতি পয়সা নিয়ে আবার সেই গাছের তলায় বাজার করতে গেল।

গাছের উপরে বাজার বসেছে কিনা, কাজেই সে গাছে চড়তে লাগল। কিন্তু সে উপরে না পৌঁছোতেই পাখিগুলো সব ভয়ে উড়ে পালাল। তখন সে ভাবল, 'ওই যা! বাজার ভেঙে গেল।' উঠতে উঠতে বেচারার বড়ো পরিশ্রম হয়েছে তাই সে ভাবতে লাগল এখন কী করি? নামতে গেলে অনেক সময় লাগে তা ছাড়া হাঙ্গামা আর পরিশ্রমও খুব। লাফিয়ে পড়লে কতকটা সহজ, কিন্তু-মাটি যে অনেক নীচে।' বেচারা আর কিছু ঠিক করতে না পেরে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে রইল আর ভাবতে লাগল, 'তাই তো, কী করি?' এমন সময় কতগুলো লোক রাজবাড়ির হাতিতে চড়ে তলা দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁতি তাদের দেখে বলল, 'ভাই, আমাকে নামিয়ে দাও না।' তাই শুনে একজন লোক তাঁতির পা ধরে টানতে গেল। কিন্তু তাঁতি গাছের ডাল শক্ত করে ধরে আছে কিছুতেই ছাড়ে না-কাজেই লাভের মধ্যে হল এই, হাতিটা চলে গেল আর সেই লোকটা তাঁতির ঠ্যাং ধরে ঝুলতে লাগল। এমনি করে সকাল কেটে গেল, দুপুরে রোদে তাদের মাথা গরম হয়ে উঠল। তাঁতি জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই তুমি কী কাজ কর?' সেই লোকটা বলল, 'আমি রাজবাড়িতে গান করি।' তাঁতি বলল, 'একটা গান করো না।' অমনি রাজবাড়ির গাইয়ে 'তানানা তাইরে

তানা' করে সুর ধরল। তাঁতি তাতে মহা উৎসাহে যেই ধাঁই করে হাঁটুর উপর তাল ঠুকতে গিয়েছে অমনি হাত ছাড়া মাত্র দু-জনে গাছের থেকে পড়ে মাথায় আর মাটিতে এমনি তাল ঠুকে গেল যে তাইরে নারে ছেড়ে তারা বাপরে মারে করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল।

*জ্যৈষ্ঠ* ১৩২১






# উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছেলেবেলা থেকেই চানু শয়তানের একশেষ, আশপাশের লোকজন তার জ্বালায় অস্থির। চানুর বাবা বড়ো গরিব ছিল, চানু ভাবল-বিদেশে গিয়ে টাকাপয়সা রোজগার করে আনবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিক দূরে গিয়েই বনের ভিতর দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা-চানু সেই রাস্তা ধরে চলল। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় পথের ধারেই একটি কুঁড়ে ঘর ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত।

ঘরের ভিতরে আগুনের পাশে একটি বুড়ি বসেছিল, চানুকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই বাপু তোমার?'

চানু বলল, 'চাইব আর কী, কিছু খাবারদাবার চাই, আর একটি বিছানা চাই।'

বুড়ি বলল, 'সরে পড়ো বাপু, এখানে কিছু পাবে না। আমার ছয়টি ছেলে, সারা দিন খেটেখুটে তারা এখনই বাড়ি ফিরবে। তোমাকে এখানে দেখতে পেলে তারা তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।'

চানু। 'সেটা আর বেশি কথা কী? এই ঠান্ডায় বাইরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মরার চাইতে গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে, সেইটাই বরং ভালো।'

বুড়ি দেখল, সে সহজ লোকের পাল্লায় পড়েনি। কী আর করে, তখন চানুকে পেট ভরে খেতে দিল। শুতে যাবার সময় চানু বুড়িকে বলল, 'দেখো বুড়ি! তোমার ছেলেরা এসে যদি আমার ঘুম ভাঙায়, তাহলে কিন্তু বড্ড মুশকিল হবে বলছি।'

পরের দিন ঘুম ভাঙলে পর চানু দেখল, ছয় জন অতি বদ চেহারার লোক তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে-সে তাদের দেখে গ্রাহ্যও করল না।

দলের সর্দারটি তখন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে বাপু? কী চাও এখানে?'

চানু। 'আমার নাম সর্দার চোর, আমার দলের জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি চালাক চতুর হও, তাহলে তোমাদের অনেক বিদ্যে শিখিয়ে দেব।'

সর্দার বলল, 'আচ্ছা বেশ, তুমি তাহলে এখন উঠে একটু খাও-দাও, তারপর দেখা যাবে এখন, কে সর্দার।'

বিছানা থেকে উঠে সকলের সঙ্গে বসে চানু খেল। ঠিক তারপরই সকলে দেখল, একটা সুন্দর ছাগল সঙ্গে নিয়ে একজন কৃষক বনের পাশে যাচ্ছে। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের কেউ কোনোরকম জবরদস্তি না করে শুধু ফাঁকি দিয়ে ওই লোকটার ছাগলটা নিয়ে আসতে পার?' একজন একজন করে সকলেই বলল, 'না ভাই, আমরা কেউ তা পারব না।'

চানু। 'ব্যস, তাহলেই দেখো আমি তোমাদের সর্দার কি না-আমি এখনই ছাগলটা নিয়ে আসছি।' এই বলে তো তখনই বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে তার ডান পায়ের জুতোটা রেখে দিল, তারপর ছুটে গিয়ে কিছু দূরে রাস্তার আর একটা মোড়ে বাঁ পায়ের জুতোটাও রেখে রাস্তার ধারে বনের ভিতর চুপ করে লুকিয়ে রইল।

খানিক পরেই সেই কৃষক এসে প্রথমে জুতোটা দেখে মনে করল, 'খাসা জুতোটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু এক পাটি দিয়ে কী হবে, আর এক পাটিও থাকলে ভালো হত।'

খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে কৃষক আর এক পাটি জুতো দেখে ভাবল, 'আমি কী বোকা, ও পাটিটা যদি নিয়ে আসতাম। যাই, তাহলে ওটা নিয়ে আসি গিয়ে।' একটা গাছে ছাগলটা বেঁধে সে চলল জুতো আনতে। এদিকে চানু কিন্তু ছুটে গিয়ে আগেই সেটা নিয়ে এসেছে। তারপর কৃষক ছাগলটাকে বেঁধে রেখে যখন চলে গেল, তখন চানুও বাঁ-পায়ের জুতোটা নিয়ে ছাগলটার বাঁধন খুলে সেটাকেও নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বুড়ির কুটিরে এসে উপস্থিত।

কৃষক গিয়ে প্রথম জুতোটাও পেল না, ফিরে এসে পরের জুতোটাও পেল না। তার উপর আবার যখন দেখল যে ছাগলটিও সেখানে নেই, তখন সে ভাবল, 'এখন করি কী? গিন্নিকে যে বলে এসেছি, বাজারে ছাগলটা বেচে তার জন্যে একখানা গায়ের চাদর কিনে নিয়ে যাব! যাই তাহলে, চুপচাপ গিয়ে আর একটা জন্তু নিয়ে আসি, তা নইলে যে ধরা পড়ে যাব-গিন্নি ভাববে, আমি বোকার একশেষ।'

এদিকে চানু ছাগল নিয়ে বুড়ির বাড়িতে যখন গেল, তখন সেই চোরেরা তো একেবারে অবাক! চানুকে কত করে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কিছুতেই সে বলল না, কী করে সেই ছাগল আনল।

খানিক বাদেই সেই কৃষক একটা মোটাসোটা সুন্দর ভেড়া নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও দেখি, কে জবরদস্তি না করে ভেড়াটা আনতে পার।' ছয় চোরের সকলেই অস্বীকার করল। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, দেখি আমি পারি কি না। আমাকে একটা দড়ি দাও দেখি।' দড়ি নিয়ে চানু বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

এদিকে কৃষকটি তার ছাগল চুরির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, মোড়ের কাছেই এসে দেখে, গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলছে। মড়া দেখেই তার গায়ে কাঁটা দিল, 'রক্ষা করো বাবা। খানিক আগে তো এখানে মড়া-টড়া কিছু দেখতে পাইনি!' সামনের মোড়ে গিয়ে কৃষক দেখল আর একটা মড়া গাছের ডালে ঝুলছে। 'রাম রাম রাম-এ হল কী? আমার মাথাটা গুলিয়ে যায়নি তো?' কৃষক তাড়াতাড়ি চলল। কিন্তু কী সর্বনাশ! রাস্তার আরেকটা মোড়ে গিয়ে দেখে, সেখানেও একটা মড়া ঝুলছে। পর পর তিন-তিনটে মড়া এতটা কাছাকাছি ঝুলছে দেখে তার মনে সন্দেহ হল-'নাঃ, এ কখনোই হতে পারে না। আমারই বোধ করি মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, দেখে আসি আগের মড়া দুটো এখনও গাছে ঝুলছে কি না।' কৃষক সবে মাত্র মোড়টা ফিরেছে, তখন ডালের মড়া চট করে নেমে এসে বাঁধন খুলে ভেড়াটাকে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একেবারে বুড়ির বাড়ি গিয়ে হাজির।



এদিকে কৃষক গিয়ে দেখল, মড়া-টড়া কিছুই গাছে ঝুলছে না। ফিরে এসে দেখল তার ভেড়াটাও নেই, কে জানি দড়ি খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখন তার মনটা কেমন হল তা বুঝতেই পার! বেচারি মাথা খুঁড়তে লাগল-'হায়, হায়। কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম! এখন গিন্নি কী বলবে? সমস্ত সকালটাই মাটি হয়ে গেল, ছাগল ভেড়া দুটোই গেল। এখন করি কী? একটা কিছু এনে বাজারে বিক্রি করে গিন্নির শাল না কিনলেই চলবে না। আসবার সময় দেখেছিলাম, ষাঁড়টা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। যাই, সেটাই গিয়ে নিয়ে আসি-গিন্নিও দেখতে পাবে না।'

চানু যখন চোরদের বাড়ি ভেড়া নিয়ে গিয়ে উপস্থিত, তখন চোরদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। সর্দার চোরটি বলল, 'আর একটা যদি এরকম চালাকি খেলতে পার, তাহলে তোমাকেই আমাদের সর্দার করব।'

ততক্ষণে কৃষকটিও ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও তো, জবরদস্তি না করে কে ষাঁড়টা ফাঁকি দিয়ে আনতে পার?' কেউ যখন ভরসা পেল না, তখন সে বলল, 'আচ্ছা দেখি, আমি পারি কি না।' চানু বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কৃষকটি খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই বনের মধ্যে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেল। ঠিক তার পরেই একটা ভেড়াও ডেকে উঠল। আর তাকে রাখে কে! একটা গাছে ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে ছুটল বনের ভিতর। কৃষক যত যায়, ততই শোনে এই একটু আগেই ডাকছে, দেখতে দেখতে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেল। তখন হঠাৎ সব চুপচাপ, ভেড়া ছাগলের ডাক আর শুনতে পাওয়া গেল না। এদিক-ওদিক খুঁজে কৃষক একেবারে হয়রান হয়ে গেল-কোথা বা ছাগল আর কোথাই বা ভেড়া। বেচারি কাহিল হয়ে আবার ফিরে এল। কিন্তু সর্বনাশ! এসে দেখে, ষাঁড়টিও সেখানে নেই। বন উলটপালট করে ফেলল, কিছুতেই আর ষাঁড়ের খোঁজ পেল না।

চানু যখন ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত, তখন আর কথাটি নেই। চোরেরা চানুকে তাদের সর্দার করল। তাদের আনন্দ দেখে কে, সমস্তটা দিন আমোদ করেই কাটিয়ে দিল। লুটপাট করে চোরেরা যা-কিছু আনত, একটা গহ্বরের মধ্যে সব লুকিয়ে রাখত, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা চানুকে নিয়ে সেই সমস্ত টাকাকড়ি সব দেখিয়ে দিল-চানুই যে এখন তাদের সর্দার, তাকে সব না দেখালে চলবে কেন।

দলের সর্দার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চোরেরা একদিন চানুকে বাড়ির জিম্মায় রেখে চুরি করতে গেল। খালি বাড়ি, চানু সেই শয়তান বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি যে এদের ঘর-সংসার দেখ, এরা তোমাকে তার দরুন কিছু বকশিশ-টকশিশ দেয় না?'

বুড়ি। 'বকশিশ দেয়, না ওদের মাথা দেয়!'

চানু! 'বটে, কিছু দেয় না। আচ্ছা এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।' বুড়িকে সঙ্গে করে চানু টাকার ঘরে গেল। জন্মেও বুড়ি এত ধন কোনোদিন দেখেনি-মুখ হাঁ করে সেই রাশি রাশি টাকা মোহরের দিকে বুড়ি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বুড়ির আহ্লাদ আর ধরে না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে দুই হাতে টাকাগুলো ঘাঁটতে লাগল। সময় বুঝে চানুও তার পকেট বোঝাই তো করলই, তারপর একটা থলে মোহর দিয়ে ভরতি করে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দিক থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল। বুড়ি সেই টাকার ঘরেই আটকা পড়ে রইল।

বেরিয়ে এসেই চানু সুন্দর একটা পোশাক পরল, তারপর সেই ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড়টাকে নিয়ে একেবারে সেই কৃষকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কৃষক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দরজায়ই বসেছিল, তারপর সেই হারানো জন্তুগুলিকে দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল।



চানু বলল, 'এ জন্তুগুলো কার বলতে পার কি?'

'এগুলো যে আমাদের, আপনি কোথায় পেলেন মশায়?'

'এই বনের ভিতর চরে বেড়াচ্ছিল। আচ্ছা, ছাগলটার গলায় একটা থলে ঝুলছে, তাতে দশটা মোহর রয়েছে-ওগুলিও কি তোমাদের?'

'না মশায়। আমরা গরিব দুঃখী লোক, মোহর কোথা পাব?'

'আচ্ছা, মোহরগুলোও তোমরা নাও, আমার কিছু দরকার নেই।' মোহরগুলি নিয়ে দুই হাত তুলে কৃষক চানুকে আশীর্বাদ করল।

সমস্ত দিন চলে চানু প্রায় সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখল, তার মা-বাবা বসে আছে। চানু বলল, 'ভগবান আপনাদের ভালো করুন, আজ রাতটা আপনাদের বাড়ি থাকতে পারি কি?'

'আপনার মতো ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারবেন? আমরা যে বড্ড গরিব।'

চানু আর চুপ থাকতে পারল না, 'বাবা, তুমি কি তোমার ছেলেকেও চিনতে পারছ না?'

চানুর মা-বাবা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল, তারপর চানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এমন সুন্দর পোশাক তুমি কোথায় পেলে বাবা?'

চানু। 'পোশাক দেখেই অবাক হয়ে গেলে, তাহলে এই টাকাগুলো দেখে কী করবে?' এই বলে চানু পকেট খালি করে সব মোহর টেবিলের উপর রাখল।

এতগুলো মোহর দেখে চানুর বাবার বড্ড ভয় হল। চানু তখন সব কথা খুলে বলল। তার আশ্চর্য বুদ্ধির কথা শুনে চানুর মা-বাপের আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিন সকালে চানু বাবাকে বলল, 'বাবা, যাও জমিদারবাড়ি। বলো গিয়ে, আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

চানুর কথা শুনে তার বাবার চোখ বড়ো হয়ে গেল, 'বলিস কী রে বেটা! তাহলে যে আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে।'

'না! তুমি বোলো যে আমি সর্দার চোর, আমার মতো ঝানু চোর দুনিয়ায় নেই, জবরদস্ত ও ওস্তাদ চোরদের ফাঁকি দিয়ে লাখ টাকা রোজগার করে এনেছি। দেখো বাবা, যখন দেখবে জমিদারের মেয়েও সেখানে আছে, তখনই এসব কথা বোলো।'

'আচ্ছা, এত করে যখন বলছ, যাচ্ছি। কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না।' প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চানুর বাবা ফিরে এল। চানু বলল, 'কী করে এলে, বাবা?'

'নেহাত মন্দ নয়। মেয়েটি যে বড়ো অনিচ্ছুক, তা তো মনে হল না। বোধ করি বাবাজি তুমি এর আগেও তার কাছে এ প্রস্তাবটি করেছ-না? যাহোক, জমিদার বললেন, আসছে রবিবারে তাঁরা নাকি একটি হাঁস ভেজে খাবেন। তুমি যদি কড়া থেকে হাঁসটা বেমালুম চুরি করতে পার, তাহলে তিনি তোমার কথা ভেবে দেখবেন।'

'এ আর তেমন শক্ত কাজ কী? দেখা যাবে এখন।'

রবিবার দিন জমিদার এবং বাড়ির সকলে রান্নাঘরে রয়েছেন। হাঁস ভাজা হচ্ছে, এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। একটা অতি কুৎসিত বুড়ো ভিখারি, পিঠে তার একটা মস্ত বড়ো থলে ঝুলছে, সে এসে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'জয় হোক বাবা! আপনাদের খেয়ে-দেয়ে কিছু থাকলে আমি বুড়ো ভিখারি কিছু খেতে পাব কি?'

জমিদারমশায় বললেন, 'অবশ্যি পাবে। রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু বোসো।'

জানালার পাশে একজন লোক বসেছিল। খানিক পরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, মস্ত বড়ো একটা খরগোশ ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে-এটাকে মারলে হয় না?'

জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, 'খরগোশ মারবার ঢের সময় মিলবে, এখন চুপ করে বসে থাকো।'

খরগোশটা বাগানে গিয়ে ঢুকল। ভিখারি পোশাক-পরা চানু থলের ভিতর থেকে আর একটা খরগোশ ছেড়ে দিল। একটু পরেই চাকর আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবু বাবু, খরগোশটা এখনও রয়েছে-এখনও চেষ্টা করলে মারা যায়।'

আবার জমিদার ধমক দিলেন, 'চুপ করে থাকো বলছি।'

খানিক বাদে চানু আরও একটা খরগোশ থলে থেকে বের করে ছেড়ে দিল। চাকরও চেঁচিয়ে উঠল-আর যায় কোথা! একজন একজন করে সব ক-টি চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খরগোশের পেছনে তাড়া করল, জমিদারমশায়ও বাদ পড়লেন না।

খরগোশ তাড়িয়ে সকলে ফিরে এসে দেখে, ভিখারিও নেই, কড়ার মধ্যে হাঁসও নেই। জমিদারমশাই বললেন, 'আচ্ছা ফাঁকিটা দিয়েছে চানু, সত্যি সত্যি আমাকে জব্দ করেছে।'

একটু পরেই চানুদের বাড়ি থেকে একজন চাকর এসে জমিদারমশায়কে বলল, 'আজ্ঞে, আমার মনিব বলে পাঠিয়েছেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ি গিয়ে খাবেন।'

জমিদার বড়ো চমৎকার সাদাসিধে লোক ছিলেন, মনে একটুও অহংকার ছিল না। স্ত্রীকে ও মেয়েকে নিয়ে চানুদের বাড়ি গেলেন। চানুর চালাকির কথা বলে জমিদারমশায় হাসতে হাসতে পাঁজরে ব্যথা ধরিয়ে ফেললেন। মেয়েটি তো আগে থেকেই চানুকে পছন্দ করত, এখন তার পোশাক দেখে এবং তার আদবকায়দা দেখে মনে মনে আরও খুশি হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর জমিদার বললেন, 'চানু, শুধু হাঁস চুরি করেই আমার মেয়ে পাবে না। কাল রাত্রে আমার আস্তাবল থেকে আমার ছয়টি ঘোড়া যদি চুরি করতে পার, তাহলে দেখা যাবে এখন। ছ-জন সহিস কিন্তু ছয়টি ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দেবে মনে রেখো।'

চানু বলল, 'আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব এখন।'

সোমবার রাত্রে জমিদারের আস্তাবলে ছয়জন সহিস ছয়টি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। বেজায় ঠান্ডা, রক্ত যেন জমে যেতে চায়। তাই প্রত্যেকের জামার পকেটে একটি করে মদের বোতল, খানিক পরে পরে একটু করে মদ খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, তাই সকলে মিলে মহা গল্প জুড়ে দিল। চানুর জন্য আস্তাবলের দরজা খোলাই রেখেছিল। রাত যত বেশি হতে লাগল, ঠান্ডাটাও যেন বাড়তে লাগল। মদে আর শানায় না, গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল। এমন সময় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে একটা কদাকার বুড়ি এসে দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'বাবাসকল, শীতে জমে গেলাম, একমুঠো খড় দাও তো, আস্তাবলের এককোণে রাতটা পড়ে থাকি। তা না হলে বুড়ো মানুষ- শীতে মরেই যাব।' বুড়ির পিঠে ছয়টা থলে, মুখে প্রায় দু-আঙুল লম্বা দাড়ি-চেহারাটি কুৎসিতের একশেষ!

বুড়ি আস্তাবলের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'লক্ষ্মী বাপ আমার, বুড়ো মানুষ শীতে মরে গেলাম, ওই কোণটাতে একটু জায়গা দাও, একমুঠো খড় নিয়ে পড়ে থাকব এখন।'

সহিসরা ভাবল, 'এলই-বা বুড়ি, বেচারি শীতে জমাট বেঁধে গেল, ও তো আর কোনো অনিষ্ট করবে না।' আস্তাবলের কোণে খড় পেতে বুড়ি বেশ আরামে বসল। সহিসরা দেখল, বুড়ি খানিক পরেই একটা কালো বোতল বের করে একটু মদ খেল। তার মুখে আর হাসি ধরে না, যেন সে খুবই আরাম বোধ করছে। সহিসদের বুড়ি বলল, 'বাবা, তোমাদের সব বোধ করি শেষ করে ফেলেছ, তা আমার কাছে ঢের আছে। তবে কিনা তোমরা পাছে কিছু মনে কর, তাই তোমাদের দিতে ভরসা পাচ্ছি না।' একে বেজায় শীত, তার উপরে সত্যি সত্যি তাদের মদ শেষ হয়ে গেছে, বুড়ির কথা শুনে সহিসরা যেন হাতে চাঁদ পেল-'সে কি বুড়িমা, তুমি যদি দাও তাহলে তো বেঁচে যাই। ঠান্ডায় মরে গেলাম।'

বুড়ির বোতলটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল, তবুও সহিসদের শীত গেল না। শয়তান বুড়ি তখন আর একটি বোতল বের করে তাদের দিল। এ বোতলটার মদের সঙ্গে কী মেশানো ছিল, খাওয়ামাত্র সব ক-টা সহিস ঘোড়ার পিঠে গদির উপরে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

তখন বুড়ি উঠে সব ক-টা সহিসকে খড়ের উপর শুইয়ে ঘোড়াগুলোর পায়ে মোজা পরিয়ে দিল। তারপর সবগুলিকে নিয়ে একেবারে চানুদের বাইরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জমিদারমশায় প্রথমেই কী দেখলেন? তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চানু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, আর তার ঘোড়ার পিছনে পিছনে অপর পাঁচটা ঘোড়াও চলেছে।

জমিদারমশায় অবাক হয়ে রইলেন। মনে মনে বললেন, 'গোল্লায় যা তুই চানু, আর যাদের চোখে ধুলো দিয়েছিস সে বেচারারাও গোল্লায় যাক।' আস্তাবলে গিয়ে সহিস বেটাদের জাগাতে জমিদারমশায়কে বেগ পেতে হয়েছিল।

সকাল বেলা জমিদারমশায় খেতে বসেছেন, চানুকেও ডেকে এনেছেন, খেতে খেতে চানুকে বললেন, 'কতগুলো বোকা পাঁঠার চোখে ধুলো দিয়েছ। এতে তেমন বাহাদুরি নেই। আচ্ছা, আজ বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াব। নিয়ো দেখি বাপু আমার ঘোড়াটা চুরি করে! তাহলে বুঝব তুমি বাহাদুর এবং আমার জামাই হবার উপযুক্ত।'

চানু মাথা নীচু করে উত্তর করল, 'যে আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করে দেখব এখন।'

একটার পর থেকে জমিদার ঘোড়ায় চড়ে পাইচারি করে করে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। তিনটে বেজে গেল, চানুর টিকিটিও দেখতে পেলেন না। মনে করলেন এবারে বাড়ি ফিরে যাবেন, এমন সময় তাঁর একটা চাকর পাগলের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাজির- 'কর্তা শিগগির বাড়ি যান, মা ঠাকরুনকে বুঝি-বা আর দেখতে পেলেন না। সিঁড়ির উপর থেকে তিনি পড়ে গেছেন। বোধ করি হাত-পা সব ভেঙে গেছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আমি চললাম ডাক্তারের বাড়ি।'

জমিদারের চোখ বড়ো হয়ে গেল, 'বলিস কীরে বেটা, কী সর্বনাশ! ডাক্তারের বাড়ি যে ঢের দূর-তাই আমার ঘোড়াটা নিয়ে ছোট শিগগির।' ঘোড়ায় চড়ে চাকর তখন ডাক্তারের বাড়ি ছুটল।

জমিদারমশাই হোঁচট খেতে খেতে বাড়ি এসে উপস্থিত। এসে দেখলেন, সাড়াশব্দ কিছু নেই, সব চুপচাপ। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ির ভেতরে গেলেন, সেখানে বসবার ঘরে গিন্নি আর মেয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আছেন। ততক্ষণে জমিদারমশায়ের চৈতন্য হল। তিনি বুঝতে পারলেন, এসব চানু বেটারই চালাকি-বেটা তাঁকে আচ্ছা ঘোল খাইয়েছে।

খানিক পরেই দেখলেন চানু তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সেই চাকর বেটার কিন্তু আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না। চাকর তার জন্য একটুও কেয়ার করে না, নাই-বা করল তার চাকরি-চানু যে তাকে দশটা মোহর দিয়েছিল, তা দিয়ে তার অনেক দিন চলবে।

পরের দিন চানু এসে জমিদার বাড়ি উপস্থিত। জমিদার বললেন, 'তুমি বাপু এবারে নেহাত ফাঁকি দিয়েছ, ওতে তোমার উপর আমার বড্ড রাগ হয়েছে। যাহোক আজ রাত্তিরে যদি আমাদের বিছানার থেকে চাদরখানা চুরি করতে পার, তাহলে কালকেই বিয়ের আয়োজন করব।'

চানু বলল, 'আজ্ঞে আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু এবারেও যদি ফাঁকি দেন তা হলে কিন্তু আপনার মেয়েকেই চুরি করে নিয়ে যাব।'

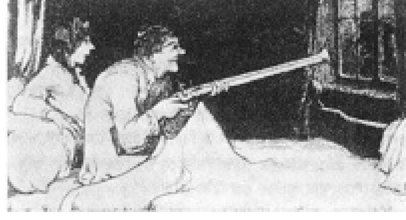
রাত্রে জমিদার আর তাঁর গিন্নি শুয়েছেন। দিব্যি জ্যোৎস্না। কাচের জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরে পড়েছে। জমিদারমশায় দেখলেন, হঠাৎ যেন একটা মাথা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিল, তাঁদের দেখতে পেয়েই আবার সরে পড়ল।

জমিদার গিন্নিকে বললেন, 'দেখলে তো? এ বেটা নিশ্চয় চানু।' তারপর বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে বললেন, 'দেখো, আমি বেটাকে এখনই চমকে দিচ্ছি।'

বন্দুক দেখেই জমিদার গিন্নি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কর কী, চানুকে গুলি করবে নাকি?'

জমিদার বললেন, 'আরে না, তুমি কি পাগল হলে নাকি? বন্দুকে কি আর গুলি পুরেছি- শুধু বারুদ।'

খানিক পরেই আবার জানালায় মাথা উঁকি মারল, দড়াম করে জমিদার বন্দুক ছুড়ে দিলেন-সঙ্গেসঙ্গে শুনতে পেলেন, ধপ করে কী নীচে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লেগেছে।



জমিদার গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় ভগবান, বেচারি বোধ করি মরে গেছে, আর নাহয় জন্মের মতো খোঁড়া কানা হয়ে থাকবে।'

জমিদারমশায় কেমন জানি থতমত খেয়ে গিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন-দরজা খোলাই পড়ে রইল।

জমিদারমশায় বোধ করি তখনও বাইরের জানালার কাছে পৌঁছোননি, কিন্তু গিন্নিঠাকরুন শুনলেন, কর্তা ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'শিগগির বিছানার চাদরখানা দাও। বেটা মরেনি বোধ হয়, কিন্তু বেজায় রক্ত পড়ছে-একটু পরিষ্কার করে বেঁধে-টেঁধে ওকে নিয়ে আসব।'

গিন্নিঠাকরুন একটানে চাদরখানা বিছানা থেকে তুলে দরজায় ছুড়ে দিলেন। চাদর নিয়ে জমিদারমশায় আবার ছুটলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে এসে ঘরে উপস্থিত-সে সময়ের মধ্যে বাগানে জানালার কাছে গিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব।

ঘরে ঢুকেই জমিদার রেগে-মেগে বলতে লাগলেন, 'বেটা পাজি চানু, তোকে ফাঁসি দেওয়া দরকার।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নি অবাক হয়ে বললেন, 'বেচারির বেজায় লেগেছে আর তুমি কিনা তাকে গালাগালি দিচ্ছ!'

'ওর বাস্তবিক লাগাটাই উচিত ছিল। বেটার বদমাইশি দেখেছ? খড় দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে সেটাকে কাপড়চোপড় পরিয়ে এনে জানালায় ধরেছিল।'

'কী ছাই মাথামুণ্ডু বলছ, আমি বুঝতেই পারছি না। খড়ের মানুষ হলে তার রক্ত মুছবার জন্য আবার বিছানার চাদর চেয়ে নিয়ে গেলে কেন?'

'বিছানার চাদর-বলছ কী! আমি তো বিছানার চাদর-টাদর চাইতে আসিনি।'

‘চাদর চাইতে আস আর না আস, আমি সেসব কিছু জানি না। তুমি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চাদর চাইলে, আর আমিও তোমাকে দিয়েছি।’

গিন্নির কথা শুনে জমিদারমশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন-‘কী ভীষণ শয়তান রে বাবা চানু। ওর সঙ্গে আর পেরে উঠব না। কাল সকালেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে দেখছি।’

এরপর চানুর সঙ্গে জমিদার কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর চানু খুব ভালো হয়ে গেল। তার মতো জামাই সচরাচর মেলে না। জমিদারমশায় এবং তাঁর গিন্নি শতমুখে চানুর সুখ্যাতি করেন আর লোকের কাছে বলেন, ‘আমার ঝানু চোর চানু।’

*অগ্রহায়ণ-মাঘ* **১৩২১**




## শান্তিলতা চৌধুরী

রাজার বাড়ির পিছনে বাঁশ বনের ধারে এক মস্ত দিঘি। গ্রামের মেয়েরা রোজ সেখানে এসে স্নান করে, আর যাবার সময় কলসি ভরে জল নিয়ে যায়।

কয়েকটি মেয়ে জলে নেমে খুব স্নান করছে আর গল্প করছে। একটি মেয়ে বলল, 'জানিস? আমাদের কেমন সুন্দর বাড়ি? কেমন চারদিকে ফুল বাগান?'

আরেকটি মেয়ে বলল, 'আমাদের পুকুরের বাঁধানো ঘাট, কেমন সাদা ধবধপে; যেন স্ফটিকের তৈরি।' আরেকটি মেয়ে বলল, 'আমার বাবার কেমন গাড়ি আছে, ঘোড়া আছে। ঘোড়াটা যা ছোটে ভাই, ঠিক যেন পক্ষীরাজ।' সকলেই একটা-না-একটা কিছু বলছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট্ট মেয়েটি চুপ করে আছে; সে কিছু বলছে না। বেচারি ভেবেই পাচ্ছে না যে কীসের কথা বলবে। অনেক পরে সে বলে উঠল, 'আমারও এক বাঘ মামা আছে, সে বড্ড ভালো।' এই কথা বলতেই সকলে হেসে উঠল; একটি মেয়ে বলল, 'যা যাঃ হাবি! শিগগির স্নান করে ওঠ'-আবার আরেকটি মেয়ে বলল, 'উনি আর কথা খুঁজে পেলেন না, তাই বোকার মতো বলতে এসেছেন আমার এক বাঘ মামা আছে'-আরেকটি দুষ্টু কালো হিংসুটে মেয়ে বলল, 'সব মিছে কথা! 'বাঘ মামা' আছে, না 'হাতি মামা' আছে!' তাই শুনে ছোট্ট মেয়েটি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বাড়ি চলে গেল।

এদিকে হয়েছে কী, সেই বাঁশ ঝোপে এক বুড়ো বাঘ এসে তাদের কথা শুনছিল। ছোট্ট মেয়েটি তাকে 'মামা' বলাতে তার ভারি মজা লেগেছে। সে করল কী, সকলের স্নান হয়ে গেলে, গ্রামের রাস্তা দিয়ে বরাবর ভিতরে যেতে লাগল। একটা গাছতলায় ৪-৫ জন পালকি বেহারা, পালকি নামিয়ে বিশ্রাম করছিল-বাঘ একলাফে তাদের সামনে গিয়েই চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'এইও! তোমরা শিগগির পালকি নিয়ে আমার সঙ্গে চলো।' পালকি বেহারাগুলো এমন থতমত খেল যে, পালাতেও পারল না। তাড়াতাড়ি পালকি উঠিয়ে ভয়ে ভয়ে বাঘের সঙ্গে চলল। খানিক দূর যেতেই বাঘ দেখল এক দোকানে সারি সারি মিঠাই সাজানো রয়েছে। সে এক লাফ দিয়ে ঢুকে, একেবারে ময়রাদের মাঝখানে উপস্থিত। আর যে যেখানে ছিল 'পালা, পালা' 'খেলো, খেলো' করে একেবারে দৌড়। বাঘ তখন মজা করে হাঁড়ি হাঁড়ি মিঠাই পালকিতে উঠিয়ে নিল। তারপর আবার এক কাপড়ের দোকানে গিয়ে বাঘ 'হালুম' করতেই-'বাপরে, মারে', করে যে যেখানে পারে দে ছুট। বাঘ তখন সুন্দর সুন্দর শাড়ি বেছে, পালকিতে উঠিয়ে নিল। এমনি করে নানান দোকান ঘুরে নানান জিনিসে পালকি একেবারে ভরতি হয়ে গেল। বাঘ তখন কতগুলো বাছাবাছা জিনিস নিয়ে সেই ছোট্ট মেয়েটির বাড়ির দিকে চলল।

মেয়েটি ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, এমন সময় তার মনে হল দরজায় যেন 'ঠুক' 'ঠাক' কীসের শব্দ হচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি দেখবার জন্য দরজাটা একটু ফাঁক করতেই-ও বাবা! একেবারে বাঘের সঙ্গে চোখাচোখি। তখন সে 'আমাকে বাঘে খেলো রে' বলে এমনি

চেঁচাতে লাগল যে চিৎকার শুনে তার বাড়িসুদ্ধ সকলেই দৌড়ে এল। বাঘ দেখল বড়োই মুশকিল, ওরা বড্ড ভয় পেয়েছে, এমনিতে দরজা খুলবে না। তখন সে পালকি থেকে মিঠাই, শাড়ি, খেলনা বার করে দরজার সামনে রেখে, নিজে চোখ বুজে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে রইল।

তখন সকলে বলাবলি করতে লাগল যে বাঘ যখন এত ভালো জিনিসপত্র এনেছে তখন তার মনে কোনো দুষ্টু বুদ্ধি নাই, সে তাদের খাবে না। তখন তারা সাহস করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বাঘ তখন 'হায়, হায় ভাগনি! মামাকে ডেকে শেষে তাড়িয়ে দিচ্ছ!' এই বলে ছটফট করতে লাগল, যেন কতই মনে কষ্ট তার। তখন মেয়েটির সেই স্নান করতে যাওয়া থেকে সব মনে পড়ে গেল। সে তার মা, বাপকে সব খুলে বলল।

তার কথা শেষ হতেই বাঘ লাফিয়ে উঠে বলল, 'তাহলে এখন একবার মামার বাড়ি চলো'-শুনে সকলে কাঁদতে লাগল। এমন লক্ষ্মীমেয়েকে কি কেউ বাঘের বাড়ি পাঠাতে পারে? ছোট্ট মেয়েটি বলল, 'বাঘ মামা, তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে যেতে বোলো না। ও বাঘ মামা তোমার পায়ে পড়ি'-বাঘ তখন রেগে বলল, 'দেখো যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, তবে আমি বলছি তোমার খুব ভালোই হবে। আর যদি না যাও, তবে এক্ষুনি সকলকে খেয়ে ফেলব।' মেয়েটি তখন ভয়ে ভয়ে পালকিতে উঠল। আর দেখতে দেখতে পালকি বেহারারা বাঘের হুকুমে মেয়েকে নিয়ে বনে এসে উপস্থিত। মেয়েকে নামিয়ে দিয়েই তারা যে যার প্রাণ নিয়ে দৌড়, মেয়েটি আরও ভয়ে কাঁদতে লাগল। বাঘ যতই বলে, 'আরে, আরে অত কেঁদো না, চুপ করো' মেয়েটি ততই কাঁদে। শেষে বাঘ বলল, 'দেখো আমি গভীর বনে শিকার খুঁজতে যাচ্ছি, তুমি আমার জন্য পাতা দিয়ে একটা বিছানা করে রেখো। আর ওই গাছে খুব মিষ্টি মিষ্টি ফল আছে তুমি খেয়ো।' এই বলে বাঘ চলে গেল।

মেয়েটি অনেকক্ষণ খুব কেঁদে, শেষে আস্তে আস্তে উঠে বাঘের জন্য শুকনো পাতা দিয়ে সুন্দর করে বিছানা করল। গাছের ডাল ভেঙে, তাই দিয়ে আশেপাশের জঞ্জাল পরিষ্কার করল। নিজে ফল-টল কিছু খেল না।

বাঘ এসে বিছানা দেখে মহা খুশি। তার আর দেরি সইল না, গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হাই তুলে বলল, 'ভাগনি, আমার পাটা একটু টিপে দাও তো!' মেয়েটি তক্ষুনি বাঘের পা টিপে দিতে লাগল।

খানিক পরে বাঘ বলল, 'আচ্ছা ভাগনি, আমার লেজটা কেমন?' মেয়েটি বলল, 'বাঃ! বড়ো সুন্দর-কেমন মখমলের মতো নরম, আবার কেমন হলদে কালো ডোরা।' 'আচ্ছা আমার কানটা কেমন ভাগনি?' 'বাঃ! ঠিক যেন সোনার পিদ্দিম খানি!' 'আচ্ছা-আমার চোখ দুটো কেমন ভাগনি?' 'চমৎকার! কেমন লাল-আবার রাত্রে জোনাকির মতো জ্বলে।' 'আচ্ছা-ভাগনি, আমার দাঁতগুলো কেমন?' 'আহাহা! যেমনি ধপধপে সাদা, তেমনি ধারালো।' 'আচ্ছা-ভাগনি, বলো তো কাঁচা মাংসের গন্ধটা কেমন?' এই বলে বাঘ 'ঘেউক' করে এক ঢেকুর তুলল। মেয়েটির তো গন্ধের চোটে প্রায় বমি হয়ে যাবার জোগাড়, তবু সে সামলিয়ে নিয়ে বলল, 'খুব ভালো মামা, খুব ভালো। ঠিক যেন আতরের গন্ধ।'

বাঘ তো বেজায় খুশি, সে বলল, 'আহা, তুমি তো বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। এখন দেখো ওই গাছের তলায় কত টাকা, কত গহনা, মণি মুক্তা কত কী রয়েছে। যত পার নিয়ে বাড়ি যাও।' মেয়েটির তো আনন্দ ধরে না। সে ছুটে গিয়ে মস্ত পুঁটলি বেঁধে অনেক টাকা, শাড়ি, গহনা নিল। তারপর বাঘ তাকে গ্রামের পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তারপর সে বাড়ি যেতেই

কী যে আনন্দ হল! পাড়ার সকলে এসে তার জিনিসপত্র দেখে অবাক হয়ে গেল। সকলেই খুশি হয়েছে, কেবল সেই দুষ্টু কালো হিংসুটে মেয়েটা মুখ হাঁড়ি করে বাড়ি ফিরে গেল।



তারপর আরেক দিনও আবার মেয়েরা স্নান করতে নেমেছে। আর সেই হিংসুটে মেয়ে নিজে থেকেই বার বার বলছে 'আমার এক বাঘ মামা আছে, আর কিছু নাই; শুধু এক বাঘ মামা আছে আর কিছু নাই'-বাঘটা সে দিনও সব শুনতে পেল। আর ঠিক সেইরকম করে শাড়ি, মিঠাই, খেলনা নিয়ে হিংসুক মেয়ের বাড়ি গেল।

এদিকে মেয়ে তো বাড়ি গিয়েই একেবারে দরজায় দাঁড়িয়ে বাঘের জন্য অপেক্ষা করছে। বাঘও পালকি-টালকি নিয়ে এসে হাজির। কিন্তু কেউ কিছু ব্যস্তও হল না এবং বাঘকে দেখে খুশিই হল। মেয়ে তো আগেই পালকিতে উঠে বসেছে, আর দেখতে দেখতে বনের কাছে এসে পড়েছে। তারপর সে পালকি থেকে নেমেই আগে চারদিকে চেয়ে দেখছে যে, শাড়ি, গহনা কোথায় আছে। বাঘ বলল, 'দেখো আমি বনে যাচ্ছি শিকার খুঁজতে। তুমি আমার জন্য পাতা দিয়ে বিছানা করে রেখো, আর ওই গাছে মিষ্টি ফল আছে, খেয়ো।'

মেয়ের বড্ড রাগ হল। বাঘ চলে গেলে পরে সে প্রথমে খুব করে ফল পেড়ে খেলো, তারপর কোথাও কিছু টাকা, গহনা পায় কি না খুঁজতে লাগল। বিছানাও হল না কিছুই হল না।

বাঘ এসে বিছানা করা হয়নি দেখে মাটিতেই শুয়ে মেয়েকে ডাকল, 'একটু পা-টা টিপে দাও তো।' পাছে বাঘ খেয়ে ফেলে সেই ভয়ে মেয়ে পা টিপতে গেল। বাঘ বলল, 'আচ্ছা- বলো তো আমার লেজটা কেমন?' হিংসুটে মেয়ে বলল, 'রাঃম! যেন নারকেলের দড়ি।' 'আচ্ছা-আমার কানটা কেমন?' 'ছিঃ! যেন জুতোর চামড়ার মতো!' 'আচ্ছা-আমার দাঁতগুলো বেশ, না?' 'থু-থু-যেন ব্যাঙের ছাতা।' বাঘের ক্রমেই রাগ হচ্ছে, সে আবার বলল, 'আচ্ছা-বলো তো বাপু কাঁচা মাংসের গন্ধটা লাগে কেমন?' এই বলে 'ঘেউক' করে এক ঢেকুর তুলল। মেয়েটা তো বমি করেই ভাসিয়ে দিল। তখন বাঘ বলল, 'তোকে গহনা, শাড়ি, খেলনা কিচ্ছু দেব না। ভালো চাস তো এখনই আমার সামনে থেকে পালা, না হলে একেবারে গিলে ফেলব।' মেয়েটা তো তখন 'বাপরে, বাপরে' করে একেবারে ছুট। একবার ফিরেও তাকায় না, সেই বাড়ির ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তবে হাঁপ ছাড়ল। সে আর লক্ষ্মী মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করত না। বাঘের ভয়ে দিঘিতে স্নান করতে যাওয়াও বন্ধ করল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩




## কুলদারঞ্জন রায়

সেকালে শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ গৌতমী নদীর তীরে কুটির নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ শিবের পরম ভক্ত-প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত শিবের স্তুতি বন্দনা করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যমদূতেরা আসিয়া উপস্থিত; কিন্তু শিবভক্ত ব্রাহ্মণের ঘরের ভিতরে তাহারা প্রবেশই করিতে পারিল না।

এদিকে বিলম্ব দেখিয়া যম মৃত্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেই শ্বেত ব্রাহ্মণ এখনও আসিল না কেন? দূতেরাই বা কেন ফিরিয়া আসিতেছে না? বাস্তবিক তুমি মৃত্যু, তোমার কাজে এরূপ অনিয়ম হওয়া কখনোই উচিত নয়।' একথায় মৃত্যুর বড়োই রাগ হইল এবং তিনি নিজেই ব্রাহ্মণের কুটিরে চলিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন যমদূতেরা ভয়ে ভয়ে কুটিরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে; তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'একী! তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?' দূতেরা বলিল, 'স্বয়ং মহাদেব শ্বেত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতেছেন কাজেই আমরা ব্রাহ্মণের দিকে চাহিতেও ভরসা পাইতেছি না।' মৃত্যু তখন ব্রাহ্মণের নিকটে গেলেন।

কে মৃত্যু, কাহারাই বা তাঁহার দূত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কিছুই জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই-তিনি একমনে মহাদেবেরই পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে শিবের অনুচর দণ্ডী মৃত্যুকে পাশ হাতে লইয়া দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি এখানে কী দেখিতেছ?' মৃত্যু বলিল, 'আমি শ্বেত দ্বিজকে লইতে আসিয়াছি।' দণ্ডী বলল, 'তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।' একথায় মৃত্যু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শ্বেত ব্রাহ্মণকে পাশ ছুড়িয়া মারিল। দণ্ডীও ছাড়িবার পাত্র নহে! তাহার হাতে ছিল মহাদেবের দণ্ড, সেই দণ্ড দিয়া মৃত্যুকে ধরাশায়ী করিল।

তখন যমদূতেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া যমরাজাকে সমস্ত সংবাদ জানাইবা মাত্র তিনিও মহিষে চড়িয়া প্রস্তুত হইলেন। যমরাজার সৈন্যেরাও সাজিয়া গুজিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। শ্বেত ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়া সকলে উপস্থিত। দলবল-সহ মহিষে চড়িয়া যমকে আসিতে দেখিয়া শিবের লোকেরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তখন সেখানে ভারি ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কার্তিক তাঁহার শক্তি দিয়া যমের লোকদের কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অবশেষে যমরাজাকে ও তাঁহার বাহনটিকে গুরুতর রূপে আহত করিলেন। তখন অবশিষ্ট যমসৈন্যেরা গিয়া সূর্যকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। সূর্য ব্রহ্মার নিকটে গেলেন। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণকে লইয়া যমের নিকটে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন যম গঙ্গাতীরে মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছেন।

যমকে মৃতপ্রায় দেখিয়া দেবতাদের তো ভয় হইবার কথাই। তখন শিবকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন আর উপায় কী? সকল দেবতা মিলিয়া জোড়হস্তে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তোমাদের পূজায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এখন কী বর চাও বলো।' দেবতারা বলিলেন, 'প্রভু! এই যম ছাড়া সংসারের কাজই চলিতে পারে না। ইনি কোনো অপরাধ করেন নাই, ইঁহাকে বধ করা আপনার উচিত নয়। অতএব আপনি সৈন্যগণ এবং বাহন-সহ যমকে জীবিত করুন।'

তখন মহাদেব বলিলেন, 'আমার ভক্তের মরণ হইবে না, একথায় যদি তোমরা রাজি হও তাহা হইলে আমি এখনই যমকে বাঁচাইয়া দিব।' দেবগণ বলিলেন, 'তাও কি কখনো হয়? তাহা হইলে সংসারের সমস্ত লোকই যে অমর হইয়া যাইবে।' শিব বলিলেন, 'সে কথা বলিলে চলিবে না। আমার ভক্তের কর্তা আমি, তাহার উপর যম কোনো দিন কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। এ কথায় যদি তোমরা সম্মত হও তাহা হইলেই যমকে বাঁচাইব।'

দেবতারা তখন নিরুপায় দেখিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা প্রভু, তাহাই হইবে।' মহাদেবও তখন নন্দীকে বলিলেন, 'নন্দী! গৌতমীর জল দিয়া যমকে বাঁচাইয়া দাও।'

মহাদেবের হুকুমে নন্দী গৌতমীর জল আনিয়া সকলের শরীরে ছিটাইয়া দিবামাত্র যম সৈন্যগণের সহিত জীবিত হইলেন। সে দিন হইতে সংসারে ধার্মিক এবং ভক্ত লোকদিগকে দেখিলেই যম তাঁহার শাসনদণ্ড নামাইয়া ভয়ে দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়েন।

*শ্রাবণ* ১৩২৩






# জ্যোতির্ময়ী দেবী

এক ছিলেন রাজা-মস্ত বড়ো রাজা! যেমন ছিল লম্বা-চওড়া তাঁর দেহ, তেমনি ছিল লম্বা-চওড়া তাঁর রাজ্য, আর তেমনি প্রচণ্ড ছিল তাঁর রাগ।

তাঁর ছিল একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে আর ছিল চমৎকার মিনা করা সোনার তারের বাটি। বাটিটা লক্ষ্মীঠাকরুনের পায়ের তলার দলমেলা পদ্মফুলের মতো দেখতে। রাজা সেটাকে একটা পুরু মখমলের গদির উপর বসিয়ে রাজসভার যে প্রকাণ্ড ঘর তার মাঝখানে রেখে দিয়েছিলেন। যে আসত সেই সে বাটিটা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত।

একদিন অনেক দূরের এক দেশের রাজার কাছে থেকে এই রাগী রাজার কাছে এক দূত এল। দূত বাটিটা দেখে মুগ্ধ তো হলই না, বরং উলটিয়ে বলল, 'ওমা! সবেমাত্র একটা বাটি! তাও আবার এমনি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে! আরে ছিঃ! আমাদের রাজার তো ওইরকম দুটো বাটি আছে। দুটো পাশাপাশি না রাখলে কি মানায়।'

রাজামশাই তো শুনে ভয়ানক চটে গেলেন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কী! এত বড়ো আস্পর্ধা! দুটো বাটি? তা কিছুতেই হতে পারে না। দূত, তুমি মিথ্যে কথা বলছ!'

দূত হাত জোড় করে বলল, 'আজ্ঞে না; আমি সত্যি কথাই বলছি; আমাদের রাজামশায়ের এরকম দুটো বাটি আছে।'

রাজা কিন্তু তবুও জেদ ধরে বললেন, 'তবে সে বাটি কখনো এ বাটির মতো দেখতে নয়।'

দূত বলল, 'আজ্ঞে হাঁ, ঠিক এই বাটির মতোই দেখতে।' তখন রাজা ভয়ংকর রেগে মন্ত্রীকে বললেন, 'মন্ত্রী, এক্ষুনি এই লোকটার রাজার বাড়ি লোক পাঠিয়ে খবর নাও যে সত্যি সত্যি সেখানে এরকম দুটো বাটি আছে কি না।'

লোকেরা গিয়ে ফিরে এসে বলল, 'হাঁ, মহারাজ এরকম দুটো বাটিই আছে।'

তখন রাজামশাই বললেন, 'যেমন করে হোক আমাকে আরেকটা বাটি এনে দিতেই হবে। যে আমাকে এরকম বাটি আরেকটা দিতে পারবে, তাকে আমি রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব দেব।'

কেউ কিন্তু আরেকটা বাটি এনে দিতে পারল না। স্যাকরারা ওরকম বাটি আর গড়তেও পারল না। রাজা খুব চটতেই লাগলেন, কিন্তু কিছু ফল হল না।

শেষে একদিন এক রাজপুত্র রাজার কাছে এসে বললেন, 'মশাই, আমি যদি আপনাকে দেখাতে পারি যে আপনার দুটো বাটি আছে, তাহলে আপনার মেয়েকে আমায় দেবেন তো?'

রাজা বললেন, ‘হাঁ, নিশ্চয়ই।’

রাজপুত্র তখন বললেন, ‘তাহলে আপনার লোকজন ডাকুন, আমি সকলের সামনে প্রমাণ করে দিচ্ছি যে একটা বাটি থাকলেই দুটো বাটি থাকা হল।’

রাজা রাজ্যের সমস্ত বড়ো বড়ো লোকদের ডেকে পাঠালেন। যত আমির, ওমরাহ, উজির, নাজির এসে উপস্থিত হল। রাজপুত্র বললেন, ‘একটা বোর্ড চাই, আমি অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দেব।’

অমনি ‘হাঁই’ ‘হুঁই’ করতে করতে চারজন লোক প্রকাণ্ড এক বোর্ড নিয়ে উপস্থিত।

রাজপুত্র খড়ি দিয়ে লিখলেন ‘ক = গ’। তারপর বললেন, ‘মনে করুন ‘ক’ ‘গ’-এর সমান। অঙ্কশাস্ত্রে তো এরকম লেখে?’

রাজামশাই আর সভাপণ্ডিতেরা ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘হুঁ’। রাজপুত্র অঙ্ক কষতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, ‘যদি ক, গ-এর সমান হয়, তাহলে কগ নিশ্চয়ই গগ (গ২)-এর সমান হবে।’

‘কগ = গগ’

লোকেরা বলল, ‘হুঁ’।

রাজপুত্র বললেন, ‘এখন কগ আর গগ দুই থেকে কক বাদ দেওয়া যাক। তাহলে হল

কগ – কক = গগ – কক’ অর্থাৎ ‘গ$^{২}$ – ক$^{২}$

কেমন হল তো?’

পণ্ডিতেরা বললেন, ‘হাঁ, হয় বই কী।’ আর সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

রাজপুত্র বললেন, ‘তারই মানে হল

ক (গ – ক) = (গ + ক) (গ – ক)

তাই তো?’

সকলে হাঁ করে বসে রইল, শুধু পণ্ডিতেরা বলল, ‘হাঁ’।

রাজপুত্র বললেন, ‘তারই মানে-

ক = গ + ক

‘কেমন নয় কি? আবার তার থেকেই হল,

ক = ক + ক

‘অর্থাৎ কিনা

১ক = ২ক

‘অর্থাৎ কিনা এক হল দুই এর সমান। এই দেখুন আমার অঙ্ক-

\ ক = গ

\ কগ = গগ

\ কগ – কক = গগ – কক

\ ক (গ – ক) = (গ + ক) (গ – ক)

\ ক = গ + ক = ক + ক

অর্থাৎ, ক = ২ক

অর্থাৎ, ১ = ২’

পণ্ডিতেরা খুব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, ‘হাঁ হাঁ, তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই। আরে এ তো জলের মতো সোজা।’

সভাসুদ্ধ লোকেরাও চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘হাঁ, এ তো জলের মতোই সোজা।’

রাজামশাই তো মহা আনন্দে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। রাজপুত্র তখন বললেন, ‘তাহলে একটা বাটি থাকাও যা দুটো বাটি থাকাও তো তাই।’

সক্কলে বললেন, ‘হাঁ, তাই।’

তখন রাজপুত্র, রাগী রাজার অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা পুরস্কার চাইলেন-আর পেলেনও।*

*ভাদ্র* ১৩২৩

---

* সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা বীজগণিত (Algebra) পড়েছেন, তাঁদের কাছে রাজপুত্রের অঙ্কটা বোঝা শক্ত হবে না। ইংরেজিতে লিখতে গেলে অঙ্কটা লিখতে হবে-

$$a = b\ ;\ \backslash\ ab = b^2\ ;\ \backslash\ ab - a^2 = b^2 - a^2\ ;\ \text{or, } a(b - a) = (b + a)(b - a)$$

$$\backslash\ a = b + a = 2a.$$




# দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

পাটনা জেলার এক গ্রামে রামভজনের বাস। সে লেখাপড়া জানে না, চাষবাস করিয়া খায়। সে কৃপণ নয়, বেশ হিসেবি লোক-মিতব্যয়ী, অনর্থক বাজে খরচ করে না। তাহার পরিবার বৃহৎ হইলেও পরিমিত ব্যয়ে সংসার চালাইয়া অনেক টাকা জমা করিয়াছে। বড়ো ছেলেটিকে সেই গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখাইয়া পাটনার হাই স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়াছে। ছেলেটি সেই স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকে আর ফোর্থ ক্লাসে পড়ে।

সেই গ্রামে আরও অনেক সংগতিপন্ন লোক বাস করে। রামভজন দেখিল যে, গ্রামের যাহাদের যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে তাহাদের অনেকেরই গাড়িঘোড়া আছে। যাহাদের গাড়ি নেই তাহাদের অন্তত একটি করিয়া ঘোড়া আছে, তাহারা ঘোড়া চড়িয়া যাওয়া-আসা করে। তাই দেখিয়া রামভজনেরও একটা ঘোড়া কিনিবার শখ হইল। নানা দেশ হইতে সওদাগরেরা নানা প্রকারের ঘোড়া লইয়া বিক্রয়ের জন্য পাটনা শহরে আসে। রামভজন গ্রাম হইতে এক বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া ঘোড়া কিনিতে পাটনায় আসিল। সেইদিন শহরের মধ্যে ঘুরিয়া চার-পাঁচ দিনের জন্য এক বাসা ভাড়া করিয়া লইয়া পর দিবস প্রাঃতকালে ঘোড়া কিনিতে বাহির হইল।

এক সওদাগরের আড্ডায় অনেক ঘোড়া ছিল। সেইসব ঘোড়ার মধ্যে একটি ঘোড়া দেখিয়া রামভজনের ভারি পছন্দ হইল। ঘোড়াওয়ালা পাঁচ-শো টাকা দাম চাহিল। একটা ঘোড়ার জন্য অত টাকা খরচ করিতে রামভজনের মন সরে না, অথচ অমন সুন্দর পছন্দসই ঘোড়াটা লইতেও তার ভারি ইচ্ছা। তাই অনেকক্ষণ দাম কষাকষি করিল, কিন্তু ঘোড়াওয়ালা পাঁচ-শো টাকার কমে কিছুতেই সেই ঘোড়া বেচিতে রাজি হইল না।

রামভজনের ঘোড়াটা কিনিবারও বিশেষ আগ্রহ আছে, অথচ সে পাঁচ-শো টাকা বড্ড বেশি মনে করিয়া ইতস্তত করিতেছে-ইহা বুঝিতে পারিয়া সওদাগর বলিল, ‘আচ্ছা বাবুজি, আমি একটা ভারি সুবিধার কথা বলে দি, দেখুন তাতে যদি আপনি কিনতে পারেন। দেখুন, ঘোড়ার চারটে পা, প্রত্যেক পায়ে একটা করে লোহার নাল বাঁধানো আছে, প্রত্যেকটা নাল পাঁচটা করে পেরেক দিয়ে খুরের সঙ্গে আঁটা আছে। সবসুদ্ধ মোটে কুড়িটি পেরেক আছে। আপনি আমায় সামান্য পেরেকের দামে ঘোড়ার দাম দিন। পেরেকের দামটা কিন্তু এইরকমে হিসেব করতে হবে। প্রথম পেরেকের দাম এক পয়সা, দ্বিতীয় পেরেকের দাম দুই পয়সা, তৃতীয় পেরেকের দাম চার পয়সা, চতুর্থ পেরেকের দাম আট পয়সা-এইরকমে প্রত্যেক পেরেকের দাম তার পূর্বের পেরেকের দ্বিগুণ হিসাবে দিতে হবে। এই রকমে পয়সা হিসাব করে দাম দিলেও হবে। মোটে কুড়িটা পেরেক বই তো নয়, ওই হিসাবে যে কয়টা টাকা হয় তা দিলেও আমি ঘোড়াটা দিতে পারি। দেখুন, এতে যদি আপনার সুবিধা হয়, এখনই বেচা-কেনার লেখাপড়া করে দিয়ে যান।’

ওই কথা শুনিয়া রামভজন মনে করিল লোকটা নিশ্চয় পাগল নতুবা অমন সুন্দর ঘোড়াটাকে কয়েকটা পেরেকের দামে, পয়সা হিসাবে, মাটির দরে কেন বিক্রয় করিবার খেয়াল হইবে। সে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী বল হে, এই শর্তে ঘোড়াটা নেব? কতই-বা পয়সা হবে? এক হাজার পয়সা হলেও তো ১৫ টাকার বড়ো বেশি হয় না।'

বন্ধু বলিল, 'আরে ভাই, দশ হাজার পয়সা হলেও তো দেড়-শো টাকার বড়ো বেশি হয় না, অত পয়সাও কি হবে? আর বিলম্ব না করে চট করে ওর সঙ্গে একটা লেখাপড়া করে নাও, কী জানি যদি আবার মত বদলায়।'

ওই শর্তে ঘোড়া কেনার লেখাপড়া হইয়া গেল। রামভজন তখনই একশত টাকা গণিয়া দিল, এবং বাকি যে কয়-টাকা হিসাব করিয়া হইবে তাহা কল্য প্রাতে দিয়া যাইবে বলিল।

রামভজন ঘোড়া লইয়া মনের আনন্দে বাসায় চলিয়া গেল। বৈকাল বেলা পুত্র বোর্ডিং হইতে পিতার সহিত দেখা করিতে আসিল। সুন্দর ঘোড়া দেখিয়া তাহারও ভারি আনন্দ হইল। কত দাম হইয়াছে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিল, 'তুই আন্দাজ কর দেখি কত দাম হতে পারে?' পুত্র বলিল, 'পাঁচ-শোর তো কম নয়?' পিতা বলিল, 'অত নয়।' পুত্র বলিল, 'তবে চার-শোর কম হতেই পারে না।' পিতা বলিল, 'তোরা লেখাপড়া শিখে শহুরে বড়োলোক হচ্ছিস, এমনি করে সব টাকা ওড়াবি। আমি কি এত বোকা যে চার-শো টাকা দিয়ে একটা ঘোড়া কিনি। আমি খুব সস্তায় কিনেছি, লোকটা হয় বোকা নাহয় পাগল।' তাহার পর সওদাগরের সঙ্গে যেসব কথা হইয়াছিল এবং যে শর্তে ঘোড়া কিনিয়াছে সেসব পুত্রকে বলিল। তারপর বলিল, 'তুই তো ইশকুলে ঢের লেখাপড়া শিখেছিস, কত অঙ্ক কষিস আচ্ছা একবার কাগজ-কলম নিয়ে হিসেবটা কষে ফেল দেখি, দু-শো না তিন-শো কত হয় দেখ, কাল বাকি দামটা চুকিয়ে দিয়ে আসতে হবে।'



পুত্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সব শিখিয়াছে, কাগজ পেনসিল লইয়া হিসাব করিতে বসিয়া গেল। সে যতই অঙ্ক লিখিতেছে, ততই তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া যাইতেছে, কপাল দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। অবশেষে পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা তুমি সত্যি সত্যিই কি এই শর্তে ঘোড়া কিনেছে?' পিতা বলিল, 'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সত্যি না তো কি মিথ্যা বলেছি, এমন দাঁও কি ছাড়া যায়, লোকটা কী বোকা।' পুত্র বলিল, 'এ যে ষোলো হাজার টাকার উপর হয়ে গেল!' পিতা বলিল, 'বলিস কী রে? এক পয়সা, দুই পয়সা, চার পয়সা, আট পয়সা-এইরকম করে তো মোটে কুড়িটি পেরেকের পয়সা-অতটাকা কখনোই হতে পারে না, তোর হিসাব করতে ভুল হয়েছে, ভালো করে দেখ।' পুত্র তখন এক এক করিয়া কুড়িটা পেরেকের দাম লিখিয়া যোগ করিয়া কত পয়সা হইল এবং সে পয়সার কত টাকা হইল পিতাকে বুঝাইয়া দিল। ঘোড়ার দাম হইয়া গেল (১৬৩৮৩-১৫-৩) ষোলো হাজার তিনশত তিরাশি টাকা পনেরো আনা তিন পয়সা।

রামভজনের তো চক্ষুস্থির! বলিল, ‘সে পাঁচ-শো টাকায় ঘোড়া দিচ্ছিল আমি নিলাম না, আমার বোকামিতে এখন ১৬ হাজার টাকার উপর দিয়ে সেই ঘোড়াটা নেওয়ার লেখাপড়া করে দিয়ে এলাম। আমার জমিজমা ঘরদোর সব বেচলেও তো অত টাকা হবে না!' রামভজন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চিন্তায়, অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইল। পরদিবস সকাল বেলা ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সওদাগরের নিকট গিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সওদাগর লোকটি ছিল ভালো আর রসিক। সে হাসিয়া বলিল, ‘আচ্ছা বাবুজি, আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি, আমায় সেই পাঁচ-শো টাকাই দিন, লেখাপড়ার কাগজখানা ছিঁড়ে ফেলছি।' রামভজন তখন বাকি চার-শো টাকা দিয়ে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

*ভাদ্র ১৩২৩*




# সুকুমার রায়

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বললে, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুলসুদ্ধ সবাই হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসল। 'ডাকাতে ধরেছিল। বলিস কী রে?' ডাকাত না তো কী? বিকেল বেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময় ডাকাতেরা তাকে ধরে তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচকিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় বলে গেল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, নইলে দড়াম করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।' তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল; এমন সময় তার বড়োমামা এসে তার কান ধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন, 'রাস্তায় সং সেজে এয়ার্কি করা হচ্ছিল!' নবীনচাঁদ কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'আমি কী করব? আমায় ডাকাতে ধরেছিল-' শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, 'ফের জ্যাঠামি!' নবীনচাঁদ দেখলে মামার সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা-কারণ, সত্যিসত্যিই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, এ কথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত! সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল। স্কুলে এসে আমাদের কাছে বসতে-না-বসতেই সে দুঃখ একেবারে উথলিয়ে উঠল।

যাহোক, স্কুলে এসে তার দুঃখ বোধ হয় অনেকটা দূর হতে পেরেছিল কারণ, স্কুলের অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল, এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুসকুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে স্বীকার করেছিল। দু-একজন যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরোনো বলে সন্দেহ করেছিল, তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বলল, 'ওটা তো জুতোর ফোসকা', তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বলল, 'যাও তোমাদের কাছে আর কিচ্ছু বলব না!' কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই যে-যার ক্লাসে চলে গেলাম, এমন সময় দেখি পাগলা দাশু একগাল হাসি নিয়ে ক্লাসে ঢুকছে। আমরা বললাম, 'শুনেছিস? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল!' যেমন বলা, অমনি দাশরথি হঠাৎ হাত-পা ছেড়ে, বই-টই ফেলে, খ্যাঃ খ্যাঃ খ্যাঃ খ্যাঃ করে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের ওপর বসে পড়ল! পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিত হয়ে, একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরা তো অবাক! পণ্ডিতমশাই ক্লাসে এসেছেন, তখনও পুরোদমে হাসি চলছে। সবাই ভাবল, 'ছোঁড়াটা খেপে গেল নাকি?' যাহোক, খুব খানিকটা হুটোপাটির পর সে ঠান্ডা হয়ে বই-টই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। পণ্ডিতমশাই বললেন, 'ওরকম হাসছিলে কেন?' দাশু

নবীনচাঁদকে দেখিয়ে বলল, 'ওই ওকে দেখে।' পণ্ডিতমশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাসের কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। পাগলার তাতেও লজ্জা নেই, সে সারাটা ঘণ্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল, 'কী রে দেশো! বড়ো যে হাসতে শিখেছিস!' দাশু বলল, 'হাসব না? তুমি কাল ধুচুনি মাথায় দিয়ে কীরকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি? দেখলে বুঝতে কেমন মজা!' আমরা সবাই বললাম, 'সে কীরকম? ধুচনি মাথায় নাচছিল মানে?' দাশু বলল, 'তাও জান না? ওই কেষ্টা আর জগাই-ওই যা! বলতে-না বারণ করেছিল!' আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কী বলছিস ভালো করেই বল না?' দাশু বলল, 'কালকে শেঠেদের বাগানের পেছন দিয়ে নবু একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময়ে দুটো ছেলে-তাদের নাম বলতে বারণ-তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুচুনির মতো কী একটা চাপিয়ে তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচকিরি দিয়ে পালিয়ে গেল!' নবু ভয়ানক রেগে বলল, 'তুই তখন কী করছিলি?' দাশু বলল, 'তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত-পা ছুড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বললাম, ফের নড়বি তো দড়াম করে মাথা উড়িয়ে দেব। তাই শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে, তাই আমি তোমার বড়োমামাকে ডেকে আনলাম।' নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা, তেমনি তার দেমাক-সেইজন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না, তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলল, 'তবে যে নবীনদা বলছিল, তাকে ডাকাতে ধরেছে?' দাশু বলল, 'দূর বোকা! কেষ্টা কি ডাকাত?' বলতে-না-বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাসে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখামাত্র শিকারি বেড়ালের মতো ফুলে উঠল। কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিকক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল।



কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময়ে দেখি, নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হনহন করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ এনট্রান্স ক্লাসে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়ো, তাকে ওরকমভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম, এবার একটা কাণ্ড হবে। মোহন এসেই বলল, 'কেষ্টা কই?' কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ বলল, 'ওই দাশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞাসা করো।' মোহন বলল, 'কী হে ছোকরা, তুমি সব জান নাকি?' দাশু বলল, 'না সব আর জানব কোত্থেকে-এই তো সবে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল, বাংলা, জিয়োমেট্রি-' মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বলল, 'সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জান কি না?' দাশু বলল, 'ঠ্যাঙায়নি তো-মেরেছিল, খুব আস্তে মেরেছিল।' মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বলল, 'খুব আস্তে মেরেছে, না? কতখানি

আস্তে শুনি তো?' দাশু বলল, 'সে কিছুই না-ওরকম মারলে একটুও লাগে না।' মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বলল, 'তাই নাকি? কীরকম মারলে পরে লাগে?' দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তারপর বলল, 'ওই সেবার হেডমাস্টারমশাই তোমায় যেমন বেত মেরেছিলেন সেইরকম!' এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান মলে দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'দেখ বেয়াদব। ফের জ্যাঠামি করবি তো চাবকিয়ে লাল করে দেব। তুই সেখানে ছিলি কি না। আর কীরকম কী মেরেছিল সব খুলে বলবি কি না?'

জানই তো দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটে গোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল, ঘুসি, চড়, আঁচড়, কামড়, সে এমনি চটপট চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে ফোর্থ ক্লাসের একটা রোগা ছেলে তাকে অমনভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে-তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে চিতপাত করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।' এনট্রান্স ক্লাসের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেলত, তাহলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'হ্যাঁ রে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন?' কেষ্টা বলল, 'ওই দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ওরকম করতে। আর বলেছিল, 'তাহলে এক সের জিলিপি পাবি!' আমরা বললাম, 'কই আমাদের তো ভাগ দিলিনে?' কেষ্টা বলল, 'সেকথা আর বলিস কেন? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কিনা, আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস জিলিপি পাবি।'

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে?

*চৈত্র ১৩২৪*






# অসিতকুমার হালদার

এক গ্রামে এক গরিব বিধবা থাকত। তার একটিমাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি রাখালের কাজ করত, পাড়ার লোকের গোরু ছাগল চরাত, তাতেই যা কিছু পেত কোনো গতিকে তাদের অতি কষ্টে দিন কাটত।

এমন করে তো দিন যায়, একদিন রাখাল তার মাকে বলল, 'মা দেখো সকলের জায়গা-জমি আছে আর গোরু বলদ দিয়ে জমি চষে। আমাদের না আছে জমি না আছে গোরু বলদ। আমি বলি এক কাজ করলে হয় না? একটা কাঠের ছোটোখাটো লাঙল তৈরি করে, গাঁয়ের লোকেদের যে সব ছাগল চরাই তাদের জুতে চাষ করলে হয় না?' একথায় মায়ের মত পেয়ে খুশি হয়ে সে কোনো গতিকে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে সেই কাঠের একটা ছোট্ট লাঙল তৈরি করে, দুটো বেশ বড়ো বড়ো দেখে ছাগল বেছে নিয়ে, গ্রাম থেকে অনেক দূরে বনের ধারে একটা পতিত জায়গা খুঁজে বার করল-যার কোনো মালিক নেই; আর সেই জায়গায় লাঙল দিতে লেগে গেল।

এইরকম করে তো জমি তৈরি হল-এখন বীজ পায় কোথায়? কী করে? তখন গাঁয়ের চাষিরা ধান ঝাড়া হলে কুঁড়ো (পেটেগ-বাবা) গুলো ফেলে দিয়েছিল সেইগুলো সে কুড়িয়ে জড়ো করে জমিতে ছড়িয়ে দিল। কুঁড়ো থেকে কি কখনো গাছ হয়! কিন্তু কী আশ্চর্য! একদিন সে সেই বীজের খোসা থেকে সুন্দর চারা বেরোচ্ছে-তখন তার কী আনন্দ! তারপর দু-একবার বেশ ভালো করে বৃষ্টি হওয়াতে খেত ধানে একেবারে ভরে উঠল! তারপর দেখল ক্রমে ক্রমে ফল ধরতে আরম্ভ হয়েছে, দানা বাঁধতে (ডেম্বো) শুরু করেছে! তারপর আবার একদিন দেখল ফসলে সোনালি রং ধরেছে-এবার পাকবে। আর দু-একদিন গেলেই সে সেগুলো কেটে তুলবে মনে করল।

বেচারা তারপর একদিন সকালে খুব খুশি হয়ে ফসল কেটে আনবে বলে কাস্তে নিয়ে গেছে। গিয়ে দেখে-হায়! হায়! তার অত সাধের ফসল অত পরিশ্রমের ফল একদিনে একদল বুনো মোষে খেয়ে গেছে! বেচারা তো রাগে দুঃখে অস্থির। তক্ষুনি সে ঘরে মায়ের কাছে গেল। মাকে বলল, 'মা, আমাকে কিছু জনারের ময়দা (লুপু) আর চালভাজা দাও, আমি যেখানে পাব তির ধনুক দিয়ে মোষেদের মেরে তবে ছাড়ব-আমি তাদের না মেরে ফিরছি না।' মা আর কী করে! ছেলেকে খাবার জিনিস ঘরে যা ছিল তা দিল। সে তির ধনুক আর একটা একতারা নিয়ে মোষেদের পায়ের দাগ দেখে দেখে তাদের সন্ধান করতে চলল।

শেষে, যেতে যেতে গভীর বনে যেখানে জনমনিষ্যির যাতায়াত নেই এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়ল। সেখানে একদল বাচ্চা মোষ চরছে, আর সমস্ত জায়গাটা একেবারে তাদের গোবরে বিছিয়ে আছে। রাখাল করল কী, চুপি চুপি তাদের চোখের আড়ালে থেকে সেই

অপরিষ্কার জায়গাটা বেশ করে নিকিয়ে চুকিয়ে তকতকে ঝকঝকে করে রেখে কাছেই একটা বড়ো গাছের কোটরে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

যখন বিকেল হল, ধাড়ি মোষের পাল তাদের থাকবার জায়গায় ফিরে এল; তখন তারা সেখানটা হঠাৎ অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে অবাক হয়ে গেল! কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না কী করে এমন অসম্ভব সম্ভব হল। বাছুরদের জিজ্ঞাসা করল, 'কে এমন ঝেড়ে পুঁছে রেখেছে রে জানিস?' তারা কিছুই বলতে পারল না।

তার পরদিন তারা একটা ছোটো মাদি মোষকে চরতে যাবার সময় 'গোঠপিঠ' পাহারায় রেখে গেল-ব্যাপারটা ধরবার জন্যে। রাখাল খুব সাবধানে চালাকি করে যেই সেই মোষটা একটু অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি বেরিয়ে এসে, জায়গাটা নিকিয়ে চুকিয়ে তাড়াতাড়ি আবার আপনার কোটরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। তার পরদিন একটা মর্দা মোষ পাহারায় রইল কিন্তু তারও চোখে ধুলো দিয়ে রাখাল আপন কাজ সেরে নিল। অবশেষে কোনো গতিকে ধরবার উপায় না দেখে তারা এবার একচোখ-কানা মোষকে পাহারায় রেখে গেল। কানি তার কুতকুতে একটি চোখে রাখালের ব্যাপার ধরে ফেলল।

তখন, মোষেদের সর্দার রাখালকে ডেকে বলতে লাগল, 'কে তুমি? এমন লুকিয়ে থেকে আমাদের উপকার করছ? আমরা তোমায় কিছু বলব না, তুমি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এসো। গাঁয়ে যেমন রাখালে গোরু ছাগল চরায়, তেমনি তুমি আমাদের এখন থেকে দেখবে শুনবে নাওয়াবে ধোয়াবে। আমরা তোমাকে দুধ, মাখন খাওয়াব, বিপদে আপদেও সহায় হব।'

তখন রাখাল কোটর থেকে বেরিয়ে এল। আর তারপর থেকে সে তাদের রাখাল হয়ে মজা করে থাকতে লাগল। যখন দরকার হত তার একতারাটি বাজালেই মোষেরা যে যেখানেই থাক হাজার বাধা পড়লেও ছুটে দলে দলে তার সামনে এসে হাজির হত। তার যখন কাপড়ের দরকার, তখন সেই বনের কোনো পথ দিয়ে তাঁতিদের কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে যেতে দেখলেই অমনি তাদের ডাকত। তারপর, তাদের কাছে বেছে বেছে ভালো কাপড় নিত। পয়সা চাইলে বলত, 'দাঁড়াও, আমার লোক আসছে, তার কাছে চেয়ো।' অমনি 'বানাম' বাজিয়ে দিত আর দলে দলে শিং নাড়তে নাড়তে মোষের পাল সেখানে কোথা থেকে ছুটে আসত। তাঁতিরা ভয়ে কাপড়চোপড় যা কিছু ফেলে রেখে প্রাণভয়ে দে ছুট! এমনি করে প্রতি হাটে লোকজনদের কেনাবেচার যা সব জিনিস পেত দরকার বুঝে আদায় করত। এমনকী তার কুমোরের হাঁড়িকুড়িও সে সেই বনে বসে পেয়ে যেত।

রাখাল করত কী রোজ একটা ঝরনায় মোষেদের স্নান করাত আর নিজেও করত। একদিন কী হয়েছে, সে মাটি দিয়ে খুব ভালো করে মাথাটা লেপেছে, তারপর মোষেদের নিয়ে গেছে। মোষেদের চান হয়ে গেলে সে যেমন নিজে চান করবে, অমনি তার একটি মাথার লম্বা চুল খসে গেল। সেটা পাছে মাছেদের গায়ে জড়িয়ে পড়ে আর তাদের বিপদ ঘটায় তাই ভেবে সে একটা ডুমুর (লোয়াদারু) পেড়ে তারই ভিতরে সেই লম্বা চুলগাছটি পুরে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিল। ডুমুর ক্রমে ক্রমে ভাসতে ভাসতে যেখানে ঝরনাটা ক্রমে নদী হয়ে চওড়া হয়ে গেছে সেইখান দিয়ে দূরে চলে গেল।

একজায়গায় নদীতে এক রাজকন্যা তাঁর সখীদের সঙ্গে স্নান করছিলেন, হঠাৎ ডুমুরটা তাঁর গায়ে গিয়ে ঠেকল। তিনি সেটা তুলে দেখেন তার মধ্যে একটি চমৎকার লম্বা চুল রয়েছে। তিনি সেই চুল দেখেই একেবারে মুগ্ধ! প্রতিজ্ঞা করে বলেন, 'এই চুল যার মাথার, তাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।' ঘরে গিয়ে তিনি দুয়ার বন্ধ করে রইলেন- আহার নিদ্রা সব ছেড়ে দিলেন। রাজার ওই একটিমাত্র মেয়ে; তিনি সব ব্যাপার

জানতে পেরে তক্ষুনি নদীর ধারে ধারে যেখানে গিয়ে নদীটা আরম্ভ হয়েছে সেখান পর্যন্ত খুঁজবার জন্য জন পাঠালেন।



লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে যেখানে জংলি মোষগুলো থাকে সেই আড্ডায় গিয়ে পড়ল। তারপর তারা সেই লম্বা চুলওয়ালা রাখালকে দূর থেকে একটা মোষের পিঠে দেখতে পেল। কিন্তু বুনো মোষের পালের মধ্যে তার কাছে এগোতে কারও সাহসে কুলাল না। রাজার কাছে খবর যেতেই তিনি তো অনেক টাকাকড়ি বকশিশ দেবার লোভ দেখালেন কিন্তু তবু কেউ মোষের সামনে এগোল না। রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন।

এমন সময়, কোথা থেকে একটা সেকালের প্রকাণ্ড কাক রাজার কাছে উড়ে এসে বলল, ‘মহারাজ! কিছু ভাববেন না, হুজুরের হুকুম হলেই, আর পেট ভরে মিঠাই পেলেই, আমি এক্ষুনি তাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি।’ তারপর, রাজার হুকুমে খানিক ভোজন করে কাকটা উড়ে যেখানে রাখাল মোষেদের দলের মাঝে বসে আছে সেইখানে গেল। গিয়েই সে করল কী, ফস করে রাখালের ‘বানাম’ যন্ত্রটি ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে পালাল। রাখাল বেগতিক বুঝে তাকে ধরবার আশায় মোষের পিঠ থেকে নেমে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। ধূর্ত কাক মাঝে মাঝে একতারাটা পথের মাঝে ফেলে দিতে লাগল আর রাখাল যেই এগিয়ে গিয়ে কুড়োতে যাবে আবার অমনি ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে যেতে লাগল। এমনি করে ভুলিয়ে ভুলিয়ে কাক তাকে একেবারে পাহাড়, বন, মাঠ ছাড়িয়ে শহরের মধ্যে রাজার প্রাসাদের ভিতরে একেবারে সিপাই পাহারার মাঝখানে এনে ফেলল। সিপাইরা তাকে দেখেই একেবারে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

তারপর, রাজার কাছে রাখাল সব জানতে পেরে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে রাজি হল। কিন্তু বলল, তার বিয়ের আগে তার একটা বিশেষ দরকারি কাজ করতে হবে। সে প্রাসাদের প্রকাণ্ড উঠোনের এক পাশে একটি মাচা বাঁধতে বলল আর তার সামনে এক হাজার খুঁটিতে মোটা মোটা দড়ি বেঁধে পুঁতে রাখতে বলল। রাজার হুকুমে তার দরকারমতো সব তৈরি হয়ে গেল। তখন, রাখাল সেই উঁচু মাচার উপরে চড়ে সেই বানামটি (একতারা) খুব জোরে জোরে বাজাতে লাগল। আর দেখতে দেখতেই পাহাড় জঙ্গল থেকে দলে দলে বুনো মোষ এসে রাজার সেই প্রকাণ্ড উঠোন একেবারে ভরিয়ে তুলল। তখন রাখাল লোকজনদের বলল, ‘মোষগুলোকে খুঁটির দড়িতে ধাঁ ধাঁ করে বেঁধে ফেলো’। কতকগুলো মোষ সেই গোলমালে আর লোকজন দেখে ভয়ে আবার বনে পালিয়ে গেল। আর বাকি মোষগুলো সেই সব খুঁটির দড়িতে বাঁধা পড়ে গোরু ছাগলের মতো মানুষের পোষা হয়ে গেল। আর যারা বনে পালাল, তারা বুনো মোষ হয়েই থেকে গেল।

*(হো জাতির গল্প)*

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫




# মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এক দেশে মস্ত এক পণ্ডিত ছিলেন। পৃথিবীর যত ভাষা সব তিনি বুঝতেন। যতরকম বিদ্যে আছে সব তাঁর জানা ছিল। স্বর্গে-মর্তে-পাতালে, আকাশে-বাতাসে-জলে-আলোয়-আঁধারে যে কেউ আছে, যত কিছু, সকলকার খবর তাঁর নখদর্পণে। মানুষদের তো তিনি চিনতেনই। ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, যক্ষ-রক্ষ, কিন্নর-গন্ধর্ব এদের সকলকার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল। এত জিনিস তো মনে রাখা যায় না, কাজেই কালো সিন্ধুকের মতন মস্ত একখানা খাতা তৈরি করে এইসব খবর, এদের ঠিকানা, সাটে লিখে রাখতেন। তবু এত লিখতে হয়েছিল যে, এত বড়ো খাতাখানা সমস্ত ভরতি হয়ে গিয়েছিল। আকাশের মধ্যে কিংবা বাতাসের মধ্যে যারা আছে, তাদের কাউকে ডাকতে হলে, কিংবা কিছু খবর পাঠাতে হলে, কিংবা মন্তর-টন্তর পড়ে জাদু করবার দরকার হলে অন্ধকারে তিনি এই খাতা খুলতেন। নইলে আর সব সময় সেটা লোহার শিকলে-বাঁধা সোনার তালা চাবি বন্ধ থাকত-পাহাড়ের গুহার মতো ঘুটঘুটে একটা ছোট্ট চোরকুটুরির মধ্যে। তাঁর বিদ্যার বলে তিনি লোহাকে সোনা, মানুষকে ভেড়া করতে পারতেন, যখন খুশি ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবদের ডেকে সৃষ্টিছাড়া কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু কাউকে তিনি এ বিদ্যা শেখাতেন না। কত লোক তাঁর পায়ে ধরে সাধাসাধি করত, তবু তিনি এইসব বিদ্যার একটি ফোঁটাও কাউকে দিতেন না। পাছে কেউ খাতা থেকে তাঁর বিদ্যা চুরি করে নেয় এই ভয়ে খাতা কোথায় লুকোনো আছে তা অবধি কাউকে জানতে দিতেন না। জানত শুধু তাঁর আদরের চাকর খুদে।

পণ্ডিত যখন সেই অন্ধকার চোর-কুটুরির মধ্যে একা বসে নানারকম অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করতেন, তখন ওই খুদে সেই সব দেখে অবাক হয়ে যেত। সে ছিল ভারি গরিব। তার মনিব বড়ো বড়ো, কালো কালো লোহার চাঁইগুলোকে মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দেখতে দেখতে চকচকে সোনার চাঁই করে ফেলেন। দেখে তার ভারি লোভ হত। তার মনে হত, ওই মন্তর-পড়া জল যদি একটু পাই, তাহলে-উঃ কী হয়! কিন্তু কিছুতেই তার ভাগ্যে ওই জলের একটি ফোঁটাও জোটে না। যখনই সে জল-পড়ার বাটির খোঁজ করত, সে দেখত, বাটির গায়ে একটি ফোঁটাও জল নেই-সেটা যেন মরুভূমির মতো শুকনো, খটখটে। আর এমন তাপ যে তার গায়ে হাত দেওয়াই যায় না। তখন তার কেবল মনে হত, যদি ওই বইখানা একবার খোলা পাই, তাহলে লোহাকে সোনা করবার মন্তরটা বার করেনি। কিন্তু সে-বই লোহার শিকল দিয়ে এমন আষ্টেপিষ্টে বাঁধা যে, খোলে কার সাধ্য! আর তার চাবি মনিব ফুসমন্তরে যে কোথায় উড়িয়ে দিত, খোঁজই পাওয়া যেত না। কাজেই খুব ইচ্ছে হলেও খুদের লোহাকে সোনা করা হয়ে উঠল না। তার দিন যেমন দুঃখে যাচ্ছিল, তেমনি দুঃখে যেতে লাগল।

একদিন হল কী, না, খুদের মনিবঠাকুর তাড়াতাড়ি কী কাজে বেরিয়ে গেলেন। অন্যমনস্কে খাতার চাবি বন্ধ করা হল না-খোলাই পড়ে রইল। খুদে গিয়েছিল বাজারে। ফিরে এসে দেখে এই ব্যাপার। তার ভারি ফুর্তি! ছুটে খাতার কাছে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে তার পাতা ওলটাতে লাগল-কী জানি দেরি হলে যদি মনিব এসে পড়েন! কোথায় আছে সোনা করবার মন্তর, মহা ব্যস্ত হয়ে সে খুঁজতে লাগল। সোনা, সোনা, সোনা-পাতা উলটেই যাচ্ছে, কিন্তু কোনো পাতাতেই সোনার নাম-গন্ধও নেই-যা একটু আছে, কেবল অক্ষরের গায়ে সোনার কালিতে। খুঁজতে খুঁজতে যতই সময় যায়, ততই তার ছটফটানি বাড়ে। তার মনে হতে লাগল, যেন বহু কষ্টে অনেক পথ হেঁটে সে সোনার পাহাড়ের কাছে প্রায় এসে পড়েছে-কিন্তু এই বুঝি সব গেল ফসকে! এক-একবার যেই মনে হয় সিঁড়িতে ওই পায়ের শব্দ, অমনি তার বুকের রক্ত শুকিয়ে ওঠে-হায় হায়! হল না, হল না!

সে খুব তাড়াতাড়ি পাতা ওলটাতে লাগল। কিন্তু যতই উলটোয়, ততই যতসব বিদঘুটে কথা তার চোখে পড়ে। তার একটি কথাও সে জ্ঞানে শোনেনি। এমনি করে অনেক পাতা ওলটাবার পর হঠাৎ একজায়গায় থেমে তার মনে হল, 'এইবার বুঝি সোনার সন্ধান পেলুম।' পাতার মাথায় বড়ো বড়ো সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে-'ষর্ণশের্ণ'। সে শুনত, পণ্ডিতমশাই, সোনাকে স্বর্ণ বলতেন। মনের আনন্দে সে চিৎকার করে উঠল, 'ষর্ণশের্ণ! ষর্ণশের্ণ!' যেমন এই চিৎকার করা, অমনি বাড়ি কাঁপিয়ে অন্ধকার চোরকুঠুরির লোহার দরজা মড়মড় করে ভেঙে এক ভয়ংকর কালো মূর্তি খুদের সামনে এসে হাজির হল। খুদে তো দেখেই প্রায় অজ্ঞান! হাত থেকে খাতার খোলা পাতাগুলো খসে গেল। সেই ভয়ংকর মূর্তি কটমট করে চেয়ে বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠল, 'কী চাই? কেন আমায় ডাকলি?'



খুদে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'কখন তোমায় ডাকলুম?'

সেই ভীষণ মূর্তি দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল, 'জানিস, আমি দৈত্যরাজ ষর্ণশের্ণ! শিগগির বল, কী চাই?'

খুদে ভয়ে কিছুই বলতে পারল না।

দৈত্য আরও রেগে বলে উঠল, 'হুকুম দে বলছি, নইলে এখনই তোর গলা টিপে মেরে ফেলব!' খুদে ভাবল এ কীরকম হুকুম চাওয়া রে বাবা! সে এমন ভেবড়ে গেল যে, হুকুম দেবে কী, কিছু মনেই আনতে পারল না। দৈত্য আবার চিৎকার করে উঠল, 'হয় কাজ দে, নয় তোকে খেয়ে ফেলে আমার কাজ চুকিয়ে যাই!' বলতে বলতে তার লম্বা নখওয়ালা আঙুলগুলো খুদের গলার কাছে এগিয়ে নিয়ে এল। খুদের মনে হল, ব্যস

গেলুম এইবার! কথা বলতে গেল, কিন্তু গলা শুকিয়ে এমন কাঠ যে, একটি কথাও বার হল না। ভয়ে, তেষ্টায় তার প্রাণ ছটফট করতে লাগল। যখন দৈত্যের আঙুল তার টুঁটি চেপে ধরে ধরে, এমন সময় তার গলা ফেটে শব্দ উঠল, 'জল দাও-জল!'

হুকুম পেয়েই দৈত্য ছুটল জল আনতে। জলের পর জল-ঘড়া ঘড়া জল, জালা জালা জল ঘরের মধ্যে ঢালতে লাগল। দেখতে দেখতে জলে ঘর ভেসে গেল। একহাঁটু জল, এককোমর জল, একগলা জল-তখনও জল আনা বন্ধ হয় না। খুদে প্রাণের দায়ে হুকুম দিয়ে ফেলেছিল; কী করে হুকুম থামাতে হয় তা সে জানে না। কাজেই দৈত্যের জল আনাও থামল না। শেষে এত জল দাঁড়াল যে খুদে প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে এল। মনে মনে বলতে লাগল-হায়, হায়, কেন সোনার লোভ করলুম!

দেখতে দেখতে জল এসে খুদের নাকের ডগায় ঠেকল-দম বন্ধ হবার জোগাড়! ঠিক সেই সময় তার মনিব এলেন ফিরে। পথে যেতে যেতে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল-ওই যাঃ, খাতাখানা বন্ধ করতে ভুলে এসেছি-যাই বাড়ি। এসে দেখেন এই কাণ্ড-সমস্ত বাড়িটা জলে জলময়। প্রথমে তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। শেষে ধ্যানে বসে যখন সব জানতে পারলেন, তখুনি মন্ত্র পড়ে সব জল শুষে ফেলে দৈত্যকে তাড়িয়ে খুদের প্রাণ রক্ষা করলেন।

খুদে রক্ষা পেল বটে, কিন্তু পণ্ডিতের সেই অত কষ্টে লেখা মন্ত্রতন্ত্রের খাতাখানি জলে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। সেই দুঃখে পণ্ডিত যে কোথায় কোন বনে চলে গেলেন, কোনো খবরই পাওয়া গেল না। খুদের সোনার লোভও সেই বানের জলে ভেসে গিয়েছিল, সেও মনিবের সঙ্গে সঙ্গে বনে চলে গেল।

*আষাঢ় ১৩২৬*




# মাধুরীলতা রায়

তোমরা কি মাকড়সাকে ভয় পাও? আমি জানি ছোটো ছেলেরাই মাকড়সাকে ভয় করে। কিন্তু আমাদের 'নেড়ু' এত যে বুড়ো ঢেঁকি হয়েছে তবু তার মাকড়সার ভয় আর গেল না। যদি কোনো ঘরে একটা মাকড়সা দেখা যায়, তাহলে কার সাধ্যি নেড়ুকে সে ঘরে ঢোকায়। যতক্ষণ না সেই মাকড়সাকে একেবারে গুঁড়িয়ে ছাতু করা হবে ততক্ষণ নেড়ুর আর শান্তি নাই। যদি কেউ তার কানের কাছে এসে শুধু বলে 'মা-ক-ঈ' তাহলেই তো হয়েছে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে সে একেবারে হুলুস্থুল বাধিয়ে তুলবে। আর মাকড়সা বাবাজিও নেড়ুকে চিনে বসেছে। যত মাকড়সার গুষ্টি, আর মাকড়সার মামা খুড়ো মেসো পিসে, সব কি নেড়ুর উপর লাফিয়ে পড়ে? একবার নেড়ু এক বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছে। পোলাও মাংসে চর্ব্যে চোষ্যে পাতাখানা একেবারে ভরে গিয়েছে, নেড়ু তো জিভের জল সামলাতে পারে না। হাঁ করে সে হাত বাড়িয়ে যেমনি নাকি খেতে যাবে অমনি এক চিৎকার। পাশের লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, লোকজন সব দৌড়ে এসে নেড়ুকে তুলে জল দেয় বাতাস করে। একজন বলল, 'নিশ্চয় গলায় কাঁটা লেগেছে'-বলেই সে গলার মধ্যে আঙুল ঢোকাতে গেছে। তখন নেড়ু অনেক কষ্টে বলে উঠল, 'মা-মা-মাকড়সা-পোলাওয়ের পাশ দিয়ে একটা মাকড়সা হেঁটে গেল'। শুনে সবাই যত হাসে, অভিমানে নেড়ুর গাল ততই ফুলে ফুঁপিয়ে ওঠে।

ক্লাসের ছেলেরাও যখন-তখন নেড়ুকে জ্বালায়। একদিন নেড়ুর বন্ধু বুড়ো বলল, 'ভাই, আজ তোর জন্য এক কৌটো মশলা এনেছি, খাবি?' নেড়ু তো মহা খুশি। সে যেমন কৌটোখানি খুলেছে ওমনি কিলবিলিয়ে দুটো মাকড়সা তার গায়ের উপর লাফিয়ে পড়েছে। নেড়ু তো বেঞ্চি ডিঙিয়ে কালি উলটিয়ে বই ছিটিয়ে 'ফিট' হবার জোগাড় করে আর কি! মশলা খাওয়া তো চুলোয় গেল, লাভের মধ্যে কালি উলটানোর দরুণ এক ঘণ্টা কোণে দাঁড় খেতে হল।

সব চেয়ে মজা হয়েছে, একদিন তো নেড়ুবাবু স্নানের ঘরে স্নান করতে ঢুকেছেন, হঠাৎ তার হাউমাউ কান্না আর চিৎকারেতে ঘরদালান সব কেঁপে উঠল। পাশের উঠোনে কতকগুলি রাজমিস্ত্রি কাজ করছিল, তারা সব দৌড়ে এল, ঠাকুর রান্না চড়িয়েছিল, সে তো 'কঁড় হউছি' বলে রান্না ফেলে লাফিয়ে এল, বাড়ির লোকে সব তো হাজির হলই, বাইরের কয়েকটি ভদ্রলোকের নেমন্তন্ন ছিল, তাঁরা পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন।

সবাই বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী হয়েছে রে নেড়ু?' নেড়ুর আর কোনো কথাটি নাই, কেবল চিৎকার। নেড়ুর বড়ো দাদা ধমক দিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে কী, দরজাটা খোল না দেখি।' নেড়ু তখন বলে উঠল, 'দরজা খোলা যাচ্ছে না, দরজার ওপর মা-ক-ড়-সা।' দাদা বলল, 'মাকড়সা তো কী হয়েছে? তাড়িয়ে দে না।' নেড়ু বলল, 'ওই ওই-ওই আমার দিকে তাকিয়ে আছে! তুমি শিগগির একটা মই দিয়ে দরজার উপরের ফাঁক দিয়ে

ঢোকো।’ শেষটায় সত্যি সত্যি নেড়ুর দাদাকে তাই করতে হল। নেড়ুর মা তখন নেড়ুকে কত বকলেন, বললেন যে, ‘মাকড়সা তাকিয়ে থাকলে কী হয় বাপু?’ নেড়ু অনেকক্ষণ পরে বলল, ‘আমি দেখেছি মাকড়সা যার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তার হাত-পা কেমন অবশ হয়ে যেতে থাকে, শেষটায় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এরকম করে মাকড়সা মানুষকে ‘হিপনোটাইস’ করতে পারে, আমি যদি না চেঁচাতাম নিশ্চয় আমাকেও ‘হিপনোটাইস’ করে ফেলত।’

তোমরা ভাবছ এটা একটা গল্প। কিন্তু তা নয়, এর মধ্যে অনেকখানিই সত্যি। তবে যার কথা বলছি, তার নামটা অবশ্য নেড়ু নয়। তার নাম হচ্ছে-থাক, আর নাম করে দরকার নেই।

*শ্রাবণ* ১৩২৬






## পুষ্পলতা রায়

এক দেশে এক বেজায় ভালোমানুষ রাজা ছিলেন; তাঁর মেজাজ এত ভালো ছিল যে কখনো তিনি রাগ-টাগ করতেন না। প্রজারা তাঁকে খুব ভালোবাসত, কিন্তু কেউই মান্য করতে পারত না। কেন জান? তিনি আশ্চর্যরকম মোটা ছিলেন; এমন মোটা জন্মে কেউ দেখেনি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা পিপে ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন অদ্ভুত মজার চেহারা দেখে, দেশের লোকে হেসেই খুন হত। রাজা বেচারা যতই গম্ভীর চালে কথা বলবার চেষ্টা করতেন ততই তারা হাসত। কী বিপদ মোটা হয়ে! শোনা যায়, রাজা যখন মোটা হতে আরম্ভ করলেন, তখন লোকেরা অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখত। কিন্তু রাজার দেহ যতই ফুটবল হতে লাগল তাদের পক্ষে হাসি চাপাও ততই মুশকিল হল। শেষে এমন দাঁড়াল যে তাঁকে দেখলেই লোকে হো-হো করে হেসে গড়াগড়ি দিত। একবার ভেবে দেখো তো, দিনের পর দিন যদি লোকে তোমায় দেখলেই হাসে তবে তোমার কেমন লাগে! কিন্তু রাজা বেচারা এমন ভালোমানুষ ছিলেন যে, শান্তভাবে সব সহ্য করতেন।

মোটা রাজার দেশটি চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, তার মাঝে সবুজ মাঠ আর সুন্দর শহর। সবাই ভাবত কী সুন্দর দেশ; কিন্তু দেশের লোকের মনে শান্তি ছিল না। কারণ এই পাহাড়ের উপরেই একজন দুষ্টু দৈত্য থাকত; তার নাম 'হেঁড়ে-গর্জন'; তার খাওয়া দেখলে তাক লাগে! রাজার সব সৈন্য মিলে যত খেতে পারত এ একাই তত খেত! ভালোমানুষ রাজা বলতেন, 'বেচারার যখন অত বেশি খিদে তখন তো তার উপযুক্ত খাবার চাই। তোমাদের যদি এই দৈত্যের মতো বড়ো পেট হত তখন কী করতে বলো তো?' লোকেরা কিন্তু তাঁর কথায় খুশি হত না। তখন রাজা বাধ্য হয়ে দৈত্যকে বোঝাবার জন্য মন্ত্রীকে পাঠালেন। দৈত্য কিন্তু চটে গিয়ে মন্ত্রীকে এমন জোরে এক লাথি মারল যে মন্ত্রীমশায় একেবারে সোজা রাজধানীতে এসে পৌঁছোলেন। তখন আর রাজা কী করেন? সব পাত্রমিত্র নিয়ে কত রকমেরই পরামর্শ করতে বসলেন।

এদিকে, 'হেঁড়ে-গর্জন দৈত্য' ক্রমেই লোকেদের বাড়ির সব ছাগল গোরু খেয়ে শেষ করল। যখন সে দেশে তার খাবার জিনিস আর কিছু বাকি রইল না তখন বেচারা কষে কোমর বাঁধতে লাগল; কিন্তু তবু কি খিদে কমে! শেষে দৈত্য ভাবল, 'না! আর পারা যায় না! পেট তো গেল, কোমর এঁটে আর চলে না!' একদিন সত্যিই কোমরের বাঁধন ফেঁসে গেল। এইবার আর উপায় কী, এবার মানুষ ধরে খেতে হবে! দেশের লোকে তো এই খবর শুনে ভয়ে দলে দলে সব রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত। রাজা বললেন, 'দেশে ঢেঁড়া পিটিয়ে দাও, যে এই দৈত্যকে মারতে পারবে আমার অর্ধেক রাজ্য পাবে।' মন্ত্রীমশাইও তাই করলেন। কিছুদিন পর কিন্তু দেখা গেল যে অর্ধেক রাজ্য পাবার লোভেও কেউ দৈত্য মারতে গেল না। তখন রাজা ভাবলেন, 'তাই তো! কী করা যায়?

আর তো কোনো উপায় দেখি না! কথায় বলে, ‘(যদি) মনের মতো কাজটি চাও, নিজেই তাতে লেগে যাও।’ কাজেই আমারই দৈত্য মারতে যাওয়া উচিত।’ তারপর তিনি সকলকে ডেকে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন যে, তাদের রক্ষা করবার জন্য তিনি নিজেই যুদ্ধ করতে যাবেন। রাজামশাই খুব আস্তে আস্তে আর খুবই গম্ভীর গলায় কথাগুলি বলেছিলেন, কিন্তু তাহলেই বা কী? তাঁর কথা শেষ হতে না হতে সকলে এত জোরে হেসে উঠল যে, সে হাসির শব্দ দৈত্যের দেশের লোকেও শুনতে পেল! এদিকে, হাসির চোটে মন্ত্রীমশায়ের চোয়ালই ভেঙে গেল! রাজামশাই কিন্তু দমে যাবার পাত্র নন! হাসি থামতেই তিনি লড়াই করবার অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করতে হুকুম দিলেন। সবই ঠিক হল, কিন্তু এত মোটা রাজার উপযুক্ত ঘোড়া মেলে কোথায়? সে দেশে এমন কোনো ঘোড়া ছিল না যে রাজার ভার সইতে পারে। তারপর আর এক মুশকিল! রাজার মাপের বর্ম কই? যদি তৈরি করানো যায় তবে সেটা এত ভারী হবে যে, রাজামশাই তার ভারে চলতেই পারবেন না! তখন রাজামশাই বললেন, ‘আমার ঘোড়াও চাই না, বর্মও চাই না।’

তারপর খুব পুরোনো একটা পোশাক পরে আর নিজের ভালো তলোয়ারখানা নিয়ে সেইদিনই রাজামশাই হেঁটে রওনা হলেন। প্রজারা বিদায় দেবার জন্য দলে দলে এল। কিন্তু যখন তারা দেখল রাজামশায় কেমন করে তাঁর ছোটো গোদা গোদা পায়ে অত প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে, হাঁপিয়ে ঘেমে অস্থির হচ্ছেন তখন তাদের হাসি চাপাই দায় হল। রাজার কিন্তু ভারি দুঃখ হল; তাঁর চোখে জল এল। ক্রমে রাত হল। তখন রাজার বড়ো আনন্দ, কারণ ততক্ষণে লোকেরা নিজের নিজের বাড়ি ফিরেছে। পাহাড়ে খানিকটা চড়লেই দৈত্যের বাড়ি দেখা যায়। রাজামশাই ওইটুকু উঠে আর পারলেন না; থপ করে বসে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, ‘কী আপদ এত মোটা হয়ে!’

হঠাৎ সমস্ত পাহাড় কেঁপে উঠল; রাজামশাই উপরে চেয়ে দেখলেন হেঁড়ে গর্জন দৈত্য খাবার খুঁজতে নীচে আসছে। তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। ‘যাক বাঁচা গেল! আর কষ্ট করে উপরে যেতে হল না, দৈত্য নিজেই আসছে।’ দৈত্য কিন্তু তাঁকে দেখেই দু-পাটি দাঁত বার করে, হ্যাঃ-হ্যাঃ করে বিকট হাসতে হাসতে বলল, ‘উঃ ! কী মোটাই তুমি! তোমার চেহারা দেখে যে আমি হেসেই ফেটে মরব দেখছি!’

রাজা বললেন, ‘আমি তো তোমাকে মারতেই এসেছি, এখন তোমার যেমন খুশি মরতে পার।’

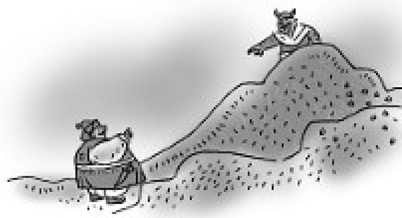
দৈত্য বলল, ‘তাই যদি হয়, তবে তো হাসি থামাতেই হয়।’ বলে সে ভক ভক করে এমন জোরে হেসে উঠল যে ঠিক যেন মেঘ ডাকছে। দৈত্য তো আর রাজামশাইয়ের প্রজা নয়; তার হাসি কেন তিনি সহ্য করবেন? রেগে তলোয়ার বের করে বললেন, ‘চুপ করো!’ দৈত্যের তখন হাসতে হাসতে চোখে জল এসেছে; সে বলল, ‘আর পারি না, দোহাই তোমার!’

রাজা বেজায় চটে বললেন, ‘শিগগির থামো, তা না হলে কী করে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।’

হেঁড়ে গর্জন বলল, ‘আমি যখন হাসি চাপতে পারছি না তখন তোমার সঙ্গে লড়াই করি কী করে?’ বলতে বলতেই তার ভয়ানক বিষম লাগল। রাজা আর কী করেন? তিনি বললেন, ‘আচ্ছা এখন থাক’; বলে তলোয়ারখানা খাপে ভরে রাখলেন। হেঁড়ে গর্জন বলল, ‘এখন চলো। আজ রাত্রের জন্য তুমি আমার অতিথি; কাল সকালে লড়াই হবে এখন।’

তখন দু-জনে উপরে উঠতে লাগলেন। দৈত্যের তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরেছে, রাজামশাইও অনেক কষ্টে পাহাড় বেয়ে উঠলেন। উপরে উঠে দৈত্য বলল, 'ওই যা! বাড়িতে কিছু খাবার নেই; এখন তোমায় খেতে দিই কী? আমার বড়ো খিদে পেয়েছিল, তাই মনে করেছিলাম নীচে গিয়ে ৫-৬টা ছেলে ধরে আনি; তা আর হল না।'

রাজা তো আর তা খাবেন না। তিনি বললেন, 'আর কাজ নেই; আমার খিদে পায়নি। একটু শোবার জায়গা দাও, বড়ো ক্লান্ত হয়েছি।' দৈত্য একজন চাকরকে ডেকে রাজামশাইকে শোবার ঘরে নিয়ে যেতে বলল। তার ২১ জন চাকর, কদাকার কাঠির মতো হাত-পা আর বড়োই অদ্ভুত চেহারা; গায়ের মাংস ঝুলে পড়েছে, চোখ যেন কপাল থেকে বেরিয়ে আসছে। রাজামশাই চাকরের সঙ্গে শোবার ঘরে গিয়ে দেখেন খালি একটা খাট পাতা আছে তাতে গদি তোশক কিছুই নাই। শক্ত বিছানায় শুতে রাজামশাইয়ের বড়ো অসুবিধা লাগল কিন্তু বড়ো ক্লান্ত হয়েছিলেন বলে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন।



দৈত্য কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না। কেন জান? তার যে বড্ড খিদে পেয়েছে! বেচারা বার বার এঁটে কোমর বাঁধছে, যদি পেটের জায়গা একটু কমে! কিন্তু যখন আর কিছুতেই থাকতে পারল না তখন মনে মনে ভাবল, 'রাজার গায় কী চমৎকার নরম মাংস! কাল তো তাকে হারিয়ে তার মাংস খাবই; তার চেয়ে আজই কেন খেয়ে ফেলি না?'

পরে আবার ভাবল, 'থাক, আজ রাজা আমার অতিথি, কাল দেখা যাবে।'

হ্যাংলা দৈত্য কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না, একটা ছোরা হাতে নিয়ে সে আস্তে আস্তে উপরের ঘরে গেল। রাজার খাটের কাছে গিয়ে দেখে চাঁদের আলো রাজার মুখের উপর পড়েছে; রাজামশাই দৈত্যের প্রকাণ্ড লেপটা গায়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ঠিক যেন, এয়া প্রকাণ্ড এক গোল তাকিয়া! এমন মজার চেহারা দেখে দৈত্য কিছুতেই হাসি চাপতে পারল না; সে হ্যা-হ্যা-হ্যা-করে হেসে উঠল। রাজামশাই 'বাজ পড়ল' মনে করে হঠাৎ ভয়ানক চমকে জেগে গেলেন। দৈত্যের হাতের ছোরাখানা চকচক করছে দেখে তিনিও তাড়াতাড়ি নিজের তলোয়ারখানা বের করে ভয়ানক রেগে বললেন, 'কাপুরুষ! ঘুমন্ত লোককে মারতে এসেছিস!' দৈত্যের কিন্তু ততক্ষণে হাসির চোটে পেট ফাটার জোগাড়; তাই সে পেট চেপে দৌড়ে রাজার ঘর থেকে পালাল। রাজা তো দৈত্যের কাণ্ড দেখে অবাক হলেন, কিন্তু তাঁর বড্ডই ঘুম পাচ্ছিল তাই আবার পাশ ফিরে ঘুমোলেন। চোখ বুজতে না বুজতেই এক বিকট চিৎকারে আবার তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। রাজা ভাবলেন, 'দূর ছাই! এ আবার কী হল!' তারপর উঠে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে কোথায় গোলমাল হচ্ছে দেখতে গেলেন। এসে দেখেন কী, দৈত্য তো পা মচকে সিঁড়ির নীচে পড়ে বেজায় চেঁচাচ্ছে, 'এবার গেলাম রে, একেবারেই গেলাম! কে আছিস বাঁচা।'

দৈত্যের ২১টি চাকর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তার হাত-পা ছোড়া দেখে কেউ আর কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। ওই লম্বা লম্বা পায়ের এক লাথি খেলেই বেচারাদের কাঠির মতো শরীর চুরমার হয়ে যাবে।

রাজার বড়ো ঘুম পেয়েছে। কী করে দৈত্যের এই ভয়ানক চিৎকার আর ভীষণ লাথি থামানো যায় কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। শেষে হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি জোগাল। তিনি শুনেছিলেন যে ঘোড়া যখন পড়ে যায় তখন লোকে তার মাথার উপর চেপে বসে; কিন্তু ঘোড়ার যে তাতে কী উপকার হয় তা তিনি কিছুই জানেন না। 'তবু একবার বসেই দেখি না যদি চুপ করে' এই না ভেবে রাজামশাই সাবধানে দৈত্যের কাছে গেলেন। যদি একবার তার হাত কিংবা পায়ের কাছে পড়েন তাহলেই তো সর্বনাশ! তাই তড়াক করে একেবারে এক লাফে গিয়ে তার মাথার উপরেই চেপে বসে পড়লেন;-আর তক্ষুনি দৈত্যের চেঁচানো থেমে গেল। হাত-পা কিন্তু আরও জোরে ছুড়তে লাগল। রাজা চাকরদের বললেন, 'এইবার ঠিক হয়েছে! যতক্ষণ না ওর হাত-পা ছোড়া বন্ধ হয় ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকব। তোমরা ওর পায় ভালো করে পট্টি বেঁধে দাও।'

ঘণ্টা দুই পর যখন দৈত্যের হাত-পা নাড়া থেমে গেল, তখন রাজামশাই উঠে, উপরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন; ভাবলেন, 'এবার চাকরগুলো মনিবের দেখাশোনা করুক।'

ভোর বেলা জাগতেই রাজামশাই ভয়ানক কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পেলেন! তিনি মনে করলেন, 'কী গোলমালের জায়গাই এটা! সারারাত ঘুমাতে তো দিলই না! এখন দেখি গিয়ে দৈত্য আজ লড়াই করতে পারবে কি না; তার পা না জানি কেমন আছে!' তার পর নীচে গিয়ে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। চাকরেরা কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বলল যে, রাত্রে তিনি যখন দৈত্যের মাথার উপর থেকে উঠলেন তখনই তারা দেখল যে সে মরে গিয়েছে।

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি! আমি তো তাকে এভাবে মারতে চাইনি। আমরা ঠিক করেছিলাম যে আজ সকালে লড়াই হবে। তবু যাক, মরে যখন গেছে, আমি খুব খুশিই হয়েছি, কারণ চোরের মতো কাল রাত্রে আমায় খুন করতে যাওয়াটা তার ভালো কাজ হয়নি।' এই বলে তিনি চাকরদের বিদায় দিলেন। তারা সব বাড়ি চলে গেল। তারপর নিজের দেশে রওয়ানা হলেন আর ভাবলেন, 'এবার তো আর পাহাড়ে ওঠা নয়, এবার নামতে হবে-তবু ভালো!' এই ভেবে যেই না পা বাড়িয়েছেন, অমনি পা পিছলে একেবারে গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের তলায় এসে পৌঁছোলেন।

এদিকে রাজার সৈন্যেরা রাজামশাইয়ের খবর নিতে পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছেছে। তাঁকে এ অবস্থায় গড়াতে দেখে তারা চমকে উঠল! রাজা হাঁপাতে হাঁপাতে শুধু বললেন, 'দৈত্য মরেছে!'

বুঝতেই পারছ এ কথা শুনে রাজার লোকেরা কত খুশি হল! তাদের এত আনন্দ হল যে, তারা রাজাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু এত ভার বইতে না পেরে শেষটায় গাড়িতেই নিয়ে চলল। ভীড় যা হল তা বলবার নয়। দেশের সব লোকে এই খবর শুনে ছুটে এসেছে। তার পর বহু দিন ধরে ঘরে ঘরে আমোদ আহ্লাদ চলল। সকলেই বলল, 'আমাদের রাজা কী বীরপুরুষ!'

আর কখনো তারা রাজাকে দেখে হাসত না। যখনই হাসি পেত, তারা ভাবত হোক না মোটা, হেঁড়ে গর্জন দৈত্যকে যিনি মারতে পারলেন তাঁর মতো বীরপুরুষ আর কে আছে? তাঁকে দেখে হাসা কখনোই উচিত নয়।

মাঘ ১৩২৭




# কুলদারঞ্জন রায়

এক দেশে ভারি চালাক আর দেখতেও বেশ সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। গ্রামের দুটি ছেলের ইচ্ছা হল এই মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েটি দু-জনকেই কথা দিয়েছিল, বিয়ে করবে বলে। ছেলে দু-টি কেউ কাউকে চিনত না আর এটা জানত না যে দু-জনে একই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এই দুষ্টু মেয়ের কাছে দু-জনে দুই বিদ্যা শেখে, একজন হল চোর, চুরি করে খায়-আর একজন হল ঠগ, লোককে ঠকিয়ে পয়সা উপার্জন করে।

একদিন চোর কতকগুলি চোরাই মাল এক দোকানির কাছে বিক্রি করে ঢের টাকা নিয়ে সেই মেয়েকে দিল। খানিক বাদে সেই ঠগ গিয়ে দোকানিকে ধরেছে-'এ সব জিনিস তুমি কোথায় পেলে? এ সব আমার বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে-নিশ্চয় তুমি চুরি করেছ।' দোকানি তো রেগে আগুন, 'বটে! আমি কখনোই চুরি করিনি, এগুলো আমি একজনের কাছ থেকে কিনেছি। সে লোক যদি চুরি করে থাকে, তবে আমি তার কী জানি-তাকে গিয়ে খুঁজে বার করো।' এইরূপ গোলমালে, ক্রমে সেখানে ঢের লোক জড়ো হল। চোর ভাবল, 'মাটি করেছে, এখন তো খুঁজে খুঁজে আমাকে ধরে ফেলবে!' এই ভেবে সে সেই মেয়ের কাছে গিয়ে সব কথা বললে পর, মেয়ে বলল, 'তাই তো এ তো ভারি মুশকিল হল। এক কাজ করো, কিছুদিনের জন্য এখান থেকে সরে পড়ো।' এই বলে, আধখানা রুটি আর ভাজা ভেড়ার লেজের অর্ধেকটা কেটে একটা পুঁটলি বানিয়ে তাকে দিল। তাই নিয়ে চোর তখনই চম্পট।

খানিক বাদে ঠগ এসে উপস্থিত। বলল, 'আর তো চালাকি খাটছে না, এবারে দেখছি ধরা পড়তে হবে। এখন কিছু খাবার দাও, নিয়ে এখান থেকে পালাই। তারপর গোলমাল মিটে গেলে, নাহয়, আবার ফিরে আসা যাবে।' তখন মেয়ে, ভেড়ার লেজের আর রুটির বাকি অর্ধেক একটা পোঁটলা বেঁধে দিলে পর, ঠগ আর সেখানে এক মুহূর্তও দেরি করল না।

এদিকে চোর চলতে চলতে ভারি কাহিল হয়ে একটা নদীর ধারে বসে পোঁটলা খুলেছে, খাবে বলে। এমন সময় ঠগও এসে উপস্থিত আর এসেই সেও তার পোঁটলা খুলেছে। দু-জনে মুখোমুখি হয়ে খেতে বসেছে, এমন সময় তারা দেখল যে, দু-জনের খাবার ঠিক একইরকম। শুধু তাই নয়, রুটি আর লেজের আলাদা আলাদা টুকরো জুড়ে দেখল, হুবহু একটা গোটা লেজ আর একটা গোটা রুটি হয়েছে! দেখে তো তারা অবাক! ঠগ চোরকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই! তুমি কোথা থেকে আসছ?' 'অমুক শহর থেকে আসছি।' 'কোন রাস্তায় তোমার বাড়ি?' 'অমুক রাস্তায় একজন স্ত্রীলোক থাকে, তার বাড়ি থেকে আমি আসছি। সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।'

একথা শুনে ঠগের তো চক্ষুস্থির! বলল, 'ওই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যে, বছর খানেক থেকে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে-তুমি মিছে কথা বলছ কেন?' চোর বলল, 'বটে! আমি মিছে

কথা বলছি না, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে-তোমার ঢের আগে থেকে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক। বিশ্বাস না হয়, চলো তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবে।' তখন ঠগ আর চোর দু-জনে ফিরে চলল সেই মেয়ের কাছে।

মেয়ে ভারি চালাক, ঠগ আর চোর একসঙ্গে ফিরে আসছে দেখেই বুঝতে পারল, ব্যাপারটা কী। যাহোক, তারা এসে প্রশ্ন করবামাত্র সে বলল, 'তোমাদের দু-জনের কথাই ঠিক, দু-জনকেই বলেছিলাম বিয়ে করব। কিন্তু এখন আমি তাকেই বিয়ে করব, যে বেশি চালাক। তোমাদের দু-জনকে দুই বিদ্যা শিখিয়েছি-এখন যার বিদ্যায় বেশি বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে, যে আমাকে খুশি করতে পারবে, সেই-ই হবে আমার স্বামী।' এ কথায় ঠগ আর চোর দু-জনেই খুশি হয়ে রাজি হল। তখন ঠগ চোরকে বলল, 'আজ, তাহলে, আমি আমার বিদ্যার পরিচয় দিব আর কাল দিবে তুমি।'এই স্থির করে, তারা দু-জনেই চলল বাজারের দিকে।

বাজারে এসে ঠগ দেখল যে, একজন লোক, তার ব্যাগে এক হাজার মোহর পুরে, ব্যাগটা বুকের পকেটে রেখে দিল। অমনি সে চলল, সেই লোকের পিছনে পিছনে। খানিক দূর গিয়ে, ভিড়ের চাপের মধ্যে, ঠগ চট করে লোকটার বুক-পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়েছে! তারপর, একটু নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে, করেছে কী, নয়টা মোহর ব্যাগ থেকে বার করে, তার নাম লেখা আংটিটা ব্যাগে রেখে দিল। এবং ফিরে গিয়ে, ব্যাগটা আবার সেই লোকের বুক-পকেটে রাখল-কেউ কিন্তু এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানতে পারল না। কিন্তু তাহলেও, একজন লোক সবই দেখতে পেয়েছিল-সে সেই চোর।

ঠগ ব্যাগটি রেখেই সরে পড়ল, আবার খানিক বাদে ফিরে এসে চট করে গিয়ে সেই ব্যাগওয়ালার ঘাড় টিপে ধরেছে! ধরেই চিৎকার, 'হতভাগা, পাজি! আমার মোহরের থলেটি চুরি করেছিস!' লোকটি তো অবাক! বুঝতেই পারল না, তার কী অপরাধ! বলল, 'বাপু হে, সরে পড়ো। বেশি চালাকি করছ কেন, যাও আমি তোমাকে চিনিও না।' ঠগ বলল, 'আমাকে চিনবার কিছু দরকার নাই-চলো, কাজির কাছে।' তখন আর উপায় কী, দু-জনে কাজির কাছে গিয়ে উপস্থিত। বিচারক কাজি দু- জনের কথা শুনে, লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ব্যাগে কত মোহর ছিল?' 'এক হাজার মোহর।' ঠগকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কত মোহর চুরি গিয়েছে, বলছ?' 'আজ্ঞে হুজুর, নয়-শো একানব্বইটা মোহর আর আমার নাম লেখা আংটিটাও ব্যাগের মধ্যে আছে।' তখন কাজি সাহেব গুণে দেখলেন-ব্যাগের মধ্যে সত্যি সত্যি নয়-শো একানব্বইটা মোহর, তা ছাড়া, সেই আংটিটাও রয়েছে। বেচারি ব্যাগওয়ালা খেল বেদম প্রহার! আর ঠগ মোহরের থলে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

পরদিন রাত্রে চোর করল কী, এক গাছা মোটা দড়ি নিয়ে, ঠগকে সঙ্গে করে, সেই দেশের বাদশাহের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত। তখন রাত হয়েছে ঢের, সব নিঝুম। চোর দড়িটা পাঁচিলের উপর দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল, কীসে জানি সেটা বেশ করে আটকে গেল। তারপর দড়ি বেয়ে প্রথম উঠল চোর, তার পিছনে উঠল ঠগ। এই করে তো তারা প্রাসাদের ভিতরে গেল। চোরের সঙ্গে ছিল নানা রকমের চাবি, সেই চাবি দিয়ে খাজাঞ্চিখানা (ধনাগার) খুলতে আর কতক্ষণ লাগে। খুলেই ঠগকে বলল, 'যত পার মোহর বোঝাই করে লও।' সে নিজেও রাশি রাশি মোহর থলে বোঝাই করে পিঠে নিয়ে চলল। পথে হাঁস-মুরগির ঘর দেখে চোর করল কী, একটা হাঁস মেরে, আগুন জ্বেলে, তাতে সেটাকে পোড়াবার ব্যবস্থা করল। আর ঠগকে বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো,

হাঁসটাকে উলটে দিয়ো-দেখো, যেন পুড়ে না যায়।' এই বলে, চোর ফিরে বাদশার ঘরে চলল।

চোরকে আবার বাড়ির ভিতরে যেতে দেখে, ঠগ মহা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে যাচ্ছ কোথায়! ফিরে এসো।' চোর বলল, 'যাচ্ছি বাদশার কাছে! যা বুদ্ধি খেলিয়েছি আজ, বাদশাকে না বললে কি চলে! সব বলে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করব-ওই মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে, না আমি করব।' একথা শুনে ঠগের তো চক্ষুস্থির বলল, 'দোহাই ভগবানের! তুমি ভিতরে যেয়ো না, চলো, শিগগির এখান থেকে পালিয়ে যাই। আমি মেয়ের আশা ছাড়লাম, তুমি মনের সুখে তাকে বিয়ে করো গিয়ে।' চোর বলল, 'তা হবে না ভাই। এখন ঠেলায় পড়ে বলছ বটে, 'তুমি মেয়েকে বিয়ে করো' কিন্তু কালই আবার মতটি বদলে ফেলবে। তাই আমি বাদশার কাছে যাচ্ছি, সব কথা শুনে তিনি যা ঠিক করে দেবেন, তুমি তা না মেনে যাবে কোথায়?'

এই বলে তো চোর চুপিচুপি বাদশার ঘরে উপস্থিত। এক কোণে লুকিয়ে থেকে দেখল, বাদশা ঘুমাচ্ছেন আর একটা চাকর তাঁর পা টিপছে আর একটা কিশমিশ চিবাচ্ছে। দেখেই, চোরের মাথায় খেয়াল হল যে, চাকরের মুখ থেকে কিশমিশ চুরি করবে। মেঝেতে ঘোড়ার লেজের একটা চুল পড়েছিল; চোর সেটা তুলে নিল। চাকরটার পেয়েছিল বেজায় ঘুম, ঢুলে পড়ছে আর মাঝে মাঝে এই বড়ো এক-একটা হাই তুলছে। চোর সেই চুলটার একটা মাথা চাকরের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিতেই কিশমিশের সঙ্গে সেটা গিয়েছে এঁটে। তারপর আর একটা হাই তুলবার সময়, চোর সেই চুল ধরে টেনে কিশমিশটাকে চট করে বার করে এনেই নিজের মুখে ফেলে দিল! এইসময় চাকর একটু সজাগ মতো হয়েছিল বলে, বুঝতে পারল যে, মুখে কিশমিশ নাই। মেঝেতে এদিক-সেদিক চেয়ে কোথাও সেটা দেখতে পেল না। ততক্ষণে সে একেবারে রীতিমতো ঘুমিয়েই পড়ল। এই সুযোগে চোরও এসে, ভারি কড়া কী একটা আরকের শিশি তার নাকে ধরতেই সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে একেবারে চিতপাত। তখন চোর, চাকরটাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে পুরে, সেই ঝুড়িটা জানলার বাইরে ঝুলিয়ে রেখে, বাদশার পা টিপতে লেগেছে। (ঠগ চুপিচুপি চোরের পিছনে পিছনে এসেছিল আর বাইরে থেকে এসব দেখছিল!)



চোর খানিকক্ষণ পা টিপলে পর, বাদশা একবার যেই একটু নড়ে উঠেছেন, অমনি সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'হুজুর, খোদাবন্দ! একটা গল্প বলব, শুনবেন?' 'হাঁ, বলো।' তখন চোর, তার আর ঠগের সব কথা বলল। (আবার দরজার দিকে চেয়ে ঠগকেও

তিরস্কার না করে ছাড়ল না, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? যাও না, হাঁসটাকে গিয়ে উলটে দাও-পুড়ে যাবে যে!') তারপর বাদশাকে আবার খাজাঞ্চিখানার চুরির কথা, চাকরের মুখ থেকে কিশমিশ চুরির কথা-সব না বলে ছাড়ল না! (ততক্ষণ দরজার বাইরে থেকে ঠগ ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে আর বলছে-'শিগগির বেরিয়ে এসো, চলো পালাই।' তার উত্তরে চোর সেই একই কথা- 'যাও, হাঁস উলটে দাও গিয়ে।') চোর সব কথা বলে বাদশাকে জিজ্ঞাসা করল-'হুজুর! কার বুদ্ধি বেশি-চোরে না ঠগের? এখন মেয়ে কাকে বিয়ে করবে?' বাদশা ঘুমের ঘোরেই উত্তর দিলেন, 'চোরেরই বাহাদুরি বেশি, মেয়েকে চোরই বিয়ে করবে।'

আরও খানিকক্ষণ পা টিপলে পর বাদশা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। তখন চোর পা টিপে টিপে বাইরে এসেই ঠগকে বলল-'বাদশা কি বললেন শুনলে তো?' ঠগ বলল, 'হাঁ হাঁ সব শুনেছি-মেয়ে তোমারই, শুধু মেয়ে তোমারই নয়, আমিও চিরকাল তোমার চেলা বনে থাকব। এখন চলো ভাই, শিগগির এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি নইলে ভয়ে আমি মরেই যাব।' দুইজনে বেরিয়ে সব টাকাকড়ি নিয়ে, একেবারে সেই মেয়ের বাড়িতে হাজির। মেয়ে সব কথা শুনে এমনই খুশি হল যে, চোরকে তখনই বিয়ে করল।

এদিকে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে পর, বাদশা শুয়ে শুয়ে চাকরকে ডাকছেন। কে সাড়া দেবে? কোথায় চাকর! বার বার ডেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বাদশা রেগে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তখন দেখেন যে, জানলায় একটা দড়ি বাঁধা রয়েছে। ব্যাপার কী? চেয়ে দেখলেন-জানলা থেকে একটা ঝুড়ি ঝুলছে আর তার মধ্যে তাঁর চাকর অজ্ঞান অবস্থায় গুড়ি মেরে পড়ে আছে। এই দেখে ডাকহাঁক করতে লাগলেন আর দেখতে দেখতে অন্য সব চাকর এসে উপস্থিত। তারা তো অনেক চেষ্টা করে, ঝুড়ির চাকরকে সজ্ঞান করল, তারপর ব্যাপার কী তাকে জিজ্ঞাসা করা হল বটে, কিন্তু সে বেচারি কিছুই বলতে পারল না। তখন বাদশার একটু একটু করে মনে পড়ল-রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে চোরের কাছে একটা গল্প শুনেছিলেন।

বাদশা তখন সভায় গিয়ে বসলেন; উজির, নাজির, পাত্র, মিত্র সবাই হাজির। তখন রাত্রের ঘটনা সকলকে বলে, বললেন, 'এই চোরকে খুঁজে বের করতেই হবে। ঢোল পিটিয়ে দাও- চোরের কিছু ভয় নাই, তাকে আমি অভয় দিলাম। সে আমার কাছে এসে, সব কথা বলুক। আমি আল্লার নামে শপথ করছি-তাকে কোনো সাজা দিব না। টাকাপয়সা আমার যা নিয়েছে, সবই তার; তা ছাড়া, তাকে আমি আরও অনেক বকশিশ দিব।'

বাদশার হুকুমে শহরময় ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হল। চোরও সব শুনল আর বাদশার প্রতিজ্ঞার উপর ভরসা করে, একেবারে সভায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল, 'দোহাই হুজুরের! আমিই সেই চোর। এখন আমাকে মারুন, কাটুন, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।'

তখন চোরের কাছে বাদশা আগাগোড়া সব কথাই শুনলেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুললেন না, আর, চোরের বুদ্ধি দেখে খুশিও হলেন। তারপর চোরকে কত যে বকশিশ দিলেন, তার সীমা নাই। চোরও তখন প্রতিজ্ঞা করল যে, আর সে কোনোদিন চুরি করবে না।

*(তুরস্কের উপকথা)*

*আশ্বিন ১৩২৮*




# সুখলতা রাও

একটি মেয়ে আছে তার নাম হচ্ছে ননু। আর তার দুই বন্ধু আছে, তাদের নাম হচ্ছে আলি আর ভুলি। কিন্তু তার সেই আলি আর ভুলি বন্ধুদের আজ পর্যন্ত আমরা কেউ দেখিনি। সে যখন একলা বসে খেলা করে, বকর বকর করে কত কথাই বলে। যদি জিজ্ঞাসা কর, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস?' বলবে, 'আলি ভুলির সঙ্গে।' খাবার সময়ে তাকে ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না, যদি বল, 'কোথায় গিয়েছিলি?' বলবে, 'আলি ভুলির দেশে গিয়েছিলাম, তাদের সঙ্গে খেলা করতে করতে দেরি হয়ে গেল।' একদিন সে আমাকে বলল, 'দেখো, ওই যে ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা দেখা যাচ্ছে, ওইখান দিয়ে, ওই ছোট্ট টিপি পার হয়ে, ওই গাছের পিছন দিয়ে আলি ভুলির দেশে যেতে হয়।' তাদের দেশে নাকি কুড়িতলা, পঁচিশতলা বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে কত আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস আছে। আলি ভুলি যখন-তখন এসে ননুকে তাদের দেশে ডেকে নিয়ে যায়। ভাত খেতে খেতে যদি আলি ভুলি আসে ননু ভাত খাওয়া ভুলে তাদের সঙ্গে চলে যায়। আমরা দেখি সে ভাতের গ্রাস হাতে নিয়ে কোন দিকে চেয়ে বসে আছে। কাজেই বুঝতে পার এই আলি ভুলি বড়ো সর্বনেশে বন্ধু। তোমরা যেন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ো না। আলি ভুলির দেশ থেকে একদিন ননুর নিমন্ত্রণ এল–

উকুনে বুড়ির বিয়ে হবে পায়েস হবে বেশ
উকুনে বুড়ির মাটির কড়া, পায়েস হবে তাতে ভরা
পাড়ার লোকে পায়েস খাবে, পায়েস হবে শেষ।

তখন সন্ধ্যে বেলা। ননু বই নিয়ে পড়তে বসেছে, তার মা বলেছেন, 'ভালো করে পড়বে, আলি ভুলির দেশে চলে যাবে না।' কিন্তু নিমন্ত্রণ পেয়ে ননু মায়ের কথা ভুলে আলি ভুলির দেশে চলে গেল। উকুনে বুড়ির বিয়ে হবে সেই কুড়িতলা পঁচিশতলা কত আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে, দূর থেকে যেন ঠিক কালীপুজোর দেয়ালির মতো দেখাচ্ছে। বাগানে মস্ত উনুনে মাটির কড়া ভরে পায়েস রান্না হচ্ছে। পায়েসের গন্ধে কত দেয়ালি পোকা, ঘুরঘুরে পোকা, ফড়ফড়ে ফড়িং, ডোরাকাটা ফড়িং সব সেখানে জড়ো হয়েছে। জোনাকি পোকারা গাছের মাথায় দেয়ালির আলো জ্বেলেছে। ননু সেখানে যেতেই আলি ভুলি কত আদর করে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু সেদিন তারা ভারি ব্যস্ত; কাজেই তারা ননুকে তেলি বেলি ফেলিদের কাছে রেখে চলে গেল। ননুর সেখানে ভালো লাগল না। খানিক বসে বসে সে ভাবল, 'যাই দেখে আসি কেমন পায়েস রান্না হচ্ছে।'

এর মধ্যে হয়েছে কী একটা মস্ত বড়ো চার পাখাওয়ালা ফড়িং পায়েসের গন্ধে মাথা ঘুরে কড়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। ননু ছুটে গিয়ে আঙুল দিয়ে ফড়িংটাকে তুলে ফেলল। বেচারার একপায়ে একেবারে ফোসকা পড়ে গিয়েছে। তখনই আরও দু-চারটে ফড়িং এসে

ঘাস দিয়ে খাটিয়ার মতো বানিয়ে সেই চার পাখাওয়ালা ফড়িংকে তাতে তুলে নিল; তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। একটা জোনাকি পোকা আগে আগে লন্ঠন দেখিয়ে চলল। ননুও তাদের সঙ্গে চলল।



একটা চামেলি ফুলের ঝোপের নীচে হাসপাতাল। সেখানে আরও অনেক ফড়িং রয়েছে। কারও হাত ভাঙা, কারও পা ভাঙা, কারও ডানা ছেঁড়া। ননু দেখল কতগুলো ছোট্ট ছোট্ট সাদা ফড়িং তাদের সেবা করছে, ওষুধ দিচ্ছে। আর একটু ভালো করে দেখে ননু বুঝল, সেগুলো ফড়িং নয়, ছোট্ট ছোট্ট পরি। তাই তো!' এরকম সাদা ফড়িং তো তাদের বাগানে অনেক আছে; সে তো মোটেই জানত না যে তারা ফড়িং নয় পরি। তাদের বাগানেও চামেলি ফুলের ঝোপ আছে। সে ভাবল, এবার থেকে যত ডানাভাঙা পোকা দেখবে চামেলি গাছের নীচে রেখে দেবে।

রোগীদের ঘুম পাড়িয়ে ফড়িং পরিরা ঘাসের ওপর নেমে এল। চারদিকে চাঁদের আলো ফুটফুট করছে। ঘাসের মাঝে কত ছোটে ছোটো সাদা নীল ফুল ফুটেছে। পরিরা সে ফুল তুলে মাথায় পরল, তারপর হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। তাই তো! ননুদের বাগানে যে আলো জ্বলে, তার চারধারে যে এমনি করে কারা ঘুরে ঘুরে নাচে। এক-একসময় এমন তাড়াতাড়ি ঘোরেও যে মনে হয় যেন আলোর চারধারে একটা আলোর চাকা ঘুরছে। ননু ভাবছে, 'এবার একদিন রাত্রির বেলা বাগানে গিয়ে দেখতে হবে।' এমন সময়ে ঘাসের মধ্যে কী যেন সড়সড় করে উঠল। সে চমকিয়ে গিয়ে যেই সরতে যাবে অমনি একটি গর্তের ভিতর পা পড়ে পা-টা ভীষণ মচকিয়ে গেল। সে মাটিতে বসে পায়ে হাত বুলোচ্ছে, হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোর ঠ্যাং, তোর ঠ্যাং।' সে আওয়াজ শুনে পরিরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। ননু দেখল, তার সামনে প্রকাণ্ড বড়ো একটা গিরগিটির মতো জন্তু বড়ো বড়ো চোখ বার করে তার দিকে চেয়ে আছে। আর 'তোর ঠ্যাং, তোর ঠ্যাং' করে চেঁচাচ্ছে।

আর ঠিক সেই সময়ে আলি ভুলি এসে পড়ল। তারা ননুকে বলল, 'তুমি এখানে বসে আছ? কই পায়েস খেতে যাবে না? চলো ।' সে বলল, 'না, ভাই আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে। আমি বাড়ি যাব।' বলতে বলতেই সে তার বাড়ি এসে পড়ল। তার সামনে বই খোলা পড়ে আছে। ওই যাঃ! নিমন্ত্রণ তো খাওয়াই হল না, না পড়াও হল, মা কত রাগ করবেন। সেদিন ননুর মা তার ওপর খুব রাগ করলেন। রাত্রে তাকে আলাদা বিছানায় শুতে হল, মার কাছে শুতে পেল না। সেই থেকে ননু মনে করেছে, এবার থেকে পড়ার সময় যদি আলি ভুলিরা ডাকতে আসে তাদের সঙ্গে যাবে না, খালি খেলার সময়ে যাবে।

কার্‌তিক ১৩২৯




# ইলা রায়

এক গ্রামে একই নামে আর একটু হাঁদা গোছের দুইজন লোক ছিল, দুইজনই গৃহস্থ। একজনের ছিল চারটা গোরু আর একজনের ছিল একটা গোরু। তাই গ্রামের সকলে চারটা গোরুওয়ালাকে বড়ো গদাই আর একটা গোরুওয়ালাকে ছোটো গদাই বলে ডাকত। বেচারা ছোটো গদাই আর কী করে, একটা গোরু দিয়ে তো আর চাষ করা চলে না। তাই সে সপ্তাহের ছয়টা দিন বড়ো গদাইকে তার গোরুটি ধার দিত আর তার পুরস্কারস্বরূপ রবিবার দিনটা সে নিজের কাজের জন্য বড়ো গদাইয়ের চারটা গোরুই পেত। এই ভাবে সপ্তাহে এক দিন করে সে পাঁচটা গোরু দিয়ে তার জমি চষত।

সেদিন রবিবার, আকাশটা ছিল খুব পরিষ্কার। ছোটো গদাই তার গোরুটি আর বড়ো গদাইয়ের চারটা গোরু নিয়ে নিজের জমি চষছে আর মনের আনন্দে গুনগুন করে গান গাইছে, আবার মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলছে, 'কী মজা! আমার পাঁচ-পাঁচটা গোরু কেমন হাল টানছে!' বড়ো গদাই ঠিক সেই সময় সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে শুনে রেগে আগুন হয়ে দৌড়ে এসে ছোটো গদাইকে বলল, 'খবরদার! আর কখনো বোলো না যে, পাঁচটা গোরুই তোমার, তাহলে কিন্তু লাঠি দিয়ে তোমার গোরুটাকে এক্ষুনি মেরে ফেলব।'

ভয়ে ছোটো গদাই তখন চুপ করে রইল, কিন্তু খানিক পরেই সব ভুলে গিয়ে, আবার চেঁচিয়ে উঠেছে, 'কী মজা! আমার পাঁচটা গোরু কেমন হাল টানছে!' যেই না বলেছে অমনি বড়ো গদাই কোথা থেকে একটা বাঁশ নিয়ে এসে ছোটো গদাইয়ের গোরুর মাথায় মেরেছে এক ঘা, সঙ্গেসঙ্গে গোরুটাও মাটিতে পড়ে তক্ষুনি মরে গেল।

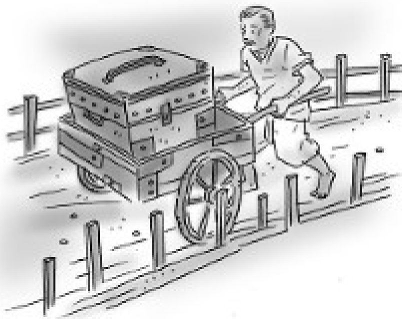
বেচারা ছোটো গদাই কী আর করে, কাঁদতে কাঁদতে মরা গোরুটাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে, গোরুটার ছাল ছাড়িয়ে সেটা রোদে শুকিয়ে নিল। তারপর একদিন সে একটা ছালায় করে সেই গোরুর শুকনো চামড়া নিয়ে, শহরে চলল বিক্রি করতে। শহরটা ছিল অনেকখানি দূরে, পথে আবার একটা মস্ত বন পার হয়ে যেতে হবে-আকাশও খুব মেঘলা করেছে। তাই ছোটো গদাই খানিক দূর গেলে পর প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে দেখে, পথের ধারেই এক গৃহস্থের বাড়ি দেখতে পেয়ে দরজায় ঘা দিল।

গৃহস্থ বাড়ি ছিল না, তার স্ত্রী দরজা খুলে যখন জানতে পারল যে, ছোটো গদাই রাত্রিটা তাদের বাড়িতে থাকতে চায় তখন সে বলল, 'কর্তা বাড়িতে নাই, তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখো। আমি অচেনা লোককে বাড়িতে জায়গা দিতে পারব না,' বলে দরজা বন্ধ করে দিল।

ছোটো গদাই আর কোনো কথা না বলে, গৃহস্থের বাড়ির লাগাই একটা কাঁচা ঘর ছিল, সেটা ছিল খড়ে বোঝাই, সেই খড়ের উপর শুয়ে থাকবার বন্দোবস্ত করল। যেখানে সে

শুয়ে ছিল, সেখান থেকে চালের ফাঁক দিয়ে গৃহস্থের ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। ছোটো গদাই দেখল যে, ঘরের ভিতর গৃহস্থের স্ত্রী আর পাদ্রি সাহেব বসে খাচ্ছে। টেবিলের উপরে কত রকমের ভালো ভালো সব খাবার রয়েছে। এমন সময়ে বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। এটা গৃহস্থের ঘোড়ার পায়েরই শব্দ, সে বাড়ি ফিরছে। গৃহস্থ ছিল খুব ভালো মানুষ, কিন্তু তার কেমন একটা খেয়াল ছিল যে, সে পাদ্রি-টাদ্রি দু-চক্ষে দেখতে পারত না। তাই পাদ্রি গৃহস্থ পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, যখন গৃহস্থ বাড়ি থাকত না তখন; সেদিনও তাই এসেছিলেন। যাহোক হঠাৎ গৃহস্থের ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে তার স্ত্রী করল কী, ভয়ে পাদ্রিকে মস্ত একটা সিন্ধুকের ভিতর লুকিয়ে রেখে, খাবারগুলো চটপট সরিয়ে ফেলে গৃহস্থকে দরজা খুলে দিল।

এমন সময় ছোটো গদাই খুব জোরে একটা নিশ্বাস ফেলেছে, অমনি গৃহস্থ বলল, ‘কে ও, খড়ের গাদায় শুয়ে?’ তখন সে নেমে এসে সব কথা বলল পর, গৃহস্থ তাকে খুব আদর-যত্ন করে ভিতরে ডেকে নিয়ে দু-জনে মিলে খেতে বসল। কিন্তু এবারের খাবার ছিল শুধু সুজির পায়েস-গৃহস্থ পেটের জ্বালায় তাই কপাকপ খেতে লাগল। এদিকে ছোটো গদাইয়ের মন পড়ে আছে সেই সব লুকানো খাবারের দিকে, তার কি আর সুজির পায়েস ভালো লাগে? শেষে কিছুতেই লোভ সামলাতে না পেরে সে করল কী, টেবিলের তলায় যে তার থলেটা ছিল সেইটাকে পা দিয়ে চাপতে আরম্ভ করল, আর ভেতরের শুকনো চামড়াতে মচমচ আওয়াজ হতে লাগল। গৃহস্থ বেচারা ভয়ে অস্থির হয়ে বলল, ‘এই, তোমার থলিতে কী আছে? কামড়াবে না তো?’ ছোটো গদাই একটু হেসে বলল, ‘ও কিছুই নয়; আমার থলিতে এক জাদুকর আছে। সে সুজির পায়েস খেতে বারণ করছে আর বলছে, সে নাকি জাদু করে উনুনের তলায় অনেকরকম খাবার রেখেছে।’ গৃহস্থ উনুনের কাছে গিয়ে দেখে জাদুকর যা বলেছে সব সত্যি; তখন একে একে সব খাবার এনে টেবিলের উপর রাখল। ছোটো গদাইয়ের ফুর্তি দেখে কে, সে টপাটপ সব খেতে লাগল। গৃহস্থ-পত্নী ভয়ে কিছু বলতেও পারছে না। এই সময়ে ছোটো গদাই আবার থলে মাড়িয়েছে আর মচমচ শব্দ শুনে গৃহস্থ বলল, ‘তোমার জাদুকর আবার কী বলছে হে?’ ছোটো গদাই বলল, ‘এবার সে বলছে যে, সে নাকি জাদু-মন্ত্র বলে এক ভূত বানিয়ে তোমার ওই সিন্ধুকে রেখেছে।’ গৃহস্থও উঠে গিয়ে বাক্সের তলাটা একটু ফাঁক করেই ‘বাপরে, মারে’ বলে ধরাস করে আবার ডালাটা চাপা দিয়ে দিল। সে তো আর জানত না যে বাক্সের ভিতর পাদ্রিসাহেব আছেন; সে ভাবল বুঝি সত্যি সত্যিই ভূত।



জাদুকরের গুণ দেখে সে অবাক! ছোটো গদাইকে বলল, ‘তোমাকে এক থলে মোহর দেব, তার বদলে এই জাদুকরটিকে আমায় দিতেই হবে।’ ছোটো গদাই অনেক আপত্তি

করে শেষে রাজি হল। পরদিন গৃহস্থ তাকে এক থলি মোহর দিয়ে বলল, 'ভাই! ওই ভূতের বাক্সটাও কিন্তু তোমাকে নিয়ে যেতে হবে, এটাকে আমি কিছুতেই বাড়িতে রাখতে পারব না। তোমাকে একটা ঠেলাগাড়ি দিচ্ছি, তাতে করে তুমি তোমার মোহর আর এই ভূতের বাক্সটা নিয়ে যাও।'

গাড়িতে মোহর আর সিন্ধুক বোঝাই করে ছোটো গদাই চলেছে। খানিক দূর গিয়েই একটা নদী, তাতে ভীষণ স্রোত আবার উপরে একটা পোলও আছে। সে পোলের মাঝামাঝি এসে বেশ জোরে জোরেই বলতে লাগল, 'বাবা! সিন্ধুকটা যা ভারী, এটাসুদ্ধ গাড়ি ঠেলা কি কম কথা? যাক, এইবারে নদীর জলে ফেলে দিলেই সব আপদ দূর হবে।' এই বলে সে বাক্সটাকে ফেলবার জন্য যেই একটু তুলেছে, অমনি পাদ্রিমশাই তার মধ্যে থেকে চেঁচামেচি করে উঠেছেন, 'লক্ষ্মী বাবা আমার! তোমাকে এক থলে মোহর দেব, তুমি আমাকে জলে ফেলো না; আমাকে বার করে দাও।'

ছোটো গদাই যেন ভারি আশ্চর্য হয়েছে এরূপ ভাবে বলল, 'তাই তো! পাদ্রিমশাই এখনও বাক্সের ভিতর আছেন দেখছি!' বলে সে বাক্সের ডালা খুলে তাঁকে বের করে দিল। পাদ্রি বাইরে এসে খালি বাক্সটা তখনই জলে ফেলে দিলেন আর ছোটো গদাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এক থলে মোহর দিয়ে বিদায় করলেন।

বাড়ি গিয়ে ছোটো গদাই দুই থলি মোহর মাটিতে ঢেলে দেখল যে, এই বড়ো এক স্তূপ মোহর হয়েছে। তখন তার আহ্লাদ দেখে কে? ভাবল, 'বড়ো গদাই আমার মোহরের কথা শুনে নিশ্চয়ই হিংসায় জ্বলে যাবে কিন্তু এখন ওকে কিছু জানানো হবে না।' এই ভেবে সে তার চাকরকে নিকতি আনবার জন্য বড়ো গদাইয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। বড়ো গদাই আশ্চর্য হয়ে গেল। নিকতি চায় কেন, কী মাপবে? তখন করল কী, নিকতির তলায় আঠা মাখিয়ে দিল। যখন সে নিকতিটা ফিরিয়ে পেল তখন দেখল যে, তার তলায় একটা মোহর লেগে আছে। তক্ষুনি সে ছোটো গদাইয়ের বাড়ি গিয়ে হাজির। বলল, 'হ্যাঁরে তুই এত মোহর পেলি কোথায়?' ছোটো গদাই বলল, 'আমার গোরুটা তুমি মেরে ফেললে। তখন তার চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করেছি।'

একথা শুনে বড়ো গদাই বলল, 'বাঃ! একটা গোরুর চামড়া বিক্রি করে তো কম টাকা পাওনি?' এই বলে সে তখনই বাড়ি গিয়ে, তার চারটা গোরুই মেরে ফেলল আর তাদের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে পরের দিনই চলল বাজারে বিক্রি করতে। কিন্তু কেউ আর এক থলে মোহর দিয়ে তার গোরুর চামড়া কিনতে রাজি হল না; তার উপর আবার সকলে তাকে পাগল বলে আর একটু হলে মার দিয়েছিল আর কি, ভাগ্যিস সে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল। বাড়ি ফিরে এসে ছোটোর উপর যা রাগ! কেবলই ভাবছে-'হতভাগা ছোটোকে এবার সাবাড় না করে ছাড়ছি না।'

এদিকে ছোটো গদাইয়ের বাড়িতে তার বুড়ি ঠাকুরমা মারা গিয়াছেন। বুড়ি ছোটোকে বড্ড গাল মন্দ করতেন, তবু তিনি মারা যাওয়াতে ছোটোর বড়ো দুঃখ হল। সে তাঁর মৃত দেহটাকে তার নিজের সুন্দর গরম বিছানাটিতে লেপ চাপা দিয়ে শুইয়ে দিল। ভাবল-যদি ঠাকুরমা গরম হয়ে আবার বেঁচে উঠেন। রাত্রি বেলা ছোটো ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে, এমন সময় রাত দুপুরে বড়ো গদাই কুড়ুল হাতে করে ঘরে ঢুকেছে। ঢুকেই ছোটোর বিছানার কাছে গিয়ে লেপের উপর দিয়েই তার ঠাকুরমার মাথায় ভীষণ এক ঘা! আর ভাবল, সে ছোটোকেই মেরেছে। তারপর, 'এখন কেমন লাগে? আমার সঙ্গে শয়তানি করবি?' এই বলে বাড়ি চলে এল।

ছোটো সবই দেখছিল, সে ভাবল, 'বেটা তো ভারি বদ! ভাগ্যিস ঠাকুরমা আগেই মরেছিলেন, নইলে তো তাঁকে আজ বেটা খুনই করেছিল।'

সকালে ছোটো গদাই প্রতিবেশীর একটা ঘোড়া চেয়ে এনে তার গাড়িতে জুতল। তারপর ঠাকুরমাকে কাপড়চোপড় পরিয়ে গাড়ির পিছনের গদিতে বেশ করে বসিয়ে দিল, যাতে গাড়ি চালালে পড়ে না যায়। এই করে সে নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে চলল শহরের দিকে। তখন বেশ রোদ উঠেছে, একটা হোটেলের সামনে গাড়ি রেখে ভিতরে গেল জল খেতে। হোটেলওয়ালার সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল। লোকটি বেশ ভালো, তার অগাধ টাকা কিন্তু মেজাজটা একটু খিটখিটে। ছোটোকে দেখেই বলল, 'কী গদাই! সকাল বেলা কোথা যাওয়া হচ্ছে?' ছোটো বলল, 'ঠাকুরমাকে নিয়ে শহরে যাচ্ছি। তিনি বাইরে গাড়িতে আছেন। ভাই! অনুগ্রহ করে তাঁকে এক গেলাস জল দিয়ে আসবে? দেখো তাঁর সঙ্গে একটু জোরে কথা কয়ো, তিনি কিন্তু বড্ড কালা।'

হোটেলওয়ালা এক গেলাস জল নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেঁচামেচি করল কিন্তু বুড়ি কিছুতেই শুনতে পেল না। শেষকালে রেগে গিয়ে জলের গেলাসটা ছুড়ে মেরেছে বুড়ির মুখে আর সঙ্গেসঙ্গে বুড়িও ধপ করে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। ছোটো গদাই সবই দেখছিল। সে তখনই 'কী সর্বনাশ! ঠাকুরমাকে খুন করলে?' বলে চেঁচিয়ে উঠল। হোটেলওয়ালা বেগতিক দেখে এক থলে মোহর এনে ছোটো গদাইয়ের হাতেপায়ে ধরে অনেক কষ্টে তাকে ঠান্ডা করল। ছোটো গদাইয়ের তো লাভই হল। সে আর কিছু না বলে এবং হোটেলওয়ালারই সাহায্যে ঠাকুরমার সৎকার করে বাড়ি ফিরে এল।

তারপর দিন বড়ো গদাই দেখল ছোটো দিব্যি বেঁচে আছে। দেখে তো সে একেবারে অবাক! তার উপর আবার আরও এক থলে মোহর পেয়েছে শুনে, হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরে। যাহোক, ছোটোর কাছে যখন সমস্ত কথা শুনল, তখন দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসে, নিজের ঠাকুরমাকে মেরে থলেতে ভরে নিয়ে সেও চলল বিক্রি করতে। এবারেও সকলে তাকে বদ্ধ পাগল মনে করে তাড়িয়ে দিল।

বাড়ি ফিরে এসে, কিছুতেই আর সহ্য করতে না পেরে বড়ো গদাই করল কী, রেগে ছোটো গদাইয়ের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। তাকে জোর করে ধরে, হাত-পা বেঁধে ছালায় পুরল আর নদীতে ফেলে দেবে বলে নিজে মাথায় করে নিয়ে চলল। ছোটো গদাই মাথায় চড়ে মনে মনে ভাবছে, কোনোরকমে বাঁচতে পারে কি না। এত বড়ো বোঝাটা মাথায় করে নিয়ে হাঁটা তো আর কম নয়! কাজেই একটুখানি পথ চলেই বেচারা বড়ো গদাই ক্লান্ত হয়ে, থলে নামিয়ে রেখে জল খেতে গিয়েছে।

এদিকে এক বুড়ো চাষা সারাদিন খেতে কাজ করে, সন্ধ্যার সময় তার গোরু ক-টা নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। চারদিক নির্জন, রাস্তাঘাটও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেল, একটা থলে তার দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে! চাষা তো ভয়ে হাঁ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে! এমন সময় শুনতে পেল, কে যেন তার ভিতর থেকে কী বলছে। চাষা তখন সাহস পেয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি থলের ভিতর-ব্যাপার কী?' ছোটো গদাই সময় বুঝে মাঝে মাঝে হঠাৎ চালাক হয়ে উঠত। সে সমস্ত কথা লুকিয়ে শুধু বলল, 'আরে ভাই, আমি সশরীরে স্বর্গে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার অল্প বয়স, এত শিগগির পৃথিবী ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে।' চাষা বলল, 'এই কথা! তবে এক কাজ করো না-তোমার বদলে আমাকে কেন স্বর্গে পাঠিয়ে দাও না? আমি বুড়ো হয়েছি, আর বেঁচে থাকতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না।' ছোটো বলল, 'বেশ, বেশ-তাহলে আমাকে বার

করে দাও।' চাষা তাকে মুক্ত করে দিলে পর, ছোটো তাকে থলেতে ভরে থলের মুখ বেঁধে দিল। তারপর চাষার গোরু ক-টি নিয়ে সেখানে আর একটুও দেরি করল না।

কিছুক্ষণ পরেই বড়ো গদাই ফিরে এসে আবার সেই থলে মাথায় করে চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু এবার থলেটা হালকা লাগছে কেন? ভাবল-জল খেয়ে শরীর ঠান্ডা হয়েছে আর গায়ে জোর বেড়েছে-তাই। কিছু দূর গিয়ে একটা মস্ত নদীতে থলেটা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যেতে যেতে ভাবছে-'এবার ছোটো গদাইকে জলে ডুবে মরতে হবে; বাছাধন আর এবার পালাতে পারল না।' এমন সময় হঠাৎ চেয়ে দেখে, একটু দূরেই ছোটো গদাই কতগুলো গোরু নিয়ে, মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। বড়ো গদাই ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ছোটো গদাই, আমি নিজের হাতে তোমাকে একটু আগে নদীতে ফেলে দিয়ে এলাম আর এক্ষুনি তুমি এখানে কেমন করে এলে?' ছোটো গদাই একটু মুচকি হেসে বলল, 'ভাগ্যিস দাদা তুমি আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিলে, তাই এতগুলো গোরু পেলাম।' আরও অবাক হয়ে বড়ো গদাই জিজ্ঞাসা করল, 'সে কীরকম?' তখন ছোটো গদাই বলল, 'আমাকে যখন তুমি জলে ফেলে দিলে, তখন একজন জলের দেবতা এসে আমাকে একেবারে জলের তলায় নিয়ে গেলেন। সেখানে এইরকমই সবুজ ঘাস আছে, ঝিনুক শামুক ইত্যাদি দিয়ে মস্ত ঘর-বাড়ি সব তৈরি আর সব মণি-মুক্তা দিয়ে সাজানো। জলদেবতা আমাকে খুব আদর-যত্ন করলেন, তারপর ফিরে আসবার সময় এই গোরুগুলো দিলেন। তখন তোমার কথা বড্ড মনে হচ্ছিল দাদা। তুমিও কি যাবে?' এসব কথা শুনে বড়ো গদাইয়ের আহ্লাদের আর সীমা নাই; সে তক্ষুনি একটা ছালা এনে শুড়শুড় করে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। ছোটো গদাইও সুযোগ বুঝে থলের মুখটা খুব কষে বেঁধে একটা মস্ত বড়ো পাথরসুদ্ধ ছুড়ে জলে ফেলে দিল। বড়ো গদাই ছালার মধ্যে বসে ভাবছে কখন জলের দেবতা আসবেন; বেচারা জানে না যে আর একটু পরেই তার অবস্থা কী হবে। এদিকে ছোটো গদাই নাচতে নাচতে বুড়ো চাষার সব গোরু নিয়ে মনের আনন্দে বাড়িতে ফিরে এল।

*(উপকথা)*

*মাঘ ১৩২৯*




পুণ্যলতা চক্রবর্তী

ভোর না হতে সতু নরেনকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল, 'দাদা! দাদা! সকাল হয়েছে, উঠবে না?' দাদা সবে একটা কড়া ধমক দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যে আজ দাদামশায়ের আসবার কথা-অমনি সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। সতুবাবু বিছানায় শুয়ে শুয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করল, 'ও দিদি! ছোটদি! শিগগির ওঠো-মাকে ডাকো।' দিদি ঝংকার দিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমরা অনেকক্ষণ উঠেছি, এখন তোমরা শিগগির উঠলেই হয়-বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাঁকডাক হচ্ছে দেখো না!' 'বারে বা, নিজেরা কখন চুপচাপ উঠে গিয়েছ, আমাদের ডাকতে পারনি বুঝি? বেশ যাহোক!' বলে অপ্রস্তুত হয়ে সতুও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

রমা, নরেন, সত্যেন তিনজনে খেতে বসলে, মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বীণা কই?' রমা বলল, 'বীণার কি এক্ষুনি হবে? তার উঠতে, মুখ ধুতে তিন ঘণ্টা।' সতু বলে উঠল, 'সত্যি, ছোটদি এমন ঢিলা-চটপট কিছু যদি করতে পারে।' এমন সময় খুকুকে কোলে নিয়ে বীণা এল, তখন মা খুশি হয়ে বললেন, 'দেখো তো, তোমরা যে যার কাজ সেরে এলে আর বীণা খুকুকে মুখ ধুইয়ে, কাপড় পরিয়ে এনেছে, কাজেই ওর দেরি হয়েছে। নাও, এখন সব শিগগির খেয়ে নাও-এখনই তোমাদের দাদামশাই আসবেন।'

একটু পরেই ছেলে-মেয়েরা দেখল, গাড়ির মাথায় একরাশ জিনিস চাপিয়ে, তাদের বাবা দাদামশাইকে নিয়ে হাজির। বাক্স-প্যাঁটরা, মিঠাইয়ের হাঁড়ি, ফলের ঝুড়ি সব নামানো হলে, প্রণাম ও আদর করার ঘটা শেষ হলে, দাদামশাই খেয়ে-দেয়ে ঠান্ডা হয়ে নাতি-নাতনিদের নিয়ে গল্প করতে বসলেন, তাদের যার জন্য যা এনেছেন বের করে দিলেন-রমা রান্না শিখছে, তার জন্য একটা স্টোভ ও ছোটো এক সেট সুন্দর সুন্দর বাসন এসেছে; নরেনের পড়ায় খুব ঝোঁক, প্রতি বৎসর প্রাইজ পায়-তার জন্য ছোট্ট একটি বইয়ের আলমারি; বীণা সেলাই ভালোবাসে, তার জন্য সুন্দর একটি সেলাইয়ের বাক্স-তাতে ছুঁচ, সুতো, কাঁচি থেকে আরম্ভ করে কত রকম সেলাইয়ের সরঞ্জাম রয়েছে; সতুর জন্য ঢাল, তরোয়াল, বন্দুক-সে কিনা বড়ো হয়ে খুব বীরপুরুষ হবে, তাই। খুকু আগে দাদামশাইয়ের দাড়ি আর চশমা দেখে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু একটা সুন্দর পুতুল আর রঙিন পাখি পেয়ে, সেও 'দাদু'র সঙ্গে ভাব করে ফেলল। জিনিসগুলি দিয়ে দাদামশাই বললেন, 'যে যা ভালোবাস শুনেছি, সেইরকম তার উপযুক্ত জিনিস এনেছি। আর একটা খুব ভালো জিনিস আছে, সেটা এখন দেখাব না। এক মাস পরে যখন আমি চলে যাব, তখন সেটা দিয়ে যাব। তোমাদের মধ্যে যে আমাকে সব চেয়ে খুশি করতে পারবে সে-ই সেটা পাবে।' চার ভাই বোনে এক সঙ্গে বলে উঠল, 'কী করলে তুমি খুশি হও দাদু?' 'তা তো আমি বলব না-সেটা তোমাদের নিজেদের বুঝে নিতে হবে।'

সেই রাত্রে চারজন পরামর্শ করে অনেক মাথা ঘামিয়ে স্থির করল যে, 'দাদু, চারজনকে চাররকম জিনিস দিয়েছেন তার মানেই হচ্ছে এই যে, তিনি দেখতে চান কে কীরকম সেই জিনিসের সদ্ব্যবহার করে।'

পরদিন সকাল থেকেই রমা মহোৎসাহে স্টোভ জ্বালিয়ে খাবার করতে আরম্ভ করল। নরেন ভোরে উঠেই পড়ায় মন দিল; সে প্রতিজ্ঞা করেছে এবার পরীক্ষায় সব বিষয়েই ফার্স্ট হবে। বীণা ঠিক করল, তার দাদামশাইকে খুব সুন্দর করে একখানা পশমের আসন বুনে দেবে। মুশকিল হল সতুর-সে বেচারা যে হঠাৎ কী বীরত্ব দেখিয়ে দাদুকে খুশি করে দেবে, তা সে ভেবেই পাচ্ছে না। দাদু যদি পুকুরে ডুবুডুবু কিংবা ছাত থেকে পড়ো-পড়ো হন, কিংবা বাড়িতে আগুন লাগে, নয় তো চোর ডাকাত পড়ে, তবে বরং তার বাহাদুরি দেখাবার সুযোগ ঘটতে পারে। কিন্তু দাদু তো ঘরের মধ্যে স্নান করেন, ভুলেও ন্যাড়া ছাতে পা বাড়ান না, অন্য বাড়ির দাদুদের মতন তামাকও খান না। মা-ও আবার তেমনি-ছেলেপিলের ভয়ে রাতদিন আলো বাতি সামলিয়ে বেড়ান। শোবার আগে বাবা নিজে দেখেশুনে চারদিক বন্ধ করেন, আর বুড়ি ঝিটা সারারাত জেগে থেকে কোথাও টুঁ শব্দটি হলে, 'কে রে?' করে এমন তেড়ে ওঠে, যে, চোর ডাকাত তো দূরের কথা-বেড়াল কুকুরটি পর্যন্ত ঘেঁষতে চায় না। সবাই এমন অন্যায় রকম হুঁশিয়ার হলে কি আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার আশা থাকে? সতুর দুঃখের কথা শুনে নরেন আর রমা তো হেসেই খুন-তাদের ঠাট্টাতে বেচারার আরও কান্না পেল। তখন বীণা বলল, 'তুই এক কাজ কর না-খুব exercise করে, গায়ে জোর কর। তোর মুখে তো খুব সাহস, কিন্তু এদিকে যে তালপাতার সেপাই-গায়ে জোর না হলে-কাজে সাহস দেখাবি কী করে?' ছোটদির কথায় সতু উঠেপড়ে ব্যায়াম করতে লেগে গেল।

ছোটদি নিজে কিন্তু সেলাইয়ের বিশেষ কিছু করতে পারল না। সকালে উঠে দেখে ঝি-র অসুখ করেছে তাই মা বড়ো ব্যস্ত-সে খানিকক্ষণ খুকুকে রাখল, বিছানা তুলে, ঘর পরিষ্কার করল, বাবার আপিসের কাপড়চোপড় ঠিক করে দিল, তাঁর জামার বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল সেটা লাগিয়ে দিল, তারপর খুকুকে স্নান করাতে নিয়ে গেল। প্রায় খুকুর মতোই বড়ো বীণার একটা পুতুল ছিল, সেটাকে স্নান করাতে তার বড্ড ভালো লাগত; কিন্তু এই জ্যান্ত পুতুলটিকে স্নান করানো যে এমন মুশকিল, সেটা তার জানা ছিল না-খুকু তেল ফেলে, সাবান চেটে, জল ছিটিয়ে, ছোট্ট দিদিটিকে অস্থির করে তুলল।

দশটার সময় দাদু আর বাবা, নরেন আর সত্যেনকে নিয়ে খেতে বসল, রমা পরিবেশন করল-তার হাতের রান্না খেয়ে সবাই খুব ভালো বললেন। নরেন দু-মিনিটে স্নান সেরে বড়ো বড়ো গ্রাস কপকপ করে গিলতে লাগল। তার বাবা বললেন, 'অত তাড়াতাড়ি খেয়ো না-হজম হবে না।' 'আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে, তাই', বলে নরেন কোনোরকমে ভাত গিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে স্কুলে ছুটল-তার চেহারাটা ঠিক যেন ঝোড়ো কাকের মতো। আর সতুর চেহারাখানা আরও চমৎকার-মুখ লাল, গায়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে-হাঁপাচ্ছে আর খাচ্ছে-জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সে এতক্ষণ 'স্যান্ডো' করছিল।

নরেন ও সতু স্কুলে যাবার পর রমা আর বীণাও খেয়ে-দেয়ে নিজেদের স্কুলে গেল। টিফিনের ছুটির সময় বীণা তার সেলাই নিয়ে বসল, অমনি কতগুলি মেয়ে এসে তাকে ঘিরে ফেলল-কেউ সেলাই ধরে টানে, কেউ পশম ঘাঁটে, কেউ হাজাররকম প্রশ্ন করে। এরকম 'লোক দেখানো' কাজ রমা পছন্দ করে না-সে মনে মনে বীণার উপর একটু বিরক্ত হল। তারপর ছুটি হতেই বীণা যখন 'দিদি, একটু দাঁড়াও না' বলে সেলাইয়ের শিক্ষয়িত্রীর ঘরে ঢুকে দেরি করে দিল, তখন রমা ভারি চটে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে

বীণা বেরোতেই তাকে খুব করে শুনিয়ে দিল, ‘আচ্ছা স্বার্থপর মেয়ে যাহোক! সেলাই দেখাতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি? নিজের সেলাইটাই হল কাজ, আর আমার রান্নাটা কাজ নয়, না? কত দেরি হয়ে গেল, গিয়ে দাদুর জল খাবার ঠিক করে দিতে হবে না বুঝি আমার?’ এই বলে সে ছুটে রওনা হল।

নরেন আর সতুও তখন স্কুল থেকে ফিরছে, পথে এদের ছুটতে দেখে তারাও ‘রেস’ দিয়ে ছুটল। নরেন সকলের আগে, তারপর রমা; সতু বীণাকে ছাড়িয়ে সবে রমার কাছাকাছি এসেছে, এমন সময়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। বীণা তার হাত ধরে তুলতেই ‘আঃ ছাড়ো’ বলে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার ছুটল। বীণা তার পিছনে পিছনে এল-যদিও সে ইচ্ছা করলেই অনায়াসে সতুকে ছাড়িয়ে যেতে পারত। বাড়ি এসে সতু বলল, ‘দাদা ফার্স্ট, দিদি সেকেন্ড, আমি থার্ড আর ছোটদি লাস্ট! মাগো, ছোটদিটা এমন ঢিলে-কোনো কাজের নয়।’ ছোটদি হেসে বলল, ‘আচ্ছা গো পালোয়ানজি, এখন এসো তো তোমার পা-টা ধুয়ে একটু জলপট্টি দিয়ে দিই?’

জলখাবার খেয়েই নরেন তার ঘরে খিল দিতে দিতে মাকে বলল, ‘রাত্রে খাবার সময়ের আগে যেন কেউ তাকে বিরক্ত না করে।’ মা বললেন, ‘অত পোড়ো না বাবা, অসুখ করবে। এখন একটু বেড়িয়ে এসে, সন্ধ্যা বেলা পড়তে বোসো।’ ‘না মা, এ কয়দিন আর কিছু করব না-পরীক্ষার আর মোটে পনেরো দিন আছে, এবারে দেখো সবটাতেই ফার্স্ট প্রাইজ পাই কি না!’ সতু বলল, ‘আর আমি পাব স্পোর্টস-এর ফার্স্ট প্রাইজ! ছোটদিকে তো হারিয়ে দিয়েছিই, দিদিকেও হারাতে পারতাম, যদি পায়ে না লাগত। আজ স্কুলে ফণীটা এসেছিল আমার সঙ্গে লাগতে-এমনি ল্যাং মারলাম তার ঠ্যাঙে, যে একেবারে চিতপটাং হয়ে পড়ল।’ ‘আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যে চিতপটাং হয়েছিলে সে কথাটি যে বড়ো বললে না?’ নরেনের কথাতে থতোমতো খেয়ে সতুবাবু মাঠে খেলতে পালাল।

রমাকে মা বললেন, ‘এবেলা তুমি আর আগুনের ধারে এসো না,’ তাই সে একখানা ‘মিষ্টান্ন-পাক’ বই নিয়ে পড়তে বসল। বীণাও সেলাই নিয়ে তার পাশে গিয়ে বসল, কিন্তু তার সেলাইয়ে মন বসল না-এই খুকি কাঁদল, ওই বাবা আপিস থেকে ফিরলেন, মা বুঝি কাকে ডাকলেন, এমনি নানান ছুতো করে সে বার বার উঠে আসে; শেষে রমা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘তোর হয়েছে কী যে, অমন উশখুশ করছিস? নিজেও মন দিয়ে স্থির হয়ে বসে কিছু করবি না, অন্যকেও কিছু করতে দিবি না নাকি? এমন স্বার্থপর হিংসুটে মেয়ে দেখিনি।’

সন্ধ্যার সময় বাবা যখন বসে বিশ্রাম করছিলেন তখন বীণা আস্তে আস্তে গিয়ে বলল, ‘বাবা, এই বইটার কথা তুমি কাল বলছিলে কি?’ বই দেখে বাবা অবাক হয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ মা, এই বই তো আমি কোথাও পাইনি-তুমি কোত্থেকে পেলে?’ ‘আমাদের সেলাইয়ের টিচারের কাছে দেখেছিলাম; তাই আজ তাঁর কাছ থেকে চেয়ে আনলাম।’ বাবা কত খুশি হলেন দেখে, বীণা বই আনতে গিয়ে দিদির কাছে বকুনি খাওয়ার দুঃখ ভুলে গেল।

রাত্রে ভাই-বোনে কথা উঠল-কার কাজ কতদূর হল। রমা আজ দু-রকম নতুন খাবার করেছে, দুটো তরকারি রাঁধতে শিখেছে-সবগুলোরই খুব সুখ্যাতি হয়েছে। নরেন ক্লাসে আগাগোড়া ফার্স্ট ছিল-একটিও ভুল করেনি। সতু সকালে একঘণ্টা স্যান্ডো করেছে আর বিকালে একঘণ্টা কুস্তি করছে, ছোটদিকে তো হারিয়েছেই, বড়দিকেও আরেকটু হলেই হারাত। (ফণীকে ল্যাং মারার কথাটা দাদার ভয়ে আর বলা হল না)। বীণা চুপ করে

রইল-তার তো সেলাই কিছুই প্রায় হয়নি। দাদা আর দিদি বলল, 'প্রথম দিনে যা নমুনা দেখালে, এমনি করলেই হয়েছে আর কি! তবেই খুব প্রাইজ পেয়েছ।'

এমনি করে দিন যায়-রমা রোজই নতুন কিছু রান্না করে, দু-বেলা রকম রকম খাবার করে, নিজের হাতে সাজিয়ে দাদুকে খাওয়ায়। তাতে যদিও অনেক সময়ে অন্য কাজ গোল হয়ে যায়-হয়তো পড়া শেখা হয় না, কাপড়চোপড় হয়তো অগোছালো হয়ে পড়ে থাকে, বইগুলো এদিক-ওদিক হারিয়ে যায়, মেজাজটাও মাঝে মাঝে একটু বিগড়িয়ে যায়-কিন্তু এই আসল কাজটিতে তার কখনো গোল হয় না। নরেন তার পড়ার জন্য আহার-নিদ্রা একরকম ছেড়েছে বললেই হয়-ভোরে উঠে সেই সে আরম্ভ হয়, রাত্রে যতক্ষণ চোখ চাইতে পারে ততক্ষণ চলে। মা-বাবা অত পড়তে মানা করেন, বন্ধুরা এসে একটু খেলতে বা বেড়াতে যাবার জন্য টানাটানি করে, নিজেরও কত সময়ে মনটা ছটফট করে ওঠে, শরীরটা বড়োই ক্লান্ত বোধ হয়-তবু তার প্রতিজ্ঞা অটল। সতুও মহা উৎসাহে রোজ ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজে, পুকুরে সাঁতার শেখে, কুস্তি করে এবং গায়ের জোরের পরীক্ষাটা করে-বাড়িতে খুকুর উপরে আর স্কুলে সবচেয়ে ছোটো ছেলেদের উপরে। বীণাও সেলাই করেছে কিন্তু ওদের মতো ভালোভাবে পেরে উঠছে না। দোষটা অবিশ্যি তারই-সে কেন দাদা ও দিদির মতো নিজের কাজে মন দেয় না? তার যেমন চঞ্চল স্বভাব তাই সে স্থির হয়ে বসে কিছু করতে পারে না-একবার একাজে একবার সেকাজে দৌড়োয়। তা ছাড়া, সে বোকার মতো খাটে বলেই তো লোকে তাকে দিয়ে বেগার খাটায়-শুধু বাড়ির নয়, পাড়ার লোকের ফরমাস খেটে সে মরে কেন? এ বিষয়ে তাকে অনেক উপদেশ দিয়ে দিয়ে শেষে রমা আর নরেন তার ভরসা ছেড়ে দিল। বীণাও দেখল যে দিদি আর দাদার যেরকম বুদ্ধি, তাতে তার আর প্রাইজ পাবার কোনোই আশা নাই। তবু যখনই অবসর হত, তখনই সে সেলাই নিয়ে বসত। কিন্তু তার হাতে ছুঁচসুতো দেখলেই সবাইয়ের মনে পড়ে যেত-কার জামার বোতামটা পড়ে গিয়েছে, কার কাপড়ে খোঁচা লেগেছে, কার পকেটটা ফুটো হয়েছে।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। যাবার আগের দিন দাদামশাই নাতি-নাতনিদের নিয়ে বসে গল্প করছেন-কাল তাদের ছেড়ে যাবেন বলে তাঁর মনটা খারাপ লাগছে। চারটি ভাই-বোনেরও মন কেমন করছে, তবে তাদের বেশি ভাবনা হচ্ছে সেই প্রাইজটার জন্য। দাদু যে বলেছিলেন যাবার সময় প্রাইজ দিয়ে যাবেন-সকলেই তো তাঁকে খুশি করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে, এখন কার ভাগ্যে কী হয়! দু-চার কথার পর দাদু বললেন, 'হাঁ-তোমাদের তো একটা প্রাইজ দেবার কথা আছে! আচ্ছা, তবে দেখা যাক, কে কেমন খুশি করেছ-

'রমা, তোমার রান্না খেয়ে আমি বড়ো খুশি হয়েছি। এতরকম রাঁধতে ও খাবার করতে, এমন যত্ন করে খাওয়াতে, তোমার মতন কেন-তোমার চেয়ে ঢের বড়ো মেয়েরাও অনেকেই পারে না, তুমি দেখছি পাকা রাঁধুনি হয়ে উঠেছ! কিন্তু দিদি, একটি কথা তোমাকে বলি-শুধু রেঁধে খাওয়ালেই তো হয় না! তুমি হলে বাড়ির বড়োমেয়ে তুমি মায়ের সাহায্য করবে, ভাই বোনদের প্রতি ভালোবাসা না দেখিয়ে রেষারেষির ভাবটাই বেশি দেখিয়েছ। মায়ের কাজের সাহায্য যেটুকু করেছে তাও নিজের স্বার্থের জন্যই, তাঁর সুবিধার জন্য নয়। পড়াতেও তুমি অন্যবারের চেয়ে এবার ঢের নীচে হয়েছ। রান্নাটা একটু কম ভালো করেও যদি তুমি এসব দিকে আরেকটু ভালো করতে, তবেই আমি খুশি হতাম।

'নরেন, তুমি পরীক্ষায় সব বিষয়ে ফার্স্ট হয়েছ শুনে খুশি হলাম। আশা করি যত বড়ো হবে, ততই লেখাপড়ায় বেশি উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু তোমার শরীরের দশাটা একবার ভাবছ কি? এর মধ্যেই যে তোমার চোখ খারাপ, মাথা ঘোরা শুরু হল, তারপর শরীর যখন একেবারে মাটি হবে, তখন বিদ্যের বোঝা নিয়ে করবে কী? বাবা-মা যে এত বলেন তবু তুমি কথা শোনো না, তাঁদের মতো হিতাকাঙ্খী তোমার কেউ নেই জেনো।

'আর সতু, তুমি হচ্ছ ঠিক দাদার উলটো-একেবারে দস্যি ডানপিটে। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নাই, রাতদিন হুড়োহুড়ি, বড়োদের মানো না, আর ছোটোদের মারধর করে বীরত্ব ফলাও-শুধু গায়ের জোর নিয়ে কি মুটে মজুর হবে, না ডাকাত হবে? সতু যদি শরীরের উন্নতির সঙ্গে মনের উন্নতির দিকে একটু দৃষ্টি দাও, আর নরেন যদি শরীরের উন্নতির দিকে একটু দৃষ্টি দাও, তবেই আমি সুখী হই।

'বীণার সেলাইটা যে খুব ভালো হয়েছে, তা নয়-এর চেয়ে আরও ভালো বোধ হয় সে করতে পারত, যদি কেবল সেলাইয়ের দিকে মন দিত। কিন্তু সে যে আর সব ভুলে কেবল প্রাইজ পাওয়ার দিকেই মন দেয়নি, তাতেই আমি বেশি খুশি হয়েছি। তার বুদ্ধি হয় তো তোমাদের চেয়ে কিছু কম থাকতে পারে, কিন্তু তবু তো সে চেষ্টা করে পড়াশোনা ও সেলাই বেশ ভালোই করেছে। শুধু তাই নয়, সে তোমাদের মতো কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেনি-বাবা-মায়ের কত সাহায্য করেছে, ছোটো ভাই-বোনকে যত্ন করেছে, কত লোকের কত খুঁটিনাটি কাজ করে দিয়েছে। তোমরা বড়ো হলেও যা তোমাদের খেয়াল থাকেনি, সে ছোটো হলেও সে সব কাজ করে তোমাদের ত্রুটি সেরে দিয়েছে। তোমাদের একটু অন্য কাজ পড়লে তোমরা 'পড়ার ক্ষতি হবে, রান্না শেখা হবে না' বলে কত বিরক্ত হয়েছ, বীণা কিন্তু সর্বদা হাসিমুখে সব কাজ করেছে। বীণাকে বোকা মনে করে তোমরা কত ঠাট্টা কর, কত কথা শোনাও কিন্তু বলো তো, তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য বেশি, নাকি তার সুন্দর স্বভাবটির মূল্য বেশি? আমি তো তার স্বভাব দেখেই সব চেয়ে খুশি হয়েছি, আর তোমরাও যদি তার মতন হও তবে আরও খুশি হব।'

বীণা তো স্বপ্নেও ভাবেনি যে, সে প্রাইজ পাবে-তার সেলাইটা তো তেমন কিছুই ভালো হয়নি-কাজেই দাদু যখন তার হাতে ছোট্ট একটি বাক্স দিলেন, তখন সে অবাক হয়ে গেল। বাক্সটি খুলে দেখল, সুন্দর ছোট্ট একটি সোনার ঘড়ি। দাদু বললেন, 'এটাকে যত্ন করে রাখবে-বড়ো হয়ে যখন এটা ব্যবহার করবে, তখনই দাদুকে মনে করবে, কেমন? আশা করি আমি আবার যখন আসব, তখন রমা নরেন আর সতুও আমাকে এমনি খুশি করে দেবে।'

বীণার এত বেশি আনন্দ হয়েছিল যে, সে কোনো কথাই বলতে পারল না কিন্তু মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল যে দাদুর জিনিসটা খুব যত্ন করে রাখবে, আর এই পুরস্কারের উপযুক্ত থাকতে চেষ্টা করবে। রমা নরেন আর সতুও ঠিক করল, যে আসছে বছর যখন দাদু আসবেন, তখন তাদের প্রতিও তিনি যাতে এমনি খুশি হন, তাই করবে।

*চৈত্র ১৩২৯*




## সুকুমার রায়

প্রফেসর হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারি রাগ করেছেন। আমরা সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানাকথা ছাপিয়েছি; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার কাহিনির কোনো উল্লেখ করিনি। সত্যি এ আমাদের ভারি অন্যায়। আমরা সেসব কাহিনি কিছুই জানতাম না। কিন্তু প্রফেসর হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরি থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এসব সত্যি কি মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিয়ো।

'২৬ জুন, ১৯২২-কারাকোরাম, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন-আমি, আমার ভাগনে চন্দ্রখাই, দুইজন শিকারি (ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

'নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি, চন্দ্রখাই আর শিকারি দু-জনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিস। দু-ঘণ্টা পথ চলে আমরা একজায়গায় এলাম, সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুতরকম। বড়ো বড়ো গাছ, তার একটারও নাম আমরা জানি না। একটা গাছে প্রকাণ্ড বেলের মতো মস্ত মস্ত লাল রঙের ফল ঝুলছে; একটা ফুলের গাছ দেখলাম, তাতে হলদে সাদা ফুল হয়েছে, এক-একটা দেড় হাত লম্বা। আরেকটা গাছে ঝিঙের মতো কী সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপহাপ গুবগাপ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

'আমি আর শিকারি দু-জন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ওইটে তার একটা মস্ত দোষ; খাওয়া পেলে তার আর বিপদ-আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকবার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখতে পেল হাতির চাইতেও বড়ো কী একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। প্রথমে দেখে মনে হল একটা প্রকাণ্ড মানুষ, তার পর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর, তার পর দেখি মানুষও নয়, বাঁদরও নয়-একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মতো হাসছে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল সে টপাটপ খেয়ে শেষ করল। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেললাম। তার পর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে গিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আসল। জন্তুটা মহা খুশি হয়ে এক গ্রাসে আস্ত একখানা পাঁউরুটি আর প্রায় আধসের গুড় শেষ করে, তার পর পাঁচ-সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলাসুদ্ধ কড়মড়িয়ে খেয়ে ফেলল। একটা টিনে করে গুড় দেওয়া হয়েছিল, সেই টিনটাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ

চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রী মুখ করে সে কান্নার সুরে গাঁও গাঁও শব্দে বিকট চিৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি হ্যাংলাথেরিয়াম।



'২৪ জুলাই, ১৯২২-বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তর। এখানে এত দেখবার জিনিস আছে, নতুন নতুন এতসব গাছপালা জীবজন্তু, যে তারই সন্ধান করতে আর নমুনা সংগ্রহ করতে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দু-শোরকম পোকা আর প্রজাপতি আর পাঁচ-শোরকম গাছপালা ফুলফল সংগ্রহ করেছি; আর ছবি যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোনো জ্যান্ত জানোয়ার ধরে সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক কতদূর কী হয়। সেবার যখন কটক টোডন আমায় তাড়া করেছিল, তখন সে কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

'আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয়নি। সেদিন জরিপের যন্ত্র দিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই পাহাড়টাকে মেপে দেখলাম। আমার হিসাবে হল ষোলো হাজার ফুট। কিন্তু চন্দ্রখাই হিসাব করল বেয়ালি×শ হাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দু-জনে মিলে মেপে দেখলাম, এবার হল মোটে দু-হাজার সাত-শো ফুট। বোধ হয় আমাদের যন্ত্রে কোনো দোষ হয়ে থাকবে! যাহোক এটা নিশ্চয় যে এ পর্যন্ত ওই পাহাড়ের চুড়োয় আর কেউ ওঠেনি। এ-এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ, কোথাও জনমানুষের চিহ্নমাত্র নাই, নিজেদের ম্যাপ নিজেরা তৈরি করে পথ চলতে হয়।

'আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত-পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং 'ভাইয়া রে, ভাইয়া' বলে কেঁদে অস্থির। যাহোক মিনিট দশেক ওইরকম হাত-পা ছুড়ে লক্কড় সিং একটু ঠান্ডা হয়ে উঠে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে হয় যে, সংসারে তার কোনো সুখ নেই, এসব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি গোমড়াথেরিয়াম। এমন খিটখিটে খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের জন্তু আর আমরা দ্বিতীয় দেখিনি। আমরা তাকে তোয়াজ-টোয়াজ করে খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রী মতো মুখ করে, ফোঁস ফোঁস ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে তার পর একটুখানি পেয়ারার জেলি মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

'১৪ আগস্ট, বন্দাকুশ পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর-ট্যাপ ট্যাপ থ্যাপ থ্যাপ ঝুপ ঝাপ-সকাল বেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এইরকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি

উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতন বড়ো একটা অদ্ভুতরকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন দিকে চলবে তার কিছুই যেন ঠিক-ঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় তো বাঁ-পা ওদিকে; সামনে চলবে তো পিছনভাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে। তার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভালো করে দেখে, কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়কে গেল যে তক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। তার পর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলেদুলে ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, 'ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।' তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে! আমি ছক্কড় সিংকে বললাম, 'তুমি বন্দুকের আওয়াজ করো, তাহলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার-পাঁচজন তাকে চেপে ধরব!' ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাট ক্যাট শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপটাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগোতে সাহস হল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজি লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তার পর লক্কড় সিঙের দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখিটার মাথাটা থেঁতলে দেবার আয়োজন করেছিল। কিন্তু সে আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিঙের বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই ভাইয়ে এমন মারামারি বেধে উঠল যে, আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দু-জনের তেজ কী তখন! আমি আর দু-জন কুলি ছক্কড় সিঙের জামা ধরে টেনে রাখছি, সে আমাদেরসুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুসি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমতো ভারিক্কে মানুষ; সে ছক্কড় সিঙের কোমর ধরে লটকে আছে, ছক্কড় সিং তাইসুদ্ধ মাটির থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বনবন করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কিনা। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা যে কখন পালাল তা আমরা টেরই পেলাম না। যাহোক এই ল্যাগব্যাগে পাখি বা ল্যাগ-ব্যাগর্নিসের কতকগুলো পালক আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।



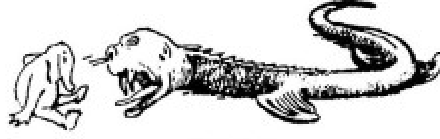
'১ সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে-আমাদের সঙ্গে খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তরিতরকারি যা ছিল, তা তো আগেই ফুরিয়েছে। টাটকা জিনিসের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস আর মুরগি আছে, তারা রোজ কয়েকটা করে ডিম দেয়, তা ছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাছ আর মাংস। এইসব কয়েক সপ্তাহের মতো আছে, সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে। আমরা এইসব জিনিস গুনছি আর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বলল যে, লক্কড় সিং

ভোর বেলা কোথায় বেরিয়েছে, এখন পর্যন্ত ফেরেনি। আমরা বললাম, ‘ব্যস্ত কেন, সে আসবে এখন। যাবে আবার কোথায়?’ কিন্তু তার পরেও দুই-তিন ঘণ্টা গেল অথচ লক্কড় সিঙের দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজতে বেরোবার পরামর্শ করছি, এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠছে নামছে আর মাতালের মতো টলছে। দেখেই আমরা সুড়সুড় করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বলছে, ‘পালিয়ো না, পালিয়ো না, ও কিছু বলবে না।’ তার পরের মুহূর্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগড়ির কাপড় দিয়ে সে ওই অত বড়ো জানোয়ারটাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বলল যে, সে সকাল বেলায় কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ফিরবার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখেই জন্তুটা মাটিতে শুয়ে কোঁ কোঁ শব্দ করতে লাগল। সে দেখল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে, বেশ করে মুছে, নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তার পর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে সে তাকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই বললাম, ‘তাহলে ওটা ওইরকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কি না।’ জন্তুটার নাম রাখা গেল ল্যাংড়াথেরিয়াম।



‘সকালে তো এই কাণ্ড হল; বিকেল বেলা আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। তখন আমরা সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। অনেকগুলো চিল আর পেঁচা একসঙ্গে চেঁচালে যেরকম আওয়াজ হয়, কতকটা সেইরকম। ল্যাংড়াথেরিয়ামটা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে একটা গাছের লম্বা লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল; চিৎকার শুনবামাত্র সে, ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেইরকম ধরনের একটা বিকট শব্দ করে, বাঁধন-টাধন ছিঁড়ে, কতক লাফিয়ে, কতক দৌড়িয়ে, এক মুহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড জন্তু- সেটা কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিনটেরই কিছু কিছু আদল আছে। সে এক হাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে; আর একটা ছোটো নিরীহগোছের কী যেন জানোয়ার হাত-পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে করলাম যে এইবার বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চিৎকারই চলতে লাগল; খাবার কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বলল, ‘আমি ওটাকে গুলি করি।’ আমি বললাম, ‘কাজ নেই, গুলি যদি ঠিকমতো না লাগে, তাহলে

জন্তুটা খেপে গিয়ে কী জানি করে বসবে, তা কে জানে?' এই বলতে বলতেই ধেড়ে জন্তুটা চিৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বলল, 'জন্তুটার নাম দেওয়া যাক চিল্লানোসোরাস।' ছক্কড় সিং বলল, 'উ বাচ্চাকো নাম দেও বেচারাথেরিয়াম।'



বেচারাথেরিয়াম ও চিল্লানোসোরাস

৭ সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে।-নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পৌঁছেছি। আর কোনোদিকে এগোবার জো নেই। দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড়; সোজা দুশো-তিনশো হাত নীচে সমতল জমি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই এরকম। নীচের যে সমতল জমি সে একেবারে মরুভূমির মতো; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এইসব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নীচেই কী যেন একটা ধড়ফড় করে উঠল। দেখলাম, বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমি গাছের মতো মস্ত কী একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নিচু করে ঘুমোচ্ছে। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরও পাঁচ-সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনোটা ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কোনোটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কী যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এইরকম দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কটকটাৎ-কট শব্দ করে প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পাগুলো গুটিয়ে আসতে লাগল। এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার, তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপরে এসে পড়ল। তারপর যে কী হল আমার ভালো করে মনে নেই-খালি একটু একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব বিটকেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানা ঝাপটানো আর জন্তুটার ভয়ানক কটকাটাং আওয়াজ। একটুখানি ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল, তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার জোগাড় করেছিল। অন্য সকলের অবস্থাও সেইরকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলেরই গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিঙের একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছে; লক্কড় সিঙের বাঁ-হাতটা এমন মচকে গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, আমারও সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আরেক হাতে একমুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনই আর বেশি আলোচনা না করে জিনিসপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।'

[প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরি এইখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরও খবর জানবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগনেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, 'এর কাছেই সব খবর পাবে।' চন্দ্রখাইয়ের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই-

আমরা। আপনারা যেসমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সেসব কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়?

চন্দ্র। সেসব হারিয়ে গেছে।

আমরা। বলেন কী! হারিয়ে গেল? এমন সব জিনিস হারিয়ে ফেললেন!

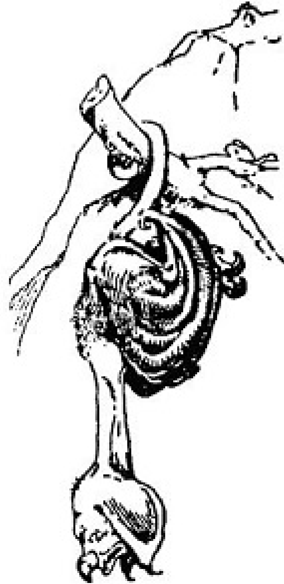
চন্দ্র। হ্যাঁ, প্রাণটুকু যে হারায়নি তাই যথেষ্ট। সে-দেশের ঝড় তো আপনারা দেখেননি। তার এক এক ঝাপটায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড়ো বড়ো তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মতো হুস করে উড়িয়ে নেয়। আমাকেই তো পাঁচ-সাতবার উড়িয়ে নিয়েছিল। একবার তো ভাবলাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল, সে তো আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ! কাঁটা কম্পাস, প্ল্যান, ম্যাপ, খাতাপত্র, কিছুই আর বাকি রাখেনি। কী করে যে ফিরলাম, তা শুনলে আপনার ওই চুল দাড়ি সব শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠবে। আধপেটা খেয়ে, কোনোদিন না খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হতে আমাদের পুরো তিন মাস লেগেছিল।

আমরা। তাহলে আপনাদের প্রমাণ-টমান যা কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে?

চন্দ্র। এই তো আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কী প্রমাণ চাই, আর এই আপনাদের জন্য কতকগুলো ছবি এঁকে এনেছি; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, 'আপনি কোন থেরিয়াম?' আর-একজন বলল, 'উনি হচ্ছেন গপ্পথেরিয়াম-বসে বসে গপ্প মারছেন!' শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে একমুঠো চীনেবাদাম আর গোটা আষ্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার তো এই। এখন তোমরা কেউ যদি আরও জানতে চাও, তাহলে আমাদের ঠিকানায় প্রফেসর হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখলে আমরা তার জবাব আনিয়ে দিতে পারি।]

*বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০*



*তিমি মাছের মতো মস্ত কী জন্তু*




# সুবিমল রায়

একজন ভদ্রলোকের একটা বদভ্যাস ছিল; তিনি রোজ আফিসে যেতে দেরি করতেন। সকালে ঘুম ভাঙলে বিছানা থেকে সহজে উঠতে চাইতেন না। এক ঘণ্টা কেবল এপাশ-ওপাশ করতেন, তারপর গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে কুড়ি মিনিট খালি হাই তুলতেন। কোনো কোনো দিন এত দেরিতে উঠতেন যে, স্নান করবার সময় পেতেন না, কোনোমতে চারটি ভাত মুখে গুঁজে আফিসে দৌড়োতেন। তার জন্য ভদ্রলোকের শরীরও খারাপ হচ্ছিল, আফিসের কাজেরও ক্ষতি হচ্ছিল, কিন্তু তিনি তবু ঘুম থেকে উঠতে দেরি করতেন।

একদিন তিনি উঠে দেখেন যে, ভাত খাবার আর সময় নাই, আফিসে যাবার বেলা হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পথের একটা দোকান থেকে কয়েকটা কচুরি আর একটা রসগোল্লা কিনে নিয়ে, তাই খেতে খেতে আফিসের দিকে ছুট দিলেন। একটু দূর যেতেই একটা চিল ছোঁ মেরে কচুরির ঠোঙাটি নিয়ে গেল; তিনি একরকম না খেয়েই আফিসে গেলেন। আফিসে গিয়েই তাঁর মনে হল-ওই যা! তিনি কচুরিওয়ালাকে একটা টাকা দিয়েছিলেন, খাবারের দাম তো হয়েছিল মোটে ছয় পয়সা, কিন্তু আফিসে যাওয়ার তাড়ায় বাকি পয়সা তো ফেরত নেওয়া হয়নি! সুতরাং সেদিন ভদ্রলোকের খাওয়াও হল না, অথচ টাকাও গেল- অচেনা দোকানদার টাকার কথা কিছুতেই স্বীকার করল না। তিনি সেদিন ঠিক করলেন যে, আর ঘুম থেকে উঠতে দেরি করবেন না।

কিন্তু পরদিনও তিনি উঠতে এত দেরি করলেন যে, ভাত খাবার আর সময় পেলেন না, তাড়াতাড়ি শুধু একটু দই খেয়ে আফিসে ছুটলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে দৌড়োতে রাস্তার মোড়ে হঠাৎ একটা ষাঁড়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে, তিনি রাস্তায় পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুটতে লাগলেন। খানিকদূর গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেলেন। তিনি ভাবলেন যে, গাড়িতে গেলে অল্প সময়ের ভিতর আফিসে পৌঁছোতে পারবেন, তাই ছুটে গাড়ি ধরতে গেলেন। কিন্তু গাড়ি ধরবার আগেই একটা আমের খোসায় পা পড়াতে পা পিছলিয়ে গেল। নিজেকে সামলাবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি পাশের একজন কাবুলিওয়ালার জামা খামচিয়ে ধরলেন। হঠাৎ জামায় টান পড়াতে কাবুলিওয়ালা একপাশে কাত হয়ে পড়ল আর নিজেকে বাঁচাবার জন্য পাশের এক পুলিশের পাগড়িতে খামচিয়ে ধরল। পুলিশের মাথা থেকে পাগড়ি তখনই খুলে এল, তাই কাবুলিওয়ালা সেই ভদ্রলোকের উপর পড়ে গেল। ভদ্রলোকটি কাদা-টাদা মেখে অনেক কষ্টে উঠে, কাবুলি আর পুলিশকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করে একটা গাড়ি ধরলেন। ততক্ষণে আফিসে যাবার সময় অনেকক্ষণ হল পার হয়ে গিয়েছে।



গাড়ি আফিসের কাছে এসে থামবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামতে গিয়েছেন, আর অমনি গাড়ির দরজার এক পেরেকে জামার পকেট আটকিয়ে গিয়ে, প্রায় আধ হাত জামা ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল। তারপর গাড়োয়ানকে পয়সা দিতে গিয়ে দেখেন যে তাড়াতাড়িতে পয়সার ব্যাগ বাড়িতে ফেলে এসেছেন। তারপর আফিসে যেই ঢুকেছেন অমনি আফিসের লোকেরা তাঁকে দেখেই 'একী মশাই! এ কী করেছেন!' বলে চিৎকার করে উঠেছে। তিনি ব্যাপার বুঝতে না পেরে আয়নার সামনে গিয়ে দেখেন যে, বাড়ি থেকে দই খেয়ে আসবার সময় তাড়াতাড়িতে ভালো করে মুখ মুছতে পারেননি, তাই সমস্ত দাড়িতে আর গোঁফে দই লেগে রয়েছে। নিজেই দইমাখা চেহারা দেখে সেদিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর কখনো ঘুম থেকে উঠতে দেরি করবেন না। তখন থেকে তিনি প্রতিদিন সকালে উঠতেন আর আফিসে যেতেও দেরি হত না।

*বৈশাখ ১৩৩০*




# বিজয়চন্দ্র মজুমদার

এক যে ছিলেন রাজা। কী? তোমরা ওরকম পচা গল্প ঢের জান? না, জান না; এ গল্পে যুদ্ধ আছে, সন্ধি আছে, আরও নানা কথা আছে।

সেই যে ছিলেন রাজা, তাঁহার নাম ছিল বীর রাজা। বীর রাজা একদিন মন্ত্রীকে বলিলেন, 'তাঁহার মনটা উশখুশ করিতেছে, আর হাত নিশপিশ করিতেছে; তিনি দিগবিজয় করিবেন, আর প্রথমেই যুদ্ধ করিবেন তাঁহার পড়শি ধীর রাজার সঙ্গে।'

লোকলশকর হাতি ঘোড়া সাজানো হইল, যুদ্ধযাত্রার দিন ঠিক হইল, আর মন্দিরে মন্দিরে বীর রাজার জয়ের জন্য ও ধীর রাজার ক্ষয়ের জন্য পূজাপাঠ হইয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ রাজাকে এত্তেলা দিলেন-'সব প্রস্তুত'।

বীর রাজা ঘোড়ায় চড়িতে ভালোবাসিতেন; তিনি ঘোড়া আনিতে বলিলেন। রাজা বাজে ঘোড়ায় চড়িতেন না-তাঁহার চড়িবার জন্য দুইটি পছন্দসই ঘোড়া ছিল; একটি ঘোড়া ভালোবাসিত নীল রং দেখিতে, ও আরেকটি ভালোবাসিত সবুজ রং দেখিতে। জয়ডঙ্কা বাজিল, শাঁখ বাজিল, সংস্কৃতে মন্ত্র পড়া হইল, আর রাজার ঘোড়া দুইটি সাজাইয়া আনা হইল। ঘোড়াদের গলায় ঘুঙুর, মাথায় জরির ঝালর ও পিঠে সোনালি জরির কাজ করা নানা চিত্রে ছককাটা গদি।

রাজা প্রথমে চড়িলেন নীল-প্রিয় ঘোড়ায়; শাঁখ ও ভেরি বাজিয়া উঠিতেই সে ঘোড়া নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া শির-পা করিয়া দাঁড়াইল-যেন সে মাটিতে পা না দিয়া আকাশে উড়িতে চায়। রাজার স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না-তিনি বহু কষ্টে সে ঘোড়া থেকে নামিয়া সবুজ-প্রিয় ঘোড়ায় চড়িলেন; সে ঘোড়া ইট-পাথরে বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া, সবুজ মাঠের পথে অতি সবুজ বনের দিকে ছুটিল। সে পথে বিষম খানাখন্দ; সহিসেরা দৌড়াইয়া গিয়া ঘোড়া ধরিল। রাজার স্বর্গে যাওয়া হয় নাই; খানাখন্দের পাতালে যাওয়াও হইল না। তাঁহার ঘোড়ায় চড়া হইল না; তিনি মন্ত্রীর পরামর্শে পালকিতে উঠিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত্র কাহারেরা মারা পড়িলে, ধপাস করিয়া পালকি পড়িতে পারে; বীর রাজা সে ভয়ের কথা বলিলেন। যে ছিল কাহারদের দলের সর্দার-অর্থাৎ কিনা বেহারা*, সে রাজাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল, 'তাহারা মারা পড়িবে না, কারণ তাহাদিগকে মারিলে অন্য রাজা-বড়োলোকদের বহিবার লোক থাকিবে না।' রাজা পালকিতে চড়িলেন; আবার শাঁখ ও জয়ডঙ্কা বাজিল, ও ভাটেরা বীর রাজার বীর কীর্তির ছড়া আওড়াইতে লাগিল।

বীর রাজার সৈন্যেরা রাতারাতি তাহাদের রাজ্যের সীমানার পাহাড় পার হইয়া ধীর রাজার রাজ্য দিয়া চলিল। কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্য নাই-চাষারা নিরুদবেগে খেতে কাজ করিতেছে, রাখালেরা গান গাইতেছে। বীর রাজার সৈন্যেরা চটিয়া জগঝম্প বাজাইল;

চাষারা কাজ ফেলিয়া সৈন্যদল দেখিল, রাখালেরা ছুটিয়া কাছে আসিল, গোরুরা ছুটিয়া পলাইল, আর গ্রামের ছেলে মেয়ে ঝি-বউয়েরা মজা দেখিতে লাগিল। কেহ বলিল পালকিতে বউ যাইতেছে, কেহ বলিল বর বিবাহ করিতে যাইতেছে। রাজা চটিয়া ভাটকে আদেশ দিলেন যে, সে চেঁচাইয়া বলিবে-বীর রাজাই এরাজ্যের মালিক। ভাট চেঁচাইল, কিন্তু সে রাজ্যের কেহ উচ্চবাচ্য করিল না।

বেলা এক প্রহর গড়াইবার পর বীর রাজা সসৈন্যে ধীর রাজার সিংহদ্বারে গিয়া তূরী ভেরি বাজাইলেন। প্রহরীরা সসম্মানে ফটক খুলিয়া দিল, আর 'আসতে আজ্ঞা হউক-আজ আমার সুপ্রভাত' ইত্যাদি বলিয়া ধীর রাজা বীর রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বীর রাজা পালকি থেকে নামিয়াই মহা দর্পে বলিলেন যে, 'সে রাজ্যটা তাঁহার।' ধীর রাজা বীর রাজাকে হাত ধরিয়া নিজের সভায় লইয়া বলিলেন, 'এ বাড়িঘর সবই আপনার; আপনি এখন বিশ্রাম করুন, স্নানাহার করুন এবং আপনার সঙ্গের লোকেরাও করুক।' বীর রাজা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া সভায় বসিলেন; আর তাহার পর সকলেরই স্নানাহার শেষ হইল।

অপরাহ্নে বীর রাজা বলিলেন, 'আমি বীর, আমি জয়ী; এখন আমার সৈন্যেরা এখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করুক।' ধীর রাজার মন্ত্রী তাঁহাকে শুনাইলেন যে তাঁহার সৈন্যেরা একটা বড়ো চাবি দেওয়া ঘরে বিশ্রাম করিতেছে, আর অস্ত্রশস্ত্র রাজগুদামে বন্ধ আছে; তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ধীর রাজার সৈন্যেরাই তাঁহাকে জয়ধ্বনি শুনাইতে পারে। বীর রাজা চটিয়া ফটকের দিকে ছুটিলেন-কিন্তু দেখিলেন ফটক বন্ধ।

বীর রাজা চটিয়া ধীর রাজাকে বলিলেন, 'আমি এই রাজ্য জয় করিয়াছি, তুমি অধীনতা স্বীকার করো, এবং প্রথা অনুসারে তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিবাহ দাও।' ধীর রাজা জানাইলেন যে বীর রাজার মতো সুপাত্রকে কন্যা দান করিতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু এখনও তাঁহার মেয়ে হয় নাই, এবং তাঁহার পক্ষে সসম্মানে ফিরিয়া যাইবার পথেও বাধা হইবে না; কারণ ধীর রাজার দূতেরা বীর রাজার রানির কাছে-রাজ-খালাশি টাকা লইয়া শীঘ্রই ফিরিবে। বীর রাজা বুঝিলেন, সর্বনাশ হইয়াছে-তিনি বন্দি। ধীর রাজা বলিলেন, 'আমার সুপ্রভাত, আপনি এখানে পায়ের ধূলা দিয়াছেন; আপনার রানি যে টাকা পাঠাইবেন, তাহা দিয়া অনেক টোল পাঠশালা ও চিকিৎসালয় করা যাইবে এবং তাহাতে এ-রাজ্যে আপনার নাম থাকিবে; আর আপনার নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য ঠিক করা গিয়াছে যে আপনার রাজ্যের সীমার পাহাড়টি এ-রাজ্যকে দান করিবেন বলিয়া সন্ধিপত্রে লিখিয়া দিবেন।' মন্ত্রী আনিয়া বীর রাজাকে সন্ধির কাগজ দিলেন এবং বীর রাজা যেমন করিয়া হউক দস্তখত দিলেন।

রানি যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পৌঁছিল; বীর রাজার সৈন্যেরা বিনা হাতিয়ারে ফিরিল এবং ধীর রাজার সৈন্যেরা পাহাড় দখল লইতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রাজা পালকিতে চড়িলেন, কিন্তু মাথার পাগড়ি খুঁজিয়া পাইলেন না; খালি মাথায় গেলে পথের লোকেরা তাঁহাকে পরাজিত রাজা মনে করিবে ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন। ধীর রাজা বলিলেন, 'আপনি যাইবেন পালকিতে, কাজেই উষ্ণ তাপ নিবারণের জন্য উষ্ণীষের প্রয়োজন নাই এবং কেহ যুদ্ধ করিতে আসিবেন না বলিয়া শিরের ত্রাণের জন্য-অর্থাৎ মাথা বাঁচাইবার জন্য শিরস্ত্রাণের প্রয়োজন নাই।' বীর রাজা বুঝিলেন, এখন অন্য টুপি মাথায় দিলে গাধার টুপি পরা হইবে। বীরে ধীরে এই রকমেই যুদ্ধ হয়।

*আষাঢ় ১৩৩০*



---

* 'বেহারা' শব্দের একালের ব্যবহারের কথা বলি। সকল রকম কাজ করিবার দলের সর্দারকেই সে কালে বেহারা বলিত; হয়তো সকল কাহারকেই খুশি করিবার জন্য সকলকেই বেহারা বলিতে বলিতে কাহারের নাম হইয়াছে বেহারা। ইংরেজদের বাড়ির সকল চাকরই চাকর দলের সর্দার নয়; তবুও তাহাদের নাম বেহারা। ওড়িশায় নানা জাতির দলের মোড়লকেই বেহারা বলে; ব্রাহ্মণদেরও এই জন্য বেহারা উপাধি আছে।




# সুখলতা রাও

বেনেগ্রাম ছোটো একটি গ্রাম। কিন্তু ছোটো হইলেও গ্রামে কয়েক ঘর অবস্থাপন্ন লোকের বাস আছে। তখন রেল হয় নাই, সেইজন্য নৌকো করিয়া দূর দেশে যাওয়া-আসা চল ছিল। বেনে-গ্রামের কাছেই নদী থাকায় ব্যবসায়েরও সুবিধা ছিল। ধনেশ্বর বণিক গ্রামের মধ্যে একজন বড়ো লোক। তাঁহার প্রকাণ্ড দোতলা পাকা বাড়ি, বাগান পুকুরে ঘেরা। সেই বাগানের বেড়া ঘেঁষিয়া ছোটো একটি একতলা বাড়ি, সেখানি রামলোচন নামে এক গরিব কায়স্থের।

এই একতলা বাড়ির পিছনে খানিকটা পোড়ো জমি। তারই উপর দেখা যায়, ঝোপজঙ্গল ও বাঁশঝাড়ের মাঝখানে, একটি ঢিপির মাথায় একটা ভাঙা মন্দির। এই পোড়ো জমিটুকু নাকি বহুকাল আগে রামলোচনের পূর্বপুরুষেরাই ভোগ করিতেন। প্রবাদ আছে, সে মন্দিরে এক সময়ে খুব ঘটা করিয়া পূজা হইত, এবং এখনও নাকি দেবমূর্তির বেদির নীচে কিংবা মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে, কিংবা আঙিনার তুলসীতলায় কোনো একজায়গায় অনেক ধনরত্ন লুকানো আছে। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রবাদ আছে যে, মন্দিরের কাছের বাঁশঝাড়ে ভূতের বাসা, কেহ মন্দিরের কাছে গেলে ভূত তাহার ঘাড়ে চাপে। তাহা না হইলে অনেক আগেই লোকে সে ধনরত্নের খোঁজ করিত। যাহা হউক, গ্রামের লোকে সেসব কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। কেবল ঠাকুরমা দিদিমারা মাঝে মাঝে ছোটো ছেলে-মেয়েদের কাছে সেই ধনের কথা ও ভূতের কথা গল্প করিতেন।

ধনেশ্বরের প্রকাণ্ড বাড়িতে থাকিতেন কেবল তিনি নিজে, তাঁহার স্ত্রী ও দাস-দাসীরা। তাঁহাদের একটিও ছেলে কি মেয়ে ছিল না। পাশের ছোটো একতলা বাড়িতে থাকিতেন রামলোচন, তাঁহার স্ত্রী ও বুড়ি ঝি চণ্ডী, তাঁহাদেরও ছেলে-মেয়ে ছিল না।

একদিন ভোর বেলা গ্রামের লোকে ঘুম ভাঙিয়া শুনিল, দোতলা বাড়িতে ও একতলা বাড়িতে, দুই বাড়িতে যেন রেষারেষি করিয়া শাঁখ বাজিতেছে। ধনেশ্বরের অনেক কাল পরে একটি ছেলে হইয়াছে, তাই এত শাঁখের ধুম। বণিকবাড়ির দাসী একতলা বাড়ির বেড়া ফাঁক করিয়া ডাকিল, 'কী লা চণ্ডী, তোরাও দেখি শাঁখ বাজাস? আমাদের ঘরে রাজপুত্র এয়েচেন, তোদের ঘরে কে এয়েচে লা?' চণ্ডী ঝি একগাল হাসিয়া বলিল, 'আমাদেরও রাজপুত্তুর এয়েচেন।'

ধনেশ্বর তাঁহার ছেলের নাম রাখিলেন, 'কমলাচরণ'। তাঁহার ইচ্ছা সে লক্ষ্মীরই সেবা করিবে। তিনি গণক ডাকিয়া ছেলের কোষ্ঠী করাইলেন। কোষ্ঠীতে লেখা ছিল, সে পরের ধন ভোগ করিবে। রামলোচন তাঁহার ছেলের বড়ো বড়ো চোখ দুটি দেখিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'পদ্মলোচন'। সকলে কমলাচরণকে ক্রমে 'চরণ' ও পদ্মলোচনকে 'লোচন' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। চরণ দোতলার উপরে সাত দাসীর কোলেপিঠে মানুষ হইতে লাগিল। লোচন গরিবের ঘরে, মায়ের ও চণ্ডী দাসীর আদরে মানুষ হইতে লাগিল। কিন্তু কেমন

করিয়া জানি একদিন চরণ আর লোচনে ভারি ভাব হইয়া গেল; যদিও তাহাদের জাতিতে মেলে না, যদিও একজন গরিবের ছেলে আর একজন ধনীর ছেলে।

ইহার মধ্যে হঠাৎ রামলোচন স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তখনও লোচন খুবই ছেলেমানুষ। তাহার মা অতি কষ্টে বাসনপত্র বাঁধা দিয়া, বিক্রি করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। চরণ ও লোচন দু-টিতে একসঙ্গে পাঠশালে যায়। চরণের পড়ায় তত মন নাই। কিন্তু লোচন জানে সে লেখাপড়া শিখিয়া বড়ো হইলে, তবে তাহার মায়ের দুঃখ ঘুচিবে, তাই সে মন দিয়া পড়ে শুনে।

চণ্ডীর কাছে লোচন মন্দিরের লুকানো ধনের কথা শুনিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় জানালার ধারে বসিয়া লোচন দেখিত, দূরে কালো ঢিপির উপর অন্ধকার মন্দির আর তার পাশে বাঁশের বন। চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিত, 'ওই মন্দিরে না জানি কত হিরা-মানিক লুকানো আছে। আহা! সে সমস্ত যদি আমি পেতাম, তবে আর আমাদের এমন কষ্ট থাকত না। ও জমি তো আমাদেরই ছিল, ও ধনও তবে আমাদের।' তাহার ইচ্ছা হইত একবার গিয়া খুঁজিয়া দেখে, যদি-বা কপাল গুণে সে ধন পায়। কিন্তু বাঁশের বনের দিকে চাহিয়া তাহার আর সাহসে কুলাইত না। তারপর মনে মনে বলিত, 'যখন বড়ো হব তখন খুব সাহস হবে আর ভূতের ভয় থাকবে না, তখন আমি ওই মন্দিরে গিয়া খুঁজব।' সে চণ্ডীকে বলিত, 'চণ্ডী! জানিস, আমি যখন বড়ো হব, ওই মন্দির থেকে অনেক মোহর এনে তোকে আর মাকে দেব।' চণ্ডী ভয় পাইয়া বলিত, 'খবরদার খোকাবাবু! ওখানে যেতে নেই, ওখানে ভূত আছে।'

এমনি করিয়া বছর যায়। লোচনের পড়া শেষ হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের যে দুঃখ সেই দুঃখই আছে। লোচনের বয়স এখন ষোলো-সতেরো হইবে। চরণের সঙ্গে এখনও তার ভাব, তবে এখন তাহাকে কাজের চেষ্টায় ঘুরিতে হয়, বাড়ি বাড়ি গিয়া দু-একটি ছেলেকে পড়াইতে হয়, তাই বন্ধুর সঙ্গে তাহার বড়ো দেখা হয় না। চরণ বড়োলোকের ছেলে, তাহার অনেক নূতন সঙ্গী জুটিয়াছে, সে লোচনের কথা প্রায় মনেই আনে না।

লোচন কিন্তু মন্দিরের কথা ভোলে নাই। একদিন দুপুর বেলা সে ছোটো একখানা শাবল হাতে করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া মন্দিরের দিকে চলিল। পোড়ো জমি, উঁচু-নীচু খানাখন্দ পার হইয়া যাইতেছে; মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া দেখে কেহ আসিতেছে কি না, মাঝে মাঝে এপাশে-ওপাশে গাছের দিকে চায়। যদিও ভূতের ভয় করিবে না মনে করিয়াছে, তবুও গাটা যেন ছমছম করিতেছে। শেষে যখন মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িল, তখন উৎসাহেতে ভূত-টুত সব ভুলিয়া গেল।

অনেক পুরোনো মন্দির, ছাত পড়িয়া গিয়াছে, একদিকের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে; সেই দিকেই বাঁশ বন। একটা বড়ো বাঁশের ঝাড় একেবারে উঠোনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই বাঁশঝাড়ের নীচে তুলসীমঞ্চ। মন্দিরের দেওয়ালের ও তুলসীমঞ্চের গাঁথুনি ছোটো ছোটো ইটের। উঠানে রাশিকৃত ইট-পাটকেল, ভাঙা দরজা কড়িবরগা, বড়ো বড়ো পাথরও। লোচন আগে সেই তুলসীমঞ্চের নীচে খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবু মাত্র আধ হাতের বেশি খুঁড়িতে পারিল না। কাজেই সেদিন বাড়ি ফিরিতে হইল। কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নহে। এমনি করিয়া প্রতিদিন সে মন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিল। ভূতের কথা সে ভুলিয়া গেল। তুলসীমঞ্চের নীচে কিছু পাওয়া গেল না। তখন সে মন্দিরের আবর্জনা সরাইয়া ঠাকুরের ভাঙা বেদি বাহির করিল। সেখানে কোনো মূর্তি নাই। বেদিখানা পাথরের তৈয়ারি। একখানি একখানি করিয়া পাথর ছেনি দিয়া কাটিয়া, শাবল দিয়া খুঁড়িয়া, অনেক কষ্টে সে সেগুলিকে সরাইল। পাথরের নীচে ধুলা মাটিতে শাবলের

ঘা মারিতে ঠন করিয়া শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি দুই হাতে মাটি সরাইয়া, লোচন দেখিল, দেড় হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া একটা লোহার কবাট। কবাটের গায়ে একটা আংটা লাগানো। লোচন প্রাণপণে সেই আংটা ধরিয়া টানিল, কিন্তু কবাট খুলিল না। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, কবাটের পাশে মাটিতে দুই পা জোরে বসাইয়া, দুই হাতে গায়ের জোরে টানিল; তাহার হাতের শির ফুলিয়া উঠিল, মুখ লাল হইয়া গেল, তবু লোহার কবাট নড়িল না। তখন সে হতাশ হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। এত কষ্ট করিয়াও কিছু ফল হইল না। তখন তাহার মনে হইল, একজনে না পারিলে, দুইজনে পারা যাইবে। কিন্তু কাহাকে বিশ্বাস করিয়া সে সাহায্য করিতে ডাকিবে, চণ্ডী দাসী? চণ্ডী দাসী তো বুড়ি, তার গায়ে জোর কোথায়? তা ছাড়া, এ কথা শুনিলে নিজে তো আসিবেই না, তাহাকেও আসিতে দিবে না, ভূতের ভয়ে। তখন তাহার মনে হইল, 'বন্ধুকে বললে কেমন হয়?' ঠিক কথা। চরণই উপযুক্ত লোক। সে তাহার বন্ধু, তাহাকে বিশ্বাস করা যায়। তা ছাড়া, যদি ধন পায়ই, লোচন গরিব মানুষ, কোথায় সে এত ধন রাখিবে? সে বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া ধন লইবে, তাহার বদলে বন্ধু তাহাকে সাহায্য করিবে এবং ধন নিরাপদে রাখিবার ভার লইবে। এই ঠিক।

লোচন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিল। কিন্তু সেদিন তাহার এত পরিশ্রম হইয়াছিল, যে, সেদিন আর সে চরণের সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না।

পরদিন লোচন চরণকে একলা ডাকিয়া নিয়া বলিল, 'ভাই, তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারি কথা আছে। একটা কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে? কিন্তু আর কেউ যেন জানতে না পায়।' চরণ বলিল, 'কী তোমার এমন গোপনীয় কাজ, শুনি? যদি তাতে আমার কোনোরকম ক্ষতি না হয়, তবে সাহায্য করতে পারি।' লোচন বলিল, 'তোমার ক্ষতি তো নেইই, বরং লাভ। তুমি যদি কিছু না-ও কর, তবু এসব কথা আর কাউকে বোলো না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি। ওই যে ভাঙা মন্দির আছে না, যেখানে ধন লুকানো আছে বলে লোকে বলে, সেখানে আমি গিয়েছিলাম।'

'সত্যি! তারপর? ভূত দেখলে?'

'না না, ভূত কী, ভূতের কথা আমার মনেও হয়নি, আমি ওই ধন খুঁড়তেই গিয়েছিলাম।'

'পাগল আর কি।'

'শোনোই না কেন আমার কথা। তুলসীতলায় আগে খুঁড়লাম, সেখানে কিছু পেলাম না। তারপর বেদির নীচে খুঁড়তেই হঠাৎ ঠন করে একটা আওয়াজ হল-'

'তারপর?'

'তারপর তাড়াতাড়ি মাটিগুলো সরিয়ে দেখি কী, একটা লোহার কবাট।'

'লোহার কবাট? তারপর?'

'তারপরে আর কী? অনেক চেষ্টা করেও কবাটটা খুলতে পারলাম না, তাই তোমার কাছে এসেছি। যদি কিছু পাই তো তোমার অর্ধেক, আমার অর্ধেক। তবে কি জানলে, আমি গরিব মানুষ, কোথায় সে সব রাখব? তোমাকেই তার বন্দোবস্ত করতে হবে। কেমন, রাজি আছ তো?'

'রাজি।'



পরদিন দুপুরে লোচন আর চরণ দু-জনে মন্দিরে গেল। চরণ বলিল, 'লোহার দরজা মরচে পড়ে আটকে রয়েছে। এক কাজ করা যাক, আগে দরজাটার চার দিকে শাবল দিয়ে আলগা করে নিয়ে, তারপর দু-জনে মিলে আংটা ধরে টানা যাক।'

লোচন-'আংটাটাও তো মরচে ধরা, যদি ভেঙে যায়?'

'যায় যদি তো আর কী করা যাবে? তখন দরজাটাকেই শাবল দিয়ে খুঁড়ে তুলতে হবে।'

তখন তাহারা আস্তে আস্তে দরজার চারিদিকে শাবল দিয়ে ঘা মারিতে লাগিল। দরজাটা যখন একটু আলগা মনে হইল, তখন দু-জনে মিলিয়া আংটা ধরিয়া খুব জোরে টান দিল। অমনি খটাং করিয়া লোহার দরজা উঠিয়া আসিল। দরজার ভিতর দিয়া দেখা গেল, নীচে ছোট্ট একটি কুঠুরি, দুইজন মানুষ কোনোমতে ঢুকিতে পারে। লোচন দরজার ফোকরে দুই-পা ঝুলাইয়া দিয়া কুঠুরির ভিতর নামিয়া পড়িল, পিছন পিছন চরণও নামিল। প্রথমে অন্ধকারে তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল বিশ্রী একটা গুমোট গন্ধে তাহাদের যেন দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। তারপর ক্রমে ভিতরের অন্ধকার তাহাদের চোখে সহ্য হইয়া আসিলে, তাহারা দেখিতে পাইল, কুঠুরির দেওয়ালের গায়ে ষোলোটি পিতলের ঘড়া সাজানো। ঘড়ার ভিতরে হাত দিয়া দেখিল মোহর! চরণ লোচনের দিকে চাহিল, লোচন চরণের দিকে চাহিল, কেহ কিছু বলিল না। দুইজনেই আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল; ভিতরে যেন তাহারা নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিল না।

বাহিরে আসিয়া লোচন বলিল, 'এখন এত মোহর বাড়ি নেব কেমন করে?'

চরণ বলিল, 'দিনের বেলা নেওয়া যাবে না। তাহলে অন্য লোকে দেখে ফেলবে। ও একটা ঘড়া আমরা দু-জনে মিলে তুলতে পারব কি না সন্দেহ। রাত্রে নিতে হবে। বেশি দিন আবার ফেলে রাখাও নিরাপদ নয়।'

'তবে চলো আজ রাত্রেই আরম্ভ করি।'

'রোসো, আমি আগে রাখবার জায়গা ঠিক করি। তা ছাড়া, পরশুদিন অমাবস্যা গিয়েছে, আজ রাত্রে অন্ধকার হবে। জ্যোৎস্না রাত না হলে হবে না।'

'তাইতো, তাহলে কিছুদিন সবুর করতে হয়। সাত-আট দিন পরে হতে পারে। এসো তবে এখন যাওয়া যাক।' দরজাটা আবার বন্ধ করিয়া দিয়া তাহারা বাড়ি ফিরিল।

এতদিন রোদে রোদে এত পরিশ্রম করার ফলে লোচনের জ্বর আসিল। বিকালে চরণ আসিয়া দেখিল বন্ধু শয্যাগত। সে মুখে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাহার বিশেষ দুঃখ হয় নাই। মোহর দেখিয়া অবধি তাহার যেন মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। সে কেবল ভাবিতেছে, 'আটটা ঘড়া আমার, আটটা লোচনের। যদি ষোলোটাই আমার হত তবে কেমন হত?' ক্রমেই এই দুষ্টবুদ্ধি তাহাকে পাইয়া বসিল। তাই সে লোচনের জ্বর হইয়াছে দেখিয়া, মনে মনে বলিল, 'এইবার সুযোগ।' কিন্তু তখনও অন্ধকার রাত,

কিছুদিন দেরি করিতে হইবে। তারপরের দিন-দুপুরে চণ্ডী দেখিল, চরণ কতকগুলি বাঁশের চোঙা হাতে করিয়া পোড়ো জমির দিকে যাইতেছে। চণ্ডী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ‘দাদাবাবু, লোচনের যে বড্ড অসুখ, একবার তাকে দেখে যাবে না?’ ‘এই যাব।’ বলিয়া চরণ চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় চরণ লোচনকে চুপিচুপি বলিল, ‘জান ভাই, সেইদিন থেকে নাকি মন্দিরের কাছে বাঁশঝাড়ের ভিতর কীরকম বিকট শব্দ শোনা যায়। আমরা টাকার সন্ধান পেয়েছি বলে বোধ হয় ভূতগুলো রেগেছে। কাল রাত্রে যখন জোরে বাতাস বইছিল, আমাদের দোতলা থেকে ‘হু-হু’ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শব্দটা ঠিক মন্দিরের দিক থেকে আসছিল।’ লোচন বলিল, ‘আর তো মাত্র ৫-৭ দিন আছে, এর মধ্যে আমি ভালো হয়ে উঠলে হয়।’

জ্যোৎস্না রাত আসিয়া পড়িল, কিন্তু লোচনের জ্বর সারিল না। চরণ সুযোগ বুঝিয়া একরাত্রে, সেই মোহরের সন্ধানে মন্দিরে চলিল। তাহার যে ভূতের ভয় ছিল না তাহা নহে, তবু টাকার লোভে সে অন্য কথা ভুলিতে চেষ্টা করিল। লোহার কবাট এখন আলগা, কাজেই সেটাকে সে একটু চেষ্টা করিয়াই খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে অন্ধকার। সে তো বাতি আনে নাই! কিন্তু এত কষ্ট করিয়া আসিয়া আবার ফিরিয়া যাইবে? তাই সে চোখ-মুখ বুজিয়া অন্ধকারেই নামিয়া পড়িল।

হাতড়াইতে হাতড়াইতে যেমনি একটি ঘড়ার গায়ে হাত ঠেকিল, অমনি ধুড়ুস করিয়া কীসের একটা শব্দ হইল। ভয়ে চরণের সমস্ত শরীরের লোম যেন দাঁড়াইয়া উঠিল। উপর দিকে চাহিয়া দেখে, দরজার ফাঁক দিয়া যেখানে জ্যোৎস্নাভরা চারকোণা আকাশ চকচক করিতেছিল, সেখানটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার, দরজাটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে! নামিবার সময়ে তাড়াতাড়িতে সে ভালো করিয়া দেখে নাই, চারপাশের ছড়ানো পাথরগুলো এমনভাবে ছিল যে, দরজাটা খুলিলে, উলটাইয়া মাটিতে না পড়িয়া, পাথরের গাদার গায়ে ঠেকিয়া খাড়া হইয়া ছিল। ঝড়েও বোধ হয় ইট পাটকেল একটু নাড়াচাড়া হইয়া থাকিবে, কেমন করিয়া জানি একটা পাথর গড়াইয়া দরজার উপরে পড়িয়া যায়, তাহাতেই দরজাটা বন্ধ হইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত চরণের যেন বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে দুই হাত উঁচু করিয়া পাগলের মতো দরজায় ঘুসি মারিতে লাগিল। উপর হইতে টানিয়া খোলা সহজ; নীচ হইতে খোলা সহজ নহে, বিশেষত দরজাটা ভালো করিয়া হাতে পাওয়া যায় না। ঘুসি মারিতে মারিতে তাহার হাতের মুঠা কাটিয়া রক্ত বাহির হইল। যখন হয়রান হইয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল, তখন তাহার গা বাহিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে; সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, ‘হায় রে, আমার লোভের এই শাস্তি। এই অন্ধকার মাটির নীচে আমাকে মরতে হবে। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও তো কেউ এখানে শুনতে পাবে না, আমি নিজেই যে সে পথ বন্ধ করেছি। লোচনের অসুখ, সেও আসতে পারবে না।’ ক্রমে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল।

পরের দিন বণিকবাড়িতে হুলুস্থুল কান্নাকাটি, চরণকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। গ্রামের চারিদিকে লোক ছুটিতেছে, পুকুরে পুকুরে জাল ফেলা হইয়াছে। মন্দিরের কথা কেহ ভাবে নাই, ভাবিবার কথাও নহে। এদিকে লোচন জ্বর বিকারে বিছানায় পড়িয়া। বিকাল বেলা আকাশ অন্ধকার করিয়া ঝড় আসিল। এক-একবার বাতাস ঝাপটা দেয়, আর কোঠাঘরগুলি পর্যন্ত যেন নড়িয়া উঠে। লোচন বিছানায় ছটফট করিতেছে, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছে। মাঝে মাঝে যখন একটু জ্ঞান হয়, চারিদিকে চাহিয়া দেখে। একবার দেখিল দরজার কাছে চণ্ডী দাসী ঘুমাইয়া আছে। আবার শুনিল বাতাস

হাঁকিতেছে, ‘হু-হু’ করিয়া বাঁশঝাড়ের ভূতটা কাঁদিতেছে। তাই তো, আজ না তাহাদের মন্দিরে যাইবার কথা ছিল? এমন দিনে কি আর যাওয়া যায়? আরও কিছুদিন দেরি করিতে হইবে। আবার দেখিল, যেন চরণ সেই ঝড়ে বৃষ্টিতে মন্দিরের উঠানে একটা পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, ভূতটা যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিল। লোচন স্পষ্ট শুনিল, চরণ তাহার নাম ধরিয়া ‘লোচন লোচন’ বলিয়া চিৎকার করিতেছে। যতবার তাহার ঘুম আসে, ততবার সেই চিৎকার শুনিতে পায় ‘লোচন, লোচন, লোচন’। শেষে আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, লাফাইয়া বিছানা হইতে নামিয়া দরজা দিয়া ছুট দিল। চণ্ডী দাসী পিছনে পিছনে ছুটিল ‘কোথা যাও, কোথা যাও, পাগল হলে নাকি? ও মা গো, দেখো এসে লোচনের কী হল?’

কোনো দিকে দৃষ্টি নাই, কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই, লোচন সোজা মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে। বাঁশঝাড়ের কাছে আসিতে, সাদা রঙের কী যেন একটা সড়সড় করিয়া গাছের উপর হইতে নামিল। লোচন মচমচ করিয়া বাঁশের খোলাটা মাড়াইয়া চলিয়া গেল। মন্দিরের উঠানে পৌঁছিয়া সে একবার থামিল, একবার চারিদিকে চাহিল, তারপর চিৎকার করিয়া ডাকিল, ‘চরণ’! কেউ কোথাও নাই, কেবল বাঁশঝাড়ে ‘হু-হু’ করিয়া কে যেন গোঙাইতেছে। আবার আরও জোরে ডাকিল ‘চর-ণ’। এবার যেন তাহার মনে হইল মাটির ভিতর হইতে কে কী বলিল। সে ছুটিয়া গিয়া দরজার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাকিল, অমনি স্পষ্ট শুনিল ভিতরে কে যেন কাঁদিতেছে। অমনি দুই হাতে দরজা ধরিয়া টানিতে লাগিল। এতদিন ভুগিয়া তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তবু সে দরজা খুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষটায় দরজা খোলার সঙ্গেসঙ্গে সেও অজ্ঞানের মতো মাটিতে পড়িয়া গেল। জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখিল, চণ্ডী দাসী তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছে, তাহার হাতে একটা তেলের বাতি। তাহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া চণ্ডী যেন বাঁচিল। সে আস্তে আস্তে লোচনকে উঠাইয়া বলিল, ‘শিগগির বাড়ি চল, আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছি। শিগগির চল।’ লোচন খানিক হতভম্বের মতো বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল আর বলিল, ‘বাতিটা দাও দেখি।’ বলিয়া, চণ্ডীর হাত হইতে বাতি কাড়িয়া লইয়া সে কুঠুরির ভিতর নামিয়া পড়িল। চরণ তখন অসাড় অচেতনের মতো পড়িয়া আছে, মাঝে মাঝে তাহার মুখ দিয়া ‘গোঁ গোঁ’ শব্দ বাহির হইতেছে। চণ্ডী উপর হইতে ‘ও লোচন, ও লোচন’ করিয়া ডাকিতেছে, ভয়ে তাহার গলার স্বর বাহির হয় না। লোচন তাহাকে বলিল, ‘চুপ করো, এখন যা বলি তাই করো, আমি একে তুলে ধরছি, তুমি টেনে নাও।’ লোচন ছিল লম্বা, চরণ ছিল ছোটোখাটো। লোচন চরণকে উঁচু করিয়া ধরিল, চণ্ডী তাহাকে কোনোমতে টানিয়া উপরে তুলিল।

মানুষের মনের বলই আসল বল। তা না হইলে সেই ঝড়ের রাতে দুর্বল শরীর নিয়ে লোচন কী করিয়া এতদূর চরণকে বহিয়া আনিল? চণ্ডী বাতি হাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছিল বটে, কিন্তু লোচন সেদিন যে সাহস দেখাইয়াছে, তেমন সাহস অল্প ছেলেই দেখাইতে পারে।

লোচন ও চরণের সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে কিছুদিন লাগিল। সুস্থ হইয়া তাহারা সমস্ত লুকানো ধন ঘরে আনিল। চরণ বলিল, ‘ভাই লোচন! আমি যেমন তোমাকে ঠকিয়ে লোভ করে নিজে সব নিতে গিয়েছিলাম, তেমনি শাস্তি আমার হয়েছে। এ টাকার ভাগ আমি নেব না, সমস্তই তোমার।’ লোচন তাহাকে বলিল, ‘তা হবে না, তোমাকে নিতেই হবে। আমার ভাগও তোমার কাছে রাখতে হবে। গরিবের বাড়িতে কোথায় এত টাকা রাখা যায়? কিন্তু কী ভাগ্যিস, যতদিন আমরা বিছানায় পড়েছিলাম, ততদিন আর কেউ এর সন্ধান পায়নি।’ তখন চরণ বলিল, ‘পাবে কী করে? ভূতের ভয়ে কি কেউ সেদিকে যায়? মনে নেই,

তোমার যখন জ্বর হয়েছিল আমি এসে তোমাকে বলেছিলাম যে, আমরা কুঠুরির দরজা খুলেছি বলে ভূতেরা রেগেছে, বাঁশঝাড়ে তারা 'হু-হু' করে চেঁচায় শোনা যায়?'

'ঠিক ঠিক, আমিও সেদিন ঝড়ের সময় শুনেছি 'হু-হু' শব্দ হচ্ছিল।'

'সে ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। এখন অবশ্য এতে আমাদের কাজ দিল, কিন্তু তখন করেছিলাম তোমাকেই ভয় দেখাবার জন্য। মন্দ যারা তারা সবাইকে মন্দ মনে করে। আমার নিজের মনে যখন মতলব এল, দু-জনে যাবার আগেই একলা গিয়ে ঘড়াগুলো নিয়ে আসব, তখন মনে হল তুমিও তো এই মতলব করতে পার। তখন জ্বর তোমার বেশি ছিল না। আমি করলাম কী, দু-তিনটা বড়ো বড়ো বাঁশের চোঙা কেটে এমন করে বাঁধলাম যে, তার ভিতর দিয়ে জোরে বাতাস গেলে বিকট আওয়াজ হয়। সেগুলোকে মন্দিরের বাঁশঝাড়ে ঝুলিয়ে দিলাম। একে বাঁশঝাড়েই নানারকম শব্দ হয়, তাতে এই চোঙাগুলো থাকাতে অদ্ভুত শব্দ হতে লাগল। গ্রামের লোকেরা পর্যন্ত সেশব্দ শুনে ভয় পেয়েছে। ভাই, আমি কত দুষ্টু দেখলেই তো; আমি এ টাকা কিছুতেই নিতে পারব না।' লোচন সে সব কথা শুনিল না, সে বলিল, 'আচ্ছা, বন্ধুর উপহার বলেও অন্তত নাও।'

*শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩০*




# মনীশ ঘটক

নতুন সিংহাসনে বসেই, রাজা দেশের যত বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের এক মস্ত সভা আহ্বান করে বললেন, 'দেখুন, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস আমায় একখানা তৈরি করে দিতে হবে। সময় যত লাগে লাগুক-কিন্তু কিছু যেন বাদ না যায়। একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই।'

কুড়ি বছর পরে একদিন, পণ্ডিতেরা রাজদরবারে এসে হাজির হলেন। পেছনে বারোটা উটের পিঠে পাঁচ-শোখানা করে কেতাব!

দলপতি কিছুক্ষণ বক্তৃতা করে, সেই ছ-হাজার পুঁথি রাজার সামনে ধরে দিলেন।

রাজা রাজকার্যে গলদঘর্ম-ইতিহাসের বহর দেখে তাঁর তো চক্ষুস্থির। বললেন, 'দেখুন, যৌবন তো অনেক দিন পেরিয়েছি-এই ছ-হাজার বই পড়বার সময় এ-জীবনে হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বাদসাদ দিয়ে বইগুলো একটু ছোটো করে আনতে পারবেন না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! নিশ্চয় পারব!'

পণ্ডিতেরা বিদায় নিলেন।

আরও কুড়ি বছর গেল। অনেক পরিশ্রমের পর পণ্ডিতেরা ছ-হাজারকে কমিয়ে পনেরো-শোয় দাঁড় করিয়ে, তিনটে উটের পিঠে বোঝাই করে রাজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজা বললেন, 'হ্যাঁ, তা কমেছে বটে, কিন্তু আমার বয়স যে অনেক বেড়ে গেছে। দেড় হাজার বই পড়বার সময় কি হবে? যদি পারেন তবে আরও কিছু ছোটো করে আনুন।'

দশ বছর পর পণ্ডিতেরা আবার হাজির-একটা বাচ্চা হাতির পিঠে পাঁচ-শো বই চড়িয়ে।

রাজা বুড়ো হয়ে গেছেন। বললেন, 'আমার মরবার তো আর বেশি দেরি নেই! আরও সংক্ষেপ করুন।'

পাঁচ বছর পর একজন পণ্ডিত, হাতে একখানা বই নিয়ে লাঠি ভর দিয়ে রাজবাড়িতে এসে উঠলেন।

একজন রাজকর্মচারী বলল, 'ও, সেই ইতিহাস? তা, শিগগির করুন-রাজা মৃত্যুশয্যায়-'

পণ্ডিত রাজার বিছানার কাছে যেতেই রাজা বললেন, 'হায়! মানুষের ইতিহাস না জেনেই আমায় মরতে হল!'

বুড়ো পণ্ডিত বললেন, 'না না-আমি তিন কথায় সে ইতিহাস আপনাকে বলছি! মানুষ জন্মে-কষ্টভোগ করে-তারপর মরে!'

*(পারস্য দেশীয় আখ্যন হইতে)*

অগ্রহায়ণ ১৩৩১






# প্রিয়ম্বদা দেবী

পবন দেবতার পাগলামির কথা তোমরা শুধু শোননি, নিজের চোখেই তার প্রমাণ পেয়েছ। ইনি দু-দণ্ড স্থির নন। সব দেবতাই নিয়ম মেনে চলেন, এঁরই শুধু খামখেয়াল। দক্ষিণে বাতাসের দিনে, হঠাৎ হু-হু করে পুবে বাতাস ঝড় তুলে ধুলো উড়িয়ে গাছপালা ভেঙেচুরে, নয়-ছয় করে বেড়ায়। তাইতো লোকে পাগলকে বলে, বায়ুরোগগ্রস্ত! এই তো স্বভাব তার উপর এক উপসর্গ জুটল, তিনি এক অপ্সরার ভালোবাসায় পড়লেন। সে কিন্তু তাঁর দিকে ভুলেও চায় না, সে শুধু আরাধনা করে তপনদেবকে! পবনদেব সদাই অন্যমনস্ক, উনপঞ্চাশ বায়ু তার শাসন মানে না। কখন কোথায় দিয়ে হুস করে বেরিয়ে পড়ে দশদিক তোলপাড় করে বেড়ায়। এতে সব চেয়ে দুঃখ হয় বরুণের। সাগরের জলে তাল গাছ প্রমাণ ঢেউ উঠে আপসে পড়ে। বারুণীর প্রাসাদে সাগর জলে এই লম্ফঝম্প দেখে সকলের জলাতঙ্ক উপস্থিত হল। এদিকে নদী-বধূদের প্রাণান্ত। তাদের তুলে তটের উপর এমনি আছাড় দেয় যে, তারা পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে, সাগরের কাছে যখন-তখন ছুটে এসে কাঁদে আর নালিশ করে। বরুণ তো তিতিবিরক্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে দরখাস্ত দিলেন। বিচারে ঠিক হল, পবন দেবতা কিছুকাল গিয়ে মলয়াচলে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করুন, বৎসরান্তে স্বর্গে ফিরবেন। তবে বসন্তের আরম্ভে তখন হতে দু-মাসের জন্যে বৎসরে বৎসরে তাঁকে মলয় পর্বতে আসতে হবে। স্বর্গহারা পবন ভারতবর্ষের দক্ষিণে শ্রেষ্ঠী শোভন দাস হয়ে জন্মালেন, আর সেই অপ্সরাকেও পৃথিবী বাসে আসতে হল।

মলয় পর্বত চির বসন্তের দেশ, শোভন দাস সেইখানে বসতি করলেন। সবুজ পান্না দিয়ে গড়ানো তার বাগানবাড়ি, দুধের মতো সাদা পাথরের জালিকাটা দরজা জানালা, ফুরফুর সুগন্ধ বাতাস, তারই মধ্যে দিয়ে অনবরত ঝিরঝির করে যাওয়া-আসা করত। চন্দনের শীতল গন্ধে চারিদিক ভরপুর, চারিদিকে রাশি রাশি ফুল। পথে পথে অশোক পলাশ, ঘাটে ঘাটে কমল, আর বনে বনে চাঁপা, মুচুকন্দ, কাঞ্চন, করবী, বসন্তের যত ফুল, সবাই মিলে সারা বছর ধরে সেখানে রূপের হাট বসিয়ে রাখে। সবুজ পাতার পোশাক পরা তাজা উঁচু গাছগুলিতে পা বেয়ে উঠে, আঙুরলতা সারা গা ছেয়ে রয়েছে। টলটলে মিষ্টি রসে-ভরা থোলো থোলো সুগোল নিটোল ফলের রাশি সাজানো ছোটো ছোটো আলোর ফানুসের মতো চারিদিকে ঝুলছে। গাছগুলিকে মনে হয়, বসন্ত ঋতু বর হয়ে আসছেন তাই পথের ধারে ধারে শোভাযাত্রার ফাটক বাঁধা হয়েছে। রাতদিনই পাখির গান, মৌমাছির গুণগুণ। শাপগ্রস্ত বায়ু দেবতার ধরন-ধারণ একেবারেই বদলে গেল। চঞ্চলতার আর কোনো চিহ্নই নেই, ফুলবাবুটির মতো শান্ত-শিষ্ট, আলগোছে কোঁচা তুলে ধরে ধীরে ধীরে চলেন। সেই যে আকাশ পৃথিবী আর সমুদ্র তোলপাড় করে বেড়াতেন, জন্মান্তরে তার স্মৃতি পর্যন্ত রইল না। শোভন দাস সুখী মানুষ, শৌখিন তাঁর চালচলন, কথা তাঁর মধুর, গতি অতি মৃদুমন্দ। সবাই তাঁকে ভালোবাসত। একদিন শোভন দাস বীণাটি হাতে করে আরাম আসনে আনমনে দূরে উত্তর দেশের খোলামাঠের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে আছেন-দেখলেন, লম্বা

দোদুল ঘাসের গুচ্ছের মাঝখানে কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় সে সেই ঘাসের চেয়ে উঁচু। এই ঘাস ছোটো বাঁশ-জাতীয়। ছিপছিপে মেয়েটি এত সরু হালকা বাঁশের চেয়ে মাথায় বড়ো বলে তার মুখখানি দেখা যাচ্ছে। মুখখানি বড়ো সুন্দর আর মনে হল চেনা মুখ কতবার যেন দেখেছেন, কেবল মনে হচ্ছে না কোথায় দেখেছিলেন। পরনে সবুজ ঘাঘরি, মাড়োয়াড়ি মেয়েদের মতো, একটু নড়লেই ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাথায় একখানি ফুরফুরে সোনালি ওড়না, ভোমরার মতো কালো চুল, মুখখানি প্রফুল× চোখ দু-টি আনন্দে উজ্জ্বল, সূর্যদেব যখনই যেদিকে ফিরছেন সেও সেই দিকে চেয়ে ঘুরে হাত জোড় করে দাঁড়াচ্ছে।

মেয়েটির জমকালো সাজ আর নরম মুখখানির দিকে শোভন দাস অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বড়ো ইচ্ছে কাছে গিয়ে ডেকে এনে, চিরসঙ্গী করে নেন, কিন্তু কী যে আয়েশি হয়ে পড়েছিলেন নড়া আর হল না, বসে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন, তার উদ্দেশে গীত রচনা হতে লাগল, উঠে কাছে আর যাওয়া হল না। বসন্তের বাতাসে সে গান ভেসে এসে মেয়েটির কানে পৌঁছোল সত্যি কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করল না। ঘাসের ঝুরঝুর শব্দের সঙ্গে মিশে কোথায় দূরে প্রতিধ্বনির মতো ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। দিনের পর দিন শোভন দাস দূরে বসে আকুল হয়ে চেয়ে থাকেন। দেখেন, ভোরের আলোর দিকে মুখ করে মেয়েটি জেগে উঠে হাত জোড় করে সেই আলোকে প্রণাম করে। সারাদিন তারই দিকে চেয়ে তারই আরাধনা করে। ভরা দুপুরে সূর্যদেব ঠিক যখন মাঝ আকাশে এসে দাঁড়ান, পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখেন, তখন সে তার মুখখানি একেবারে তুলে ধরে, ঘোমটা খসে যায়, কালো চুল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসের দোল পেয়ে তার তনু দেহখানি কেঁপে কেঁপে ওঠে, মাজা রুপোর রঙের দুপুরের সাদা আলো তার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে, বিজুলির মতো উজ্জ্বল দেখায়। এমনিভাবে দিনের পর দিন যায়, একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল। চারিদিক কালো ছায়ায় অন্ধকার করে, ধুলো ঝড় উঠে এল। সূর্যদেব আর দেখা দিলেন না, চোখের জলের ধারার মতো পৃথিবীর বুক ভাসিয়ে বৃষ্টি নেমে এল। দখিন বাতাস তখন দেশ হতে চলে গেছে। হু-হু করে পুবে বাতাস কোথা হতে এসে পড়ল। সেই যে সরু লম্বা শরের মতো বাঁশের সারি সারাদিন ধরে পিছনে পর্দার মতো দুলত, যার সমুখে সাজানো মূর্তির মতো মেয়েটিকে রোজ দেখা যেত, সেদিন দেখলে পর্দা ছিঁড়ে ভুঁয়ে পড়ে গেছে মেয়েটির ঘাঘরি আর সোনালি ওড়না ধুলোমাখা, তার টকটকে গায়ের রং ফ্যাকাশে, কালো চুলের রাশ ভিজে কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে সে বিষণ্ণ মূর্তিও আর দেখা গেল না।

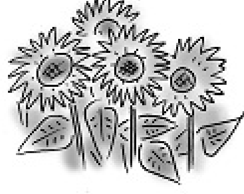
দুঃখী শোভন দাস তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না, উঠে এসে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু তখন সে নিরুদ্দেশ।

শীতের চর এলোমেলো উত্তরে বাতাস কুয়াশার ডানা মেলে উড়ে এল-আলো আসার পথ রোধ হল, দশদিক অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে পথহারা শোভন দাস বাতাসের ধাক্কায় লাঞ্ছিত হয়ে ঘরে এলেন। পাহাড়ের চূড়ায় বরফ দেখা দিল যেন সাদা পালক ছড়িয়ে পড়েছে। বসন্ত কোথায় অন্তর্ধান হলেন, তখন স্বর্গ দূতেরা তাঁকে দেবসভায় ফিরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে তাঁর স্মরণশক্তি জেগে উঠল, শোভনা অপ্সরাকে মনে পড়ল, কিন্তু তার দেখা আর পেলেন না। তপে তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব তাকে তাঁর জ্যোতির্ময় প্রাসাদে স্থান দিয়েছিলেন। ভোরের বেলা অরুণ সারথির আলোর রথে যখন তিনি আকাশের পথে যাত্রা করেন, তখন হতে সারাদিন ধরে সে ফুলের মতো দেখতে সোনার ছাতা তাঁর মাথার উপর ধরে থাকে- কিরণের ছটা চারিদিকে দেখা যায়। শীত গেলে বসন্ত আবার দেখা দিল। মাঠে সবুজ ঘাসের বিছানা বিছানো হল, পবনের মলয়াচলে ফিরবার দিন এল, আর

যেখানে শোভনা অপ্সরা তপস্যা করেছিল, সেখানে রাশি রাশি সূর্যমুখী ফুটে উঠল-এরা চিরদিন তারই মতো একাগ্র মনে ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সূর্যদেবের আরাধনা করে।

*(বিদেশি গল্প অবলম্বনে)*

*আষাঢ়* ১৩৩২






# জলধর সেন

অন্য দিন আপিস থেকে সাতটার আগে বাড়ি ফিরতে পারিনে। সে দিন একটা কাজের জন্য একটু সকালে বেরোতে হয়েছিল। তাই চারটার সময়ই বাড়ি এসেছিলাম।

বাড়িতে এসে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই দেখি, আমার ছেলে শ্রীমান প্রণবপ্রসন্ন বারান্দায় মুখ ভার করে বসে আছে।

আমি তার কাছে গিয়ে আদর করে বললাম, 'হ্যাঁরে ন্যাপলা, অমন করে বসে আছ যে?'

ন্যাপলা অমনি কেঁদে উঠে বলল, 'এই দেখেছ মা!'

আমি তো একেবারে অবাক। গৃহিণী ঘরের ভিতর ছিলেন; বাইরে বেরিয়েই বললেন, 'এই নেও, ছেলেটাকে বুঝি আবার খেপিয়েছে?'

আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম; কই, এমন কী বলেছি যে, ছেলে খেপে একেবারে কেঁদে ফেলল। আমি নিতান্ত অপরাধীর মতো বললাম, 'সে কী! আমি ওকে খেপাব কেন? আমি শুধু জিজ্ঞাসা করেছি, হ্যাঁরে নেপলা, অমন করে বসে আছ যে! এতে খেপবার তো কোনো কারণ দেখিনে।'

গৃহিণী বললেন, 'ওকে ন্যাপলা বলে ডাকলেই ওর রাগ হয়। ও নাম ধরে ডাকতে পারবে না।'

বাঃ রে বাঃ! আজ দশ বছর ওই নাম ধরে, আমি কেন, সবাই ডেকে এসেছে; কোনো দিন বাবাজীবনের রাগ হয় নাই, খেপেও নাই; আজ হঠাৎ ও নামে অরুচি হল কেন?

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'কেন, ও নাম ধরে ডাকলে খেপবে কেন?'

গৃহিণী উত্তর দেবার আগেই শ্রীমান বলে উঠলেন, 'কেন তোমরা অমন বিশ্রী নাম ধরে আমাকে ডাকবে?'

আমি বললাম, 'তাতে দোষ কী হয়েছে?'

ছেলে বললেন, 'তোমরা দিনরাত ন্যাপলা ন্যাপলা কর বলে, স্কুলের ছেলেরাও আমাকে ন্যাপলা ন্যাপলা করে খেপাতে থাকে। কোন একটা ছেলে সে দিন বাড়ি এসে শুনে গিয়েছে ওই নাম। আজ একেবারে ক্লাসের মধ্যে ঢোল পিটিয়ে দিয়েছে। আমি আর কাল থেকে ও ইশকুলে যাব না, তা বলে রাখছি। আর তোমরা কেউ যদি আমাকে এ নাম ধরে ডাকো, তাহলে ভালো হবে না কিন্তু বাবা!'

বাস রে! আমি ভেবেছিলাম, কী না অপরাধ হয়েছে। তাই আমি হেসে বললাম, 'আমি তো তোমার এমন সুন্দর আর একেবারে নূতন নাম প্রণবপ্রসন্ন রেখেছিলাম। তোমার মা-ই

তো আদর করে সেই আঁতুড় ঘরেই তোমার নাম রাখলেন ন্যাপলা। কাজেই সেই নাম চলে আসছে। আর নামটা এমন মন্দই বা কি! কেমন সুন্দর আদুরে নাম। এখন যদি প্রণবপ্রসন্ন বলে ডাকি, তাহলে মনে হবে, আর কাকে যেন ডাকছি, তোমাকে ডাকছিনে।'

শ্রীমান বললেন, 'তোমাদের যেন ভালো লাগে। ইশকুলে যে সবাই ঠাট্টা করে। মাস্টারমশাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেই শুধু শোনো-ওরে ন্যাপলা। আমি ও ইশকুলে যাবই না।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আমি কাল হেডমাস্টার মশাইকে একখানা চিঠি লিখে দেব; তিনি যেন সব ছেলেদের নিষেধ করে দেন, কেউ যেন তোমাকে ওই নাম ধরে না ডাকে।'

শ্রীমান বললেন, 'ছেলেরা সে কথা শুনবে কিনা। ক্লাসেই নাহয় না বলবে; বাইরে বেরিয়ে আরও বেশি করে বলবে।'

গৃহিণী বললেন, 'সে তো ঠিক কথা। ও যখন ওই নাম শুনলে খেপে, তখন কেন রে বাপু তোদের ও নাম বলা। আর তুমি যে বলছ, মাস্টারকে লিখে দেবে, তাতে ছেলেরা আরও বেশি করে খেপাবে। না, না, ছেলেকে ও ইশকুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আর কোনো ইশকুলে দাও। কলকাতা শহরে অনেক ইশকুল আছে।'

আমি বললাম, 'দেখো বাবা প্রণবপ্রসন্ন-আরে দুর ছাই, এ যেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জিমূতবাহন সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে ডাকছি-না, না, বাবা ন্যাপলা, তুমি রাগই কর আর খেপই এতটুকু ছেলেকে আমি প্রণবপ্রসন্ন বলে যখন-তখন ডাকতে পারব না। দেখো দেখি ন্যাপলা নাম কেমন মিষ্টি, কেমন গালভরা।'

গৃহিণী বললেন, 'কেন, ও নাম তো তুমিই রেখেছিলে।' আমি বললাম, 'আরে, ও হচ্ছে পোশাকি নাম। যখন বড়ো হবে, পাঁচটা পাশ করবে, বড়ো চাকরি করবে, রায় বাহাদুর হবে, তখন নামটা বেশ মানাবে। এই শোনো না-শ্রীযুক্ত রায় প্রণবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.এল.। তখন ঠিক ভালো শোনাবে। এখন ওই যে বলেছি, প্রণবপ্রসন্ন বলতে গেলেই মনে আসবে সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। আর তাও বলি বাবা ন্যাপলা! আঁতুড় ঘরে তোমার মা বড়ো আদর করে ওই নাম রেখেছিলেন। মায়ের দেওয়া ওই নাম যে অমূল্য। ওর সঙ্গে যে কত মধু, কত আদর, কত স্নেহ মিশানো আছে, তা তুমি বুঝতে পারছ না। আর পোশাকি নাম কোনো দিনই মিষ্টি হয় না, সে যেন সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে, উড়নি উড়িয়ে একটা ভালো মানুষের মতো এসে দাঁড়ায়; আর আটপৌরে নাম-সে যেন চিনি-মাখানো; কেমন সুধাভরা, কেমন মিষ্টি! না, বাবা, তোমার অমন সুন্দর নাম ন্যাপলা আমি তো কোনোদিন ছাড়তে পারব না। তুমি যদি হাইকোর্টের জজ হও, কি বিলেত থেকে সাহেব হয়ে এস, তাহলেও হাজার লোকের মধ্যেও আমি তোমাকে ন্যাপলা বলে ডেকে যে আনন্দ পাব, আমার যেরকম প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, তোমার প্রণবপ্রসন্ন, বামপ্রসন্ন, শ্রীপতিপ্রসন্ন, কিছুতেই সে প্রসন্নতা দিতে পারবে না। অতএব, তোমার মায়ের দেওয়া এই পরম আদরের নাম তুমি তুচ্ছ করতে পার, এ নাম শুনে তোমার লজ্জা বোধ হতে পারে; কিন্তু আমি তো ও নাম ছাড়তে পারব না-মরবার দিনও ডাকব-ওরে ন্যাপলা!'

গৃহিণী বললেন, 'শুনলে তো বক্তৃতা বাবা! তোমার ওই আঁতুড় ঘরের নাম ভিন্ন তোমার আর উপায় নেই। ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলো, অপরাধ হয়েছে-আমি তোমাদের ন্যাপলাই থাকব।'

ন্যাপলা তখন আমার পায়ের ধূলা লইতে আসিল; আমি তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, 'এই তো আমার বালগোপাল, এই তো আমার ন্যাপলা।'

আশ্বিন ১৩৩২






# ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রামের বাইরে নদীর পথে একটা নির্জন মাঠ। সেই মাঠের পাশে একটা বড়ো গাছের নীচে চোখ বুজে বসে, একটি যুবক আপন মনে কী ভাবছিল। সে কী যে ভাবছিল তা কেউ বলতে পারে না। গাছটাতে বসে পাখিরা ময়লা ফেলে ফেলে, তার সারা শরীরটাকে বিশ্রী করে দিচ্ছিল; কিন্তু সে দিকে তার মোটেই খেয়াল নেই।

পথ দিয়ে কত লোক যাওয়া-আসা করল, কিন্তু কেউ তার দিকে একবার ফিরেও চাইল না; আর যারা-বা চাইল-পাগল বলে সরে পড়ল; তা না হলে, কে এমন পাগল যে, পাখির ময়লা গায়ে নিয়ে চোখ বুজে এমন ধারা বসে থাকবে?

ক্রমে বেলা পড়ে এল, অস্তগামী সূর্যের শেষ সোনালি রশ্মিটুকু এসে তার মুখের উপর পড়ল, দিনান্তরের পাখিরা আপন আপন কুলায় ফিরল, যুবক কিন্তু উঠল না। মন্দিরে মন্দিরে সান্ধ্য-শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠল, সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে ধরণীর বুক ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল, যুবক ঠিক তেমনি ভাবে বসে রইল।

ক্রমেই রাত বেড়ে চলল, কিন্তু একটি প্রাণীও তার খোঁজ নিল না-আর নেবেই বা কে? ঘরে এক বুড়ো মা ছাড়া তো তার আর কেউ ছিল না। মায়ের মন কত দুর্ভাবনা ভেবে ছটফট করে উঠল, আহা! সাত নয় পাঁচ নয়, এই যে তার সাত রাজার ধন এক মানিক; কিন্তু উপায় কী? এত রাতে অন্ধকারের মাঝে কে তাকে খুঁজতে বেরুবে?

এমনি ভাবেই রাত কাটল। ভোরের আলোয় আবার দশদিক আলোময় হয়ে এল-আবার পাখিরা মিষ্টি সুরে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়ল; যুবক তখনও তেমনি ভাবেই বসে আছে।

সেই ভোরে প্রায় এই বয়সের আর একটি যুবক এই পথ দিয়ে নদীতে নাইতে চলেছিল; দূর থেকে একে দেখেই সে চিনতে পারল-তোমরাও চিনতে পারবে, ইনি বাঙলার সেই কানাছেলে রঘুনাথ, আর অন্যজন তাঁর প্রিয় সাথী ও সহাধ্যায়ী প্রেমাবতার চৈতন্যদেব।

রঘুনাথের শরীরের অবস্থা দেখে আর তেমনি ভাবে বসে থাকতে দেখে, চৈতন্যদেবের বুঝতে বাকি রইল না যে, ন্যায়শাস্ত্রের কোনো জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যই রঘুনাথ এমনিভাবে রাত কাটিয়েছেন, আর এ আজ নূতনও নয়, কোনো গুরুতর প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করতে হলে প্রায়ই এমনি ঘটে থাকে, চতুষ্পাঠী গৃহে নির্জন কোণটা তিনিই প্রায় স্থায়ী বন্দোবস্তে দখল করে নিয়েছেন, তবে কোনোদিন ব্যাপার এতদূর গড়ায়নি।

চৈতন্যদেব তখন পরিহাসচ্ছলে হাতের জল-পাত্র থেকে খানিকটা জল রঘুনাথের গায়ে ঢেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'এক গা পাখির ময়লা নিয়ে বসে বসে মাথামুণ্ডু কী ভাবছ?' হাজার হোক ঠান্ডা জল তো, তার উপর আবার সকাল বেলা। রঘুনাথের তন্ময়তা ছুটে

গেল, চোখ খুলে নিজের অবস্থা আর সমুখে চৈতন্যদেবকে দেখে, তিনি বড়ো অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। ভাবতে ভাবতে কখন যে রাত হয়েছিল, আবার কখন যে তাও শেষ হয়ে গিয়ে ভোর হয়েছে-কখন যে পাখিরা তাঁর গায়ে ময়লা ফেলেছে তা তো তিনি জানতে পারেননি!

তিনি কী ভাবছিলেন জানবার জন্য চৈতন্যদেব খুব জেদ করতে লাগলেন। শেষটা যেই তিনি প্রশ্নটা বললেন, চৈতন্যদেব শুনেই তার সুমীমাংসা করে দিলেন। রঘুনাথ ভারি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, সারা দিনরাত বসে ভেবে ভেবে যার সিদ্ধান্ত তিনি করতে পারেননি, চৈতন্যদেব এক মুহূর্তে তা বলে দিলেন।

কিন্তু রঘুনাথ নিরাশ হননি; তাঁর এই সাধনাও একেবারে নিষ্ফল হয়নি-এই চিন্তাশীলতাই ছিল তাঁর জীবনের একটি বিশিষ্ট। তিনি তেমন অস্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেননি বটে কিন্তু শিখবার এই প্রবল একাগ্রতা ও চিন্তাশীলতা দ্বারাই তিনি নিজের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিলেন এবং এরই ফলে তিনি একদিন সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র আয়ত্ত করে বাঙালির মুখরক্ষা আর বাংলার গৌরব বাড়িয়েছিলেন-জগৎবাসীকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। কোনো জিনিস জানবার এই যে প্রবল একাগ্রতা আর তার জন্য এমন প্রাণপাত সাধনা তা কখনো নিষ্ফল হয় না।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে-নবদ্বীপে, গঙ্গার ধারে একটি নির্জন মাঠে। রঘুনাথের জীবনে এরূপ আরও কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে আর অনেক শিখবার কথাও তাতে আছে।

*পৌষ ১৩৩২*






# কল্যাণী চক্রবর্তী

বীণা যখন প্রথম স্কুলে এল তখন তার সংস্কৃতে অনভিজ্ঞতা দেখে শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'অন্য সব বিষয়ই তো তুমি বেশ ভালো জান; কিন্তু সংস্কৃত দেখছি তুমি একেবারেই শেখনি-না হলে তোমায় ফোর্থ ক্লাসে ভরতি করে দিতে পারতাম। আচ্ছা এখন তুমি ফিফথ ক্লাসেই পড়ো-হাফ-ইয়ারলিতে সংস্কৃতে যদি ভালো নম্বর পাও, তাহলে তোমাকে ফোর্থ ক্লাসে উঠিয়ে দেব এখন।'

বীণা ফিফথ ক্লাসেই পড়তে লাগল। সে পড়ায় খুব ভালো ছিল; সব বিষয়েই প্রথম হতে লাগল; কিন্তু ক্লাসের মেয়েরা তার উপর যে খুশি হল তা নয়। বীণা পরীক্ষায় প্রথম হলে তারা বলত, 'ফোর্থ ক্লাসের মেয়ে ফিফথ ক্লাসে পড়লে তো হবেই, তাতে বাহাদুরির কী আছে?' বীণা প্রথম যেদিন ক্লাসে এল সেদিন মেয়েরা বলল, 'আটটা মোটে ডেস্কে এত মেয়ের কুলান অসম্ভব, বরং এই নূতন মেয়েটিকে আর কোথাও বসানো যেতে পারে।'

শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'তবে তোমরা সবাই সিক্সথ ক্লাসে গিয়ে বসো। সে ঘরটাও বড়ো, আর তাতে ডেস্কও বেশি আছে-সিক্সথ ক্লাসে মেয়ে কম আছে, তারা এ-ঘরটা নিতে পারে।'

সে প্রস্তাবে মেয়েরা রাজি হল না-মীরা চট করে পাশের বেঞ্চে চলে গিয়ে নিজেরটা খালি করে দিল; পাশের বেঞ্চে দু-টি মেয়ে আগে থেকেই ছিল; মীরাকে নিয়ে তিনটি হল। মীরা ফিসফিস করে বীণাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পাশের মেয়েটিকে বলতে লাগল, 'বাপরে কী ভিড়! এর মধ্যে আমার কোমর ব্যথা হয়ে গিয়েছে-ওই নতুন মেয়েটির জন্যই তো এরকম হল।' বীণা সবই শুনতে পেয়েছিল-সে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার বেঞ্চেতে আর এক জনের জায়গা আছে, তোমরা কেউ এলেই পার-অত ঠেসাঠেসি করবার দরকার কী?' মীরা যেন ওর কথা শুনতেই পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে বলতে লাগল, 'ওই মেয়েটি আর সব বিষয়েই ফোর্থ ক্লাসের মতন জানে, কেবল সংস্কৃত জানে না-ও স্বচ্ছন্দে ফোর্থ ক্লাসে পড়তে পারে- কেবল ন্যাকামি করে পড়ে না।'

শিক্ষয়িত্রী কিন্তু সবই দেখতে পাচ্ছিলেন-তিনি এক ধমক দিয়ে বীণা আর মীরাকে এক বেঞ্চে বসিয়ে দিলেন, কিন্তু বীণা সেদিন যা চিমটি খেয়েছিল-সে কথা সে সহজে ভুলতে পারেনি।

তাকে সবচেয়ে বেশি জ্বালাতন করত মীরা। বীণা আসবার আগে সেই ক্লাসে প্রথম হত; এখন বীণার প্রথম হওয়াটা তার অসহ্য হয়েছিল।

সে দিন রবিবার বীণা বসে বসে পড়ছিল, হঠাৎ মীরা এসে বলল, 'জান, ওই মাঠে একটা মস্ত সার্কাস এসেছে; বোর্ডিং-এর ছাত থেকে তাঁবুটা দেখা যায়। ওদের হাতি,

ঘোড়া, বাঘ, সিংহ এইসব অনেক জন্তু আছে-আবার নাকি অনেকগুলো সং আছে, তারা ভয়ানক হাসায়। মিস মজুমদারকে কত করে বললাম আমাদের নিয়ে যেতে, কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না। এই বর্ষাকালে সন্ধ্যা বেলায় যদি বাড়ি থেকে বেরোই তাহলে নাকি হয় জ্বর, নয় সর্দি-কাশি নাহয় আরেকটা কিছু হবেই হবে। তা ছাড়া সেখানে নাকি এমন ভিড় যে আমরা কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে পারব না।

'আচ্ছা তোমাকে তো উনি খুব ভালোবাসেন-তুমি একবার বলে দেখো না-তাহলে হয়তো নিয়ে যেতে পারেন।'

বীণা বলল, 'তোমরা সবাই বললে, রাজি হলেন না-আর আমি একলা বললেই বুঝি রাজি হবেন?'

মীরা, 'নিশ্চয়ই হবেন।'

বীণা, 'কিন্তু আমার মনে হয় হবেন না। মাঝখান থেকে আমাকে বকুনি খেতে হবে।'

'তার চেয়ে বললেই হয়, তুমি বলবে না।'

'বাঃ একবার 'না' বলে দিয়েছেন, আবার জ্বালাতন করতে গেলে বকবেন না!'

মীরা রাগ করে চলে গেল-বীণা টের পেল যে দরজার বাইরে আরও কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল আর তারা যে তাকেই জব্দ করবার পরামর্শ করতে করতে চলে গেল, সে বিষয়েও তার কোনো সন্দেহ রইল না।

তার পরদিন ক্লাসে বীণাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হত যদি না মিস রায় এসে প্রচণ্ড এক ধমকের চোটে তার জন্য জায়গা করে দিতেন।

তারপর আরও একটা সপ্তাহ কেটে গিয়ে আবার রবিবার এসেছে। বিকাল বেলা মেয়েরা খেলা করছিল। বীণাকে কেউ ডাকেনি; তাই সে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সামনে দু-একটা বাড়ির পর সার্কাসের তাঁবু একটুখানি দেখা যাচ্ছে-আজ রবিবার, ছুটির দিন-নিশ্চয়ই ঢের লোক যাচ্ছে-তারা যদি যেতে পেত তাহলে কী মজাই না হত! আর একটু ভালো করে দেখবার জন্য বীণা এগিয়ে গিয়ে সামনে রান্নাঘরের ছাতে উঠল-সেখান থেকে সার্কাসের মাঠটা বেশ ভালো করে দেখা যাচ্ছে। ওই যে একদল ছোটো ছোটো মেয়ে এসে দাঁড়াল- নিশ্চয় ওরা তারই ইশকুলের কোনো মেয়ে-ওদের টিচার নিশ্চয়ই টিকিট কিনতে গিয়েছেন, তাই ওরা অপেক্ষা করছে। হঠাৎ নীচের দিকে তাকিয়ে বীণা দেখতে পেল-ঘন ঘাসের মধ্যে দিয়ে কী একটা জন্তু এগিয়ে আসছে-দেখতে দেখতে সেটা বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। ও বাবা! এ যে একটা চিতাবাঘ! নিশ্চয় ওই সার্কাসের বাঘ, কোনোরকমে ছাড়া পেয়েছে। বাঘটা বীণাকে দেখতে পেল না-রান্নাঘরের দরজা খোলা পেয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে পড়ল- বামুন ঠাকুর একগামলা কাঁচা মাংস আঢাকা ফেলে বাসন-মাজা ঝিকে তাড়া দিতে গিয়েছিল- বাঘ সামনে এই খাদ্য সম্ভার দেখে মনের আনন্দে জলযোগ করতে আরম্ভ করল। বীণা এতক্ষণ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল-বাঘটাকে অন্যমনস্ক দেখে দৌড়িয়ে পালাতে যাচ্ছে এমন সময়ে ঠাকুর একগাদা মাজা বাসন হাতে নিয়ে ঝিকে গাল দিতে দিতে এসে উপস্থিত। হঠাৎ বাঘের উপর চোখ পড়বামাত্র সে এক চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল, সঙ্গেসঙ্গে বাসনগুলো ভীষণ ঝনঝন শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল; এই গোলমালে চমকে উঠে বাঘটা নিশ্চয়ই ঠাকুরকে আক্রমণ করত-কিন্তু বীণা তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে শিকল তুলে দিল।

ততক্ষণে ঠাকুরের চিৎকার শুনে শিক্ষয়িত্রীরা সব ছুটে এলেন; ইশকুলের দরোয়ান ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে, টিকি ওড়াতে ওড়াতে লাঠি বাগিয়ে তেড়ে এল, স্কুলের বেয়ারা দোয়াতে কালি ভরছিল, 'বাঘ এসেছে' শুনে সে কালির দোয়াত, ব্লাকবোর্ড উলটে, শার্সি ভেঙে, দেওয়ালময় কালির ছাপ লাগিয়ে গেটের দিকে ছুটল, মেয়েরা সব কেউ লেপের তলায়, কেউ আলমারির পিছনে, কেউ ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল-কেবল বীণা যেখানে ছিল সেই খানেই দাঁড়িয়ে রইল।

খানিক হাঁকডাক চেঁচামেচির পরে দরোয়ান একখানা চিঠি হাতে করে, হাঁপাতে হাঁপাতে সার্কাসের তাঁবুর দিকে ছুটল।

সে যখন ফিরে এল তখন তার সঙ্গে একটি খাঁচা ও কয়েকটি লোক নিয়ে স্বয়ং সার্কাসের মালিক মহাশয় এসে উপস্থিত। রান্নাঘরের দরজা খুলে খাঁচার দরজাটা তার সামনে রাখা হল; তারপর মালিক মহাশয় নাম ধরে ডাকতেই বাঘটা অত্যন্ত ভালোমানুষের মতন এসে খাঁচায় ঢুকে পড়ল।

তারপর দিন যখন সার্কাসের মালিক আবার এলেন ও প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর হাতে একগোছা টিকিট দিয়ে গেলেন-তখন আর মেয়েদের সার্কাস দেখাতে তাঁর কোনো আপত্তি রইল না। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় সার্কাসের তাঁবুতে কে বীণার পাশে বসবে, সেই নিয়ে ফিফথ ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে খুব একচোট ঝগড়া হয়ে গেল।

এখন বীণা আর মীরার মতন অন্তরঙ্গ বন্ধু খুব কমই দেখা যায়।

*চৈত্র* ১৩৩২




রবীন্দ্রনাথ সেন

## ১

ডিগবাজি খাঁ ডোবায় জল খেতে এসে দেখে, কাদাখোঁচা পাখিরা ডোবার জল বিলকুল নোংরা করে আবার কাদা করে দিয়েছে!

ডিগবাজি খাঁ রাগ করে বলল, 'তোদের কি আক্কেল গেছে? ভদ্রলোকেরা জল খাবে আর তোরা কিনা সব জল নোংরা করে কাদা করে দিলি? সারাদিন কাদা ঘেঁটে তোদের বুদ্ধিটাও তেমনি হয়েছে।'

এই কথায় কাদাখোঁচা পাখিরা শেয়ালকে গরম গরম আচ্ছা দু-কথা শুনিয়ে দিল।

সারস পাখিরা পাশেই ছিল; ঝগড়ার ফাঁক পেলে তাদের তো পোয়াবারো; শুধু একটা অছিলা চাই। চেঁচামেচিতেও তাঁদের সঙ্গে কেউ বড়ো পেরে উঠে না। তারা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'জানোয়ার আবার ভদ্রলোক নাকি! ছোটো জাতের স্পর্ধা দেখো না! যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা।'

বাচ্চু (ওয়াক পাখি) উপর থেকে মাথা নেড়ে বলল, 'হক কথা, হক কথা!'

হাঁড়িচাঁচা পাখিটা দূর থেকে শুনে হি-হি করে হেসে উঠলে।

## ২

ডিগবাজি খাঁ গাল খেয়ে মুখ লাল করে বাড়ি ফিরে এল। সে সারস, বাচ্চু ও হাঁড়িচাঁচার কথাগুলি বনের সবাইকে বলে বেড়াল।

সকলে একবাক্যে বলল, 'কী জানোয়ারদের নিয়ে ঠাট্টা আর গালাগালি? জানোয়ার হয়ে আমরা এই অপমান কিছুতেই বরদাস্ত করব না।'

তখন সকলে পরামর্শ করতে লাগল, কী করে এই পাখিদের আচ্ছারকম জব্দ করা যায়। সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, জিরাফ, চিতাবাঘ, হাতি, জলহাতি (হিপপপটেমাস), নেকড়ে, শেয়াল সবাই মিলে একটা মস্ত সভা করল। বানর সভাপতি হয়ে গাছের ডালে লেজ ঝুলিয়ে বসল। সকল জন্তুদের শলাপরামর্শ চলতে লাগল। খেকশিয়াল বুদ্ধিমান প্রাণী; হাত-পা ছেড়ে সে দাঁড়িয়ে বলল, 'এসো, সবাই মিলে লড়াই করে পাখিগুলিকে আচ্ছারকম জব্দ করি।'

বাঘ ও সিংহ এ কথায় সায় দিল। কাজেই অন্য জন্তুরাও তাতেই সম্মতি জানাল। তখন সভায় ঠিক হল, পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই সংগত।

ডিগবাজি খাঁ বলল, 'কে কী কাজের ভার নেবে তা এই সভায়ই ঠিক হয়ে যাক।'

হাতি শুঁড় উঁচু করে বলল, ‘আমি এই যুদ্ধের রসদ জোগাব। জল আর খাওয়া-দাওয়ার ভার আমার উপর রইল।’

ভাল্লুক বলল, ‘আমি গাছের ডালে চড়ে কোথায় শত্রুরা লুকিয়ে আছে, সেই খবর বলে দেব।’

গণ্ডার বলল, ‘আমি শত্রুদের সামনে দাঁড়িয়ে ঢালের মতো থেকে শত্রুদের গোলাগুলি আটকাব।’

চিতা বলল, ‘আমি জয়ঢাক ঘাড়ে করে নেব।’

জিরাফ বলল, ‘আমি বরং মাথা নেড়ে সেটা বাজাব।’

শজারু আর খরগোশ বলল, ‘আমরা ছুটে গিয়ে খবর নিয়ে আসব।’

জলহস্তী বলল, ‘আমার এই মস্ত হাঁয়ের ভিতর দশ-বিশ গণ্ডা পাখি একবারেই ভরে নিতে পারব।’

নেকড়ে গলা হাঁকড়ে বলল, ‘আমরা তির জোগাব।’

এখন যুদ্ধ করবার বাকি রইল একমাত্র সিংহ আর বাঘ।

দু-জনেই ঠিক করলে তারা তির মেরে পাখি শিকার করবে।

ডিগবাজি খাঁ সবাইকে সাহস দেখিয়ে বলল, ‘আমি সামনে থেকে সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। আমি লেজ উঁচু করে সবার সামনে থাকব। আমার এই নিশান যতক্ষণ খাড়া থাকবে, ততক্ষণ তোমরা সকলে খুব লড়বে; লেজ নীচু হলেই বুঝবে এখন সকলকে তাড়াতাড়ি পিছনে পালাতে হবে।’

সকলে কিছুক্ষণ পা-তালি আর দাপাদাপি করে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিল।

সভা ভঙ্গ করে সবাই বাড়ি গেল।

## ৩

মাছি এই সভার খবর বোঁ করে পাখিদের কাছে এসে বলে গেল। এই খবর পেয়ে পাখিরা ব্যস্ত হল বটে, কিন্তু ওরা ঠিক জানত জন্তুদের কারও ওড়ার ক্ষমতা নেই।

এদিকে কাক, চিল, ময়ূর, সারস, বাজ, কাদাখোঁচা, হাঁড়িচাঁচা, কাঠঠোকরা সবাই মিলে একটা সভা হল।

কিছুদিন বাদে দুই দলই সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হল।

বক বলল, ‘যুদ্ধে হার জিত কী হয় বলা তো যায় না। বরং একটা বুদ্ধি খাটিয়ে দেখা যাক।’

কাকেরা কা কা করে চেঁচিয়ে বলল, ‘বেশ তো, বেশ তো।’

বক বলল, ‘ভিমরুল ভায়াকে এই খবরটা দিলে হয়।’

ফড়িং অমনি ভিমরুল ভায়াকে খবর দিতে ছুটল।

ভিমরুল এসেই জিজ্ঞেস করল, ‘আমায় কী করতে হবে বলো তো?’

বক বলল, ‘তুমি বোঁ করে গিয়ে শেয়ালের লেজ জোরে কামড়ে দেবে।’

## ৪

ডিগবাজি খাঁ সবাইকে নিয়ে হইহই করে যুদ্ধে রওনা হল।

পিছনে তার লেজখানা উপরের দিকে সোজা হয়েই আছে। যুদ্ধের গোড়াতেই ভিমরুল বোঁ করে গিয়ে ডিগবাজি খাঁর লেজে জোরে হুল ফুটিয়ে দিলে। ভিমরুলের হুল তো বড়ো সহজ নয়, তাতে দু-দিন সে হুলখানা পাথরে ধার দিয়ে এনেছে। হুল ফুটতেই শেয়াল বোঁ করে লেজখানা নাবিয়ে মাটিয়ে ঘসতে লাগল।

ডিগবাজি খাঁর লেজের দিকে তাকিয়ে অন্য জন্তুরা বুঝল, এবার বুঝি তাদের শক্ত হার হয়েছে। অমনি সকল জন্তুই পিছন ফিরে ভোঁ দৌড়।

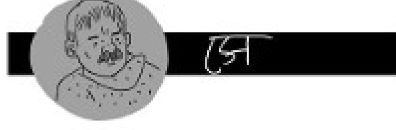
ডিগবাজি খাঁ পিছন ফিরে যত ডাকে, অন্যেরা ততই জোরে ছুটতে থাকে। সবাই একসঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

ডিগবাজি খাঁ একলা ভারি বিপদে পড়ল। কাক আর চিল উড়ে এসে ডিগবাজি খাঁকে বেজায় ঠোকরাতে শুরু করল।

শেয়াল 'ক্যায়া হুয়া, ক্যায়া হুয়া' বলে যতই ছুটে পালায় কাকগুলি ততই তার পিছনে তাড়া করে।

বেগতিক দেখে ডিগবাজি খাঁ এক গর্তের ভিতর ঢুকে পড়ল। আজ যে তার প্রাণ বেঁচেছে-এই-ই ঢের। আর মনে মনে ভাবল, 'আচ্ছা জব্দটাই হলাম।'

*বৈশাখ* ১৩৩৩




## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিধাতা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করেন তবু মানুষ বলে আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব। তাই খেলা শুরু হল পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের নিজের গড়া মানুষ। তারপরে ছেলেরা বলে গল্প বলো, তার মানে, মানুষ বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপুত্তুর মন্ত্রীর পুত্তুর সুয়োরানি দুয়োরানি, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিনসন ক্রুসো। বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মানুষ বানাও-অমনি আঠারো পর্ব মহাভারত প্রস্তুত। তার পরে আরও কত কী!

নাতনির ফরমাসে কিছুদিন থেকে মানুষ গড়ার কাজে লেগেছি। তার বয়স ন-বছর আর আমি পড়েছি সত্তরে। কাজটা প্রথমে একলাই শুরু করলুম, তারপর সেও তাতে লেগে গেল।

অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই বলে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ করে দিলুম এক যে আছে মানুষ। তারপরে লোকে যাকে বলে গল্প, তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বলল, 'দাদামশায় খিদে পেয়েচে।'

রাজপুত্তুরের গল্প অনেক শুনেছি; কখনো তার খিদে পায় না। কিন্তু এর খিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শুনে খুশি হলুম। ওর সঙ্গে ভাব হতে আর দেরি হল না।

দেখলুম লোকটার দিব্যি খাবার শখ আছে। ফরমাস করে মুড়োর ঘণ্ট, লাউচিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি; বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা বেশ চেঁচেপুঁছে খায়। এক-একদিন শখ যায় তার আইসক্রিমের। খায় বসে, মজা লাগে দেখতে।

একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকচি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তরদিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা-দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে দুটো তাল গাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওত পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রং গুলে তুলি বাগিয়ে এই সব এঁকে চলেচি।

দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্তুর নয়-সেই লোকটা। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা গায় লেপটে গেছে, কোঁচার ডগায় কাদা, জুতোয় কাদার পিণ্ডি। আমি বললুম, 'একী!'

সে বললে, 'যখন বেরিয়েছিলুম খটখটে রোদ্দুর। আদ্ধেক পথে আসতে বৃষ্টি নামল। তোমার ওই বিছানার চাদরটা যদি দাও, তো কাপড় ছেড়ে গায়ে জড়িয়ে বসি।'

হুকুম পাবার সবুর সইল না। চট করে খাটের থেকে বেগনি রঙের ছিটের ঢাকাটা টেনে নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল।

বললে, 'দাদামশায়, তোমাকে একটা গান শোনাব।'

কী করি, ছবি আঁকা বন্ধ করতে হল।

সে শুরু করলে-

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে

নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভেবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী মনে হল জানিনে, জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন লাগচে?'

আমি বললুম, 'আরও অনেক কাল তোমাকে গলা সাধতে হবে, এর বেশি আর কিছু বলতে ইচ্ছে করিনে।'

সে বললে, 'পুপেদিদিও (আমার নাতনি) হিন্দুস্থানি ওস্তাদের কাছে গান শেখে সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলে কেমন হয়।'

আমি বললুম, 'পুপেদিদিকে যদি রাজি করাতে পারো তাহলে কথা নেই।'

সে বললে, 'পুপেদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি।'

এই পর্যন্ত শুনে আমার শ্রোতা খুব হেসে উঠল। তাকে কেউ ভয় করে এতে সে ভারি খুশি।

দয়াময়ী আশ্বাস দিয়ে বললে, 'ভয় নেই, আমি তাকে কিছু বলব না।' আমি বললুম, 'তোমাকে ভয় কে না করে! দু-বেলা দু-বাটি করে দুধ খাও-গায়ে কি কম জোর! মনে আছে তো তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ গুটিয়ে একেবারে নুটু পিসির বিছানার নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল।'

বীরাঙ্গনা ভারি খুশি। মনে করিয়ে দিলে ভালুকটার কথা-সে পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল নাবার ঘরের স্নানের জলের টবের মধ্যে।

সেই যে মানুষটার ইতিহাস গড়ে উঠছিল আমার একলার হাতে এখন থেকে পুপেও তাতে যোগ দিলে। আমি যদি-বা বলি, একদিন বেলা তিনটের সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাড়ি কামাবার ক্ষুর চেয়ে নিতে, পুপে খবর দেয় সে ওর কাছ থেকে এক বাক্স চকোলেট নিয়ে গেছে।

সব গল্পেরই একটা আরম্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্তু ওই যে 'এক যে আছে মানুষ' তার আর শেষ নাই। তার দিদির জ্বর হয় ডাক্তার ডাকতে যায়। টনি কুকুর আছে, বেড়ালের নখের আঁচড় লেগে নাক যায় ছড়ে। পিছন দিক থেকে গোরুর গাড়ির উপর চড়ে বসেছিল, তাই নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে হল বিষম ঝগড়া। উঠোনে কলতলায় পিছলে পড়ে বামুন ঠাকরুনের মাটির ঘড়া দিয়েচে ভেঙে। মোহনবাগানের ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিন আনা পয়সা কে নিয়েছে তুলে। ভেবেছিল ফিরতি রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশ কিনে খাবে, সে আর হল না, বন্ধু আছে কিনু চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে পাঁপর ভাজা খেয়েচে। এমনি একটার পর একটা চলচে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পুপে জুড়চে, কোনদিন দুপুর বেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে 'শিশু' বই থেকে ওকে বেড়ালের কবিতা শোনাতে, আর একদিন পুপের ছোট্ট হাঁড়িতে ছোট্ট

আলুভাজা হয়েছিল তাই শেষ করে ছোট্ট পেয়ালায় চা খেয়ে গেল, আর একদিন দিনদার ওখানে গান শুনতে গেল দিনদা তখন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে।

এই যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা দু-জনেই জানি, আর কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই, রাজপুত্র তারও নেই, আর রাজকন্যা, যার চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মানিক, চোখের জলে মুক্তো তারও নাম কেউ জানে না।

এই যে আমাদের মানুষটি-একে আমরা শুধু বলি, 'সে'। বাইরের লোক কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে আমরা দু-জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসি। পুপে বলে আন্দাজ করে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে, প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ। কেউ বলে পিটার্স, কেউ বলে প্রেস্কট, কেউ বলে পিরবক্স, কেউ বলে পিয়ার খাঁ।

এইখানে এসে কলম থামতেই একজন বললে, গল্প চলবে তো! কার গল্প? এ তো রাজপুত্তুর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয় আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করচে তাই এর গল্প। মনের মধ্যে যদি মানুষটাকে স্পষ্ট করে গড়ে তোলো তাহলে দেখতে পাবে এ যখন দোকানের রোয়াকে বসে রসগোল্লা খায় আর তার রস দু-চার ফোঁটা পড়তে থাকে তার ময়লা ধুতিতে, সেটাই গল্প। যদি জিজ্ঞাসা করো, তার পরে? তাহলে বলব, তার পরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাৎ জ্ঞান হল পয়সা নেই, টপ করে লাফিয়ে পড়ল। তার পরে? তার পরে এইরকমই আরও কত কী, 'বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা'।

## ২

এর মধ্যে পুপে দিদি গেছে দার্জিলিঙে। 'সে' এখন একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগচে না। আমিও জ্বালাতন হয়েচি। বলে, 'আমাকে দার্জিলিঙে পাঠাও।' আমি বললুম, 'কেন?' সে বললে, 'পুপে দিদি বেতের মোড়ায় দড়ি বেঁধে যে-ঘোড়া বানিয়েচে সেইটেতে দু-বেলা চড়ে বেড়াব।' এক ধমক দিয়ে বললুম, 'চুপ করো, গোল কোরো না। এখন হুঁহাউ উপদ্বীপের ইতিহাস লিখচি।' তখন 'সে' মস্ত একটা হাই তুলে বললে, 'পুত্তুলালকে বলে দাও মোটর গাড়িটা নিয়ে আসে, আমি দিদির বাড়িতে যাই।' জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার দিদি থাকে কোথায়।' বললে, 'তেরো মাইল দূরে, চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ্ডু পাড়ায়।'

আমাকে বলে, 'তুমিও চলো। দিদি আমসত্ত দিয়ে উচ্ছেসিদ্ধ চমৎকার রাঁধে আর তার সঙ্গে ওভালটিন দিয়ে কুলের চাটনি।'

শুনে ভারি লোভ হল। গাড়িতে চড়ে বসলুম। ঘোর অন্ধকার। পুকুরের ধারে আসশেওড়ার ঝোপ ছিল। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেঁকশিয়ালি ডেকে উঠল। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, ভয়ে পুত্তুলাল চমকে উঠে গাড়িসুদ্ধ গিয়ে পড়ল এক-গলা জলের মধ্যে। ভাগ্যে একটা হাঁড়ি ভাসছিল সেইটে ধরে সে তো উঠল ডাঙায়। এদিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাং ঢুকে লাফালাফি করচে। আর পুত্তুলালের সে কী চেঁচানি! আমি গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্চি, 'বনমালী বনমালী।' ইস্টুপিডের কোনো সাড়া নেই, সে তখন শান্তিনিকেতনে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্চে। ভারি রাগ হল। জলে আমার চুলগুলো গেচে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর দিদির ওখানে

যাই কী করে। হঠাৎ শুনি পুকুর পাড়ে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠেচে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে, ধরলুম তাদের একটাকে। চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একরকম ঠিক করে নিলুম। ওদিকে তখনও পুত্তুলাল এক হাঁটু পাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গ আঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাউ হাউ করচে। পিঠের কাপড়ের মধ্যে ব্যাংও যত লাফায় তারও তত লাফানি। শেষকালে আমি গিয়ে পকেট থেকে একটা ফাউন্টেন পেন বের করে দু-চার খোঁচা মারতেই এত বড়ো একটা সবুজ রঙের কোলা ব্যাং লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

তার পরে যাওয়া গেল ওর দিদির বাড়িতে। খিদে খুব পেয়েচে। ওর দিদিকে বললুম, ‘বের করো তো তোমার ওভালটিন দিয়ে কুলের চাটনি।’ সে বললে, ‘হায়রে, আমার পোড়া কপাল, এই গেল মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবারে ফাটা ফুটবল ভরতি করে সমস্তটা পাঠিয়ে দিয়েচি বুজু দিদির ওখানে-সে ওটা খেতে ভালোবাসে ছাতুর সঙ্গে মেখে।

মুখ শুকিয়ে গেল, বললুম, ‘আমরা খাই কী?’

সে বলে, ‘কমলালেবু দিয়ে চিংড়িমাছের মোরব্বা ওই ভাঁড়ের তলায় অল্প একটুখানি আছে, বাছারা খেয়ে নাও, নইলে পিত্তি পড়ে যাবে।’



ভাঁড় চেঁচেপুঁছে তিন জনে তিন চামচ খেয়ে কোনোমতে বাড়ি ফিরে এসে বাঁচি। চটিজুতো ভিজে, গা-ময় কাদা। বনমালীকে ডাক দিয়ে বললুম, ‘বাঁদর, কী করছিলি।’ সে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, ‘বিছে কামড়েছিল, তাই ঘুমচ্ছিলুম।’-ধমক দিয়ে বললুম, ‘খেতে দিবিনে?’ সে বলে, ‘পাব কোথায়? সকালে তোমার জন্যে রুটি টোস্ট করেছিলুম, তারই কিছু ছাল আছে আর আছে কাঁচকলা ভাতে।’ কী করি, তাই খেয়ে পুপুদিদিকে সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি লিখতে বসেছি।

‘পুপুদিদি,

‘সে’ তো চলে গেল, বললে, ‘পুপুদিদি নেই, আমি এখানে থাকব না।’ দু-দিন পরে তার মাসতুতো দিদির বাড়ি থেকে একজন লোক এসে উপস্থিত। মস্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দান, বনমালীর মতো রং কালো, ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা গোঁফ, চোখ দুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মেরজাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা লুঙির উপরে হলদে রঙের তিন কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি, গলার আওয়াজ যেন কুঞ্জবাবুদের মোটর গাড়িটার শিঙের মতো। আমি সকাল বেলা খোওয়া-

ফেলা আধ-মেরামত করা এবড়োখেবড়ো রাস্তাটায় প্রাণপণে পনেরো মিনিট পায়চারির পর জুতোর তলা জখম করে ঘরে এসে লিখতে বসেচি, হঠাৎ পিছন দিক থেকে সাড়ে তিন মন ওজনের গলায় কে ডেকে উঠল, 'বাবুমশায়!'

চমকে উঠে কলমের খোঁচায় খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেল। পিছন ফিরে দেখি সেই প্রকাণ্ড এক তাল মানুষ।

বললুম, 'কী হয়েচে, কে তুমি?'

সে বললে, 'আমার নাম পাল্লারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেচি, জানতে চাই 'সে' কোথায় গেল।'

আমি বললুম, 'আমি কী জানি।'

পাল্লারাম চোখ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, 'জানো না বটে! ওই যে তাঁর তালি-দেওয়া আঁশ বের করা সবুজ রঙের এক পাটি পশমের মোজা কাদাসুদ্ধ শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালির কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেলফে ঝুলচে ওটা ফেলে সে যাবে কোন প্রাণে!'

আমি বললুম, 'লোকসান সইবে না, যেখানে থাকে ফিরে আসবেই। কিন্তু হয়েচে কী!'

পাল×ারাম বললে, 'পরশুদিন সন্ধ্যের সময় দিদি গিয়েছিল লাট সাহেবের বাড়ি করিম শেখের সীতার বনবাস পাঁচালি শুনতে-ফিরে এসে দেখে, একটা ঘটি একটা ছাতা এক জোড়া তাস, হারিকেন, লণ্ঠন, আর একটা পাথুরে কয়লার ডালা নিয়ে কোথায় 'সে' চলে গেছে; দিদি বাগান থেকে এক ঝুড়ি বাঁশের কোঁড়া, লাউডগা আর বেতে শাক তুলে রেখেছিল তাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিদি ভারি রাগ করচে।'

আমি বললুম, 'তা আমি কী করব!'

পাল্লারাম বললে, 'তোমার এখানে কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তাকে বের করে দাও!'

আমি বললুম, 'এখানে নেই, তুমি থানায় খবর দাও গে।'

'নিশ্চয় আছে।'

আমি বললুম, 'ভালো মুশকিলে ফেললে দেখচি-বলচি সে নেই।'

'নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে,' বলতে বলতে পাল্লারাম আমার টেবিলের উপর দমাদ্দম তার বাঁশের লাঠির মুণ্ডুটা ঠুকতে লাগল। টেবিলে ভীষণ ভূমিকম্প। পাশের বাড়িতে একটা পাগল ছিল সে শেয়াল ডাকের নকল করে হাঁক দিল হুক্কাহুয়া। পাড়ার সব কুকুর চেঁচিয়ে উঠল। বনমালী আমার জন্যে এক গ্লাস বেলের সরবত রেখে গিয়েছিল, সেটা উলটিয়ে, বোতল ভেঙে বেগনি রঙের কালির সঙ্গে মিশে রেশমের চাদর বেয়ে আমার জুতোর মধ্যে গিয়ে জমল। একটা ভাঁড়ে কিছু রেখেছিলুম ফিটকিরি, খয়ের, গেরিমাটি, ভুসো, তুঁতে আর হিরেকষ গুঁড়িয়ে, খুব একটা নূতন রকম কালি বানিয়ে বাজারে চালাবার মতলব ছিল। সেটা উড়ে আমার চুলে আমার দাড়িতে এসে ছড়িয়ে পড়ল। চিৎকার করতে লাগলুম, 'বনমালী, বনমালী।' বনমালী ঘরে ঢুকেই পাল্লারামের চেহারা দেখে 'বাপরে মারে' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় দিলে।

আমি বললুম, 'পাল্লারাম, রাগ কর কেন, নরম আওয়াজে বলো কী চাই তোমার।'

পাল্লারাম হাউমাউ করে বললে, 'আর কিছু না হোক, যেখান থেকে পাই সেই লাউডগা ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে-লাউডগা দিয়ে করমচা দিয়ে তার সঙ্গে ভিনিগার আর বার্লির

গুঁড়ো মেখে নিয়ে দিদি রোজ সাড়ে তিনটের সময় জলখাবার খায়। একটু এদিক-ওদিক হলেই তার ডান পায়ের গিঁটে ঝিলিক মারতে থাকে। জোঁক বসিয়ে তবে সারাতে হয়।'

আমি প্রতাপকে ডেকে বললুম, 'প্রতাপ, যেমন করে পারো এই লোকটাকে কিছু লাউডগা জোগাড় করে দাও, নইলে আমাকে মেরেই ফেলবে।'

প্রতাপ মীরাপিসির বাগান থেকে ঝুড়িতে করে লাউডগা শাক নিয়ে এল। পাল্লারাম সেটা নিলে, তার সঙ্গে নিলে জলের কুঁজোটা, একটা গঁদের শিশি, একখানা পুরোনো প্রবাসী, এক পাটি খড়ম পড়েছিল সেটা, সবগুলো ভরতি করলে একখানা ছেঁড়া কাগজ ফেলবার চুপড়িতে। একটা তলাভাঙা বালতি ছিল সেটাও নিলে।

আমি বললুম, 'বালতি নিয়ে কী হবে।'

পাল্লারাম বললে, 'বড়ো রোদ্দুর, ওটা আমি টুপির মতো করে পরব।'

এই বলে সে চলে গেল, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কাপড়খানা তখনই কাচতে দিলুম। সাবান দিয়ে গরম জল দিয়ে স্পিরিট দিয়ে এমোনিয়া দিয়ে মাথা যতই ধুই, চুল থেকে সেই আমার অসামান্য কালির মশলার রং কিছুতেই যেতে চায় না। মহা মুশকিলে পড়েছি। কুনো মিস্ত্রি এসে কাঠের গুঁড়োর সঙ্গে বালি মিশিয়ে মাথা ঘষে দিচ্ছে। বলছে, এমন করে তিন দিন তিন বেলা ঘষলে মাথা বেশ সাফ হয়ে যাবে, চুলও বেশি বাকি থাকবে না। 'সে' যদি এখনও দার্জিলিঙে থাকে তবে তাকে বলে দিয়ো তার দিদির বাঁশের কোঁড়া আর বেতো শাক যেন শিগগির ফিরিয়ে দেয়, লাউডগা আমি দিয়ে দিয়েছি। ভয় হচ্ছে আবার কালই পাল্লারাম এসে পাছে উৎপাত করে। ইতি ৮ই বৈশাখ ১৩৩৮।

-দাদামশাই

*আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৩৮*




## সমর দে

### ১

মোহনপুরের জমিদার বাড়ির নাটমন্দিরে লোকে লোকারণ্য-ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কি। সে কী ভিড়ের ভিড়।

মেজোবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন; কলকাতা থেকে খুব নামকরা যাত্রার দল এসেছে। সব প্রজাদের নেমন্তন্ন। তার ওপর আবার পালাটাও খুব ভালো-'পঞ্চনদ'। ভিড় হবে না তো কী? আশেপাশের গ্রাম উজাড় করে তো সব এসেছেই-এমনকী দু-চার ক্রোশের লোকেরাও। নাটমন্দিরের থামে থামে রংবেরঙের আলোয় আলোয় রাতকে দিন করে ফেলেছে।

আসর বেশ জমে উঠেছে; এমনি সময় চার জুড়িদার এসে গলা সাধতে শুরু করে দিল। সামনেই অনেকখানি জায়গা দখল করে একদল ছেলে গুম হয়ে যাত্রা শুনছিল কিন্তু এই হতভাগা জুড়িদারদের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে উঠল।

যে ছেলেটি সবার আগে বসে ছিল তার নাম তড়িৎ। তড়িৎকে ও-দলের পাণ্ডা বললেও অন্যায় হয় না; কারণ ওর কথায় আর সবাই উঠত-বসত।

তড়িৎ ফেলুকে বলল, 'চল খানিকক্ষণ বাইরে থেকে ঘুরে আসি। এ ব্যাটাদের গর্দভরাগিণীর জের শিগগির মিটবে বলে মনে হচ্ছে না।' বাইরে এসে তড়িৎ বলল, 'ভাবছিলাম আজকের পালাটা ভালো করে শুনব; কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া জুড়িদাররা যেমনিভাবে গলা ভাঁজতে শুরু করেছে-এতে সরে পড়াই ভালো।' তারপর চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে খাটো গলায় বলল, 'পাঁজি দেখেছিস?' সবাই অবাক হয়ে বলল, 'পাঁজি? কেন বল তো?'

'দুর বোকারা, আজকে যে নষ্টচন্দ্র!'

'আজ নষ্টচন্দ্র?'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। সে খবরও রাখিস না? তোরা দেখছি সবাই ভালোমানুষ হয়ে চললি রে!'

ফুর্তিতে অধীর হয়ে খেলু একটা লাফ মেরে চেঁচিয়ে উঠতেই-তড়িৎ ওর মুখ চেপে ধরে বলল, 'আস্তে, আস্তে! চেঁচাসনে!' হাত ছাড়িয়ে দিয়ে আবার খেলু বলল, 'ওরে ভালোই হয়েছে রে, আজ পাকা ফলার-যাও দু-হাতে তোলো আর খাও। এন্তার খাও বাবা, এন্তা-র খাও। কেউ দেখবার নেই! কেউ কইবার নেই! বিলকুল যাত্রার আসরে মশগুল। চল তাড়াতাড়ি।'

ফেলু বলল, 'বড্ড গরম বোধ হচ্ছে, আগে চল প্যারিবাবুর বাগানে ডাবের জল খেয়ে-দিল খোলাসা করি, তারপর শিববাবুর বাগানের কলা, বাড়ুয্যেমশাইয়ের আখ, রামধন পোদ্দারের শশা এ তো আছেই।' খেলু ক্যানক্যানে গলায় বলল, 'তারপর মদন ময়রার দোকানে হানা দিয়ে 'মিষ্টিমুখ'! কি বলিস?' বলেই হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল। টুক্কু এক হুমকি ছেড়ে বলল, 'নে নে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেকচার ঝাড়লে হবে না-চল।'

২

জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা রওনা হল শিববাবুর কলা বাগানে। বড়ো রাস্তায় উঠে খানিকটা পথ এগুতেই, ফেলু ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাবা! সামনে ওটা কী?' সকলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে তাই তো দূরে মস্ত বড়ো একটা সাদা ভূতের মতো টলতে টলতে এগিয়ে আসছে না। ভয়ে জড়সড় হয়ে ফেলু চেঁচিয়ে বলল, 'ওরে বাবারে! এযে মস্ত বড়ো ভূত! চল বাঁচতে চাস তো পালাই শিগগির। কাজ নেই বাবা নষ্টচন্দ্রে!' তড়িৎ ওদের সাহস দিয়ে বলল, 'ভয় নেই। আরে ভূতই যদি হয়, তো এতগুলো লোক একটা ভূতকে শায়েস্তা করতে পারব না?' তা বললে কি হয়! ভূতটা যে ক্রমেই টলতে টলতে এগিয়ে আসছে! আর একটু হলেই হয়তো ঘাড়ে চাপবে। রইল পড়ে নষ্টচন্দ্র! ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ওরা যে যেদিকে পারল আপ্রাণ চেষ্টায় ছুটল।

তড়িৎ কিন্তু ঘাবড়াবার ছেলে নয়। সাহস করে এগিয়ে দেখে সাদা ভূত আর কিছুই নয়, একটা গোরুর গাড়ির ছাদ সাদা কাপড় দিয়ে ছাউনি দেওয়া! দেখে তো ও হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। তড়িৎকে হাসতে দেখে গাড়োয়ান বলল, 'কী হয়েছে খোকাবাবু?' তড়িৎ বলল, 'সব সাহসীর দল কিনা তাই।'

যাক! ভূতের ঘাড়ে চেপে তড়িৎ যখন, ফেলু, খেলু, টুক্কুকে ডাকল, তখন ওদের ধড়ে প্রাণ এল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে ওরা বলল, 'দুর ছাই! এরই জন্য এত ভয়?' তড়িৎ বলল, 'তোদের মতো সাহসী নিয়ে-'। ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে খেলু বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের নিয়ে খুব সুবিধে হবে। তুই ভাবিস কী? এবার ভূত কেন, ভূতের ঠাকুরদা এলেও আর আমরা কেউ ঘাবড়াচ্ছি না, চল শিগগির।'

বড়ো রাস্তা থেকে নেমে একটা সরু পথ ধরে ওরা চলল কলা বাগানের দিকে। কিছুদূর এসে পথটা ঘুরে একটা বাড়ির উঠোনের ওপর দিয়ে চলে গেছে। তড়িৎ বলল, 'আরে কে আর এখন জেগে আছে? যারা জাগবার তারা এতক্ষণে যাত্রার আসরে বিভোর।' চোরের মতো পা টিপে টিপে উঠোন পেরিয়ে ওরা পুকুর পাড়ের ধার দিয়ে চলল। সামনেই কলা বাগিচা। বাঁশ দিয়ে উঁচু করে বেড়া দেওয়া। কোনো দিক দিয়েই ভেতরে ঢোকবার সুবিধে নেই। দরজার সামনে এসে ওরা দেখে, দরজায় কুলুপ দেওয়া। ফেলু বলল, 'হয়েছে আজ কলা খাওয়া। চল দেখি অন্য কোথাও সুবিধে করা যায় কি না।'

হঠাৎ তড়িতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ও বেড়ার পাশে একটা গাছে চড়ল; তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে ধুপ করে-একেবারে বাগানের ভেতর! কাছেই মালির ঘর, তড়িৎ পা টিপে টিপে ঘরের বেড়ায় কান ঠেকিয়ে দেখল-ভেতরে কারোর নাক ডাকানির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আর চাই কী! মালি তো গেছে যাত্রা শুনতে। আনন্দে অধীর হয়ে বলল, 'মালি নেই রে। তোরা পেছনের দরজার কাছে যা, খুলে দিচ্ছি।'

দরজা খুলে দিতেই তিনজনে ভেতরে ঢুকে পড়ল। খেলু বলল, 'কোন গাছে কলা পেকেছে আগে তাই খোঁজ।' এসব কাজে তড়িতের মাথায় বুদ্ধি খেলে বেশি। ও বলল, 'আরে গাছে চড়া পরে হবে, আগে চল মালির ঘরে।' টুক্কু বলল, 'কেন রে?' 'কেন আবার কী? আগে চল না! বেটা রোজ রোজ বাজারে পাকা কলা বেচতে নেয়। আজ ঘোল খাইয়ে তবে ছাড়ব।' ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে ওরা মালির ঘরের কাছে এল; কিন্তু দরজায় তালা দেওয়া। অনেক কলকৌশলে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকল। ঘরে পা দিয়েই খেলু বলল, 'আঃ কী চমৎকার পাকা কলার গন্ধ।' কিন্তু অনেক খোঁজাখুজি করেও সে পাকা কলার সন্ধান মিলল না। হঠাৎ তড়িতের চোখ পড়ল মাচার নীচে খানিকটা বালির ওপর। বালি সরাতেই কলা বের হয়ে পড়ল।

তারপর মজা দেখে কে! চারজনে মাচার নীচে বসে কলা তোলে আর কপাকপ গেলে। এমনি করে সমস্ত কলা সাবাড় করে ওরা বেরিয়ে পড়ল। তড়িৎ কিন্তু ঘর থকে মালি বেচারির কাটারি আর দড়িগাছা নিতে কসুর করল না।

পথে বের হয়ে তড়িৎ বলল, 'চল এবার ডাব খেতে প্যারিবাবুর বাগানে।'

৩

পুকুরের পশ্চিম পাড়ের পথ ধরে, উত্তর পাড়ার ভেতর দিয়ে ওরা যখন ক্ষেত্রবাবুর বাগানে পৌঁছোল, তখন রাত দেড়টা। চারিদিকে হুয়া হুয়া রবে শেয়াল ডাকছে। তড়িৎ সড়সড়িয়ে গাছে উঠে পড়ল। তারপর দড়িটার একদিক গাছের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আর একদিক বাগানের বাইরে টুক্কুদের কাছে ছুড়ে ফেলল। ওরা দড়ি টেনে ধরার সাথে সাথেই তড়িৎ অনেকগুলো ডাব দড়ির গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে সুড়সুড়িয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল- অমনি ডাবগুলোও দড়ির গায়ে ঝুলতে ঝুলতে একেবারে বাগানের বাইরে টুক্কুদের কাছে।

কাছাকাছি একটা পোড়োবাড়ি ছিল; ওরা ডাবগুলো সেখানে বয়ে নিয়ে একে একে সবগুলো ডাবই সাবাড় করে চলল আবার আখ খেতে।

আখ খেতে গিয়ে তড়িৎ বলল, 'টুক্কু তুই এই দিকটায় পাহারা থাক, আর, খেলু ওই দিকে যা।' তারপর ফেলুকে ইশারায় ডেকে আখ খেতে ঢুকে পড়ল। ভেতরে গিয়ে তড়িৎ দা দিয়ে আখের গোড়ায় কোপ শুরু করল। কোথায় আখ কাটবে তা না ঠক ঠক শব্দ করে উঠল।

ফেলু বলল, 'ওরে সর্বনাশ করলি, ওটা আখ নয়। আখ নয়।'

এদিকে শব্দ শুনে ঘর থেকে ক্যানকেনে গলায় কে যেন বলে উঠল, 'কেরে বাগানে? কে-কে?' বেগতিক দেখে ফেলু তো হুড়মুড় করে মারল এক দৌড়। আখের পাতার হিঁচকে লেগে ওর পা কেটে গেল। তড়িৎ আর কী করে, সেও অগত্যা সটান দিল।

ছুটতে ছুটতে সবাই একেবারে তড়িৎদের বৈঠকখানাতে। এতক্ষণে ফেলুর ভয় ভেঙেছে। সে হোঃ-হোঃ করে হেসে বলল, 'তড়িৎ তুই কিনা শেষে আখ ভ্রমে বাঁশের খুঁটিতে কোপ মারলি?' তড়িৎ বলল, 'আরে দেখলুম তোদের সাহসের দৌড়!'

দেওয়ালের ঘড়িতে ঠং ঠং করে তিনটে বাজল। টুক্কু বলল, 'থাক, খুব খেয়েছি বাবা, আর কত? লাভের ভেতর ও আখ খেলে জিব কাটত।' ফেলু হেসে বলল, 'আঙুর যখন নাগালের বাইরে তখন তাকে টকই বলতে হবে, এই তো? ওসব বাজে কথা রাখ, সোজা কথায় বল আখ খেতে পেলুম না।'

টুক্কু বলল, 'নে নে হয়েছে, আর তর্ক করতে হবে না; চল আবার যাত্রার আসরে, এতক্ষণে হয়তো পালাটা বেশ জমে এসেছে।' খেলু টুক্কুকে বাধা দিয়ে বলল, 'আরে রেখে দে তোর যাত্রা।' তারপর তড়িতের দিকে চেয়ে বলল, 'আরে আসল কথাটাই ভুলে গেছি। বলেছিলুম না, যে মিষ্টিমুখ করতে হবে সেইটেই যে বাকি রয়ে গেল।' ফেলু খেলুকে এক ধমক দিয়ে বলল, 'নে নে হয়েছে, আর মিষ্টিমুখে কাজ নেই-চল যাত্রার আসরে।'

এতক্ষণে তড়িৎ মুরুব্বির মতো বলে উঠল, 'বড্ড ইয়ার হয়েছিস ফেলু, না! খেলু ঠিকই বলেছে, মিষ্টিমুখ করতেই হবে। বিকেলে নবীন ময়রার দোকানে যা রসগোল্লা তৈরি করতে দেখেছি-জমিদার বাড়ির বায়না! আঃ , জিব বেয়ে জল ঝরছে রে! আর পারছি না, চল শিগগির।'

## ৪

বাজারে ঢুকতেই নবীন ময়রার দোকান মস্ত একটা বট গাছের তলায়। চারজন দোকানের কাছাকাছি যেতেই একটা খেঁকি কুকুর ভয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে উঠে পালাল।

তড়িৎ বলল, 'দাঁড়া, আর এগুসনে! দেখি আগে কেউ জাগল কি না।' একটু কান পেতে থেকে পা টিপে টিপে সবাই একেবারে-দোকান ঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তড়িৎ বলল, 'দোকানে বোধকরি সেই হাবাটা ঘুমুচ্ছে।' টুক্কু বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে-ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলছে; আর কাঠের সিন্ধুকের ওপর হাবা দিব্বি আরামে ঘুমুচ্ছে। তার নাক ডাকছে-ঘড়, ঘড়, ঘড়। খেলু বলল, 'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আর দেখ মেঝেতে বড়ো বড়ো দু-দুটো কড়া ভরতি রসগোল্লা-রসে হাবুডুবু খাচ্ছে!' তড়িৎ বলল, 'চুপ, চুপ! টের পায় তো সবই মাটি।' তারপর দা দিয়ে চোরের মতো বেড়া কেটে একে একে সবাই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ফিসফিস করে তড়িৎ বলল, 'এত বড়ো কড়া টেনে বাইরে নেওয়া মুশকিল হবে। তার চাইতে আলোটা নিবিয়ে দে, এখানে বসেই সৎকার করা যাক। আরে হ্যাঁ, ও হাবার ঘুম সহজে ভাঙলে তো।'

তারপর আর কী? সবাই মনের সুখে অন্ধকারে কপাকপ শুরু করল। হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ হতেই ওরা ভাবল, হাবার বুঝি ঘুম ভেঙে গেছে।

ফেলু 'সারলে রে' বলে তড়াক করে উঠে দাঁড়াতেই-তার মাথার সাথে ঠকাস করে কী একটা লেগে একেবারে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। সাথে সাথে 'ওরে বাপ রে গেলাম' বলে সবার ছুটোছুটি দেখে কে! তড়িৎ বেচারি পড় তো পড় একেবারে জ্বলন্ত উনোনে! চেঁচাতে চেঁচাতে হুড়মুড় করে বেড়া ভেঙে যে যেদিকে পারল ভোঁ দৌড়!

চেঁচামেচি শুনে আঁৎকে উঠে হাবা হাঁউমাউ করে উঠল। দেখতে দেখতে লণ্ঠন হাতে পাশের দু-চার দোকানের লোক ছুটে এল-ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?

আর ব্যাপার কী! হাবা তো এদিকে সিন্ধুক থেকে পড়ে, হাত-পা ভেঙে চোখ কপালে তুলে গোঁ গোঁ করছে; আর ঘরময় রসগোল্লার হরির লুট।

ওপরে তাকাতে সবাই দেখল, সিকেয় তোলা বড়ো একটা কড়া কাত হয়ে রয়েছে, আর তারই গা বেয়ে টপ টপ করে রস ঝরছে!

হাবা হাঁউমাঁউ করে কী বলল, কেউ তা বুঝতে পারল না। সবারই মুখে একই প্রশ্ন, 'ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করে গনেশ মুদি বলল, ‘আরে মাথা ঘামানোর দরকার নেই হে, ভোর হোক না; দেখবখন চোর পালায় কোথায়? হ্যাঁ বাবা, এ ময়রার ঘরে ‘নষ্টচন্দ্র’! পিঠে ছাপ না নিয়েই কি ফিরে গেছে?’

হাঁপাতে হাঁপাতে তড়িৎ, খেলুর বাড়ি এসে উঠল, কিন্তু তখনও ওদের গরম রসের পোড়ার জ্বালা একটুকুও কমেনি? খেলু তো যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হাঁউমাঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে একেবারে শুয়েই পড়ল। এত দুঃখের সময়ও বেচারি তড়িৎ আর খেলুর অবস্থা দেখে ফেলু হিঃ-হিঃ করে হেসে বলল, ‘কেন বাপু, খুব যে মিষ্টিমুখ মিষ্টিমুখ বলে লম্ফঝম্ফ করছিলে-এখন?

*অগ্রহায়ণ ১৩৩৮*




## যতীন সাহা

### ১

শম্ভুকে আমরা কেউ কোনোদিন খেলার মাঠে দেখেছি কি না সন্দেহ। সেই যে কবে একদিন ও ইশকুলে ভরতি হয়ে বোর্ডিঙে খাট পেতেছে, তারপর থেকে শুধু ইশকুলে যাবার পথটা ছাড়া আর কোনো পথে বোধ হয় ও বের হয় নাই।

সব সময়ই শম্ভু গুম হয়ে ঘরে বসে থাকত; রোজ সকালে বিকেলে হাত জোড় করে আকাশের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলত। আমরা বলতাম, 'শম্ভু তুই রোজ সকালে বিকেলে আসন-পিড়ি হয়ে বসে, ফিসফিস করে কী ছাই মুণ্ডু বকিস রে?' শম্ভু গম্ভীর হয়ে বলত, 'ও সব বুঝবি না রে! ও হচ্ছে ন্যাস।'

'ন্যাস! সে আবার কী রে?' শম্ভু তার কোনো জবাব দিত না।

সে যাক। শম্ভু যে 'প্ল্যানচেট' করে প্রেতাত্মা এনে পরীক্ষার প্রশ্ন জেনেছিল-সে কথা আমিও শুনেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করিনি।

অঙ্কে ছিলাম নেহাত কাঁচা; তাই শম্ভুকে একদিন বললাম, 'আচ্ছা শম্ভু! তুই যদি একদিন প্রেতাত্মা এনে আমাদের অঙ্কের প্রশ্নটা 'আউট' করে দিতে পারিস তো বুঝি হ্যাঁ ন্যাসের বাহাদুরি আছে।'

### ২

শম্ভুর সাথে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। শম্ভু আমায় যতটা বিশ্বাস করে তেমন বোধ করি বোর্ডিঙের আর কাউকে করে না। এই অল্প কয়দিনেই ও আমায় একরকম শিষ্য করে তুলেছে। এবার থেকে শম্ভুর সাথে সাথে আমিও খেলাধুলা ছেড়ে দিয়েছি। আর বাজেও বড়ো একটা বকি না; ওতে নাকি মানসিক শক্তি হ্রাস হয়-শম্ভু তো তাই বলে।

বোর্ডিঙের আর সব ছেলে ঘুম থেকে উঠবার আগেই শম্ভু আমায় রোজ রোজ ডেকে তোলে। তারপর ছাতে উঠে শম্ভু ন্যাস করতে শুরু করে দেয়, আমিও শম্ভুর সাথে থাকি। প্রথম কয়দিন শম্ভু আমায় কোনো মন্ত্রতন্ত্রই শেখাল না; শুধু পদ্মাসন হয়ে বসে সংযম শেখবার কতগুলো নিয়ম বলে দিল। রোজ রোজ সকালে-বিকেলে শম্ভুর উপদেশ মতো সংযম শিখতে লাগলাম। বোর্ডিঙের ছেলেরা হঠাৎ আমার এতটা পরিবর্তন দেখে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে লাগল। অনাদি অনেক গবেষণা করে আমার নাম দিল 'শম্ভু দি সেকেন্ড'। এক মাসের মধ্যে আমার নতুন দেওয়া নামটা ইশকুলময় রটে গেল। রাস্তাঘাটে সবাই আমায় 'শম্ভু দি সেকেন্ড' বলে পাগল করে তুলল। ওরা বকুনির চোটে আমার কান ঝালাপালা করে দিল-কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

রোজ রোজ পদ্মাসনে বসে বসে হয়রান হয়ে, একদিন শম্ভুকে বললাম, ‘শম্ভু, পদ্মাসনে বসে বসে তো আমার হাঁটুতে আর পায়ের কবজিতে কড়া পড়ে গেল; এবার কী করতে হবে বলে দে? নইলে হাত-পা থাকতে শুধু শুধু পঙ্গু সেজে বসে থাকতে আমি আর পারব না ভাই, তা যাই বল না কেন!’

শম্ভুকে কোনোদিন হাসতে দেখিনি। আজ তার হাসি মুখখানা ঠিক স্বপ্নেরই মতো মনে হল। শম্ভু একটু মুচকি হেসে বলল, ‘আরে এ তো আর বাগবাজারের ‘স্পঞ্জ’ রসগোল×T নয় যে মুখে ফেলে দিলেই ব্যাস ...।’ আমি বললাম, ‘নাই বা হল ‘স্পঞ্জ’ রসগোল্লা, তাই বলে কি আর ‘রুটিন’টা একটু ‘চেঞ্জ’ করতে নেই?’ মাথা নেড়ে মুরুব্বির মতো শম্ভু বলল, ‘সাধনা করতে হয় হে মিথিল! সাধনা করতে হয়! ভেঙ্গা ছেলের ধৈর্য কম! অত ছটফট করলে চলবে না।’

৩

সেবার শম্ভু ‘প্ল্যানচেট’ করে ভূদেব চাটুজ্যের প্রেতাত্মা এনে যেসব অঙ্কের প্রশ্ন আমায় বলে দিল, পরীক্ষার আগে ঠিক একটি মাস ধরে সেগুলোকে কণ্ঠস্থ তো কণ্ঠস্থ একেবারে ঠোঁটস্থ করে ভাবলাম, এবারে আমার ‘ফুলমার্কস’ আটকায় কে? কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্ন হাতে পেয়েই চক্ষু একেবারে চড়ক গাছ! সে যাত্রায় সসম্মানে মস্ত বড়ো একটা গোল আলু পেয়ে শম্ভুর উপর ভক্তি চটে গেল। সটান গিয়ে শম্ভুকে চেপে ধরলাম; কিন্তু শম্ভু যা বলল তার আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। শম্ভু বলল যে ভূদেব চাটুজ্যের প্রেতাত্মা কখনোই মিথ্যে প্রশ্ন বলে দেয়নি; কিন্তু এর ভেতর যে সেকেন্ড মাস্টারমশাই সে খবর জানতে পেরে প্রশ্ন বদলে ফেলেছেন সে দোষ কি শম্ভুর? না ভূদেব চাটুজ্যের প্রেতাত্মার?

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়; হতেও পারে। যাক এ নিয়ে আর বকাবকি না করে শম্ভুকে বললাম, ‘শম্ভু তাহলে ‘হাফ ইয়ারলি’ পরীক্ষার সময় কিন্তু অঙ্কের প্রশ্নটা বের করে দিতেই হবে।’ শম্ভু বলল, ‘আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে!’

বোর্ডিঙের সবাই শম্ভুকে ভয় করে চলে। কী জানি কবে হয়তো মন্ত্র হেঁকে ব্রহ্মদত্তি এনে ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। সেদিন নাকি অনাদি, যশো, বিষ্টু, মনি জোর গলায় বলেছে, ‘হ্যাঁ শম্ভুর ভেতর কিছু আছে, নইলে বিষ্টুর বাক্স থেকে যে একটা পাঁচ টাকার নোট উধাও হয়েছিল সেটা কি আর অমনি বের করে দেয়? নিশ্চয় ও প্রেত সাধনা জানে।’ যাহোক সেই থেকে শম্ভুকে সবাই খাতির করে চলত।

৪

সেদিন ক্ষিতীশের টেবিল থেকে তার সোনা দিয়ে বাঁধানো ফাউন্টেন পেনটা চুরি হয়ে গেল। ক্ষিতীশ তো রেগে অস্থির! কিন্তু রাগলে হবে কী! পেন আর পাওয়া গেল না। আমি ক্ষিতীশকে বললাম, ‘ক্ষিতীশ তুই এক কাজ কর শম্ভুকে গিয়ে বল। শম্ভু চোর ধরে দিতে না পারুক অন্তত বলে দিতে পারবে কলম কোথায় আছে।’ ক্ষিতীশ শম্ভুকে অনেক করে বলায় শম্ভু বলল, ‘আচ্ছা যাও দেখবখন।’

সাত দিন যেতে-না-যেতেই একদিন খুব ভোর বেলা শম্ভু সেই চুরি-যাওয়া কলমটা পকেট থেকে বের করে ক্ষিতীশকে বলল, ‘এইটে নাকি হে ক্ষিতীশ, তোমার কলম?’

ক্ষিতীশ কলমটা পেয়ে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলল, 'হ্যাঁ শম্ভুদা, হ্যাঁ এই তো গায়ে লেখাই রয়েছে 'কে. সেন', কিন্তু কী করে বের করলেন?'

কলমটা শম্ভু বের করতে পারবে তা আমি কখনোই ভাবিনি, মনে করেছিলুম হয়তো ন্যাস করে বলবে-ওমুক ঘরের ওমুক দিকে তোমার কলম এখন আছে। পাঁচ দিন পরে সেখান থেকে ওমুক দিয়ে যাবে। কিন্তু আমার সে ধারণা ঘুচে গেল যখন শম্ভু হাতে হাতে কলমটা বেরই করে দিল; আমি শুধুই মিথ্যে ভাবলুম, 'শম্ভুর ভেতর বাস্তবিকই কিছু আছে।' অঙ্কে ফেল করে যে শম্ভুর ওপর চটে গিয়েছিলাম তার জন্যে আজ মনে বড়োই অনুতাপ হল- কেননা, আজকে বুঝলাম, যে শম্ভুর একটা কথাও বাজে নয়। কেবলই মনে হল, সে দিন নিশ্চয় ও ঠিক প্রশ্নই বলে দিয়েছিল। কথাট যতই মনে হল ততই শম্ভুর প্রাণায়াম, যোগ, ন্যাস প্রভৃতির উপর আমার বিশ্বাস প্রবলতর হয়ে চলল।

যাক তার পর থেকে আমি আপ্রাণ চেষ্টায় লেগে গেলাম শম্ভুর কাছ থেকে প্রাণায়াম শিখতে।

## ৫

এত দিন বোর্ডিংটা বেশ চুপচাপ ছিল; হঠাৎ সেদিন খাবার ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে তেতলায় ভীষণ গণ্ডগোল শুনলাম। গিয়ে শুনি অনাদির পেঁটরা থেকে তার ঘিয়ের বোতল উধাও হয়েছে আর অনাদি চটে লাল হয়ে হোস্টেলের ছেলেদের লক্ষ্য করে বলছে, 'যত সব চোরের আড্ডা হয়েছে বোর্ডিঙে-আজ ওর ছাতা চুরি, কাল ওর কলম চুরি, পরশু তার টেনিস র্যাকেট চুরি এ সমস্ত কী!'



আমি ঘরে ঢুকে বললাম, 'এই যাঃ! কি অনাদি থাম না!' অনাদির রাগটা এসে পড়ল আমার উপর; দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা গেছে, নিজের একটা কিছু চুরি গেলে বুঝতে বাপু।' আমি বললাম, 'ঘিয়ের বোতলও আমার নেই, চুরিও যাবে না; আর চুরি গেলেও তোর মতো চেঁচিয়ে সারাটা বোর্ডিং মাথায় করতাম না।' অনাদি ঠিক তেমনি রাগের মাথায় বলল, 'তবে কী করতে শুনিই না।' 'কি করতাম? বোকার মতো হইহই না করে চুপসে শম্ভুকে গিয়ে বলতাম। তার পরে দেখতে ঘি চোরের কাঁদাকাটির বহর!'

অনাদি শম্ভুকে ধরে বসল-যে ঘিয়ের বোতলটার খোঁজ করে দিতেই হবে-সে চোর ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক; শম্ভু কিন্তু বেঁকে বসে বলল, 'না, না! ওসব পারব না বাবা! ন্যাসটা অমনি সহজ কিনা! যে চোখ বুজলেই ঘিয়ের বোতল এসে হাজির হবে? তোমরা তো ওর কিছু জানো না, জিজ্ঞেস করো ওই মিথিলকে।' আমি শম্ভুর ঘরেই ছিলাম; কিন্তু কিছুই বললাম না।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শম্ভুর ঘরে গিয়ে দেখি শম্ভু তক্তপোষের উপর চিতপাত হয়ে শুয়ে কী যেন ভাবছে। আমি ঘরে ঢুকতেই শম্ভু বলল, 'কী রে মিথিল আয়।' আমি ওর পাশে বসে বললাম, 'শম্ভু, ঘিয়ের বোতলটার একটা তল্লাস করে দে না ভাই। বেচারি অনাদি নইলে শুকিয়ে মারা যাবে যে। ও যেমনি ছেলে, হয়তো জলখাবারের ওপর দিয়ে ঘিয়ের দাম উসুল করে তবে ছাড়বে।'

শম্ভু হঠাৎ উঠে বসল। তার মুখচোখের ভাব দেখে আমার যেন কেমন কেমন ঠেকল। আমার দিকে একটু ঘেঁষে বসে চোখ ইশারা করে ও আমায় দোরটা বন্ধ করে দিতে বলল। দোর ভেজিয়ে দিয়ে এসে যখন শম্ভুর পাশে বসলুম, শম্ভু চোরের মতো আমায় বলল, 'শোন তুই যে ঘিয়ের বোতলের কথা বলিস-সে হয় কী করে? তুই কি মনে করিস যে ন্যাস জিনিসটা এমনই সোজা যে চোখ বুজে হ্রিং ফট ওঁ ফ্যাঁচ ফ্রং বললেই ঘিয়ের বোতল এসে হাজির হবে!' হঠাৎ তার মুখে এই কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুই বলছিস কী এসব! আমায় অবাক করলি যে! তবে ক্ষিতীশের ফাউন্টেন পেন, রমেশবাবুর টেনিস র‍্যাকেট এসব বের করলি কী করে?' শম্ভু একটু হেসে পর মুহূর্তেই আবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'কারোর কাছে বলবি না তো? আমায় ছুঁয়ে দিব্বি কর!' কিছুই বুঝতে পারলাম না তবুও শম্ভুর গা ছুঁয়ে বললাম, 'এই তোকে ছুঁয়ে দিব্বি করছি কাউকে বলব না।'

শম্ভু তার গলাটা আরও নামিয়ে এদিক-সেদিক চেয়ে, আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, 'আরে তাও জানিস না বোকা কোথাকার! ওসব জিনিস আমি নিজেই লুকিয়ে এনে রেখে দিই; তারপর যখন খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে আমায় এসে বলল, তখন আমি ন্যাস করার ছুতো করে বের করে দি। দেখিস না আমি কোনোদিন কারোর সাথে কথা বলি না। কী জন্যে জানিস? ও শুধু নিজের 'গ্র্যাভিটি' বজায় রাখবার জন্যে। আর তাই জন্যে তো সকালে-বিকালে ন্যাস করা। এসব কাজে খুব চালাক হতে হয় বুঝলি? দেখ তো শুধু এই ন্যাসের জন্যেই বোর্ডিংসুদ্ধ সব ছেলে আমায় এমন মেনে চলে!'

## ৭

শম্ভুর কথাগুলো মোটেই বিশ্বাস হল না। বললুম, 'যাঃ! যত সব বাজে চাল দিচ্ছিস।' শম্ভু আমার গা ছুঁয়ে বলল, 'এই তোর দিব্বি করে বলছি এর একটা কথাও যদি মিথ্যে হয়। ঘিয়ের বোতলটা যদি সত্যি চুরি না গিয়ে আমিই লুকিয়ে এনে থাকতাম, তবে কি আর আজ অনাদিকে ফাঁকি দিয়ে বিদায় করে দেই?'

এবারে আর শম্ভুর কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না। তার ভণ্ডামিটা যেন কিছুতেই সইতে পারছিলাম না; কিন্তু সে ভাবটা গোপন করে বললাম, 'শম্ভু! তাহলে তো বেশ মজা হয়েছে রে? আর ভাবনা কীসের? ঘিয়ের বোতল যে সেদিন আমিই লুকিয়ে অনাদির বাক্স থেকে নিয়ে রেখে দিয়েছি।' শম্ভু কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, 'যাঃ।' আমি

শম্ভুর হাতটা ধরে বললাম, 'সত্যি বলছি ভাই! ঘিয়ের বোতল আমিই নিয়েছি।' খুশিতে শম্ভুর মুখখানি ভরে গেল। তড়াক করে উঠে বলল, 'তবে আর কী, আমি ন্যাস করতে বসলে তুই ঘিয়ের বোতলটা চুপ করে এনে দিবি। দেখিস কেউ যেন টের না পায়, যা ওদের বল গিয়ে।'

উপরে এসে সবাইকে ডেকে বললাম, 'শম্ভুকে রাজি করিয়েছি অনেক বলে-কয়ে। ও এক্ষুনি আসছে; ঘিয়ের বোতল বের করে দেবে।' তার পর ঘরে গিয়ে আমার যে খালি একটা ঘিয়ের বোতল পড়েছিল সেটাকে র্যাপারের নীচে নিয়ে এলাম।

শম্ভু একটা গরদের কাপড় পরে ফোঁটা কেটে ওপরে আসতেই আমরা সবাই তাকে ঘিরে ফেললাম। শম্ভু অনাদিকে কাছে ডেকে বলল, 'অনাদি তুমি এক কাজ করো, এই ঘরে যাদের উপর তোমার সন্দেহ হয় তাদের নাম বসে বসে ভাবো। দেখো অন্যমনস্ক হয়ো না কিন্তু; তাহলে কিছুই হবে না। আর এক কথা-আমি যখন ন্যাস করতে বসব তখন ঘরে আলো থাকবে না। তারপর হাতে তিন তালি দেওয়ামাত্র একজন ঘরে আসবে।' আমরা সবাই বললাম, 'আচ্ছা তাই হবে।'

শম্ভু ন্যাসে বসে গেল; আমরা সবাই বাইরে বারান্দায় রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। আগেই ঠিক করা ছিল তিন তালি দিলেই আমি তাকে বোতল দিয়ে আসব অপর কাউকে যেতে দেব না। একটু পরেই 'ওঁ হ্রিং ফট স্বাহাঃ' বলে শম্ভু মন্ত্র হাঁকতে লাগল।

ওর ভণ্ডামি দেখে আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না। শুধু বোতলটা সবাইকে দেখিয়ে বললাম, 'চুপ চুপ! বাছাধনের এবারে সব ভণ্ডামি বের করব। এই দেখ নকল ঘিয়ের বোতল আগেই এসে হাজির হয়েছে, এখন দিয়ে এলেই হয় আর কি।' ঠিক এমনি সময় পর পর তিন বার হাততালি বাজল। আমি আঁধার ঘরে ঢুকে তার হাতে সেই বোতলটা দিয়ে বললাম, 'এই নে।' বোতলটা দিয়ে আমি চলে আসছি, আঁধারে শম্ভু আমায় ফিসফিস করে ডেকে বলল, 'সবাইকে বাইরে রাখ গিয়ে মিনিট তিনেক পর আমি কাত হয়ে পড়ে গোঁ গোঁ করে হাত-পা ছুড়তে লাগব। তখন তুই ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকিস, বুঝলি? তাহলে ওরা বুঝবে যে বাস্তবিকই ন্যাস করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।' 'আচ্ছা' বলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

বাইরে এসে দেখি ওরা সব হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। টপ করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ছুটে ওদের কাছে গিয়ে বললাম, 'এই চুপ, চুপ! সব পণ্ড করে দিবি! শিগগির কলতলা থেকে মগটা নিয়ে এসে ওতে কালি গোল; আর ছুটে যা একজন দু-পয়সার বরফ কিনে নিয়ে আয়। ভণ্ডামিটা আজ বের করব হতভাগার!'

## ৮

সব ঠিকঠাক করতে-না-করতেই শম্ভু ঘরের ভেতর গোঁ গোঁ করতে শুরু করে দিল। আর যাবে কোথায় সবাই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলেই দেখি শম্ভু চিতপাত হয়ে পড়ে গোঁ গোঁ করছে, আর ঘিয়ের খালি বোতলটা গড়াগড়ি খাচ্ছে খাটের পায়ার কাছে।

অনেক কষ্টে হাসি চেপে আমি কাঁদো-কাঁদো সুরে ডাক ছেড়ে বললাম, 'হায়! হায়! শম্ভুকে তোরা মেরে ফেললি রে, মেরে ফেললি!' এদিকে যশো বলে উঠল, 'ওরে কে আছিস জল জল! পাখা!' যেই না বলা বিষ্টু সেই কালি গোলা জল খানিকটা শম্ভুর মুখে চোখে ছিটিয়ে দিয়ে বাকিটা মাথায় ঢেলে দিল। কেউ হাওয়া করে, কেউ-বা হাত-পা ধরে

টানাটানি করে- শম্ভু কিন্তু ঠিক ভণ্ডের মতো তখনও গোঁ গোঁ করে হাত-পা ছুড়তে লাগল।

শচীন ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'এই যে বরফ, বরফ!' অমনি ওরা কে কে যেন দুই-তিন চাকা বরফ নিয়ে কেউ শম্ভুর মাথায় ঠাসে, কেউ হাতের তালুতে কেউ পায়ের তলায় কেউ বুকের ওপর ঠেসে ধরল। কিন্তু কী আশ্চর্য! তবুও শম্ভুর ভণ্ডামি যায় না। যশো চট করে গিয়ে একটানে শম্ভুর গায়ের নতুন গেঞ্জিটা ফেললে ছিঁড়ে। মনি কোথা থেকে একটা কাঁচি নিয়ে এসে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে শম্ভুর মাথার চুলগুলো কেটে বলল, 'লাগাও বরফ।' হাসতে হাসতে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম!

এদিকে হইচই শুনে সারাটা বোর্ডিঙের ছেলে সেখানে ভেঙে পড়ল। এমনকী সুপারিন্টেন্ডেন্টবাবুও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, 'ব্যাপার কী হে! ব্যাপার কী?' কে একজন ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'শম্ভু ফিট হয়েছে স্যার-ডাক্তার! ডাক্তার ডাকুন শিগগির!' সুপারিন্টেন্ডেন্টবাবু ছুটে গিয়ে তার 'স্মেলিং সল্ট'টা এনে শম্ভুর নাকের ডগায় ধরতেই শম্ভু নাক সিঁটকিয়ে এ্যাঁ এ্যাঁ করে উঠে বসল-তখন তার কাঁপুনি দেখে কে।

আমরা কেউ আর হাসি চাপতে পারলাম না, প্রাণ খুলে হো-হো করে হেসে উঠলাম। মুখটা হাঁড়ির মতো করে শম্ভু উঠে টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। দোলের দিনে হোলির বাজার যা অবস্থা হয় বেচারি শম্ভুর ঠিক তেমনি অবস্থা দেখে সুপারিন্টেন্ডেন্টবাবুও না হেসে থাকতে পারলেন না।

ঘিয়ের বোতল পড়ে মরুকগে ছাই-কিন্তু সেই যে শম্ভু আমাদের সঙ্গে কথা বন্ধ করল আর কোনো দিনই কথা কইল না। কইবেই-বা কোন মুখে?

এখনও শম্ভুর কথাটা মনে পড়লে আর হাসি চাপতে পারি না।

*ফাল্গুন ১৩৩৮*




## দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

### ১

দেশের ছোটো ছোটো আলোর দল।

তোমাদের উজ্জ্বল মনটি নিত্য নূতন দেশের যাত্রী। আর সে দেশ হচ্ছে-আলোর দেশ। আমি জানতে পেরেছি, তোমরা চাচ্ছ, 'আরও আলো।' 'আরও আলো।' 'আরও আলো।'

সেই জন্যে, আজ তোমাদের এক খুব অপরূপ রাজ্যে এসেছি নিয়ে যেতে!

দেখতে পাচ্ছি, তোমরাও এসেছ একেবারেই সেজেগুজে, ভারি উৎসাহে। সেই দেশে যেতে হবে বলে। তা তো হবেই।

জানোই তো, তেমন স্বপ্নের রাজ্য কেউ কখনো দেখেনি, আবার তেমন সত্যের রাজ্যেও কেউ যায়নি কখনো! তা ছাড়া, কে যে সেই রাজ্যের মহারাজ, কেউ তা জানে না; কিন্তু সবাই জানে, সে রাজ্যের এক আছেন ম-স্ত রাজা, যাঁর চাইতে বড়ো রাজা আর হতে পারে না। আর, সে রাজ্যে এক আছেন রানি, যাঁর চাইতে বড়ো রানিও কখনো হয়নি।

আর মজা এই যে, সত্য সত্য হয়তো সে দেশও নেই, রাজাও নেই, রানিও নেই।

কেমন! বলো তো, বড়োই সে মজার রাজ্য, নয়? তার চেয়েও মজা এই যে, নেই কিছুই, তবু আবার, যত কিছু ওর সব, সবই আছে।

সত্যি, এর চাইতে অপূর্ব রাজ্যের কথা কেউ কখনো শোনেওনি, আর এমন রাজ্যও আর কোথাও নেই।

বলতে পার কেউ, সে দেশটা কোথায়? কেউ পারলে? সবখানে আছে সে দেশ, কিন্তু নেই কোথাও-ই!

পারলে না? সে দেশটা হচ্ছে-শূন্য।

আর সেই রাজা? বললে কে, দেখি? হাঁ, হাঁ, রাজা হলেন-সৃষ্টি।

আর রানি? কে বলতে পার? পারছ না কেউ? তবে, এবারে সে নামটি আমায়ই বলতে হবে? রানি হলেন-পরমোজ্জ্বলা, অপরূপসুন্দরী, মহিমময়ী বিদ্যুৎ।

দেখতে পেলে তো? সবাই এঁরা রয়েছেন। কিন্তু, সবই এঁদের মিছে। তবু আবার, খাঁটি সত্যি সবই এঁরাই!

তার পরীক্ষে দেখবে? আচ্ছা, 'শূন্য' বলতে কী বোঝা যায়? 'শূন্য' বলতে সত্যি সত্যি দেখা যায়, সেখানে কিছুই থাকে না। কিন্তু, তবু সবাই জান যে, 'শূন্য' বলে একটা কিছু

আছে।

আর, সৃষ্টি মানে কাজ। তোমরা যদি কোনো কাজ কর তবেই তো কোনো একটা জিনিস গড়া হয়? নইলে কিছুই গড়া হয় না। কিন্তু কাজটা সত্যি সত্যি কিছুই নয়, শুধু একটু নড়াচড়া; হাতটা নেড়ে বাঁটালি ধরি, বাঁটালি নেড়ে কাঠটা কাটি, কাঠটা নেড়ে একটু ঘুরিয়ে দিই, আবার কাটি, এইরকম করে কাঠের একটা জিনিস তৈরি হয়ে যায়। তাহলেই, কাজ যদিও কিছু নয়, তবুও কাজ থেকেই সব জিনিস হচ্ছে!

নদীর জলে যেমন ঢেউ, আর সেই চলন্ত উঁচু-নীচু ঢেউ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তেমনি শূন্যের ঢেউ (-স্পন্দন-মানে কাঁপন) থেকেই প্রথম সৃষ্টি, অর্থাৎ যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ সবার শুরু। এই শূন্যের ঢেউ থেকেই, ক্রমে ক্রমে, যে দিকে যা কিছু সবাই দেখতে পাচ্ছি, এ সবই হয়েছে!

আর তারপর, যা কিছু দশদিকে দেখছ তোমরা, সব রয়েছে একটি জিনিসের ভিতর। আসল কথা এই যে, সেটিকে জিনিস বললেও ভুল হবে-রয়েছে শুধু একটা টানের ভিতর। সব জিনিসের সব কিছুকে রেখেছে সে-ই টেনে ধরে; সেই টানটুকু আছে বলেই, দশদিকের যা কিছু-যা কিছুই দেখছ, সব রয়েছে। কে সেই টানটুকু? ওই বিদ্যুৎ তারই নাম! বিদ্যুৎ যদি না থাকে, অর্থাৎ ওই টানটুকু যদি না থাকে, তো, কোনো জিনিসের চিহ্নও, একটুকুও, এক সেকেন্ডও থাকবে না।

কী ভয়ানক কথা।

যা কিছু দেখা যায় সব জিনিসের খু-ব ছোটো ছোটো কণা, যা চোখে দেখা যায় না এমন সব অণু কণা, আর যা দূরবিনের মতো-খুব ছোটো জিনিস দেখবার অণুবীণ- দিয়েও দেখা যায় না-এমন সব অতি ছোটো কণা, সব শুধু বিদ্যুতের টানে একসঙ্গে হয়ে আছে বলেই সব জিনিসের আকারটি হচ্ছে, আর সব জিনিস টিকে রয়েছে, আর আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি। তা নইলে সব জিনিস টুকরো টুকরো হয়ে, তারপর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে, তারপর কত কোটি কণা হয়ে যে ছড়িয়ে যেত, তার কোনো কিছুরই আর কোনোই খোঁজ পাওয়া যেত না।

কিন্তু যদি ভালো করে দেখতে যাও, তো, দেখতে পাবে যে, সত্যি সত্যি বিদ্যুৎটা কিন্তু কিছুই নয়, শুধু ধরে রাখার একটা শক্তি!

অসীম শক্তিময়ী এই বিদ্যুতের শক্তিতে সমস্ত শূন্য দেশটা ছেয়ে রয়েছে।

দেখতে পেলে এখন? সবই কিন্তু মিছে। আবার সবই সত্যি। একটা অবাক করা ব্যাপার- না? যেন সব স্বপ্ন! আবার, সেই স্বপ্নই-সব চেয়ে সত্যি!

কী আশ্চর্য!

কিন্তু ওইখানেই অবাক হওয়ার ব্যাপারটা শেষ হয়নি। হবে কী করে? এর কবে যে আরম্ভ, আর কবেই যে এর শেষ, কেউ তা পারেনি কখনোই জানতে! কী করেই বা জানবে? মিছেমিছি সেই যে রাজ্যটা, সেই যে ‘শূন্য’ দেশটা-সে যে কতই প্রকাণ্ড-কত যে অনন্ত কোটি কোটি তেপান্তরের ক-ত কোটি কোটি পারাপার জুড়ে যে তার সীমানা-তার কোনো কিছুরই, কোনোই ঠিকানা নেই।

মনে মনে একবার বুঝে দেখো এখন, সেই দেশটা তাহলে কী ধরনের। মনেও ভেবে উঠা যায় না।

ভাবতে না পার, কিন্তু মজা হল।

খুব প্রকাণ্ড একখানা কাগজ-মানে, যত বড়ো কাগজ কলে তৈরি হতে পারে, তার একখানা নিয়ে তোমরা সবাই মিলে, সারা দিন রাত জেগে, একের পিঠে য-ত শূন্য বসাতে পার, তত শূন্য বসিয়ে যাও। তাহলে, যে অঙ্কটা হল, দেখে রাখো। ঠি-ক তত বছর আগে, সেই রাজা 'সৃষ্টি' আর রানি 'বিদ্যুতের' পুরী আনন্দে ভরে দিয়ে-

হল কী?

না-

হল পরম সুন্দর তাঁদের চারটি রাজপুত্তুর, আর এক রাজকন্যে। ওই বিশাল রাজ্যে এই রাজকন্যে আর রাজপুত্তুরদের জন্মে কীরকম শাঁখ যে বেজে উঠেছিল, কে তা ভাবতে পারে?

যা-ই তা হোক, ছেলেপুলেরা জন্মেই উঠে কেঁদে; জন্মেই, পাঁচজনের কেউ কিন্তু কাঁদলেন না। সেই রাজকন্যে-রাজপুত্তুরেরা সবাই লাগলেন হাসতে! সে হাসিতে রাজা-রানির পুরী, একেবারে সকল দিক ভরে গেল! চারদিকে ভারি সে আনন্দ! আর সেই আনন্দে, তখনই চার রাজপুত্তুরের চারটি চমৎকার অতুলন নাম দেওয়া হল।

চার রাজপুত্তুরের বড়ো, নাম তাঁর ব্যোমকুমার-খোকা! তুমি যাকে বলছ আকাশ।

মেজো রাজপুত্তুর-মরুৎকুমার-খুকু! তুমি যাকে বলছ বাতাস।

সেজো রাজপুত্তুর হলেন-তেজকুমার-যাকে তোমরা বললে আলো আর আগুন।

ছোটো রাজপুত্তুরের নাম অপকুমার-এই যে তোমরা এখনই যাকে বললে-জল।

আর সবার ছোটো বোন, রাজার রাজকন্যের কী হল নামটি? সুন্দর সে নামটি কী? নাম তার-ক্ষিতি। ক্ষিতি, ক্ষিতি, কি না, তোমরা সবাই জান-মাটি; যা দিয়ে আজ পৃথিবীর সব জিনিস গড়ে উঠছে।

প্রথম দিনে কিন্তু ছিল না এরকম। রাজপুত্তুর রাজকন্যেরা জন্মিলেন বটে, কিন্তু কারও হাত দেখা যায় না, পা দেখা যায় না, মুখ দেখা যায় না, শরীরও দেখা যায় না!

কী অদ্ভুত! সব অদেখা-অদৃশ্য-ধোঁয়ার আকার!

রানি বলেন, 'ওমা, কী হবে!' রাজা বলেন, 'তাই তো, কী হবে।' রাজা-রানির মুখ গম্ভীর হয়ে রইল। অমন যে অ-সীম রাজপুরী, সেই রাজপুরীতে হয়তো তখন কান্নার হাট-ই বসে গেল।

ভাবছ, একদিন দু-দিন রাজা-রানি ওইরকম হয়ে রইলেন, আর রাজপুরী ওইরকম হয়েই চলল? এইরকমে কত কত কোটি কোটি বছর যে গেল, কে তার কোনোই খবর রাখে?

কী করে রাখবে? কেননা, তখন না ছিল আলো, না ছিল অন্ধকার।

বাঃ! আলোও নয়, আঁধারও নয়, কীরকম ছিল তাহলে? সে যে কীরকমটা ছিল, তা বুঝতেই পারা যায় না। কিন্তু, ছিল তাইই! কীরকম যে ছিল, কে সে কথা এসে বলবে? কে-ই বা তখন ছিল? রানি যে বিদ্যুৎ, তাঁরও নিজের তখন আলো ছিল না! দিন আর রাত যে, তা-ও ছিল না।

তবু সে মজার দেশে, ওই ভাবে যায় দিন। সবাই ভাবেন শুধু; আর কী করবেন?

## ২

যায় দিন।

হঠাৎ একদিন, বড়ো রাজপুত্তুর ব্যোমকুমার, সেই অদেখা ধোঁয়ার ভিতর থেকে জেগে, কোনো এক সুন্দর মুহূর্তে মাথা জাগিয়ে তুলে বললেন, 'বাবা! মা! এই যে আমি! আমি এই যে!'

শুনতে পেয়ে রাজা-রানি এগিয়ে এলেন, আনন্দে, মহা উৎসুক হয়ে! এসে হবে কী? রাজা-রানি ছেলের ডাক শুনতে পাচ্ছেন বটে, কিন্তু কিছুই তো দেখতে পাচ্ছেন না ভালো করে। কোথাও আলোও নেই, অন্ধকারও নেই!

ভারি মুশকিল!

ব্যোমকুমার মা-বাপকে দেখতে না পেয়ে-ছেলেমানুষ হলে কী হবে, বেজায় বীর তো! তাঁদের ডাকতে ডাকতে, খুঁজতে খুঁজতে ভীষণ শব্দ করে-হাত, পা, শরীর, ছড়িয়ে সেই বিশাল মহাশূন্য দেশ ভরে-বড়ো হয়ে হয়ে চলল। থামল না আর, চলল, চলল, চললই!

তাই তো সেই আগেকার মহাশূন্য দেশখানি, এই যে এখন দেখছ আকাশ, এই আকাশে ছেয়ে গেল!

শূন্যের জায়গায়, ব্যোমকুমারের বিরাট শরীরের সুন্দর শোভাখানি হেসে উঠল! আর তার ডাকবার শব্দও ছড়িয়ে গেল যত দিকেই!

চলল সেই শব্দ হয়তো কোটি কোটি দিন! তখনকার এক দিন ছিল কত কোটি বছর, কে জানে তা? সেইরকম দিনের কত কোটি দিন তেমনি করেই চলতে থাকল।

কিছুদিন যাচ্ছে। তারপর, একদিন অকস্মাৎ, মেজো ভাই মরুৎকুমার সেই অদেখা ধোঁয়া থেকে মাথা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাদা! আমি তো জেগেছি, কিন্তু বাবা, মা, কোথায়? তুমি কোথায়? দেখতে পাচ্ছিনে কিছু যে?'

রাজা-রানি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, 'এই যে! এই যে!' বড়ো ভাই আকাশ উঁচু থেকে অমনি উবু হয়ে বলল, 'এই যে!'

কিন্তু তাঁরা সাড়া দিলে কী হবে? কিছুই দেখা যায় না!

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে মরুৎকুমার নিশ্বাস ছাড়তে লাগলেন। শেষে, কী আর করবেন! মরুৎকুমার, আস্তে আস্তে শরীর তাঁর বাড়াতে লাগলেন, সবকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলতে লাগলেন, আন্দাজে, এগিয়ে এগিয়ে, ক্রমে বড়ো হতে হতে-যেন হাতড়ে হাতড়ে বুঝতে লাগলেন- কোথায় মা-বাবা, আর কোথায় দাদা, আর পুরীর বা কোথায় শেষ!

এইরকম করে-স্পর্শ দিয়ে জানিয়ে জানিয়ে-ছুঁয়ে ছুঁয়ে-সারা আকাশ ভরে ক্রমে বাতাস ছাড়িয়ে গেল।

## ৩

তারপর যাচ্ছে আরও কতক দিন। তার অর্থ এই যে, যাচ্ছে আরও কত কোটি বছর। সেই না-আলো-না-অন্ধকারের দেশ।

যেতে যেতে একদিন উঠলেন মাথা সোজা করে, সেজো ভাই তেজকুমার-এমন বেগে, যে যেখানে যত দিক ছিল হঠাৎ সমস্ত দিক যেন চমকিয়ে দিয়ে।

সমস্ত দিক ভরে 'একী!' 'একী!' 'একী!' করে একেবারে দশটি দিকই শিউরে উঠল! 'কে এল!' 'কে এল!' সোর উঠতেই, এদিকে স্পষ্ট 'আমি!' 'আমি!' বলে তেজকুমার বুক টান করে দাঁড়িয়েছেন, আর তার সাথে সমস্ত দিক যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠেছে।

সে কী উজ্জ্বল, আর কী চমৎকার!

আগে তো কিছুই দেখা যেত না; না? আজ একেবারে দশদিকে যা কিছু সব-চোখের সামনে আশ্চর্যরকমে ঠিকঠাক আর জ্বলজীয়ন্ত ভাবে দেখা যেতে লাগল দেখে, সেই দিনটিতে তখন, সবার-সে খুশির কি সীমা আছে?

মহাকাশ রাজ্যে হুলস্থুল পড়ে গেল!

কী করলেন রাজা-রানি? পুলকে আকুল হয়ে, অবাক হয়ে রাজা-রানি চেয়ে রইলেন; বড়ো ভাই আকাশ-যত বড়ো চোখ মেলতে পারে তত বড়ো চোখ মেলে আনন্দে চেয়ে রইল, বাতাস একদম নেচে, কুঁদে ছুটোছুটি করে পুরী মাতিয়ে তুলল, আর শুধু বলতে লাগল, 'কী সুন্দর! কী সুন্দর! কী সুন্দর!'

আর এত কাল যে দেখা যায়নি সেই-যে-দুঃখুটা, সেটা ছিল কিনা একটা দুষ্ট দানব, যেমন সেটা এতদিন সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিল, তেমনি আজ, সেই দানবটা, অন্ধকারের মূর্তি ধরে, ভয়ে বিকট হা করে-কোথায় যে নিজে লুকোবে, মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে সেই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

কী মজাটাই হল!

তেজকুমার কী করলেন? সোনার হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে তেজকুমার, বাবা, মা আর ভাইদের গলা জড়িয়ে ধরলেন-সেই জ্বলজ্বল কাঁচা সোনার রঙের চাইতেও সুন্দর হাতে! রাজা, রানি বড়ো দুই রাজপুত্তুর আকাশ আর বাতাস-মনে করতে লাগলেন, আজ যেন সত্যি সব কী সার্থক হল! সবই যেন আজ সত্যি সত্যি হল! মনে হল, বলে উঠলেন সবাই, 'কী আজ অপার আনন্দের দিন!'

আর ওদিকে, যা কিছু দেখা যাচ্ছিল, সমস্ত আপনারই মোহন অতুল রূপে ঝলমল উজল করে দিয়ে-যেন সবার বুকের আনন্দের ফুলটি তাদেরই চোখের বাগানে ফুটিয়ে দিয়ে- তেজকুমার, খলখল করে শুধু হাসতে লাগলেন।

যত কিছু যেখানে ছিল, আর যত সব দিক, সব সেই হাসিতে অপলক হয়ে অপূর্ব উজ্জ্বল হাসিতে মণ্ডিত হয়ে জ্বলতে লাগল।

রাজপুত্তুর তেজকুমারের সেই অকূল অফুরণ সোনার হাসিতে, এইরকমে স-ব আলোতে আলোময় হয়ে গেল।

এই হতে হতে, হঠাৎ কেটে গেছে কোটি বছর!

কেটে যাক না; তাতে কী? সব যখন এমনই আলোময় হয়ে গেল, তাই দেখে তখন, আনন্দে রাজা-রানির চোখ, গলে আসে আসে হল-দশদিকের সব দেখে!

বটে তো! কিন্তু মুশকিল আবার! কী হবে তা এলে? চোখে তো আর জল নেই! যে টপ টপ করে পড়বে?

সত্যি, এটা বড়ো দুঃখু কিন্তু! যেমন দুঃখে, তেমনি খুশির সময়েও, চোখের জল না পড়লে কি আসল খুশি হওয়া যায়?

তোমরা কী বল?

তাই তখন সব রাজপুত্তুরের ছোটো, কিনা-চতুর্থ রাজপুত্তুর, অপকুমার ধীরে জেগে উঠে, টলটলে চোখে চেয়ে বললেন, 'বাবা, এই যে আমি! মা, এই যে আমি! এই যে এসেছি।' বলেই অপকুমার ধোঁয়াগুলো ডিঙিয়ে, ছুটে রাজা-রানির চোখেমুখে চুমো এঁকে দিয়ে তাঁদের বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভাইদের চোখে-মুখে চুমো এঁকে দিয়ে তাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ব্যোমকুমার মরুৎকুমার তেজকুমারের চোখে আনন্দের জল এল, আনন্দে জলের বিন্দু দেখা দিল। রাজা-রানির চোখে আনন্দজল ঝরতে লাগল। যত দিক সব গেল যেন কী চমৎকার ঠান্ডা আর স্নিগ্ধ হয়ে!

এতদিন সব কিনা ছিল শুকনো। আকাশ শুকনো, বাতাস শুকনো, আলো বিষম শুকনো- অপকুমারকে পেয়ে আজ সবার মনে ভারি স্ফূর্তি।

শুধুই স্ফূর্তি? সবার মুখে হাসি হয়ে উঠল ঢল ঢল সরস, আর সুখে সবার চোখ ছল ছল!

এমনি করে-দশদিক ভরে অতুল স্নেহ ভালোবাসা জাগিয়ে দিয়ে, এখন যাকে বলছ জল-এই জলের হল জন্ম।

## ৪

হল তো এ সব। কিন্তু তার পরে?

এক যে কথা, এখনও বাকি।

তার জন্যে হাজার হাজার বছর ধরে আকাশ চেয়ে আছেন যত দূর দৃষ্টি যায় ততদূর চেয়ে, হাজার হাজার বছর ধরে বাতাস হু-হু করে খুঁজে খুঁজে ছুটে চলেছেন, আরও হাজার হাজার বছর ধরে, এখনও না দেখতে পেয়ে, আলোর আগুন চোখ গরগর রাগে জ্বলছে শূন্য জুড়ে, আর হাজার হাজার বছর ধরে কান্নাভরা ডাগর চোখ নিয়ে ভাই জল চেয়ে রয়েছেন- কই কোথা তাদের আদরের ছোটো বোনটি, কোথায় মণির পুতুল রাজকন্যে, কেন এখনও জাগছেন না? জাগছেন না?

যুগের পর যুগ রাজা-রানি ব্যাকুল হয়ে, ব্যগ্র হয়ে চেয়ে রয়েছেন-কেন জাগছে না বুকের মণি রাজকন্যে, তাঁদের সব চেয়ে আদরের ক্ষিতি, জাগছে না কেন? কেন এখনও জাগল না?

ওগো আমার আলোর মানিক দল। শুনেছ? শোনো! শোনো! রাজকন্যে এখনও যে স্বপ্নে ঘুমিয়ে। ঘুম যে ভাঙেনি এখনও।

শুনতে পাচ্ছি আমি, তোমরা জিজ্ঞেস করছ, 'কবে স্বপ্ন পোহাবে, কবে রাজকন্যের ঘুম ভাঙবে?'

চু...প। চু...প।...

এখনও ভোরের হাওয়া বয়নি! আস্তে!

ভোরের হাওয়া বইবে, আলো পা টিপে টিপে এসে ধীরে ধীরে গান গেয়ে গেয়ে ডাকবে-লক্ষ্মী বোন, জাগো! পারুল বোন জাগো! জাগো! মণি বোন জাগো! তবে তো রাজকন্যে জাগবেন?

লাখ লাখ বছর ধরে এমনি করে আলো এসে ডাকতে ডাকতে ডাকতে ডাকতে ডাকতে ডাকতে, হঠাৎ একদিন ঈষৎ একটুখানি গা মোড়ামোড়ি দিয়ে রাজকন্যে তাঁর পদ্ম-আঁখি

মেললেন!

আঃ ! বলে কি শেষ করা যায়? সে দিন দশদিকে কী যে সাড়াই পড়ে গেল! রাজা-রানি তো আনন্দে সিংহাসন ছেড়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন। আকাশ বাতাস আলো জল চার ভাইয়ের চটাপট হাততালিতে আর জয়গানের সুরে যত দিক, সব ডুবে গেল। আকাশ তো ছিলেন ওই একরকম, তাঁর না ছিল হাড় না ছিল মাংস, তিনি অমনি একধরনের ছিলেন; বাতাস, আলো, জল, এঁদের গায়ে মাংস ছিল তো হাড় ছিল না, তাঁরা ছিলেন আর এক ধরনের-

আর রাজকন্যের? রাজা, রানি, ভাইয়েরা সব দেখলেন, কালো পাথরে রাজকন্যের এলোকেশ মেঘবরন চুল, লাল পাথরে সাদা পাথরে কচি কোমল হাড়ে, সোনায় রুপোয় হিরে মানিকে রাজকন্যের কুঁচবরন অঙ্গ-বাষ্পের দুধবরন শাড়ি পরা, জরির তাতে পাড়- সোনার ফুলের পাপড়ির উপরে পরমা সুন্দরী রাজকন্যে শুয়ে আছেন, টুল টুল করে চেয়ে। গায়ে পায়ে তাঁর অলংকারের জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে!



আর? এতদিন কোনো কিছুরই ছিল না তো কোনো গন্ধ! আজ লাখো হাজার ফুলের সৌরভের মতো, রাজকন্যের গায়ের স্বর্গের মধুর সুবাসে-গন্ধে-দিক সব ময় হয়ে গেল। সেই সুবাসে, যেখানে যে ছিল, সবাই গেল মুগ্ধ হয়ে।

রাজা-রানি হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি করে তুলে নিলেন প্রাণ-মণি রাজকন্যেকে কোলে। আহা! তাদের বুক যেন আজ কত দিনের চাওয়া চন্দনে শী-ত-ল হল।

আজ এতকাল পরে, এতদিনে তাঁরা তাঁদের বুকের সত্যি সত্যি মানিকটিকে পেলেন। যার জন্যে জেগে ছিলেন কোটি কোটি কোটি কোটি নিযুত কোটি বছর!

মনের আনন্দে রাজা-রানি তাকে কোলে নিয়ে দোলাতে লাগলেন; নাচাতে লাগলেন; আকাশ এসে বোনটিকে চুমো খেলেন, বাতাস এসে চুমো খেলেন, আর মণি বোনের গায়ের সুগন্ধ মেখে সারা রাজ্য ছুটোছুটি করতে লাগলেন, খুশিতে মেতে! আলো তো সেই ভোর থেকেই কত আদর করছেন তার কি সীমে আছে? জল ছুটে এসে চুমো খেলেন আর বোনটির সারা গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন; আর তখন খুশিতে রাজা-রানির মুকুটের চুড়ো দুলতে লাগল!

এগিয়ে আলো বলল, 'বাবা! আমি তো বোনটিকে জাগিয়েছি, আজ আমি সারাদিন বোনটিকে কোলে নিয়ে খেলা দেব!'

এগিয়ে আকাশ, বাতাস, জল তারাও বলল, 'বা রে! আর আমরা?'

রাজা রানি বললেন, 'ঝগড়া কোরো না; আচ্ছা, আজকের দিনটি আলোর কোলেই থাক না, সবাই বোনটিকে নিয়ে মিলেমিশে খেলো; তারপর আবার তোমরা কোলে নেবে খন।' এ কথা শুনে সবাই ভারি খুশি হয়ে বলল, 'আচ্ছা! আচ্ছা!'

তারপর আলো তখন গম গম আগুনের আসন পেতে, বোনটিকে কোলে নিয়ে বসল। রাজ্য জুড়ে অতুলন খেলার উৎসবের হাট বসে গেল ভাইদের!

তারা ভোরের বাঁশিতে সুর দিয়ে তখন সবাই মিলে জুড়ে দিল তাদের মজার খেলার গানখানি! চলল সে গান দিন রাত্তির পেরিয়ে কত হাজার হাজার কোটি কোটি বছর ধরে, আর কতই যে হাজার হাজার রকমের সুরে!

খাওয়া-দাওয়া কি আর তাদের মনে আছে? তারা চলল মনের আনন্দে গেয়েই! সেরকম সুন্দর গান কেউ কখনো শোনেনি ত্রিভুবনে!

সুন্দর জাঁকালো সে গান! মহাশূন্য ভরা সে সুন্দর গান!

রাজা খুশি হলেন। রানি তো খুশি হয়ে গিয়েছেন, যারপর নেই। দিকেরা সব মহাখুশি। দেখতে দেখতে সে গানের সুরে সারা শূন্য দেশটা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল!

## ৫

দিকে দেশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে গানের মধুর সুরে।

যেতেই-সেই সুন্দর গানের সুরের মধ্যে, একদিন, চারিটি ভায়ের সেই যুগ যুগের গানের সুর ছাপিয়ে উঠে, রাজকন্যের অমৃত মুখে, কথা ফুটল!

কথা ফুটল রাজকন্যের, কী সে মি...ষ্টি! কী অফুর মধুর সে কথা! রাজকন্যের কথার মধুর সুরে যেন কত দূরের কোটি বাঁশি বেজে উঠল, চারিদিক যেন ভরে গেল মধুতেই।

বলে উঠেছেন রাজকন্যে, 'মা কই? বাবা কই? দাদারা কোথায়? আমি যে খেলব।'

চারিদিকে-'কী?' 'কী?' 'কী?' 'কী?'

রাজকন্যে মধুঢালা কথা বলেছেন, রাজকন্যে কথা বলেছেন, রাজকন্যে খেলতে চেয়েছেন, রাজকন্যে খেলবেন-রাজপুরীতে উৎসবের একেবারে কলরব আর কোলাহল পড়ে গেল!

মহাশূন্যে আবার হুলস্থুল পড়ল! রাজকন্যে খেলবেন, তা কোথাও তো কিচ্ছু নেই তখন! 'কোথায় খেলনা?' 'কোথায় খেলনা?'

রাজা মুকুটের ঝালর ঝাঁকি দিয়ে, তখনই বিশ্বকর্মাকে ডেকে পাঠালেন।

কোথায় কোন শূন্যপুরীর ঘূর্ণিঘরে চিরকালের অ-ঠিকানায় বিশ্বকর্মার আস্তানা, সেইখানে রাজার খবর যেতেই বিশ্বকর্মা একেবারে বিরাট এক লাট্টুর মতো ছুটে এসেছেন ঘুরতে ঘুরতে।

বিশ্বকর্মা আসতে-না-আসতেই রাজা তাঁকে আদেশ করলেন, 'রাজকন্যে খেলবেন, শিগগির তুমি তাঁর খেলনা তৈরি করে দাও।'

বিশ্বকর্মার নাম 'জ্বলচ্চক্র বলয়ংকর ঘুরপাক'। হাজার মহা ঘূর্ণি দিয়ে কোনোরকমে মাথাটা ঠিক করে দাঁড়িয়ে, তিনি তো প্রথমেই থতমত খেয়ে গেলেন।

'তাই তো, রাজকন্যে খেলবেন-কীরকম সে খেলনাটা হবে?'

তোমরা তাঁর ভাব দেখে হাসছ নিশ্চয়ই! বিশ্বকর্মার মতো অত বড়ো ওস্তাদ কারিগর, একটা খেলনা তৈরি করবে, তারই এত ভাবনা!

কিন্তু তিনি সত্যিই ঠাহর করে উঠতে পারছিলেন না।

এ তো আর বাজারের খেলনা নয়, যে, যাহোক করে তৈরি করে দিলেই হল, কি, বেশ দেখেশুনে বেছে একটা কিনে এনে দিলেই হল; খেলবেন রাজকন্যে, হুকুম করেছেন রাজা স্বয়ং, আর তা তৈরি করতে হবে বিশ্বকর্মাকে নিজে; আর সে দিনে বাজারও হয়নি, যে, বাজারের মতন করে কোনো জিনিস তৈরি করা যাবে।

বুঝছ? সে কি যেমন-তেমন খেলনা হবে? সে তেমনি খেলনা!

তাই তো; তাঁকে অনেক ভাবনায় পড়তে হল।

ভেবে, বলয়ংকর বিশ্বকর্মা ঘুরপাক কী করলেন? আবার সেইখানেই এক লক্ষ বার ঘুরে, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

আর তারপর, সেই মহাশূন্যরাজ্য তোলপাড় করে তাঁর যত যন্ত্রপাতি ছিল, যেখানে যা কিছু ছিল, সব নিয়ে-বিশ্বকর্মা জ্বলৎ-চক্র ঘুরপাক বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে শুরু করে দিলেন-দশ দিকে দশ হাজার কোটি আগুনের চুল্লি জ্বালিয়ে নিয়ে, হাজার হাজার কোটি কোটি, অযুত-কোটি কোটি বছর ধরে- রাজকন্যের খেলনা তৈরি করতে!

কীরকম যে সে খেলনাটা হবে, তা কি কেউ এতটুকুও কিছু পাচ্ছ টের?

ওগো কচি আর সুন্দর, আলোর রাজ্যের আনন্দ-মানিক সব! জানতে তোমাদের ভারি ইচ্ছে হচ্ছে? না?

তা কি আর না হয়ে যায়, বলো। কিন্তু সে যে কিরকম আশ্চর্য খেলনা হবে, তা তোমরাও জান না; আর বিশ্বকর্মার মহাশূন্যের ওই প্রকাণ্ড ব্যাপারের হিসেবটাতে একটুকু উঁকি না মেরে-এতদূর থেকে আসল খবর ও পুরীর, পাওয়া যাবে কী করে?

কাজেই, চলো-পার কে কে, আঙুলে গুণতে কর দেখি শুরু-আগে আমরা হিসেব করে দেখি, যে, ক-হাজার কোটি বছর পেরিয়ে এলেন ওইরকম করে ঘুরে বলয়ংকর জ্বলচ্চক্র ঘুরপাক মহাশয়-কতটা দূর-তাহলেই হঠাৎ সেই অদ্ভুত খেলনার খবর জানতে পারবে, এইখানে বসেই!

আর তার সঙ্গে তারপর তোমাদের সভায় হয়তো এ খবরও এসে পৌঁছোবে, যে,-সেই অজানা খেলনা নিয়ে কী অপরূপ খেলা খেলবেন তোমাদের অপরূপ রাজ্যের রাজকন্যে!

*জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৩৯*






## ননীগোপাল মজুমদার

শান্তিরাম পথ দিয়ে যায় আর ভাবে, জগতে কোনো কাজই আর তাকে দিয়ে হল না। এত গরিব সে, যে তার দোরে ভিখারি এলে, একমুঠো চাল তাকে দেবার শক্তি তার নেই। পথের পাশে ছাল-ছাড়ানো নারকোলের মতো শুকনো টিংটিঙে কুকুরগুলি ঘুরে বেড়ায়, কোথাও একটু খাবার পায় না, শান্তিরাম দেখে আর ওদের দুঃখে কাঁদে। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ হয় আজকাল তার এই পথটা দিয়ে যেতে। গাঁয়ের জমিদার মস্ত বড়ো লোক, মেলাই তাঁর টাকা। যেমনি বড়ো জমিদার, তেমনি বিরাট তার দানখয়রাতের ফর্দ। সেই জমিদার এবার অনেক টাকা খরচ করে এক দেবমন্দির তুলছেন; লোকজন, ইট, কাঠ, সুরকি, বালি, শ্বেতপাথরে গাঁ বোঝাই হয়ে গেছে। বিরাট সুন্দর বাড়ি উঠছে।

বাগদির ছেলে সে, তায় গরিব, এই মন্দিরের কাছাকাছি যেতেও তার ভরসা হয় না। কিন্তু ভগবানের কাজ করতে তার এত ইচ্ছা করে! তার বুধি গাই তো গাঁয়ের সবই চেনে, আপন মনে সে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে ঘাস খেতে চলে যায়; শান্তিরাম মস্ত বড়ো একটা বট গাছের ছায়ায় বসে বসে সেই দালান দেখে আর ভাবে-কেমন করে সে সাহায্য করবে দেবতার মন্দির গড়ে তুলতে।

ভিন গাঁ থেকে গাড়ি বোঝাই মাটি আসে রোজ। গোরুগুলি পরিশ্রমে আধমরা হয়ে ধুঁকতে থাকে, শান্তিরাম ভাবে-হায়, এই অবোধ প্রাণীরাও ভগবানের কাজ এত করতে পারে, কিন্তু সে কী করছে! হঠাৎ তার মনে হল-নাই-বা পারল সে ওইসব কারিগরদের মতো মোট বইতে, কাজ করতে; কিন্তু ওই গোরুদের তো আর জাত নেই, সে যদি তাদের রোজ ঘাস খাওয়ায়, তবে ভগবান নিশ্চয়ই খুশি হবেন। গোরুগুলি সুস্থ থাকলে তবে তো তারা ভালো করে কাজ করবে। সেদিন থেকে রোজ তার কাজ হল তাই-সারাদিন ধরে সে ঘাস কেটে জমায়, পরদিন গোরুদের খেতে দেয়। তার চোখের সামনে সাদা মার্বেল পাথরের সুন্দর সুন্দর মন্দির গড়ে ওঠে। সে মনে মনে ভাবে, এর মধ্যে তারও একটু কাজ যেন আছে।

এমনিভাবে, ভিতরের মন্দিরের বেদি তৈরি হল, সামনের সেগুন কাঠের মস্ত মস্ত দরজা হল, উপরে প্রকাণ্ড গম্বুজ হল; দেয়ালে আঁটকানো হল রামায়ণ মহাভারতের গল্পগাথা, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কথা। সামনের মোটা মোটা থামগুলি সুন্দর কারুকার্যে চমৎকার হয়ে উঠল।

শান্তিরাম রোজ দেখে আর ভাবে, এই থাম, এই মন্দির, ওই বেদি, সব যেন তাকে দেখে হাসে; পাখি, গাছপালা, বাতাস সবাই যেন তাকে শোনাবার জন্য গান গায়। ভগবানের কাজ করছে সে! এমনি করে, শান্তিরাম গাছপালায়, মাঠেঘাটে একটা নতুন আনন্দের আমেজ পেয়ে খুশি হয়ে উঠে। জীবন যে তারও আনন্দময় হয়ে ওঠে, সেও যেন

চেষ্টা করলে অনেক কাজ করতে পারে। আজ যে সব তার দিকে-এই গাছপালা, আলো, হাওয়া সব।

একদিন মন্দির গড়া শেষ হল, বেদিতে সোনার কাজ করে লিখে দেওয়া হল জমিদারের নাম-তাঁরই টাকায় গড়া এই মন্দির! চমৎকার একখানা দামি সিল্ক দিয়ে বেদি ঢাকা, উপরের মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি, সুন্দর একটা মখমলে ঢাকা। আজ ঠাকুরমশায় এসে, সেই মখমল খুলে দিয়ে, বেদির কাপড় তুলে নিয়ে মন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করবেন। দেশ-বিদেশে গেল জমিদারের নিমন্ত্রণ। ব্রাহ্মণে পণ্ডিতে সামনের মাঠ ভরে গেল। বিরাট ব্যাপার! শান্তিরাম দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে অছে। দূর থেকে ভগবানের আশীর্বাদ চাওয়া ছাড়া তার আর কী-ই বা করবার আছে!

সময় হয়ে এল। গাঁয়ের সবাই ছুটল মন্দিরে। জমিদার গর্বভরে সবার দিকে চাইলেন-কী বিরাট তাঁর কীর্তি!

পুরোহিত বিগ্রহের কাপড় খুললেন, তারপর তুললেন বেদির কাপড়।

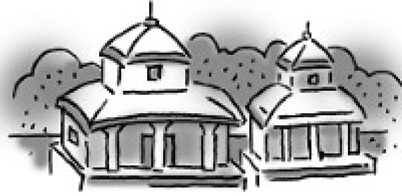
ও কী! সবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখল বেদির উপর লেখা রয়েছে-এই মন্দির তুলেছে বাগদিপাড়ার শান্তিরাম!

পুরোহিত অবাক, জমিদার অবাক, অভ্যাগত সকলে অবাক!

ভগবান উপরে দাঁড়িয়ে হাসলেন-সত্যকারের দান তো হল তারই, যার দান আসে হৃদয় থেকে; অর্থে, দম্ভে-ভরা দান তো ভগবান নেন না।

বুঝল সবাই। পুরোহিত বিগ্রহের মুখে দেখলেন প্রেমের চিহ্ন। বেরিয়ে গিয়ে, শান্তিরামকে বুকে করে নিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন।

*কার্‌তিক ১৩৩৯*






## সুকুমার ঘোষ

আমাদের পাড়াতে এক বুড়ি ছিল-আর তার ছিল অনেক টাকা। রাজ্যের যত চোর তারা বুড়ির টাকা চুরি করবার জন্য না করেছে এমন কিছু নেই। কিন্তু সেয়ানা বুড়ির টাকায় হাত দেয় এমন সাধ্য কারও হয়নি। সে দেশের সব চোরই দু-একবার চেষ্টা করে নাকালের একশেষ হয়ে জেল খেটেছে, অথবা কোনোমতে পালিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

বুড়ি সেকেলে মানুষ, ব্যাঙ্কে টাকা রাখা সে মোটেই পছন্দ করত না। আর তা ছাড়া নিত্য টাকাগুলিকে নেড়ে নেড়ে যে সুখ তা তো আর ব্যাঙ্কে রাখলে হবার জো নেই। তাই সে নিজের শোবার ঘরেই টাকাগুলিকে লুকিয়ে রাখত। কোথায় রাখত কেউ জানত না।

সংসারে বুড়ির এক নাতি ছাড়া আর কেউ ছিল না। নাতিকে সে আদর করত খুবই, কিন্তু পয়সা খরচ করবার বেলা নাতিকে সে একটুও প্রশ্রয় দিত না।

যাক, সুখে দুঃখে এমনি করে তাদের দিন কাটছিল। একে বুড়ি তাতে অনেক টাকার মালিক; কাজেই বুড়ির রাত্রে ঘুম হত না। বয়সের দোষে রাত্রে একটু চোখেও দেখত কম। কিন্তু নাতির কাঁচা চোখের দৃষ্টিতে সে অভাব পুষিয়ে নিত। এমনি করে চোরের আশায় ছাই দিয়ে তাদের দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল।

এমনি সময় সে-দেশে ধাড়িওয়াল থেকে এক দাড়িওয়ালা প্রবীণ চোর এসে হাজির হল-বুড়ির টাকার লোভে। সে-দেশে পৌঁছেই সে ওখানকার সমস্ত চোরদের এক গোপন সভায় নিমন্ত্রণ করল এবং এক-এক করে সবাইয়ের নাকাল হওয়ার কাহিনি শুনে নিল।

পরের দিন বুড়ির বাড়ি এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হল-সর্বাঙ্গে তার বিভূতি মাখা, মাথায় প্রকাণ্ড জটা, হাতে কমণ্ডলু আর মুখে ঘন ঘন রাম নাম।

চতুর বুড়ি বাইরের লোক কাকেও বিশ্বাস করত না-সে সন্ন্যাসীই হউক আর যেই হউক। সন্ন্যাসী বাড়ির ভিতর ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় বুড়ি চেঁচিয়ে বলল, 'বাড়ির ভিতর ঢুকো না ঠাকুর-ওখানেই দাঁড়াও, ভিক্ষে দিয়ে দিচ্ছি।' সন্ন্যাসী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ি নাতিকে বলল, 'চারটি চাল দিয়ে দে তো।' নাতি চাল দিতে গেল। সন্ন্যাসী তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমাদের বাড়িতে বুঝি খুব চোরের উপদ্রব? নেও, একটি মাদুলি তোমাকে দিলাম। হাতে করে রেখো, চোরের ভয় কেটে যাবে।' এই বলে একটি তামার মাদুলি সে নাতিটির হাতে দিল। কথাগুলি বুড়ির কানে যেতেই সে উঠে এসে বলল, 'কী বললে বাবা, চোরের মাদুলি! তা ওতে আমাদের দরকার নেই, ফিরিয়ে নিয়ে যাও।' বুড়ির কথা শুনে সন্ন্যাসী হেসে বলল, 'আমার কথা তোর বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! তবে এই দেখ!' বলেই নাতির হাতের মাদুলিটা এক বার হাতে করে আবার তার হাতে ফিরিয়ে দিল-দেখা গেল তামার মাদুলিটা সোনার হয়ে গেছে। এবার বুড়ির সন্ন্যাসীর উপর কিছু ভক্তি হল। তার নাতি তো ভক্তিতে একেবারে গলে জল। সে

সন্ন্যাসীর সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুলল এবং নিজেদের প্রতিদিনকার সব সুখদুঃখের খবর দিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে তামা থেকে সোনা করবার কায়দাটা জেনে নেবার জন্যে অনেক কাকুতিমিনতি করতে লাগল। সন্ন্যাসী বলল, 'আমি তোকে মন্ত্র দেব, আর সোনা করবার কৌশলটাও শিখিয়ে দেব; কিন্তু আজ নয়, ঠিক এক মাস পর আসব।' এই বলে সন্ন্যাসী ভিক্ষা নিয়ে প্রস্থান করল। কয়দিন কেটে গেল। নাতিটি সন্ন্যাসীর অনেক খোঁজ করেও তাকে আর পেল না।

সাত দিন পরের কথা। শহরে এক সার্কাসের দল এসেছে এবং তারা খেলাও দেখাচ্ছে অতি চমৎকার। শহরের ছেলে বুড়ো সার্কাস দেখতে দলে দলে হাজির। দিনে তিন বার করে খেলা দেখানো হয় কিন্তু প্রত্যেকবারই বসবার জায়গা সব ভরে যায়! এমন সার্কাস কেউ দেখেনি-শহরে একটা হইচই পড়ে গেছে।

বুড়ির নাতি বুড়িকে ধরে পড়ল সার্কাস দেখতে যাবে। চার আনা পয়সা লাগবে, কিন্তু বুড়ির কাছে তো অনেক পয়সা, সে কিছুতেই দেবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর ঠিক হল- চার আনা পয়সা বুড়ি দেবে বটে, কিন্তু নাতিটিকে সার্কাস দেখে সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে। নাতিটি তাতেই রাজি হয়ে তিনটার খেলা দেখতে বেরিয়ে পড়ল।

তিনটার বড়ো বেশি বাকি ছিল না, নাতিটি হনহন করে হেঁটে চলেছে; এমন সময় সার্কাসের তাঁবুর দিকে রাস্তার একটা মোড় ফিরেই দেখে সেই সন্ন্যাসীটি একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে। নাতিটি তাকে দেখেই ভক্তিভরে প্রণাম করে বলল, 'বাবা, আজ আমি সার্কাস দেখতে যাচ্ছি, কাল অবশ্য দয়া করে কি আমাদের বাড়ি একবার যাবেন না?' সন্ন্যাসী রাজি হয়ে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বুড়ির নাতি অনেক ঠেলেঠুলে টিকিট ঘরের কাছে গিয়ে শুনল সব 'সিট' ভরতি হয়ে গেছে, ৬টার খেলা ছাড়া আর উপায় নাই। বুড়ির মেজাজমর্জি তার জানা ছিল; সে ভাবল আজ না দেখে গেলে তার ভাগ্যে আর সার্কাস দেখা হবে না। তাই সে ৬টার খেলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

৬টা বেজে গেল, ৬.৩০টাও বাজল, ক্রমে ৭টা হল-শীতের রাত্রি, চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, অথচ নাতির দেখা নাই। বুড়ি নিতান্ত চঞ্চল হয়ে টাকার হাঁড়িটি আঁচলের তলায় করে বসে রইল, নাতির ফিরবার অপেক্ষায়। খানিকক্ষণ যায়, এমন সময় দরজায় কড়া নড়ে উঠল এবং সঙ্গেসঙ্গে ঠিক নাতির গলার স্বরে ডাক এল, 'ঠাকুরমা দরজা খোলো, ঠাকুরমা দরজা খোলো।' ঠাকুরমা বকতে বকতে উঠে দোর খুলে দিলেন-আর মাথা নীচু করে তার বেঁটে নাতিটি বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। বুড়ি ভালো করে দরজা এঁটে দিয়ে নাতিকে নিয়ে ঘরে এল। কিন্তু যাকে নিয়ে এল সে বুড়ির নাতি মোটেই নয়-রাতকানা বুড়ি গলার স্বর শুনেই তাকে নাতি বলে ভেবেছে। কান-মাথা ঢাকবার ছলে নকল নাতিটি তার লম্বা লম্বা দাড়িগুলিও কাপড় দিয়ে জড়িয়েছে, বুড়ি তা ধরতে পারে নাই। নকল নাতি আসল নাতির গলার স্বর অনুকরণ করে বলল, 'ঠাকুরমা, বড়ো খিদে পেয়েছে, শিগগির ভাত দাও।' বুড়ি এক ধমক দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'পোড়ারমুখো, এত দেরি করে বাড়ি ফিরলি! আমি টাকা আগলাব না ভাত রাঁধব? নে, টাকার হাঁড়িটা নিয়ে সাবধানে বসে থাক, ঘুমিয়ে পড়িস না যেন। আমি দু-টি ভাত ফুটিয়ে আনি।' এই বলে বুড়ি টাকার হাঁড়িটি নকল নাতির হাতে দিয়ে ভাত রাঁধতে রান্নাঘরে চলে গেল।

ঘরে লোহার সিন্ধুক রয়েছে। নকল নাতিটি মনে করেছিল-টাকাপয়সা সব তাতেই থাকে। কিন্তু এমনি করে টাকার হাঁড়িটি হাতে পেয়ে প্রথমত সে আনন্দে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ল। তারপর পা টিপে টিপে বাইরে এসে দেয়াল টপকে গলির ভিতর

নেমে পড়ে চলতে লাগল। সদর দরজা খুলে গেল না, পাছে হুঁশিয়ার বুড়ি টের পায়। এদিকে ঠিক সেই সময় গাছের ছায়ার অন্ধকারে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখল বুড়ির বাড়ি থেকে দেয়াল টপকে একটা কালো দাড়িওয়ালা লোক একটা হাঁড়ি নিয়ে নেমে এল। পুলিশ তার পিছু নিল-তার সন্দেহ রইল না যে দাড়িওয়ালা হাঁড়িওয়ালা নিশ্চয় চোর।

চোর ভাবল, বিধি আজ তার প্রতি সুপ্রসন্ন-আজ এই শুভরাত্রে সুযোগ নিয়ে সে যতগুলি বাড়িতে পারে চুরি করে রাতারাতি বড়োলোক হবে। মনের আনন্দে সে দুই-তিনটা গলি পেরিয়ে গিয়ে আর একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হাঁড়িটা রাস্তার এক পাশে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল।

এদিকে পুলিশ ভায়া গোঁফ মুচড়ে হাতে খইনি টিপছে আর গলির মুখে ওত পেতে বসে আছে-'বমাল' চোর ধরবার আশায়। সেও ভাবছে, আজ রাত্রের চোর ধরার সফলতায় তার বরাত ফিরে যাবে। মুহূর্তে তার মনে কত কথাই না খেলে যেতে লাগল-তার মাইনে বাড়বে, ইনাম পাবে, আরও কত কী!

এদিকে সার্কাস শেষ হয়েছে। বুড়ির নাতি আলোয়ান মুড়ি দিয়ে পথে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ তার কাশি আসায় থুথু ফেলতে গিয়ে দেখে ঝোপের আড়ালে ঠিক তার ঠাকুরমার টাকার হাঁড়ির মতো একটা হাঁড়ি। বুড়িরই তো নাতি! সে আস্তে আস্তে হাঁড়িটি খুলে দেখে, সেটিকে তুলে আলোয়ানের তলায় করে পুলিশের সামনে দিয়েই বাড়ির দিকে চলে গেল। খানিক পরেই বাড়ির ভিতরে একটা শোরগোল উঠল 'চোর'-'চোর'-'চোর', এবং নিমেষ মধ্যে সেই দাড়িওয়ালা চোর রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে এল। কাছেই গলির পাশে আর একটা মুখ-ঢাকা হাঁড়ি পড়ে ছিল, চোর তাড়াতাড়ি সেটাকেই মাথায় করে দে ছুট!

পুলিশ ভায়া তৈরিই ছিল। চোর গলির মোড়ে আসতেই সে তার প্রকাণ্ড শরীরটা দিয়ে গলি আটকে চোরকে সাপটে ধরে ফেলল। তার পর হাঁড়ি সমেত হিড়হিড় করে তাকে টেনে থানায় নিয়ে গেল।

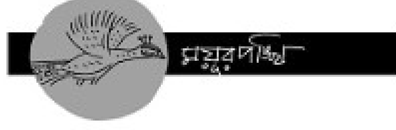
তখনও রাত্রি আটটা হয়নি। থানার ঘরে ইনস্পেকটর সাহেব, দারোগা প্রভৃতি সব কর্মচারীই আছেন। এমন সময় পুলিশ ভায়া 'বমাল' চোর নিয়ে হাজির হল। থানার ডাইরিতে চোর ধরার সব বিবরণ লেখা শেষ করে ইনস্পেকটর, দারোগা প্রভৃতি সবাই এগিয়ে এলেন চোরাই মাল দেখতে। হাঁড়ির ঢাকনা খোলা হল, কিন্তু খুলতেই কী একটা বিকট তীব্র দুর্গন্ধ বের হল হাঁড়ির ভিতর থেকে। ভিতরের জিনিস ঢেলে ফেলা হল। তা থেকে বেরোল-টাকা নয়, পয়সা নয়, সোনা নয়, গয়না নয়, কতকগুলি পুরানো চাল ও একটা প্রকাণ্ড পচা ইঁদুর-গায়ে থুকথুকে পোকাপড়া।

তদন্তের জন্য বুড়ির নাতিকে থানায় ডাকা হল। সে থানায় এসে চোরকে দেখে এক প্রণাম করে বলল, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনি এখানে যে?'

বাকিটুকু আর সবিস্তারে বলে কাজ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, পচা ইঁদুর চুরির জন্য ধাড়িওয়ালের দাড়িওয়ালা চোরের জেল হয়নি বটে, তবে থানা থেকে পেট ভরে কিল গুঁতো লাথি খেয়ে, সে সেদিনই দাড়ি কামিয়ে ধাড়িওয়াল চলে গিয়েছিল-যাবার সময় আমাদের দেশের চোরদের সঙ্গে আর দেখাও করেনি।

*কার্‌তিক ১৩৩৯*






# বন্দে আলী মিয়া

এক দর্জি। তার খুব নাম ডাক, এমনকী বাদশার দরবারেও খুব খাতির। বাদশার যত পোশাক-আশাক সেই তোয়ের করে।

তার এক কামার বন্ধু আছে। সে রাতদিন লোহা পেটে আর কাস্তে কোদাল গড়ায়। দুই জনে খুব ভাব।

একদিন দুইজনে তর্ক লেগেছে। দর্জি বলছে, 'আমি বড়ো।' কামার বলছে, 'আমি বড়ো।' কিছুতেই আর এর মীমাংসা হয় না। খাঁটি বিচার পেতে হলে বাদশার কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাজেই শেষকালে তারা চলল বাদশার কাছে। বাদশা বললেন, 'তোমরা দু-জনেই বলছ, নিজে বড়ো। এর মীমাংসা তো শুধু কথায় হয় না, কাজে দেখাতে হবে। তোমরা কে কী কাজ করতে পারো তার প্রমাণ দেখাতে হবে, তবেই বিচার চলবে।'

দু-জনেই রাজি হয়ে ঘরে ফিরে এল।

উজির-নাজির পাত্র-মিত্র নিয়ে মস্ত সভা করে বাদশা বসেছেন। কামার আর দর্জিও এসেছে। তাদের কাজের পরীক্ষা হবে। কামার একটা লোহার শাল মাছ আর তার ছোটো পোনা তৈরি করে এনেছিল। সেগুলো একটা চৌবাচ্চার মধ্যে ছেড়ে দিল। কী আশ্চর্য! ছেড়ে দিতেই সেই লোহার মাছগুলো চুলবুল করে বেড়াতে লাগল। বাদশা উজির-নাজির সভাসদগণ তো অবাক। সকলে হাজার মুখে তার তারিফ করতে লাগলেন।

তারপর, এবার দর্জির পালা। দর্জি কাপড়ের একটা ময়ূর তৈরি করে এনেছে-এমন সব রংবেরঙের কাপড় যে, নকল ময়ূর বলে ধরতে পারা যায় না। দর্জি তখন ময়ূরকে ছেড়ে দিল। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! ময়ূরটা পেখম মেলে নাচতে লাগল; তারপর গিয়ে ডানার ঝাপটা দিয়ে শাল মাছটাকে ওপরে তুলে খেয়ে ফেলল। আর পোনাগুলোকে তো খুঁজেই পাওয়া গেল না। পাত্র-মিত্র উজির-নাজির সকলে জয়জয়কার দিয়ে উঠল।

বাদশা কিন্তু প্রশংসা করলেন না। বললেন, 'কাপড়ের ময়ূরের প্রাণ হয়েছে, লোহার শাল মাছেরও তো প্রাণ ছিল, সুতরাং দু-জনেই সমান গুণী। এতে দর্জি প্রশংসা পাবার যোগ্য নয়।' সকলে বললেন, 'ঠিক ঠিক।'

দর্জি বলল, 'বাদশা নামদার, আমার ময়ূরের আরও একটা ক্ষমতা আছে-বারো দিনের ছেলে যদি কোথাও পাওয়া যায়, আমায় আনিয়ে দিন, ময়ূর পিঠের ওপরে নিয়ে উড়ে যাবে।'

বাদশার হুকুমে তখনই সিপাই-পাইক ছুটল। খোঁজ খোঁজ সারা রাজ্য তোলপাড় করে ফেলল, কোথাও বারো দিনের শিশু ছেলে পাওয়া গেল না। সিপাই-পাইক এসে সে কথা

বাদশাকে খবর দিল। বাদশা বললেন, 'আমার ঘরে বারো দিনের ছেলে আছে; তাকেই নিয়ে এসো।'

আঁতুড় ঘরে বারো দিনের বাদশাজাদা বেগম সাহেবার কোল আলো করে আছে! সিপাই-পাইকরা এসে বাদশার হুকুম জানিয়ে তাকে নিয়ে গেল। দর্জি হাত পেতে তাকে কোলে নিয়ে ময়ূরের পিঠে শুইয়ে দিল। বাদশাকে বলল, 'শাহানশাহ, গোলামের বেয়াদবি মাফ করবেন। ময়ূর এই শিশুকে নিয়ে উড়ে যাবে-কিন্তু যদি ফিরে না আসে-তাতে আমার কোনো কসুর নেই।'

বাদশা খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, তাই।'

দর্জি তখন ময়ূরকে ইঙ্গিত করতেই ময়ূরটা উড়ে উঠে সাত বার সেখানেই ঘুরল, তারপর প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে কোথায় যে উড়ে চলে গেল তার আর দিশে পাওয়া গেল না।

বাদশা বললেন, 'দর্জির ক্ষমতাই বেশি, সুতরাং সে-ই বড়ো।' নিজের পরাজয়ে কামার বেচারির মুখ কালো হয়ে গেল। দর্জি খুশি মনে বাদশাকে কুর্নিশ জানাল।

## ২

এক মালিনী। তার মালঞ্চ শুকিয়ে গেছে। বারো বৎসর তাতে ফুল ফোটে না-দোয়েল শ্যামা শিস দেয় না। মালঞ্চে কত আগাছা জন্মেছে, কাঁটায় পথ ঢেকেছে। সাপ-শিয়ালের বাসা, বারো বৎসর সেখানে মানুষের পা পড়ে না। বাদশার মহলে মালিনী ফুল জোগাতে পারে না। সুতরাং কষ্টে তার দিন যায়।

সেদিন ভোর হতে-না-হতে হাজার মৌমাছি আর ভ্রমরের গুঞ্জনে তার ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার কী! মালিনী ধড়মড় করে কবাট খুলে বাইরে এসে একেবারে অবাক। রংবেরঙের লাখো ফুলের আভায় মালঞ্চ উজ্জ্বল। তার মুখে হাসি, চোখে হাসি-কী করবে ভেবে পায় না। পড়শিদের ডেকে দেখাতে লাগল। পড়শিরা বলল, 'মালিনী, তোর বরাত ফিরেছে।'

ধুলোয় ভরা মাকড়সার বাসা ফুলের সাজিটা ঝেড়ে মুছে এনে ফুল তুলতে লাগল। এ গাছের একটা ও গাছের দুটো-সাজিটা প্রায় ভরে ভরে, এমনি সময়ে তার নজর পড়ল-এক সোনার চাঁদ শিশু এক ময়ূরের বুকের কাছে শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। এত রূপ যে তার দিকে চাইলে চোখ ধেঁধে যায়। কোনো দেবতা না পরি তার সাথে ছলনা করছে। মালিনী ফুলের সাজিটা একপাশে ফেলে দিয়ে সাততাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ময়ূরটাকে সাথে করে ঘরে এল।

পড়শিরা সুধাল, 'এ ছেলে কার, কোথায় পেলি?' মালিনী মিথ্যা কথা বলল, 'এ আমার বোনপো। সাতকুলে তো কেউ নেই; বোন মারা যাবার সময়ে একে আমায় দিয়ে গেছে।'

মালিনীর আর কোনো কষ্ট নেই। বাদশার মহলে রোজ রোজ ফুল জোগায়। ঘি খায় আর দুধ দিয়ে হাত ধোয়।

বাদশাজাদা মালিনীর আদরযত্নে ষোলো কলার চাঁদের মতন দিন দিন বাড়তে থাকে। মালিনী সোহাগ করে তার নাম রাখল 'রাফান'। ছ-সাত বছর যেতে না যেতে মালিনী তখন রাফানকে লিখতে পড়তে পাঠাল।

৩

রাতের পর দিন, আর দিনের পর রাত, এমনি করে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর। রাফান লেখাপড়া শিখে রূপে গুণে বড়ো হয়ে উঠল।

সেই দেশের বাদশার মেয়ে শাহজাদি তুলাবতী পরম সুন্দরী। মেয়ের বয়স হয়েছে তবু তার বিয়ের কথা বাদশার মনেই নেই। রংমহলের সাত দেউড়ির পর যে মহল-সেই মহলের সাততলায় দাসী-বাঁদি নিয়ে সে থাকে। চাঁদ সূর্য ছাড়া অপর কারও মুখ তার দেখবার উপায় নেই। বাদশার হুকুম-কোনো পুরুষমানুষ সে মহলে গেলে বিনা বিচারে তার শিরচ্ছেদ।

বাদশাজাদি তুলাবতীকে মালিনী ফুল জোগায়। মালিনীর কাছে তুলাবতীর রূপ-গুণের কথা রোজ রোজ রাফান শুনতে পায়। একদিন সে একটা বিনি সূতার মালা গেঁথে মালিনীকে বলল, 'মাসি, এই মালাটা তুমি আজ বাদশাজাদিকে দিয়ে এসো।' মালিনী মালা দেখে মনে মনে খুশি হল, কিন্তু মুখে বলল, 'তুই কি মালা গাঁথতে জানিস? এ কি মালা হয়েছে না কিছু! ও আমি পারব না। শেষে বাদশা অসন্তুষ্ট হোক আর আমার চাকরিটা যাক!'

রাফান বলল, 'না, কিছু বলবে না মাসি, তুমি নিয়ে যাও।' তার পীড়াপীড়িতে মালিনী আর কী করে, অগত্যা অন্যান্য ফুলের সাথে সেই মালাগাছটাও বাদশাজাদিকে দিয়ে এল।

পরদিন আবার মালিনী ফুল নিয়ে যেতেই বাদশার মহলে তার ডাক পড়ল। মালিনী যেতেই বাদশা বললেন, 'মালিনী, বল তো এ মালা কে গেঁথেছে?' বলে রাফানের গাঁথা গতকালকার সেই মালাটা বের করে তাকে দেখালেন।

মালা দেখেই মালিনীর মুখ শুকিয়ে গেল। না জানি কী অপরাধ-কী ত্রুটি বা হয়েছে। সে থতমত খেয়ে ভয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মালিনীর ভয় দেখে বাদশা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'তোর কোনো ভয় নেই মালিনী, আমি কিছু বলব না। তুই আজ তেরো বছর আমাকে ফুল জোগাচ্ছিস, ফুলের মালা গাঁথছিস, কিন্তু এমনি করে বিনি সূতায় মালা গাঁথতে তো তোকে কোনো দিন দেখিনি। এ ক্ষমতা তোর হবে না। বল সত্যি করে, কে গেঁথেছে-আমি তোকে বকশিশ দেব।'

পুরস্কারের লোভে মালিনীর মাথা বিগড়ে গেল। সে শেষ অবধি গোপন করতে পারল না। বলল, 'আমার এক বোনপো আছে, তার নাম রাফান-সেই গেঁথেছে।' বাদশা বললেন, 'তাকে এক দিন নিয়ে এসো, আমি দেখব।'

পরদিন রাফানকে আর ময়ূরকে সাথে করে মালিনী বাদশার দরবারে এসে সেলাম দিল। রাফানের দিকে চেয়ে বাদশা অবাক হয়ে গেলেন। এত সৌন্দর্য মালিনীর বোনপোর কী করে হয় তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। তারপর মালিনীকে বিদায় দিয়ে রাফানকে বাদশা নিজের খাসকামরায় নিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'মালিনী কি তোমার আপন মাসি?'

রাফান বলার আগেই ময়ূর তার জবাব দিল। বলল যে, সে সত্যি সত্যিই মালিনীর বোনপো নয়, পুব দেশের বাদশার ছেলে। সেখান থেকে কপাল দোষে কী করে সে মালিনীর মালঞ্চে এল-সব কাহিনি ময়ূর একে একে বলে গেল।

বাদশা সব কথাই খুব গম্ভীর হয়ে শুনলেন। শুনে খুবই খুশি হলেন। তিনি মালিনীর বাড়িতে রাফানকে আর যেতে দিলেন না, নিজের প্রাসাদেই খুব খাতিরযত্ন করে রেখে

দিলেন। তারপর বাদশা আর বেগম দু-জনে অনেক ভাবলেন-অনেক চিন্তা করলেন। তারপর, খুব ধুমধাম আমোদ-আহ্লাদ করে রাফানের সাথে তুলাবতীর বিয়ে দিলেন।

দিন যায় দিন আসে। বাপ মা-র কথা শুনে অবধি রাফানের মনটা তাঁদের দেখবার জন্য ছটফট করে। একদিন কথাটা সে ময়ূরের কাছে পাড়ল। ময়ূর অমনি রাজি হয়ে গেল। একদিন শ্বশুর আর শাশুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে সে ময়ূর চড়ে দেশে রওনা হল।

## ৪

এত উঁচু দিয়ে ময়ূরটা উড়ে চলেছে যে, মেঘ এসে গায়ে লাগতে লাগল। এইসব দেখছে আর বাদশাজাদি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠছে। কিন্তু তার আবার ভয়ও করছে-কী জানি হঠাৎ যদি ময়ূরের ওপর থেকে নীচের মাটিতেই পড়ে যায়, তাহলে হাড়গোড় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

যেতে যেতে একটা চর। সেই চরের ওপরে এসে ময়ূরটা নামল। সে চরে না আছে লোকজন না আছে কিছু। মানুষজন কেউ কোনোদিন এসেছে কি না তারও কোনো চিহ্ন নেই। যেদিকে তাকানো যায়-শুধু বালি আর বালি, তারপরে সমুদ্দুরের নীল জল চারিদিকে থইথই করছে। সেই চরে তুলাবতীর দু-টি যমজ ছেলে হল।

আহা! ছেলে তো নয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ! তুলাবতী ছেলে দুটোর চাঁদ মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে গেল।

কিন্তু খাবারদাবার তো কিছুই নেই। সেই জনশূন্য চরে কেই-বা দানাপানি দেয়-আর কেই-বা তাঁদের পানে ফিরে তাকায়। রাফান তুলাবতীকে বলেকয়ে বুঝিয়ে ময়ূরে চড়ে গ্রামের দিকে গেল-একটু দুধ-টুধ, একটু খাবার আনতে পারে কি না।

ময়ূর যেখানে এসে নামল, সে গাঁয়ে এক গেরস্থের বাড়িতে সেদিন খুব ভোজ হচ্ছিল।রাফান পাড়াময় ঘুরেফিরে, কোথাও কিছু না পেয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে উঠল। ময়ূরটাকে একটা বট গাছের ওপরে বসিয়ে রেখে গেল। মনে ভাবল, চেয়েচিন্তে কিছু সংগ্রহ করে সেই বট গাছতলায় এসে ময়ূরে চড়ে ফিরে যাবে।

এমন সময়, সেই বট গাছতলার পথ দিয়ে এক তিরন্দাজ শিকারি চলেছে। সে ময়ূরটাকে দেখতে পেয়ে তাকে লক্ষ করে তির ছুড়তে লাগল। তির লাগতেই ময়ূরটা নীচে পড়ে গিয়ে ছটফট করে মরে গেল। শিকারি ময়ূরটাকে আর নিল না, সে তাকে অমনি অবস্থাতেই ফেলে রেখে চলে গেল।

ওদিকে খাবারদাবার নিয়ে এসে রাফান ময়ূরটাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সে বুক চাপড়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। সেই সাতসমুদ্দুরের চরায় সে ফিরবে কী করে! খাবারদাবার সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে পাগলের মতন হয়ে ছুটে চলল। কোথায়-বা তার স্ত্রী, কোথায়-বা ছেলে দুটো, আর কোথায়-বা সে!

এক প্রহর যায়, দুই প্রহর যায়-তুলাবতী স্বামীর পথের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু স্বামী তো আর আসে না। মাথার ওপরে রোদ্দুর আগুন ঢালছে আর ওদিকে খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সে আর কী করবে? অনেকক্ষণ পথ চেয়ে বসে থেকে যখন দেখল যে, স্বামী আর কিছুতেই এল না, তখন সে মহা ফাঁপরে পড়ল। বালুর চরার ওপরে কচি ছেলে দুটোকে শুইয়ে রেখে সে কাপড়চোপড়গুলো নিয়ে সমুদ্দুরের জলে ধুতে গেল, ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে এক দুষ্টু সওদাগর চলেছে বাণিজ্য করতে। তুলাবতীকে দেখে সে

তাকে ধরে জোর করে পানসিতে তুলে নিয়ে নিজের দেশের দিকে চলল। তুলাবতীর কান্নাকাটি কিছুই সে শুনল না।

৫

এদিকে হয়েছে কী-এক গোয়ালার গোরু রোজ সেই চরায় চরতে আসে। ছেলে দু-টিকে দেখে তার কী মনে হল, সে তাদের দুধ খাইয়ে গেল। এমনি করে রোজই দুধ খাইয়ে যায়! তাই গোয়ালে দুধ দোহালে তার আর আগের মতন দুধ হয় না, রোজই দুধ একটু কম হয়। গোয়ালা বেচারি কিছুই ভেবে ঠাহর করতে পারল না। মনে করল, একদিন সে গোরুটার পিছু পিছু গিয়ে দেখবে, কোথায় গোরুটা সারাদিন কী করে।

পরদিন গোরুটা ছেড়ে দিয়ে সে পিছু নিল। গোরুটা নদী সাঁতরে একটা চরে গিয়ে উঠল। গোয়ালাটা নজর করে দেখল-গোরুটা নীচু হয়ে কাকে যেন দুধ খাওয়াচ্ছে। সেও তখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে চরে গিয়ে হাজির হল।

দুটো ছেলে! আহা কী রূপ! যেন আকাশের চাঁদ খসে পড়েছে। গোয়ালার আর চোখের পাতা পড়ে না। সে তাড়াতাড়ি ছেলে দুটোকে বুকে তুলে নিয়ে ঘরে এল। গোয়ালিনি যেন সাত রাজার ধন মানিক কুড়িয়ে পেল। তারা আদর করে শিশু দুটোকে লালনপালন করতে লাগল।

৬

সুখে হোক দুঃখে হোক দিন বসে থাকে না, একরকম করে কেটেই যায়। তুলাবতীর দিনও কোনোরকমে কাটছে। এমনি করে বারো বৎসর গেল। সেই সওদাগর উৎপাত শুরু করে দিল-যেমন করেই হোক-শিগগির তাকে শাদি করা চাই।

একদিন তার আয়োজনও হল। বহু দেশের নবাব-বাদশা আমির-ওমরাহদের নিয়ে এক মস্ত বড়ো সভা বসল।

এ দিকে সেই যে বাদশাজাদা রাফান-সে তো তার ছেলে দুটো আর তুলাবতীকে হারিয়ে একেবারে পাগলের মতন হয়েছে। রাতদিন কেবল তুলাবতীর কথা ভেবে কাঁদে। সেই সভায় পাগলের মতন ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়জামা নিয়ে সেও একটি কোণে এসে চুপটি করে বসেছে। ভেবেছে, কোনো ভোজ-টোজ হবে বোধ হয়।

তুলাবতী অন্দরমহলের জানলা থেকে উঁকি দিয়ে লোক দেখছিল। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠল-এই তো তার স্বামী! সে ধীর ভাবে সভায় এসে হাজির হল। সভায় আমির-ওমরাহদের ডেকে ধীর গলায় বলল, 'আমার একটা নালিশ আছে-আপনারা বিচার করুন।' সকলে বলল, 'কী নালিশ বলুন।'

তুলাবতী বলল, 'আমার স্বামী এখনও বেঁচে আছেন। তিনি থাকতে আমি আরেক জনকে কী করে বিয়ে করি?'

সকলে বলল, 'ঠিক, ঠিক! তা আপনার স্বামী কোথায় আছেন?'

তুলাবতী বলল, 'তিনি এখানেই আছেন।'

সওদাগর এবং অন্য সকলে চমকে উঠল। বলল, 'কোথায়?' তুলাবতী তখন রাফানের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে নমস্কার করল। রাফানও এমন হঠাৎ স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে

আশ্চর্য হয়ে গেল।

সকলে সেই পাগলের মতন লোকটাকে দেখে বলল, ‘এই আপনার স্বামী! কী ব্যাপার?’ যা যা ঘটেছিল তুলাবতী তখন সকল কথা তাদের কাছে বলে গেল। তাদের ছেলে দুটো যে সেই সুমুদ্দুরের চরায় না খেতে পেয়ে মরে গেছে-এই কথা বলে সে কাঁদতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে সভার মাঝখান থেকে দুটো ছেলে এসে তুলাবতী আর রাফানকে প্রণাম করল। মায়ের প্রাণ, তখনই দেখেই তাদের চিনতে পারল। কিন্তু তবু হঠাৎ না জেনে না শুনে কী করে ছেলে বলে মেনে নেয়।

তখন সেই ময়ূরটা প্যাঁক প্যাঁক করে উড়ে সভার মাঝখানে এসে নামল। বলল, ‘আমি মরিনি। তির লেগে কাতর হয়ে পড়েছিলাম, এক দরবেশ আমাকে জিইয়ে দিয়েছে। ... এ দুটো আপনাদের সেই ছেলে, গোয়ালার ঘরে এরা মানুষ হয়েছে।’

তুলাবতী আর রাফান ছেলে দুটোকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সকলে আনন্দে জয়জয়কার দিয়ে উঠল। বাদশা নবাব যাঁরা নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, তাঁরা সেই দুষ্টবুদ্ধি সওদাগরকে বন্দি করে যাবজ্জীবনের জন্যে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

তুলাবতী আর ছেলে দুটোকে নিয়ে শাহজাদা রাফান দেশে রওনা হল।

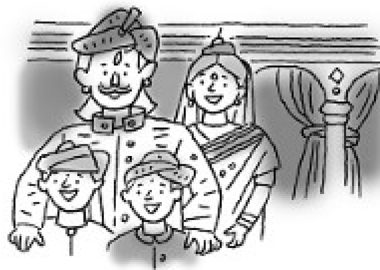
সেই যে বাদশা আর বেগম, তাঁরা তো বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁদের আর ছেলেপুলে হয়নি। একমাত্র সেই বারো দিনের ছেলেকে হারিয়ে অবধি তাঁদের মনে সুখশান্তি নেই।

একদিন ময়ূরতক্তে বসে বাদশা বিচারআচার করছেন, হঠাৎ এমনি সময়ে রাফান, তার স্ত্রী ছেলে দুটো আর ময়ূর-সবাই এসে বাদশাকে সেলাম করল। বাদশা তো চিনতেই পারেন না। ময়ূরের মুখে তাদের পরিচয় পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। মহল থেকে বেগম ছুটে এলেন।

তারপর?-

তারপর আর কী! বছর কয়েক পরে বুড়ো বাদশা আর বেগম দু-জনেই মারা গেলেন। শাহজাদা রাফান তখন বাদশা হয়ে ছেলেপুলে আর তুলাবতীকে নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব করতে লাগল।

*চৈত্র ১৩৩৯*






# সুবিনয় রায়

রসিকরাজ রায়চৌধুরি আমাদের সঙ্গে ইশকুলে পড়ত। ছেলেটার বেশ মাথা; লিখতে-টিখতে পারত মন্দ না। শুনলাম সে নাকি আজকাল সাহসপুরের 'সরস সমাচার'-এর সম্পাদক।

ম্যাট্রিকে ৩-৪ বার ইংরেজিতে ফেল করে সে বাংলা লেখা লিখতে আরম্ভ করে। ক্রমে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সে সম্পাদকি করে কাগজটাকে বেশ দাঁড় করিয়েছে। কাগজের নাম আগে ছিল 'সান্ধ্য সমাচার', ভালো চলত না। রসিক এসে 'সান্ধ্য সমাচার' নাম বদলিয়ে 'সরস সমাচার' করল। প্রথম তো ক-দিন নামের নূতনত্ব দেখেই লোকে কাগজ কিনতে লাগল। তারপর নানা রকমের খবর ক-দিন পাওয়া যেতে লাগল-যেমন, লড়াই, ভূমিকম্প, টাকাচুরি, ডাকাতি, ধূমকেতু, গণকের গণনায় প্রলয়ের ভয়, ঝড়ের আশঙ্কা, ছেলে ধরার উৎপাত ইত্যাদি। সেসব যখন ঠান্ডা হয়ে এল, তখন তার হেডিং লেখার কেরামতিতে ক-দিন আবার কাগজটা খুব চলল। দু-চারটা হেডিং শুনবে?-

(১) 'হনলুলুতে হাস্যকর হদিস',

(২) 'সাহসী শিম্পাঞ্জি-শিকারি',

(৩) 'চলচ্চিত্রে চর্বিতচর্বণ',

(৪) 'লন্ডনে লণ্ডভণ্ড',

(৫) 'কলিকালের কলিকাতা',

(৬) 'ব্যাগ্র ব্যাধের ব্যাঘ্রবধ',

(৭) 'কর্মকর্তার কর্ণ কর্তন',

(৮) 'বাড়বানলের বাড়াবাড়ি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, হেডিং-এর চোটেই কিছুদিন কাগজ বিক্রি হল। অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিক রসিককে খুব উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখলেন। একজন লিখলেন, 'আপনার প্রাক্তনজন্মার্জিত পুণ্যপ্রভাবে অনুপ্রাশ প্রয়োগের প্রচ্ছন্ন প্রতিভা প্রকৃতই প্রদীপ্ত প্রভাবৎ প্রকাশ পাইয়াছে।' এরকম আরও কতজনে লিখলেন!

রসিকের তো আর মাটিতেই পা পড়ে না-অহংকারে বুক ফুলিয়েই আছে। কাগজও বিক্রি হচ্ছে বেশ। আজকাল কাগজে মাঝে মাঝে ছবিও ছাপা হয়।

একদিন রাত্রে রসিক সেদিনের কাগজখানা হাতে করে পড়তে পড়তে হঠাৎ তার চোখে পড়ল 'জব্বলপুরের বর্বরশৈল';-একী? তার স্পষ্ট মনে আছে সে লিখেছে 'মর্মরশৈল'। Marble Rocks-এর এমন সুন্দর ছবিখানার নীচে কিনা শেষটায় 'বর্বরশৈল' ছাপা হল?

রাগে গজগজ করতে করতে সে তখনই দৌড়ে গেল; গিয়ে দেখে কম্পোজিটাররা সকলেই চলে গেছে, শুধু হরিচরণ নামে নতুন একজন অল্পবয়স্ক কম্পোজিটার আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে আমতা-আমতা করে বলল, 'মনে করলাম, শৈলের আবার মর্মর কী? তাই 'ম'-এর জায়গায় 'ব' করে দিলাম।' রসিক রেগে বলল, 'অত বুদ্ধি না-ই বা খাটাতেন। স্পষ্ট দেখছেন 'ম' রয়েছে, 'ব' বসাতে যাবার দরকারটা কী ছিল?' হরিচরণ শুধু মাথা চুলকাতে লাগল, কিছু বলল না।

এর পর একদিন কাগজে বের হল, 'মর্মরের দেশে'। এক ভদ্রলোক অসভ্যদের পাহাড়ে-দেশে প্রাণ হাতে করে কিছুদিন থেকে যেসব খবর সংগ্রহ করে এনেছেন তারই বিষয় তিনি 'বর্বরের দেশে' নাম দিয়ে 'সরস সমাচার'-এ লিখছেন; সেই লেখারই হেডিং ছাপা হয়েছে 'মর্মরের দেশে'। রসিকের আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। সে সকলের সামনে হরিচরণকে ধমক দিলে আর জরিমানা করল।

কম্পোজিটাররা আড়ালে গিয়ে ফিসফিস করে কী যেন সব বলাবলি করতে লাগল। একজন বলল, 'যা-ই বলুন মশায়! রসিকবাবুর লেখারও দোষ আছে।' আরেকজন বলল, 'কিন্তু এটা তো রসিকবাবুর লেখা নয়!' প্রথম লোকটি বলল, 'আগের লেখাটা রসিকবাবুর ছিল; সেটা আমি দেখেছিলাম; আমারও কিন্তু 'বর্বরশৈল' মনে হয়েছিল। এবারের হেডিংটা বোধ হয় রসিকবাবুর লেখা।'

বিপিনবাবু সাহসপুরের নামজাদা উকিল। ভদ্রলোক খুব পরোপকারী, লোকের বিপদে-আপদে অনেক সাহায্য করেন; সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এবার তিনি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হবার চেষ্টা করছেন। তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন আরেক উকিল, নাম তাঁর সত্যসহায় সেনশর্মা। ভদ্রলোকের দেদার টাকা; বেজায় ধড়িবাজ। বিপিনবাবুর বিরুদ্ধে তিনি কাগজে লেখাবার জন্য খুব চেষ্টা করছেন; রসিকের কাছে এক তাড়া নোট নিয়েও একদিন গেছিলেন। রসিক তাকে স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিল, 'এমন ঘেন্নার কাজ আমি করি না।' পরের দিনের কাগজে বের হল 'অসহায় সত্যসহায়'।

এবার সভ্য নির্বাচনের ভোটের দিন কাছাকাছি আসছে। রাস্তার দু-ধারেই শুধু লাল কালিতে ছাপা প×Êকার্ডে ভরতি-'Vote for Bepin Babu, who stands for you'—'আপনাদের প্রতিনিধি বিপিনবাবুকে ভোট দিবেন'; অথবা 'Vote for the right man Satyasahai Babu'-'সত্যের সহায়, সত্যসহায়বাবুকে ভোট দিবেন।'

সত্যসহায়বাবু দু-হাতে টাকা খরচ করছেন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার অসম্ভব রকমের ধুম-লুচি, মাংস, সন্দেশ, পান্তুয়া, রাবড়ির ছড়াছড়ি। কনসার্ট রোজ সন্ধ্যায় কান ঝালাপালা করে। পঁচাত্তর জন ছেলেকে টাকা দিয়ে, মেগাফোন হাতে বের করেছেন। তারা পাড়াময় মেগাফোন দিয়ে কেবলই চেঁচায় 'ভো-ও-ও-ট ফর সত্যসহায় বাবু'; লোকের তিষ্ঠানো দায়।

লোকে কিন্তু তাঁর বাড়িতে বড়ো একটা ঘেঁষে না। সবাই বিপিনবিহারীবাবুরই নাম করে। সবাই বলে, 'বিপিনবাবুর মতো লোক পাবে না।' কিন্তু অনেকে বলে, 'সরস সমাচার কেন বিপিনবাবুর কথা একদিনও লেখে না? সত্যসহায়বাবু কি ওদের কিছু ঘুষ দিয়েছেন? নাঃ! রসিকবাবু তো ঘুষ খাবার ছেলে না' ইত্যাদি।

এসব কথা রসিকের কানে গেল। এতদিন সে এ বিষয়ে কিছু লেখেনি; কারণ সে জানে-সত্যসহায়বাবু যত টাকাই কেন খরচ করুন না, বিপিনবাবুর বিরুদ্ধে ভোটে এঁটে

উঠবার কোনোরকম সম্ভাবনা নাই তাঁর; সবাই বিপিনবাবুকে চায়। তবু, লোকের কথায় রসিক ভাবল, 'একবার বিপিনবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর নিজের মুখে শুনে আসি তিনি কী ভাবে মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করতে চান, তাঁর মনের কথা কথা কী ইত্যাদি।' সেদিনই সন্ধ্যায় বিপিনবাবুর কাছে গিয়ে সে এক ঘণ্টা ধরে তাঁর কথা সব শুনে, রাত্রে বসে এক পৃষ্ঠা লিখে ফেলল। পরের দিন ছাপাখানায় সেটা ছাপতে দিল।

বিকেলে মামার বাড়িতে একটা দরকারি কাজে যেতে হবে বলে রসিক তার ম্যানেজারকে সেদিনের কাগজের সব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে মামার বাড়ি রওয়ানা হয়ে পড়ল। ম্যানেজারকে বলে গেল, 'দেখুন! এই যে লেখাটা দিলাম, এর হেডিংটা আমাদের আজকের কাগজের প্লাকার্ডে দেবেন।'

প্রতিদিনের কাগজের প্রধান খবর যেটি থাকে, সেটি একটা বোর্ডে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে, কাগজ বের হবার একটু আগেই আপিসের সামনে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। সেটিই হল কাগজের 'প্লাকার্ড'।

রসিক সন্ধ্যার পর মামাবাড়ি থেকে ফিরেই সোজা তার অফিসের দিকে গেল। গিয়ে দেখে, আপিসের সামনে লোকে লোকারণ্য! কাগজের জন্য রীতিমতো কাড়াকাড়ি লেগে গেছে। অনেকে যেন বেজায় খেপে রয়েছে।

ব্যাপারখানা কী বুঝতে না পেরে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। সামনেই প×Êাকার্ডে লেখা, 'বিপিনবিহারীর বর্বরতা'-সর্বনাশ! এ আবার কী?

অনেক লোকের মুখের ভাবখানা এমন, যেন রসিকবাবুকে পেলে হয় একবার! ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে রসিক গলির দরজা দিয়ে চুপচাপ অফিসে ঢুকল। সামনেই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা; সে বেচারা তো মুখখানা হাঁড়ি করে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রেসে তখনও কাগজ ছাপা হচ্ছে। রসিক জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপারটা কী? প্ল্যাকার্ডে 'বিপিনবিহারীর বর্বরতা' লেখা কেন?'

ম্যানেজার মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলল, 'আর বলবেন না মশাই! এই হরিচরণটার কাণ্ড! আপনার লেখাটা কম্পোজ করতে করতে সুরেশকে জিজ্ঞাসা করল, 'বর্বকথা' আবার কী?' সুরেশ বলল, 'বর্বকথা বলে কোনো কথা নেই, বর্বরতা হতে পারে।' তারপর দেখি, ছাপায় বেরিয়েছে 'বিপিনবিহারীর বর্বরতা'। আমি খেতে গেছিলাম, ইত্যবসরে কাগজ ছাপা হয়েছে, পরানবাবুও ওই হেডিং দেখে প্ল্যাকার্ডেও লিখে ফেলেছেন, 'বিপিনবিহারীর বর্বরতা'!'

রসিক বলল, 'কতক্ষণ কাগজ বেরিয়েছে?'

ম্যানেজার বলল, 'কাগজ বের হবার আগেই প্লাকার্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সত্যসহায় বাবুর ভাগনে সেটা দেখতে পেয়ে তখনই নগদ পয়সা দিয়ে সব কাগজ কিনে নিয়ে গেছে। তাই আবার কাগজ ছাপতে দিয়েছি। এদিকে, কাগজের জন্য সামনে ভিড় জমে গেছে; লোকেরা খেপেও আছে মনে হচ্ছে।'

রসিক বলল, 'কাগজ তো ছাপতে দিয়েছেন; ভুলটা সংশোধন করিয়েছেন কি?'

ম্যানেজার, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি নিজে কপি দেখে হেডিংটায় 'বর্বরতা'র জায়গায় 'মর্মকথা' করে দিয়েছি।'

রসিক, 'কাগজ ছাপা আরম্ভ হয়েছে কি?'

ম্যানেজার,'এখনই আরম্ভ হবে। আগেকার ১০০ কাগজ ছিল, তাতে হেডিং-এর উপর 'বিপিনবিহারীর মর্মকথা' ছেপে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি; এখন সেগুলোই দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে।'

রসিক তখনই কাগজের শেষ পৃষ্ঠায় বড়ো বড়ো অক্ষরে কী যেন একটা লাইন ছেপে দেবার ব্যবস্থা করে, পরানবাবুকে ডাকতে পাঠাল। পরানবাবু আসতেই তাকে নিয়ে অফিসের সামনে গেল-পরানবাবুর হাতে প্ল্যাকার্ড লেখবার কালি তুলি।

রসিকবাবুকে দেখে দু-চারজন খুব চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ছি! ছি! শেষটায় কিনা ঘুষ খেলেন!'

রসিকবাবু মুচকি হেসে পরানবাবুকে নিয়ে প্ল্যাকার্ডখানার কাছে গেলেন আর হাত নাড়িয়ে কী যেন সব দেখালেন। পরানবাবুও তখনই তুলি দিয়ে কীসব করলেন; তারপর দেখা গেল, প্ল্যাকার্ডে 'বিপিনবিহারীর বর্বরতা'র জায়গায় লেখা রয়েছে 'বিপিন-বিরোধীর বর্বরতা'! অমনি চারিদিকের লোকেরা হো-হো করে হেসে উঠল।

পরানবাবু 'হ' কে দুই টানে 'র' করলেন, বাঁ-দিকে একার বসালেন; তারপর 'র' এর পুঁটুলি তুলে দিয়ে 'ব'-এর মাথায় বাঁ-দিকে শুঁড় বসিয়ে 'র'কে 'ধ' করে দিলেন-বাস!

আধ ঘণ্টা বাদে যখন কাগজ ছাপা বেরিয়ে এল, তখন রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সকলেই দেখল, প্রথমেই 'বিপিনবিহারীর মর্মকথা' নামে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বেরিয়েছে। যারা সত্যসহায়বাবুর সহায়, তাদেরও সেই প্রবন্ধ পড়ে বিপিনবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা হবে। কাগজের শেষ পৃষ্ঠার নীচে বড়ো অক্ষরে ছাপা আছে 'বিপিন-বিরোধীর বর্বরতা' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।' বলা বাহুল্য, সকলেই কাগজ পড়ে খুশি হল-সত্যসহায়বাবুর জন কয়েক সাঙ্গোপাঙ্গ ছাড়া।

ভাগনের কাছ থেকে একখানা 'সরস সমাচার' নিয়ে সত্যসহায়বাবু সেটা খুলেই দেখলেন, 'বিপিনবিহারীর বর্বরতা'! ওঃ কী খুশি সেটা দেখে! এক বার দেখলেন, দু-বার দেখলেন, দশ বার দেখলেন-তবু আশ মেটে না। হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বললেন, 'রসকে ছেলেটা বেশ! শেষ মুহূর্তে বেশ চালটা চেলেছে। বিপিনবাবুর জিতবার আশার গুড়ে বালি!'

একটু বাদে আবার কাগজখানা হাতে নিয়ে বললেন, 'দেখা যাক, রসকেটা লিখেছে কী।' দু-চার লাইন পড়েই কাগজখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'রসকেলটার যত জোচ্চুরি! কী ফাঁকিটা দিয়েই এতগুলো কাগজের নগদ দাম নিল! ওরে! কাগজগুলো আর বিলোস নে- এখনই সব জ্বালিয়ে দে! রাবিশ লিখেছে!'

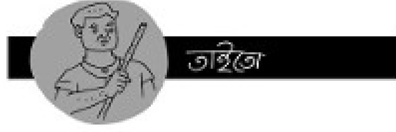
পরদিন মিউনিসিপ্যালিটির ভোটিং হল। ফল :

| | |
|---|---|
| বিপিনবিহারী বসু | ৫,৭৯৫ ভোট |
| সত্যসহায় সেনশর্মা | ৪৯ ভোট |

'সরস সমাচার' সে দিন আবার লিখল-'অসহায় সত্যসহায়'।

*চৈত্র ১৩৩৯*


সবুজ সমাচার




## হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নাথু কিন্তু কোনো কথাই কানে তোলে না; বলে-'তা ভূতই হোক আর দত্যিই হোক, আমি একবার ভালোরকম পরখ না করে ছাড়ছি না।'

মা কত মাথার দিব্যি দিলেন, কত কান্নাকাটি করলেন-'আরে নাথঅ, তুমহে যদি সেঠাকু যাও তাহেলে মু নিশ্চয় মথাকুটি মরিবি।'

নাথু তার মাকে বুঝিয়ে বলল, 'কিচ্ছি ভয় নাহি মা, ভূতঅ মনুষ্যকু কামুড়ি ন পারে; আউ যদি বদমাস লোক হুয়ে তাহেলে-' বলতে বলতে নাথু তার জংলি লতার লাঠিটা বোঁ করে নিজের চার দিকেই একবার ঘুরিয়ে নিল।

নাথুকে কোনোরকমেই আটকানো গেল না। সে সন্ধ্যে পার না হতেই আঠারোনালার খালের উপর ডিঙিটা ভাসিয়ে দিয়ে ওপারের ঘন বনের ধারে ধারে বৈঠা বেয়ে চলল। বনের মাঝে পোড়ো মন্দিরটাই তার লক্ষ্য। কয়েকদিন থেকেই সে শুনে আসছে, ওই ভাঙা মন্দিরটার ভেতর নাকি হঠাৎ হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠে আর নানারকম বিটকেল বিটকেল শব্দ হয়। সবাই বলে ভূত, কিন্তু নাথুর তা বিশ্বাস হয় না। সে ভাবে ব্যাপারটা কী দেখতেই হবে।

নাথুর গায়ে ছিল অসুরের মতো শক্তি আর মনে ছিল দুর্জয় সাহস-উড়িয়াদের মধ্যে এমনটা খুব কমই দেখা যেত। তাহলেও বনের ভেতর ঢুকতেই তার গাটা কেমন ছমছম করে উঠল। কী ভয়ানক অন্ধকার। লাঠিটাকে খুব শক্ত করে ধরে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। সে যখন মন্দিরটার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে, এমনি সময় দুরুস দুরুস করে তার চারদিকে এমনি ভয়ানক আওয়াজ হতে লাগল যে নাথু ভয়ে একেবারে মাটির ওপর টলে পড়ল।

আস্তে আস্তে একটু সাহস সঞ্চয় করে আবার সে উঠে বসল। তার চারদিকটায় তখন বিশ্রী রকমের ধোঁয়ায় ভরে গেছে, কিচ্ছু দেখবার উপায় নাই। ধোঁয়ার গন্ধটা নাকে যেতেই নাথুর মনে হল, এ ধোঁয়াটা যেন তার চেনা চেনা। এই তো সেদিন যখন তার বন্ধু বরজর বিয়েতে সে বোমপটকা ছুড়েছিল সে ধোঁয়াতেও যেন এরকম গন্ধই ছিল। নাথুর কেমন সন্দেহ হতে লাগল, হয়তো কেউ তাকে পটকা ছুড়ে ভয় দেখাচ্ছে।

নাথু আবার তার লাঠিগাছটা খুব শক্ত করে বাগিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলল। মন্দিরের প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েছে কি দেয়নি এমনি সময় মন্দিরের ভিতর একটা ছোটো কুঠুরিতে হঠাৎ এমন ভয়ানক আগুন জ্বলে উঠল যে তার দুটো-চারটা হলকা ছুটে এসে নাথুর বাঁ-হাতটাকে রীতিমতো ঝলসে দিয়ে গেল। নাথু তাড়াতাড়ি দু-পা পিছিয়ে এল।

যেন ভেলকি।

আগুনটা যেমন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল আবার তেমনি হঠাৎ নিভেও গেল। অন্ধকারটা আরও কী ভয়ানক বিশ্রী হয়ে উঠল। নাথুর নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল এমনি জমাট অন্ধকার। ভয়ে তার সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তবু পিছু হঠল না। নানারকমে নিজের মনকে সাহস দিয়ে সে চাঙ্গা করে তুলল। তার চারদিকে রাতজাগা পশুপাখি চিৎকার করে করে পালাতে লাগল। বাদুড়ের ঝটপটানি, ভুতুমপাখির ভুতুম-থুমো নাথুকে খুব বেশি ভয় দেখাতে পারল না বটে কিন্তু ওর পাশেই যখন ঝুপ ঝুপ করে কতগুলো ঢিল পড়তে লাগল তখন নাথু একদিকে যেমন পেল ভয়, আরেক দিকে তেমনি ওর সাহসটাও গেল বেড়ে। সে দুই লাফে চত্বরের ওপর উঠে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

তারপর!

তারপর নাথুর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। লাঠিটা কাঁপতে কাঁপতে তার হাত থেকে মেঝের উপর পড়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গেই হাত-পা অবশ হয়ে নাথুও সেখানে ধপ করে বসে পড়ল। কিন্তু তার চোখ দুটোকে সে কোনোমতেই ফেরাতে পারল না। মোহাবিষ্টের মতো অপলক চোখে সে দেখতে লাগল একটা মস্ত বড়ো মাথা। কেবল একটা মাথা, আর কিছু নয়। তিন-চার হাত বড়ো একটা বিকট বিভৎস মাথা আর মস্ত মস্ত হাঁড়ির মতো জ্বলজ্বলে দুটো চোখ তার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। নাথু চিৎকার করে উঠল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটুখানি চিঁ চিঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না।

নাথু ভাবল-মরেছি তো মরেছি, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। সে ধীরে ধীরে তার লাঠিটাকে তুলেই ধাঁ করে দিল সেই মাথাটার উপর বসিয়ে।

অমনি এক অবাক কাণ্ড! মাথাটা ভুস করে চুপসে গিয়ে গড়াতে গড়াতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছুট ছুট! কিন্তু নাথুর মনে হল কে যেন তাকে দূর থেকে বলছে-'গেলাম গেলাম, রক্ষা করো, আমায় একা ফেলে যেয়ো না-বাঁচাও বাঁচাও!'

নিজে বাঁচলে তবে তো পরের কথা-নাথু একেবার টেনে দৌড়।

মন্দিরের বাইরে পা দিতেই একটা তীব্র চকচকে আলো নাথুর চোখ দুটো একেবারে ধাঁধিয়ে দিল। নাথু ভাবল-না! আজকে আর সত্যি সত্যিই রক্ষে নেই দেখছি। এমনি সময় কে যেন ক্যাঁক করে তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'মিলগিয়া, শালা ডাকুকে পাকড়েছি সাব।'

কিন্তু বাঙালি দারোগা সাহেব টর্চের বাতিতে নাথুকে দেখেই চিনতে পারলেন। তিনি বেশ একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে নাথু, তুই এখানে কেন?'

নাথুও দারোগা সাহেবের গলা শুনে অনেকটা সাহস ফিরে পেল। সে তখন সকল কথাই দারোগা সাহেবের কাছে খুলে বলল।

দারোগা সাহেব তো সব শুনে নাথুর পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, 'সাবাস নাথু, তুই একটা মস্ত কাজ করেছিস। যে ভূতটাকে তুই লাঠি মেরেছিলি সেটা মোটেই ভূত নয়, একটা বিষম দজ্জালে ডাকাত। পনেরো-ষোলো দিন আগে হঠাৎ জেল টপকে পালিয়ে যায়। তারপর খোঁজ খোঁজ, সমস্ত তল্লাটটা ওলট-পালট করেও ওকে পাওয়া যায়নি। আজকে সন্ধ্যার একটু আগে আমাদের গুপ্তচর খবর দিল যে এই ভাঙা মন্দিরটার ভেতর

লুকিয়ে আছে-তাই ধরতে এসেছিলাম। যাক, তুই কাজটা অনেক এগিয়ে রেখেছিস, চল এখন ওকে ধরে নিয়ে আসি।'

নাথু বলল, 'কিন্তু মাথাটা যে হঠাৎ মিলিয়ে গেল; ডাকাত হলে তো ...'

তার কথা শেষ না হতেই দারোগা সাহেব বলে উঠলেন, 'মিলিয়ে যায়নি রে, মিলিয়ে যায়নি। মন্দিরটার ভেতর অনেক কালের পুরোনো একটা শুকনো ভাঙা কুয়ো আছে। ডাকাতটা গড়াতে গড়াতে সেই কুয়োর মধ্যেই পড়ে গেছে বোধ হয়। কুয়োর ভেতর থেকে উঠবার আর কোনো উপায় নেই তাই 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে তোকে ডেকেছিল।'

তিন-চার দিন পরের কথা। নাথু তার শখের বুলবুলিটির সাথে খেলা করছিল আর তাকে গান শেখাচ্ছিল-

'মো সম পাতকি হেলা, মু কন করমু জগরনাথ-অ-অ-রে-'

এমনি সময় হঠাৎ দারোগা সাহেব এসে উপস্থিত। দারোগা সাহেব নাথুর হাতে একটি থলে দিয়ে বললেন, 'নে নাথু, ডাকাত ধরার জন্য সরকার থেকে তোকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।'

নাথু থলের মুখ খুলে দেখে-

তাই তো!-এক, দুই, তিন, চার!-এ যে কড়কড়ে দু-শো টাকা!

*জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০*






# রবীন্দ্রলাল রায়

হ্যাঁ, বৃষ্টি বটে সেদিন-ঝড়ও কী তেমনি! যাকে বলে প্রলয় কাণ্ড। বাইরে বার হয় কার সাধ্য!

এই জলঝড়ের মধ্যে জমাট আড্ডা বসেছে বিনয়দের উপরের ঘরে। ওদের বাড়িতেই এত লোক যে আড্ডা জমাতে আর বাইরের লোকের দরকার হয় না। এত লোক যে ওদের বাড়ি রোজই ভোজ বলা চলে। খাওয়ার সময় হলে প্রকাণ্ড একটা ঘণ্টা বাজানো হয়, ঘণ্টা শুনে সকলে খেতে আসে, দুটো লম্বা বারান্দা ভরতি হয়ে যায়। তিনজন মুদিতে তাদের চাল ডাল দেয়, চারজন ঠাকুর রাঁধে, ছ-জন চাকরে বাসন মাজে। কোথাও যেতে হলে তিন-চারখানা 'বাস' রিজার্ভ করতে হয়-ট্যাক্সি বা গাড়িতে কুলায় না।

যাক সে কথা! আজ আড্ডা বসেছে খুব জোর! তার উপর আবার বিনয়ের এক মামা এসেছেন আজ ক-দিন হল, তিনিও আজ আড্ডার একজন। কত খোশগল্পই যে হল তার আর ঠিক নেই-খেলার গল্প, ছোটোবেলাকার দুষ্টামির গল্প, ভূতের গল্প-এমনি কত কী। ছোটো ছোটো যারা তারা তো সব চারপাশে ঘিরে বসেছে-শুনছে অবাক হয়ে!

এমনিধারা গল্প করতে করতে শেষে গল্প এসে দাঁড়াল-বরযাত্রী গিয়ে কে কীরকম কষ্ট পেয়েছে। কেষ্ট বলল, 'হ্যাঁ বাবা, বরযাত্রী গিয়েছিলাম বটে, দু-দিন স্রেফ উপোস করিয়ে রাখল। একদিন খেতে দিল মুড়ি আর নারকেল আর একদিন দিল চিঁড়ে গুড় আর কলা-।' বাধা দিয়ে বিনয় বলল, 'আরে খাওয়ার কষ্ট তবু সহ্য হয়, দু-দিন যাহোক খেয়ে কাটানো যায়। কিন্তু সেবার গেলাম পশ্চিমে আমার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী। কী শীত! যাকে বলে হাড়-কাঁপানো শীত! আমরা কুড়িজন লোক, অথচ কনে বাড়ির লোকে না দিল বিছানা, না দিল লেপ-স্রেফ বসে বসে শীতে সারারাত কেঁপে কাটাতে হল!' একপাশ থেকে বিনোদ গম্ভীর চালে বলল, 'ওসব তো কনের বাড়ির অভদ্রতা, কিন্তু জায়গা-যেখানে বরযাত্রী গিয়েছে-সেই জায়গার জন্য কষ্ট পাওয়া কী ভীষণ বলো তো? কনের বাড়ির লোকের কোনো হাত নেই সে ক্ষেত্রে। একজায়গায় বরযাত্রী গিয়ে শুনলাম আমাদের সকলকে পুকুরে স্নান করতে হবে, বাড়ির কুয়োর জল নাকি শুকিয়ে গেছে। গেলাম সকলে মিলে পুকুরে স্নান করতে। দেখি দু-তিন জন লোক এসে খুব মিহি একটা জাল দিয়ে পুকুরের খানিকটা জল অন্য জলখানি থেকে ছেঁকে আলাদা করে দাঁড়াল; বলল, 'আপনারা এই জলে স্নান করে নিন।' কারণ জিজ্ঞাসা করায় কোনো উত্তর দিল না। আমাদের বন্ধু নীরদ সাঁতারটা জানত ভালো। সে তাদের কথা না শুনে ঝাঁপিয়ে চলে গেল পুকুরের মাঝে। কিন্তু যখন উঠে এল তখন তার শরীরের চারিদিকে অজস্র জোঁক ঝুলছে। নুন দিয়ে দিয়ে সে জোঁক তো ছাড়ানো হল, কিন্তু বেচারার গা থেকে রক্তপড়া আর থামতেই চায় না। অনেক কষ্টে রক্ত বা যদি থামল তো আবার জ্বর এল ভীষণ!'

হঠাৎ ঘরের আরেক পাশ থেকে দিলীপ বলে উঠল, 'আরে তবুও সেখানে পুকুরে স্নান না করলেই আর কোনো হাঙ্গামা হত না, একদিন স্নান না করলে মানুষ মরে যায় না। কিন্তু আমরা যে মুশকিলে পড়েছিলাম তা আর কহতব্য নয়-একরকম প্রাণ নিয়ে টানাটানি বললেই হয়।' সকলেই দিলীপের কথায় অবাক, শুনবার জন্য সকলেই উদগ্রীব হয়ে রইল। দিলীপ বলল, 'গেলাম তো বরযাত্রী। দিনের শেষে পাড়াগাঁয়ের মাঝে সন্ধ্যা নামল। সঙ্গেসঙ্গে দেখি কনে যাত্রীর লোকেরা এসে বললেন, 'মশাই, শিগগির মশারির ভিতর ঢুকে পড়ুন।' ওরে বাবা, কী জোয়ান মশা! মনে হল যেন পাখাওয়ালা নেংটি ইঁদুর উড়ছে সব! যাই হোক, মশারির ভিতর বসে তো গল্প করতে লাগলাম। শেষে যখন খেতে গেলাম তখন দেখি বারান্দায় লম্বা লম্বা প্রকাণ্ড মশারি টাঙানো। তার মধ্যে খাবার দেওয়া হয়েছে, আর যারা পরিবেশন করছে তারা মশারির 'বোরখা' পরে আছে। শুনলাম এখানকার মশা এমন কিছু নয়, কামড়ালে জ্বর-টর হবার ভয় নেই-তবে সারা গায়ে দগদগে ঘা হয়ে ওঠে, এই মাত্র!'

দিলীপের গল্পটাই বোধ হয় অন্য সকলের গল্পকে ছাড়িয়ে গেল। সত্যিই তো মশার কামড়ে দগদগে ঘা-কী ভীষণ! বিনয়ের মামা এতক্ষণ ঘরের এক কোণে একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে গল্প শুনছিলেন। তিনি এবার একটু সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, 'আমার জীবনেও ওরকম ঘটনা এক ঘটেছিল।' বলেই আবার চুপ করে বসে চুরুট টানতে লাগলেন। সকলেই এক সঙ্গে ধরে বসল, 'বলুন না, বলুন না।' মামাবাবুর চুরুটটা ততক্ষণ শেষ হয়ে এসেছিল, তিনি আর একটা নতুন চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'তবে শোন! একদিন আমার এক বন্ধু এসে জানাল যে তার বিয়েতে আসামের কাছে কোথায় আমাকে বরযাত্রী যেতে হবে। শুনে তো আমি অবাক! এত দেশ থাকতে শেষে কি আসামের কালাজ্বর নিয়ে আসব নাকি? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গেলাম বরযাত্রী-একা আমি নয়, অনেকেই। তবে তাদের মধ্যে আমরা পরিচিত ছিলাম কয়েকজন-বাকি সব অচেনা, তাঁরা নাকি সব বিদেশ থেকে এসেছেন।

কী বন রে বাবা সে দেশে! কোথাও বার হওয়ার জো নাই। শুনলাম নাকি রাত্রে বেজায় বাঘ ভাল্লুক বাড়ির আনাচেকানাচে বেড়াল কুকুরের মতো ঘুরে বেড়ায়।

'বিয়ের লগ্ন রাত বারোটায়, কাজেই তার আগে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত হল। একটা প্রকাণ্ড হলের মধ্যে আমাদের খাওয়ার জায়গা করা হয়েছে। সকলে আসনে বসলাম। সকলেই ভাবছি, এবার লুচি আসবে, কিন্তু যা এল তা দেখে সকলে স্তম্ভিত। চার-পাঁচ জন গুণ্ডার মতো লোক এসে গম্ভীরভাবে দরজার কাছে বসল, তাদের হাতে তেল দিয়ে পাকানো এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি! কনেদের বাড়ির এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হল, 'মশাই, লাঠি কী হবে?' তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'দেখতে পাবেন পরে?' বলে তিনি চলে গেলেন। অতগুলি লোক, সকলে চুপ! যেন সেখানে একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে এমনি একটা আশঙ্কায় সকলে বসে আছে-ঝড়ের আগে যেমন সব নিস্তব্ধ হয়ে যায় তেমনি।

'আমাদের আমোদ তো সব মাথায় উঠে গেছে-সকলের বুক ভয়ে ধড়াস ধড়াস করছে। আমার ডান দিকে যে অপরিচিত ভদ্রলোকটি বসে ছিলেন তাঁকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মশায়, ব্যাপার বুঝছেন কিছু, মারধোর করবে না তো?' সে ভদ্রলোক বললেন, 'কী জানি মশাই, এদের দেশে কি বরযাত্রীদের লাঠি-পেটানোর রীতি আছে নাকি?' আমি বললাম, 'তা তো জানিনে। পৃথিবীর এক-এক দেশে অভিবাদনের এক-এক রকমের রীতি আছে শুনেছি। কোন এক দেশে নাকি দু-জনে দেখা হলে পরস্পরের হাতে থুতু দিয়ে

পরস্পরকে অভিবাদন করে। কিন্তু বরযাত্রীদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে লাঠিপেটা করে তা তো শুনিনি কখনো। তবে হাতে থুতু দিয়ে যদি অভিবাদন করা যেতে পারে, তাহলে লাঠি পিটিয়ে আদর অভ্যর্থনা বা হবে না কেন-এ বুনো দেশে হয়তো এই প্রথা।'

'আমার বাঁ-পাশে ভোলা বসেছিল; তার গোল মুখটি ভয়ে লম্বা হয়ে গিয়েছিল। সে কাঁদো-কাঁদো মুখে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'দূর, তা কী হয়, মারবে কেন?' আমি বললাম, 'মারবে কেন তা জানিনে, তবে মারবে নিশ্চয়।' ভোলা সঙ্গেসঙ্গে সভয়ে কাঁদো-কাঁদো সুরে আর্তনাদ করে উঠল, 'না'। ভোলার ওপাশে বসেছিল নীলু। সে বলল, 'দেখ, ও-বেটারা বসেছে একেবারে ওদিকে-যেই ওরা ওদিকে মারতে আরম্ভ করবে অমনি আমরা এই দিকের দরজা খুলে পালিয়ে যাব।' আমার পাশের ভদ্রলোকটি একটু ম্লান হেসে বললেন, 'পালাবেন কোথায় মশাই এ রাত্রে? বাইরে বার হলেই যে বাঘের পেটে যেতে হবে। তার চেয়ে দু-ঘা লাঠি খাওয়া ভালো-একেবারে মেরে তো ফেলবে না।'

'যাই হোক, আমরা তো পাতা সামনে নিয়ে বসে আছি-ওদিকে সেই লোকগুলি বসে আছে লাঠি নিয়ে। লুচি দিয়ে গেল। খাব কী-গলা যে ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কনে বাড়ির আর একটি ভদ্রলোক আমাদের এদিকে আসতেই ভোলা যেন কিছুই হয়নি এইরকম ভাব দেখাবার চেষ্টা করে জোর করে একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে বলল, 'হ্যা, হ্যা মশাই, লাঠি কী হবে, অ্যাঁ?' ভদ্রলোক শুধু বললেন, 'একটু পরেই বুঝবেন।' ভোলার থুতনিটা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে, বোধ হয় মূর্ছা যাবে। আমারও শরীরে ঘাম দেখা দিয়েছে। পাশের ভদ্রলোকটি এবার বোধ হয় কেঁদেই ফেলবেন।

'লুচি-তারপর এল ভাজা, তারপর ডালনা, তারপর ডাল-। তারপরই সব চুপ-খানিকক্ষণ ওপক্ষের কারও দেখাই নেই। একটু পরে কনেবাড়ির কে একজন এসে ওই লোকগুলিকে কী বলে গেল। ওরাও তক্ষণি লাঠিগুলি বাগিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা সকলে তখন কী করব ভেবে ঠিক করতে পারছি না। সকলের মুখে সে কী অসহায় ভাব! গুরুমশায়ের হাতে বেদম প্রহার খাওয়ার আগের মুহূর্তে ছাত্রের মুখে যেমন ভাব হয় ঠিক তেমনি!



'এবার বালতি করে একজন মাছ নিয়ে এল। যেই দু-একজনের পাতে মাছ পড়েছে, অমনি মধ্যে থেকে কে চিৎকার করে উঠল, 'লাগাও, লাগাও! মার, মার!' এদিকে মুহূর্তের মধ্যে কী যে ঘটল তা বর্ণনা করাই একরকম অসম্ভব। ওই চিৎকারের সঙ্গেসঙ্গে লোকগুলি আমাদের সামনে দমাদম লাঠি আছড়াতে লাগল। এদিকে আমাদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। কেউ দু-হাতে নিজের মাথা ঢেকে উবু হয়ে পড়ল, কেউ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কেউ-বা পালাবার জন্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। ভোলাটা তো মড়ার মতো চোখ কপালে তুলে নিশ্চল হয়ে বসে রইল, ওর গলা দিয়ে খালি একটা অদ্ভুত রকমের ঘড়র, ঘড়র, শব্দ হতে লাগল।

'এমন সময় কনের বাপ ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, 'আপনারা তাড়াতাড়ি মাছটা খেয়ে নিন দয়া করে, নইলে এখনই সব মাছ বন বেড়ালে-।' তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখি ওদিকের দরজা দিয়ে, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ অসংখ্য শুয়োরের বাচ্চার মতো বুনো বেড়াল আমাদের পাতের দিকে ছুটে আসছে। তাদের চোখের দিকে চাইলে ভয় হয়-খেয়ে ফেলবে নাকি আমাদের?

'কনের বাপের সে কী অবস্থা! একবার কড়া সুরে ওই লোকগুলোকে হুকুম করছেন, 'আরও জোরসে লাঠি চালাও,' আর এদিকে হাত জোড় করে আমাদের করুণ সুরে অনুনয় করছেন, 'দয়া করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন মাছটা।'

'লাঠি চলতে লাগল সজোরে বেড়ালের উপর দমাদম। বেড়ালগুলো আর আমাদের পাতের দিকে এগোতে পারল না। তবে সহজে হটবার পাত্র নয় তারা। তাদের আটকে রাখতে লোকগুলো একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠল। বেড়ালে আর মানুষে সে কী বিষম দাঙ্গা। যাই হোক, আমরা তো কোনোরকম করে মাছ খেয়ে নিলাম; সঙ্গেসঙ্গে সেই বন বেড়ালগুলিও হল অন্তর্হিত, আর সেই লোকগুলিও তাদের লাঠি ক-টি নিয়ে করল প্রস্থান।

'ব্যাপার দেখে সকলেই অবাক-এ কী কাণ্ড রে বাবা! তবে অবাক হলেও হাসি ফুটে উঠেছে সকলের মুখেই। সকলেই বোধ হয় তখন ভাবছিল-'যাহোক মারেনি তো!' ভোলার সেই ভয়ে লম্বা হয়ে যাওয়া মুখ আবার গোল হয়ে এসেছে, যে চোখ কপালে উঠেছিল তা আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছে। সে গম্ভীর ভাবে দুলে দুলে বলছে, 'দেখলি তো মারলে না, তখনই বলেছিলাম, তোরা তো ভয়েই অস্থির!"

মামার গল্প শেষ হতে না হতেই খাবার ঘণ্টা বেজে উঠল। সবাই নীচে গিয়ে প্রকাণ্ড দুটো বারান্দায় খেতে বসল। চারজন ঠাকুর পরিবেশন করছে। ভাত, ডাল, ভাজা সব খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর সকলের পাতে যখন মাছের তরকারি দিল, তখন সকলেরই একসঙ্গে মনে হল-বন বেড়াল আসবে না তো আবার?

*শ্রাবণ ১৩৪০*






# বুদ্ধদেব বসু

দিদির এক খুকি হয়েছে; বয়েস তার সাত দিন হতে চলল।

বাড়িতে খুকি নামের আর একটি যে মানুষ আছে, তার বয়েস তেরো, গোখেল মেমোরিয়ালে সে পড়ে। সে বলল, 'তোমরা আর কেউ ওকে খুকি বলতে পারবে না-এখন থেকে ডাকতে ডাকতে শেষটায় ওর নাম খুকিই হয়ে যাবে। খুকি-কী ভীষণ হোপলেস নাম!'

তার নিজের খুকি নামের বিরুদ্ধে সে বড়ো হয়ে অবধি প্রাণপণে প্রতিবাদ করে এসেছে, ফল হয়নি কোনো। তার যে আর একটা নাম আছে, আভা, তা যেন ভুলেই গেছে সবাই; সব চেয়ে ভুলেছেন তাঁরা, যাঁরা ও-নাম রেখেছিলেন। অবিশ্যি আভা নামটাও যে তার খুব পছন্দ হয়, তা নয়-আভা, কেমন যেন সেকেলে গন্ধ! মানুষ কেন বড়ো হয়ে তার নিজের নাম বদলে রাখতে পারে না ইচ্ছেমতো!

যাই হোক, নিজের নাম তো যা হবার হয়েছে, এখন দিদির মেয়েকে নিয়ে ভাবনা। বাড়ির লোকগুলো এমন-হয়তো ওর নাম সুরমা কি বিমলাই রেখে বসল।

আভা-আমরা তাকে আভাই বলব-মনে মনে যুদ্ধ ঘোষণা করল বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে। বলল, 'আমি রাখব খুকির নাম।'

কোত্থেকে মানিক বলে উঠল ফট করে, 'তাহলেই হয়েছে!'

মানিক দস্তুরমতো বড়ো হয়েছে; বালিগঞ্জ ইশকুল থেকে সে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে সামনের বার। আভাকে সে মনে মনে জানে ছেলেমানুষ।

আভা মনে মনে জানে যে তার ছোড়দা, এই মানিক নির্বুদ্ধিতার একটি গৌরীশঙ্কর। সে ভুরু বাঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'তুই এসব বিষয়ে কথা বলতে আসিস কেন? যা, ফুটবল খেল গে।'

মানিক সেকথা কিছুমাত্র গায়ে মাখল না; একজন শিশু কী বলে আর না বলে, তা আমরা আমলেই আনি না। সে গম্ভীরমুখে বলল, 'আমি একটা চমৎকার নাম ভেবে রেখেছি খুকির জন্য।'

আভা বেণী দুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁঃ, তোর আবার চমৎকার।'

'দেখবি?'

'কী আর দেখব! পারুলবালা কি সুরকুমারী কি কনকলতা কি ওই গোছের একটা হবে আর কি! তোর যা taste!'

‘আর তোর যত বীণা আর মীরা আর ললিতা আর লতিকা-তাই খুব ভালো তো? এক একটা নাম শুনলে ইচ্ছে করে মরে যাই।’

‘ওমা,’ আভা খিলখিল করে হেসে উঠল, ‘আমি বুঝি তাই বলতে যাচ্ছি! ওসব নাম তো আজকাল একেবারে পচে গেছে।’

মানিক বলল, ‘আমি যা একটা ভেবেছি, তা একেবারে আশ্চর্য! তাক লেগে যাবে তোর শুনলে।’

‘ছাই! হত যদি কুকুরের নাম, তাহলে অবিশ্যি তুই-

‘বেশি তড়বড় করিসনে-বুঝলি? এসব পুতুলের নাম রাখা নয়, মনে রাখিস।’

পুতুলের কথা তোলায় আভা ভীষণ অপমানিত হল। হবারই কথা; বেশিদিন নয়, সে পুতুলখেলা ছেড়েছে, সেইজন্য এখন তার চোখে ওসব ভয়ংকর ছেলেমানুষি। লাল হয়ে উঠে সে বলল, ‘আর তুই তো সেদিনও লাট্টু ঘোরাতিস বোঁ বোঁ করে। আর মার্বেল ভেঙে ফেলে দু-ঘণ্টা কেঁদেছিলি ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে মনে নেই?’

‘যা যাঃ, অঙ্কে লাড্ডু পাস আবার কথা বলতে আসিস!’

‘আর তুই যে একদিন জিয়োগ্রাফির ক্লাসে দাঁড়িয়ে ছিলি বেঞ্চির উপর-জানিনে বুঝি!’

‘ভাগ, এখান থেকে রাক্ষুসি।’

‘তুই তো কুলির দলের সর্দার, জন্মে সাবান মাখবিনি গায়ে।’

আলাপের বিষয়টা ক্রমেই খুকির নাম থেকে দূরে সরে পড়ছিল; এবং আরও নানারকম সব কথা উঠতে পারত, যা শুনতে মোটেও ভালো নয়-এমনকী, কথা কাটাকাটি থেমে গিয়ে খানিকটা হাতাহাতিও হতে পারত, যদি না ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আভা হঠাৎ আবিষ্কার করত যে এক্ষুনি স্নান করতে না গেলে সে ইশকুলের বাস ফেল করবে।

* * *

কমল, ওদের মেজদা, এবার সেকেন্ড ইয়ারে উঠল; মাসিকপত্রে তার কবিতা বেরোয়। সম্প্রতি সে চুলের চর্চা করছে; আর চাদর জড়াচ্ছে অগোছালো করে-যেন এক্ষুনি খসে পড়বে গা থেকে।

সে বলল, ‘খুকির নামের জন্য ভাবনা কী, রবীন্দ্রনাথকে আমি এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি একটা নামের জন্য।’ সে একবার তার অটোগ্রাফের খাতায় দু-লাইন পদ্য লিখিয়ে এনেছিল রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে; আরেকবার এম্পায়ারে কী-এক পালা হচ্ছিল, ভাঙবার সময় সে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার একপাশে, রবীন্দ্রনাথ কাছে আসতেই ঢিপ করে এক প্রণাম করেছিল আর তিনি তাকে বলেছিলেন, ‘ভালো আছ?’ সেই থেকে-তার কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা তুলতে কেউ যেন আর সাহস না পায়!

আভা ঠোঁটের একটা ভঙ্গি করে বলল, ‘রবিবাবুর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তিনি গেছেন তোমার ভাগনির নাম করতে!’

‘আন্দাজে বকবক করিসনে।’ কমল দিল এক ধমক, ‘জানিস, উনি কত ছেলে-মেয়ের নাম রেখে দিয়েছেন। আমি চিঠি লিখলে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন একটা নাম।’

‘তা কেন? আমরা নিজেরা বুঝি একটা নামও বার করতে পারিনে ভেবে।’

'করো তোমাদের যা খুশি,' কমল গম্ভীর হয়ে গেল, 'ভালো কথা বললে তো শুনবে না।'

'এমন একটা নাম চাই', আভা বলল, 'যা এর আগে কেউ কখনো শোনেনি। যা এক্কেবারে নতুন।'

'সেইজন্যই তো বলছিলুম, রবীন্দ্রনাথকে লিখি। তাঁর অত বড়ো প্রতিভা, তিনি কোত্থেকে একটা আশ্চর্য নাম খুঁজে বার করবেন, দেখবি হাঁ হয়ে যাবি তোরা সবাই। আর তাঁর দেওয়া নাম-এ কি কম ভাগ্যের কথা! খুকি বড়ো হয়ে লোককে বলতে পারবে না!'

'ভারি তো!' রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আভার মনে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সে শুধু জানত, রবিবাবু বুড়োগোছের এক ভদ্রলোক, যিনি অনেক গান তৈরি করেছেন, আর যাঁর হাতের লেখা অনেকটা তার দাদার লেখার মতো। তাই, 'ভারি তো!' সে বলল।

কমল কিন্তু মর্মাহত হল। 'তোমরা যা খুশি করো', অমাবস্যার মতো মুখ করে সে বলল, 'আমাকে কেন ডেকেছ এর মধ্যে?'

সত্যি বলতে, কেউ তাকে ডাকেনি। আভা একবার রঙিন পেনসিল দিয়ে একটা নদী আঁকবার চেষ্টা করেছিল; মেজদা তা দেখে বলেছিল, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে মাঠটা।' সেই থেকে মেজদার বুদ্ধিসুদ্ধির উপর আভার কোনো আস্থা ছিল না।

আভা বলল, 'আহা, রাগ কর কেন?' ইশকুলে তার সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু মীরার সঙ্গে দু-দিন তার কথা বন্ধ ছিল, আজ ঝগড়া শেষ হয়েছে-তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, আর কক্ষনো কক্ষনো …

থাক সে কথা। মোট কথা, সেই কারণে আভার মেজাজটা ভালো ছিল; সে বলল, 'এসো সবাই মিলে একটা নাম ঠিক করা যাক।' অবিশ্যি তার মনে মনে সন্দেহ ছিল না যে, সে যা বলবে, সেটাই সব চাইতে ভালো হবে, এবং সেটা মেনেও নেবে সবাই। 'মানিক, তুই আগে বল।'

মানিক ফোঁস করে উঠল, 'আমাকে তেমনি বোকা পেয়েছিস কিনা! আগে বলে দিই, আর তুই তক্ষুনি সেটা নিয়ে নে! বললেই হল-আমিও ওটাই ভেবেছিলুম।'

আভা একবার তাকাল মানিকের দিকে-এমনভাবে, যেন তাঁকে ভস্ম করে ফেলবে। তারপর শান্তভাবেই বলল, 'আচ্ছা, চঞ্চুলিকা কেমন নাম?'

কমল বলল, 'চঞ্চুলিকা-তার মানে কী?' আর মানিক উঠল হেসে; 'চঞ্চুলিকা-হাঃ হাঃ! তার চাইতে গড্ডালিকা কি অট্টালিকা রাখ না কেন?'

'কি, ধর', কমল এবার তার প্রতিশোধ নিল, 'করকমলিকা, কি শ্যামকদলিকা, কি নীলোৎপলিকা?'

আভা একেবারে নিবে গেল। সে কাঁদবে না ঘর ছেড়ে চলে যাবে, না মা-র কাছে গিয়ে নালিশ করবে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারল না। এমন যে হবে, সে কখনো ভাবতেও পারেনি। অবিশ্যি চঞ্চুলিকার চেয়ে অনেক ভালো নাম ছিল তার মনে, তবে সে সেগুলো বলবে না, খুকিকে ফেলে রাখবে তার অদৃষ্টের হাতে?-না বলাই বোধ হয় ভালো। ছেলেরা, সে বরাবর লক্ষ করেছে, এক-একটি জন্তুবিশেষ; কোনো কথা যদি তাদের কাছে বলা যায়।

কমল একটু ভেবে বলল, 'আমার তো মনে হয় বনশ্রী নামটি বেশ মিষ্টি।'

আভা ফস করে বলে উঠল, 'ভারি একটা বললে! বললেই বিশ্রী আর মিছরি মনে পড়ে।'

কমল বলল, 'তাহলে, ধর জয়তী।'

'ওমা, জয়তী যে আমাদের ক্লাসের একজন মেয়ে আছে।'

'এমন নাম তুই কোথায় পাবি, যা আর একজনেরও নেই? বাংলাদেশের সব মেয়ের নামই তুই জানিস নাকি?'

'বয়ে গেছে জানতে। বেশির ভাগ মেয়ের নামই তো রমা আর ছায়া আর মায়া আর বেলা আর রেবা আর বীণা আর লীলা। এমন নাম সহজেই বার করা যায়, যা আর কারও নেই।'

'তুই-ই বল।'

'আমি বলছি', মানিক হঠাৎ বলে উঠল, 'সোনালি।'

'সোনালি! এ আবার নাম হয় কবে!'

এবার আভার পালা হাসবার। 'তার চেয়ে বল না চৈতালি কি হরিতালি কি করতালি। রুপালি কি তামালিই বা মন্দ কী?'

'কেন হবে না', মানিক তীব্রস্বরে বলল, 'তোমাদের রবিবাবু যদি পদ্যে লিখতে পারেন খেয়ালি আর কাকলি আর ঝামরি-তাহলে সোনালিই বা হবে না কেন?'

'দেখ বোকারাম', কমল তক্ষুনি বলে উঠল, 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তুই কিছু বলিসনে। চুপ করে থাক।'

'ভারি সব দিগগজ পণ্ডিত এসেছেন এক-একজন। আমি, দেখে নিয়ো, ওকে সোনালি বলে ডাকব।'

'তুই মহাকালী বলে ডাকলেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু ওর নাম হবে মঞ্জুভাষা।'

কমল বলল, 'ভারি বললি। সবাই ডাকবে তো মঞ্জু বলে, আর মঞ্জু নামের হাজারখানেক মেয়ে বোধ হয় আছে দেশে।'

'তাও তো বটে! তাহলে রাগিণী-'

'দূর,' মানিক বলল, 'শুনলেই মনে হয় রেগে আছে।'

'বিম্ববতীটা কেমন? বেশ গম্ভীর আওয়াজ।'

'ঠিক জাম্বুবতীর মতো।'

'দেখ মানিক, তুই যদি সবসময় ওরকম ফাজলেমি করবি-'

'হ্যাঁ, ফাজলেমিই তো! আর তোমরা যখন করো, খুব ভালো।'

'তুই এখান থেকে যা।'

'কক্ষনো যাব না।'

'নিশ্চয়ই যাবি।'

'ইস! তোর কথায় নাকি?'

'আচ্ছা, যার কথায় যাবি, তাকে ডাকছি।' আভা চেঁচাতে আরম্ভ করল, 'মা, মা-'

পাশের ঘর থেকে মা এলেন। ‘কী হয়েছে?’

‘দেখো তো, মা, মানিকটা কী করছে।’

‘কী করেছিস তুই, মানিক?’

‘কী আবার করব!’

‘তোরা জটলা বেঁধে এখানে করছিস কী? পড়াশোনা নেই কারও?’

আভা তাড়াতাড়ি বলল, ‘খুকির একটা নাম ঠিক করছিলুম, মা।’

‘খুকির নাম? খুকির নাম আমি সীতা রাখব। তোরা যা-ই বলিস, সীতার মতো মিষ্টি নাম কি আর আছে।’

আকাশ ভেঙে পড়ল আভার মাথায়। ‘কিন্তু মা, ও তো একটুও আজকালকার মতো হল না। ছি, ছি, ও-নাম তুমি কিছুতেই রাখতে পারবে না।’

মানিক সুযোগ পেয়ে বলল, ‘কেন আমার তো বেশ ভালোই লাগছে।’

আভা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, ‘ইস, ওর আবার একটা ভালোলাগা!’

‘থাক, এখন আর তোদের এ নিয়ে ঝগড়া করতে হবে না,’ বলে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আভা খানিকক্ষণ বসে রইল হতভম্ব হয়ে। শেষটায়, সীতা! আভার সব চেয়ে শখের শাড়িটা কেউ কেড়ে নিলেও সে এর চেয়ে দুঃখিত হতে পারত না। তারপর সে ভাবল, মা বললেন আর অমনি সবাই নামটা মেনে নিল, তার তো কোনো মানে নেই। যে নামটা সব চেয়ে সুন্দর, সেটাই শেষ পর্যন্ত থাকবে। তখন সে বলল, ‘আচ্ছা মেজদা, দীপা নামটা কারও আছে বলে জানো?’

কমল একটু ভেবে বলল, ‘কই, মনে তো পড়ছে না।’

মানিক বলল, ‘ও-নামে কি কেউ ডাকতে পারে? ডাকবার জন্যে দেখবি ঝন্টু কি হাসি কি ছবি ওইগোছের একটা নামই হবে।’

আভা ক্লান্তসুরে বলল, ‘তা-ই যদি হয়, তাহলে এত ভেবেচিন্তে নাম রাখাই বা কেন? একটা বিশ্রী, বিদঘুটে নামে না ডাকলে কারও যদি ভালো না লাগে-‘

‘দেখ,’ কমল হঠাৎ বলে উঠল, ‘নাম তো ডাকবারই জন্যে। ডাকতে সুবিধে, এমন নামই ভালো। আর তেমন একটা অসাধারণ নাম তুই পাবিই বা কোথায়? আমি বলি কী, বেশ ছোটোখাটো একটা মিষ্টি নাম রাখা যাক।’

‘যেমন?’

‘যেমন ধর কমলা।’

‘খেপেছ? আমাদের অঙ্কের টিচারের নাম কমলা-আর তাঁর যা মেজাজ।’

মানিক বলল, ‘অরুণা তো বেশ নাম।’

‘না, না, অরুণা-বরুণা-তরুণা ওসবের কাজ নেই। শুনলেই মনে হয় নভেল।’

‘মালতী?’ কমল বলল, ‘বেশ ঠান্ডা নাম।’

‘কচু! ওই তো ও-বাড়িতে এক মালতী আছে-কী বিশ্রী দেখতে।’

'রানি? যে যা-ই বলুক, রানির মতো নাম আর নেই।'

'ওই একটা নাম শুনলেই আমার গা জ্বালা করে। যদি ওর নাম উর্মিলাও হতে হয়, তবুও রানি নয়।'

'উর্মিলাই বা মন্দ কী, ডাকবে উর্মি বলে।'

'নাঃ,' আভা হতাশভাবে মাথা ঝাঁকুনি দিল, 'এমন বিপদে কে কবে পড়েছে! একটা নাম পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে!'

'দেখ, নাম একটা হলেই হয়। শুনতে শুনতে, ডাকতে ডাকতে সব নামই মিষ্টি শোনায়।'

'নাম রাখো সুধা,' মানিক অনেকক্ষণ পরে বলল, 'শুনলেই মনে হয় লক্ষ্মী মেয়ে।'

'মনে হয় ছিঁচকাদুনে।'

'নাহয় নিরুপমা-একটু সেকেলে অবিশ্যি, কিন্তু বেশ-মোটেও ফাজিল গোছের নয়।'

'কীরকম যেন মোটা মোটা নামটা।'

'নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। তোর যা খুশি রাখ, আমরা হার মানলুম।'

আভা চুপচাপ খানিকক্ষণ ভাবল-প্রাণপণে ভাববার চেষ্টা করল। তার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে কামড়ে সে আর কিছু রাখল না, ঘাম দেখা দিল কপালে।

* * *

ঘণ্টা দুই পরে আভা তার দিদির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

'কী রে?'

'দিদি, তোমার খুকির জন্য একটা নাম ...।'

'কী, বল?'

'বনশ্রী। চমৎকার নাম-না? আর একেবারে নতুন।'

'চমৎকার। এ নিয়ে পাঁচটা হল।'

'পাঁচটা?'

'হ্যাঁ-মা বলেছেন সীতা, বাবা বলেছেন মৃন্ময়ী, কমল-'

'মেজদা?'

'হ্যাঁ-কমল বলেছে সুধা-'

'সুধা! কখন বলল?'

'এই তো একটু আগে এসে বলে গেল। আর মানিক-'

'মানিক কী বলেছে?'

'মানিক বলেছে রাগিণী। তোরা সবাই মিলে ওর নাম রাখছিস, আর খুকি এদিকে কী সুন্দর হাসছে, দেখ। দুষ্টু মেয়ে, এখনই এত হাসতে শিখেছে। এই খুকি, খুকি-তোমার মাসি এসেছে, খুকি। খুকি, তোমার মাসিকে একটু হাসি দেখিয়ে দাও তো।'






# মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

মাধবপুর টি.এন.জি. ইনস্টিটিউশনে, এবং তৎসংলগ্ন হোস্টেলে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেছে; একসঙ্গে পনেরো দিন ছুটি; এ অসম্ভব কখনোই সম্ভব হইত না, যদি না সেবার বাংলার মন্ত্রীমহাশয়কে পুরস্কার বিতরণ করিতে রাজি করানো যাইত।

পুরস্কার-বিতরণ সভায় মন্ত্রীমহাশয় বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'শিক্ষার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় দিকে আমি আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকাল চারদিক থেকেই একটা নালিশের সুর উঠছে যে আমরা আমাদের ছেলেপেলেদের কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই শিখিয়ে আসছি-হাতে-কলমে কাজ শেখবার সুযোগ তাদের দিচ্ছি না। এ স্কুলের কর্তৃপক্ষ যাঁরা তাঁদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ কথাটাকে তাঁরা যেন একটু তলিয়ে ভেবে দেখেন।' এই কথাগুলি হোস্টেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট প্রতাপবাবুর মনে বড়োই ধরিয়াছে।

সভা ভঙ্গের পরই দেখা গেল প্রতাপবাবু হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে বসিয়া তাঁর সঙ্গে কী একটা বিষয় আলোচনা করিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর ডান হাতের মুঠো প্রবল বেগে বাঁ-হাতের তেলোকে প্রহার করিতেছিল। যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিতে হইলেই প্রতাপবাবু এই রকম করিয়া থাকেন। সেই ঘরে আর একজন ভদ্রলোক চুপ করিয়া বসিয়া উভয়ের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন; তিনি ধ্রুবপদবাবু, হোস্টেলের নতুন সুপারিনটেন্ডেন্ট।

ঘণ্টাখানেক বাদে হোস্টেলের ছেলেরা দেখিতে পাইল নোটিশবোর্ডে একটি নূতন নোটিশ ঝুলিতেছে-তার মর্মার্থ এই যে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সাড়ে নয়টার সময় 'কমন রুমে' একটি জরুরি বিষয়ের পরামর্শের জন্য মিটিং বসিবে। প্রতাপবাবু সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক বোর্ডার যেন ওই সময় 'কমন রুমে' উপস্থিত থাকে।

যথা সময়ে মিটিঙে উপস্থিত হইয়া প্রতাপবাবু তাঁর বক্তব্য বিষয় ছেলেদের বুঝাইয়া বলিলেন-বাস্তবিক মন্ত্রীমহাশয় আজ তাঁরই মনের কথাটি খুলিয়া বলিয়াছেন। কেবল বই মুখস্থ করিলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না, হাতে-কলমে কাজ করিতে শেখা চাই। হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আজ তাঁর এবিষয়ে কথাবার্তা হইয়াছে। তাঁরা পনেরো দিন ছুটি পাইতেছেন, এ ক-টা দিন ছেলেরা যদি হোস্টেলেই থাকিয়া যাইতে রাজি হয়, তবে তাদের জন্য চমৎকার একটি জিনিসের বন্দোবস্ত তিনি করিতে পারেন। হোস্টেলের সংলগ্ন যে বারো-চোদ্দো বিঘা জমি আছে অনায়াসেই সেখানে নানারকম ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা চলে। এই পনেরো দিন প্রত্যেকে সকালে তিন ঘণ্টা, বিকালে দু-ঘণ্টা এবং স্কুল খুলিলে প্রত্যহ বিকালে এক ঘণ্টা করিয়া খেতের কাজ করিলেই ব্যাপারটা খুব সহজ হইয়া যায়। এক দিকে তাদের যেমন হয় স্বাবলম্বন শিক্ষা, অপরদিকে তেমনি আলু, কুমড়ো, বেগুন, কপি, মটরশুঁটি প্রভৃতি তরকারি নিজেদেরই খেতে উৎপন্ন হওয়ায় 'বোর্ডিং চার্জ'ও অনেক কম পড়ে। এ বিষয়ে ছেলেদের কী মত?'

প্রতাপবাবুর বক্তৃতা শুনিয়া ছেলেরা অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভোট নিয়া তিনি দেখিলেন সকলেরই এ প্রস্তাবে সম্মতি আছে। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'আমার প্রস্তাব তবে এ মিটিং গ্রহণ করছে-কী বলো?'

সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ।'

সেই রাত্রেই অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট প্রতাপবাবু কাজের খসড়া, শ্রেণি-বিভাগ প্রভৃতি সমাধা করিয়া ফেলিলেন। স্কুলের অন্যান্য মাস্টারমশায়দের তিনি কথাটা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন, পরদিন প্রত্যুষেই দেখা গেল তাঁদের বাড়ি হইতে প্রচুর পরিমাণে কোদাল, শাবল, খোন্তা, ঝুড়ি প্রভৃতি আসিয়া হাজির হইয়াছে। সর্বপ্রথম হেডপণ্ডিত মশায় একটি মন্ত্র পাঠ করিলেন; তারপর হারমোনিয়াম সহযোগে গান আরম্ভ হইল, আর সেই গানের তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে ছেলের দল কোদাল, শাবল প্রভৃতি হাতে নিয়া মাঠে নামিয়া পড়িল।

মিনিট পনেরো তারা খুবই উৎসাহে কোদাল চালাইয়াছিল, কিন্তু তারপরই শুরু হইল ঘন ঘন ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত-তিন ঘণ্টা হইতে আর কত বাকি আছে।

বিকাল বেলা গান আর তেমন জমিল না, অনেকেরই নাকি ইতিমধ্যে মাথা ধরিয়া গেছে।

দ্বিতীয় দিন দেখা গেল খেতের কাজে খুব কম ছেলেরই উৎসাহ টিকিয়া আছে, তৃতীয় দিনে এক জনেরও আছে কি না সন্দেহ। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্টের দরবারে প্রায় ডজন খানেক দরখাস্ত পেশ হইল-ছেলেদের অনেকেই একবার বাড়ি ঘুরিয়া আসিতে চায়। বর্ষাকালের আকাশের মতো মুখ নিয়া প্রতাপবাবু কোনো দরখাস্তের উপর লিখিলেন, No (না), কোনোখানার উপর Rejected (না-মঞ্জুর), কোনোখানার উপর Impossible (অসম্ভব)।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ভীমসেনের ঘরে কতগুলি ছেলে জটলা পাকাইতেছিল। ঘরের মালিকের আসল নাম ভীমসেন নয়, গোপাল গাঙ্গুলি; মহাভারতোক্ত ভীমের মতো গায়ের জোর এবং চেহারার বহর দেখিয়া হোস্টেলের ছেলেরা ওই নাম দিয়াছে। ভীমসেনের মানসিক অবস্থা বর্তমানে মোটেই সুবিধাজনক নয়; কী কুক্ষণে বেচারা প্রতাপবাবুর প্রস্তাবে ঘাড় নাড়িয়াছিল-তার বলীবর্দের মতো বপুখানা দিয়া তিনি খেতের বারো আনা মাটি কোপাইয়া লইতেছেন। আজ সকাল হইতেই ভীমের অন্তরাত্মা পালাই পালাই করিতেছিল, হরিহরকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল, 'কাল থেকে তোমরাই বাপু খেতের কাজ করো, স্বাবলম্বন-শিক্ষা এবং দৈহিক উন্নতি লাভ হবে। আমি আজকেই সটকাচ্ছি। উঁহুহু, খেপিনি আমি; প্রতাপবাবুর কাছে নয়, খোদ সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে আমার আর্জি পড়বে। তারপর প্রতাপবাবুও একটু চোখের আড়াল হয়েছেন, আর আমিও সুড়ুৎ।' এই শেষের কাজটি কেমন ধাঁ করিয়া সুসম্পন্ন হইবে বোধ করি সেইটেই বুঝাইবার জন্য ভীমসেন ভীমরবে একটি তুড়ি মারিল।

সুরসিক বলিয়া হরিহরের হোস্টেলে একটু সুনাম আছে; সে কহিল, 'সুড়ুৎ বলে তুড়ি মারলেই তো আর সুড়ুৎ করা চলে না। বলি যাবে যে, একখণ্ড 'মেটিরিয়া মেডিকা' জোগাড় হয়েছে? সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে গেলেই তো তিনি বলবেন, বাড়ি যাবে যাও, কিন্তু বন্ধের ভেতর 'মেটিরিয়া মেডিকা'খানা মুখস্থ করে এসো।'

উপস্থিত সব কয়টি ছেলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিবার বাস্তবিকই একটা কারণ আছে। নূতন সুপারিনটেন্ডেন্ট ধ্রুবপদবাবু যেন একটু বাতিকগ্রস্ত-ডাক্তারি করিবার

তাঁর উৎকট রকমের শখ এবং ডাক্তারিবিদ্যায় নিজের গভীর ব্যুৎপত্তি আছে বলিয়া তাঁর আন্তরিক ধারণা। চার্জ নিয়া হোস্টেলে আসিবার দিন তিনি যে কেবল তিন বাক্স ওষুধই সঙ্গে আনিয়াছিলেন তা নয়, বোর্ডারদের স্বাস্থ্য হোস্টেলের আবহাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি অনুসন্ধানও করিয়াছিলেন। কলতলার একটা জায়গা শ্যাওলা পড়িয়া অনেক দিন হইতেই বেজায়রকম পিছল হইয়াছিল, প্রত্যেককে তিনি বার বার সতর্ক করিয়া দিলেন কেউ যেন ভুলক্রমেও ওদিক না মাড়ায় কেননা আছাড় পড়িয়া হাত পায়ে 'কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার' হইলে সে বড়ো বিপদের কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন তাড়াতাড়ি ওই জায়গাটিতেই আঁচাইতে গিয়া রামপদ ঠ্যাং ভাঙিয়া বসিল। সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে খবর পৌঁছিতে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া, রামপদর পা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'আমি বাপু তোমাদের এত করে বারণ করে দিলাম ওখানটাতে যেয়ো না, তবু কেন ওখানে গেলে?'

রামপদ অপ্রতিভের মতো আমতা-আমতা করিয়া বলিল, 'ভুলে গিয়েছিলাম স্যার, কথাটা মনে ছিল না।'

'অ্যাঁ' বলিয়া সুপারিনটেন্ডেন্ট মনে মনে কী একটু ভাবিলেন, তারপর রামপদর জন্য দুইটি ওষুধের ব্যবস্থা হইল; একটি টিংচার আয়োডিন-পায়ে মালিশ করিবার জন্য, অপরটি ব্রাহ্মীঘৃত-খাইবার জন্য। প্রতাপবাবু সাশ্চর্যে তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন দেখিয়া ধ্রুববাবু কহিলেন, 'আপনি অবাক হচ্ছেন কেন প্রতাপবাবু? ওর আসল অসুখ তো আর পায়ের ব্যথা নয়, স্মরণশক্তির অভাব-তাই হয়েছে বলেই তো পেছল জায়গায় গিয়ে পায়ে চোট খেয়েছে। কাজেই দুটো রোগেরই ওষুধ দিতে হবে না? স্মরণশক্তির অভাব হলে আমাদের কবরেজি ব্রাহ্মীঘৃতটাতে বেশ কাজ হয়, তাই ওটাই প্রেসক্রিপশন করে দিলাম।'

এই অভিনব প্রেসক্রিপশনে ছেলেরা সকলে এ উহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল; প্রতাপবাবু মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়াছিলেন। সেই হইতে হোস্টেলে সুপারিনটেন্ডেন্টের চিকিৎসা একটা হাসির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হরিহরের রসিকতা শুনিয়া ভীমসেন মনে মনে কী একটু চিন্তা করিল, তারপর সোল্লাসে হরিহরের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, 'ব্র্যাভো ব্রাদার, তোফা কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছিস! ও আর্জি-ফার্জি কিছু নয়, সম্পূর্ণ একটা নতুন মতলব মাথায় এসেছে। দেখিস ওবেলা থেকে আর আমায় খেতের কাজে নামতে হবে না, তোরাই খেটে খেটে মরবি।'

ঠিক সেই সময় সুপারিনটেন্ডেন্টের গলার আওয়াজ শোনা গেল, বোর্ডাররা কে কেমন আছে খোঁজ নিতে তিনি উপরে উঠিয়াছেন। অমনি ভীমসেন তড়াক করিয়া একলাফে বিছানার উপর চিত হইয়া পড়িল, সে বড়ো বপুর ভারে পুরাতন তক্তপোষ জবাব দেয় আর কি! তারপরেই শুরু হইল তার কাশি-ভীষণ কাশি, কড়িবরগা-ফাটানো কাশি!

'ওকী! ওভাবে কাশছে কে?' বলিতে বলিতে উদবিগ্ন সুপারিনটেন্ডেন্ট ধ্রুববাবু ভীমের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ভীমসেনের কাশি তখন চরমে উঠিয়াছে, প্রায় দম বন্ধ হইবার গতিক। সে একটু থামিলে পর ধ্রুববাবু বলিলেন, 'এমন একখানা কাশি বাধিয়ে বসেছ অথচ আমায় একবারও খবর দাওনি।'

বহুকষ্টে কাশির ধমক সামলাইয়া ভীমসেন বলিল, 'কাশিতে আমি ভয় খাইনে স্যার, কিন্তু নিশ্বাস নিতে বুকে যে ব্যথাটা উঠছে তাইতেই আমায় বড়ো কাবু করে ফেলেছে।'

‘বল কী, সঙ্গে সঙ্গে বুকে বেদনারও সৃষ্টি হয়েছে?’ ত্রস্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট তাড়াতাড়ি ভীমের বুকের উপর নিজের ডান কানটা লাগাইলেন, তারপর বুকে দুইটি টোকা এবং পিঠে দুইটি টোকা মারিয়া কহিলেন, ‘হুঁ, যা ভেবেছি তাই।’

‘আপনি স্যার যতটা গুরুতর ভাবছেন ততটা বোধ করি নয়। গলা দিয়ে রক্ত তো কই আগের মতো তত পড়ে না! কেবল কালকে খেতের কাজে মাটি কোপাবার পরই যা আধ কাপটাক পড়েছিল। আজকে তাও কমে গেছে, বোধ করি সিকি কাপটাক পড়েছে।’

ভয়ে নীল হইয়া ধ্রুববাবু কহিলেন, ‘গলা দিয়ে রক্তও পড়ে নাকি আবার? অথচ তুমি বলছ ভাববার কারণ নেই? খেতে কাজ-টাজ তোমার করা চলবে না বাপু, ওসব একদম ছেড়ে দিতে হবে। আমার কথামতো দিন কতক ওষুধ খেলেই তোমায় আমি আরাম করে দেব, ভয় নেই। সকাল-বিকেল তোমায় দু-বেলা খোলা মাঠে বেড়াতে হবে। ভালো কথা, খাচ্ছ কী আজকাল?’

‘ভাত, চচ্চড়ি, ডাল-সবই তো খাই স্যার।’

‘আরে ভাত চচ্চড়ির ভেতর কি আর কোনো সার বস্তু আছে? তোমার চাই পুষ্টিকর খাবার-একবেলা মাংস আর একবেলা ডিম না হলেই নয়। রোসো, হোস্টেল থেকেই তোমার জন্য ওসবের আলাদা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি আমি।’

‘খেতের কাজ কি তবে একটুও করতে পারব না স্যার? সামান্য একটুও না?’

‘পাগল! আস্ত পাগল! এ অবস্থায় খেতের কাজ করতে কোনো ডাক্তার তার রোগীকে অনুমতি দিতে পারে?’

ধ্রুববাবু ঘরের বাহির হইতেই ভীমসেন খবরের কাগজ খুলিয়া দেখিল আজ সিনেমায় তিনটার শোতে কী ফিলম আছে। তারপর খানিকবাদেই চুল ফিরাইয়া সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে সে ‘মাঠের খোলা বাতাস খাইতে’ বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় হরিহরকে উদ্দেশ্য করিয়া একটু মুচকি হাসিতে ভুলিল না।

পরদিন প্রাতে সুপারিনটেন্ডেন্ট সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিলেন, পাশের বারান্দার দিকে নজর পড়ায় লক্ষ করিলেন কে একজন সেখানে বসিয়া হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ওখানে বসে কাঁপছে ও কে?’

‘আজ্ঞে আমি হরিহর। কাল রাত্রে বড়ো জ্বর হয়েছিল, এখনও শরীরটায় কাঁপুনি দিচ্ছে।’

‘হুঁ, ম্যালেরিয়া। বেশ বুঝতে পারছি। এদিকে এসো তো নাড়িটা দেখি।’

হরিহর কহিল, ‘জ্বর এখন নেই স্যার, শুধু শরীরটা বড়ো দুর্বল।’

‘ওই তো দোষ তোমাদের! জ্বর নেই, আসতে কতক্ষণ? ... তাই তো নাড়ি তো বিশেষ সুবিধের নয়। তোমায় বাপু কিন্তু এখন কিছুদিন একেবারে বিশ্রাম নিতে হবে, আজকের দিনটা শুধু দুধ খেয়েই থাকো। দুধে অরুচি? আচ্ছা, কিছু বেদানা আঙুরেরও বন্দোবস্ত করে দেব।’

‘বিকেলে বোধ হয় একটু খেতের কাজ করতে পারি-কী-ই বা খেতি তাতে?’

‘দেখো বাপু, তুমি, রুগি, রুগির মতোই থাকো, ডাক্তারিটা আমাকেই করতে দাও। খেতের কাজ-টাজ এখন তোমায় বেশ কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে।’

হরিহর কোনোমতে আনন্দের হাসি গোপন করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আপনি যখন নিষেধ করছেন তখন তো আর কোনো কথাই হতে পারে না।'

বেলা সাড়ে ন-টার সময় রান্নাঘরের দিকে একটা গোলমালের শব্দ শুনিয়া ধ্রুববাবু সেই দিকে আগাইয়া গেলেন। দেখেন, প্রতাপবাবু রাগে গজরাইতেছেন। সুপারিনটেন্ডেন্টকে দেখিয়া তিনি রাগতস্বরে বলিলেন, 'শুনেছেন মশাই, হরিহর ছোঁড়ার কাণ্ড? আপনাকে ভাঁওতা দিয়ে এসেছে জ্বর হয়েছে, এদিকে রান্নাঘরে এসে বনমালী ঠাকুরকে দুই দাবড়ান দিয়ে এক থালা ভাত আদায় করে ওই আড়ালে খেতে বসেছিল। আমায় দেখেই পালিয়েছে।'

সুপারিনটেন্ডেন্ট বললেন, 'ছেলেটার অসুখ নিশ্চয়ই তবে খুব বেড়ে গেছে প্রতাপবাবু। বেশি অসুখের সময়েতেই এ ধরনের দুষ্টু খিদেটা বাড়ে। ও তো একরত্তি ছেলে, বুড়ো মানুষদের পর্যন্ত এভাবে খেতে দেখা গেছে।' প্রতাপবাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তারপর একদিনের মধ্যেই হোস্টেলে সে যেন এক সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হইল। ধ্রুববাবুর আর কামাই নাই, এঘর হইতে ওঘরে তিনি ডাক্তারি করিয়া ফিরিতেছেন। বিকাল বেলা অসুখ হইয়া পড়ায় পাঁচ-সাত জন বোর্ডার খেতের কাজে উপস্থিত হইতে পারিল না, পরদিন সকালে আরও জনা দশেক।

প্রতাপবাবু সুপারিনটেন্ডেন্টকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, 'দেখুন ধ্রুববাবু, অসুখবিসুখ সমস্তই ছোঁড়াদের কারসাজি। আমার খুব বিশ্বাস খেতের কাজ ওদের আর ভালো লাগছে না, তাই সব মিথ্যে অসুখের ভাঁওতা দিচ্ছে। আর তা ছাড়া ওদের খাওয়ার এবং বিশ্রামের আপনি যেরকম রাজসিক ব্যবস্থা করছেন তাতে ভবিষ্যতে শিগগির যে ওদের অসুখ সারবে তাও আমার মনে হচ্ছে না।'

ধ্রুববাবু বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'বড়োই দুঃখিত হলাম আপনার কথা শুনে প্রতাপবাবু! কোনটা আসল অসুখ আর কোনটা তা নয়, এ বোঝবার ক্ষমতাও আমার নেই নাকি! আপনি কি বলতে চান আমি হাতুড়ে ডাক্তার?'

একথার পর আর কথা চলে না, প্রতাপবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে রোগীর সংখ্যা হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিল, প্রতাপবাবু প্রমাদ গণিলেন। দু-দিন পরে আবার তিনি সুপারিনটেন্ডেন্টকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখুন ধ্রুববাবু, আমার ঠাকুরদা মরবার আগে একটা স্বপ্নাদ্য ওষুধের কথা বলে গিয়েছিলেন। যেমন-তেমন ক্ষেত্রে সে ওষুধ ব্যবহার করবার বারণ আছে বলেই এ ক-দিন তার সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস এখন সেটা কাজে লাগাবার সময় হয়েছে-দেখছেন না হোস্টেলে প্রায় এপিডেমিকের অবস্থা। অনুমতি করেন তো সেটা একবার পরখ করে দেখি।'

ধ্রুববাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, 'সে কখনো হতে পারে? ছেলেরা রয়েছে আমার চিকিৎসাধীনে, আর আপনি করবেন ওষুধের ব্যবস্থা! চিকিৎসা বিভ্রাট হবে যে-সে বড়ো ভয়ানক জিনিস।'

'আহা হা, আপনি ভুলে যাচ্ছেন এটা যে স্বপ্নাদ্য ওষুধ। এতে কাজ দেবেই, দিতে বাধ্য- বহু 'কেসে' দিয়েছে। আমি জোর করে বলতে পারি এ ওষুধে আমি ছেলেদের আরাম করে তুলতে পারবই পারব।' প্রতাপবাবু বাঁ-হাতের তেলোয় ডান হাতের মুঠোর আঘাত করিলেন।

অনেক বাগবিতণ্ডার পর সুপারিনটেন্ডেন্ট অবশেষে রাজি হইলেন; প্রতাপবাবু তখন রান্নাঘরে গিয়া খিল দিলেন স্বপ্নাদ্য ওষুধ তৈরির উদ্দেশ্যে।

স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকারী নয়, অথচ সব চাইতে তেতো, সব চাইতে বিস্বাদ এবং সব চাইতে দুর্গন্ধ যে কয়টি জিনিস তাঁর জানা ছিল গাঁদাল পাতার রসে সেগুলিকে গুলিয়া প্রথমে তিনি কয়েকটি জাগ ভরতি করিলেন। তার পর ডান হাতে তারই একটি জাগ এবং বাঁ-হাতে মেজারগ্লাস নিয়া সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে আসিয়া তিনি জানাইলেন ওষুধ প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রথমেই ঢুকিলেন তাঁরা ভীমসেনের ঘরে। রয়াল সিনেমা হাউসের 'মুক্ত বায়ু'তে এতক্ষণ 'কিং কং' দেখিয়া আসিয়া এইবার সে একমনে স্পেশাল ডায়েট মাংসের ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ দেখিল মূর্তিমান বিভীষিকার মতো জাগহস্তে প্রতাপবাবু ঘরে ঢুকিলেন, সঙ্গে ধ্রুববাবু। ধ্রুববাবুই তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলেন, বলিলেন, 'বাবা গোপাল, প্রতাপবাবুর ঠাকুরদার দেওয়া একটি স্বপ্নাদ্য ওষুধ আছে সেটা আজ আমরা একবার পরীক্ষা করব। এক ডোজ খেলেই নাকি তুমি সদ্য উপকার পাবে।'

এই ভয়াবহ প্রস্তাবে সেই কুরুক্ষেত্র-বিধ্বংসী বীরবরের মুখ এক নিমেষে জিয়োমেট্রির বিন্দুর মতো এতটুকু হইয়া গেল। কোনোমতে ঢোঁক গিলিয়া সে বলিল, 'কেন স্যার, আপনার ওষুধেই তো দিব্যি ফল পাচ্ছি।'

একটু গর্বের সহিত ধ্রুববাবু বলিলেন, 'পাচ্ছ নিশ্চয়ই সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে ধীরে ধীরে, এ ওষুধটাতে নাকি কাজ হবে সঙ্গেসঙ্গে।'

প্রতাপবাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'নিজের মুখে গর্ব করতে চাই না, ফলেন পরিচীয়তে।' মেজার গ্লাসটি পূর্ণ করিয়া সেটি তিনি ভীমের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

হায়রে, আসল দুর্যোধন আসিয়া আমাদের ভীমসেনকে এক ঘা গদার বাড়ি মারিল না কেন? তাতেও সে ততখানি কাহিল হইত না যতখানি হইল সে এক ডোজ ওষুধ সেবন করিয়া। অন্নপ্রাশনের ভাতকেও যে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়।

ধ্রুববাবু সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী গোপাল, কেমন ঠেকছে?'

'অত্যন্ত খারাপ স্যার। এতক্ষণ শুধু বুকের এক পাশটাই ব্যথা করছিল, ওষুধ খাওয়া মাত্র দু-পাশেই ব্যথা শুরু হয়েছে।'

ধ্রুববাবু একেবারে নিবিয়া গেলেন, বলিলেন, 'তাই তো প্রতাপবাবু, হিতে বিপরীত করে বসলেন নাকি?'

প্রতাপবাবু বলিলেন, 'কোনো ভাবনা নেই, নির্ভয়ে থাকুন। প্রথম এগারো ডোজ ওই রকমই মনে হবে বটে, কিন্তু বারো ডোজের পর থেকেই আসল উপকার স্পষ্ট বোঝা যাবে। দশ মিনিট বাদে বাদে এক-এক ডোজ পড়বে।'

ভীমসেন মুখ কালি করিয়া করিল, 'বা-রো ডো-জ! দ-শ-মি-নি-ট বা-দে-বা-দে?'

'হাঁ, সেইরকমই নিয়ম কিনা, ঠাকুরদা বলে গেছেন। তোমার রিস্ট ওয়াচটা বার করো-সময়টা নোট করতে হবে তো!'

দ্বিতীয় ডোজ ওষুধ খাইবার পর ভীমসেন একেবারে লাফাইয়া উঠিল, 'আশ্চর্য ওষুধ স্যার, এ যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বুকের ব্যথা আমার সম্পূর্ণ উবে গেছে। গত

এক বচ্ছরে একদিনের তরেও আমি এতখানি সুস্থ বোধ করিনি। আর ওষুধে দরকার হবে না।' নবলব্ধ স্বাস্থ্যের আনন্দে ভীমসেন ভীমবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ধ্রুববাবু একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন, আনন্দের আবেগে প্রতাপবাবুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এ ওষুধের ফরমুলাটা আমায় লিখে দিতেই হবে প্রতাপবাবু, না দিলেই চলবে না।'

'হ্যাঁ, তা দেব বই কী! আগে চলুন, আপনার অন্যান্য রোগীদের দেখে আসি।'

স্বপ্নাদ্য ওষুধের আশাতীত ফল-একরাত্রের মধ্যেই হোস্টেল হইতে সমস্ত রকমের অসুখ কর্পূরের মতো উবিয়া গেল। পরদিন সকালে খেতের কাজে আর একটি বোর্ডারও অনুপস্থিত নাই।

ওষুধের ফরমুলা দিতে কিন্তু প্রতাপবাবু আজ কাল বড়োই গড়িমসি লাগাইলেন। শেষটায় ধ্রুবপদবাবু ভাবিলেন-স্বপ্নাদ্য ওষুধ কিনা কাজেই ভিতরকার রহস্য ভাঙিবার ইচ্ছা প্রতাপবাবুর আদবেই নাই।

*(একটা ইংরেজি গল্পের ছায়া আছে)*

*মাঘ ১৩৪০*






# সুনির্মল বসু

সকাল থেকেই বেশ মেঘ করেছে।

বেলা তখন আটটা হবে-আমি ঘরে বসে একমনে খবরের কাগজটা উলটেপালটে দেখছি এমন সময় বন্ধুবর মোহনলাল এসে হাজির।

বোর্ডিংয়ের চাকর জগন্নাথকে ডেকে বললাম, 'ওরে চট করে দু-কাপ চা আর কিছু গরম জিলিপি নিয়ে আয় শিগগির।'

মোহনলাল বলল, 'ওহে, আমি এইমাত্র চা খেয়ে আসছি, শুধু তোমার জন্যেই আনতে দাও।'

'আরে, সে কি হতে পারে নাকি! আর এক কাপ চা খেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, দিনটা আজ বেশ ঠান্ডা আছে।'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোহনলাল বলল, 'দিনটা আজ ঠান্ডা আছে বলেই তো একটা মতলব নিয়ে তোমার কাছে এলাম। আজ রবিবার আছে, চলো কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যাক।'

মতলবটা আমার কাছে নেহাত মন্দ লাগল না। মোহনলালের সঙ্গে অনেক দিনই এরকম আমি ঘুরে বেড়িয়েছি! গত রবিবারেও আমরা ব্যারাকপুরের এক বাগানে মাছ ধরতে গেছিলাম।

আমি বললাম, 'কোথায় যাবে মনে করেছ? এমন জায়গায় চলো যেখানে গাঁটের পয়সাও বেশি খরচ হয় না অথচ কলকাতার বাহিরেও ঘুরে আসা যায়।'

মোহনলাল বলল, 'ডায়মন্ড হারবার লাইনে 'গড়িয়া' বলে একটা জায়গা আছে, জায়গাটা শুনেছি খুব সুন্দর। সেখানকার হাটও নাকি একটা দেখবার জিনিস। কলকাতার খুব কাছে, খরচেরও বেশি ভয় নেই।'

আমি বললাম, 'কখন ফিরবে?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মোহনলাল বলল, 'এখন সোয়া আটটা; বারোটার মধ্যে আমরা ফিরব নিশ্চয়ই। আজ রবিবার, তোমাদের বোর্ডিংয়ের খাওয়া-দাওয়া হতে আজ অনেক দেরি হবে; কাজেই অসুবিধার কোনো কারণ নাই।'

ততক্ষণে চা আর জিলিপি এসে গেছে। দু-মিনিটের মধ্যে সেগুলির সুব্যবস্থা করে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

ভাগ্য ভালো। শিয়ালদায় এসে দেখলাম ডায়মন্ডহারবারের গাড়ি গার্ড সাহেবের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম, গাড়িও ছেড়ে দিল।

বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, ট্রেন হুস হুস করে ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে। যাদবপুর ছাড়িয়ে যেতেই আমাদের চোখে পড়ল দু-ধারের দিগন্তবিস্তৃত নীচু জমি। ধু-ধু করছে ফাঁকা মাঠ। শোনা যায় বর্ষাকালে এই সব জমিতে রীতিমতো বান ডাকে, তখনকার রূপ দেখলে কেউ ধারণা করতে পারে না এখানে কোনোকালে মাঠ ছিল। মনে হয় ট্রেন যেন কোনো সীমাহীন নদীর সেতুর উপর দিয়ে চলেছে।

পরের স্টেশনই গড়িয়া। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। ছোট্ট স্টেশন। ভদ্রলোকের মধ্যে আমি আর মোহনলালই নামলাম; আর যারা নামল তাদের মধ্যে ছিল কয়েকটি জেলে, কয়েকটি উড়ে, একজন ডাকহরকরা, আর কয়েকটি লুঙিপরা মুসলমান কারিগর।

গাড়ি থেকে নামতেই হাঁপাতে হাঁপাতে একটি রোগামতো ভদ্রলোক এসে আমাদের বললেন, 'আপনারা তো কলকাতা থেকে আসছেন?' মোহনলাল আর আমি একসঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোকটির গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়ানো। এতক্ষণ বোধ হয় খালি গায়েই ছিলেন, হঠাৎ অপরিচিত দুটি ভদ্রলোকের ছেলেকে দেখেই বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরে ওই কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়েছেন।

তিনি বললেন, 'মহেন্দ্রবাবু এলেন না?' মনে মনে বুঝলাম ভদ্রলোক ভুল করেছেন। বেশ কৌতুক অনুভব করলাম। চোখের ইশারায় মোহনলালকে কোনো কথার উত্তর দিতে মানা করে আমি বললাম, 'না, বিশেষ কাজে আটকে পড়ায় তিনি আসতে পারলেন না।'

ভদ্রলোক তখন আমাদের আপ্যায়িত করে ডেকে নিয়ে পথ দেখিয়ে তাঁর বাড়িতে চললেন। ভদ্রলোক একটু এগিয়ে যেতেই আমি মোহনলালকে খুব আস্তে আস্তে বললাম, 'দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, বিপদ বুঝলে সটকে পড়া যাবে।'

মোহনলালও মুচকি হেসে আমার কথায় সায় দিল।

মাঠের রাস্তা ধরে আমরা চলেছি। মাঝে মাঝে পথের দুই ধারে ঝোপড়া বাঁশের ঝাড় আর তার পাশে এঁদো পুকুর। জনশূন্য গ্রাম। দু-এক জায়গায় শুধু দেখলাম কয়েকটি ছেলে পুকুরের জলে নেমে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

অনেকখানি পথ হেঁটে আমরা একটা টিনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। বাইরের ঘরে আমাদের বসিয়ে ভদ্রলোকটি ছুটে ভিতরে গেলেন। টের পেলাম ভিতরে বেশ সাড়া পড়ে গেল। দুই একটি ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে এসে কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেখতে লাগল। বোধ হল যেন আশেপাশের জানলা দিয়ে বাড়ির মেয়েরাও উঁকিঝুঁকি মারছে।

ব্যাপারটা মন্দ নয়। আমি আর মোহনলাল মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না! দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়!

ছোট্ট একখানা বৈঠকখানা ঘর। বেশ ফিটফাট করে সাজানো। তক্তপোশের উপর একটা পরিষ্কার সাদা চাদর বিছানো। এক পাশে একটা টেবিল, তার উপরে অনেকদিনের পুরোনো একখানা আয়না, একধারে একটা ছোটো টাইমপিস ঘড়ি টিক টিক করছে। টিনের দেয়ালে কতগুলি রংচঙে ক্যালেন্ডার টানানো, ঘরের এক কোণে একটা কাপড়-জড়ানো লম্বা মতন কী জানি ঝুলছে; মনে হল বোধ হয় এস্রাজ।

আমরা জুতো খুলে তক্তপোশের উপর উঠে বসলাম।

ডুরে শাড়ি পরা নোলক নাকে একটি ছোট্ট মেয়ে হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। মোহনলাল বলল, 'খুকি, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার?'

আঁচল ঘুরিয়ে খুকি এক ছুটে ভিতরে চলে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে ভদ্রলোকটি দু-টি নেয়াপাতি ডাব কেটে এনে আমাদের সামনে ধরে বললেন, 'এখন এই ডাবের জলটুকু খান, চা হচ্ছে। চা খেয়ে তারপর মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করা যাবে।'

আমাদের দম ফেটে হাসি বেরিয়ে আসছিল, মোহনলাল হাসি চাপতে না পেরে খুক খুক করে কাশতে আরম্ভ করে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই চা এল, তার সঙ্গে ফুলকো ফুলকো লুচি আর আলুর দম। বিনা বাক্যব্যয়ে খাবারগুলো সাবাড় করে ফেললাম।

তারপর মেয়ে দেখার পালা। লাল রঙের শাড়ি পরা একটি খুকির হাত ধরে ভদ্রলোক আমাদের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'নাও মা, প্রণাম করো।'



খুকি আমাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। হাসি চেপে মোহনলালের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমারও মারাত্মক রকমের হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হেসে ফেললেই সব মাটি।

যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর নামটি কী?'

ভদ্রলোক খুকির দিকে চেয়ে বললেন, 'বলো মা, নাম বলো।'

মুখ নীচু করে অতি অস্পষ্ট ভাষায় খুকি বলল, 'নিস্তারিণী দাসী।'

মোহনলাল বলল, 'বাঃ, বেশ নাম।'

আমি ভদ্রলোকটিকে বললাম, 'আচ্ছা, এখন ওকে ভিতরে নিয়ে যান।'

ভিতরে আর নিয়ে যেতে হল না, চৌকাঠ পর্যন্ত ধীরে ধীরে গিয়ে এক লাফে খুকি অন্দরে চলে গেল।

আমরা বললাম, 'এখন তবে উঠি।'

ভদ্রলোকটি হাতজোড় করে বললেন, 'তা কি হতে পারে! এই ভর দুপ্পুর বেলা, ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না। আমি কিছুতেই ছাড়ব না। চান করে খেয়েদেয়ে খানিক বিশ্রাম করে বিকেল বেলার দিকে যাবেন।'

মনে মনে ভাবলাম-বোর্ডিংয়ে গিয়ে তো সেই কলাইয়ের ডাল আর পুঁই শাকের ছ্যাঁচড়া খেতে হবে, এমন খাসা ভোজটা ছাড়তে যাই কেন? মোহনলালের মনেরও সেই তুরীয়

অবস্থা।

কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোকটি একশিশি জবাকুসুম তেল আর সাদা ধবধবে দু-খানা তোয়ালে এনে বললেন, 'আমাদের বাড়ির পুকুরের জল খুব চমৎকার, চান করে বেশ আরাম পাবেন।'

আচ্ছা করে তেল মেখে স্নান করা গেল। বেশ পুকুর, কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে উঠে পড়লাম।

স্নান সেরে আবার বাইরের ঘরে বসে আছি। ভদ্রলোকটি ভিতরে খাবার ব্যবস্থা করতে গেছেন, এমন সময় ডাকপিয়োন একখানা পোস্টকার্ড দিয়ে চলে গেল।

পরের চিঠি পড়া অন্যায়, কিন্তু পোস্টকার্ডের দু-একটা কথা হঠাৎ চোখে পড়ে যেতেই বাকি সবটুকু পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। দেখলাম চিঠিতে লেখা আছে-

বিহিত সম্মানপুঃরসর নিবেদনমিদং-

মহাশয়, রবিবার আপনার কন্যাকে দেখিতে যাইব-এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু বড়োই দুঃখের বিষয় ঘটনাচক্রে সেদিন আর যাইতে পারিব না, সোমবার সকালের গাড়িতে অবশ্যই যাইব। শ্রীমান হরিমোহন ও কালীচরণ আমার সাথে যাইবে।

আমার বিনীত নমস্কার জানিবেন।

বশংবদ

শ্রীমহেন্দ্রলাল মজুমদার

চিঠিখানি পড়ে জলের মতো সমস্ত জিনিসটা বুঝতে পারলাম। ভাগ্যিস চিঠিটা ভদ্রলোকের হাতে পড়ে নাই, তাহলেই হয়েছিল আর কি!

চিঠিখানা গোপনে পকেটে পুরে ফেললাম। মোহনলালকে বললাম, 'দেখ, যতক্ষণ এখানে আছি, তুই হরিমোহন আর আমি কালীচরণ-বুঝলি!'

বেলা অনেক হয়েছে। খিধের চোটে নাড়ি টনটন করছে। ভদ্রলোকটি বারে বারে এসে হাত জোড় করে বলে যাচ্ছেন, 'আর একটু অপেক্ষা করুন, মাংসটা প্রায় হয়ে এল।'

যথাসময়ে খাওয়ার ডাক পড়ল। ভাত কই! এ যে পোলাও, সারি সারি বাটিতে ডাল, কই মাছের কালিয়া, গলদা চিংড়ির ঝোল, মাংসের কোরমা, ভাজাভুজি, অম্বল, তারপর এল দই আর সন্দেশ-।

ভদ্রলোকটি বললেন, 'পায়েসটা আর হয়ে উঠল না কিছুতেই।'

আমি বললাম, 'না না এই যথেষ্ট, এত আয়োজনেরও কোনো দরকার ছিল না।'

ছাগল গেলার পর অজগর সাপের যে দশা হয় আমাদের দশাও তাই হল, একেবারে 'নট নড়নচড়ন'।

সমস্ত দুপুরটা পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমালাম। বিকেল পাঁচটা তেইশ মিনিটে কলকাতার গাড়ি। এই গাড়িতেই আমরা ফিরব।

বিকেলেও ভদ্রলোক জলখাবার খেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু কাঁহাতক আর খাওয়া যায়! দুই কাপ চা খেয়ে আমরা স্টেশনের দিকে হাঁটা দিলাম। ভদ্রলোকটিও সঙ্গে চললেন আমাদের গাড়িতে তুলে দিতে।

যথাসময়ে গাড়ি এল, চড়ে পড়লাম। ভদ্রলোকটি হাত জোড় করে আবার বিনয় জানিয়ে বললেন, 'অনেক কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না; মহেন্দ্রবাবু এলে খুবই সুখী হইতাম।'

গাড়ি ছেড়ে দিল, আমি জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললাম, 'ওঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনার একখানা চিঠি ছিল, দিতে ভুল হয়ে গেছে।' এই বলে হাত বাড়িয়ে সেই পোস্টকার্ড-খানি হাতে গুঁজে দিলাম।

হুস হুস করতে করতে গাড়ি স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেল।

*বৈশাখ ১৩৪১*






# উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমি যখন তোমাদের মতো ছিলাম, অর্থাৎ আমার বয়স যখন তোমাদের বয়সের মতো ছিল, তখন আমাদের বাড়িতে একটি আত্মীয় মাঝে মাঝে আসতেন-তাঁর নাম ধরো, 'রায় মহাশয়'। রায় মহাশয় ভারি আমুদে লোক ছিলেন; বয়স ছিল আমার বয়সের মতো বেশি, কিন্তু মনটি ছিল তোমাদের মনের মতো সরল। মুখে হাসি লেগেই থাকত, আর কণ্ঠে গুনগুন শব্দে গান। তামাক খেতে তিনি খুব ভালোবাসতেন; ভুড়ুক ভুড়ুক করে সর্বদাই তামাক খেতেন, আর তার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের মজার মজার গল্প বলে শোনাতেন।

আজ রায় মহাশয়ের কাছে শোনা একটা গল্প মনে পড়ছে। সন্দেশের মারফত তোমাদের সে গল্পটি শুনিয়ে দিই, পুজোর সময়ে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে সেটি বলে হয়তো একটু আনন্দ পাবে।

এক ছিল পশ্চিমা সওদাগর, বয়স ছিল তার কম-বেশি ষাট বছর। দীর্ঘাকৃতি কৃশ মানুষটির মন ছিল অত্যন্ত সরল; কিন্তু সেই মনের মধ্যে বুদ্ধি বলে যে জিনিসটি থাকে সেটি ছিল একেবারে ভোঁতা, অর্থাৎ সাদা কথায় লোকটি ছিল নেহাত বোকা।

ব্যাবসাতে লোকসান তাকে প্রায়ই দিতে হয়। কাজ শিখতে শিখতে আর পাকা হতে হতেই সে বুড়ো হয়ে গেল। লোকে কিছু বললে বলে, 'ব্যাবসা কি সহজ জিনিস রে ভাই? লাভ হঠাৎ করলেই হল আর কি!' বুদ্ধি যে তার ধারালো নয়, এ কথা কিন্তু প্রাণান্তে কারও কাছে সে স্বীকার করে না।

সকাল বেলা তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে দিল্লির চাঁদনি চক বাজারে গিয়ে সে তার ছোটোখাটো দোকানটি খুলে বসে। তারপর সারাদিন সেখানে বেচাকেনা করে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি এসে স্নান করে কিছু খাবারদাবার খেয়ে সে তাড়াতাড়ি বই নিয়ে বসে। বই পড়া তার ভারি শখের জিনিস।

একদিন সন্ধ্যার পর মামুলি নিয়ম মতো সে বই নিয়ে বসেছিল। সম্মুখে কাঠের ফ্রেমের উপর একটি বড়ো আকারের উর্দু শ্লোকের বই খোলা; ডান দিকে লম্বা গড়গড়ায় তাওয়া চড়ানো; বাঁ-দিকে কাঠের ডেলকোয় (পিলসুজে) প্রদীপ জ্বলছে। সে অনেক দিনের কথা, তখন বিজলি বাতির যুগ নয়, বাড়ি বাড়ি তেলের প্রদীপই জ্বলত।



সওদাগর মনের আনন্দে দুলে দুলে বই পড়ছিল, একটা শ্লোক পড়ে হঠাৎ তার দোল থেমে গেল, মনের মধ্যে ভারি খটকা লাগল। মনে হল-তাই যদি হয়, তাহলে তো অনেক লোকেই তার বিষয়ে অনেক কথাই ভেবেছে! মনে করেছে তার তত বুদ্ধি নেই, মনে করেছে সে একটু বোকা!

যে শ্লোকটা পড়ে সে উদবিগ্ন হয়ে উঠেছিল তার অর্থ হচ্ছে-যে ব্যক্তির দাড়ি দু-মুঠোর চেয়েও বেশি লম্বা হয় সে হয় বোকা। এখন সওদাগরের দাড়ির প্রতি একটু বিশেষ যত্ন ছিল, এবং তার ফলে দাড়িটি একটু লম্বাই ছিল। কিন্তু তাই বলে কি দু-মুঠোর চেয়েও বেশি?

আগ্রহে এবং উৎকণ্ঠায় দু-হাতের দু-মুঠো পাশাপাশি রেখে সওদাগর তার দাড়ি চেপে ধরল; চোখের দিকে বদ্ধ মুঠো তুলে ধরে দেখল, মুঠো ছাড়িয়েও পনেরো-ষোলো গাছা চুল ইঞ্চি দেড়েক বেরিয়ে রয়েছে। সর্বনাশ! তাহলে তো এ শ্লোক যারা পড়েছে, তারা তাকে নির্বোধ বলেই মনে করে। লজ্জায় ও দুঃখে সওদাগরের দু-চোখে জল ভরে এল। লজ্জা কেন বুঝতেই পারছ; দুঃখ-যদি এই এত সাধের দাড়িকে ছোটো করতে হয়! কিন্তু তাই বলে দাড়ির খাতিরে তো আর বুদ্ধিকে ছেঁটে রাখা চলে না! দাড়ি সরেস জিনিস বটে, কিন্তু বুদ্ধি আরও সরেস! ও ছাঁটতেই হবে।

হাতের কাছে কাঁচি-টাঁচি কিছু ছিল না, বাড়িতেই ছিল কি না সন্দেহ। কী করা যায় তাহলে? কী করা যায়? হঠাৎ পড়ল প্রদীপের উপর দৃষ্টি। ঠিক হয়েছে, পুড়িয়ে ফেলা যাক-কিন্তু দুর্নাম সৃষ্টিকারী যেটুকু দূষিত অনাবশ্যক অংশ ঠিক ততটুকুই, মুখের শোভাবর্ধনকারী নিরীহ যে অংশ তার একটি চুলও নয়!

প্রাণপণে শক্ত করে দু-হাতের মুঠোয় দাড়ি চেপে ধরে সন্তর্পণে মুখটি বাড়িয়ে সওদাগর দাড়ির ডগাটি প্রদীপের শিখায় সমর্পণ করল। শুকনো চুলে আগুন লাগতেই পুড়ে উঠল। তারপর চুড়বুড় চুড়বুড় করে এগোতে এগোতে যেই প্রথম মুঠোয় গিয়ে ছ্যাঁকা লেগেছে, অমনি সে 'আঃ ' শব্দ করে হাত ছেড়ে দিয়েছে। তারপর চড়বড় চড়বড় করে পুড়তে পুড়তে দ্বিতীয় মুঠোর গায়ে আগুন লাগতেই 'গেলুম' বলে সে হাতও ছেড়ে দিল। তখন আর কি! দেখতে দেখতে এক নিমেষে প্রায় সমস্ত দাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল! দু-হাত দিয়ে আগুন নেভাতে গিয়ে একটু একটু যা দাড়ি রয়ে গেল, তাতে মুখের শোভা হল অপূর্ব!

নিকটেই ছিল সওদাগরের মেয়ে, সে বাপের কাতরোক্তি শুনতে পেয়ে ছুটে এল।

'কী হল বাবা?'

'কিছু নয় মা!' যন্ত্রণায় কিন্তু দুই চোখ জলে ভরা।

'ওকী বাবা! তোমার দাড়ি কী হল?'

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সওদাগর বলল, ‘কিছু হয়নি, ঝরে গেছে।’

‘ঝরে গেছে? কী করে ঝরল?’

‘দাড়িতে ওষুধ লাগিয়েছিলাম, তাই ঝরে গেছে।’

‘উঁ! গন্ধ কীসের? কী বিশ্রী চুলপোড়া গন্ধ!’

‘ও ওষুধের গন্ধ। চুল কি পোড়ে মা? পোড়ে না। পুড়লেও এত দূর থেকে কখনো পোড়ে? যা তো মা, শিগগির একটু নারকেল তেল নিয়ে আয়। উঃ , বড্ড জ্বলছে!’

‘কী জ্বলছে বাবা, দাড়ি?’

‘দাড়ি নয় মা, মাথা। মাথা ঠান্ডা হলে দাড়িও ঠান্ডা হবে!’

সওদাগরের মেয়ে যখন নারিকেল তেল নিয়ে এসে হাজির হল তখন সওদাগর বইখানা বেঁধে ফেলেছে। মেয়ের হাতে সেটা দিয়ে বলল, ‘এটা আলমারিতে তুলে রাখগে মা, তোরা কখনো যেন খুলে পড়িসনে।’

মেয়ে চলে গেলে দাড়িতে তেল মাখিয়ে সওদাগর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে মনে বলল, ‘বইয়ে যে কথা লেখে তা কি আর মিথ্যে লেখে! দু-মুঠোর বেশি লম্বা যাদের দাড়ি সত্যিই দেখছি তারা বড়ো বেওকুফ হয়।’

*আশ্বিন ১৩৪১*




## অখিল নিয়োগী

দু-বছর বাদে পুজোর ছুটিতে সমর দেশে এসেছে।

অনেক রাত্তিরে স্টিমার এসে ঘাটে পৌঁছেছিল, তারপর সেখান থেকে নৌকো করে বাড়ি এসেছে আরও বেশি রাতে। কাজেই তখন আর সঙ্গীসাথি কারও সঙ্গে দেখা করবার ফুরসতও হয়নি, উপায়ও ছিল না।

ভোর হতেই সে চোখ কচলে বট গাছতলার আড্ডার দিকে রওনা হচ্ছিল-ঠাকুমা পেছু ডেকে বললেন, 'সেই শেষ রাত্তিরে এলি, কিছু হাতে তুলে দিতে পারলুম না, কাক না ডাকতেই আবার বাড়ি ছেড়ে কোথায় চললি?'

সমর বলল, 'বা রে! দু-বছর পর বাড়ি এলাম-গণেশ, বঙ্কা, ছোটকা, পটলা ওদের সঙ্গে দেখা না করে বুঝি তোমায় পাহারা দিতে বসব?'

মিশি দেয়া ফোকলা দাঁতে ফিক করে হেসে ঠাকুমা বললেন, 'তেমন ভাগ্যি কি আমার হবে যে তোদের রাতদিন আমার চোখে চোখে রাখতে পারব? দিব্যি বড়ো বড়ো ঢ্যাপের মোয়া তৈরি করে রেখেছি। দু-বছর তো আর তোর হাতে তুলে দিতে পারিনি-আয় খাবি আয়!'

মাথা নেড়ে সমর বলল, 'কবে ছেলেবেলায় ঢ্যাপের মোয়া খেতাম, তাই তুমি মনে করে বসে আছ ঠাকুমা? কলকাতায় ফিরপোর কেক খেলে আর তুমি কথা কইতে পারতে না। এখনও আমার সুটকেসে এক ডজন আছে।'

এই বলে সে হনহন করে বটতলার আড্ডার দিকে রওনা হল।

ছেলেদের মজলিশ এরই মধ্যে জমে উঠেছে। বঙ্কা বলল, 'কী রে সমর, মহরমের লেঠেলের মতো ঘাড় ছাঁটাই করেছিস কেন? লাঠি খেলতে শুরু করলি নাকি?'

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সমর বলল, 'পাড়া গাঁয়ে থাকিস কিনা, একে বলে 'ববড হেয়ার'। কলকাতার বড়ো বড়ো সেলুনে লাট সাহেব থেকে শুরু করে আমরা পর্যন্ত সবাই সেইখানে চুল কাটাই। যদি যাস কখনো আমাদের রাজধানীতে তো দেখিয়ে দেব।'

আর একটু বেলা হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে দলের মোড়ল গণেশ এসে হাজির। বলল, 'এরই মধ্যে সবাই জুটে গেছিস? বেশ-বেশ! তাহলে ওই 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ' পালাই ঠিক হল। আজ সন্ধ্যে বেলা সবাই আমাদের বৈঠকখানায় যাবি, সেইখানে কে কোন পার্ট নেবে ঠিক করা যাবেখন।' সমর অবাক হয়ে বলল, 'সে কী রে গণেশ? 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ' আবার কী?'

গণেশ তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে, সমর যে, কখন এলি? আজই বুঝি? বেশ, বেশ! তোর জন্যেও আমি পার্ট ঠিক করে রেখেছি।'

সমর বলল, 'কীসের পার্ট? আমি তো ব্যাপার কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে!'

গণেশ বিজ্ঞের মতো মাথাটা একবার দু-দিকে দুলিয়ে বলল, 'আরে, আস্তে আস্তে সবই বুঝতে পারবি। আমরা পুজোর পরই 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ' অভিনয় করব যে!'

উৎসাহে সমর লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরে বলিস কী? তবে তো চমৎকার আইডিয়া বের করেছিস! কলকাতার শিশির ভাদুড়ির সমস্ত প্যাঁচ আমার মুখস্থ আছে, যখন যেটা বলবি লাগিয়ে দেব। শুনবি-?'

এই বলে সমর উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটো ওপরে তুলে-চিৎকার শুরু করে দিল-

'রঘুয়া, রঘুয়া, রঘুবীর নহি আর-'

বামুন পাড়ার দীনু খুড়ো দাঁতন করতে করতে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ একটি ছোকরাকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওরে ছেলেটাকে পেঁচোয় পেলে নাকি রে? তোরা কেউ ছুটে গিয়ে চাঁড়াল পাড়া থেকে মেঘু ওঝাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

ব্যাপার শুনে সমরের সমস্ত রস এক মুহূর্তে জমে গেল।

গণেশ সবাইকে ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, 'চুপ! এখানে কারও আর কিছু বলবার দরকার নেই; নইলে দীনুখুড়ো এবার সত্যি সত্যিই মেঘু ওঝাকে ডেকে নিয়ে আসবে। সন্ধ্যে বেলা আমার বাসায়-মনে থাকে যেন। এখন যে যার বাড়ি যাও।'

সেদিন অসময়ে শিশু মজলিশ ভেঙে গেল বটে, কিন্তু আবার গম গম করে জমে উঠল সন্ধ্যে বেলা গণেশের পড়বার ঘরে।

বঙ্কু বলল, 'ষাঁড়ের মতো আমি কিছুতেই চেঁচাতে পারব না, আমায় অন্য পার্ট দাও গণেশ।'

সমর অবাক হয়ে বলল, 'ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে হবে-সে আবার কীরকম পার্ট?'

গণেশ তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সবাই চুপ করো, আমি ব্যাপারটা তোমাদের বুঝিয়ে বলি।'

দলপতির আদেশে ছেলের দল অনর্গল বাক্যস্রোত বন্ধ করল।

গণেশ বলল, 'হ্যাঁ, আমরা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গই অভিনয় করব। এতে কী কী ধরনের পার্ট আছে তোমাদের শোনাচ্ছি।-

'একদল লোক দরকার যারা কুম্ভকর্ণের কানের কাছে প্রাণপণ ঢাক বাজাবে। তারপর দরকার একদল লোক যারা মরিয়া হয়ে ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে পারবে। এমন একটি লোক দরকার যে কুম্ভকর্ণের চুল ধরে ক্রমাগত দোল খাবে, আর একটি ছোটো ছেলে চাই যে কুম্ভকর্ণের নাকের ভেতর সুড়সুড়ি দেবে। তারপর চাই একজন রাক্ষসী যে কেঁদে তার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সব চাইতে বড়ো কথা-কে সাজবে কুম্ভকর্ণ?'

পটলা লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমি হব কুম্ভকর্ণ।' গণেশ বলল, 'চুল ধরে দোল খেলে তুমি সহ্য করতে পারবে?' পটলা ইতস্তত করে বলল, 'না।'

গণেশ বলল, 'নাকে সুড়সুড়ি দিলে চুপচাপ সয়ে থাকতে পারবি?'

পটলা বলল, 'না।'

গণেশ রেগে-মেগে বলল, 'যাও তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।'

বঙ্কা বলল, 'কেন, ওপাড়ার গোবর্ধন রয়েছে-! যেমন চেহারা তেমনি তার সহ্য করবার ক্ষমতা। সেবার 'কর্ণবধে' কাটা সৈনিকের পার্ট নিয়েছিল। এক ঘণ্টা স্টেজের ওপর মরে পড়ে থাকবার কথা। ঠিক ঠিক ছিল, একটুকু নড়েনি। ড্রপ পড়লে যখন উঠে দাঁড়াল তখন দেখা গেল ছারপোকা আর মশায় তার পিঠ আর পা ফুলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে এক চুলও নড়েনি।'

সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, গোবর্ধনই কুম্ভকর্ণের পার্ট করার উপযুক্ত লোক।

তারপর যথারীতি বাদবাকি ভূমিকাগুলি অন্যান্য ছেলেদের ভেতর ভাগ করে দেওয়া হল।

কেঁদে কেঁদে ঘুম ভাঙাবার ভার পড়ল সমরের ওপর। ও নাকি এমন মড়াকান্নার ভান করতে পারে যে লোকে শুনে মনে করবে সে সদ্য শ্মশান থেকে উঠে এসেছে।

তার পরদিন যথারীতি মহলাও শুরু হল, কিন্তু সব গোপনে-পাছে অভিভাবকের দল কিছু জানতে পারেন।

অভিনয়ের তিন দিন আগে একদিন দুপুর বেলা সমর হাঁপাতে হাঁপাতে গণেশকে এসে বলল, 'ভাই আমার পার্ট ফিরিয়ে নাও।'

গণেশ বলল, 'কেন বলো তো?' সমর মুখখানা কাচুমাচু করে জবাব দিল, 'গত বছরও পাশ করতে পারিনি বলে বাবা কাল ডেকে বললেন, গোটা ছুটিটা হইহই করে বেড়ালে চলবে না, কাল থেকে জনার্দন মাস্টার রোজ সন্ধ্যে বেলা পড়াতে আসবে। তাহলে কি আর সন্ধ্যে বেলা রিহার্সেল দিতে আসব?'

দলের সবাই সব শুনে বলল, 'কী সর্বনাশ! সমরের মতো অমন মড়াকান্না কাঁদবে কে? তাহলে প্লের সমস্তই মাটি!'

গণেশ বলল, 'তোকে কিছু ভাবতে হবে না সমর। দুপুর বেলা এসে তুই রিহার্সেল দিয়ে যাস।'

ভয়ে ভয়ে সমর বলল, 'কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যায়-?'

গণেশ বলল, সেদিন মাস্টারমশাইকে এক ফাঁকে সরিয়ে দিলেই হবে। তোর বাড়ি তো আমার বাড়ির পাশেই-এক ব্যবস্থা হবেখন।'

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা।

অভিনয়ের দিন সন্ধ্যা বেলা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পোশাকের জন্য ঠাকুমার বালাপোশ আর ছোটো বোনের ডুরে শাড়িটা বগল তলায় লুকিয়ে সমর যেই খিড়কির দরজা দিয়ে বেরোতে যাবে অমনি তার বাবা বৈঠকখানা থেকে হাঁকলেন, 'ও রে সমরা, মাস্টার-মশাই এসেছে তোর শোবার ঘরে নিয়ে যা!'

মুখে সমর বলল বটে, 'যাই বাবা', কিন্তু কী করে যে এই বিষম সংকটে পরিত্রাণ পাবে তা কিছুই সে স্থির করতে পারল না।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সমস্ত দিনের খাটুনির পর পড়াতে পড়াতে মাস্টারমশাই ঘুমে ঢুলতে থাকেন। এক মুহূর্তে তার মাথা যেন একেবারে সাফ হয়ে গেল। ছুটে গিয়ে

তাড়াতাড়ি খাটের ওপর বিছানাটা পেতে দিল। তারপর দক্ষিণ দিকের জানলাটা খুলে দিতেই ঝিরঝির করে হাওয়া আসতে লাগল। জানলার সামনেই রজনীগন্ধার ঝাড়। চমৎকার মিষ্টি হাওয়া আসছিল।

এতেও যদি মাস্টারমশায়ের ঘুম না আসে তো সমর নিয়ে আসবে জ্যাঠামশায়ের ভালো পরিমল নস্যির কৌটোটা। মাস্টারমশায় নস্যি নিতে বড়ো ভালোবাসেন।

সমস্ত ষড়যন্ত্র সমাপ্ত করে সমর মাস্টারমশাইকে বাইরে থেকে ডেকে নিয়ে এল।

মাস্টারমশায় ঘরে ঢুকে ধবধবে বিছানা পাতা দেখে দিব্যি আরামে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'জোরে জোরে শব্দরূপ মুখস্থ করো।'

একবার মাস্টারমশায়ের দিকে আড়চোখে চেয়ে সমর শুরু করল-

নঃর নরৌ নরাঃ

তারপর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, 'গোবিন্দকে তামাক দিতে বলব স্যার? জ্যাঠামশায় বিষ্ণুপুর থেকে ভালো তামাক আনিয়েছেন।'

মাস্টারমশায়ের তখন সমস্ত দিনের খাটুনির পর বেশ আমেজ লেগে এসেছে। জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'বেশ আনতে বলো!'

তামাক টানার সঙ্গেসঙ্গেই মাস্টারমশায়ের নাকের ডাক শোনা গেল।

তখন আর সমরকে পায় কে! বইপত্তর ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে ছুট দিল পাশের বাড়ির দিকে।

ততক্ষণে কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে। দর্শক বলতে গ্রামের মহিলা আর শিশুর দল। পুরুষদের বলা হয়নি শাসনের ভয়ে।

অল্পক্ষণের ভেতরই অভিনয় শুরু হয়ে গেল। সে কী সবার উৎসাহ!

ক্রমে এল সমরের পালা।

কুম্ভকর্ণের পিসি মড়াকান্না কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'ওরে কুম্ভ, তুই না উঠলে যে সোনার লঙ্কা ছারেখারে যায় রে-!'

তারপর ডাক ছেড়ে সে কী কান্না!-যেন এইমাত্র কাউকে বাড়ি থেকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে!

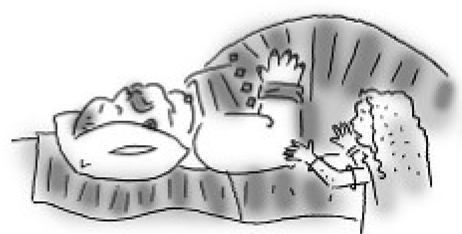
সমরের বাবারও সন্ধ্যের মুখে বেশ একটু ঢুল এসেছিল। মড়াকান্না শুনে তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

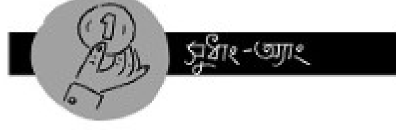
চাকরকে বললেন, 'দেখ তো গোবিন্দ, ও বাড়িতে এত কান্নাকাটি কীসের?'

তারপর কান্নার রোলটা ক্রমেই যখন বাড়তে লাগল তখন নিজেই ছুটতে ছুটতে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন।

তখন যে অভিনয়টা আরম্ভ হল তো তোমরাই আঁচ করে নাও।

*কার্‌তিক ১৩৪১*






# ব্রহ্মদাশ গোস্বামী

খেলতে যাচ্ছিলাম মফস্সলের একটা জায়গায়।

ট্রেনে দলের সবাই ছিল। কিন্তু আমরা যে কামরায় উঠেছিলাম তাতে ছিলাম দলের মাত্র চার জন, আমি, নরেশ, সুকোমল আর সুধাংশু।

শনিবার ৩টায় ট্রেন। আমরা একটু আগেই এসেছিলাম, তখনও গাড়িতে ভিড় হয় নাই; কিন্তু জানিতাম অফিস-ফেরত যাত্রীবাবুরা সব যখন এসে পড়বে তখন আর তিল ধারনের স্থান থাকবে না। তাই আমি একটা শতরঞ্চ বিছিয়ে একটু হাত-পা মেলে বসবার জোগাড় করছিলাম।

সুধাংশু আমাকে একটা ঠেলা মেরে বলল, 'ওহে বিনয়, আমাদের এ ট্রেন কি বালিগাছা ধরবে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলো দেখি? ছোটো-বড়ো এত স্টেশন থাকতে বালিগাছার কথা হঠাৎ তোমার মনে এল কেন?'

সে বলল, 'ছোটোবেলা থেকেই বালিগাছা দেখবার একটা আগ্রহ আছে ভাই। আর সেটা নেহাত অহেতুকও নয়।'

নরেশ বলল, 'তাহলে হেতুটাই আগে শুনতে হয়।'

ততক্ষণ আমার শতরঞ্চ বিছানো হয়েছে এবং সকলে আরাম করে বসেছে। সুধাংশু চোখ থেকে চশমা জোড়া নামিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, 'সে শোনবার মতো বটে। জানো তো আমি সেন্ট থমাস হাই স্কুলে পড়তাম। সেখানে এক মাস্টার ছিলেন, তাঁর নাম ছিল- নামটা আর নাই বললাম; বললে তোমরাও চিনে ফেলবে। তাঁর বাড়ি ছিল অই বালিগাছায়।

'স্কুলের এতগুলি মাস্টার থাকতে তাঁর নামটা এতদিন পরেও মনে আছে কেন সেই কথাই বলছি, শোন।-

'পড়াতে তিনি পারতেন না মোটেই। পারতেন আমাদের ধরে নানা ছুতোয় মারতে। আবার তেমনি ছিলেন তিনি গল্পবাজ আর চালিয়াত।

'তাঁর গল্পগুলি আমাদেরও নেহাত মন্দ লাগত না। বরং পড়ার চেয়ে তাঁর আজগুবি গল্প শুনতেই আমরা বেশি ভালোবাসতাম।

'সেদিন আমাদের ক্লাসের প্রথম ঘণ্টা তাঁর।

'আমাদের স্কুলের নিয়ম তো জানো? ছেলেরা যে ক্রমে ক্লাসে ঢুকবে সেই ক্রমেই বসবে। আমি যখন ক্লাসে পৌঁছোলাম তখন ক্লাসে অধিকাংশ ছেলেই এসে গেছে, কাজেই

আমাকে বাধ্য হয়ে পেছনের দিকের একটা বেঞ্চে বসতে হল।

'জানি না কী কারণে তিনি আমায় একটু খারাপ চক্ষে দেখতেন। প্রবল প্রতাপান্বিত মাস্টারির আসনে বসে আমার মতো দুর্বল ও মুখচোরা ছেলেদের অঙ্গে বাক্যবাণ ছুড়ে ছুড়ে মজা দেখা ছিল তাঁর ভারি প্রিয় কাজ। বাক্য-জ্বালায় আমি যখন অস্থির হয়ে উঠতাম, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যেত, কান রাঙা হয়ে রক্ত বাহির হতে চাইত, তখন সার্থক লক্ষ্য ভেদের আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

'সেদিন আমি দেরিতে এসেছি, সুতরাং সে সুযোগ হেলায় হারাতে অর্থাৎ আমাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করবার সুযোগ ছেড়ে দিতে তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না।

'আমি সবে বইগুলি রেখে বসতে যাচ্ছি অমনি মাস্টারমশায় ডাকলেন, কীরে সুধাং-অ্যাং-

'তিনি আমাকে এইরকমই ডাকতেন। আমি ফিরে বললাম, স্যার!

'তোদের বাড়ি নাকি লুচি ডুবে গিয়েছিল? বল সত্যি কি না।

'আমি জানতাম, তিনি আমার উপর দিয়ে রহস্যের পরীক্ষা চালাচ্ছেন। তাই জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দুই কান দিয়ে যেন আগুন বার হতে লাগল।

'মাস্টারমশায় জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই অন্যান্য ছেলেদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, জানিস, ওদের বাড়ি ভোজ ছিল। ময়রা যখন ঘিয়ের কড়াতে প্রথম লুচি ছেড়ে দেয়, ও ছিল কাছে দাঁড়িয়ে-কতক্ষণে লুচি হবে আর সে খাবে। তাই সে যখন দেখল কড়াতে পড়ে লুচি ডুবে যাচ্ছে তখন তার ভেউ ভেউ সে কী কান্না! ময়রারা বুঝতে না পেরে ওকে জিজ্ঞাসা করল-কী হল খোকাবাবু, কাঁদছ কেন? গায়ে গরম ঘি লাগল না কি? সরে দাঁড়াও। ও বললে-নাঁ নাঁ, ঘিঁ পঁড়ে নাঁই, লুঁচি ডুঁবে গেঁছেঁ!

'মাস্টারমশায় নাকি সুরে এমনি কথাগুলি বললেন যে ক্লাসের ছেলেরা সবাই হেসে উঠল। আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। সীতা দেবী যখন পাতাল প্রবেশের জন্য কাতর প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর তখনকার লজ্জা আমার লজ্জার চাইতে বেশি হয়েছিল কি না জানি না।

'এমন সময় দপ্তরি এসে সংবাদ দিয়ে গেল যে সেক্রেটারি স্কুল দেখতে আসছেন। মাস্টারমহাশয় তটস্থ হয়ে উঠলেন। কী করবেন যেন স্থির করতে পারছেন না। তারপর যখন হঠাৎ দেখলেন যে সেক্রেটারির ভাইপো আমারও পরে ক্লাসে এসে সব শেষের বেঞ্চিতে বসে আছে তখন তো তাঁর চক্ষুস্থির। এইবার বুঝি গেল চাকরি।

'কিন্তু তার মতো উপস্থিত বুঝি এ পর্যন্ত কারও দেখলাম না। হটা কাকে বলে তা তিনি জানেন না।

'হঠাৎ ক্লাসের সবাইকে সম্বোধন করে তিনি বলে উঠলেন, এই শোনো- শোনো-শোনো। আজকে আমি একটা মজা করব। প্রশ্ন করব আমি মনে মনে; যার উত্তর ঠিক হবে সেই হবে ফার্স্ট। বলে যেন প্রশ্নটাই মনে করবার জন্য একবার তিনি চোখ মিটমিট করলেন, ঢোক গিললেন, তারপর বললেন, হয়েছে। কে জবাব দিতে পারিস বল।

'একজন ছেলে বলল, স্যার, আপনি মনে করেছেন ক্যারাকোরাম পর্বত। মাস্টারমশায় মাথা নাড়লেন।

'আর একজন বলল, আওরঙজেবের ঠাকুরদার নাম কী তাই নিশ্চয় আপনার প্রশ্ন, না স্যার?

'এমনি যার যা মনে এল সে তাই বলল, কিন্তু জবাব আর ঠিক হয় না। তুমি, তুমি, বলে হাত নাড়তে নাড়তে মাস্টারমশায় এগিয়েই যেতে লাগলেন, শেষটায় গিয়ে দাঁড়ালেন সেক্রেটারির ভাইপোর কাছে।

'সে হয়তো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মাস্টারমশায় যখন সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, জবাব তখন একটা দিতে হবেই। সুতরাং হয়তো না বুঝেসুঝেই সে বলে উঠল, কমন নাউন স্যার।

'ব্যস! মাস্টারমশায় তৈরিই ছিলেন। বললেন, ঠিক, ঠিক হয়েছে। যাও, সকলের ডাইনে গিয়ে বসো।

'সেক্রেটারির স্কুল দেখা হয়ে গেল, মাস্টারমশায়ের চাকুরি নিয়েও কোনো গোলযোগ ঘটেনি। শুধু তাই নয়, আজও তিনি খোশ মেজাজে সেইখানে বিরাজ করছেন এবং আমার মতো গোবেচারিদের মস্তক চর্বণ করছেন।'

আমরা তন্ময় হয়ে সুধাংশুর কথা শুনছিলাম। ইতিমধ্যে কখন যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে টেরও পাইনি। তার কথা শেষ হতে দেখি গাড়িতে ঠাসাঠাসি লোক। খালি হাত বড়ো কারোরই নয়। কারও হাতে দুটো ফুলকপি, কারও হাতে রুমালে-বাঁধা ক-টা নেবু, তার লালচে আভা রুমাল ভেদ করে দেখা যাচ্ছে। কেউ-বা নিয়ে চলেছেন মাছ, কেউ নিয়ে যাচ্ছেন এক ঠোঙা বিস্কুট, লজেঞ্চুস বা আর কিছু। পুঁটলির আকার দেখে এবং মুখের ভাব দেখে আমরা চার জন ফিসফাস করে আলোচনা করতে লাগলাম, কে আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আর কেই-বা সপ্তাহ শেষে বাড়ি যাচ্ছে! দু-তিনটা স্টেশন যেতে যেতে ভিড় খানিকটা কমল। একটু যেন হাঁফ ছাড়বার জায়গা পেয়ে আরাম বোধ করলাম।

সুধাংশু বলল, 'ইচ্ছে করে এই কষ্ট। যাদের ভাড়ায় যাচ্ছি তারা তো দিয়েছে সেকেন্ড ক্লাসের ভাড়া, পয়সা বাঁচাতে কিনা এলেন থার্ড ক্লাসে! তেমনি মজাটা এখন বেশ টের পাচ্ছেন।'

নরেশ হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে থাম, থাম-সুধাং-অ্যাং-'

উচ্চারণের ভঙ্গিতে গাড়িসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। সুধাংশু এখনও লাজুক, সুতরাং সে নরেশকে বলতে পারল না যে তার জন্যই এই কষ্ট। কারণ নরেশই ছিল পয়সা বাঁচাবার প্রস্তাবের মূল পাণ্ডা। চুপ করে সে বসে রইল।

এমন সময় গাড়ি এসে থামল আর একটা স্টেশনে। বাইরে উঁকি মেরে স্টেশনের নাম পড়ে সুধাংশুকে বললাম, 'এইরে সুধাং-অ্যাং-তোর বালিগাছা। ভালো করে এইবার দেখে নে।'

সে সবে সিট হতে উঠেছে অমনি গাড়ির অপর প্রান্তের একটা গোলমালের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ল।

একটা লোক বলছে, 'ও মশাই, ভেটকি মাছটা যে আমার।'

যে লোকটা ভেটকি মাছ আর কপি নিয়ে নামছিল সে বলল, 'বেশ লোক তো আপনি! কপি আমার, আর ভেটকি মাছ আপনার!'

যে লোকটার ভেটকি মাছ সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যারা নেমে যাচ্ছিল তারা যেন বেশ খুশি হয়েছে এমনি ভাবে হাসতে হাসতে স্ফূর্তির সহিত গেট পার হয়ে যেতে লাগল। গাড়ির ভিতরে যারা ছিল তারা শহরের এবং শহরতলির, বিশেষত এই

স্থানের লোকেদের চালাকির বিভিন্ন গল্প ফেঁদে বসল। ঘটি চোর বাঙালির সৃষ্টি কী করে হয়েছে সেকথাও উঠল।

সুকোমলটা বরাবরই পেটুক। সে হঠাৎ বলে উঠল, 'বিনয়দা, এখানকার ছানার জিলিপি খুব ভালো, আমি শুনেছি। খাওয়াও না বিনয়দা!'

আমার জবাব দেবার আগেই সুধাংশু বলল, 'দাঁড়া আমি খাওয়াচ্ছি।'

সুধাংশুর হাত কখনোই খুব দরাজ নয়, সুতরাং তার কথায় আমি বা সুকোমল কেহই বড়ো একটা ভরসা পেলাম না। কিন্তু সে সত্যই জানালা দিয়ে মুখ বার করে 'খাবারওয়ালা' 'খাবারওয়ালা' বলে চেঁচাতে আরম্ভ করে দিল।

তখন গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। ডাক শুনে বাক্স মাথায় খাবারওয়ালা যখন এসে পৌঁছোল তখন গাড়ি মোশন দিয়েছে। সুধাংশু জানলা গলিয়ে মুখ বার করে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আট আনার জিলিপি দাও।'

খাবারওয়ালার ভয় ছিল পাছে পয়সা না দিয়েই বাবুরা খেয়ে পালিয়ে যায়। তাই সে বলল, 'বাবু পয়সা?'

দিচ্ছি বলে সুধাংশু বুকপকেট থেকে তার মানিব্যাগ টেনে বার করল এবং তড়াক করে খুলে তার মধ্য থেকে বার করল একটা টাকা।

টাকা দেখে খাবারওয়ালা আট আনার জিলিপি নিয়ে গাড়ির পাদানিতে উঠে পড়ল এবং সুধাংশুর হাতে খাবারের ঠোঙা দিয়ে টাকাটি হাতে নিল।

সুধাংশু বলল, 'ফেরত পয়সা?'

চলতি ট্রেন থেকে নামতে নামতে সে বলল, 'দিচ্ছি।'

ততক্ষণে আমাদের গাড়ি প্রায় প্লাটফর্মের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে; গাড়ির বেগও বেশ বেড়েছে।

যখন খাবারওয়ালা বুঝতে পারল যে বাবুরা আর গাড়ি থেকে নামতে পারবে না, তখন সে সেইখানে দাঁড়িয়ে মুখ ভেংচিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুলাতে দুলাতে বলতে লাগল, 'গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, আর-কলা-দেবে-।'

সুধাংশুও জানালা দিয়ে মুখ বার করে মুখ ভেঙাতে ভেঙাতে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলতে লাগল, 'নিগে-যা, মেকি সীসার-অচল টাকা!'

আমরা হেসে লুটিয়ে পড়তে লাগলাম। গাড়ির অনেকেও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। যে ভদ্রলোকটি সাধের ভেটকি মাছ যাওয়ায় মুখ ভার করে বসেছিলেন তিনিও সে হাসিতে যোগ দিলেন। বললেন, 'বেশ করেছেন বেটাকে ঠকিয়েছেন। এখানকার সব বেটা জুয়াচোর।'

আমি বললাম, 'ওহে সুধাং-অ্যাং, মতলবটা কি আগে থেকেই ঠাউরে রেখেছিলে?'

জিলিপি খেতে খেতে সে বলল, 'না ভাই, হঠাৎ মাথায় এল। যাই হোক আমার বালিগাছাও দেখা হল, অচল টাকাও চলে গেল, আর সুকোমলেরও জিলিপি খাওয়া হল, তোমরাও বাদ গেলে না।'

তার কথা আমার বিশ্বাস হল না। সে ছেলেবেলা থেকে এ গাঁয়ের উপর বিরক্ত ছিল এবং আজ যে সুযোগ পেয়ে গেল এর জন্য সে অপেক্ষা করছিল নিশ্চয়।






# সুধাবিন্দু বিশ্বাস

রমাইয়ের বুদ্ধির অভাব ছিল না। বরং একটু বেশি মাত্রায় ছিল বলেই অসুবিধা হয়েছিল। বুদ্ধির জোরে সকলকে ও সব কাজে ফাঁকি দিতে দিতে এমন তার ফাঁকির অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে নিজেও ফাঁকিতে পড়ে যেত। একটু চেষ্টা করলেই সে পড়াশোনায় খুব ভালো হতে পারত, কিন্তু এই ফাঁকির জন্যেই স্কুলের সব প্রাইজগুলোই অন্য ছেলেরা নিয়ে নিত। কিন্তু সে সব কথা থাক। সেবার সে স্কুল ফাঁকি দিতে গিয়ে কীরকম মজাটা ভোগ করেছিল তাই বলি।

সেবার গ্রামে যাত্রার দল এল পুজোর অনেক পরে। পুজোর ছুটি তখন ফুরিয়ে গিয়েছে। ক্লাস প্রমোশনের পরীক্ষার তাড়ায় স্কুলে রীতিমতো পড়া আরম্ভ হয়েছে। হেডমাস্টারমশায় সকলকে ডেকে তাই বলে দিলেন, কেউ যেন যাত্রা শুনতে গিয়ে শরীর খারাপ আর পড়াশোনা নষ্ট না করে। রমাকান্তের বাবাও রমাইকে যাত্রা শুনতে যেতে মানা করে দিলেন।

রমাই হাঁ-না কিছু না বলে সন্ধ্যার সময় ভাত খেয়ে ভালো ছেলে হয়ে পড়াশোনা করতে বসল। একটু পরেই উঠে সকাল সকাল শুয়ে পড়ল। তারপর কখন যে পাশ বালিশের উপরে লেপ ঢাকা দিয়ে রেখে চুপিচুপি বের হয়ে গেল তা কেউ টেরই পেল না।

যাত্রার আসরে গিয়ে যখন সে পৌঁছোল তখন তাকে দেখে কে বলবে সে রমাই। কবেকার ছেড়ে-ফেলা এক জোড়া ছেঁড়া চটি জুতো তার পায়। শৌখিন গোলাপি রঙের র‍্যাপারটার উপরে ময়লা একটা বিছানার চাদর ঢেকে সেইটাই মাথামুড়ি দিয়ে গায় দিয়েছে। সেই অদ্ভুত র‍্যাপারের ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকাতে তাকাতে পশ্চিম পাড়ার গোয়ালারা যে ধারে বসে ছিল সেই ধারে গিয়ে বসল। পাছে যাত্রার সভায় চেনা কোনো লোক তাকে চিনে ফেলে এবং বাবা বা মাস্টারমশায়ের কাছে বলে দেয় এই তার ভয়।

যাত্রা তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই কেউ বড়ো একটা তার দিকে তাকিয়ে দেখল না। সেও নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রা শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে কখন যে রাত কেটে গেছে তা খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল, বুড়ো তেঁতুল গাছ আর ঝাঁকড়া আম গাছটার ফাঁক দিয়ে পুবের যেটুকু আকাশ দেখা যায় তার অন্ধকারটা ঘুলিয়ে এসেছে। আর দেরি করা চলে না। রমাই আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে এল। পা টিপে টিপে, দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। বিছানার কাছে গিয়ে সবেমাত্র লেপটা উঠিয়ে তার মধ্যে ঢুকতে যাবে অমনি দরজার বাইরে খড়মের শব্দ। তাকিয়ে দেখে বাবা। ভয়ে সে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

রমাইয়ের বাবাও রমাইকে এত ভোরে বিছানার বাইরে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'কীরে! আজ যে এত ভোরে উঠেছিস? কাল সকাল সকাল শুয়েছিলি বলে বুঝি? তা ভালোই হয়েছে। তোর ছোটোকাকাটা দেখছি যাত্রা শুনে এখনও ফেরেনি। দৌড়ে যা, তাকে ডেকে নিয়ে আয়। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বস!'

রমাই বেঁচে গেল। ভাগ্যি বাবার কোনো কথায় তাকে জবাব দিতে হয়নি। নইলে বুকটা যেরকম ধড়াস ধড়াস করছিল তাতে মুখ দিয়ে একটা কথাও আস্ত বের হত না। বাবাও সব ধরে ফেলতেন।

ছোটোকাকাকে ডেকে নিয়ে রমাই যখন বাড়ি ফিরল তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। পিসিমা উঠোনে বসে গোবর গুলছেন। বাবা ছোটোকাকাকে দুটো বকুনি দিয়ে দাওয়ায় বসে তামাক খাওয়ার আয়োজন করতে লাগলেন। কোনোরকমে তখনও গিয়ে বিছানায় ঢোকা যায় কি না ভাবছিল, কিন্তু বাবার তাড়া খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসতে হল। পড়তে বসেও যে পড়ার ভান করে ঢুলে ঢুলে একটু ঘুমোবে তাও হল না। বাবা সব দিন এমন করেন না। আজই দিন বুঝে পড়ার কাছে ঠায় বসে রইলেন। কাজেই ঠিক সময়েই বাবার তাড়ায় স্নান করে খেয়ে-দেয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বই-টই নিয়ে স্কুলে রওনা হতেও হল।

কিন্তু চলতে যে আর পারে না! হাত-পা সব এলিয়ে আসছে। কী করা যায়? কিছু দূর গিয়েই ঝাঁ করে মাথায় একটা ফন্দি এল। অন্যান্য ছেলেদের বলল, 'আমার ভাই বড্ড পেট কামড়াচ্ছে। তোরা যা, আমি এখনই আসছি।' বলেই সে নদীর ঘাটের দিকে চলে গেল। ভাবল ছেলেগুলো চলে গেলেই লুকিয়ে কোনোরকমে বাড়িতে ঢুকে একটা ঘুম দিয়ে উঠবে। তারপর স্কুলে গিয়ে বলবে, পেটের অসুখের জন্য আসতে দেরি হল।

ছেলেরা চলে গেল, রমাই কিন্তু ভরসা করে বাড়িমুখো হতে পারল না। কী জানি, বাবার চোখে পড়ে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। অসুখ বললেও নিস্তার নেই। এক মাইল পথ হাঁটিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। আবার ডাক্তারটা যা চালাক! হয়তো সব ধরে ফেলবে। তা না হলেও ঘুমের দফা তো শেষ হবেই, সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচ দিন খাওয়া বন্ধ, খেলা-বেড়ানো বন্ধ, তার উপরে বিশ্রী ওষুধ তিন বার করে! তার চেয়ে বড়োবাবুদের বাগানের সেই কাঁঠাল গাছটার তলায় ঘুম দেওয়া ভালো।

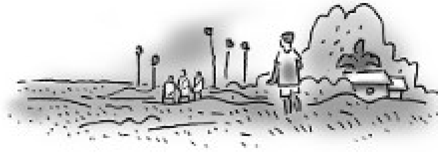
সেই দিকেই যাবে বলে ফিরেছিল, এমন সময় চোখ পড়ল নদীর ঘাটে সার সার নৌকোগুলোর উপরে। অমনি মাথায় এল এক নূতন ফন্দি। কাঁঠালতলার আড্ডার কথা তো সকলেই জানে। তার উপর সেখানে যেমন মশা, তেমনি শুঁয়োপোকা! তার চেয়ে একটা নৌকোয় উঠে খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে স্কুলে গেলে কেউ কিছু টের পাবে না। নৌকোগুলো তো খালি পড়েই থাকে। হাটের দিন ছাড়া কোনোখানে যাবার দরকারও হয় না, কেউ খবর নিতেও আসে না। এই সব ভেবে সে নদীর ঘাটেই চলে গেল। প্রথম দু-খানা নৌকোয় ছই পাটাতন কিছুই ছিল না; তার পরের খানায় ছই ছিল কিন্তু ভেতরে লোক রয়েছে মনে হল। তার পরে প্রকাণ্ড একটা নৌকো একেবারে বিচালি বোঝাই। বিচালি গাদার মাথা এত উঁচু যে নীচে থেকে তার উপরের কোনো কিছু দেখা যায় না। নৌকোখানাও খালি। রমাই আস্তে আস্তে সেই বিচালি গাদায় উঠে একটা জায়গা বিচালি দিয়ে রোদ আড়াল করে শুয়ে পড়ল। তারপর বেহুঁশ ঘুম! তখন আর রমাই নয়, একেবারে কুম্ভকর্ণের মাসতুতো ভাই!

স্কুলের ছুটি হয়ে গেল, সাড়ে চারটে বাজল, রমাই কিন্তু বাড়ি ফিরল না। শীতের বেলা, সূর্য ক্রমে ডুবু ডুবু হয়ে এল, তবু রমাইয়ের দেখা নেই। কোথায় গেল, কোথায় গেল?

অন্য ছেলেরা বলল, 'রমাই আজ তো স্কুলে যায়নি। সে কি বাড়ি ফেরেনি? পেট কামড়াচ্ছিল বলে সে যে নদীর ধারে পায়খানায় গিয়েছিল।' খোঁজ খোঁজ, ছুটল সবাই নদীর দিকে। ঝোপঝাপ, এদিক-ওদিক, কোনোখানেই তার সন্ধান পাওয়া গেল না। বাবুদের বাগানের কাঁঠাল গাছ তলা, ভাঙা শিবমন্দির, যাত্রাদলের আখড়া, ছোটোবাবুদের পিছন-বাড়ির চিলে ছাদ, সব জায়গা থেকে লোক ঘুরে এল; রমাই যে কোথায় তার ঠিক নেই। তবে কি নদীর মধ্যে-?

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। বাতি মশাল নিয়ে, জেলে ডেকে, সকলে আবার নদীতে ছুটল। নদীতে জাল ফেলে টানা দেওয়া হল। শামুক গুগলি অনেক উঠল, রমাই উঠল না। রমাইয়ের বাবা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ার উপর ধপ করে বসে পড়লেন। মা ও পিসিমা ডাক ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন। পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-বুড়োর জটলা চলতে লাগল। যাত্রা সেদিন জমল না।

রমাই নৌকোর উপরে দিব্যি আরামে ঘুম দিচ্ছিল, সে কি এসব জানে? সে ঘুমিয়ে পড়বার একটু পরেই পাশের দোকান থেকে খাওয়া-দাওয়া করে মাঝিরা ফিরে এল। এসেই নৌকো ছেড়ে দিল। বিচালির গাদার উপরে কুম্ভকর্ণের মাসতুতো ভাই রমাই কিছু টেরই পেল না। আর অত উপরে কেউ যে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে মাঝিরাও তা জানতে পারল না। বেলা যখন প্রায় ২টা তখন ঘুমের ঘোরেই রমাই একবার পাশ ফির শুল। ঘুম যখন ঠিকমতো ভাঙল তখন বেলা পড়ে এসেছে। জেগে উঠে প্রথমটা সে বুঝতে পারল না, কোথায় সে আছে। তারপর মনে পড়ল, সে নৌকোয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু নৌকো যে চলছে! সে লাফিয়ে উঠল। তাকে লাফিয়ে উঠতে দেখে মাঝিরাও সব চমকে উঠল। এ আবার কে রে! কোথা থেকে এল! রমাইও তাদের চিনতে পারল না। এরা তো তাদের গ্রামের মাঝি নয়! তখন দু-দিক থেকেই প্রশ্ন আর বকাবকির পালা আরম্ভ হল। কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হল না। কেবল এইমাত্র বোঝা গেল যে মাঝিরা সে গ্রামের নয়, দূরের একটা গঞ্জ থেকে আর একটা গঞ্জে চলেছে। গ্রামে কিছু কেনবার ছিল বলে নৌকো বেঁধেছিল। গ্রাম থেকে তারা নদীপথেই ৫-৬ ক্রোশ চলে এসেছে, হাঁটা পথে ৭-৮ ক্রোশ হবে। এখন আর তারা ফিরতে পারবে না, অথবা এই আ-ঘাটাতে এখন নৌকো বাঁধতেও পারবে না ইত্যাদি।



অনেক খোশামুদির পর তারা রমাইকে একটা মাঠের ধারে নামিয়ে দিল। সূর্য তখন ডোবে ডোবে। রমাই নদীর কিনার ধরে ছুটল। কিছু দূর যেতেই একটা খাল। কী আর করবে, সাঁতার দিয়েই সেটা পার হতে হল। একে শীত কাল তাতে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে রমাই চলল। কিন্তু যাবে কোথায়? সম্মুখে বন। সেই জঙ্গলের মধ্যে সরু একটা পথ ধরে ছুটে চলল। পথ ক্রমেই সরু হয়ে আসতে লাগল। শীতের রাত্রি হঠাৎ অন্ধকার হয়ে ঝপ করে নেমে পড়ল। তখন সেই অন্ধকারে পথ হারিয়ে সে বনের মধ্যে কেবলই পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। কাঁটা গাছে কাপড়জামা তো গেলই, গায়ের

চামড়া পর্যন্ত কেটেকুটে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। তার উপরে দারুণ শীত, গায় র্যাপার পর্যন্ত নেই। ঠক ঠক করে কাঁপছে, চলছে আর হোঁচট খাচ্ছে, এমন সময় শুনল দূরে ফেউ ডাকছে। তবে কি বাঘ আসছে নাকি? ভয়ে সে একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পা আর বাড়াতে পারে না। মনে হয় চারিদিকেই যেন কে পথ আগলে বসে রয়েছে। ওই যেন কার চোখ জ্বলছে। না, ওটা তো জোনাকি। কিন্তু ওদিকে ওটা কি ঝোপ না বাঘ? মনে হল যেন গুঁড়ি মেরে আসছে। এমন সময় সত্যিই একটা জানোয়ার ঝোপের মধ্যে থেকে একটু ফাঁকা জায়গায় বের হয়ে এল। তাকে দেখেই রমাই ভয়ে 'বাবা গো!' বলে চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। তার আর জ্ঞান রইল না। তার চিৎকারে ভয় পেয়ে শেয়ালটা পালিয়ে গেল।

রমাইয়ের যখন জ্ঞান হল তখন উপর আকাশের অন্ধকার কেটে আসছে বটে তবে বনের ভেতরের অন্ধকার তখনও বেশ ঘোর। কিছুক্ষণ বসে থেকে সে উঠে দাঁড়াল, মাথা ভার, হাত পায়ে জোর নেই। বনের মধ্যে পথ হারিয়ে অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে তার দিক ভ্রম হয়ে গিয়েছিল। তবে তাদের গ্রাম যে উত্তর দিকে তা মনে ছিল। আকাশের যেদিক ফরসা হয়ে উঠছিল সেই দিকটা তাই ডাইনে রেখে সে চলতে আরম্ভ করল।

রাত্রি বেলা কত পাক খেয়েছিল কে জানে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যখন নিজেদের গ্রামের বাইরের বড়ো মাঠটার ধারে এসে পৌঁছোল তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। ওই ওদিকে রাখালেরা গোরু চরাচ্ছে। ওই তো মাঠের মধ্যের রাস্তা ধরে র্যাপার গায়ে কে তিন জন ভিন গাঁয়ে চলেছে। রমাই আরও খানিকটা ঘুরে, রাখাল ও রাস্তা অনেক দূরে রেখে ঝোপঝাপের মধ্যে দিয়ে বাড়ির পিছন দিকের বাঁশ বনে এসে ঢুকল। বাড়ির কাছে আসতেই শুনল পিসিমা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছেন। কোন মুখে কী করে যে বাড়িতে ঢুকবে তা ভেবেই পাচ্ছিল না। কিন্তু তখন বেশি ভাববার তেমন ক্ষমতাও তার ছিল না। চাপবাঁধা মাথা বোঁ বোঁ করছে, ভারী ভারী পায়ের নীচে মাটি দোল খাচ্ছে। দাঁড়াতে আর পারে না। সে চোখ-কান বুজে উঠানে এসে ঢুকল। তাকে দেখে পিসিমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। তিনি হতভম্ব হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন। মা চিৎকার করে উঠে ছুটে এলেন। চারিদিকে শোরগোল পড়ে গেল। গ্রামের যত ছেলে-মেয়ে, ছোটো-বড়ো, কচি-বুড়ো, সকলে ছুটে এল। এসে তো সকলেই অবাক। গায়ের জামা ১০-১২ জায়গায় ছিঁড়ে ঝুলছে। আধ ভিজে কাপড়, কাদা মাখা ও ময়লা। তাও হাঁটুর নীচে থেকে ছিঁড়ে খসে কোথায় পড়ে গেছে। পায়ে জুতো নেই। চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে গিয়েছে। হাত-মুখও ফোলা ফোলা। চুল উশকোখুশকো। সারা গা কাটা, আঁচড়ানো আর রক্তমাখা। সেই চেহারা দেখে সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

বাবা এসে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তখন তাদের কাছ থেকে বাঁচালেন। কিন্তু দিনটা কাটতে-না-কাটতেই রমাইয়ের সব কথা জাহির হয়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে ছেলেমহলে হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। তার এত যে প্রতিপত্তি, আজ বেশি চালাকি করতে গিয়ে সব নষ্ট হল।

কিন্তু এই শাপই তার বর হয়ে দাঁড়াল। লজ্জার জন্যই হোক আর যে জন্যই হোক, সে আর বেশি আড্ডা দিত না বা ফাঁকিবাজি করে চাল মেরে বেড়াত না। তা ছাড়া, সে দু-মাস এমন মন দিয়ে পড়াশোনা করল যে, ক্লাস প্রমোশনে প্রথম হয়ে উঠল। সেই থেকে বরাবর সে ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে সে স্কলারশিপ পেয়ে কলকাতায় কলেজে এখন পড়ছে। যারা তাকে চেনে তারা জানে রমাই এখন কথায় কাজে এক।

*পৌষ ১৩৪১*




# বিমল দত্ত

কটকটচন্দ্র ঘঙ্গোপাধ্যায় আমাদের খিড়কির পুকুরঘাটের ব্যাং কোলাবতীর ছেলে। একদিন ঘাটে আঁচাতে গিয়ে বাবুল স্পষ্ট তার নিজের কান দুটোয় শুনল যে কটকট তার মাকে বলছে, 'এইবার শোনো তো, কেমন গলাটা খুলেছে!'

এই বলেই ক্যাট ক্যাট ক্যাট করে গলা দিয়ে একরকম শব্দ বার করতে লাগল-যেন এক গাদা মাছের পেটের পটকা কে নোড়া দিয়ে মাটিতে বাটছে।

কোলাবতী তখন কী একটা কথা ভাবছিল। তাই অন্যমনস্কভাবে বলল, 'চমৎকার!' এই বলেই সে যে পদ্মপাতাটায় বসেছিল তার ওপর থেকে এক লাফে জলে পড়ে, কোথায় নিতল হয়ে ডুব দিল।

কটকটচন্দ্র পদ্মপাতাটায় একলা বসে বসে বার কয়েক সেই পটকা-ফাটানো রাগিনী গাইল। তারপর তীরের দিকে সাঁতরে ছুট দিল।

তার গলার সুরে তার ভারি আনন্দ হচ্ছিল। কেননা, এত কাল পর্যন্ত তার গলা থেকে কোনো শব্দই বার হচ্ছিল না। এখন তার বিশ্বাস হল, সে ওস্তাদ গায়ক, ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা তার গলায়।

তখন সবে বসন্তের মলয় বইছে। ঘাস তখনও খুব সবুজ। চার দিকে কচি কচি চারা গাছ, তাতে বিচিত্র ফুল। কটকটচন্দ্র যেতে যেতে কিছু ঘাসের আর ফুলের রস খেয়ে নিল। ফুর্তি তার আর ধরছিল না। আনন্দে কী যে করবে ভেবে না পেয়ে, সে নরম ঘাসের ওপর খুব খানিক 'লং জাম্প' করল।

এমনি করে লাফাতে লাফাতে সে একটা ডালিম গাছের তলায় এসে পড়ল। সেখানে দেখল, গাছের মাথায় দিব্যি এক গানের আসর জমে গেছে।

তখন হরবোলা পাখি গান ধরেছে। সে এক অদ্ভুত সুন্দর গান! কী তার সুর! কী তার ঝংকার! সারা পুকুর পাড়টা সুরের ঝরনাধারায় উপছে উঠছে। আকাশের ভাসন্ত ফুরফুরে মেঘ গান শুনতে থমকে থেমে গেছে। পুকুরের মাছেরা ঘাটের ধারে ভিড় করে এসেছে গান শুনতে।

কটকটচন্দ্র খানিক শুনে আর স্থির থাকতে পারল না। কেমন করেই বা চুপ করে থাকে? সে উপস্থিত থাকতে কিনা ল্যাবাকান্ত হরবোলা পাখিটা যত প্রশংসা পাবে! তোমরাই বলো এ কি কেউ সহ্য করতে পারে!

তারপর প্রাণপণে গলা ফুলিয়ে কটকটচন্দ্র করাত দিয়ে কাঠ চেরার মতো একরকম খ্যাঁশখেঁশে বিশ্রী আওয়াজ করতে লাগল। তারপর গলা যতই চড়তে লাগল ততই সুরটা

তার ভীষণ গোঙানির মতো মনে হতে লাগল। কটকটচন্দ্র ভাবল-কী সুরই না ধরেছি! এমন কাঠকাটা রাগিনী এদেশে কেউ কি ছাই শুনেছে!

এদিকে সেই বিদঘুটে আওয়াজ শুনে তো গাছের ওপর হরবোলার গান থমকে থেমে গেল। কটকটচন্দ্র ভাবল, 'দেখেছ দেখেছ, যেই খাঁটি ওস্তাদ তান ধরেছে অমনি মেকির দল চুপ!' তার বুক ফুলে দশ হাত হয়ে উঠল।

উৎসাহের চোটে তার গোঙানি এত বিশ্রীভাবে বেড়ে উঠল যে হরবোলা পাখি আর স্থির থাকতে পারল না। সে ময়নাকে বলল, 'দেখ ভাই, গাছের তলায় কার বুঝি প্রাণ ওষ্ঠাগত!' দোয়েল বলল, 'আহা, ফড়িং খেতে গিয়ে বেচারার গলায় আটকে গেছে বোধ হয়, আহা!' হরবোলা মিষ্টি সমবেদনার সুরে বলল, 'ভাই কটকটচন্দ্র, তোমার কী হয়েছে?'

কটকটচন্দ্র ভারি বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিছু না, আমি একটু গলা সাধছিলাম।'

এই কথা শুনে চারপাশ থেকে এক হাসির হররা উঠল; এমনকী ফড়িংগুলোও চিড় চিড় করে হেসে উঠল। মাকড়সারা এত জোরে হেসে উঠল যে তাদের জাল থরথর করে কাঁপতে লাগল। মৌমাছিরা এমন হাসিটা হাসল যে, তাদের হাত-পা থেকে সোনালি ফুলরেণু ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল। প্রজাপতিরাও বেদম হাসল, তবে ওরা সব তাতেই হাসে কিনা!

এতে কেই বা না দমে যায়!

কটকটচন্দ্রের বুকভরা আশা নিমেষে নিভে গেল। মুখ হাঁড়ি করে বেচারা নলখাগড়ার বনের আড়াল দিয়ে কোনোরকমে গা ঢাকা দিয়ে পিটটান দিল।

খিড়কির পুকুরে ফিরে এসে সে দেখল, তার মা কোলাবতী তখন চোখ বুজে আরাম করে জলের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে। কটকটচন্দ্র কাঁদো-কাঁদো সুরে তার মাকে বলল, 'দেখো মা, আমি কেমন চমৎকার কাঠকাটা রাগিনীটা গাইছিলাম, আর ওরা সব আমায় ঠাট্টা করল!' বিরক্তভাবে চোখ চেয়ে কোলাবতী বলল, 'ওরা সব মানে? আবার বুঝি ব্যাঙাচিদের লেজ ধরে টানতে গেছিলে?'

'তা কেন,' কটকটচন্দ্র বলল, 'হরবোলা, ময়না, ফড়িং, মাকড়সা, মৌমাছি, প্রজাপতি-ওরা আমার গলার নিন্দে করল। ওই লেজ-দুলানো আহ্লাদি হরবোলাটার চেয়ে আমার গিটকিরিটা খারাপ নাকি!'

ঠাট্টার সুরে কোলাবতী বলল, 'ওঃ, তুমি বুঝি হরবোলার দেখাদেখি গান গাইতে গেছিলে?'

কটকটচন্দ্রের একটু লজ্জা হল। সে তবু বলল, 'কেন যাব না? আমি কম কীসে?' কোলাবতী খানিক চুপ করে কী ভাবল। তারপর বলল, 'আচ্ছা ভাবো দেখি, হরবোলা যদি তোমার মতো সাঁতার কাটতে যায়, তবে কেমন মানাবে!'

কটকটচন্দ্র ছ্যাড়ছ্যাড় করে হেসে উঠল, ঠিক যেন কচুপাতায় বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। তারপর বলল, 'হ্যাঁঃ, পারবে নাকি? জলে ভিজে একেবারে জুজুবুড়ির পিসশাশুড়িটি হয়ে যাবে না!'

কোলাবতী বলল, 'সাঁতার কাটবার তার দরকার নেই। তার কাজও নয় সাঁতার কাটা। তার ছোটো ছোটো নখ আছে, কিন্তু আমাদের মতো পাতলা চামড়ায় ঢাকা পা সে পাবে

কোথা? ওর গায়ে একবোঝা অদরকারি পালক। জলে ভিজলে আর রক্ষা থাকবে? আর আমাদের কেমন রবারের মতো পেছল গা-জলে এর কিচ্ছুটি হবে না।'

কটকটচন্দ্রের এই কথা ভারি পছন্দ হল। খ্যাঁশখ্যাঁশ করে আবদারে হাসি হাসতে লাগল।

তারপর আবার সাঁতরাতে সাঁতরাতে ডালিম গাছটার কাছাকাছি এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, যাতে লেজ-দোলানি দুলালি হরবোলা আর কানে-মাকড়ি কালিন্দী ময়নাটা শুনতে পায়-

'জলো ডাঙার বাদশা আমি
ব্যাঙের ছাতি মাথে,
হরবোলা আর কালিন্দী গো,
সাঁতরাবে মোর সাথে!-
ঘ্যা-ঘ্যাং-ঘ্যাং
কট কটর কট-ঘ্যা-ঘ্যাং-ঘ্যাং!'

*মাঘ ১৩৪১*






## ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শোঁ শোঁ করে এল পশ্চিমের কালো মেঘের দেশ থেকে ভীষণ ঝড়। গাছপালাদের ঘাড় ধরে ধরে সে তাদের মাথা নুইয়ে দিতে লাগল মাটির ওপর। নারকেল গাছ বুঝি বেঁকে বেঁকে ভেঙেই পড়ে।

নিশু ভারি বিপদে পড়ল! এমন দিনে কাউকে না জানিয়ে সে ছোটো বোন হাসিকে নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন সে বাসে চড়ল তখন তো আকাশ-ভরা আলো আর শরতের দুপুর বেলার দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া। ওঃ সে কী মজা! অন্যদিন সে বাবার হাত ধরে বাসে ওঠে, যেন সে কতই ভীতু! একলা রাস্তা পার হয়ে বাসে ওঠবার ক্ষমতাটুকু যেন তার নেই! আজ বাবার মতো সে হাসিকে হাত ধরে বাসে তুলেছে! হাসির কী ভয়! ওর যত দাপাদাপি তো সেই চিলের ছাতের কোণটাতে, যেখানে আছে তার নীল পুতুল আর লাল পুতুল। রাস্তায় বেরিয়ে বেচারা যেন ভয়ে একেবারে পাঁপড়-ভাজা হয়ে গিয়েছে! বাসের এক কোণে দাদার গা ঘেঁষে বসে হাসি বলল, 'উঃ , দাদা তোমার কী সাহস!' গর্বে মাথা তুলে নিশু হাসির মুখপানে চেয়ে রইল-ভয়ে তখনও হাসির ঠোঁট দুটো কাঁপছে!

'হ্যাঁ খোকাখুকি, তোমরা যাবে কোথা?'

নিশু মুখ ফিরিয়ে দেখে, বাসের ভিতর আর কেউ নেই; তারা যেদিকে বসেছে তার অপর দিকের কোণে বসে আছে, এক দাড়িওয়ালা বুড়ো। ফুরফুরে সাদা দাড়ি নুইয়ে পড়ছে তার বুকের নীচে। বুড়ো ফোঁকলা দাঁতে হেসে বলল, 'বুঝেছি বুঝেছি, তোরা চিড়িয়াখানা দেখতে যাবি! আজ কিন্তু ভারি খারাপ দিন। তোরা যদি কোনো বিপদে পড়িস তাহলে আমার নাম ধরে ডাকিস; আমি তোদের বাঁচাব সব বিপদ থেকে। আমার নাম পিন্টুবুড়ো।-

'পিন্টুবুড়ো পিন্টুবুড়ো

ঘণ্টারামের মেজো খুড়ো

'এই নামেতে ডাকলেই আমি তখুনি তোমাদের সামনে এসে হাজির হব।' বলেই দাড়ি দোলাতে দোলাতে পিন্টুবুড়ো তড়াক করে এক লাফ দিয়ে বাস থেকে নেমে গেল। হাসির মুখের দিকে চেয়ে নিশু দেখে সে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে! ওর হাতখানা নিজের মুঠোর ভেতর নিয়ে নিশু বলল, 'ভয় কীরে হাসি? আমি থাকতে বিপদ এসে কী করবে!'

চিড়িয়াখানার দরজায় এসে ওরা দেখল সেখানে মানুষের চিহ্নও নেই! কেউ বাইরে থেকে ভিতরে যাচ্ছে না, ভিতর থেকেও কেউ বাইরে আসছে না। দরজা খোলা, কেউ সেখানে নেই! হাসির হাত ধরে নিশু সোজা বড়ো ফটক পার হয়ে চিড়িয়াখানার ভেতরে চলে গেল। কেউ তাদের বারণ করল না। বাবার সঙ্গে নিশু আরও অনেকবার এখানে

এসেছে, কিন্তু তখন দেখেছে কত ছেলে-মেয়ে কত লোকজন চারিদিকে ঘুরছে! আজ কেউ কোথাও নেই! আকাশ থেকে দুপুর বেলায় রোদ ঠিকরে পড়ছে, ঝলমল করছে গাছপালায়; চিড়িয়াখানার চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে। মাঝে মাঝে শুধু শোনা যাচ্ছে সিংহের গর্জন আর বানরের উকু উকু শব্দ।

নিশুর বুকটাও কেমন ভয়ে গুরগুর করে উঠল। তার মনে হতে লাগল কেবলই পিন্টুবুড়োর কথা। ওই অপয়া বুড়োটার সঙ্গে কেন তাদের দেখা হল। ওটা নিশ্চয়ই একটা শয়তান, না জানি কী বিপদই আজ ঘটবে!

যেখানে কুমির থাকে সেখানে নিশু উঁকি দিয়ে দেখল, চারদিক উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা; তার মাঝে নিশু অবাক হয়ে দেখল, দিব্যি টেবিল চেয়ার পাতা রয়েছে আর কুমির মামা সপরিবারে তার ওপর বসে দিব্যি নূতন গুড়ের পায়েস খাচ্ছে। নিশুর মনে পড়ল সেদিন তার মা এইরকম সুন্দর পায়েস রেঁধেছিলেন। কী ভালোই তার লেগেছিল সে পায়েস, তিন-চার বার সে চেয়ে নিয়ে খেয়েছিল। হঠাৎ কুমিরের চোখ পড়ল পায়েসের বাটি থেকে ওপরের দিকে। সে একটা বিকট গর্জন করে উঠল! কুমিরকে এরকম করে ডাকতে নিশু কখনো শোনেনি! হাসির হাত ধরে সে দৌড় দিল। হাসি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘চলো দাদা বাড়ি ফিরে যাই!’ নিশু জোর করে হেসে বলল, ‘দূর, একটুও সাহস নেই তোর!’

পেছনেই বাঁদরের খাঁচা। হাসি সেদিকে চেয়ে বলে উঠল, ‘দাদা দাদা, ওই দেখো।’ খাঁচার ভেতরে মাচার ওপর বসে একদল দাড়িওয়ালা হনুমান একটা হাঁড়ি থেকে কী বার করছে আর খাচ্ছে! হাসি বলল, ‘দাদা, ওই যে আমাদের কাসুন্দির হাঁড়ি। মা বললেন সেদিন ভাঁড়ার থেকে কে চুরি করে নিয়ে গেছে! সেই যে একটা কালো বেঁটে হনুমান মিনুদের ছাদের ওপর এসে রোজ বসত, আর তার দিকে তাকালেই মুখ ভেঙাত, এ তারই কাজ। সেই নিশ্চয় হাঁড়িটা চুরি করে নিয়ে এসেছে।’

নিশু খাঁচার কাছে এসে দেখল সত্যিই তো! ওই তো তাদের ভাঁড়ার থেকে চুরি-যাওয়া কাসুন্দির হাঁড়ি। যশোর থেকে তার দিদিমা পাঠিয়েছিলেন সেবার রথের সময়! কিন্তু বেঁটে হনুমানটা সেটা চুরি করল কী করে আর এখানে আনলই বা কেন? কী মজা করেই না ওরা কাসুন্দি খাচ্ছে! টক খেয়ে ওদের চোখ বুজে আসছে! দেয়ালের ওপর টাঙানো রয়েছে একখানা আরশি, তাইতে ওরা মাঝে মাঝে গিয়ে মুখ দেখে আসছে, আর দাঁতভাঙা একখানি চিরুনি দিয়ে আঁচড়াচ্ছে দাড়ি আর মাথার চুল।

হুম-হুম-হুম!

শব্দ শুনে ওরা দু-জনে চমকে উঠল। মস্ত একটা পাখির মতো জানোয়ার এসে নামল আকাশ থেকে মাটির উপর, যেখানে মাদি হাতিটা তার দুটো বাচ্চার সঙ্গে বাঁধা থাকে বাদামতলায়। নিশু জানত হাতির চারটে পা, কিন্তু এখন যেন মনে হল চারটি পায়ের মাঝে তার আরও দুটো পা বেরিয়েছে, আর পাগুলো যেন হয়ে গেছে আগের চেয়ে আরও বেঁটে, আর শরীরটা হয়ে গেছে লম্বা-এত বড়ো হাতির শুঁড় সে দেখেনি আগে! শুঁড় দিয়ে তারা দিব্যি আগডাল থেকে বাদাম পেড়ে খাচ্ছে!

কী অবাক কাণ্ড! যেটা নামল আকাশ থেকে, ওটা যে নিশুদের বাড়ির পাশে মিনুদের ছাতের ওপর যে বেঁটে হনুমানটা এসে বসে থাকে, সেইটারই মতো। কিন্তু এ আবার কী হল? হনুমানের মুণ্ডুটা কেটে তার জায়গায় কে কাকাতুয়ার মাথা বসিয়ে দিয়েছে! নিশুদের বারান্দায় দাওয়ার ওপর মস্ত কাকাতুয়াটা বসে থাকত; এটা যে তারই মাথা। নিশুর মামা

সেটাকে সিঙ্গাপুরের রবারের বাগান থেকে ধরে এনেছিলেন। নিশু আর হাসিকে দেখলেই কাকাতুয়াটা বিকট সুরে ডাকতে আরম্ভ করত। একদিন পায়ের শিকল কেটে কাকাতুয়াটা উড়ে পালিয়ে যায়! তার সেই বাঁকানো ঠোঁটওয়ালা মস্ত মুখখানা আজও নিশুর মনে আছে।

তারপর হনুমানটার আবার অমন ডানা কোথা থেকে এল? এ যে দেখছি খিড়কির পুকুরে যে রাজহাঁসটা জলে মাথা ডুবিয়ে ডুবিয়ে গুগলি খেয়ে বেড়ায়, তার সাদা সাদা ডানা দুটো কেটে কে হনুমানটার দু-পায়ে আটকে দিয়েছে! সেই ডানায় ভর দিয়ে উড়তে উড়তে এসে হনুমানটা হাতির পাশে দাঁড়াল।

তাই তো, এরূপ অদ্ভুত জানোয়ারকে কী বলে ডাকবে? কাকাতুয়ার মতো মাথা, হনুমানের মতো শরীর, হাঁসের মতো ডানা-এর নাম নিশ্চয় কাহামান।

হাতিটা কাহামানের দিকে একবার তাকিয়ে গোটা কতক বাদাম পেড়ে তাকে খেতে দিল। বাদাম পেয়ে কাহামান ভারি খুশি, কচ কচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। তারপর তার চটের জামার পকেট থেকে একটা কলা পাতার পুঁথি বের করে পড়তে লাগল। নিশু জানতে পেল, কাহামান স্পষ্ট তাদের মতোই সুর করে কবিতা পড়ছে-

‘বদ্দিবাটির পদ্ম এনে
বিক্রি করে নন্দ বেনে।
নন্দ বেনের গন্ধগোকুল
খায় চিবিয়ে আমের মুকুল।
নেংটি ইঁদুর আংটি পরে
বেড়াচ্ছে হিং বিক্রি করে।
ওই এল রে পিন্টু বুড়ো,
ঘণ্টারামের মেজো খুড়ো।
কণ্ঠি গলায় ঘণ্টারাম
খাচ্ছে খাজা দিবস যাম!’

কাহামান সুর করে করে পড়তে লাগল। ছড়া শুনে বাচ্চা হাতি দুটোর কী স্ফূর্তি! তারা চার পা তুলে দাঁড়িয়ে, দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে, ছড়ার তালে তালে নাচতে আরম্ভ করল। খানিক পরে ধাড়ি হাতিটাও গুনগুনিয়ে গান ধরল। নিশু তো অবাক! পিসিমা, দিদিমার কাছে সে অনেক উপকথা রূপকথা শুনেছে, কিন্তু হাতিতে গান গায় তা কখনো শোনেনি! সে হাসির কানে কানে বলল, ‘কী অবাক কাণ্ড দেখছিস হাসি! হাতিটাও কেমন গান গাইছে!’

হাতি মিহি সুরে গাইতে লাগল-

‘বাবরি কাটা গুবরে পোকা রাবড়ি খেতে চায়,
আলতা পরে সন্ধ্যা বেলা পলতা বনে যায়।
সিঁদুর খেয়ে তেলাকুচো টুক টুক টুক দোলে
শাকচুন্নি কাঁদছে বসে, হালুম বুড়োর কোলে!’

কাহামান আনন্দে লাফিয়ে উঠল, 'বাহবা হাতি মাসি, তুমি এমন সুন্দর ছড়া কাটতে পার!' হাতির মুখে ছড়া শুনে হাসির কী আনন্দ! সে তো হেসেই কুটি কুটি! নিশুর হাত চেপে ধরে বলল, 'দাদা একটা হাতির বাচ্চাকে নিয়ে চলো বাড়ি, আমাদের সঙ্গে পড়াশোনা করবে, ইশকুল যাবে। ওরা যে এমন সুন্দর কথা কইতে পারে তা তো আগে জানতাম না!'

ছড়া শুনতে শুনতে নিশু ও হাসির অন্যদিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে পশ্চিম দিক থেকে এক কালো মেঘ উঠে দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশখানা ছেয়ে ফেলেছে। গাছপালা দুলিয়ে হঠাৎ ঝড় উঠল! কড় কড় কড় বাজের আওয়াজে আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। নিশু ছুটতে লাগল হাসির হাত ধরে। বাঘের খাঁচার কাছাকাছি এসে সে ভয়ে কেঁপে উঠল। দেখল বাঘ খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে; খাঁচার সামনে মাঠের ওপর থাবা পেতে বসে তার দুটো বাচ্চার সঙ্গে খেলা করছে।

চোখে হাত চাপা দিয়ে সেদিক থেকে নিশু ফিরল।

যাবে কোথায়! চিড়িয়াখানার সব জানোয়ারই আজ খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে। বাঘ, ভালুক, সিংহ, হাতি, উট, বাঁদর সব চারদিকে লাফালাফি ছুটোছুটি করছে। কোথায় গিয়ে তারা প্রাণ বাঁচায়! নিশু হাসিকে নিয়ে একবার গাছের আড়ালে লুকোয়, একবার থামের পাশে বসে। চারিদিকে জন্তুজানোয়ারের ভীষণ গর্জন, আর তাদের ছুটোছুটির আওয়াজ! হাসি বুঝি ভয়ে অজ্ঞান হয়েই পড়ল।

নিশুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল পিন্টুবুড়োর কথা। বাসে আসবার সময় সে তো বলেছিল আজ তারা বিপদে পড়বে। সে সময়ে সে তার কথা বিশ্বাস করেনি, এখন পিন্টুবুড়োর ওপর কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল। পিন্টুবুড়ো বলেছিল কোনো বিপদে পড়লে তার নাম ধরে ডাকলেই সে এসে তাদের বাঁচাবে। আশায় নিশুর বুক ভরে উঠল, নতুন সাহস এল।

মস্ত একটা সাদা ভাল্লুক তাদের গা ঘেঁষে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল একটা নেকড়ে বাঘের ওপর। নিশু ভয়ে আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলতে লাগল-

'পিন্টুবুড়ো, পিন্টুবুড়ো,

ঘণ্টারামের মেজো খুড়ো,

দু-ভাই বোনে তোমায় ডাকি

এই বিপদে আসবে না কি!'

হঠাৎ একটা শব্দ হল! কালো মেঘ চিরে এক ঝলক আলো বেরিয়ে এল, ধারালো তরোয়ালের ফলার মতো। নিশু দেখল মস্ত একটা সিংহ দৌড়োতে দৌড়োতে এসে তাদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। যেন সে তাদের পিঠে চড়িয়ে নিতে চাইছে। নিশু ভয়ে দু-পা পেছিয়ে গেল! সিংহটা তার কাছে এসে তার পায়ে মাথা ঘষতে লাগল-যেন সে বলতে চায়, আমার পিঠে ওঠো, আমি তোমাদের বাড়ি রেখে আসব। নিশু হাসির কানে কানে বলল, 'হাসি, আমরা পিন্টুবুড়োকে ডেকেছি, সে নিশ্চয়ই এই সিংহকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের কাছে। ভয় পাসনি, ওর পিঠে চড়ে বোস।' দু-ভায়ে বোনে সিংহের পিঠে চড়ে বসল। নিশু প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল সিংহের কেশর, হাসি জড়িয়ে ধরল নিশুকে; সিংহ ছুটে চলল ঝোড়ো হাওয়ার মতো।

চারিদিকে কিছু দেখা যায় না। মেঘে ঢাকা আকাশ অন্ধকার। ঝম ঝমাঝম দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি এল। তারই মধ্য দিয়ে সিংহ দৌড়োচ্ছে, ওদের দু-জনকে পিঠে নিয়ে। চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তা, তারপরে মাঠ, তারপরে গঙ্গার তীর, সব পেরিয়ে এসে সিংহটা পাখির মতন পাখনা মেলে উড়ল আকাশে। আর বুঝি বাঁচবার উপায় নেই! নিশু কেঁদে উঠল-নিজের জন্যে নয়, তার মনে হতে লাগল কেবল হাসির কথা। কেন সে তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় এসেছিল, সেই তো তাকে এই বিপদে ফেলেছে! নিশুর কান্না শুনে সিংহ মুখ ঘুরিয়ে তাকাল; নিশু দেখল, এ তো সিংহের মুখ নয়, এ যে সেই বাসের পিন্টু বুড়ো-সেই চোখ সেই মুখ, সেই দাড়ি! পিন্টুবুড়ো সিংহ হয়ে এসেছে তাদের বাঁচাতে। নিশুর তবুও ভয় গেল না। সে চেঁচিয়ে বলল, 'পিন্টুবুড়ো, পিন্টুবুড়ো, আকাশ থেকে তুমি আমাদের মাটিতে নামিয়ে নিয়ে চলো; হাসি ভয়ে কাঁদছে!'

নীচের দিকে চেয়ে নিশু দেখল, কূল নেই, কিনারা নেই, অগাধ নীল জল দুলছে ঢেউয়ে, ঢেউয়ে! এ যে সমুদ্র! মাটি ছেড়ে কখন তারা সমুদ্রে এসে পড়েছে! হঠাৎ কোথা হতে একটা শোঁ শোঁ শব্দ আসতে লাগল। নিশু মাথা ফিরিয়ে দেখল একটা এরোপ্লেন আসছে তাদের দিকে!

'পালাও পালাও পিন্টুবুড়ো, এরোপ্লেনে তোমার ডানা কেটে যাবে-' বলতে বলতেই এরোপ্লেনটা এসে পড়ল তাদের ওপর; তার ধাক্কা লেগে পিন্টুবুড়োর দুটো ডানাই গেল কেটে। বিষম চিৎকার করে নিশু জড়িয়ে ধরল হাসিকে, এই বুঝি তারা পড়ল গিয়ে কূল-হারানো ঢেউ-দোলানো নীলসাগরের বুকে!

'হ্যাঁরে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অমন চেঁচিয়ে উঠলি কেন?' জেগে ওঠে নিশু দেখে, মা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে পাখা নিয়ে বাতাস করছেন আর নতুন একজন লোক হাসির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিশু 'চিড়িয়াখানা' বইটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেখানা তখনও তার বুকের উপর খোলা পড়ে রয়েছে।

নতুন ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে মা বললেন, 'ওঠ নিশু, দেখ দিল্লি থেকে তোদের নতুন খুড়ো এসেছেন। উনি খুব বড়ো শিকারি। তোরা শিকারের গল্প ভালোবাসিস, উনি তোদের অনেক গল্প বলবেন।' এই সময় হাসি চোখ রগড়াতে রগড়াতে জেগে উঠল, নতুন খুড়ো তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

নিশু অবাক হয়ে বারবার নতুন খুড়োর মুখের দিকে চাইতে লাগল, ঠিক যেন স্বপ্নের সেই পিন্টুবুড়ো, তেমনি চোখ, তেমনি ফুরফুরে সাদা দাড়ি। ওদিকে বাইরের আকাশও মেঘে অন্ধকার, ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। নতুন খুড়ো বললেন, 'বৃষ্টি থামলেই আমরা বেড়াতে যাব, ততক্ষণ তোমাদের তিনপেয়ে বাঘের গল্প বলি।' তিনি বিছানায় উঠে বসলেন, নিশু আর হাসি দু-জনে তাঁর দু-দিক ঘেঁষে গল্প শুনতে বসল।

নিশুর চোখে কিন্তু তখনও কেবল ভাসছে তার সেই স্বপ্নে দেখা পিন্টুবুড়োর মুখ!

*চৈত্র ১৩৪১*






**সুকুমার দে সরকার**

এবারে জন্মদিনে মামা নিলুকে একটা চার নম্বর ফুটবল দিয়েছিলেন। নিলু একটা ফুটবল টিম গড়ে তুলেছে। পাড়ার হাঁদা, গোপাল, নোদো, ক্লাসফ্রেন্ড বোকা ও অসীম সবাই মেম্বার। ও পাড়ার সেই ঝগড়াটে ভোম্বল তার ভুলো কুকুরকে নিয়ে এসে বলেছিল, ‘ভাই, আমরাও মেম্বার হব।’ নিলু বলল, ‘পথ দেখো বাপু, এখানে নয়।’ ভোম্বলটা তো একটা ‘স্পাই’, তাদের টিমের খবর গ্রাস-হপারদের বলে দিক আর কি!

টিমের নামকরণ নিয়ে একটু গোলমাল হয়েছিল প্রথমে। ক্যাপ্টেন নিলু বোস বলল, ‘স্বরাজ ফুটবল ক্লাব।’ ভাইস ক্যাপ্টেন বোকা রায় বলল, ‘দূর, তার চেয়ে হামিদ স্পোর্টিং ভালো।’ নোদো আর অসীম বলল, ‘না, ইস্টবেঙ্গল’; তাদের ঢাকায় বাড়ি। তখন ক্যাপ্টেন চটেমটে বলল, ‘যাও, আমার বল দেব না।’ মেম্বাররাও পেছপা নয়; তারা বলল, ‘ভারি তো বল! যাও যাও একলা খেলোগে। চলে আয় রে তোরা!’

কিন্তু কারোর যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। অসীম বলল, ‘আমার পিসতুতো ভাই কানাইয়ের পাঁচ নম্বর মাগগ্রেগর আছে। ভারি তো এ বল!’

বোকা বলল, ‘কাল আর্য স্পোর্টিং আমায় সাধাসাধি করছিল, তাদের ক্লাবে খেলবার জন্য। তাদের কেমন লাল ইউনিফর্ম আছে। ভারি ইয়ে ...’

শেষে মামা এসে থামিয়ে না দিলে ব্যাপারটা কত দূর গড়াত কে জানে? মামাই ঠিক করে দিলেন, টিমের নাম ‘ছাত্রদল’; নিলু ক্যাপ্টেন আর বোকা ভাইস ক্যাপ্টেন।

যাহোক নিলুদের বাড়ির পেছনে দেড়গজি কচুবনে ‘ছাত্রদলের’ খেলা চলছিল মন্দ নয়; কিন্তু দেশপ্রিয় মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শিল্ডে এন্ট্রি করে দিয়ে অবধি ক্যাপ্টেন নিলুর আর ভাবনার অন্ত নেই।

কত টিম তো এন্ট্রি করেছে-গ্রাস-হপারস, আর্য স্পোর্টিং, বয়েজ ওন; কিন্তু তাদের প্রথম খেলা পড়ল একটা অজানা টিমের সঙ্গে। ‘কার্ডস’-কী নাম রে বাবা! ওয়ার্ড বুকে তো লেখা আছে ‘কার্ডস’ মানে তাস। তাস আবার টিমের নাম হয়! তার উপর ভোম্বল আবার সেদিন শাসিয়ে যাওয়াতেই বেশি ভয় হয়েছে-‘দেখো না কার্ডস তোমাদের দশ গোল ঠুসে দেবে। কী ছোটে ওদের খেলোয়াড়রা, আমার ভুলোও পারে না তাদের সঙ্গে। ইয়া মোটামোটা পা তাদের।’

এরকম শুনলে ভয় হবে না ক্যাপ্টেনের?

রবিবার দিন দুপুর বেলা খেয়ে-দেয়ে নিলু বেরোবার জোগাড় করছিল। আজ খেলা, আজ কখনো বিকেল অবধি চুপ করে থাকা যায়!

নিলুর চালিয়াতচন্দর কাকা হাঁক দিলেন, 'নিলে, কোথায় বেরোচ্ছিস রে এখন? শিগগির গিয়ে শুয়ে পড়!'

নিলু কাঁদো-কাঁদো হয়ে জবাব দিল, 'আজ যে আমাদের ম্যাচ আছে।'

'হুঁ, ম্যাচের নিকুচি করেছে! নিয়ে আয় দেখি ওয়ার্ড বুকটা!'

সিগারেট ধরাতে ধরাতে চন্দরকাকার চিমসে বন্ধু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঃ, আজকালকার ছেলেগুলো যত ইয়ে!'

ওয়ার্ড বুক নিয়ে যাওয়ার চেয়ে নিলু শুয়ে পড়াই সুবিধা মনে করল।

চন্দরকাকা চিমসে বন্ধুর সঙ্গে একমনে দাবার ঘুঁটি টিপছেন দেখে নিলু পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ল। বোকার বাড়ির সামনে এসে ডাকল, 'বোকা, বোকা-!' বোকাটাও যে সাড়া দেয় না! নিলু আবার ডাকল, 'বোকা-বোকা-অ বোকা-অ ...'

দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল। একজন ইয়া মোটা লোক রাঙা জবাফুলের মতো চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এসে হেঁড়ে গলায় বলল, 'কে হে চালাক, ঠিক দুপুর বেলা বোকা বোকা করে চেল্লাতে লেগেছ? ভালোমানুষদের ঘুমোবার জো নেই! ভাগো ভাগো শিমের বিচি, হতচ্ছাড়া, টোকো আম ...'

নিলু চোখ-কান বুজে দৌড় মারল। পেছনে তখনও বিশেষণ শোনা যাচ্ছিল-'কানকাটা, পায়রার ডিম, ঘোড়ার গোবর ...!' যখন একটু হুঁশ হল নিলুর, সে দেখল খেলার মাঠের সামনে এসে হাজির হয়েছে। একজন লোক ডাকছে 'ছাত্রদল, কার্ডস'-ওমা! বোকা, নোদো, অসীম, হাঁদা সবাই তো হাজির!

বোকাকে দেখেই নিলুর শরীর রাগে জ্বলে গেল। তার জন্যেই তো এই বিপদ আজ।

'কোথায় ছিলি রে বোকা?'

'আজ পিসেমশাই এসেছেন, তাই আগেই পালিয়ে এসেছিলাম। এমন বদরাগি পিসেমশাই, তার ওপর কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। তোকে তাড়া লাগিয়েছেন বুঝি?'

'না, সন্দেশ খেতে ডেকেছিলেন!'



খেলার হুইসেল পড়ল। তারা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। কার্ডস কার্ডস? কই তাদের বিপক্ষ কই? কার্ডস-কার্ডস? অবাক চোখে নিলু দেখল পিলপিল করে নামছে তাদের দল। বেঁটে মোটা হরতনের সাহেবটা দাড়ি নাড়তে নাড়তে কিক করে মাঠে নামল। চারিদিক থেকে পড়ল হাততালি। গোলামের দল সার বেঁধে ফরোয়ার্ডে দাঁড়িয়েছে, বেঁটে বেঁটে

গুণ্ডাগোছের সব চেহারা। সাহেবগুলো ব্যাক আর হাফ-ব্যাক। গোলে দাঁড়িয়েছে হরতনের রানি।

নিলু বলে উঠল, 'না না, এ ম্যাচ হতেই পারে না!' হরতানের সাহেব এগিয়ে এসে বলল, 'কেন হে খোকা? আমরা কি এন্ট্রি করিনি?'

থতমত খেয়ে নিলু বলল, 'তোমরা বড্ড বড়ো ...'

'মেপে দেখো,' বলে হরতনের সাহেব নিলুর পাশে এসে দাঁড়াল। মোটে নিলুর কাঁধ সমান।

'দেখেছ তো খোকা?'

চটেমটে নিলু বলল, 'খোকা খোকা বোলো না বলছি!'

'তবে কী বলব?'

'আমি ক্যাপ্টেন নিলু বোস!'

মাটির ওপর এক সামারসল্ট খেয়ে হরতনের সাহেব বলল, 'গুডমর্নিং ক্যাপ্টেন'! বলে নিলুর হাতটা কষে ঝেঁকে দিল।

তারপর খেলা শুরু হল। নিলু বলটা বোকাকে পাস করে দিতে যাচ্ছে এমন সময়ে ইশকাবনের গোলামটা ছোঁ মেরে এসে হাতে করে বলটা নিয়ে ছুট মারল।

'হ্যান্ডবল, হ্যান্ডবল!' নিলু চেঁচিয়ে উঠল।

ইশকাবনের গোলাম বলল, 'কক্ষনো নয়!'

'আলবত হ্যান্ডবল! হাতে করেছ হ্যান্ডবল নয় কীরকম?' ইশকাবনের গোলাম বলল, 'তাহলে পায়ে ঠেকলে লেগবল, মাথায় ঠেকলে হেডবল, চোখে ঠেকলে আইবল, ব্যাটে ঠেকলে ব্যাটবল ... তাহলে তো খেলাই হয় না!'

নিলু জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাট আবার কোথা হতে এল?'

'তাও জানো না? খেলতে এসেছ কেন? ব্যাটদের শুধোও।' মাঠের এক কোণ থেকে কেঠো গলায় একটা ব্যাট বলে উঠল, 'আদি নিবাস মিহিজামের শালবন, হাল সাকিন মোহনতোষ ব্রাদার্স!'

নিলু ক্রমশই বোকা বনে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে নোদো এসে ইশকাবনের গোলামের হাতের বলে এক কিক কষাল। বলটা নিলুর পায়ের কাছে পড়তেই নিলু সেটা নিয়ে মারল চোঁ চোঁ দৌড়, বিপক্ষের গোলের দিকে। পেছন থেকে শুনল ইশকাবনের গোলামটা চেঁচাচ্ছে- 'লেগবল, লেগবল ...'

ড্রিবল করে ব্যাকেদের মধ্য দিয়ে বলটা বার করে নিলু গোলের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। গোলকিপার হরতনের রানি তাই দেখে উ-উ-উ বলে চিৎকার করতে করতে একেবারে অজ্ঞান! গোলপোস্ট দুটো হঠাৎ মাটি থেকে উঠে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে উলটো দিকে দৌড় মারল। নিলু যতই এগোয় তারাও ততই ছোটে!

পেছনে যত দশ নয় আটা সাতা দর্শক ছিল, তারা এদিকে লাল-কালো হাত তুলে চেঁচাতে লেগেছে, 'ফাউল, ফাউল! জোচ্চোর রেফারি, মাঠ থেকে বার করে দাও।'

গোলমাল ক্রমশ বেড়েই চলল।

হঠাৎ কোথায় যেন কী হয়ে গেল! নিলু বুঝতেই পারল না যে মাঠ থেকে সে কী করে খাটের উপর চলে এল। ওধারে চন্দরকাকা আর তার চিমসে বন্ধু মহা হইচই লাগিয়েছেন।

-কিস্তি!

-কক্ষনো নয়!

-আলবত!

দুমদাম টেবিল চাপড়ানোর শব্দ।

এদিকে বোকা তার খাটের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আজ পিসেমশাই এসেছেন তাই পালিয়ে এলাম। এমন বদরাগি পিসেমশাই ...!'

*বৈশাখ ১৩৪২*




# রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে অনেক বছর আগেকার কথা। ১৯১৪ সালে ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধেছিল। যুদ্ধ বাধবারও কয়েক মাস আগেকার একটা গল্প বলছি। গল্পটা বানানো নয়, একেবারে সত্যি ঘটনা।

সেই সময় নৈনিতাল ও আলমোড়ার মাঝামাঝি রামগড় পাহাড়ে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। সেখানে যাওয়া সহজ ছিল না, এত চড়াই ভাঙতে হয় যে সে রাস্তায় মোটর যেতে পারত না। রামগড়ে যেতে গেলে বেরিলিতে গাড়ি বদল করে ছোটো রেল লাইনে পুঁচকে ট্রেনে করে কাঠগুদাম স্টেশনে নামতে হত। এখান থেকেই ওই অঞ্চলের হিমালয় পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। কাঠগুদাম থেকে ঘোড়ার পিঠে পাহাড়ে উঠতে হয়। যারা ঘোড়ায় চড়তে ভয় পায় তাদের জন্যে ডান্ডি বলে একরকম হাতলওয়ালা আরামচেয়ার পাওয়া যায়, চারজন বাহক সেটা কাঁধে করে নিয়ে যায়। আমাদের বাড়িটা রামগড় পাহাড়ের উপরে ৭০০০ ফিট উঁচুতে ছিল, কাঠগুদাম থেকে ১৬ মাইল পথ উঠে যেতে হত। আমার বাবা বাড়িটার নাম দিয়েছিলেন 'হৈমন্তী'। বেশ সুন্দর নাম নয় কি? হৈমন্তী নামের মধ্যেই পাহাড়ের ঠান্ডা ভাব যেন বেশ রয়েছে।

গরমের ছুটি পড়লে বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন রামগড়ে। শান্তিনিকেতনে তখন দারুণ গরম লু বইছে, জলের অভাবে গাছপালা সব মরো-মরো। পাহাড়ে পৌঁছে সেই গরম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বড়ো আরাম বোধ হল। আমরা কয়েকজন হৈমন্তীতে গিয়ে গুছিয়ে বসবার পর অনেক লোক সেখানে এসে পড়লেন। অতিথিতে বাড়ি ভরে গেল। যদিও হৈমন্তী পাহাড়ের একটা নিতান্ত নিরালা জায়গায়, লোকের বসতি বা হাটবাজার থেকে দূরে, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভাব হল না। বাড়ির সঙ্গে মস্ত বড়ো বাগান ছিল; আপেল, পেয়ারা, পিচ, চেরি প্রভৃতি ভালো ভালো ফলের গাছ ছিল বিস্তর। বাগানে সবজিও হত প্রচুর। খুব মজা করেই আমরা সেই সব ফল ও সবজি খেতুম।

গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে এলেন অতুলপ্রসাদ সেন ও সি.এফ. এন্ডরুজ। অতুলবাবুর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি ছিলেন কবি-অনেক গান বেঁধেছিলেন, তাঁর গান শুনতে সকলে ভালোবাসতেন। আর সি. এফ. এন্ডরুজ সাহেব হলে কী হয়, তিনি আমাদের দেশকে নিজের দেশ করে নিয়েছিলেন। তিনি উৎপীড়িত ও গরিবদের সর্বদা সাহায্য করতেন বলে লোকে তাঁর 'দীনবন্ধু' নাম দিয়েছিল। আমাদের কাছে আরও এলেন আমার ভাইপো দিনেন্দ্রনাথ ও মুকুল দে। দিনেন্দ্রনাথ খুব ভালো গান গাইতে পারতেন, বাবার সব গান তিনি জানতেন বলে লোকে তাঁকে বলত 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারী'। মুকুল দে তখন শান্তিনিকেতন ইশকুলের ছাত্র, তার আঁকার খুব শখ, রাতদিনই কাগজ পেনসিল নিয়ে সকলের ছবি এঁকে বেড়াত। পরে সে আর্টিস্ট বলে নাম করেছে।

এতগুলি লোক এক বাড়িতে, আমাদের খুব জমেছিল সেবার। রোজ সকাল বেলায় পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার সামনে আমরা সকলে বসতুম। সেখান থেকে যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই মনোরম দৃশ্য। কত পাহাড়-পর্বতের শ্রেণি, তাতে কত রকমের গাছ। পিছন দিকে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত গভীর বন, তার ভিতর কত বিচিত্র রকমের সুন্দর অর্কিড ফুল। সবচেয়ে ভালো লাগত দেখতে বরফের পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য। সকাল বেলার রোদে বরফে ঢাকা পর্বতশিখরগুলি ঝকঝক করত আমাদের চোখের সামনে। রোজই সেখানে আমাদের গানের মজলিশ বসত। কত নতুন গান বেঁধে বাবা আমাদের শোনাতেন। অতুলপ্রসাদ সেনও তাঁর অনেক গান শোনাতেন। অতুলবাবুর ফরমাশ মতো দিনেন্দ্রনাথকে বাবার পুরোনো গান গাইতে হত। গানের মজলিশ চলত দুপুর পর্যন্ত। বনমালীর তাগিদে তখন গান বন্ধ করে খেতে যেতে হত।

গান, গল্পগুজব, কাব্য-আলোচনা, কবিতাপাঠ নিয়ে রামগড়ের হৈমন্তী বাড়িতে আমাদের দিনগুলি খুব আনন্দে কেটেছিল। এর মধ্যে একটি ঘটনা হল-তারই গল্প তোমাদের বলব বলে লিখতে বসেছি।

মুকুল কারও কাছ থেকে শুনেছিল রামগড় পাহাড়ের আশেপাশে অনেক বুনো জন্তুজানোয়ার আছে। সাহেবরা এখানে শিকার করতে প্রায়ই আসে। সেই শুনে অবধি তার শিকারের ভারি লোভ হল। আমাদের রাতদিন অনুরোধ করত, 'চলুন, শিকারে যাই; দাদা, আমাকে শিকারে নিয়ে চলুন।' তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'শিকার করতে গেলে বন্দুক লাগে, এখানে শিকার করতে আসিনি, বেড়াতে এসেছি, বন্দুক আনা হয়নি।' এই কথা শুনে সে চুপ করে গেল, ক-দিন আর কিছু বলে না। আমিও নিশ্চিন্ত হলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলুম না। একদিন ভোর বেলায় আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে মুকুল আমাকে বলে, 'দাদা, উঠুন, চলুন-সব ঠিক আছে।' দেখলুম ঠিকের মধ্যে একটি মান্ধাতা আমলের গাদা বন্দুক। আমাদের বাড়ি তদারক করে যে মুনশি, তার কাছ থেকে বন্দুক জোগাড় করেছে কেবল নয়, তাকে সুদ্ধু ধরে নিয়ে এসেছে।



মুকুল বলল, 'মুনশিকে নিয়ে এসেছি। সে আমাদের পথ দেখাতে পারবে, জঙ্গলে আমরা হারিয়ে যাব না।'

মুকুল নাছোড়বান্দা। না গিয়ে উপায় নেই। পকেটে কিছু খাবার নিয়ে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই বন। গভীর জঙ্গলে ঢুকে

পড়লুম। সেখানে আদ্যিকালের বুড়ো বুড়ো ওক গাছ। তাদের ডালপালা শ্যাওলার মতো মস দিয়ে ঢাকা। গাছের তলায় এত অন্ধকার যে গা ছমছম করে। ওকের বন শেষ হল তো পাইনের বন আরম্ভ হয়। পাইনের পাতা সুতোর মতো সরু সরু লম্বা বলে ইংরেজিতে নিডলস (সুচ) বলে। শুকনো সেই পাতা পড়ে মাটিতে পুরু হয়ে বিছিয়ে থাকে। তার উপর দিয়ে হাঁটা বড়ো মুশকিল, পা হড়কে যায়। প্রত্যেক গাছের গায়ে একটি করে মাটির ভাঁড় বাঁধা থাকে, গাছ থেকে যে আঠা বেরোয় তাই ধরবার জন্য। পাইনের আঠা থেকে রজন ও তারপিন তৈরি হয়। তাই পাইনের বন সুগন্ধে ভরা।

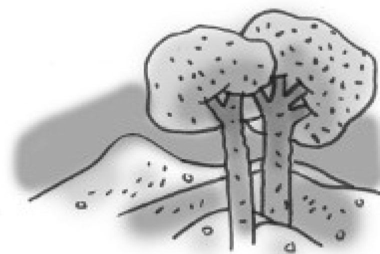
এইরকম কত বন, কত পাহাড়, কত ঝরনা পার হয়ে আমরা চললুম। সমস্ত দিন ঘুরে বেড়ালুম, না একটা বাঘ, না একটা ভাল্লুক, এমনকী না একটা শেয়াল দেখতে পাওয়া গেল। কোথাও উপরের পাহাড় থেকে ঝিরঝির করে জল নেমে আসে। জল দেখলেই মুকুল থমকে দাঁড়ায়। জলের ধারে পায়ের কোনো দাগ দেখতে পেলেই কানে কানে আমাকে বলে-

'দাদা, আছে, আছে, বাঘের পায়ের দাগ দেখেছি, চলুন দাগ ধরে এগিয়ে যাই।'

আবার চলতে থাকি। কিন্তু জ্যান্ত কোনো জীবেরই সন্ধান পাওয়া গেল না। পেলে যে কী বিপদ হত তা আমি বুঝতে পারছিলুম। সঙ্গে একটিমাত্র বন্দুক, তাও সিপাহি বিদ্রোহ আমলের হবে। ভগবানের দয়ায় বাঘ-ভাল্লুকরা দেখা দিল না। সন্ধ্যা হয়ে আসে, মুনশিকে বললুম, এখন বাড়ি ফেরবার পথ দেখিয়ে দাও। হৈমন্তী থেকে অনতিদূরে একটা মস্ত বড়ো ওক গাছ ছিল। সমস্তদিন পাহাড় ওঠা-নামা করে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। পা আর চলে না। আমরা তিনজনে বসে পড়লুম সেই গাছতলায় গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে। যেই বসে একটু আরাম করছি, মাথার উপরে ডালপালার মধ্যে খড়খড় শব্দ হল, ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। দাঁড়িয়েছি আর মেটে রঙের প্রকাণ্ড একটা ভাল্লুক ঝুপ করে পড়ল মাটিতে ঠিক আমাদের সামনে। নেমে পড়েই দু-পা তুলে আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমার পিছনে একটি গোঙানির শব্দ শুনতে পেলুম। বন্দুক তুলতে যাব-কে আমাকে জাপটে ধরল। বন্দুকটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য টানাহেঁচড়া করছি-এমন সময় ভাল্লুকটা মুখ ফিরিয়ে হুড়হুড় করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমার মনে হল চলে যাবার সময় তার মুখে যেন একটু বিদ্রূপ-হাসি দেখা গেল। ভাল্লুক কি হাসতে পারে? কে জানে। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে সে কি সত্যি কৌতুক বোধ করল? কী জানি, তবে চলে গেল তাই রক্ষে। আমরা আর দেরি করলুম না, বিশ্রাম করা চুলোয় গেল-ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলুম পা চালিয়ে।

যতদিন তারপর আমরা রামগড়ে ছিলুম, মুকুল আমার কাছে শিকারের কথা ঘুণাক্ষরেও আর তোলেনি।

*বৈশাখ ১৩৬৮*






# আশাপূর্ণা দেবী

এদের কাকুতিমিনতি আর হাত ধরে ঝুলোঝুলির জ্বালায় সুন্দরবনের সেই ভয়ংকর কাহিনিটাই শুরু করতে হল আমায়!

সেই আমার মাছ ধরতে গিয়ে নৌকো ওলটপালট হয়ে সুন্দরবনের ধারে ছিটকে গিয়ে পড়া, আর পথ হারিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে নরখাদক মানুষদের হাতে প্রাণ যাওয়ার কাহিনিটা।

এতটুকু বাচ্চাদের কাছে এ গল্প আমি কখনো করি না। করতে সাহসই হয় না। দরকার কী বাবা, এসব শুনে-টুনে যদি রাত্রে স্বপ্ন দেখে আঁতকে ওঠে? উঠতেই পারে, খুবই স্বাভাবিক। কারণ যতই হোক-মানে, যতই গল্পখোর হোক, শিশু বই তো নয়! আর শিশুদের স্বপ্নের বিভীষিকায় আঁতকে ওঠা থেকে কত কী-ই না ঘটতে পারে!

তেমন কিছু ঘটলে ওই বাচ্চাদের মা-বাবা যে আমাকে আস্ত রাখবে, এ ভরসা রাখি না। কী দরকার বাবা তবে আমার অত রিস্ক নেবার?

নইলে গল্পের কিছু অভাব আছে জগতে? ছেলেবেলায় শুনিনি আমরা? বেলুমাসি আর ছোটোকাকা জগতের সমস্ত ভূত পেতনি ব্রহ্মদত্যি আর মামদো ভূতের গল্প বলেননি আমাদের?

কিন্তু সেসব গল্পও আমি ছোটোদের বলি না। বলি কী করে, ওর প্রতিক্রিয়া তো জানি। শোনবার সময় আমরা, মানে বাড়িতে যে গোটা পাঁচ-ছয় ছেলে ছিলাম আমরা, দিব্যি বেলুমাসির কি ছোটোকাকার গা ঘেঁষে বসে চোখ গুলি গুলি করে গল্পগুলো গিলতাম, গায়ে কাঁটা দিলে বা বুক ধড়ফড় করলে কি মাথা ঘুরলেও শুনতে ছাড়তাম না।

ডালমুট কি ঝালমুড়ির নুন লঙ্কা যেমন চোখে জল নিয়েও চেটে চেটে খেতে ইচ্ছে করে, তেমনি গায়ে কাঁটা নিয়েও শুনতে ইচ্ছে করত।

কিন্তু তারপর?

তারপর যা হত! ও বাবা!

সন্ধ্যে হতে-না-হতেই আমাদের ক-জনের অবস্থা হত ঠিক পিণ্ডিখেজুরের মতো। পাঁচ-ছ-জন মিলে এমন তালগোল পাকিয়ে ডেলা বেঁধে থাকতাম যে আলাদা করে চিনে বার করা যেত না।

দালান পার হয়ে সিঁড়িতে যাচ্ছি তো ওই ছ-জনে হাত ধরাধরি করে, সিঁড়িতে উঠছি তো সবাই কাঁধ ধরাধরি করে, আর পিঁড়ি পেতে ভাত খেতে বসেছি তো প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে।

আর রাত্তিরে শুতে যাওয়া?

সে তো কেটে ফেললেও মা কি পিসিমা শোবার আগে নয়!

এসব তো জানি আমি।

সবই জানি।

জেনেশুনে কি আমার আদরের বাচ্চা-টাচ্চাগুলোকে সেই বিষ খেতে দিতে পারি?

তাই গল্পের বইয়ের গল্প থেকে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সে গল্প এদের ভালো লাগছে না, 'গল্প বলো, ভালো গল্প', 'তোমার নিজের গল্প বলো' বলে হাত ধরে ঝুলোঝুলি করছে!

তা যে-সে তো নয় এরা যে এদের কথা অবহেলা করি! এরা হচ্ছে আমার ছোড়দির সাক্ষেত মামাতো পিসশাশুড়ির ছেলের-মেয়েরা, আর মেয়ের ছেলেরা।

অগত্যাই আমার 'নিজের গল্প' শুরু করতে হল।

একেবারে সাল তারিখ দিয়ে শুরু করি। ছোটো বলে যেমন-তেমন করে সেরে দেওয়া আমার ভালো লাগে না। এই ধরো যেমন নেমন্তন্ন বাড়িতে! ছোটোদের খেতে বসিয়ে ভালো ভালো জিনিসগুলো দিতেই চায় না! বাড়ির কর্তারা এসে হাঁ-হাঁ করে পরিবেশনওলাদের হুকুম দেবেন, 'কাটলেট ছোটোদের পাতে নয়, ছোটোদের পাতে নয়; ফ্রাই একখানা, স্রেফ একখানা! ছোটো খুরিগুলো কোথায় গেল বাচ্চাদের দই দিতে! মিষ্টি জিজ্ঞেস করে দেবে, ফেলাছড়া না যায়।'

কেন বাপু? ছোটোদের বুঝি মানসম্মান নেই? চাইতে পারে তারা? একমাত্তর পান ছাড়া আর কক্ষনো কিছু তো চেয়ে খাইনি আমি।

অবিশ্যি এখন কী হয়েছে জানি না।

এখন বোধ হয় ছোটোদের শুধু 'ছোটো' না ভেবে মানুষই ভাবা হয়। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় তা ভাবা হত না বাপু, এই সত্যি কথা বলছি।

আমি কিন্তু মানুষই ভাবি। তাই ওদের কাছে গল্প বললে গুছিয়েই বলি। শুরু করলাম-

'উনিশশো উনচল্লিশ সালের আগস্ট মাসের এক রাত্তিরে ছোট্ট একখানা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মাছ ধরতে-'

পিসশাশুড়ির মেয়ের বড়ো ছেলে বলে ওঠে, 'ধ্যেৎ, রাত্তিরে আবার কেউ মাছ ধরে নাকি? আমার জ্যাঠামশাই তো দিনের বেলা-'

আমি বাধা দিয়ে বলি, 'আহা সে তো ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে। জাল ফেলে মাছ রাত্তিরেই ধরে।'

'ও!' বলে কাছে ঘেঁষে এল মেয়ের ছোটো ছেলে। নীল কাচের মার্বেলের মতন ঝকঝকে চোখ তুলে মহোৎসাহে বলল, 'তারপর?'

ছেলেটার এই কাচের মতন চোখ আর দেবদূতের মতন মুখ দেখতে এত ভালো লাগে আমার! ওকেই সবচেয়ে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। তাই গল্প বলার সময় ওর পিঠেই হাত রাখি।

'তারপর-' আমি বলি, 'রাত যখন বেশ গভীর হয়ে উঠেছে, আর গভীর জলের ইয়া বড়ো বড়ো মাছগুলো জলের ওপর উঠে এসেছে চাঁদের আলো খেতে-'

পিসশাশুড়ির ছেলের বড়ো মেয়ে বলে ওঠে, 'আহা, কী কথার ছিরি! চাঁদের আলো আবার খায় মানুষে?'

গম্ভীর হয়ে বলি, 'আমি মানুষের কথা বলিনি, বলেছি মাছের কথা।'

'আহা, সে একই কথা, মাছ বলে কি মানুষ নয়?'

'মাছ যদি মানুষ হয়, আমরাও তাহলে মানুষখেগো বুনো'-আমি বলি।

নীল কাচের মার্বেল বলে ওঠে, 'আঃ , কথা বলছিস কেন? শুনবি তো মন দিয়ে?'

'বেশ বাবা বেশ, শুনছি বাবা শুনছি-' সবাই গুছিয়ে বসে।

আমি আবার শুরু করি-'সেই গভীর রাত, চারিদিকে 'নি-নি' অন্ধকার, আর একলা আমি সেই কালো ঢেউ-তোলা জলে জাল ফেলছি, এমন সময়-'

'নতুন মামা',-আবার ব্যাঘাত পড়ে, 'জাল বুঝি একলা ফেলে? আমরা তো পুরী গিয়ে দেখেছি দু-জন-তিনজনে মিলে জাল ফেলে।' ছেলের বড়ো মেয়েই ফের বলে এ কথাটি।

আমি স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলি, 'ওরে, গভীর জলের মাছ তুলতে হলে একলাই জাল ফেলতে হয়। দু-জন-চারজন থাকলেই তো কথা, আর কথা কানে গেলেই ওরা ফের গভীর জলে পালায়।'

নীল মার্বেল আবার ওদের তাড়া দেয়, 'ফের কথা বলছিস? আবোল-তাবোলের 'এক যে রাজা থাম না দাদা'র মতন করবি বুঝি? না, নতুন মামা, শুনো না ওদের কথা, তাড়াতাড়ি বলো।'

ওর উৎসাহে চকচকে চোখ দুটোই আমাকে বিগলিত করে ফেলে, তাই আবার ওকে কাছে টানি; টেনে বলি, 'হ্যাঁ, কী বলছিলাম ... এমন সময় ইয়া প্রকাণ্ড একটা কী যেন জলজন্তু হঠাৎ ডিঙির তলায় মারল এক ধাক্কা! মনে হল কোনো পাহাড় এসে ধাক্কা মারল।'

'নতুন মামা,' নীল কাচের মার্বেল আগ্রহে আর উত্তেজনায় ঠিকরে ওঠে, 'জলহস্তী বুঝি?'

ওর আগ্রহ দেখে মনে হল জলহস্তী হলেই ভালো হত, কিন্তু হবার উপায় নেই। ওটা তিমি মাছ, কারণ তার পরের বারই যে ল্যাজের ঝাপটা দেবে ও আমায়। জলহস্তীর কি লেজ থাকে? থাকে না, তাই কাচের মার্বেলকে একটু মঃনক্ষুণ্ণ করেই বলতে হয়, 'না জলহস্তী নয়, তিমি মাছ!'

'তিমি মাছ! ও মা!' হাততালি দিয়ে ওঠে আর একজন, 'তিমি মাছ আমার খুব ভালো লাগে। তারপর কী হল?'

'তারপর? তারপর হল সেই কাণ্ড! যার জন্যে আমাকে একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়তে হল সেই সুন্দরবনের গহন অরণ্যের ধারে।'

'কী করে?' বলল একজন।

'আরে বাবা, এটা জানিস না, তিমি কখনো শুধু মাথার ঘাই মেরেই থেমে যায় না! তিমিরা ঠিক যা যা করে ও-ও তাই করল। মাথায় ধাক্কা দিয়েই ঘুরে গিয়ে মারল লেজের

এক ঝাপট!'

'মারল?' নীল মার্বেল উৎসাহে নীল বালব হয়ে ওঠে।

আমি ওকে কাছে টেনে বলি, 'মারবে না? যার যা স্বধর্ম সে তা করবে তো? ডিঙি নৌকোর যা স্বধর্ম সেও তাই করল, ওই ধাক্কায় স্রেফ রবারের বলের মতো লাফিয়ে, উলটেপালটে ডিগবাজি খেয়ে আমাকে আছড়ে ছুড়ে দিল ডাঙায়। মানে সুন্দরবনে।'

'বাঃ, সুন্দরবনের দিকেই বা তুমি মাছ ধরতে গেলে কেন?' বলল সেই পাকা মেয়েটা-পিসশাশুড়ির ছেলের বড়ো মেয়ে।

গেলাম কেন সে কথা বুঝিয়ে বলার আগেই কাচের মার্বেল ভীষণ রেগে ওঠে, 'খালি খালি বুঝি দেরি করিয়ে দিবি তোরা? শুনতেই দিবি না? সুন্দরবনের কাছেই কি আর গিয়েছিলেন নতুন মামা? এমনি বাড়ির কাছের গঙ্গাতেই হয়তো জাল ফেলেছিলেন, তিমি মাছটাই তো এই কাণ্ড করল।'

'বাড়ির কাছ থেকে সুন্দরবনে নিয়ে গিয়ে ফেলল?' পাকা মেয়েটা অবিশ্বাস করে।

কাচের মার্বেল চেঁচিয়ে ওঠে, 'ফেলবে না? ওদের জোর কত তা জানিস? বিলেতে নিয়ে গিয়েও ফেলতে পারে ওরা।'

আমি মুখ গম্ভীর করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলি, 'বিলেতের কথা অবশ্য ঠিক জানি না আমি। আমাকে অন্তত ফেলেনি কখনো। কিন্তু সুন্দরবন আমার হাড়ে হাড়ে প্রত্যক্ষ। কিন্তু তোমাদের যদি শুনতে ভালো না লাগে-'

'না না, খুব ভালো লাগছে, বলো বলো।' ঐকতান বাদন শুরু হয়ে যায়। 'বলো বলো' আর থামতে চায় না।

হেসে ফেলে থামিয়ে দিয়ে বলি, 'ওই যে বলছিলাম হাড়ে হাড়ে? ওইটাই আসল কথা। যখন পড়েছিলাম তখন তো আর জ্ঞানগম্যি ছিল না। তারপর যখন সকাল হয়ে চলে গিয়ে দুপুর হয়েছে, মুখে চোখে আগুনের মতো রোদ এসে পড়েছে, তখন জ্ঞান ফিরল। ফিরল তো, কিন্তু আমি যে পাশ ফিরতেও পারছি না। হাড়গোড় সব চূর্ণ।'

'চূর্ণ!' ওদের সকলের কণ্ঠ থেকে একযোগে হতাশা আর বেদনা ঝরে পড়ে।

আমি আশ্বাস দিয়ে বলি, 'আহা সত্যিই কি আর গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে? তা নয়, ভেতরে ভেতরে ছাতু হয়ে গেছে আর কি। যেমন পাঞ্ঝা বরফের বরফ। ও, তোরা বুঝি পাঞ্ঝা বরফ খাসনি কখনো? তবে আর কী বুঝবি। যাক, ভীষণ ব্যথা গায়ে, সেই নিয়েই গড়াতে গড়াতে একটা গাছের তলায় পৌঁছে ছায়ায় পড়ে রইলাম। তখনও তো জানি না কী ঘটেছে কপালে, কোথায় এসে পড়েছি।

'তখন ভাবছি একটু উঠে যেতে পারলেই এই জঙ্গলটা থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে যাব আর একটা দোকানে উঠে যত পারব পেট ভরে খেয়ে নেব। পয়সা? সে তো কখন পকেট থেকে হাওয়া, জলে কি জঙ্গলে। কিন্তু এই যে খাঁটি সোনার সিল আংটিটি, যেটা পইতের সময় পিসিমা দিয়েছিলেন-এইটা বুকের বল। দোকানিকে দিলে কি আর যত পারব খেতে দেবে না? পেটের মধ্যে বুঝলে কিনা-তখন একেবারে খাণ্ডবদাহন! বকরাক্ষস আর কুম্ভকর্ণের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারগুলো মোটেই বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে না তখন।

'এমনকী মনে হচ্ছে তিনি মাছটা যখন আমাকে আছড়ে দিল তখন যদি এক-আধটা জলের তলার ছোটোখাটো মাছও আছড়ে দিত, ওই রোদেই ঝলসে খেয়ে নিতাম।

'কিন্তু হা অদৃষ্ট, মাছ তো দূরের কথা একটা মাছিও নেই সেখানে। শুয়ে শুয়ে মনে পড়তে থাকে এযাবৎ জীবনে কবে কোথায় কখন কী কী খাবার পাতে ফেলে উঠে গেছি! উঃ , ইস! সে কী কম! কম খাওয়ার জন্যেই পিসিমার কাছে বকুনি খেয়েছি চিরদিন।

'আশৈশবের সেই ফেলে-দেওয়া মাছ মিষ্টি দই পায়েস লুচি রুটি ভাত খিচুড়ি মাংস মালপো এমনকী চচ্চড়ি বেগুনভাজা পর্যন্ত যেন অদৃশ্যলোক থেকে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসতে থাকে।

'ভেবে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। জিবেগজা পর্যন্ত পাতে ফেলেছি আমি একদিন।

'হে ভগবান, কাতর প্রার্থনায় তো তুমি গলে যাও শুনেছি, ধ্রুবকে বনের মধ্যে দেখা দিয়েছিলে, আমি অত কিছু চাইছি না, তোমার দেখা পেয়ে আর আমার কী হবে, শুধু যদি তোমার ওই বৈকুণ্ঠ না কোথা থেকে যেন এক ঠোঙা জিবেগজা ফেলে দিতে!

'বুঝলি কিনা, অনেকক্ষণ আশা করলাম, কিন্তু কোথায় কী?

'অবশেষে ভগবানের ওপর রেগে-টেগে গায়ের ব্যথা নিয়েই গা ঝেড়ে উঠে পড়ে লোকালয়ের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করলাম। তখনও জানি না কপালে কী ঘটছে!'

ওরা আমার কাছে ঘেঁষে আসে।

'হাঁটছি হাঁটছি, কোথায় লোকালয়, কোথায় বা রাস্তা, আরও বন, নিবিড় বন, ভয়ংকর বন! তারপর হঠাৎ দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। কী রে বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেল নাকি!

'তা নয়, জমাট পাহাড়ের মতন, কয়লার খনির মতন, তাড়কা রাক্ষুসির চুলের মতন, গহন গভীর অরণ্যে এসে পড়েছি! সে যে কী অন্ধকার তা তোমরা ধারণা করতেও পারবে না। নিজের হাত-পা দেখতে পাচ্ছি না, মাথাটা ঘাড়ের ওপর আছে কি না টের পাচ্ছি না, গায়ে হাতে চিমটি কেটে মাথার চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখছি, আছি তো-'

'ই-ইস!' কাচের মার্বেল শিউরে উঠে একেবারে আমার হাঁটু চেপে ধরে-'চিমটি কেটে! চুল ছিঁড়ে! তারপর?' ওর ছোট্ট হাঁ-টা বড়ো হয়ে যায়, বড়ো হয়েই থাকে। আর চোখ দুটি দু-আনার মার্বেলের সাইজ হয়ে ঠিকরে ওঠে। আরও কাছে টানি তাকে।

'তারপর-? তারপরের কথা বলব? ভেবে দেখি বাপু, তোমরা রাত্রে ভয় পাবে না?'

'না না, আমরা তো মার কাছে শুই।'

'তারপর পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে থাকি, আর যেদিকে যাই সেদিকেই মোটা গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠোকে। আরশি নেই, চোখে দেখবার নয়। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখি ঠুকে ঠুকে কপালটা আগে আলুর মতো, তারপর কাঁচা পেঁপের মতো, তারপর ডাবের মতো, আর শেষ অবধি প্রকাণ্ড এক বিলিতি কুমড়োর মতো হয়ে উঠল।'

'বিলিতি কুমড়োর মতো! ওরে বাবা!' সক্কলের মুখগুলোই হাঁ হয়ে যায়।

'গেল তো! জ্ঞানগম্যি তো নেই, সেই নিয়েই পাগলের মতন ছুটোছুটি করছি। হঠাৎ দেখি সেই অন্ধকারের গায়ে কোনো এক ফাঁক থেকে দপদপে আগুনের শিখা!'

'দাবানল বুঝি?' পাকা মেয়েটা বলে।

'আরে বাবা, সে হলে তো বরং ভালো ছিল। এ আগুন-বলব? ভেবে দেখো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।' সবাই চেঁচায়, শুধু কাচের মার্বেল একটু যেন নিভে নিভে আসে, আর প্রায় আমার কোলের ভেতর ঢুকে আসে সে।

'বলছি কিন্তু, আমার দোষ নেই। এ আগুন মানুষের হাতের মশালের। সেই মশালের আগুনেই তাদের চেহারা দেখতে পেলাম!

'আবলুস কাঠ দেখেছ তোমরা? দেখনি! যাক কয়লার চাঁই দেখেছ তো? ঠিক যেন সেই কয়লার চাঁই দিয়ে গড়া একদল দাঁত-খিঁচোনো দৈত্য! বললে বিশ্বাস করবে না, প্রত্যেকের মুখে হাতির মুখের মতো দু-পাশে দুটো খোঁচা খোঁচা ধারালো দাঁত, কপালে সাদা সাদা কীসের যেন মোটা মোটা দাগ আঁকা, গলায় জন্তুজানোয়ারের হাড়-গাঁথা মালা, পরনে গাছের ছাল, আর নেড়া মাথার ওপর-'

পাকা মেয়েটা হঠাৎ বলে ওঠে, 'নাপিত আছে ওদের?'

নাপিত! আমি তো হতভম্ব-'নাপিত মানে?'

'বাঃ, মাথা নেড়া করতে নাপিত লাগে না?'

হো-হো করে হেসে উঠি আমি, 'আরে এত বুদ্ধি নিয়ে এই কথা বললে তুমি? কেন, সুন্দরবনের 'কুন্তলোৎপাটিনী লতিকা'র নাম শোননি কখনো? তা হয়তো শোননি, কী জানি তোমার মা-বাবাও শুনেছেন কি না, আজকাল তো আর এইসব বৃক্ষলতা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ, সবাই ডাক্তারি ওষুধ ভজেছে। ওই লতার রস একবার মাথায় মাখালে তিন দিনের মধ্যে মাথার সমস্ত চুল উধাও। জীবনেও আর সে মাথায় চুল গজাবে না।'

ওরা এবার একটু বিচলিত হল, 'জীবনেও চুল গজাবে না?'

'নাঃ!'

'কী নাম বললে, নতুন মামা? 'কুন্তলোটিকা পাতিনী' না কী?'

'কী সর্বনাশ! আরে না না, কুন্তলোৎপাটিনী লতিকা।'

ওরা বিজবিজ করে মুখস্থ করতে থাকে।

'তুমি বাবু বড্ড বাধা দিচ্ছ,' আমি বলি, 'আমি প্রায় ভুলেই যাচ্ছি সব।'

'না না নতুন মামা, বলো, ভেবে ভেবে সব বলো তুমি,' দেবদূতের মতো ছেলেটি অধীর আগ্রহে আমার আঙুল টানাটানি করে-'নেড়া মাথার ওপর কী?'



'নেড়া মাথার ওপর?' আমি বলি, 'সে যা ব্যাপার, তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।'

‘মাথায় গাছের পাতা বুঝি?’ ওরা বলে ওঠে।

‘উঁহু।’

‘তবে পাখির পালক?’

‘দূর, নেড়া মাথায় পালক গুঁজবে কোথা?’

‘তবে? হরিণের শিং?’

‘উঁহু।’

‘তবে নিশ্চয়-তবে নিশ্চয়-‘

‘বলতে পারলে না তো? প্রত্যেকের মাথার মাঝখানে ইয়া বড়ো এক-একটি পা-বাঁধা বনমোরগ! অনবরত তারা তাদের হাত-দুই করে লম্বা ডানাগুলো ঝটাপট ঝটাপট ঝটপটাচ্ছে।’

‘জ্যান্ত?’ কাচের গুলি দুটি বিস্ময়ে যাকে বলে একেবারে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে!

‘জ্যান্ত বলে জ্যান্ত-একেবারে জলজ্যান্ত!’

‘উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে না?’

আমি বললাম, ‘বাঃ, বললাম না-পা-বাঁধা? সেই বাঁধন-দড়িগুলো যে আবার ওদের কানের সঙ্গে আটকানো।’

‘ইস, কী বুদ্ধি!’ নীল কাচের মার্বেলই সত্যিকার অভিভূত হচ্ছে।

‘বুদ্ধি বলে! সেই জ্বলন্ত মশালগুলো আমার মুখের সামনে তুলে ধরে বলল, বাঃ, বেড়ে চেহারাটি তো! কাঁচা খেতেই লাগবে ভালো।’

‘তুমি ওদের ভাষা বুঝতে পারলে?’ পাকা মেয়েটা আবার ফোড়ন কাটে।

আমি অবশ্য পাকাকে বোকা বানিয়ে ছাড়ি। সত্যি, এত পাকা অথচ এটুকু আর জানে না সুন্দরবন বাংলাদেশেরই অন্তর্গত। বললামও তাই-‘সুন্দরবন তো বাংলাদেশে, তাও জান না? বাংলাদেশের লোকের ভাষা বুঝতে পারব না?’

‘বাঃ ওরা তো বুনো। মানুষের মাংস খায়।’

‘চমৎকার! তোমার যা বুদ্ধি।’ আমি বলি, ‘মানুষের মাংস খায় বলে মাতৃভাষায় কথা বলবে না?’

‘বলবে?’

‘নিশ্চয় বলবে!’

‘বাঙালির মাংস খাবে?’

‘নিশ্চয় খাবে। বাঙালির মাংসর স্বাদ কত ভালো!’

সেই আমার দেবদূতটি, সত্যিই বড়ো সরল ছেলেটা-শুনে একেবারে কাঁদো-কাঁদো, ‘কেন নতুন মামা, স্বাদ কেন ভালো?’

‘বাঃ, বাঙালিরা কত ভালো ভালো খায়। পৃথিবীর আর কোথাও এত অদ্ভুত সুন্দর আর এত রকম-বেরকম রান্না-খাওয়া আছে? গোকুল পিঠে, চন্দরপুলি, রসমাধুরী, ছানার পায়েস, সাড়ে-ছাপ্পান্নরকম সন্দেশ চোখে দেখেছে আর কারা? তবে? এসব খেলে গায়ের

মাংস তুলতুলে আর সুস্বাদু হবে না? নিজেরা নিজেরা ওই কথাই বলাবলি করে, দেখেছিস, ব্যাটার গা দিয়ে যেন খোশবু বেরোচ্ছে।

'আমার অসহ্য লাগতে লাগল। চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, যা করবার করো, আর ভালো লাগছে না।

'আমার চেঁচানিতে দলপতিটার কী ফুর্তি।

'লাফিয়ে নেচে বিশ্রী একটা চিৎকার করেই প্রচণ্ড এক শিস দিল। আর সঙ্গেসঙ্গে-উঃ , সে দৃশ্য ভাবলে এখনও আমার কালঘাম ছুটে যায়। সঙ্গেসঙ্গে যেন বনে আগুন ধরে গেল। কোথা-না-কোথা থেকে পিলপিল করে দলে দলে ঠিক ওই এক সাজের লোক মশাল হাতে ছুটে এসে আমাকে ঘিরে দাঁত খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে নাচতে লাগল।

'তার সঙ্গে মাথার ওপর সেই ঝটন্ত-পটন্ত বনমোরগ, আর মুখে কিম্ভূতকিমাকার গান! তখন আমার যা অবস্থা, কী গাইছিল তা মনে নেই, শুধু মনে আছে খালি খালি বলছিল-

হেচাং হেচাং হেচাং হে-

নাদুস নুদুস খাউস রে-

তাধিং তাধিং ধিংতা রে-'

'তারপর?' নীল কাচ প্রায় আমার হাতটা খামচে ধরে, 'তারপর নতুন মামা?'

ওর মুখচোখ ভয়ে পাঙাশ, মাথার চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো খাড়া, আর গলার স্বর বুজে আসা।

'দেখো, আর বলব না, তুমি বড়ো ভয় পাচ্ছ।'

'না না বলো বলো। তারপর কী হল বলো-' সেই বোজা গলাতেই বলে ও, কিন্তু আমার সঙ্গে একেবারে লেপটে বসে।

অগত্যাই বলি, 'তারপর তারা নাচতে নাচতে তাদের মশালগুলো একবার করে আমার গায়ের চামড়ায় বুলিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে আবার সেই বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। রইল খালি আগের লোকেরা। একজন আমাকে টিপে টিপে বলল, ঝলসেছে মালুম হচ্ছে।

'অর্থাৎ বুঝতেই পারছ কেন ওই মশাল বুলোনো। জ্যান্ত রোস্ট করে নিল আমায়।

'আমি হাত জোড় করে চেঁচিয়ে বললাম, আমাকে তোমরা তাড়াতাড়ি শেষ করো, আর দগ্ধে মেরো না!

'ওরা আবার খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল, তারপর না-ওরে বাবা, কী করে বলি! এদিকে তোমরাও না শুনে ছাড়বে না। তারপর না-দু-তিন জনে মিলে আমাকে জোর করে মাটিতে শুইয়ে ফেলল, আর দলপতি কোথা থেকে একটা চিমটে এনে-ওরে বাবা রে-'

ভয়ে চোখ বুজি আমি সেই দৃশ্য মনে পড়ায়।

'চিমটে এনে কী? ও নতুন মামা?' ছেলেটা ভয় পেয়ে খালি আমায় খামচে ধরছে।

'চিমটে এনে! চিমটে এনে আমার গা থেকে সমস্ত ছাল চড়চড় করে টেনে ছাড়িয়ে নিল।'

'ছাড়িয়ে নিল!'

'নিল বই কী!'

এবার দেখলাম যতগুলো চোখ ছিল সবগুলোই গুলি গুলি হয়ে উঠেছে, এমনকী সেই পাকা মেয়েটারও।

‘লাগল না তোমার?’

‘লাগল? হুঁঃ। আমি কি তখন আমাতে ছিলাম। অসাড় হয়ে ঠিক যেন সিনেমার ছবি দেখছি-ছালগুলো সব ছাড়িয়ে একটা তাল করে মাটিতে রেখে তাতে কী যেন গুঁড়ো, মশলা কি নুন তা জানি না, ছড়িয়ে ছড়িয়ে চেখে চেখে খেতে লাগল সবাই।’

‘তুমি নিজের চক্ষে দেখলে,’ হঠাৎ নীল গুলি ডুকরে কেঁদে উঠল-‘তোমার ছাল ছাড়িয়ে দিয়ে নুনমশলা দিয়ে খাচ্ছে তুমি দেখলে? ও নতুন মামা?’

‘আরে আরে’-ব্যস্ত হয়ে উঠি আমি, ‘কান্নার কী আছে? আবার তো ছাল গজিয়েছে আমার!’

‘কী করে আবার গজাল?’ পাকা মেয়েটা রুদ্ধশ্বাসে বলে।

‘গজাল ওদেরই গুণে,’ আমি বলি, ‘ওরা নিজেরা বলাবলি করল, ছালটাই ভারি মজাদার খেতে। ছোঁড়াটাকে এক্ষুনি শেষ করে দরকার নেই। ভুরাং, তুই এটাকে মশলা মাখিয়ে রোদে শুকোতে দিয়ে রাখবি, ফের ছাল গজিয়ে যাবে। আহা, কী খাসা রে!’

‘তারপর?’

‘তারপর আর জানি না, মরে গেলাম কি বেঁচে থাকলাম, তাই বা কে হিসেব রেখেছে? কবে কত দিন পরে জানি না, জ্ঞান হতে দেখি সেই জলের ধারে কাঁটাগাছের ঝোপের ওপর রোদে পড়ে আছি, সর্বাঙ্গে কীসের যেন প্রলেপ। ঠিক যেমনি পিসিমা নুনমশলা-মাখা আমসি রান্নাঘরের চালে তুলে রোদে দিতেন।

‘আমার যে জ্ঞান ফিরেছে সে খবর ওরা পায়নি। তাই নিশ্চিন্ত আছে। আমি আর কোনোদিকে না তাকিয়ে চোঁ চাঁ জলে ঝাঁপ! সাঁতারটা শেখা ছিল, ডুবলাম না। সাত দিন সতেরো রাত্তির সাঁতরে উঠলাম এসে এই আহিরীটোলার ঘাটে!’

‘অ্যাঁ!’

‘তবে না তো কী!’

‘তারপর?’

‘তারপর জীবনে আর কখনো মাছ ধরতে যাইনি, বাড়িতে কোনো চিমটে রাখতে দিইনি, আর পিসিমাকে আচার রোদে দিতে দিইনি। চিমটে আর আমসি দেখলেই-উঃ !’

কপালের ঘাম মুছতে থাকি আমি।

কান্না থামিয়ে ছেলেটা আমার গায়ের ছাল টিপে টিপে বলে, ‘এসব নতুন ছাল?’

‘বিলকুল। যাক, এবার নাইতে যাওয়া যাক। বেলা হয়ে গেছে। তোমরা তো দিব্যি পেট ভরিয়ে বসে আছ।’

নাইতে গেলাম আমি। গেলাম, কিন্তু চিরকালের জন্যে কেন গেলাম না! কেন আবার ফিরে এলাম! ফিরে এলাম শুধু এ ঘরে তোয়ালেটা ছিল বলে। কিন্তু না, ঘরে আমি আসিনি, শুধু দরজার বাইরে পর্যন্ত এসেছিলাম। তারপরই সেই প্রচণ্ড ধাক্কা। না না, কপালে নয় যাতে কপালটা আলু থেকে বিলিতি কুমড়ো হয়ে উঠতে পারে। ধাক্কা খেলাম প্রাণে।

শুনতে পেলাম পাকা মেয়েটা বলছে, 'উঃ ! যাই ভাগ্যিস সাঁতার জানত নতুন মামা! তাই না-'

তার কথা থামিয়ে দেবদূতের হি-হি হাসি ঝনঝনিয়ে উঠল, 'তুই বুঝি ওই সব বিশ্বাস করেছিস? হুঁঃ। ও তো স্রেফ গুল!'

'গুল!'

'না তো কী? এক ঘণ্টা ধরে স্রেফ গুল মারল নতুন মামা!'

চোখে অন্ধকার দেখেও তখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম, পরের দু-লাইন শুনে আর পারলাম না, টেনে দৌড় দিয়ে সোজা চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে। ছোড়দির বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি। আহিরীটোলা থেকে উত্তরপাড়া।

শেষ দু-লাইন? উঃ , ভাবলে সারা গায়ের ছাল ছাড়ানোর চাইতেও যন্ত্রণা হয়।

পাকা মেয়েটা বলল, 'আহা! বড্ড যে চাল মারছিস এখন? তখন তো ভয়ে কেঁদেই ফেললি!'

দেবদূত বলল, 'দূর, ও তো বানিয়ে! নতুন মামা এত কষ্ট করে অত সব বানাল। আমরা একটু বানিয়ে বানিয়ে বিশ্বাসও করব না?'

*আশ্বিন ১৩৬৮*




# লীলা মজুমদার

আমার ছোটোকাকা মাঝে মাঝে আমাদের বলেন, 'এই যে তোরা আজকাল চাঁদে যাওয়া নিয়ে এত নাচানাচি করিস, সে কথা শুনলে আমার হাসি পায়। কই, এত খরচাপাতি, খবরের কাগজে লেখালেখি করেও তো শুনলাম না কেউ চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে! তোরা আবার এটাকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিস, ছোঃ!'

আমরা তখন বলি, 'তার মানে? কী বলতে চাও খুলেই বলো না।'

ছোটোকাকা বলেন, 'তার মানেটা খুবই সোজা। চাঁদে যাওয়াটা কিছু একটা তেমন আজকালকার ব্যাপারও নয়। পঞ্চাশ বছর আগে আমি নিজেই তো একরকম বলতে গেলে চাঁদে ঘুরে এসেছি।'

আমরা তো অবাক!-'একরকম বলতে গেলে কী? গেছিলে, না যাওনি?'

ছোটোকাকা বইয়ের পাতার কোনা মুড়ে রেখে পা গুটিয়ে বসে বললেন, 'তাহলে দেখছি সব কথাই খুলে বলতে হয়। শোনো তবে। বয়স আমার তখন বারো-তেরো হবে, পুজোর ছুটিতে গেলাম মামাবাড়িতে। সেজোমামা অনেক করে লিখেছেন। এমনিতেই আমি কোথাও গেলে সেখানকার লোকরা খুব যে খুশি হয় বলে মনে হয় না, আর সেজোমামা তো নয়ই। তা ছাড়া দিদিমা সারাক্ষণই এটা-ওটা দেন, খাওয়া-দাওয়া ভালো, পুকুরে ছিপ ফেললেই এই মোটা মোটা মাছ, গাছে চড়লেই ডাঁসা পেয়ারা। না যাবার কোনো কারণই ছিল না।

'সেখানে পৌঁছে দেখি সেজোমামা কোত্থেকে একটা লড়ঝড়ে মোটরগাড়ি জোগাড় করে আমাকে নিতে স্টেশনে এসেছেন। আমাকে দেখেই, মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আগের চেয়ে যেন একটু ভারী ভারী লাগছে! হ্যাঁরে, তোর ওজন কত রে?

'কিছুদিন আগেই ইশকুলে সবাইকে ওজন করেছে। বললাম, আটত্রিশ সেরের সামান্য বেশি।

'সেজোমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, আবার বেশি কেন? সে যাকগে, ওতেই হবে, এখন গাড়িতে ওঠ, চল তোকে একজায়গায় নিয়ে যাই, খুব ভালো খাওয়ায় তারা।

'সেজোমামাকে গাড়ি চালাতে দেখে আমি তো অবাক, তুমি আবার গাড়ি চালাতে পার নাকি?

'সেজোমামা বেজায় রেগে গেলেন, কী যে বলিস! আরে এই সামান্য একটা গাড়িও চালাতে পারব না? বলে কিনা যে আমি-যাকগে, চল তো এখন।

'সোজা নিয়ে গেলেন কুণাল মিত্তিরের রহস্যময় বাড়িতে। ও বাড়ির ভেতরে এখানকার কেউ কখনো যায়নি, কুণাল মিত্তিরের নাম সবাই জানে, তবে তাকে কেউ চোখে দেখেনি। একটা উঁচু টিলার উপরে অদ্ভুত বাড়ি, বাড়ির চারিদিকে দেড়-মানুষ-উঁচু পাঁচিল, তার ওপরে কাঁটাতারের বেড়া, দেয়াল কেটে লোহার গেট বসানো, সে সর্বদাই বন্ধ থাকে। শোনা যায় কুণাল মিত্তির নাকি নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, সে-সব সাধারণের জন্য নয়, অতি গোপন ও গুহ্যভাবে করতে হয়।

'প্রকাণ্ড টিলাটার গা বেয়ে যদি চড়া যায়, ওপরটা চ্যাপটা, সবটা ঘিরে পাঁচিল, আশেপাশে কোনো গাছগাছড়াও নেই যে তাতে চড়ে পাঁচিলের ভেতরে দেখা যাবে। তার ওপর মাঝে মাঝে ভেতর থেকে বাড়ি-কাঁপানো গর্জন শোনা যায়, লোকে বলে নাকি দু-জোড়া ডালকুত্তা দিনরাত ছাড়া থাকে। মোট কথা, কেউ ওদিকে বড়ো একটা যায় না। চারদিকে দু-তিন মাইলের মধ্যে কারও বসতিও নেই। ফাঁকা মাঠ আগাছায় ভরা।

'সেইখানে তো গেলেন আমাকে নিয়ে সেজোমামা। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাঁ গাঁ করতে করতে গাড়িটা তো টিলার উপরে চড়ল। তারপর প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন বাজাতেই লোহার দরজা গেল খুলে। আমরাও ভেতরে গেলাম। অবাক হয়ে দেখি চমৎকার ফুলবাগান, একতলা লম্বা একটি বাড়ি, তার বারান্দায় একটা বড়ো কালো বেড়াল সোজা হয়ে বসে সবুজ চোখ দিয়ে আমাদের দেখছে। একটা উঁচু দাঁড়ে নীল কাকাতুয়াও একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমাদের বলছি কেন, আসলে আমাকে দেখছে।

'অমনি চারদিক থেকে দলে দলে চাকর-বাকর ছুটে এসে মহা খাতির করে আমাদের নামাল। বারান্দা থেকে একজন ভদ্রলোকও এগিয়ে এলেন, ফর্সা কোঁকড়া চুল, বেঁটে মোটা, বয়স বেশি নয়। আমি সেজোমামাকে ফিসফিস করে বললাম, ওই নাকি সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কুণাল মিত্তির যাকে কেউ চোখে দেখেনি।

'শুনতে পেয়ে ভদ্রলোক চটে গেলেন, কেউ চোখে দেখেনি আবার কী, আমি বিলক্ষণ দেখেছি। বিশ্রী দেখতে।

'সেজোমামা বললেন, আহা, বড়ো কথা বলিস। ওই তোর দোষ। কিছু মনে কোরো না, মনোহর-উনি কুণাল মিত্তির হতে যাবেন কেন, কুণাল মিত্তির ওঁর বাবা, ওঁর নাম মনোহর মিত্তির, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। একদিন উনি ওঁর বাবার চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবেন। জানিস তো, মিত্তিররা কীরকম চালাক হয়।

'মনোহরবাবু তাই শুনে ছোটো গোঁফটাকে একটু নেড়ে বললেন, আর তুমিও তার চেয়ে খুব বেশি কম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবে না।-কী যেন নাম তোমার বললে?

'বললাম, আগে বলিনি, এখন বলছি-ইন্দ্র।

'খুশি হয়ে বললেন, ইন্দ্র? তা ইন্দ্রই বটে, চাঁদের মাটিতে প্রথম পা দেবার গৌরব হবে যার, সে ইন্দ্রের চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম বল দিকিনি।

'চারপাশের লোকজনেরা বলতে লাগল, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

'আমার তো চক্ষু ছানাবড়া। চাঁদে যাব নাকি আমি?

'বললাম, সে আমার যেতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু একা যাব না। তা ছাড়া, আবার ফিরে আসব তো? ডিসেম্বরে আমার ক্রিকেট ম্যাচের সিট বলা আছে কিন্তু।

'সেজোমামা আর মনোহরবাবু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। শেষটা মনোহরবাবু বললেন, তা হ্যাঁ-তা ফিরে আসবে বই কী, যাবে আর আসবে না, সে কি একটা কথা

হল নাকি! কিন্তু আর দেরি কীসের জন্য? চলো তো দেখি ইন্দ্র, আমার সঙ্গে।

‘গেলাম বাগান পেরিয়ে একটা ঘেরা জায়গায়। তার মাথার ওপর দিয়ে লম্বা একটা কী বেরিয়ে রয়েছে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে চিকচিক করছে, আগাটা ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

‘বেড়ার দরজা চাবি দিয়ে খুলে মনোহরবাবু সরে দাঁড়ালেন, আমিই আগে ঢুকলাম।

‘গিয়ে যা দেখলাম সে আর কী বলব। আগাগোড়া অ্যালুমিনিয়ামের মতো কী ধাতু দিয়ে তৈরি কী একটা বিশাল যন্ত্র, অবিকল উড়ুক্কু মাছের মতো দেখতে, তবে ডানাগুলো অনেক ছোটো আর পিছন দিকে বেঁকিয়ে বসানো। দেখলেই বোঝা যায় যে একবার ছেড়ে দিলেই অমনি সুড়ুত করে তিরের মতো ওপরে উঠে, নীল আকাশের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে। চাঁদে যাওয়া এর পক্ষে সেরকম কিছুই শক্ত হবে না।

‘নীচে একটা গোল প্ল্যাটফর্ম ওটাকে চারদিকে ঘিরে আছে, সেটাই প্রায় একতলার সমান উঁচু হবে, তারও নীচে যন্ত্রটার আরও অনেকখানি রয়েছে। রুপোলি গায়ে কালো দিয়ে লেখা ‘ধূমকেতু’। আর একজোড়া এই বড়ো বড়ো চোখ আঁকা। আশেপাশে কতরকম যন্ত্র দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, বোঝা গেল-একবার সেইগুলো খুলে দিলেই আর দেখতে হবে না।

মনোহরবাবু চোখ ছোটো করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পকেটে কী? ওরকম ঝুলে আছে যে? ও হবে না, যতটা সম্ভব হালকা হওয়া চাই। এই বেদে, দেখ তো ওর পকেটে কী।

বেদে বলে লোকটা এগিয়ে আসতেই বললাম, এই খবরদার, তাহলে কিন্তু চাঁদে যাব না বলে রাখলাম। মনোহরবাবু মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ওরকম করিসনে বাপ, চাঁদে যাবি না কী রে? তুই না গেলে কে যাবে বল দিকিনি? কেউ রাজিও হবে না, তা ছাড়া তোর প্যান্টের মাপে সব তৈরি। এখন না গেলে যে আমার জীবনের সব কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে! বলছি আমার শালাকে বলে তোকে মোহনবাগান ক্লাবের লাইফ-মেম্বর করে দেব।

‘ওঁর হাত ধরে বললাম, দেবে তো ঠিক? বাবা! সেজোমামা কত চেষ্টা করেও হতে পারেনি। শেষটা কিন্তু অন্যরকম বললে-

‘মনোহরবাবু রেগে উঠলেন, বলছি করে দেব, আবার অত কথা কীসের? ফিরে তো এসো আগে।

‘বেদে বললে, যদি আসো!

‘মনোহরবাবু তাকে এক ধমক দিলেন, তোমাকে অত কথা বলতে কে বলেছে বাছা? যাও, নীচে গিয়ে পাওয়ার লাগাও দিকিনি, নইলে-

‘বেদে অমনি একটা ছোটো সিঁড়ি দিয়ে যন্ত্রের তলায় চলে গেল।

‘সেজোমামা মনোহরবাবুকে বললেন, ফিরে আসার কলকবজাগুলো ওকে বুঝিয়ে দিয়ো, মনোহর।

‘মনোহরবাবু বললেন, ও কি ওর বাবা-মার একমাত্র সন্তান?

‘আমি বললাম, আরে না না, আমার দুটো ভাই, দুটো বোন।-আচ্ছা, লাইফ-মেম্বর করে দেবেন তো? কারণ বাবা হয়তো চাঁদা দেবেন না।

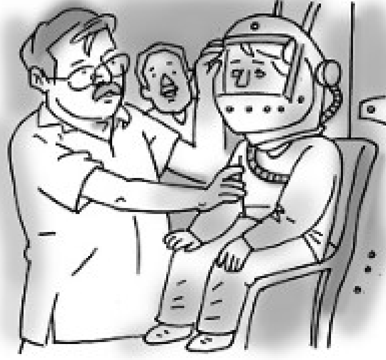
‘মনোহরবাবু বললেন, তাই দেব। পকেটে কী আছে বের করে এইখানে রাখো তো দেখি।

‘মেশিনের তলা থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হল, তারপর কেমন শোঁ শোঁ করতে লাগল। মনোহরবাবু একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। আমি পকেট থেকে লাট্টু লেত্তি ইয়ো-ইয়ো রুমাল নীল গুলি রুমেনিয়ার দুটো ডাকটিকিট-মনাদা দিয়েছিল-আধঠোঙা নরম ঝাল ছোলা ভাজা টর্চ আমার বড়ো গুলতিটা আর এক কৌটো শট, বের করে রাখলাম। মনোহরবাবু তো অবাক!

‘এসব কিচ্ছু নেবার দরকার নেই, শুধু ওজন বাড়ানো। খালি এই নোট বই আর পেনসিলটা নেবে। কী দেখবে না দেখবে, শরীরে কেমন বোধ করবে, সব টুকে রাখবে। আর এই হাতঘড়িটা নেবে, এতে সেকেন্ডের কাঁটা, তারিখের কাঁটা সব দেওয়া আছে। সব লিখবে, কখন পৌঁছোলে ইত্যাদি-ও কী হল, চলে যাচ্ছ যে?

‘আমি বললাম, গুলতি শট না দিলে আমি যাব না। ওদের নিয়ে আমি রাত্রে শুই পর্যন্ত।

‘সেজোমামা বললেন, থাকগে মনোহর, এখন মনে হচ্ছে তুমি বরং আর কাউকে দেখো।



‘মনোহরবাবু বললেন, বেশ, তাহলে আমার হাজার টাকা ফিরিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি অন্য লোক দেখছি।

‘সেজোমামা চুপ। আমি বললাম, তাতে কী হয়েছে, সেজোমামা? আমার গুলতি দিলেই আমি যাব। অবিশ্যি বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই আগে খানিকটা খেয়েও নেব। আর বলেছি তো-একা যাব না।

‘মনোহরবাবু চটে গেলেন, একা যাব না আবার কী? জানিস, ওই কাকাতুয়াটা আর বেড়ালটা দু-তিনবার একা গেছে, কিচ্ছু বলেনি।

‘বললাম, চাঁদ অবধি গেছে?

‘মনোহরবাবু বললেন, চাঁদ অবধি গেছে কি না বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলেই তো তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। নিদেন তোমার খাতা-পেনসিলটা ওই যে ছোটো হাউই মতন দেখছ, ওটাতে পুরে ফেলে দিতে পারবে তো, নিজে যদি নেহাতই-আচ্ছা সে যাকগে, এখন এই বড়িটা খাও দিকিনি, কেমন পেট ভরে যায় দেখো।

'বলে আমার মুখে একটা হলদে বড়ি কী পুরে দিলেন, সে যে কী আশ্চর্য বড়ি আর কী বলব। খেতেই মনে হল আমি লুচি মাংস চপ কাটলেট ভেটকি-ফ্রাই চিংড়িমাছের মালাইকারি রাবড়ি কেক চকলেট ছাঁচিপান সব খাচ্ছি। একেবারে পেট ভরে গেল। সেই বড়ির শিশিটা আমার হাতে দিয়ে মনোহরবাবু বললেন, এই নাও একমাসের খোরাক। একটার বেশি দুটো বড়ি, কোনোদিন খেয়ো না, খেলেই পেটের অসুখ করবে, মোটা হয়ে যাবে, যন্ত্রের ভেতর আঁটবে না। এসো, এই আরাম কেদারাটাতে এবার বসে পড়ো দিকিনি। হাওয়ার কোনো অভাব হবে না, এমন কল করেছি ভেতরে তোমার নিশ্বাসই আবার অক্সিজেন হয়ে যাবে।

'বলে সেই লম্বা চোঙার মতন যন্ত্রটার গায়ে একটা দরজা খুলে, আমাকে একটা চমৎকার হাওয়ার গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন আর মাথার ওপর দিয়ে একটা অদ্ভুত পোশাক গলিয়ে পরিয়ে দিয়ে কোমরে চেয়ারের সঙ্গে বগলেস এঁটে দিলেন। মুখের জায়গাটা বোধ হয় অভ্র দিয়ে তৈরি, সব দেখতে পাচ্ছিলাম। নাকের কাছে ছ্যাঁদা, নিশ্বাস নিতে পারছিলাম। তারপর দেখি সেজোমামা তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্র নিজের পকেটে ভরছেন। চেঁচিয়ে বললাম, গুলতি দিলে না? গুলতি না দিলে যাব না বলেছি না!

'অভ্রের মুখোশের ভেতর থেকে কথা শোনা গেল কি না জানি না। কিন্তু সেজোমামার বোধ হয় একটু মন কেমন করছিল, কাছে এসে কী যেন বলতে লাগলেন, একবর্ণ শুনতে পেলাম না, যন্ত্রের শোঁ শোঁ গোঁ গোঁতে কান ঝালাপালা! দারুণ রেগে গিয়ে সেজোমামার কাছা আঁকড়ে ধরে চেঁচাতে লাগলাম, দাও বলছি, গুলতি না নিয়ে আমি কোত্থাও যাই না।

'এদিকে মনোহরবাবু বার বার ঘড়ি দেখছেন, যন্ত্রটা কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছে, অথচ আমি এমন করে সেজোমামার কাছা আঁকড়েছি যে দরজাটা এঁটে দেওয়া যাচ্ছে না। শেষটা হঠাৎ রেগেমেগে ঠেলে সেজোমামাকেসুদ্ধু ভেতরে পুরে দিয়ে মনোহরবাবু দরজা এঁটে দিলেন।

'বাবা! দিব্যি ফাঁকা ছিল ভেতরটা, সেজোমামা ঢোকাতে একেবারে ঠেসাঠেসি হয়ে গেল, নড়বার-চড়বার জো রইল না। দরজা বন্ধ করাতে বাইরের শব্দ আর কানে আসছিল না, সেজোমামা চিৎকার করতে লাগলেন, ও মনোহর, ফেরবার কল শিখিয়ে দিলে না যে, ফিরব কী করে?

'তা কে কার কথা শোনে। ভীষণ জোরে ফুলে উঠে বোঁ করে যন্ত্রটা আকাশে উড়ে গেল। একবার মনে হল চারদিকে চোখ-ঝলসানো আলো, তারপরেই মনে হল ঘোর অন্ধকার।

'যখন জ্ঞান ফিরে এল বুঝলাম চাঁদে পৌঁছে গেছি। যন্ত্রটা আর নড়ছে না চড়ছে না, কাত হয়ে পড়ে আছে, আমি বসে বসেই শুয়ে আছি, সেজোমামা আমার তলায় একটু একটু নড়ছেন-চড়ছেন। মুখ তুলে কানের কাছে বললেন, আমার ডান পকেটে তোর টর্চটা আছে, দেখ তো নাগাল পাস কি না।

'বুঝলাম ওঁর নিজের হাত নাড়বার জায়গা নেই। হাতড়ে হাতড়ে ঠিক পেলাম। ভয়ে ভয়ে জ্বালালাম, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যন্ত্রের ভেতরটা ভালো করে দেখলাম, ভেতরকার কলকবজা সব ঠিক আছে, যে যার জায়গায় আটকানো। হাত দিয়ে আমার বাঁ-পাশের জিপ ফাসনার খুলে মুখোশ নামিয়ে ফেললাম।

'অমনি এক ঝলকা ঠান্ডা বাতাস এসে মুখে লাগল। আঃ , চাঁদের বাতাসই আলাদা রে, এ পৃথিবীতে সেরকমটি হয় না।

‘সেজোমামা বললেন, বেড়ে খাসা কল বানিয়েছে তো মনোহর। বলেছিল যে নামবার সময় এততুটুকু ঝাঁকানি লাগবে না, এততুটুকু ভাঙবে না, টসকাবে না।

‘আমি এদিকে টর্চ ঘুরিয়ে দেখি, পড়বার সময় কাত হয়ে যাওয়াতে দরজার বাইরের ছিটকিনি গেছে খুলে, দরজা এখন হাঁ!

‘বললাম সে কথা সেজোমামাকে, কিন্তু আমি না সরলে তাঁর তো নড়বার উপায় নেই। তখন কোমরের বগলেস খুলে সেজোমামার পেটের ওপরে দুই পা রেখে এক লাফে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে পড়া আমার কাছে কিছুই নয়। পৃথিবীতে যখন থাকতাম এর চেয়ে কত উঁচু উঁচু জায়গা থেকে লাফাতে হয়েছে। সেজোমামা শুধু একটু কোঁত করে উঠলেন।

‘বেরিয়ে বুঝলাম বোধ হয় চাঁদের কোনো একটা নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখের মধ্যে পড়ে গেছি। চারদিকে মনে হল নরম ঘাস, মাথার ওপর তারাও দেখতে পেলাম, আবার এক কোনা দিয়ে বোধ হয় আমাদের এই পৃথিবীটাকেই একবার একটু দেখতে পেলাম। ঠিক যেন আরেকটা চাঁদ। মনে হল আফ্রিকাটাকে যেন একটু একটু দেখতে পেলাম। তারপরেই আবার সেটা টুক করে ডুবে গেল।

‘তখন কানে এল যন্ত্রের ভেতর থেকে সেজোমামা মহা চেঁচামেচি লাগিয়েছেন, টর্চের আলো দেখা, আমিও নামব।

‘অনেক কষ্টে নামলেন, নেমে আমার পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেই বললেন, খিদেয় পেট জ্বলে গেল, সেই বড়ি একটা দে না।

‘টের পেলাম আমারও বেজায় খিদে পেয়েছে, দু-জনে দুটো বড়ি খেলাম, তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে থেকে থেকে অন্ধকারটা একটু চোখ-সওয়া হয়ে এল। আমরা যে একটা বেশ বড়ো গর্তের মতো জায়গাতে শুয়ে আছি সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই, ঠিক যেন একটা বিরাট পেয়ালার মধ্যে রয়েছি। একটু একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল।

‘সেজোমামা বললেন, কী রে, উঠে একটু দেখবি না?

‘বললাম, ভোর হোক আগে।

‘সেজোমামা বললেন, আবার ভোর কী রে? এটা যদি চাঁদের উলটো পিঠ হয়ে থাকে তা হলে তো ভোরই হবে না।

‘একেবারে উঠে বসলাম।-তাই-ই নিশ্চয় সেজোমামা। এ পিঠটাতে তো সর্বদা আলো থাকে। দিনের বেলাও তাই দেখেছি, রাতেও দেখেছি।

‘ফোঁস।

‘তিন হাত লাফিয়ে উঠলাম। ফোঁস করল কী? তবে কি চাঁদে হিংস্র জন্তুও আছে? বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। কিন্তু স্পষ্ট শুনলাম জন্তুটা কচর-পচর করে নরম ঘাসগুলোকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

‘সেজোমামা বললেন, তবে কোনো ভয় নেই। ওরা নিরামিষ খায়।

‘আবার শুনলাম জোরে একটা ফোঁস, তারপর আরও ফোঁস ফোঁস। আমার মোটেই ভালো লাগল না। সেজোমামা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, কী হবে রে?

‘কী আবার হবে? এক নিমেষে গুলতিতে শট লাগিয়ে শব্দ লক্ষ করে দিলাম ছেড়ে। অমনি সে যে কী বিকট চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল সে আর কী বলব। একটা কেন, মনে হল এক লাখ জানোয়ার একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে! সেই চেঁচানি শুনে চাঁদের মানুষেরা জেগে

উঠে সব বড়ো বড়ো মশাল নিয়ে দেখি পেয়ালার একদিকের কানা বেয়ে নামছে। কী হিংস্র সব চেহারা! কী ষণ্ডা, পৃথিবীর মানুষদের চেয়ে তিনগুণ জোরালো। আর সে কী গর্জন, কান ফেটে যায়।

আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলাম না। তারা হয়তো ওই অন্ধকারে আমাদের দেখতে পেল না। পড়ি-মরি প্রাণপণ ছুটে অন্য ধারের ঘাসে ঢাকা ঢালু দেয়াল বেয়ে পিঁপড়ের মতো আমরা উঠে গেলাম। শরীরে আর এতটুকু ক্লান্তি বোধ করলাম না।

'ওপরে উঠেই ছুট লাগালাম। আন্দাজে অন্ধকারের মধ্যে দু-পা না যেতেই চাঁদের পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুপ করে খানিকটা পড়েই গড়াতে লাগলাম।

'সব সইতে পারি বুঝলি, শুধু ওই গড়ানিটা আমার সহ্য হয় না। তখুনি মুচ্ছো গেলাম।

'আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখি সেজোমামা আমার মুখে-চোখে ঠান্ডা জল ছিটোচ্ছেন। আমি নড়ে উঠতেই বললেন, বাপ, বেঁচে আছিস তাহলে? দাঁড়া, গাড়িটা আনি, আর এখানে নয়, চল একেবারে ভোরের গাড়িটা ধরা যাক।

'সেজোমামা গাড়ি আনতে গেলেন, আমি একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। আস্তে আস্তে মাথাটা খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এলে বুঝলাম, কুণাল মিত্তিরদের টিলার নীচেই এসে পড়েছি। সেজোমামা গাড়ি আনলে বললাম, কী আশ্চর্য, না সেজোমামা? যেখান থেকে চাঁদে গেলাম আবার ঠিক সেই একই জায়গায় এসে নামলাম।

'সেজোমামা বললেন, আশ্চর্য বই কী। আমরা যে বেঁচে আছি সেটা আরও আশ্চর্য!

'তাই তো, যন্ত্রটা তো চাঁদেই পড়ে আছে। পকেট হাতড়াতে লাগলাম। সেজোমামা বললেন, আবার কী?

'কেন, সব লিখে রাখতে হবে না? ওখানে ঠান্ডা বাতাস আছে, জন্তু মানুষ সব আছে-

'সেজোমামা বললেন, সে আমি মনোহরকে বলে দেবখন। আর দেখ, এসব কথা খবরদার বাড়িতে বলবি নে।

'বাবা-মারা আমাদের দেখে অবাক।-একী, কাল গেলে, আজই ফিরে এলে?

'সেজোমামা বললেন, সেখানে মহামারী লেগেছে। আমাকে আজই ফিরে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে আমি কাউকে কিছু বলতে পারছি না, পেট ফেঁপে মরি আর কি!'

ছোটোকাকা থামলে আমরা বললাম, 'তবে কেন বললে একরকম বলতে গেলে চাঁদে গেছিলে?'

ছোটোকাকা বললেন, 'তার কারণ এই ঘটনার মাস চারেক বাদে মা হাতে করে সেজোমামার একটা চিঠি নিয়ে বাবাকে বললেন, শোনো একবার কাণ্ড। ওই যে আমাদের কুণাল মিত্তিরের ছেলে মনোহর না, সে নাকি এক উড়োজাহাজ বানিয়ে, যেখানে কুণাল মিত্তিরের গবেষণা-গোরুরা চরছিল সেখানে নামিয়ে একাকার কাণ্ড করেছে। কুণাল মিত্তির দারুণ রেগে ওকে চাকরি দিয়ে বোম্বাই পাঠিয়েছেন।

'বাবা বললেন, গবেষণা-গোরু আবার কী জিনিস?

'মা বললেন, ওমা, তাও জান না? কুণাল মিত্তির একরকম বড়ি বানিয়েছেন, তাতে সব রকম পুষ্টিকর জিনিস আছে, সে খেলেই পেট ভরে যায়। ওই টিলার মাথায় খানিকটা জায়গাকে পুকুরের মতো করে কেটে, অবিশ্যি তাতে জল নেই, সেখানে গোরুগুলো ছাড়া থাকত, ওই বড়ি খেত আর মন ভালো করবার জন্য একটু একটু ঘাসও চিবুত। বাইশ সের দুধ দিত এক-একটা। ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া মনোহর সেইখানে উড়োজাহাজ নামিয়েছে। ব্যস, আর যাবে কোথা, গোরুরা সব দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কুণাল মিত্তির রেগে টং! ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে, এখন বলে নাকি ছেলের কোনো দোষ নেই, চমৎকার উড়োজাহাজ করেছে, কিন্তু পাড়ার কয়েকটা দুষ্টু লোক মিলেই নাকি ওর মাথাটা খেল। শুনলে একবার কথা!'

'আমি আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে গিয়ে গুলতিটা বের করে কাকদের মারতে লাগলাম।

'হ্যাঁ রে, তোরা এখনও বসে রয়েছিস যে, আমাকে কি বইটা শেষ করতে দিবি না?'

এই বলে ছোটোকাকা আবার পা মেলে দিয়ে বই পড়তে লাগলেন।

*আশ্বিন ১৩৬৮*



# গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন আগে আবু বলে একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির তিন বছর বয়েস, কপালটা উঁচু, নাকটা খ্যাঁদা, বড়ো বড়ো চোখের মণি দুটোয় পেতলের রং আর গালে টোল পড়ে। চুলগুলো যেন একঝুড়ি বাদামি বট ফল। আর গায়ের রং রাগলে লাল, ভয় পেলে নীল আর হাসলে মিঠে আলোর মতো।

এহেন আবু থাকত সিঙ্গাপুর শহরে আর সে শহরটা ছিল মালয়ে। আর মালয় হল-এ-ই-ই পাঁচ দিনের পথ।

এখন হয়েছে কী, আবু যে কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। সবাই বলছে, 'আহা, এমন পুতুলটি যে আবার জ্যান্ত!'

পথে কত যে মানুষ! চীনে, মালাই, সায়েব, বাঙালি, অবাঙালি-হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান। সবাই জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ মেয়ে, তোমার দেশ কোথায় গো?'

আবু বলল, 'এখেনে।' বলে ঘট হয়ে বসে চেয়ে রইল।

'তোমার মা কোথায়?'

'এখেনে।'

'মাকে হারিয়ে ফেলেছ?'

'উঁহু।'

'তবে?'

'মা যে আমায় খুঁজেই পায়নি।'

বলে আবু তার বড়ো বড়ো চোখ দুটো মেলে সক্কলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তার পর হাসল। আর তার টোল-খাওয়া গালে মিষ্টি মিষ্টি রং ফুটে উঠতেই একজন ছুটে এসে ওকে কোলে নিয়ে বললেন, 'ওমা, তোকেই যে আমি সারাজীবন খুঁজছি।'

আর আবুও চেয়ে থেকে বলে উঠল, 'তাহলে তুমিই আমার মা।'

কাজেই আবুর মা পাওয়া গিয়েছে দেখে ভিড়ের লোকেরা খুশি হয়ে যে যার চলে গেল।

আর আবুর মা সারাজীবন ধরে হাঁটাহাঁটি করে করে শেষে এমন আবুকে পেয়ে সমুদ্রের ধারে তার কুঁড়েঘরে গিয়ে খুশিতে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যে হলে আবু যখন তার কচি আধো গলায় গান ধরে তখন সেই গানের সুর শুনে আবুর মার দু-চোখ বেয়ে জল পড়ে-এ গান ও মেয়ে কোথায় শিখল! কেননা এ গান গাইলেই দূরের চর পেরিয়ে দেখা যায় আবুর সাইরেন আর মারমেডদিদি এসে হাজির হয়েছে। দেখা যায় আবুর খুদে রাজপুত্তুর সাগরদাদা আর দূর, আরও দূরের মাথাপাগল কালাপানিদাদা শান্ত মুখে ছলছল করছে। আরও দূরে, আরও আরও দূরে, সাতসমুদ্দুর পেরিয়ে, এপাশে-ওপাশে, কারা সব বসে গেছে গান শুনতে। কচি গলার গান।

আবুর মা সব দেখতে পান। ভাবেন এ মেয়ে কোথার থেকে এল?

কিন্তু! জানাই আছে যে একটা কিন্তু এসে হাজির হবেই। বিশেষ করে এমন একজন নাম-না-জানা মার কোলে যদি আসে এমন একটি মেয়ে।

সুলতানের পেয়াদারা লাঠি ঠুকে জানাল এ মেয়ে রাজার ঘরেই মানায়।

মা কেঁদে বলেন, ‘এতদিন তো বাছা রাস্তার ধুলোতেই গড়াচ্ছিল। কই তখন তো ওকে দেখতে পাওনি!’



কিন্তু ওরা তো কথা শুনতে আসেনি-বলতে এসেছে। আর এসেছে আবুকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে।

তাই কোনো কিচ্ছু কানে না তুলে আবুকে জরির-ঝালর-দেওয়া গাড়িতে তুলে নিয়ে ওরা চলে গেল। মেয়ের গায়ে উঠল মখমলের জামা, গয়না। দেখতে দেখতে আবুর মিঠে আলোর মতো গায়ের রং বদলে নীল হয়ে উঠল।

সুলতান সাহেব আবুকে দু-হাতে তুলে বললেন, ‘জিনিসটা বেশ। পোষ মানবে তো?’

মন্ত্রী বললেন, ‘ওর ঘাড় মানবে।’

ভেতর মহলে নিয়ে যাওয়া হল ‘জিনিস’টাকে। সুলতানের বেগমেরা জড়োয়ার গহনা আর পেসওয়াজের ভারে তেমন নড়তেচড়তে পারেন না। তবু তাঁরা হাঁপাতে হাঁপাতে আবুর চারধারে জড়ো হলেন। বাঁদিরা অবাক হয়ে আবুকে দেখতে লাগল। একজন বাঁদি আবুকে ছুঁয়ে বলল, ‘ও মাগো-জ্যান্ত যে!’

শুনে বড়ো বেগমসাহেবা মেজোর গায়ে ঢলে পড়ে বললেন, ‘ওমা দেখ দেখ ভাই, সত্যিই জ্যান্ত! ডাইনিদের মেয়ে বলে মনে হয়। দেখছিস না গায়ের রং কেমন পালটে যাচ্ছে!’

মেজো বেগমের মনটা ছিল নরম। তিনি জিভে চুক চুক করে আহা শব্দ তুলে বললেন, ‘আহা মরে যাই, ভয় পেয়েছে দেখছ না?’

শুনে আবুর দু-চোখে দু-ফোঁটা জল দেখতে দেখতে গড়িয়ে পড়ার সময় মুক্তো হয়ে গেল।

আর যাবে কোথায়! সুলতানের বেগমরা সব ভুলে বাঁদিদের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করে সেই চোখের জলের মুক্তো পাবার জন্যে চুল-ছেঁড়াছিঁড়ি ঝগড়া বাধালেন।

এমন তুলকালাম কাণ্ড বাধল যে কেউ লক্ষই করল না যে আবুর রং এবার টকটকে লাল দেখাচ্ছে। ধাক্কাধাক্কির ঝোঁকে এটাও কারোর খেয়াল হল না যে আবুর চোখের জলের মুক্তো দুটো শুকিয়ে দুটো দাগ হয়ে মেঝেতে পড়ে চোখ মটকে হাসছে।

ঠিক এমনি সময়ে-যখন আবুর গালের আভাটা গনগন করে উঠেছে-আকাশ রেগে টং হয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, মেঘ ফুলিয়ে, বাজ বাগিয়ে ছুটে এল-ছি ছি, ছি, ছি, বলে চেঁচাতে চেঁচাতে। খুদে রাজপুত্তুর সাগরদাদা খেপে খুন হয়ে কালাপানিদাদাকে সঙ্গে করে ঘোড়া ছুটিয়ে খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। কালাপানিদাদার গলার সঙ্গে সাইরেনদিদি যখন তার চড়া গলার সুর মেলাল তখন সাতসমুদ্দুর তেরো দেশে সব থরহরি কম্প! আরও জুজু হয়ে গেল সবাই যখন মারমেডদিদি নিজের রূপের কথা ভুলে ল্যাজ আছড়ে প্রলয় বাধাল।

কী যে লড়াই হল-তা কী বলব!

সুলতানসাহেব ভাবলেন-এই মওকায় তিনি বেগমদের ফেলে রেখেই নিজেকে জানে বাঁচাবেন। তাই চুপিচুপি রোলস রয়েস গাড়িখানা চড়ে পাড়িও দিয়েছিলেন। কিন্তু একী-এ কে!

কালাপানির চোখ এড়ায় না কিছুই। ভাইটির হাতে সে পাঠিয়েছে বান। সেই বান আসছে এগিয়ে-রোলস রয়েসটাকে লক্ষ করে। সুলতান কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ‘জিনিসটা চাই না-নিয়ে নাও, নিয়ে নাও! আমার জানের দরে ওটাকে নিয়ে নাও।’

কিন্তু ততক্ষণে বান আকাশে উঠেছে। উঁচু থেকে সে দেখছে-ওটা কী! তাই বলো! এ যে সুলতানসাহেব, ভয়ে কেঁচো বনে গেছেন!

বানের জল পাড়ে আছড়ে পড়ল।

তখন যত সোনামুক্তো হিরে জহরত সুলতানের প্রাসাদের খাঁজে খাঁজে আর বেগমসাহেবাদের গায়ে পায়ে জমা হয়েছিল তা খুদে রাজপুত্তুর সাগরদাদা কালাপানিরও হাতে পৌঁছে দিয়ে তবে দম নিল। আর সঙ্গেসঙ্গে ছোট্ট আবুকে ভাসিয়ে দিল ভেলায়।

আবুকে দেখে সবাই হেসে উঠল। কী আনন্দ, কী আনন্দ! সাগরদাদা ছলাত করে উঠে আবুর মিঠে আলোরঙের গালে গাল ছুঁয়ে বলল, ‘কীরে পাগলি, ফিরে এলি?’

মারমেডদিদিকে জল থেকে ভেলায় উঠে আসতে দেখে আবু হেসে হাততালি দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, ‘রাঙাদি, রাঙাদি, তুমি কি আমার কাছেই থাকবে?’

মারমেডদিদি আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল। তার কালো লম্বা চুল মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রবালের ঠোঁট আবুর টোল-খাওয়া গালের মিঠে রঙের ওপর ছুঁইয়ে সে শুধু ইশারা করল। মারমেডদিদির ঠোঁটে হাসি। চোখে জল। আবুর কচি হাত দুটো গলা থেকে খুলে নিয়ে

ভেলা থেকে সে লেজ নামিয়ে জলে নেমে এল। তারপর আবার একবার দূরের দিকে চেয়ে ইশারা করে সে অতল জলে তলিয়ে গেল।

মারমেডদিদির ভাষা ফোটেনি। তার সমস্ত কিছুই ইশারায় ফুটে ওঠে। তাই বাবা সাত-সমুদ্দুরের সে আদুরে মেয়ে।

আবু ইশারা বোঝে। আবু বোঝে তার মারমেডদিদি তাকে কী বলে গেল। তাই তার আরও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে এই বোবা দিদিটাকে।

এবার আবু দূরের দিকে চোখ ফেরাল। সুর করে ডাকল সাইরেনদিদিকে-

'দি-ই-ইদি! দি-দি!'

সাইরেনদিদি সব সময় গা ঢাকা দিয়ে থাকে। হয়তো সাতসমুদ্দুর বলতে পারেন কোথায় থাকে তাঁর মেয়ে। শুধু শোনা যায় তার গলার সুর। এমন সুর যা প্রত্যেকবারেই নতুন। আর প্রত্যেকটা সুর সে আবুকে শুনিয়ে দেয়।

এখন আবুর দিদি ডাকের প্রতিধ্বনির সুরকে নিজের গলায় বেঁধে নিয়ে করুণ গলায় ডাকে-

আবু সোনা

চাঁদের কোনা

আবু ময়না

কোলে আয় না-

আবুর চোখের জলে কূল ভেসে যায়। সে সুর তোলে-

মা যে ডাকে-

চায় আমাকে-

তবু সাইরেনদিদি, কী টানে, কে জানে, গেয়ে চলে-

তবু আয় না

আবু ময়না

মন মানে না-

এবার আবুর চোখের জলে ভিজে গিয়ে সাগরদাদা বলে, 'আর কাঁদিসনে আবু, আমার সর্দি হয়ে যাবে।'

শুনে কালাপানিদাদার হোঃ হোঃ হোঃ হাসি, সারা তল্লাট কাঁপিয়ে তোলে। সে এমন হাসতে থাকে যে রোদ উঠে যায়। তখন সে আবুকে বলে, 'এবার তুই মার কাছে যা আবু।'

আবু হাসে। ভেলা দোলে। আবু চেয়ে দেখে একটা সামপানে চড়ে ওই তো তার বাবা! ঠিক চিনেছে।

সাগরদাদা ভেলায় দোল দেয়। আবু ঝুপ করে গিয়ে পড়ে তার বাবার সামপানে। ভেলাটা ভাসতে ভাসতে আপন মনে দিগন্তে মিশে যায়।

আবুকে লুফে নিয়ে বাবা বলেন-

রূপসায়রী

দোদুল দুলি

পড়ে গেলি-

মা দাঁড়িয়ে ছিলেন ওদের কুঁড়েঘরের দোরগোড়ায়। মা হাসলেন আর কাঁদলেন। আর ওকে কোলে বসিয়ে মুখখানা ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, 'আহা, এমন মেয়ে শেষে আমার কুঁড়েতে এল!'

বাবাও ওর মুখখানা দেখলেন। চোখটা হাসি হাসি করে বললেন, 'মেয়ের কী রূপ, কী রূপ!' বলে ওর কপালে আঙুল ছুঁইয়ে গাইলেন-

ঢিল-কপালি

পেতল-চোখি

খ্যাঁদা-নাকি মেয়ে-

আবুও হাসল। তারপর মুখখানা পাকা বুড়ির মতো করে বলল, 'কুঁড়েঘরে থাক কেন বাবা?'

'কুঁড়েঘরে না থাকলেই যে প্রাসাদে থাকতে হবে!'

'তা তো হবেই।'

'ওই দেখ!' বলে বাবা বানের জলে ভেসে যাওয়া সুলতানের প্রাসাদটা দেখিয়ে দিলেন।

আবু আসলে তিন বছরের মেয়ে হলেও তিন-শো বছরের পাকা বুদ্ধি ওর ঘটে। তাই ও ব্যাপারটা বুঝে নেয়।

আর বোঝে বলেই ও কুঁড়েঘর আলো করে বড়ো হয়।

অনেক অনেকদিন পরে কালাপানিতে আবার তাইফুন ঝড় উঠেছে। সাইরেনদিদির গলা আকাশ ফাটাচ্ছে। ইশারা করছে মারমেডদিদি। আর ওই খুদে রাজপুত্তুর সাগর যত হিরে, জহরত আর তাল-পাকানো সোনা বানের জলে ভাসিয়ে নিয়ে সাতসমুদ্দুরের পায়ে ফেলে দিচ্ছে।

আবু এখন অনেক দূরে থাকে। এত দূরে যে এ ঝড়টা সেখানে পৌঁছোয় না। তবু আবুর বুকের মধ্যেটা কীরকম করে ওঠে। আবুর গায়ে যে সহজ হাওয়া লাগে সে হাওয়াই ওকে বলে দিয়ে যায়। তাই মনে পড়ে।

আবুর ছোট্ট ছেলেটা আর মেয়েটা ওর দু-হাত ধরে ডাকে-'মা, মা!'

আবু তাদের কোলে তুলে নিয়ে আরব সাগরের ওপারটার দিকে চেয়ে শোনে-তাকেই কে করুণ সুরে ডাকছে-

আবু সোনা

চাঁদের কোনা

আবু ময়না

বুকে আয় না।

আশ্বিন ১৩৬৮




# বিজয়া রায়

এক গ্রামে একজন মস্ত বড়োলোক আর একজন ভারি গরিব লোক পাশাপাশি বাড়িতে থাকত। বড়ো লোকটির নাম সেরিঙ্গ; সে ছিল বেজায় অহংকারী আর কিপটে। গরিব লোকটির নাম ছিল চাম্বা; সে ভারি দয়ালু আর পরোপকারী।

একদিন একজোড়া চড়ুই পাখি চাম্বার সদর দরজার এক ফাটলে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ল। সময়মতো ডিম ফুটে ছোট্ট ছোট্ট ছানা বের হল।

একদিন চড়ুই পাখি দু-টি যখন ছানাগুলোর খাবারের সন্ধানে গেছে তখন তাদের একটি বাচ্চা বাসা থেকে চাম্বার দরজার গোড়ায় পড়ে গিয়ে একটি পা ভেঙে ফেলল। কিছুক্ষণ বাদে চাম্বা বাড়ি ফিরে চড়ুই ছানাটিকে দেখতে পেল। এরকম অসহায় অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখে তার ভারি মায়া হল। সে সাবধানে ছানাটিকে তুলে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যত্নের সঙ্গে একটুকরো সুতো দিয়ে তার ভাঙা পা-টি বেঁধে দিল। তারপর খুব সাবধানে তাকে তার বাসায় তুলে রেখে দিয়ে এল।

পাখিটা বড়ো হলে পরে একদিন হঠাৎ সে কোথা থেকে তার ঠোঁটে করে গুটি কয়েক ধান এনে চাম্বার সামনে রাখল। চাম্বা তো অবাক! চড়ুইটা তখন কিচির কিচির করে বলল, 'তুমি একদিন আমার বড়ো উপকার করেছিলে, সে কথা আমি ভুলিনি। তোমার বাগানে এই ধান ক-টি পুঁতে দেখো কী হয়।' বলেই সে ফুড়ুত করে উড়ে পালিয়ে গেল।

চড়ুইয়ের মুখে কথা শুনে চাম্বা তো থ! তারপর সে ভাবল, 'বলেছে যখন তখন দেখাই যাক না।'

বাড়ির সামনের বাগানেই ধান ক-টি সে খুব যত্ন করে পুঁতল। ক্রমে ক্রমে তার থেকে ধানের গাছ হল, দিনে দিনে গাছগুলি বড়ো হতে লাগল। চাম্বার কিন্তু ততদিনে আর ধানের কথা মনেই নেই। একদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, বড়ো বড়ো ধান গাছগুলোর ওপর চোখ পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল! একী, ধানের গাছে ধান তো নেই! তার বদলে প্রত্যেক গাছে ঝলমলে সব মণিমুক্তো ঝুলছে! এতে আর কে খুশি না হয় বল! চাম্বা তো মহাআনন্দে পাথরগুলো নিয়ে শহরে বিক্রি করে অনেক টাকা পেল। সেই টাকায় দেখতে দেখতে চাম্বার অবস্থা ফিরে গেল।

এদিকে তার বড়োলোক পড়শি সেরিঙ্গ গরিব চাম্বার হালচাল জাঁকজমক দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরে! একদিন সে মনে মনে ঠিক করল যে যেমন করে হোক চাম্বার বাড়িতে গিয়ে তার এই হঠাৎ বড়োলোক হওয়ার কায়দাটা জেনে আসবে।

যেমন কথা, তেমনি কাজ।

চাম্বার বাড়িতে গিয়ে সেরিঙ্গের সে কী খোশামোদ! এখন তো আর চাম্বা গরিব নয়, তাই সেরিঙ্গ এমন ভাব দেখাতে লাগল, যেন সে চাম্বার কতদিনের বন্ধু। আগে হলে তো চাম্বার দিকে সে ফিরেও তাকাত না। চাম্বা বেচারি নেহাত ভালোমানুষ, সেরিঙ্গের ফন্দি সে বুঝবে কী করে? সেরিঙ্গ অতি সহজেই চাম্বার কাছ থেকে তার বড়োলোক হবার ইতিহাসটুকু জেনে নিল। ফেরার পথে তার বারবার মনে হতে লাগল, ‘আহা, আমার ভাগ্যে এমনটি যদি হত।’



কী আশ্চর্য! সেরিঙ্গ যা চেয়েছিল ঠিক তাই হল! একদিন সকালে উঠে সে দেখল তার সদর দরজার উপরে চড়ুই পাখি বাসা বেঁধেছে। তখন আর তাকে পায় কে! সেদিন থেকে সে খুব কড়া নজর রাখল সেই বাসাটার উপর। চড়ুইয়ের ডিম হল, ডিম ফুটে বাচ্চা হল। এবারে বাচ্চার পা ভাঙা চাই। সেরিঙ্গের আর তর সয় না। সে একদিন করল কী, চালার উপর উঠে একটা বাচ্চাকে বাসা থেকে তুলে মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গেসঙ্গে ছানা বেচারির একটা পা ভেঙে গেল। তখন সেরিঙ্গ ঠিক চাম্বা যেরকম করেছিল সেইরকম সুতো দিয়ে পা বেঁধে ছানাটাকে আবার তার বাসায় রেখে দিয়ে এল।

এই ছানাটিও বড়ো হয়ে একদিন ঠোঁটে করে সেরিঙ্গের জন্য ধান নিয়ে এল। সেরিঙ্গ তো এইজন্যই অপেক্ষা করছিল। মহাআনন্দে সে তক্ষুনি বাগানে গিয়ে ধানগুলো পুঁতে ফেলল। তারপর থেকে সারাদিন পোঁতা ধানগুলোর আশপাশে সে ঘুরে বেড়ায়-আর তাড়াতাড়ি বড়ো হচ্ছে না কেন ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে। সময়মতো ধান গাছগুলো বড়ো হয়ে উঠল। সেরিঙ্গ রোজ ভাবে আজই বোধ হয় দেখবে গাছগুলো মণিমুক্তোর ভারে নুয়ে আছে।

একদিন সে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বাগানে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। কোথায় তার ধান গাছ! যেখানে গাছ পোঁতা হয়েছিল সেখানে তার আর কোনো চিহ্ন নেই। তার বদলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিরাটকায় বিকট এক মানুষ, বগলে তার একতাড়া কাগজ।

সেরিঙ্গকে দেখেই সেই মানুষটি দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, ‘আমাকে ফাঁকি দেবে ভেবেছিলে, না? সেটি হচ্ছে না। আমি তোমার আগের জন্মের পাওনাদার। দলিলপত্র সব আমার কাছে। সুদে আসলে প্রতিটি পয়সা তোমার কাছ থেকে আদায় না করে আমি ছাড়ছি না।’ ভয়ে সেরিঙ্গের মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। লোকটা তার বাড়ি ঘরদোর, ধনসম্পত্তি যেখানে যা-কিছু ছিল সব নিয়ে সেরিঙ্গকে প্রায় পথের ভিখিরি করে ছেড়ে দিল।

এর কিছুদিন বাদে চাম্বা বিদেশ যাবে। এখন তার প্রচুর টাকা। যাবার আগে এক থলি-ভরতি সোনা এনে বলল, 'ভাই সেরিঙ্গ, এগুলো তোমার কাছে রেখে গেলাম। ফিরে এসে আবার নেব।'

সেরিঙ্গের অবস্থা এখন এত খারাপ যে, সে আর লোভ সামলাতে পারল না। চাম্বা যাবার পর অল্প অল্প করে সব সোনা সে খরচ করে ফেলল। চাম্বার থলি খালি হয়ে গেল। সেরিঙ্গ তখন সেই খালি থলি বালি দিয়ে ভরে রাখল।

চাম্বা ফিরে এসে যখন থলি ফেরত চাইল, সেরিঙ্গ ওই বালি-ভরতি থলি তার হাতে তুলে দিল। থলি খুলেই তো চাম্বার চক্ষুস্থির! বলল, 'ভাই, বন্ধু বলে বিশ্বাস করে তোমার কাছে যা রেখে গেলাম, তার বদলে তুমি এ কী ফেরত দিলে?'

সেরিঙ্গ এমন ভাব দেখাল যেন এ সবের সে কিছুই জানে না; খুব অবাক হবার ভান করে সে কেবলই বলতে লাগল, 'ভাই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না-তোমার সোনাই বালি হয়ে গেছে, তোমার সোনাই বালি হয়ে গেছে।' চাম্বা মনে মনে খুব দুঃখ পেলেও মুখে কিছু না বলে বাড়ি ফিরে এল।

কিছুদিন পর সেরিঙ্গের হঠাৎ বিদেশ যাওয়ার দরকার হল। যাবার সময় বলল, 'ভাই চাম্বা, আমি বিদেশ যাচ্ছি। আমার ছেলে তোমার কাছে রইল। তুমি ওর একটু দেখাশোনা কোরো।'

কিছুদিন পরে বিদেশ থেকে ফিরে এসে সেরিঙ্গ সোজা চাম্বার বাড়িতে গিয়ে হাজির। তখন চাম্বার বাড়িতে ইশকুল বসেছে, চাম্বাই ছেলেদের পড়াচ্ছে। এদিক-ওদিক চেয়ে সেরিঙ্গ নিজের ছেলেকে কোথাও পেল না। শুধু দেখল ছেলেদের সঙ্গে একটা বাঁদর বসে রয়েছে। সেরিঙ্গ চাম্বাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, আমার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে কোথায়? লেখাপড়া ঠিকমতো করছে তো?

চাম্বা তখন কোনো কথা না বলে সেই বাঁদরটাকে সেরিঙ্গের কাছে এনে দিল। সেরিঙ্গ বলল, 'এ তো বাঁদর! আমার ছেলে কোথায়?'

বাঁদরটা তখন সেরিঙ্গের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'বাবা, আমি বাঁদর হয়ে গেছি-'

বাঁদরটা আসলে চাম্বার পোষা এবং সেরিঙ্গ যতদিন বাইরে ছিল চাম্বা ততদিনে বাঁদরটাকে ওই একটা কথা বলতে শিখিয়েছিল। সেরিঙ্গ যতই বলে, 'আমার ছেলে কোথায়?' বাঁদর ততই বলে, 'বাবা, আমি বাঁদর হয়ে গেছি-বাবা, আমি বাঁদর হয়ে গেছি।'

সেরিঙ্গ ভয়ানক রেগে গেলেও মনে মনে বুঝতে পারল চাম্বা তাকে উচিত শিক্ষাই দিয়েছে। সে তখন চাম্বার কাছে তার অন্যায়ের জন্য অনেক করে ক্ষমা চাইল আর প্রতিজ্ঞা করল যে সে নিশ্চয়ই চাম্বার সোনা ফেরত দিয়ে দেবে।

বন্ধুকে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া চাম্বার মনে আর কোনো অভিসন্ধি ছিল না, তাই সে তক্ষুনি সেরিঙ্গের ছেলেকে ঘর থেকে বার করে আনল। বিদায়ের সময় চাম্বা বলল, 'বন্ধু সেরিঙ্গ, আর কখনো কাউকে এভাবে ঠকাতে যেয়ো না।'

*(তিব্বতি উপকথা)*

*শ্রাবণ ১৩৬৮*






# শিবানী রায়চৌধুরী

সেদিন বিকেল বেলা 'সন্দেশ' এসে বলে গেল, ওর নামে আজকাল এত চিঠি আসছে যে সেগুলো শুনতে শুনতে ওর কান ঝালাপালা। সে চিঠিগুলোতে কী নেই! তাতে কত রকমের কথা, কত জিনিস নিয়ে আলোচনা, যেমন-দুঃখকষ্ট, ভাব-ঝগড়া, মামলামোকদ্দমা, জন্মদিন-দুর্গাপুজো, পরীক্ষা-রেজাল্ট, ঘুড়ি-লাটাই ... এমনি সব জিনিস। 'সন্দেশ' বলল, 'দেখো তো মজা! এই চিঠিগুলোর হাঁকডাক শুনে আমি কি পাগল হয়ে যাব? তারপর বলল, 'এরা নাকি একটার পর একটা চিঠি লিখে যায়, উত্তর না দিলে আরও বড়ো চিঠি লেখে, তারও উত্তর না দিলে নিজেরাই চলে আসে।' আমি বললাম, 'সন্দেশ', তুমি একা অত ঝক্কি নিতে যাও কেন, দাও না বন্ধুদের পাঠিয়ে। তারা পড়ে দেখুক।'

তাই শুনে 'সন্দেশ' তার ঝোলা থেকে এক বান্ডিল চিঠি বের করে আমার সামনে রাখল। আমি তো দেখে অবাক! খামের চিঠি, পোস্টকার্ডের চিঠি, বুক-পোস্টের চিঠি, বেয়ারিং চিঠি-আমি একটার পর একটা পড়ে যেতে লাগলাম। তার থেকে তিনটে চিঠি 'সন্দেশ'-এর বন্ধুদের দিচ্ছি। তার একটাতে ইতিহাস উলটে যাচ্ছে, আর দুটোতে দু-জনের দুঃখের কাহিনি মুক্তোর মতো হরফে লেখা হচ্ছে।

প্রথম চিঠি-

'হস্তিনাপুর।

আমার সহিত মহাভারত-রচয়িতা বেদব্যাসের সৌহার্দ্যের কথা ইতিহাস বর্ণিত না থাকিলেও তৎকালীন বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার মহাভারতের মূল উপকরণ বস্তুত আমার নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তিনি আমার এই মহৎ দান ভাঙাইয়া খাইতেছেন। আমি এবিষয়ে পাঠকবৃন্দকে অবগত করা আবশ্যক মনে করি নাই, যদি না কিছুদিন পূর্বে তিনি আমার সহিত ফুচকা-ভক্ষণ ব্যাপারে বৈতরিণীতীরে এক তুমুল কাণ্ড বাধাইতেন। আহা! কী মহৎ প্রবৃত্তি! মাত্র দুইখানি ফুচকা! ইতি-'

চিঠির নীচে কোনো নাম ছিল না। তাই 'সন্দেশ'কে বললাম, এসব বেনামি চিঠিতে কান দিয়ো না। বড়োলোকদের নামে ওরকম অনেক উড়ো চিঠি আসে। ব্যাসদেবের সঙ্গে দেখা হলে নাহয় এসব সমস্যার সমাধান হত।



দ্বিতীয় চিঠি। একজন পবননন্দনের উক্তি :

'ভাই 'সন্দেশ',

আমি পা স্লিপ করে এই অভদ্র জগতে এসে পড়েছি। নয়তো পুরাণে লেখা রামরাজ্যেই আমি বাস করতাম-এ কথা আশাকরি তোমার অজানা নয়। আমি এ জগতের অবনতির উচ্চশিখর দেখে হাঁ হয়ে যাচ্ছি, আর বসবার জায়গার অভাবে পার্কে পার্কে ঘুরে চীনেবাদাম চিবোচ্ছি (এতে অনেক পয়সা নষ্ট হচ্ছে, তবে পয়সা আমার নয়, পয়সা বাদামওয়ালার)। কোথায় বসব?-সমস্ত গাছ উৎপাটিত, সেখানে চিরহরিৎ ঘাসের চাষ। রোদে ঘুরে আমার মাথা ধরেছে। একপাটি হাওয়াই স্যান্ডেল ছিঁড়েছে। একটা সাত আনা তিনপয়সা দামের কলম পকেটমার হয়েছে (এর আগে জানতাম না যে পার্কে মুক্তসেবন করতে এসে লোকে কলম ভক্ষণ করে। এটাই বোধকরি এ জগতের বিধি-হাওয়া খেতে এসে কলম হাওয়া হয়ে যায়)। গায়ের অমন ধোঁয়াটে রং তামাটে আভা ধারণ করেছে, মাথার খুলিতে ফাটল ধরেছে আর কানের গোড়ায় কনসার্ট বাজছে। এদের মাশুলস্বরূপ কয়েক ডজন 'এনাসিন', একছটাক সিমেন্ট ও একটি পেন্টিং বক্স লেগেছে। এ ছাড়া নাইলন-শার্টের ফুটো দিয়ে নগদ পাঁচ নয়া পয়সা রাস্তার ধুলোয় মিলিয়ে গেছে (লোকে কুড়িয়ে নিতেও পারে, যা হ্যাংলা স্বভাব হয়েছে)।

যা হোক এখন আমার মেজাজ গরম। একটা আইসক্রিম খেয়েছি। আরেকটা খেতে চাই। কিন্তু পয়সা নেই। একটা কালো চশমা কিনতাম, তাও হবে না (চক্ষুরত্ন দু-টি রক্ষা পেত তা কে বুঝবে?)। পয়সার অভাবে পৃথিবী অন্ধকার। কালো চশমার আর কী দরকার?'

আমরা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে একটা কলম, নগদ পাঁচ নয়া পয়সা আর একটা কালো চশমা কিনে পাঠিয়েছি। হাজার হোক ছেলেমানুষ তো, খুশি হবে।

শেষের চিঠিটা লিখেছে একটা সাদা দাঁড়কাক। চিঠিটা ইংরেজিতে লিখেছিল। তার বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায় :

'ওস্ট্রেলিয়াসে ইখানে আসার পর থেকেই হামার মন খুব খারাপ আছে। একজনভি বন্ধু আছে না। হামার যত জাতভাই আছে তারা কুছ বাংলা জানে না। ইশকুলে পোড়ে না, তাই অংরেজি জানে না। হামার কোথা বুঝে না। বোড় দুঃখ হয় যে বুঝার চেষ্টাভি কোরে না। হামার সামনে সামনে দেখিয়ে চপ-কাটলেট আচ্ছাসে খায়। হামি কুছু খাবে জানলে

বুঝবে না, বুঝবে তো এক গেলাস পানি আনবে। বহুত মোজার আছে যে কুনো গালাগালি করলে ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে। হে 'সন্দেশ' ভাই, হামি কী কোরবে? তুমি একটা কুনো বুদ্ধি বাতলে দিবে।'

আমি ওকে বাংলা শিখতে বলেছি। কোথায় শিখবে সেটাও এক সমস্যা! দাঁড়কাকদের জন্যে তো কোনো ইশকুল নেই। তা 'সন্দেশ'-এর বন্ধুরা কেউ রাজি থাকলে জানিয়ো। আমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেব।

*কার্তিক* **১৩৬৮**




## শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

### ১

সদাশিব কুঙ্কুকে নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিল এবং কুঙ্কুকে জিজাবাইয়ের হাতে সঁপে দিয়েছিল, সে কাহিনি আগে বলেছি। সদাশিবের মাথায় বুদ্ধি ছিল অনেক, কিন্তু অহংকার এক ফোঁটা ছিল না; নিজের চেয়ে পরের কথাই সে বেশি ভাবত। তার নিজের যে কোনো যোগ্যতা আছে এ কথা তার মনেই আসত না। তাই শিবাজি থেকে আরম্ভ করে সবাই তাকে এত ভালোবাসতেন।

ওদিকে শিবাজি চাকন দুর্গ দখল করেছেন বটে, কিন্তু সে কতটুকু? সারা মহারাষ্ট্র দেশে অসংখ্য দুর্গ আছে; প্রত্যেক দুর্গের মালিক স্বাধীনভাবে থাকেন। কেউ-বা বিজাপুর রাজ্যের অধীনে থেকে দুর্গ রক্ষা করেন। শিবাজির উদ্দেশ্য মহারাষ্ট্র দেশে যত দুর্গ আছে সব নিজের দখলে এনে, একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করবেন; সমস্ত মারাঠা জাতি এক হবে, স্বাধীন হবে। বাইরের শত্রুর উপদ্রব থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু এ কাজ তো সোজা কাজ নয়, একদিনের কাজও নয়। শিবাজি কখনো ছল-চাতুরি দ্বারা, কখনো লড়াই করে একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করেছেন। কিন্তু এখনও অনেক দুর্গ বাকি।

বলা বাহুল্য সদাশিব সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছে। এতদিন সে একটু মনমরা হয়ে ছিল, কারণ তার গোঁফ ছিল না; যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে গিয়ে যদি গোঁফ না থাকে সে বড়ো লজ্জার কথা। কিন্তু এখন তার প্রাণে আর দুঃখ নেই, তার নাকের নীচে কুরকুরে এক জোড়া গোঁফ গজিয়েছে। কেউ আর তাকে ছেলেমানুষ বলে অবজ্ঞা করে না, সে এখন জোয়ান মর্দ, জঙ্গিবাহাদুর।

কিন্তু সম্প্রতি মহারাষ্ট্র দেশে এক মহাদুর্যোগ উপস্থিত হয়েছে; ঘোড়ার মড়ক এসে দেশের প্রায় অর্ধেক ঘোড়া শেষ করে দিয়ে গেছে। অথচ ঘোড়া না হলে যুদ্ধ হয় না, পাহাড়ি দেশে এখান থেকে ওখানে যাওয়া যায় না। শিবাজি ভারি মুশকিলে পড়েছেন। তাঁর নিজের এবং অধীন সৈন্যদের মিলিয়ে আন্দাজ পাঁচ হাজার ঘোড়া ছিল, তার অধিকাংশ মড়কে মারা গেছে। এখন তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন কী করে? ভরসা শুধু এই যে শত্রুদেরও ঘোড়া মরেছে; কেউ আর এগিয়ে এসে যুদ্ধ করতে পারছে না। সবাই প্রাণপণে ঘোড়া সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘোড়া কোথায়? বিদেশ থেকে যেসব ঘোড়ার সওদাগর ঘোড়া বিক্রি করতে আসত তারা মড়কের ভয়ে আর আসে না।

সারা মহারাষ্ট্র দেশে কেবল একটি লোকের কাছে ঘোড়া আছে, তিনি হচ্ছেন চন্দ্রগড় দুর্গের অধিপতি বলবন্ত রাও। চন্দ্রগড় দুর্গ পুনা থেকে বেশি দূর নয়, ঘোড়ার পিঠে এক বেলার রাস্তা। কিন্তু পথ বড়ো দুর্গম, কৎরজ গিরিসংকটের গোলকধাঁধার মধ্যে নিরালা

দুর্গটি চুপচাপ বসে আছে। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ কম বলেই বোধ হয় চন্দ্রগড় দুর্গে ঘোড়া-মড়কের ছোঁয়াচ লাগেনি। বলবন্ত রাওয়ের দু-হাজার ঘোড়া সব জ্যান্ত আছে।

বলবন্ত রাওয়ের অনেক বয়স হয়েছে; লোকটি যেমন ধূর্ত তেমনি কৃপণ। তিনি দূর সম্পর্কে শিবাজির মামা হন। শোনা যায়, ছ-সাত বছর আগে তিনি একবার ভগিনী জিজাবাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পুনায় এসেছিলেন। শিবাজির তখন কিশোর বয়স, কিন্তু বলবন্ত রাও তাঁকে দেখেশুনে বুঝলেন, এ ছেলে সামান্য নয়; একদিন এ ছেলে সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশ নিজের কবলে আনবে। তিনি মধুর হেসে বললেন, ‘বাবা শিব, তোমার কপালে রাজতিলক দেখতে পাচ্ছি। আশীর্বাদ করি তুমি দিগবিজয়ী হও।’

শিবাজি চুপ করে রইলেন। বলবন্ত রাও তখন তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ‘তুমি আমার বোন জিজার ছেলে, আমার পরমাত্মীয়। দেখো বাবা, তুমি যেন বড়ো হয়ে আমার দুর্গের পানে নজর দিয়ো না।’

শিবাজি সবিনয়ে বললেন, ‘না না, সে কী কথা!’

জিজাবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বলবন্ত রাও তাঁর পায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ‘তাহলে মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি করো।’

শিবাজি নিরুপায় হয়ে মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করলেন যে তিনি কোনোদিন ছলে বলে কৌশলে চন্দ্রগড় দুর্গ দখল করবার চেষ্টা করবেন না। বলবন্ত রাও খুশি হয়ে নিজের দুর্গে ফিরে গেলেন।

এই তো গেল আগের কথা। বর্তমানে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, বলবন্ত রাও নিজের দুর্গে দু-হাজার ঘোড়া নিয়ে বসে আছেন। তাঁর দুর্গে যত সৈন্য আছে ঘোড়া তার চারগুণ। বলবন্ত রাও মনের আনন্দে ঘোড়া বিক্রি করছেন; মড়কের পর তিনি ঘোড়ার দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন-একটা ঘোড়ার দাম দশ আশরফি, ইচ্ছে হয় কেনো না হয় কিনো না।

গরজ বড়ো বালাই। যাদের গরজ বেশি তারা দু-চারটে ঘোড়া কিনছে, কিন্তু এত দাম দিয়ে বেশি ঘোড়া কেনার ক্ষমতা ক-জনের আছে? শিবাজি একবার বলবন্ত রাওয়ের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বলবন্ত রাও অটল। নিজের ভাগনের প্রতি তিনি তো আর পক্ষপাত দেখাতে পারেন না, লোকে বলবে কী! যে ঘোড়া কিনতে চায় তাকেই দশ আশরফি দিতে হবে, এক কানাকড়ি কম হবে না।

শিবাজি ভারি প্যাঁচে পড়ে গিয়েছেন। মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারেন না। দুর্গটা ইচ্ছে করলেই তিনি জয় করতে পারেন, কিন্তু চন্দ্রগড় দুর্গের প্রতি তাঁর লোভ নেই। তাঁর চাই ঘোড়া। তিনি মনে মনে নানারকম ফন্দি আঁটছেন, কী করে বলবন্ত রাওয়ের ঘোড়াগুলো হস্তগত করা যায়, অথচ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না হয়। বলবন্ত রাও কেবল নামেই শিবাজির মামা, কাজের বেলা কেউ নয়। বুড়োকে জব্দ করতে না পারলে জীবনই বৃথা!

এই সব নানা চিন্তায় মগ্ন শিবাজি একদিন বিকেল বেলা প্রাসাদের ছাদে উঠলেন। ছাদে কুঙ্কু আর জিজাবাই ছিলেন, কুঙ্কু জিজাবাইয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। শিবাজিকে দেখে জিজাবাই ভুরু তুলে চাইলেন, ‘কী রে?’

শিবাজি বললেন, ‘কিছু নয় মা, ছাদে একটু বেড়াতে এলাম।’

জিজাবাই আর কিছু বললেন না; শিবাজি চিন্তিত মুখে ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। ছাদের কিনারা থেকে পুনার ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে, দূরে মুথা নদী দেখা যাচ্ছে কিন্তু

সেদিকে শিবাজির দৃষ্টি নেই, তাঁর মন চিন্তায় মগ্ন।

ওদিকে জিজাবাই কুঙ্কুর সঙ্গে গল্প করছেন। দু-একটা কথা শিবাজির কানে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মন অন্য দিকে; তিনি ভাবছেন কোন উপায়ে মামা বলবন্ত রাওয়ের ঘোড়াগুলো হাত করা যায়। ভাবতে ভাবতে তিনি এক সময় জিজাবাইয়ের কয়েকটা কথা শুনতে পেলেন, শুনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজাবাই বলছেন, '… সামনের পূর্ণিমা তিথিতে আমার ব্রত উদযাপন; ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে … জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের নেমন্তন্ন করতে পারলে ভালো হত, কিন্তু পুনায় জ্ঞাতিগোষ্ঠী ক-জনই বা আছে …'

শিবাজি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিঃশব্দে ছাদ থেকে নেমে গেলেন।

সিঁড়ির নীচে সদাশিব দাঁড়িয়ে ছিল, শিবাজি তাকে বললেন, 'দেখ তো তানাজি কোথায়। তাকে ডেকে নিয়ে আয়, পরামর্শ আছে।'

শিবাজি গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে বসলেন। ছোটো ঘর, মেঝের ওপর জাজিম পাতা, কয়েকটা মোটা তাকিয়া ছড়ানো রয়েছে। শিবাজি একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। চমৎকার বুদ্ধি মাথায় এসেছে!

কিছুক্ষণ পরে তানাজিকে নিয়ে সদাশিব এল। তখন তিনজনে মুখোমুখি বসে মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন। শিবাজি দু-চার কথায় তাঁর মতলব খুলে বললেন, 'আগামী পূর্ণিমার দিন মায়ের ব্রত উদযাপন হবে। মায়ের ভারি দুঃখ জ্ঞাতিগোষ্ঠী বেশি পুনায় নেই; তা আমি ঠিক করেছি চন্দ্রগড় দুর্গে লোক পাঠিয়ে মামা বলবন্ত রাওকে নেমন্তন্ন করব, দুর্গের সবাইকে নেমন্তন্ন করব। তারা অন্তত তিন-চারশো লোক আসবে; ঘোড়ায় চড়ে আসবে। তার মানে তিন-চারশো ঘোড়া। বুঝেছ? ওরা দুপুর বেলা এসে পৌঁছোবে, সারা দিন খাওয়া-দাওয়া হইহল্লা চলবে। সে রাত্রে ওরা ফিরে যেতে পারবে না, এখানেই রাত কাটাতে হবে। পরদিন সকাল বেলা বলবন্ত রাও ঘুম থেকে উঠে দেখবেন সব ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে। কেমন?'

তানাজি মহানন্দে হাঁটু চাপড়ে বললেন, 'বাহবা! খাসা বুদ্ধি বার করেছ। যদি তিন-চারশো ঘোড়া পাওয়া যায় তাই বা মন্দ কী। তা, কাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠাচ্ছ?'

শিবাজি বললেন, 'সদাশিবকে। সঙ্গে পুরুতমশাই যাবেন।'

## ২

শিবাজি জিজাবাইকে বললেন, 'মা, এবার খুব ঘটা করে তোমার ব্রত উদযাপন হবে।'

মা খুশি হলেন, বললেন, 'বেশ তো, তুই যা করবি তাই হবে।'

শিবাজি বললেন, 'চন্দ্রগড় দুর্গের সবাইকে নেমন্তন্ন করব। হাজার হোক বলবন্ত রাও তোমার দাদা। আমার মামা। তাঁকে এবং তাঁর দুর্গের লোকদের নেমন্তন্ন না করলে ভালো দেখায় না।'

জিজাবাই মনে মনে হাসলেন, বললেন, 'তা ভালো। কিন্তু দাদার দুর্গের পানে যেন নজর দিস নে, পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিস।'

শিবাজি জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, সে কী কথা!'

দুপুর রাত্রে সদাশিব গোরুর গাড়িতে চড়ে যাত্রা করল। তার সঙ্গে বৃদ্ধ পুরোহিত রামদেও এবং এক বস্তা সুপুরি। কাউকে নেমন্তন্ন করার সময় তার হাতে সুপুরি দিতে হয়।

শুক্লা দশমীর রাত্রি, আকাশে চাঁদ আছে। সদাশিব নিজেই গোরুর গাড়ি হাঁকিয়ে চলল। ঘোড়ায় না গিয়ে গোরুর গাড়িতে যাওয়ার কারণ, প্রথমত, সঙ্গে বৃদ্ধ রামদেও আছেন। মহারাষ্ট্র দেশে যদিও সকলেই ঘোড়ায় চড়তে জানে, তবু পুরোহিত মশাইয়ের বয়স হয়েছে। এতদূর রাস্তা ঘোড়ার পিঠে যেতে তাঁর কষ্ট হবে। দ্বিতীয়ত, মাত্র দু-জন লোকের পক্ষে ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়; আজকাল চারিদিকে রাহাজানের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুবিধে পেলেই অসহায় পথিকের ঘোড়া কেড়ে নিচ্ছে। মহারাষ্ট্র দেশে ঘোড়া সবচেয়ে দুর্মূল্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারা রাত সদাশিব উঁচু-নীচু পাথুরে পথ দিয়ে গোরুর গাড়ি চালাল; রামদেও গাড়িতে শুয়ে নিদ্রা দিলেন। রাত্রি শেষ হবার আগেই চাঁদ অস্ত গেল। সদাশিব তখন গাড়ি দাঁড় করাল। তারপর ভোর হবার সঙ্গেসঙ্গে আবার চলল।

তারা যখন চন্দ্রগড় দুর্গের সামনে উপস্থিত হল তখন বেলা প্রথম প্রহর পার হয়ে গেছে।

চন্দ্রগড় দুর্গটি খুব পুরোনো, বোধ হয় তিন-চারশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল। মস্ত বড়ো দুর্গ, বড়ো বড়ো পাথরের বিশ হাত উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা। বলবন্ত রাও দুর্গটিকে অটুট রেখেছেন, সর্বদা তার দেখাশোনা করেন, কোথাও প্রাকারের পাথর খসে গেলে তৎক্ষণাৎ মেরামত করান। তবু প্রাকারের পাথরের খাঁজে খাঁজে গাছ গছিয়েছে; প্রাচীনতার চিহ্ন দুর্গটির গায়ে ছাপ মারা রয়েছে। সদাশিব দেখেশুনে নিজের মনে মন্তব্য করল, 'শিবাজির পক্ষে এ দুর্গ দখল করা মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু রাজা যে মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছেন-' সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

দুর্গের তোরণদ্বার খোলা ছিল। সদাশিবের গোরুর গাড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিন-চারজন লশকর বেরিয়ে এল, একজন জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

রামদেও গাড়ি থেকে নামলেন, সদাশিব সুপুরির বস্তা নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াল। রামদেও বললেন, 'আমরা পুনা থেকে আসছি। আমি শিবাজির কুলপুরোহিত। কিল×াদার বলবন্ত রাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

শিবাজির নাম এখন সকলেই জানে, লশকরদের চোখে সম্ভ্রম ফুটে উঠল। একজন বলল, 'একটু দাঁড়ান, রাওকে খবর দিচ্ছি।'

লশকর দুর্গের ভিতর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'আসতে আজ্ঞা হোক।'

রামদেও এবং সদাশিবকে নিয়ে লশকরেরা দুর্গে প্রবেশ করল।

দুর্গের একটি চাতালের ওপর গদি পাতা, তার ওপর বলবন্ত রাও বসে আছেন। কয়েকজন অনুচর তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে; একজন তালপাতার প্রকাণ্ড পাখা দিয়ে বাতাস করছে। বলবন্ত রাওয়ের মুখখানি তাল-তোবড়া বেগুন-পোড়া গোছের; মাথার চুল কামানো। কিন্তু চোখ দুটি ভারি তীক্ষ্ণ। তিনি সন্দেহভরা চোখে রামদেওয়ের পানে চাইলেন।

রামদেও হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন, তারপর সদাশিবের ঝোলা থেকে পাঁচটি সুপুরি নিয়ে বলবন্ত রাওয়ের সামনে রাখলেন, বললেন, 'আগামী পূর্ণিমা তিথিতে

জিজাবাইয়ের ব্রত উদযাপন হবে। আপনি তাঁর পরমাত্মীয়; তাই তিনি আপনাকে এবং আপনার দুর্গের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন। পূর্ণিমার দিন আপনারা সকলে পুনায় গিয়ে তাঁর ব্রত উদযাপনে অন্ন গ্রহণ করলে তিনি কৃতার্থ হবেন।'

বলবন্ত রাওয়ের পাশে গদির ওপর তাঁর বাঁধা-পাগড়ি রাখা ছিল, তিনি সেটি মাথায় পরে নিয়ে সুপুরিগুলি তুলে নিলেন; মাথায় পাগড়ি না পরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা নিয়ম নয়। রামদেওয়ের পানে একটু হেসে বললেন, 'আসন গ্রহণ করুন।'

রামদেও গদির পাশে বসলেন। সদাশিব সুপুরির ঝোলা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান, তাকে কেউ বসতে বলল না।

বলবন্ত রাও মুখে মেকি হাসি এবং চোখে সন্দেহ নিয়ে রামদেওকে নানা প্রশ্ন করলেন। প্রথমে কুশল প্রশ্ন, তারপর নানা কথা। কীসের ব্রত, কত দিনের ব্রত, অন্য কে কে নিমন্ত্রিত হয়েছে, এই সব। রামদেও সরল ব্রাহ্মণ, ভিতরের কথা কিছু জানতেন না, তিনি সরলভাবে উত্তর দিলেন। শেষে বলবন্ত রাও বললেন, 'বেশ বেশ, শিব্বা মায়ের ব্রত উপলক্ষে খুব ঘটা করছে দেখছি।'

রামদেও বললেন, 'জানেন তো শিবাজি কীরকম মাতৃভক্ত ছেলে। মায়ের ব্রত উদযাপনে সে ঘটা করবে না তো কে করবে!'

'তা বটে-তা বটে।' বলবন্ত রাও একটু ইতস্তত করে বললেন, 'খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কীরকম হয়েছে?'

রামদেও লম্বা ফিরিস্তি দিলেন : আম্বা মৌর চালের ভাত, আমটি সম্বর কোশাম্বি, পুরণপুরী লাড্ডু পেঁড়া জিলিপি, দই দুধ-পাক দহি বড়া আরও কত কী; বলবন্ত রাও কিপটে মানুষ, নিজের মাতৃশ্রাদ্ধে পাঁচজন ব্রাহ্মণ খাইয়েছিলেন, ফিরিস্তি শুনে তিনি প্রকাণ্ড হাঁ করলেন, 'এত খরচ করবে শিবাজি মায়ের ব্রত উদযাপনে। আমার দুর্গেই তো পাঁচ-শো জোয়ান আছে, সবাইকে এত খাওয়াবে?'

রামদেও হেসে বললেন, 'তা খাওয়াবে বই কী। এ তো আর সামান্য ব্যাপার নয়, মায়ের ব্রত উদযাপন।'

ইতিমধ্যে দুর্গের অনেক লোক এসে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল; ভোজের ফিরিস্তি শুনে তাদের জিভে জল এল। তারা সাধারণ সৈনিক, তাদের দৈনিক রসদ জোয়ারের রুটি আর ধনে পাতার চাটনি; এর বেশি তাদের ভাগ্যে বড়ো একটা জোটে না। শিবাজি তাদের নেমন্তন্ন করেছেন এবং রকমারি অন্নব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন খাওয়াবেন জেনে তারা উল×সিত হয়ে উঠল।

রামদেও বললেন, 'তাহলে আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করি?'

'করুন।' বলবন্ত রাও হাসিমুখে কথা বললেন বটে কিন্তু তাঁর মনটা সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। শিবাজি অবশ্য শপথ-ভঙ্গ করবে না, কিন্তু তার মতলবটা কী? নিশ্চয় অন্য কোনো মতলব আছে। নইলে এত লোককে কেউ কখনো নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়!

রামদেও উঠলেন, চারদিকে ঘুরে ঘুরে সকলের হাতে সুপুরি দিয়ে নেমন্তন্ন করলেন। দুর্গের ভিতরটা ছোটোখাটো একটি শহরের মতন; রাস্তা আছে, বাজার আছে, পুকুর আছে। দুর্গের উত্তর দিকে ঘোড়াশালা, তার পাশে গোশালা। রামদেও যেমন ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন করছেন, সদাশিবও সুপুরির ঝোলা নিয়ে সঙ্গে আছে। সদাশিব বোকার মতন

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন এমন দৃশ্য সে আগে কখনো দেখেনি। তার দিকে কারোর দৃষ্টি নেই, কিন্তু সে সবকিছু দেখে নিচ্ছে।

নিমন্ত্রণ সারা হতে বেলা দুপুর কেটে গেল। অপরাহ্নে রামদেও বলবন্ত রাওকে বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে, আমি তাহলে বিদায় নিই। জিজাবাইকে জানাব যে পূর্ণিমার দিন মধ্যাহ্নে আপনি সদলবলে পুনায় উপস্থিত হবেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়।'

গোরুর গাড়ি চলে যাবার পর বলবন্ত রাও গদির ওপর বসে অনেকক্ষণ আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। হাজার হোক তিনি শিবাজির মামা, বাঁশের চেয়ে কি কঞ্চি দড় হয়? শিবাজির মতলব তিনি বুঝে নিয়েছেন।

## ৩

শুক্লা একাদশীর রাত্রি তিন প্রহরে, চাঁদ তখন অস্ত যাচ্ছে, সদাশিবের গোরুর গাড়ি পুনায় ফিরে এল। শিবাজি তাদের জন্যে রাত জেগে বসে ছিলেন, রামদেওকে বললেন, 'আপনি বুড়ো মানুষ, ক্লান্ত হয়েছেন। শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

তিনি চলে গেলেন। শিবাজি তখন সদাশিবকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে বসলেন, প্রদীপের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নিলেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'জয় ভবানী। লক্ষণ ভালোই মনে হচ্ছে।-কিন্তু তুই দু-রাত্রি জেগে গোরুর গাড়ি চালিয়েছিস, যা, লম্বা এক-ঘুম ঘুমিয়ে নে। কাল থেকে ভোজের আয়োজন শুরু করতে হবে। মাঝে মাত্র তিনটি দিন বাকি।'

পরদিন সকাল থেকে কাজের ধুম পড়ে গেল। শিবাজি এবং তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পুনায় যত গণ্যমান্য লোক আছেন সকলকে নিমন্ত্রণ করতে হবে; শিবাজির প্রায় পাঁচ হাজার সিপাহি পুনায় উপস্থিত আছে, তারাও খাবে; তা ছাড়া চন্দ্রগড় দুর্গের পাঁচ-শো লোক। সব মিলিয়ে দশ হাজার আসবে। প্রকাণ্ড প্রাসাদের প্রকাণ্ড রসুইঘরে ভিয়েন বসে গেল। মা জিজাবাইয়ের আনন্দের সীমা নেই, তিনি চারদিকে কাজকর্ম তদারক করে বেড়াচ্ছেন। কুঙ্কু সর্বদা তাঁর সঙ্গে আছে।

শিবাজির মনে অন্য চিন্তাও রয়েছে। উৎসবের সময় শত্রুরা সুযোগ পায়; শিবাজির শত্রুর অভাব নেই। তাই তিনি চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। শিবাজির বন্ধু যেসাজির অধীনে কয়েক দল লশকর পুনার চারিধারে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে; তা ছাড়া গুপ্তচরের দল চুপিচুপি সুলুকসন্ধান নিচ্ছে। শত্রু যে আচমকা আক্রমণ করবে তার উপায় নেই।

এইভাবে তিন দিন কেটে গেল, পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত। উদ্যোগ-আয়োজন সব শেষ হয়েছে, এখন অতিথিরা এলেই হয়। বিশেষত শিবাজির মন পড়ে আছে চন্দ্রগড়ের অতিথিদের দিকে। তারা ঘোড়ায় চড়ে কখন আসবে!

বেলা প্রথম প্রহর পার হবার পর পুনার অতিথিরা আসতে আরম্ভ করলেন। ন্যাড়া মাথায় বাঁধা-পাগড়ি-পরা ব্রাহ্মণ, কোমরে তলোয়ার-বাঁধা মারাঠা। সবাই সভামণ্ডপে গিয়ে বসলেন; আতর গোলাপ মাখলেন। সভা গমগম করতে লাগল।

শিবাজি এবং তাঁর বন্ধুরা অতিথিদের অভ্যর্থনা করছেন, সকলের সঙ্গে মিষ্টালাপ করছেন। শিবাজি সদাশিবকে ছাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন; যেদিক থেকে চন্দ্রগড়ের অতিথিরা আসবে সদাশিব সেইদিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের আসতে দেখলেই

শিবাজিকে গিয়ে খবর দেবে। শিবাজিও একটু ফুরসত পেলে ছাদে গিয়ে দেখে আসছেন। কিন্তু চন্দ্রগড় দুর্গের অতিথিদের এখনও দেখা নেই।

বেলা বাড়ছে। একদল ব্রাহ্মণ মহোদয় ভোজনে বসলেন। চর্ব্যচূষ্য এত খেলেন যে নড়বার ক্ষমতা নেই; কোনোমতে আসন থেকে উঠে ঢেকুর তুলতে তুলতে দক্ষিণা নিয়ে প্রস্থান করলেন। তারপর অব্রাহ্মণের দল বসলেন। এঁরাও কম নন। প্রচণ্ড বেগে চর্ব্যচূষ্য চলতে লাগল।

কিন্তু শিবাজির মন ক্রমেই উদবিগ্ন হয়ে উঠছে। বেলা দুপুর অতীত হয়ে গেছে, এখনও মামা আসে না কেন? সূর্যোদয়ের সময় ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে অনেক আগেই পৌঁছোনোর কথা। তবে কি মামা আসবে না? যদি না আসে তাহলে এত উদ্যোগ-আয়োজন সব মাটি।

আরও এক-ঘড়ি কেটে গেল। শিবাজি অতিথি-ভোজনের দেখাশোনা করছেন আর মনে মনে ছটফট করছেন এমন সময় দেখতে পেলেন সদাশিব সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে আসছে। দূর থেকে চোখাচোখি হতেই সদাশিব দাঁড়িয়ে পড়ল। শিবাজি দেখলেন সদাশিবের চোখ গোল গোল হয়ে আছে, মুখে হাসি নেই। তিনি ভুরু তুলে নীরবে প্রশ্ন করলেন, সদাশিব ঘাড় নেড়ে নীরবে উত্তর দিল; কিন্তু তার চোখ গোল হয়ে রইল, মুখে হাসি ফুটল না। শিবাজি তখন অতিথিদের এড়িয়ে তার কাছে গেলেন, খাটো গলায় বললেন, 'কী রে!'

সদাশিব চুপিচুপি বলল, 'ওরা আসছে, কিন্তু-'

'কিন্তু কী-?'

সদাশিব বলল, 'তুমি নিজের চোখে দেখবে এসো রাজা।'

শিবাজি সদাশিবের সঙ্গে ছাদে গেলেন। ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে কৎরজ ঘাটের দিকে তাকিয়ে তাঁর চক্ষুস্থির। মামা বলবন্ত রাও দলবল নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে আসছেন বটে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে নয়। লম্বা এক সারি গোরুর গাড়ি আসছে, সবসুদ্ধ বোধ হয় এক-শোখানা গোরুর গাড়ি। তাইতে চেপে মামার দল নেমন্তন্ন খেতে আসছে।

শিবাজি হতাশ চোখে সদাশিবের পানে তাকালেন। সদাশিব বলল, 'রাজা, এখন উপায়?'

শিবাজি বললেন, 'উপায় কিছু নেই। সব ভেস্তে গেল।' তিনি ছাদ থেকে নেমে গেলেন।

সদাশিব একা দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। উঃ , কী সাংঘাতিক মামা! মতলব বুঝে নিয়েছে! কিন্তু-কোনো উপায় কি নেই? ঘোড়া যে আমাদের চাই! কোনো উপায় কি নেই?

প্রাসাদের সামনে গোরুর গাড়ির সারি এসে দাঁড়িয়েছে। শিবাজি মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম গাড়ি থেকে বলবন্ত রাও নামলেন; শিবাজি তাঁর পদবন্দনা করলেন। বলবন্ত রাও দাঁত ছিরকুটে হেসে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। উদ্যোগ-আয়োজন তো ভালোই করেছ, অনেক লোক নেমন্তন্ন করেছ দেখছি!'

শিবাজি বললেন, 'আজ্ঞে। আপনি সবাইকে এনেছেন তো?'

বলবন্ত রাও হাত উলটে বললেন, 'সবাইকে আনতে পারলাম কই। দুর্গ পাহারা দেবার জন্য এক-শো জোয়ানকে রেখে এসেছি।'

শিবাজি বললেন, 'দুর্গ পাহারার জন্যে এত লোক রেখে এলেন!'

বলবন্ত রাও বললেন, 'হেঁ হেঁ, তা রাখতে হয় বই কী বাবাজি। তুমি নাহয় মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছ আমার দুর্গের পানে হাত বাড়াবে না, কিন্তু অন্য শত্রু তো আছে-হেঁ হেঁ হেঁ-'

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। শিবাজি হেসে বললেন, 'তা বটে।' তিনি মামাকে এবং তাঁর দলবলকে নিয়ে গিয়ে সভায় বসলেন; আদর আপ্যায়ন আতর গোলাপ চলতে লাগল। তারপর মামা অনুচরদের নিয়ে আহারে বসলেন। দীয়তাং ভুজ্যতাং আরম্ভ হল। শিবাজির মুখ দেখে কেউ ঘুণাক্ষরে তাঁর মনের অবস্থা জানতে পারল না।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। চারদিকে হইহই চলেছে, কিন্তু সদাশিব সিঁড়ির ওপর গালে হাত দিয়ে ভাবছে। কাজকর্মের দিকে তার মন নেই; আসল কাজই যখন হল না তখন বাজে কাজ করে লাভ কী!

চুপটি করে বসে ভাবতে ভাবতে সদাশিব একবার চিড়িক মেরে উঠল, যেন তার মাথার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছে। কিছুক্ষণ সে শরীর শক্ত করে বসে রইল, তারপর পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেল।

শিবাজির সঙ্গে তার দেখা হল মহলের একটা নিরিবিলি অংশে। সে আস্তে আস্তে বলল, 'রাজা, একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।'

শিবাজি চকিতে তার পানে চাইলেন, তারপর তার হাত ধরে আবার ছাদে উঠে গেলেন।

ছাদ নির্জন। সদাশিব শিবাজিকে তার মতলবের কথা বলল। শুনে শিবাজির দুই চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি উত্তেজনা দমন করে বললেন, 'দুর্গে কিন্তু এক-শো রক্ষী আছে।'

সদাশিব বলল, 'রাজা, তুমি আমাকে বাছা বাছা পঞ্চাশটি মাওলা দাও, আমি পারব।'

শিবাজি সদাশিবের দুই কাঁধে হাত রেখে কম্পিত স্বরে বললেন, 'যদি পারিস সদাশিব, তাহলে-তাহলে কুঙ্কুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।'

## ৪

সূর্যাস্ত হতে দেরি নেই। বলবন্ত রাও এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা এমন খাওয়া খেয়েছেন যে হাত-পা ঢিলে হয়ে গেছে, আজই গোরুর গাড়ি চড়ে দুর্গে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বলবন্ত রাও ঠিক করলেন আজ রাত্রিটা পুনায় বিশ্রাম করে কাল ভোরে দুর্গে ফিরে যাবেন।

ওদিকে মহলের পিছন দিকে চুপিচুপি যে ব্যাপার ঘটছিল তা কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। সদাশিব ঘোড়ায় চড়ে রসুইঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল, শিবাজি দু-টি খাবার-ভরা ছালা ঘোড়ার পিঠের দু-দিকে ঝুলিয়ে দিলেন। সদাশিব কদম চালে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল, যেন তার কোনোই তাড়া নেই।

সদাশিব চলে যাবার পর আর একজন ঘোড়সওয়ার এল, শিবাজি তার ঘোড়ার পিঠেও দু-টি খাবারের ছালা ঝুলিয়ে দিলেন, সে চলে গেল। তার পরে আর একজন এল। এইভাবে পঞ্চাশজন সওয়ার যখন খাবারের ছালা নিয়ে চলে গেল তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে।

শিবাজির মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে কেউ যদি কৎরজ ঘাটের দিকে তাকিয়ে থাকত তাহলে দেখতে পেত অশ্বারোহীরা একে একে সেই রাস্তা ধরেছে। তাদের গন্তব্য স্থান চন্দ্রগড় দুর্গ।

পুব দিকে পাহাড়ের আড়াল ছাড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। তখন পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার 'জয় ভবানী' বলে একসঙ্গে ঘোড়া চালাল। ঘোড়ার খুরের সমবেত খটাখট শব্দ পাহাড় থেকে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বেড়াতে লাগল।

দলের আগে আগে চলেছে সদাশিব। বয়স কম বটে, কিন্তু সে এই দলের নায়ক। যে কাজ তারা করতে চলেছে তাতে বিপদ আছে, সাহস এবং বুদ্ধি দরকার। সদাশিব কাজের কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছে, কিন্তু তার বুকের মধ্যে থেকে থেকে চমকে উঠছে শিবাজির কথা-'কুঙ্কুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।'

আশ্চর্য মানুষ শিবাজি। সত্যি কি মানুষ, না অন্তর্যামী দেবতা। নিজের মনের যে কথাটি সদাশিব নিজেই জানত না, তিনি কেমন করে জানলেন?

চন্দ্রগড় দুর্গ থেকে দু-শো গজ দূরে একটা টিলার আড়ালে সদাশিবের দল এসে দাঁড়াল। চাঁদ তখন মাথার ওপর উঠেছে, জ্যোৎস্নায় চারদিক ঝিমঝিম করছে। দুর্গ থেকে মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, দুর্গটা নিষ্প্রাণ একটা স্তূপের মতন দাঁড়িয়ে আছে।

সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল, অন্য সকলেও নামল। সদাশিব কয়েকজনের সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ করল, তারপর হুকুম দিল, 'সব খাবারের ঝোলা দশটা ঘোড়ার পিঠে চাপাও।'

নিঃশব্দে কাজ হল; সদাশিব আর দশজন সওয়ার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল, তারপর দুর্গতোরণের দিকে অগ্রসর হল; বাকি চল্লিশজন টিলার আড়ালে লুকিয়ে রইল।

দুর্গের তোরণদ্বার বন্ধ। সদাশিবের দল তোরণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, সদাশিব মুখ উঁচু করে হাঁক দিল, 'হো ফাটকদার হো!'

কিছুক্ষণ পরে তোরণের ডগার ওপর থেকে কয়েকটি মুণ্ডু উঁকি মারল, একজন ভারী গলায় বলল, 'কে তোমরা?'

সদাশিব বলল, 'আমরা শিবাজির লোক, পুনা থেকে আসছি।'

প্রশ্ন হল, 'কী চাও?'

সদাশিব বলল, 'বলবন্ত রাও পুনায় পৌঁছেছেন, কিন্তু নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক-শো জন পুনায় যায়নি, তাই শিবাজি তাদের জন্যে খাবার পাঠিয়েছেন। আমরা খাবার এনেছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর তোরণশীর্ষ থেকে আবার প্রশ্ন হল, 'তোমরা ক-জন?'

'এগারোজন। ফাটক খুলে দাও।'

মুণ্ডুগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। তোরণরক্ষীরা বোধ হয় নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করছে। খানিক পরে আবার মুণ্ডুগুলি উঁকি মারল, আওয়াজ হল, 'তোরণ খোলবার হুকুম নেই। আমরা দড়ি ফেলছি, দড়িতে খাবার বেঁধে দাও।'

সদাশিব হেসে উঠল, 'এত ভয়! আচ্ছা, দড়ি ফেলো, খাবারের ছালা বেঁধে দিচ্ছি!'

কয়েকটি দড়ি তোরণের মাথা থেকে নেমে এল; সদাশিবের দল খাবারের ছালাগুলি দড়িতে বেঁধে দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ছালাগুলি দড়ির সাহায্যে দুর্গের মাথায়

অদৃশ্য হয়ে গেল।

সদাশিব বলল, ‘আচ্ছা, তাহলে চললাম। তোমরা তো দুর্গে ঢুকতে দিলে না, পুনায় ফিরে যাই।’

ওপর থেকে সাড়াশব্দ এল না। সদাশিব তার সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজে চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলে চলে গেল। দুর্গের রক্ষীরা শুনল অনেক দূরে গিয়ে খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল। তারা জানতে পারল না যে সদাশিবের দল টিলার পিছনে গিয়ে বাকি চলি×শজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

দলে ফিরে গিয়ে সদাশিব সকলকে নিজের কাছে ডাকল। সবাই ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সদাশিব তখন সকলকে আসল কথা বলল; কাকে কী করতে হবে, কীভাবে কাজ করতে হবে, সব বুঝিয়ে দিল। চাঁদের আলোয় পঞ্চাশজন জোয়ানের চোখ উৎসাহে চকচক করে উঠল। জয় ভবানী! এই তো জীবন।

তারপর আরম্ভ হল দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এখনও সময় হয়নি।

এক-ঘড়ি কেটে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ, দুর্গ থেকে কোনো শব্দ আসছে না। কদাচিৎ নিশাচর পাখি মাথার ওপর দিয়ে চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দ করে উড়ে চলে যাচ্ছে। একবার একদল শেয়াল টিলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ অনেকগুলো মানুষকে বসে থাকতে দেখে ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া করে ছুটে পালাল।

দু-ঘড়ি কেটে গেল। চাঁদ দুর্গের পরপারে ঢলে পড়ল; দুর্গের প্রকাণ্ড ছায়া সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

তারপর দুর্গের ছায়া যখন টিলার গায়ে এসে লাগল তখন সদাশিব উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইশারা করল। সবাই উঠে দাঁড়াল, ঘোড়ার পিঠ থেকে লম্বা দড়ি নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিল, তলোয়ার আঁট করে বাঁধল। সদাশিব বলল, ‘আমি আগে যাচ্ছি, তোমরা একে একে আমার পিছনে এসো।’

একে একে তারা দুর্গের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল; কেবল ঘোড়াগুলো টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। দুর্গচ্ছায়ার অন্ধকারে মানুষ দেখা যায় না, প্রাকারের ওপর থেকে যদি কেউ এদিকে তাকায় কিছুই দেখতে পাবে না।

সদাশিব কিন্তু তোরণের দিকে গেল না। উলটো দিকে চলল। সুপুরির বস্তা নিয়ে যেদিন নেমন্তন্ন করতে এসেছিল সেদিন সে দুর্গের অন্দর-বাহির সব ভালো করে দেখে নিয়েছে, প্রাকারের গায়ে কোথায় কী আছে সে জানে।

দুর্গ-প্রাকারের গা ঘেঁষে তারা চলল। প্রাকার চাকার মতন গোল, বিশ-বাইশ হাত উঁচু। সদাশিব আগে আগে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে দেখছে। একজায়গায় এসে সে থামল।

পনেরো-ষোলো হাত উঁচুতে প্রাকারের গায়ে গাছ গজিয়েছে। বেশি বড়ো নয়। কিন্তু পাথরের খাঁজে শিকড় গেড়ে শক্তভাবে প্রাকারকে আঁকড়ে আছে।

সদাশিবের ঠিক পিছনে যে লোকটি ছিল তার নাম গজানন। সদাশিব ফিসফিস করে তার সঙ্গে কথা বলল; গজানন নিজের কোমর থেকে দড়ি খুলে সদাশিবকে দিল। সদাশিব দড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওপর দিকে ছুড়ে দিল। দু-তিন বার ছোড়ার পর দড়ির আগা গাছের গায়ে আটকে গেল।

তখন ভবানীর নাম স্মরণ করে সদাশিব দড়ি ধরে ধরে ওপরে উঠে গেল। সে গাছের ওপর পৌঁছোতেই গজাননও দড়ি ধরে উঠে এল। প্রাকারের গায়ে গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আর একবার চুপিচুপি পরামর্শ হল। এখান থেকে প্রাকারের মাথা বেশি দূর নয়, কিন্তু হাতের নাগালের বাইরে। গজানন লম্বা মানুষ, সে গাছের ডালে পা রেখে প্রাকারে ভর দিয়ে দাঁড়াল, সদাশিব সাবধানে তার কাঁধে উঠল, উঁচু দিকে হাত বাড়াল; কিন্তু তবু প্রাকারের কিনারার নাগাল পেল না। আর একটু বাকি, আধ হাতেরও কম। সদাশিব তখন গজাননের মাথায় পা দিয়ে ডিঙি মেরে উপর দিকে হাত বাড়াল। এবার প্রাকারের কিনারা তার নাগালের মধ্যে এসেছে।

দুই বাহুর বলে শরীরটাকে ওপর দিকে টেনে তুলে সদাশিব প্রাকারের ওপর উঠে বসল।

## ৫

প্রাকারের ওপরে বসে সদাশিব সন্তর্পণে চার দিকে চাইল, কোথাও মানুষ নেই। কান খাড়া করে শুনল, আস্তাবলের দিক থেকে মাঝে মাঝে ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ আসছে। অন্য কোনো শব্দ নেই।

সদাশিব তখন নীচের দিকে মুখ বাড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারা করল; নিজের কোমর থেকে দড়ি খুলে নীচে ঝুলিয়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সদাশিবের অনুচরেরা একে একে দড়ি ধরে ওপরে উঠে এল। দুর্গের কেউ জানতে পারল না।

পশ্চিম আকাশে চাঁদের মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছে, চাঁদ অস্ত যেতে বেশি দেরি নেই। তবে একটা সুবিধা এই যে চাঁদ অস্ত যাবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গে সূর্যোদয় হবে।

সদাশিব সঙ্গীদের বলল, 'এইবার আসল কাজ আরম্ভ। তোমরা এখানে বসে থাকো, আমি চট করে একবার দুর্গের হালচাল দেখে আসি।'

কোমর থেকে তলোয়ার বের করে সদাশিব হাতে নিল, তারপর ছায়ার মতন নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গীরা বসে রইল, নড়নচড়ন নেই। অস্তমান চাঁদের আবছায়া আলোয় তাদের দেখে বোঝা যায় না এতগুলো মানুষ পাশাপাশি বসে আছে, মনে হয় একসারি কলসী প্রাকারের আলসের ধারে সাজানো রয়েছে।

সে রাত্রে দুর্গের লোকেরা যখন অনেক খাবার পেল তখন তাদের মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল; কী জানি শিবাজি যদি খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা লোভ সামলাতে পারেনি। এত ভালো খাবার তারা অনেকদিন খায়নি। একটু একটু করে চাখতে চাখতে তারা শেষ বরাবর সমস্ত খাবার সাবাড় করে দিয়েছিল।

খাবারে অবশ্য বিষ-টিষ কিছু ছিল না। কিন্তু গুরুভোজন করলে শরীরে আলস্য আসে; ওরা পেট ভরে খেয়ে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে গালগল্প করেছিল, তারপর হাই তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সদাশিব পরিদর্শন করে ফিরে এসে সঙ্গীদের বলল, 'সবাই ঘুমোচ্ছে, কেউ জেগে নেই। এখন কী করতে হবে শোনো। বেশির ভাগ লোক যে-যার কুঠুরিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে; আর দুর্গের মাঝখানে 'ওটা'*র ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে পঁচিশ-ত্রিশ জন। গজানন, তোমরা বিশজন

ওটায় গিয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকো, যদি কারুর ঘুম ভাঙে, দেখো যেন সে চিৎকার করতে না পারে। টিকারাম, তুমি দশজন লোক নিয়ে যাও, কুঠুরিগুলোর বাইরে থেকে দোরের শিকল তুলে দাও, যারা ভেতরে আছে তারা যেন বেরোতে না পারে। আমি বাকি লোক নিয়ে যাচ্ছি দুর্গের তোরণ খুলে দিতে। হুঁশিয়ার, নিঃশব্দে কাজ হওয়া চাই। সবাই তলোয়ার বার করো।'

তলোয়ার হাতে নিয়ে তিন দল তিন দিকে চলল। কারোর মুখে কথা নেই, কারোর পায়ে শব্দ নেই ; যেন ছায়াবাজির খেলা।

সদাশিব তার দল নিয়ে তোরণে গিয়ে দেখল চারজন তোরণ-প্রহরী কপাটে ঠেস দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে। তারা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জেগে ছিল ; কিন্তু শিবাজির দল পুনায় ফিরে গিয়েছে, অন্য কোনো শত্রুও কাছাকাছি নেই, সুতরাং জেগে থাকার কোনো মানে হয় না ; তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মুহূর্তমধ্যে চারজন প্রহরীর মুখ এবং হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। তারা একটা কথাও বলতে পারল না, কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তাদের এক পাশে শুইয়ে রেখে সদাশিবের দল দুর্গের কপাট খুলতে আরম্ভ করল। প্রকাণ্ড ভারী হুড়কো খুলে আস্তে আস্তে কপাট খুলতে হবে। বেশি শব্দ করা চলবে না, কপাট খোলার ঘড়ঘড় শব্দে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কপাট খুলল। বেশি শব্দ হল না।

তবু, ওটায় যারা শুয়ে ছিল তাদের মধ্যে একজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে চোখ রগড়ে উঠে বসল, সঙ্গেসঙ্গে তার বুকে তলোয়ারের নখ বিঁধল, কানের কাছে শব্দ হল-'চুপ! কথা বলেছ কি মরেছ।' লোকটা কিছুক্ষণ হাঁ করে রইল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

যন্ত্রের মতন কাজ হচ্ছে, শব্দহীন যন্ত্র। যারা কুঠুরিগুলো বন্ধ করতে গিয়েছিল তারা সমস্ত কুঠুরির দোরে শিকল তুলে দিয়েছে, ভিতরে যারা ছিল তারা জানতেও পারেনি। তাদের যখন ঘুম ভাঙবে, তারা যখন বাইরে আসতে চাইবে তখন দেখবে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ।

তোরণদ্বার খুলে দিয়ে সদাশিব সেখানে পাঁচজন পাহারাদার দাঁড় করিয়ে বাকি লোকজন নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলল। এবার আসল কাজ, ঘোড়া পাচার করতে হবে।

ওদিক থেকে টিকারামের দল কাজ শেষ করে আস্তাবলে হাজির হয়েছে। কেবল গজাননের দল ওটার ওপর ঘুমন্ত লোকগুলোকে আগলে আছে।

প্রকাণ্ড ছাউনির মতন আস্তাবল। তাতে দু-হাজার ঘোড়া। ঘেরা জায়গায় ঘোড়াগুলো ছাড়া রয়েছে ; কেউ বসে আছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ দেখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ গলার মধ্যে মিহি সুরে চিঁহিঁহিঁ করল।

অবিলম্বে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। সদাশিব দাঁড়িয়ে তদারক করতে লাগল, বাকি লোক প্রত্যেকে দুটো ঘোড়ার গলায় দড়ি পরিয়ে দুর্গের বাইরে রেখে ফিরে আসতে লাগল। এ কাজ অবশ্য নিঃশব্দে হয় না ; ঘোড়ার খুরের শব্দ বন্ধ করা অসম্ভব। ওটায় যারা ঘুমোচ্ছিল তারা জেগে উঠল। কিন্তু তারা নিরস্ত্র, তাদের ঘিরে খোলা তলোয়ার হাতে শত্রু দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থায় বুক চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই। যারা কুঠুরির মধ্যে বন্ধ হয়েছিল তারা দোরে ধাক্কা দিয়ে চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু বেরোবে কী করে?

দু-হাজার ঘোড়া চন্দ্রগড় দুর্গের বাইরে চালান দিয়ে সদাশিবের দল যখন দুর্গ থেকে বেরোল তখন পুবের আকাশ ফরসা হয়ে গেছে।

টিলার কাছে ফিরে গিয়ে তারা নিজের নিজের ঘোড়ায় চড়ল, তারপর চোরাই ঘোড়াগুলোকে ঘিরে পুনার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

সদাশিব বুক-ভরা আনন্দ নিয়ে ভাবতে লাগল-শিবাজি যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তা সিদ্ধ হয়েছে; তাঁর শপথ ভঙ্গ হয়নি, এক ফোঁটা রক্তপাত হয়নি, অথচ কাজ হাসিল হয়েছে। জয় মা ভবানী! শিবাজি দু-হাজার ঘোড়া পেয়ে নিশ্চয় খুব খুশি হবেন। আর কুঙ্কু-

কিছু দূর চলবার পর সূর্যোদয় হল। সদাশিব গজাননকে বলল, 'মামা বলবন্ত রাও এতক্ষণে পুনা থেকে যাত্রা করেছেন। তিনি এই পথেই ফিরবেন; তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয় নয়। এসো, আমরা অন্য রাস্তা ধরি।'

পুনায় যাবার সিধা রাস্তা ছেড়ে তারা বাঁ-দিকে মোড় ঘুরল। এদিকে একটা সরু উপত্যকা আছে। সেদিক দিয়ে গেলে পুনায় পৌঁছোতে দেরি হবে বটে, কিন্তু মামার দলের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই। মামা সিধা পথেই দুর্গে ফিরবেন। তারপর তাঁর কী অবস্থা হবে তা না ভাবাই ভালো।

## ৬

পুনায় মহলের ছাদে উঠে শিবাজি একলা পায়চারি করছেন। তাঁর কপালে উদবেগের ভ্রূকুটি। দিন শেষ হয়ে এল, এখনও সদাশিবের দেখা নেই।

তানাজি এসে শিবাজির সঙ্গে যোগ দিলেন। শিবাজির মুখ দেখে বললেন, 'ভাবছ কেন? সদাশিব খলিফা ছেলে, সে কাজ ফতে না করে ফিরবে না।'

শিবাজি বললেন, 'তা তো জানি। আজ পর্যন্ত কোনো কাজে সে নিষ্ফল হয়নি। কিন্তু হাজার হোক ছেলেমানুষ তো-'

মা জিজাবাই ছাদে এলেন, সঙ্গে কুঙ্কু। জিজাবাই বললেন, 'কোথায় পাঠালি তুই ছেলেটাকে! বলেছিলি আজ বেলা দুপুরের আগেই ফিরবে। তা এখনও ফিরল না।'

শিবাজি বললেন, 'সূর্যাস্তের আগে যদি সদাশিব না ফেরে, আমাকে দলবল নিয়ে বেরোতে হবে।'

কৎরজ ঘাটের দিকে কারোর নজর ছিল না; এই সময় কুঙ্কু আঙুল তুলে সেই দিকে দেখাল। সে সকলের আগে দেখতে পেয়েছে।

সকলে একসঙ্গে সেই দিকে ফিরলেন। দেখলেন কৎরজ ঘাটের সংকীর্ণ ঢালু সংকটপথে পিলপিল করে ঘোড়ার পাল নেমে আসছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড একপাল ভেড়া।

তানাজি নাচতে শুরু করে দিলেন-'দু-হাজার ঘোড়া! দু-হাজার ঘোড়া! জয় ভবানী।'

শিবাজি দু-হাত তুলে লাফিয়ে উঠলেন-'পেরেছে-সদাশিব পেরেছে। মা, তোমার কোলের ছেলেটা সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে।'

তানাজির হাত ধরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে শিবাজি ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মা, কুঙ্কুর জন্যে আমি পাত্র ঠিক করেছি। ওকে জিজ্ঞেস করো সদাশিবকে ওর পছন্দ কি না।'

এই বলে একটু হেসে শিবাজি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

*আশ্বিন* **১৩৬৯**



---

* *ওটা-উঠোন*




# তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাকালে, মানে অনেক কাল আগে, একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংসারে তাঁর কেউ ছিল না, একলা মানুষ, শুধু পড়াশোনা পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকতেন। যার ফলে তিনি ত্রিকালজ্ঞ হয়েছিলেন। ত্রিকালজ্ঞ মানে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিনই তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তা বলে গণক নন। পড়াশোনা করে পৃথিবীর ইতিহাস তিনি জেনেছিলেন এবং বর্তমান কালে কোথায় কী ঘটছে তাও তিনি খবর রাখতেন; এর ফলে দুইকে মিলিয়ে আগামী কালে কী ঘটবে তাও তিনি নির্ভুlলভাবে বুঝতেন, বলতে পারতেন। বয়স অনেক হয়েছিল। একদিন বুঝলেন-শরীর যেন খারাপ হচ্ছে ঘন ঘন। সুতরাং তিনি নির্ভুlল ভাবে বুঝলেন, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মারা যাবেন। তখন মনে মনে চিন্তা করলেন-আমরা মৃত্যুর সময় তীর্থে যাই, সেইখানে মারা যাওয়াটা ভাগ্য বলে মনে করি। ভগবানকে ভাবতে হয় না চেষ্টা করে-ভগবানের মন্দির, তাঁর নাম, তাঁর পূজার ধূপ-দীপ ফুলের গন্ধে সেখানকার বাতাস ভরে থাকে। সেখানে মৃত্যু সৌভাগ্য। তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশী। এখন তাহলে আমার কাশী যাওয়া উচিত। কিন্তু-কিন্তু কাশী তো অনেক পথ। এবং তীর্থস্থল হলেও বিদেশ। পথে বিপদ হতে পারে, সেখানেও পৌঁছে রোগ হলে একলা পড়ে থাকতে হবে। একজন লোকের দরকার। যে পথে সঙ্গী হবে এবং সেখানেও কাছে থাকবে, কথাবার্তা বলবে, রোগে একটু জলও মুখে দিতে পারবে। কিন্তু কে যাবে? আমার নাহয় কেউ নেই। অন্যের তো তা নয়! ঘরবাড়ি ছেলেপুলে আছে-তারা তাদের ফেলে যেতে চাইবে কেন? হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর এক বন্ধু আছে, ভবানন্দ ভারী, লেখাপড়া শেখেনি, ভার বয়ে খায়, তাই তাকে লোকে খেতাব দিয়েছে ‘ভারী’; আর যেখানেই থাক না কেন, তার মুখে হাসি লেগেই থাকে। তাই লোকে তাকে বলে ‘ভবানন্দ’। বিয়ে-টিয়ে করেনি, সংসারে তাঁরই মতো কেউ নেই, বয়সও তাঁরই সমান, ছেলেবেলার বন্ধু। এই ভবানন্দ ভারী যদি সঙ্গে যায় তবে বড়ো ভালো হয়। যাবার সময় মোট-টোটগুলি বইতেও পারবে। সর্বত্রই আনন্দ তার, সুতরাং বলবে না ঘরের জন্য, গাঁয়ের জন্য মন কেমন করছে। আর ছেলেবেলার বন্ধু, বেশ প্রাণ খুলে কথাবার্তা হবে। এই ভেবে তিনি চলে গেলেন ভবানন্দের আস্তানায় সন্ধ্যে বেলায়। একটি গাছতলায় ছোটো একখানা চালা ঘর। ভবানন্দ চালেডালে খিচুড়ি চাপিয়েছিল। তিনি ডাকলেন, ‘ভবানন্দ ভাই, বাড়ি রয়েছ?’

ভবানন্দ হেসে বলল, ‘ভবানন্দকে ভাই ডাকছ, দাদাঠাকুর তুমি নিশ্চয়ই, এসো এসো।’

ব্রাহ্মণ বললেন, ‘ভবানন্দ একটি কথা বলছি।’

‘বলো।’

তখন ব্রাহ্মণ তাঁর কথাটি বলে বললেন, ‘দেখো ভাই, তোমারও বয়স হয়েছে। চলো না। যাবে আমার সঙ্গে? আমি প্রতিজ্ঞা করছি যদি কাশীতে তোমার অসুখ করে তবে আমি তোমার সেবা করব। যদি আমার আগে মারা যাও তবে তোমার সৎকার করব। আর আমি

আগে যদি মারা যাই, অসুখ করে, তবে তুমি সেবা করবে, মারা গেলে সৎকার করবে। আমার সঙ্গে আমি কিছু টাকা নিয়ে যাব, সে টাকা তোমাকে দিয়ে যাব। ওই টাকায় তুমি বাকি দিনগুলো কাটাবে? দেখো, রাজি?'

ভবানন্দ বলল, 'ভবানন্দ ভারী মোট বয়ে খেতে পারবে, ভবানন্দের সর্বত্র সদাই আনন্দ, সুখে আনন্দ দুঃখে আনন্দ; ভবানন্দের কাছে দুঃখের ভাগ্যে কাঁচকলা। ভিক্ষেও করে খেতে ভবানন্দের বাধবে না। সেসব কথা ভুয়ো কথা। আসল শর্ত শোনো, সেই শর্ত মানলে যাব, নইলে যাব না।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'বলো।'

ভবানন্দ ভারী বলল, 'ভারীর বল আছে, ভার বয়, ভয় নাই। ভবানন্দের আনন্দ আছে, সুখের অভাব হয় না। কিন্তু বিদ্যে নাই, মুখ্যু। তুমি পণ্ডিত, লোকে বলে-ত্রিকালজ্ঞ, সব জান। কাশী যাব, যেতে হবে অনেক পথ, পথে বন আছে, পাহাড় আছে, গ্রাম আছে, শহর আছে, কতরকমের মানুষ আছে, কত জন্তু আছে, পক্ষী আছে, কত ঘটনা ঘটবে। এর মধ্যে যা আমার আশ্চর্য ঠেকবে, বুঝতে পারব না, কিন্তু বুঝতে বাসনা হবে, আমি তোমাকে বলব কী ব্যাপার, বুঝিয়ে দাও। তোমাকে কিন্তু সেই দণ্ডে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়ে দিতে হবে। যদি বুঝিয়ে না দাও কি না দিতে পার তাহলে সেইখান থেকে ভবানন্দ ভারী কাঁধের ভার পথে নামিয়ে দেবে উলটো মুখে পাড়ি, সটান এসে হাজির হবে বাড়ি। কাজ নাই তার কাশীতে। বুঝেছ?

ব্রাহ্মণ হেসে বললেন, 'বুঝেছি।'

ভারী বলল, 'রাজি?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাজি না হয়ে উপায় কী? রাজি।'

'বেশ, চলো। শুধু খিচুড়িটা নামার অপেক্ষা। খেয়ে নিলেই তৈরি।'

ব্রাহ্মণ আবার হেসে ফেললেন। বললেন, 'না আজ না। সাত দিন পর।'

'বেশ।'

সাত দিন পর ব্রাহ্মণ আর ভবানন্দ ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লেন। সবে কাক ডাকছে, কোকিল ডাকছে বাসায় বসে; বাসা ছাড়েনি। ওঁরা গ্রামকে প্রণাম করে বেরোলেন। ভবানন্দের মাথায় মোট। ব্রাহ্মণের বগলে ছাতা, হাতে লাঠি। ভবানন্দ গান ধরে দিলে-

'কাশীর পেঁড়া ও পেয়ারা, কী মিষ্টি,

পেঁড়া বানায় ময়রাতে, পেয়ারা বিশ্বনাথের ছিষ্টি।'

এইভাবে চলেন দু-জনে। এক ক্রোশ, দু-ক্রোশ, পাঁচ ক্রোশ। দুপুর হলে রোদ উঠলে পথের ধারে চটিতে ঘরভাড়া নিয়ে স্নান আহার করেন, একটু বিশ্রাম করে রোদ্দুর পড়লে আবার রওনা দেন; রাত্রে অন্য চটিতে খেয়েদেয়ে ঘুমোন, আবার ভোর ভোর উঠে রওনা হন। এইভাবে একদিন দু-দিন তিনদিন কেটে গেল। চারদিনের দিন সেদিন খুব রোদ্দুর উঠেছে, রাস্তাটাও ন্যাড়া মানে দু-পাশে গাছপালা নেই, গ্রাম বা বসতিও নেই-ওঁরা চলছেন তো চলছেনই। চলতে চলতে একটা চড়াইয়ের উপরে উঠে নজরে এল ঢালের নীচে সামনে মস্ত একটা শহর। দু-জনে ভারি ক্লান্ত। ব্রাহ্মণের তো কথা নেই, ভবানন্দ

ভারী পর্যন্ত গান থামিয়েছে। কাশীর পেঁড়া-পেয়ারার কথাও ভুলে গেছে। এতক্ষণে সে বলল, 'বাবা বাঁচলাম। চলো দাদাঠাকুর, পা চালিয়ে।'

এসে দু-জনে হাজির হলেন এক সিংহদ্বারের সামনে। একটা গেট। গেটটার দু-দিকে দুটো থাম। উপরে খিলান। থাম দুটো বেশ মোটা, চৌকো গড়নের-দুটোর গায়েই দুটো কাচ লাগানো প্রকাণ্ড তাক। একটা থামের তাকের উপর বাঘ-নখের মতো অস্ত্র, তার পাশে বড়ো বড়ো সত্যকার নখ, তার পাশে ভীষণাকৃতি মুখোশ-রাক্ষসের মুখ-তাতে তেমনি দাঁত লাগানো। ভীষণ গদা, অগ্নিমুখ বাণ, তলোয়ার, আর একটা মস্ত কাচের পাত্রে স্বচ্ছ আরকে ডুবানো একটা মরা রাক্ষসের দেহ। নীচে লেখা-অভিশাপ। আর একদিকের থামের মধ্যের তাকে একটি একতারা, একছড়া তুলসীকাঠের মালা, একখানি কাপড় আর চাদর, একটি সিংহাসনের উপর রাখা রয়েছে। নীচে লেখা-শাপমোচন।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ভবানন্দ ভারী, 'দাদাঠাকুর!'

ক্লান্ত ব্রাহ্মণ বললেন, 'কী ভবানন্দ?'

'এ তো ভারি আশ্চর্য!'

ব্রাহ্মণ সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন-দেখে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন-সঙ্গেসঙ্গে একটু আশ্চর্য স্বর্গীয় হাসিও মুখে ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আশ্চর্য। সত্যই সব থেকে বড়ো আশ্চর্য ভবানন্দ!'

'এর কারণ? এই লেখার মানে? বলো দাদাঠাকুর। তুমি তো ত্রিকালজ্ঞ।'

'হ্যাঁ রে জানি আমি। জানি। কিন্তু এই রোদে দাঁড়িয়ে নয়। চল, শহরে গিয়ে কোনো চটিতে-'

'তা হলে রইল তোমার মোট।'

'ভবানন্দ? খিদে পায়নি? তেষ্টা পায়নি?'

'পেয়েছে। কিন্তু জানবার আগে ওসব রুচবে না।'

'এখুনি বলতে হবে? দাঁড়িয়ে?'

'তা নাহয় বোসো। কিন্তু এখুনি।'

পথের ধারে থামগুলোকে সামনে রেখে বসলেন দু-জনে।

ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন, 'অনেক কাল-কত কাল তার হিসেব ঠিক কেউ বলতে পারে না ভবানন্দ। হিসেব কষতে গিয়ে বার বার হিসেব ভুল হয়েছে। কখনো লক্ষ বছর দাঁড়ায়, কখনো দশ হাজার বিশ হাজার। কখনো একশো, কখনো দাঁড়ায় দশ-বিশ দিন আগে। কেউ বলে বার বারই এমনি ঘটে-এমনি ঘটছে বলে হিসেব এমনি দাঁড়ায়।'

ভবানন্দ বলল, 'হিসেব বাদ দাও। দশের বেশি হলে আমার মাথা ঘোরে। গুনতে জানিনে। মেরে-কেটে কুড়ি। এক-শো গুনতে হলে পাঁচ কুড়ি না সাজিয়ে ধরতে পারিনে। তুমি ব্যাপারটা বলো।'

'এই নগর, এটি হল এই রাজ্যের রাজধানী। তখন শুধুই বন-শুধুই বন চারিদিকে। বনের ভিতর একটি রাজ্য। এই দেশের মানুষদের পূর্বপুরুষেরা বাস করত। তখন বনে ফল ছিল, নদীতে জল ছিল, মাঠে চাষ হত, ফসল ফলত। লোকেরা হাসত খেলত গান

করত সুখে স্বচ্ছন্দে থাকত। মাঝে মাঝে বন থেকে জন্তু আসত, তারা দল বেঁধে তাদের তাড়াত। মানুষে মানুষে ঝগড়াও হত। কিন্তু নিয়ম ছিল-যা নিয়ম তাই ন্যায়। সেই ন্যায় অনুসারে প্রবীণেরা বিচার করে দিত। সবাই তা মেনে নিত। মারামারি বা যুদ্ধ হত। তারও নিয়ম ছিল। যুদ্ধ হবে সমানে সমানে। যুদ্ধ হবে সামনাসামনি। রাত্রে যুদ্ধ হবে না। তলোয়ারে তলোয়ারে যুদ্ধ হবে। তলোয়ারে-লাঠিতে, লাঠিতে-শুধুহাতে হবে না। একজনের সঙ্গে একজনের যুদ্ধ; পাঁচজনের নয়। যুদ্ধে কেউ মারা গেলে যে তাকে মারত সে তার সৎকার করত। শুধু তাই নয়-তার তর্পণ করত শ্রাদ্ধ করত। শুধু এই রাজ্যেই নয়-পাশাপাশি রাজ্যেও এই নিয়ম ছিল।

'হঠাৎ গোলমাল ঘটল।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'বুঝলি ভবানন্দ-সংসারে পাপ হল শয়তান। তার বড়ো দুঃখ-তার স্থান হয় না-সে ঠাঁই পায় না কোথাও।

'সে রাজ্যের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। কেবল ঘোরে। কী করে কোন ফাঁকে ঢুকতে পারবে! একদিন তার চোখে পড়ল-অনেকটা দূরে একটা আশ্চর্য রাজ্য। বন-পাহাড়। কিন্তু রাশি রাশি মণি-রত্ন-সোনা ছড়ানো রয়েছে মাটির উপর। নদীর জলে মাটি ধুয়ে গিয়েছে। তার কিনারায় চোখে পড়ে, স্তরে স্তরে থাকে থাকে সোনা হিরে পান্না নীলা ঝকমক করছে। পাপের চোখ দুটো ঝকমক করে উঠল। এই তো!

'কিছু মণি-রত্ন-সোনা নিয়ে সে এল এই দেশে-মণি-রত্ন-সোনা চাই!

'লোকে তার ডালা দেখে অবাক হয়ে গেল।

'কী দাম?

'দাম আর কী? যা দেবে। আমি তো কুড়িয়ে এনেছি। নাও যার যা পছন্দ। যা পার দাও। লোকে নিয়ে গেল, যে যা পারল নিয়ে এবং দিয়ে। যাবার সময় বলল-যাও না, ওই পথে অনেকটা দূর, সেখানে ছড়ানো রাশি রাশি!

'ছড়ানো? রাশি রাশি?

'হ্যাঁ।

'আমাদের নিয়ে যাবে?

'যাব। চলো!

'সঙ্গেসঙ্গে ঢেঁড়া পড়ল, চলো চলো। কাল যেতে হবে সেই দেশে।

'তাই গেল। ভেঙে পড়ল গিয়ে সেখানে! আরম্ভ হল খোঁড়ার কাজ-সোনা মণি তোলার কাজ! তুলছে তারা সোনা-মণি-মাণিক্য। হঠাৎ একদিন দেখল আর একদিক থেকে আর-এক দেশের লোক আসছে। তাদেরও নিয়ে এসেছে-সেই পাপ। এদের এখানে রেখে সে আর-একদেশের লোক নিয়ে এসেছ।

'এরা বলল-বাঃ, এ কী? এ তো আমাদের জায়গা!

'তারা বলল-বাঃ, তা কী করে হবে? এ তো পতিত জায়গা! তোমরা ও দিকটায় খুঁড়ছ। আমরা এদিকটা খুঁড়ব।

'হল খানিকটা কথার ঝগড়া। তারপর নিয়মানুযায়ী যুদ্ধ। কেউ হারে না, কেউ জেতে না। যুদ্ধ চলে। একদিন পাপ একদলকে এসে বলল, তোমরা কী? শুধু হাতাহাতি করছ।

লাঠালাঠি করছ। তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকি করছ। তার থেকে আমি বাঘনখ দিচ্ছি, তাই দিয়ে দাও না মল্লযুদ্ধের সময় পেটটা ফেঁড়ে!

'সে যে অন্যায় হবে, পাপ হবে। অধর্ম হবে।

'অধর্ম হবে! তবে ধর্ম করে হারো, মরো। বাড়ি চলে যাও। ওরা সব নিক দখল করে।

'তাই তো।

'পাপ আবার বলল-ধর্ম করলে কী হয়?

'পুণ্য হয়।

'পুণ্য হলে কী হয়!

'সগগে যায়।

'সগগ কোথায়?

'তা জানি না।

'হ্যাঁ গো, মরে যেতে হয় বল তোমরা।

'হ্যাঁ।

'সব মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে।

'মিথ্যে?

'হ্যাঁ। সত্য যা তা চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়। এই সোনা সত্যি, এই হিরে সত্যি, এই মণি সত্যি, মানিক সত্যি। স্বর্গ নরক চোখে কেউ দেখেনি। সব মিথ্যে সব মিথ্যে।

'ঠিক। ঠিক। ঠিক বলেছ। কাল থেকে চালাও বাঘনখ।

'ওদেশের লোকের কাছেও গিয়ে তাই বলল। পর দিন থেকে আরম্ভ হল নতুন যুদ্ধ। ওরা পেয়েছিল ছুরি। এরা বাঘনখ। ওরা ছুরি নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল।

'সন্ধ্যায় দেখা গেল-মরেছে প্রায় সমান সমান। কিছু কম-বেশি। তারপর শুরু হল রাত্রে যুদ্ধ। গাছের উপর উঠে আগুনের গোলা ছোঁড়া হতে লাগল। ক্রমে এ দেশ জয়ী হল। ওদের দেশের লোকদের কতক ধরে আনল। তারা ক্রীতদাস হল। এদের দেশে ধন সম্পদ মণি মাণিক্য সোনায় ভরে উঠল। কিন্তু আরও চাই। চলো পৃথিবী খুঁজব। এমন দেশ নিশ্চয় আরও আছে।

'পাপ বলল-আছে, নিশ্চয় আছে। কিন্তু আরও দেশের মানুষ আছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তার জন্য তৈরি হয়ে বের হও।

'ঠিক কথা। ডাকো পণ্ডিতদের।

'পণ্ডিতরা এল। তাদের রাজা বলল, শুনুন পণ্ডিতগণ। পৃথিবীর যেখানে যত ধনরত্ন আছে আমরা জয় করে আনবার জন্য বের হব। যুদ্ধ করে জিততে হবে সকল দেশকে। আপনারা এই ধরনের অস্ত্র বের করুন। বাঘনখের মতো, ছুরির মতো। আর এমন তলোয়ার এমন গদা এমন মুষল তৈরি করুন যাতে থেকে আগুন বের হয়। আর সমস্ত লোক শুধু যুদ্ধকৌশল শেখো; আর মনকে এমন করে তৈরি করো যেন মানুষ মারতে বুক

না কাঁপে। মরতেও ভয় না হয়। শুধু চিৎকার করো আমরাই শ্রেষ্ঠ আমরাই বিধাতা, আমরাই সমস্ত সুখ সমস্ত সম্পদের মালিক।

'তাই আরম্ভ হয়ে গেল। দিবারাত্র মানুষ করে ওই চিৎকার। বড়ো বড়ো গদা নিয়ে মুষল নিয়ে আস্ফালন করে, বনে যায়, মারে সেই গদা জন্তুর মাথায়, চুরমার হয়ে যায় জন্তুর মাথা। ক্রীতদাসদের ডেকে আনে, তাদের চাবকায়, বলে, বল বল, তোমরা শ্রেষ্ঠ তোমরা বিধাতা। কেউ যদি বলে তা কেন বলব? তা তো নয়। সঙ্গেসঙ্গে মুষল দিয়ে ভেঙে দেয় তার বুকের পাঁজরা। দাঁতে দাঁত টিপে ক্রোধে দম্ভে চোখ রক্তবর্ণ করে নিজেরাও চিৎকার করে ওই বনে।

'শুধু একটি পরিবার এতে যোগ দেয় না। তারা ঘরে বসে এর জন্য দুঃখ পায়, কাঁদে। সেটি রাজার ছোটো মেয়ে আর স্বামী। তারা কিছুতেই এতে সায় দিতে পারে না। ছোটো মেয়ের স্বামী, ছোটো জামাই সে ছিল অকেজো লোক, সেই গাইতো গান। গায়ক ছিল।

'রাজার কানে এ খবর গোপন রইল না। কোটাল এসে কানে তুলল। মহারাজ, এত বড়ো দেশব্যাপী সাধনা চলছে আর ছোটো জামাই রাজা ঘরে বসে এর জন্যে কাঁদছেন।

'বল কী?

'হ্যাঁ মহারাজ। বিশ্বাস না হয় ডাকুন, ডেকে পরীক্ষা করুন।

'রাজা তাকে ডাকলেন পরদিন সভায়। প্রশ্ন করলেন-তুমি দেশের এত বড়ো যে আয়োজন চলছে এতে যোগ দিচ্ছ তো নিয়মিত?

'ছোটো জামাইটি শুধু গায়ক এবং দুর্বলচিত্তই নয়, সে ছিল সত্যবাদী। সে বলল-না মহারাজ!

'না? কেন?

'আমার সাধনার মধ্যে আমি অবকাশ পাই না।

'কী তোমার সাধনা?

'গানের।

'গানের? কী গান তুমি গাও। গাও তো শুনি!

'গায়ক গান ধরল-আমাকে সকল লোভ জয় করবার শক্তি দাও। আমাকে নির্লোভ করো-হে রাজাধিরাজ। আমার সকল ভয় দূর করে নির্ভয় করো হে মৃত্যুঞ্জয় অভয়দাতা। আমাকে রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা করো, হে চিরকোমল হে চিরসুন্দর। আমার অন্তর মানুষের প্রেমে জীবের প্রেমে পূর্ণ করো-হে পূর্ণ পুরুষ।

'গর্জে উঠল রাজা-কে তোমার রাজাধিরাজ? কে তোমার মৃত্যুঞ্জয় অভয়দাতা? কে তোমার চিরসুন্দর? কে তোমার পূর্ণ পুরুষ? আমি?

'না মহারাজ। তিনি আপনারও রাজাধিরাজ। ভগবান।

'ভালো। রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা পেতে চাও। সে রাক্ষসত্ব কী?

'দেশে যার সাধনা চলছে, মহারাজ, তাই!

'ভয়? ভয়টা কীসের? কাকে তোমার? আমাকে? দণ্ডের?

'না মহারাজ, তার থেকেও বড়ো ভয় লোভের এবং পাপকে!

'রাজা ডাকলেন-ঘাতক!

'ঘাতক এসে দাঁড়াল। রাজা সভাসদদের বললেন, আমাদের এই বীর্যের সাধনায়-এ পশ্চাৎপদ কাপুরুষ। আমাদের এ নিন্দা করে। এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী দেশদ্রোহী। এক অস্তিত্বহীন অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এ ব্যক্তি দুর্বল এবং মূর্খ। কী বলেন আপনারা?

'ক্রোধে দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে ভয়ংকর মুখে সকলে বললে-নিশ্চয়। নিঃসন্দেহে!

'এর আমি শাস্তিবিধান করব। মৃত্যুদণ্ড। কী বলেন?

'সাধু সাধু মহারাজ। এমন দৃঢ়চিত্ত না হলে রাজা! এমন রাজা নায়ক না হলে জাতি কি কখনো শ্রেষ্ঠ হতে পারে?

'রাজা বললেন জামাইকে-আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। ডাকো তোমার মৃত্যুঞ্জয়কে। আসুন তিনি দেখি!

'না মহারাজ, তা আমি ডাকব না। তাঁকে শুধু ডেকে বলে যাব-প্রভু, আমার পিতৃতুল্য শ্বশুরকে এবং আমার জাতির মানুষকে তুমি রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা করো।

'রাক্ষসত্ব?

'হ্যাঁ মহারাজ। আসছে। আমিও দেখতে পাচ্ছি। জাতিটা রাক্ষসে পরিণত হবে আমার মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে।

'রাজা বললেন-তবে ঘাতক, এই মুহূর্তে এই রাজসভায় একে হত্যা করো। রাক্ষসত্বের জন্য মুহূর্তের বিলম্ব আমার সহ্য হচ্ছে না।

'মুহূর্তে ঘাতকের খড়্গ উঠল। নামল। রাজজামাতার মাথা ছিটকে পড়ল। রক্তে রাজসভা রক্তাক্ত হয়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে আশ্চর্য ক্রিয়া হল। সকলের কণ্ঠ থেকে এক বিকট উল×াসধ্বনি বের হল। তার সঙ্গেসঙ্গে তাদের দেহ বাড়তে লাগল, মুখ চোখ দাঁত নখে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল। এ ওর মুখের দিকে চায়, ও এর মুখের দিকে চায়। একী একী একী!

'সমস্ত রাজ্য জুড়ে ধ্বনি উঠল-একী!

সমস্ত রাজ্য হয়ে গেল রাক্ষস।

'আনো, মদ আনো-আনো ভারে ভারে মাংস, আনো প্রমোদ, আনো বিলাস। আনো অস্ত্র, সাজাও সৈন্য। রাবণের মতো বিশ্বজয় করব!

'মধ্যরাত্রে রাজার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলেন নারীকণ্ঠে কে গাইছে সেই গান-

'আমার সকল ভয়কে দূর করো হে মৃত্যুঞ্জয়। আমাকে রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা করো হে চিরসুন্দর চির পবিত্র!

'রাজা চিৎকার করে উঠল-কল্যাণী!

'কল্যাণী রাজার ছোটো মেয়ের নাম। তাই তো, তার কথা তো মনে হয়নি। কোটাল, নিয়ে এসো। কল্যাণীকে নিয়ে এসো।

'কোটাল ছুটে গেল। ফিরে এসে বলল, মহারাজ, তাকে তো পেলাম না। তিনি আমাদের প্রমত্ত ঘুমের মধ্যে কোথায় চলে গেছেন।

'চলে গেছেন?

'হ্যাঁ।

'কল্যাণী চলে গেল? রাজার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

'কোটাল বলল-মদ আনব?

'না। বসে থাকতে থাকতে চিৎকার করে উঠল রাজা-কল্যাণী, ফিরে আয়।

'কে যেন ফিসফিস করে বলল-তোমাদের রাক্ষসত্ব যেদিন মোচন হবে সেদিন সে ফিরবে।

'সে কবে?

'যেদিন সত্যকারের মানুষ এসে এ রাজ্যে পদার্পণ করবে এবং তোমাকে জয় করবে সেই দিন।

'কিন্তু তুমি কে?

'আমি এ দেশের দেবতা-বিবেক। আমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। যাবার সময় বলে যাচ্ছি-

'রাজা চিৎকার করে উঠল-দেখো তো কোটাল, কে কোথা থেকে লুকিয়ে কথা কয়?

'তন্নতন্ন করে খুঁজল কোটাল। বলল-কেউ তো নেই মহারাজ!

'উত্তম! সকাল বেলাতেই তুমি কাউকে পাঠাবে-আমাদের পাশের রাজ্য থেকে মানুষ নিয়ে এসো।

'যে আজ্ঞে মহারাজ।

'পরদিন মানুষকে ধরে আনা হল।

'রাজা বললেন-আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তোমাকে।

'সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল-হে মহারাজ, তুমি অজেয়। আমি কী যুদ্ধ করব তোমার সঙ্গে?

'তবে হার মানো! স্বীকার করো আমার শ্রেষ্ঠত্ব!

'তুমি শ্রেষ্ঠ-তুমি শ্রেষ্ঠ-তুমি শ্রেষ্ঠ!

'দাও, একে ধনরত্ন দাও। এবং দাসখত লিখে নাও। বলে হা-হা করে হেসে উঠল রাজা।

'এমনি করে দিনের পর দিন। রোজ মানুষ ধরে আনে, স্বেচ্ছায়ও আসে, দাসখত লিখে দিয়ে ধনরত্ন নিয়ে ফিরে যায়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর। অন্যদিকে বিশ্বপৃথিবীর বুক চিরে উঠছে রাশি রাশি সম্পদ। আর অস্ত্রের পর অস্ত্র নির্মাণ চলছে। অজেয়ত্ব বজায় রাখতে হবে।

'চলে গেল ষোলো বছর। ষোলো বছর পরও সেই একধারায় চলছিল রাজ্য। মানুষ এসে দাসখত লিখে ধনরত্ন প্রসাদ নিয়ে চলে যায়। সকাল হতে-না-হতে এই যে তোরণ-এরই দরজায় মানুষের ভিড় জমে। তারা জয়ধ্বনি তোলে-জয় রক্ষরাজের জয়। তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি শ্রেষ্ঠ!

'ষোলো বছর পর সেদিন সকালে তাদের কণ্ঠস্বর থামতেই ধ্বনি উঠল-জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়, জয় অভয়ংকরের জয়! যে নির্লোভ সেই শ্রেষ্ঠ। যে মানুষ সেই শ্রেষ্ঠ। যে ভয়হীন সেই শ্রেষ্ঠ!

‘ভীষণ হুংকার উঠল রাক্ষস-প্রহরীদের কণ্ঠে-কে? কে? কে রে হতভাগ্য?

‘ষোলো বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এল, প্রসন্ন প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বলল-আমি।

‘রাক্ষস-প্রহরীরাও হতবাক হয়ে গেল বিস্ময়ে। সুন্দর সুঠামগঠন একটি কিশোর, হাতে বীণা, গলায় মালা আর উত্তরীয়। পরনে শুভ্রশুচি বস্ত্র, ঠোঁটে হাসি। সে বলছে এই কথা!

‘একজন বলল-কী বললি? কার জয়!

‘সে প্রসন্ন হেসে বলল-মৃত্যুঞ্জয়ের জয়! অভয়ংকরের জয়!

‘আর একজন প্রশ্ন করল-কে শ্রেষ্ঠ?

‘যে নির্লোভ সেই শ্রেষ্ঠ। যে ভয়হীন সেই শ্রেষ্ঠ। যে মানুষ সেই শ্রেষ্ঠ!

সে কি আমি?

‘রথ এসে দাঁড়াল। রাজা নামল। সংবাদটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে পৌঁছে গেছে রাজপুরী পর্যন্ত। রাজা মুক্ত অসি হাতে এসে উপস্থিত হয়েছেন-বর্বর বুদ্ধিহীন বালক! যা বলেছিস প্রত্যাহার কর!

‘তা কেমন করে করব? মিথ্যা বলা হবে যে!

‘মিথ্যা বলা হবে? আমি শ্রেষ্ঠ নই? এত সম্পদ এত প্রাসাদ এত সুখ কোথাও দেখেছিস?

‘সম্পদ দিয়ে কি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়? প্রাসাদে যারা বাস করে তারা কি মরে না? আর সুখ? বলো তো রাজা তুমি এখানকার শ্রেষ্ঠ প্রাসাদে বাস করো, তুমি তো রাজা, তোমার সুখ কত? সুখ কি আছে? চিন্তা থাকলে সুখ থাকে না। তোমার চিন্তা নেই? অহরহ চিন্তা করো কি না-ভাব কি না কখন কে তোমার রাজ্য থেকে সমৃদ্ধ হবে-অধিক শক্তিশালী হবে। বলো?

‘রাজা গর্জে উঠল-জানিস আমার কত শক্তি, কত অস্ত্র-

‘হেসে উঠল বালক-কত শক্তি তোমার? যেসব অদ্ভুত অস্ত্র তোমার আছে তাতে তোমার মৃত্যু হয় না?

‘কী? এর অর্থ কী?

‘অর্থ সহজ। ভেবে দেখো যেসব অস্ত্র তুমি তৈরি করেছ অন্যকে মারবার জন্যে তা কি তুমি সহ্য করতে পার? তাতে কি তোমার মৃত্যু হবে না? যদি হয় রাজা, তবে এই অস্ত্র তুমি যখন তৈরি করেছ অন্যেও তা তখন তৈরি করতে পারে এবং তোমাদের উপর প্রয়োগ করতে পারে! পারে না?

‘রাজার ক্রোধের সীমা রইল না, সে বলল-ওরে মূর্খ এর জন্য তোকে হত্যা করব আমি।

‘এই সত্য কথার জন্য আমাকে হত্যা করবে?

‘হ্যাঁ। যে আমাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার না করবে তাকে আমি হত্যা করব। তোর অস্ত্র থাকে তো যুদ্ধ কর।

‘অস্ত্র আমার নেই।

‘তবে এখনও স্বীকার কর।

‘না। তুমি রাক্ষস-স্বভাব পেয়েছ। তুমি লুব্ধ, তুমি উদ্ধত, তুমি ভীত।

‘তোর ভয় নেই?

‘না। কারণ আমি মানুষ।

‘অস্ত্র তুলল রাজা-তবে এই তার শাস্তি!

‘ছেলেটি বুক পেতে দাঁড়াল। রাজার অস্ত্র নামল। বুকে লাগল। রক্ত ঝরতে লাগল। বালক পড়ে গিয়েও গাইতে লাগল-

‘আমাকে লোভ জয় করতে শক্তি দিয়েছ, আমাকে নির্লোভ করেছ, হে রাজাধিরাজ। তুমি ধন্য। আমাকে অভয় দিয়ে নির্ভয় করেছ-হে অভয়ংকর মৃত্যুঞ্জয় তুমি ধন্য।

‘রাজার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল-এ কে? এ কে? এ কোন গান?

‘সমস্ত লোকের বুকও সঙ্গেসঙ্গে তোলপাড় করে উঠল। এ কী গান-এ কে?

‘কী সুন্দর গান-কী সুন্দর বালক!

‘রাজার চোখে জল এসেছে-সেই জলে-ধোওয়া চোখে তিনি কী দেখছেন? এ কার মুখ?

‘ছেলেটির কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে তবু গাইছে-আমাকে রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা করেছ হে সুন্দর-তুমি ধন্য হে প্রভু, বিশ্বের যেখানে রাক্ষসত্ব আছে-তাকে তোমার স্পর্শে অমৃত করো মনুষ্যত্বে পরিণত করো।

‘দরদর ধারায় চোখ থেকে জল নামল রাজার। তিনি চিৎকার করে উঠলেন-কল্যাণী-কল্যাণী-কল্যাণী মা!

‘কল্যাণী এসে দাঁড়াল! তপস্বিনী।

‘বাবা!

‘এ কে?

‘আমার ছেলে। তোমার দৌহিত্র!



‘বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল রাজা, হায়-হায়-হায়। সারা রাজ্য হায় হায় ধ্বনিতে ভরে উঠল। চোখের জলে ভাসতে লাগল সকল বুক।

‘দেখতে দেখতে রাক্ষসত্বের মোচন হল।

‘রাজা শুধু আছাড় খেয়ে পড়ে আর উঠলেন না।

‘এদিকের তাকে রাজার সেই দেহ রেখেছে আরকে ডুবিয়ে। ওই সেই মারণাস্ত্র। ওদিকে সেই দৌহিত্রের উত্তরীয় বস্ত্র বীণা। সিংহাসনে রেখে দিয়েছে। মানুষ রাক্ষস হয় কর্মদোষে ভবানন্দ-আবার মানুষই তাকে মুক্ত করে! তাই-তাই রয়েছে ফাটকে। এ যত স্বাভাবিক ভবানন্দ, তত আশ্চর্য। এখন চলো চটিতে গিয়ে রান্নাবান্না করি-হাতমুখ ধুই।’

‘কাশী কত দূর দাদাঠাকুর?’

‘অনেক।’

‘চলো, জলদি চলো। রান্না সেরে খেয়ে নিয়ে আবার চলো। দেখব আরও কত আশ্চর্য পথে অপেক্ষা করে আছে।’

‘পেয়ারা পেঁড়া?’

‘সে তো কাশী পৌঁছে। শেষ আশ্চর্য।’

*আশ্বিন ১৩৬৯*




# শিবরাম চক্রবর্তী

জীবনে সেই যা আমার পুরস্কার লাভ-সেই প্রথম আর সেই শেষ। কিন্তু এরকমটা যেন তোমাদের কারও কখনো না ঘটে ...

ক্লাস টেনে প্রমোশন পেয়েই মামাকে গিয়ে জানালাম।

'টেনে উঠেছিস! বলিস কী রে!' মামা তো হতবাক। 'টেনে উঠলি? বাঃ।'

'এখনই বাঃ কি মামা? আসছে বছর এনটেন্স পরীক্ষা দেব, তা জানো?'

'বলিস কী রে! আমাদের বংশে কেউ যে কখনো এনটেন্সের চৌকাঠ মাড়ায়নি! সাত জন্মে না। সাত পুরুষে নয়।'

সাত পুরুষের খবর রাখি না, তবে তিন পুরুষের জানি। আমার মামা বাংলা পাঠশালার পড়ুয়া, ছাত্রবৃত্তি পাশ। তারপর তিনি আর এগোননি। নিজের ব্যাবসা নিয়েই রয়েছেন।

আর আমার দাদামশাই ছিলেন টোলের পণ্ডিত। ইংরেজির ধার ধারতেন না। সংস্কৃত নিয়ে থাকতেন, টোল ছিল তাঁর। তাঁর ধাক্কায় টোলে পড়তে পড়তে খুব আমি টাল সামলেছিলাম।

আর তাঁর বাবার আমলে এনটেন্সের পাটই ছিল না। তিনি জানতেন শুধু ফারসি। মৌলভিদের মক্তবে পড়েছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার লেখা কী একটা ফারসি চিঠি পড়ে দিয়ে কোনো এক সাহেবের কাছ থেকে একটা সোনার ঘড়ি নাকি বখশিশ পেয়েছিলেন তিনি।

সেই সনাতন বংশে প্রথম 'এ-বি-সি-ডি' নিয়ে এলাম আমি। কেবল নিয়ে আসা নয়, এনটেন্স পাশ করে সেই 'এ-বি-সি-ডি'-র ছেরাদ্দ করে ছাড়ব। বি এল এ ব্লে থেকে শুরু করে এতদূর যখন টেনে-হিঁচড়ে নিজেকে আনতে পেরেছি, তখন বাকিটুকুও কোনোরকমে ঠেলেঠুলে উৎরে যেতে পারব আশা করি।

মেজোমামার আনন্দ ধরে না। 'কী পুরস্কার চাস বল?'

'কী দেবে দাও,' আমি তো লাফিয়ে উঠি।

'এই সোনার ঘড়িটা নে।' বলে মামা জেব থেকে চেন-লাগানো ঘড়িটা বার করলেন, 'দেখেছিস? মোকবের সোনার ঘড়ি। পাঁচ-শো টাকা দাম। আমার ঠাকুরদাকে দিয়েছিল এক সাহেব। বেঞ্জামিন সাহেব। ভেবেছিলাম তুই এনটেন্স এগজামিন পাশ করার পর বেঞ্জামিনের ঘড়িটা তোকে দেব। তার আগেই নে তুই। ক্লাস টেনে তো উঠেছিস! যাঁহা বাঁহান্ন, তাঁহা তিপান্ন।'

'ঘড়ি নিয়ে কী করব মামা? ধুয়ে ধুয়ে খাব?' আমি বললাম, 'ঘড়ি তোমার থাক।'

‘তাহলে কী চাস তুই?’

‘টাকা দাও বরং আমায়। ওই ঘড়ির দামের টাকাটা দিয়ে দাও।’

‘পাঁচ-শো টাকা! পাঁচ-শো টাকা নিয়ে কী করবি রে তুই?’

‘খাব।’

‘খাব! পাঁচ-শো টাকার কী খাবি? এমন কী খাবার আছে?’

‘কেন, রসগোল্লা, সন্দেশ, জিবে গজা, জিলিপি, চানাচুর, চকোলেট, চীনে বাদাম …’

‘পাঁচ-শো টাকার চীনে বাদাম! তা খেলে আর বাঁচতে হয় না। আর যদি বাঁচিসও, তোর চেহারা চীনেদের মতন হয়ে যাবে। কিংবা একটা বাদাম হয়েও দাঁড়াতে পারিস।’

‘তাহলে রেখে দেব।’

‘রাখবি কোথায়? তোর কি ব্যাঙ্ক-প্যাঁটরা আছে? টাকা রাখতে হয় সিন্দুকে।’

‘কেন আমার পকেটে রাখব।’ সিন্দুকে আমি বিন্দু জ্ঞান করি। বিন্দুমাত্র আমল দিই না-‘আমার এই বুক পকেটে।’

‘পকেটে! পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবি যেখানে-সেখানে?’

‘বেড়াবই তো। দেখিয়ে বেড়াব সবাইকে। বা রে! বন্ধুদের দেখাতে হবে না? তা না হলে আবার কীসের টাকা!’

‘তবেই হয়েছে। চারদিকে যা পিকপকেট! কলকাতায় কি পা বাড়াবার জো আছে রে কোথাও! পকেটমাররাই টাকাটা মেরে দেবে তোর।’

‘তা আর মারতে হয় না। আমার পকেটে হাত দেবে এমন মানুষ এখনও জন্মায়নি মামা।’

‘চার ধারেই তো ঠকজোচ্চোর। ঠক বাছতে গাঁ উজোড় এই কলকাতায়।’

‘দিয়ে দেখো না আমায়?’

‘নে তাহলে।’ আয়রন সেফ খুলে পাঁচখানা এক-শো টাকার নোট আমার হাতে তুলে দেন, ‘দেখিস যেন বেহাত না হয় কখনো।’

‘আমার টাকা আর হাত সাফাই করতে হয় না কাউকে। এত বড়ো ম্যাজিশিয়ান এদেশে নেই।’

‘টাকাটা পকেটে নিয়ে ঘুরবি বলছিস। বাড়ি ফিরে রোজ রোজ দেখাবি আমায় কিন্তু। পাঁচখানা নোট গুণে গুণে দেখব আমি।’

‘দেখাব দেখাব,’ বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম-বন্ধুদের দেখাবার জন্য। তাদের কারও পাঁচ টাকার বেশি মুরোদ নেই, পাঁচ-শো টাকায় কেমন তাদের তাক লেগে যায় সেটা দেখতে হবে।

পাড়ার হুদ্দা পার হয়ে একটা পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় এক ভদ্রলোক ডাকলেন-

‘খোকা তোমার আদ্দির পাঞ্জাবির ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে সব।’

‘অ্যাঁ?’ চমকে গিয়ে আমি থমকে দাঁড়াই।

‘নোটগুলো সব দেখা যাচ্ছে যে।’ আমার ঘাড়ে হাত রেখে তিনি বললেন, ‘অমন করে টাকা রাখতে নেই ভাই। পকেটমারের নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই। মানিব্যাগের মধ্যে রাখবে টাকা।’

ঘাড়কে হস্তচ্যুত করে আমি হটে যাই ‘কিনব ব্যাগ’ জানিয়ে দিই সংক্ষেপে।

‘নোটের নম্বরগুলো তোমার টোকা আছে তো সব?’ তিনি শুধোন।

‘নোটের নম্বর?’ অবাক হতে হয়।

‘হ্যাঁ, নোটের কোনার দিকে নম্বর থাকে, বড়ো বড়ো নোটের নম্বর টুকে রাখতে হয় আলাদা কাগজে। ধরো, বলা তো যায় না, টাকাটা তোমার খোয়া গেল। তখন তুমি থানায় গিয়ে পুলিশকে জানাতে পারবে নোটের নম্বর দিয়ে। পুলিশ তখন খবরটা জানিয়ে দেবে সবাইকে। কেউ ওই নম্বরের নোট বাজারে চালাতে গেলে ধরা পড়ে যাবে হাতে হাতে। টাকাটা তোমার উদ্ধার হবে তখন।’



লোকটা ভালো কথা বলছে বলে আমার মনে হল। কিন্তু আমার কাছে এখন কাগজ কলম কিছুই নেই তো!

‘এই নাও কাগজ কলম দিচ্ছি,’ বলে তিনি তাঁর ডায়েরি বইয়ের থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে দিলেন।

‘এই নাও আমার কলম। নোটগুলো আমার হাতে দাও আমি নম্বর বলে বলে যাই আর তুমি টুকে নাও।’

বললেই টাকাগুলো ওর হাতে অমনি তুলে দিলাম কিনা তেমন বোকা আমি নই। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে আমি তাকাই। তেমন যেন সুবিধে নয় লোকটা।

‘আচ্ছা আচ্ছা। তুমি নম্বরগুলো বলো, আমি তোমায় টুকে দিচ্ছি নাহয়।’

আমি বলে বলে গেলাম, নম্বরগুলো তিনি টুকে নিলেন।

‘এইবার আমার এই মানিব্যাগটা তুমি রাখ। ব্যাগের মধ্যে টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই, খালি ব্যাগ। ব্যাগটা আমি তোমায় উপহার দিলাম। এর ভেতরে তোমার নোটগুলো সাজিয়ে রাখো। তাহলে কারও নজর পড়বে না।’

‘আপনার ব্যাগ আমি নিতে যাব কেন?’ আমি আপত্তি করি, ‘আমার ব্যাগ আমি কিনে নেব। আমার কি টাকা নেই?’

'আহা রাগ করছ কেন? আমি কি তাই বলেছি। আমার চেয়ে তোমার এখন বেশি টাকা। আমি কি তোমাকে একেবারে দিচ্ছি ব্যাগটা? জন্মের মতো নিতে বলছি কি? তোমার ব্যাগ কেনার পর আমাকে এটা তুমি ফিরিয়ে দিয়ো নাহয়। ব্যাগের মধ্যে আমার নামের কার্ড রয়েছে! নরহরি সামন্ত, বৈঠকখানা রোড, ওই ঠিকানায় তুমি দিয়ে এসো আমাকে।'

তবু আমার দোনামোনো যায় না।

'ওই দেখো, একটা পুলিশের লোক আসছে। ছেলেপিলেদের হাতে টাকা থাকা ওরা ভারি অপছন্দ করে, ভীষণ সন্দেহের চোখে দেখে। ভাববে তুমি হয়তো বাড়ির ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছ, পাকড়ে নিয়ে যাবে থানায়। নাও চট করে পুরে ফেলো টাকাটা।'

পুলিশ দেখে ব্যগ্র হয়ে আমি টাকাগুলো ব্যাগস্থ করি।

তারপরেই যেন কী ঘটে গেল!

'আমার ব্যাগ, আমার মানিব্যাগ! কোথায় গেল আমার মানিব্যাগ!' লোকটা চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ। 'অনেক টাকা ছিল যে আমার ব্যাগে। কে পকেট মারল আমার!'

পুলিশ ইন্সপেক্টর থমকে দাঁড়ালেন আমার কাছে এসে।

'কী হয়েছে মশাই? কী হয়েছে?'

'আমার মানিব্যাগ পকেট থেকে কে তুলে নিয়েছে দেখুন।' আর্তনাদে ফেটে পড়ল লোকটা, 'পাঁচ-শো টাকা আমার তাতে। সব খোয়া গেল আমার।'

ইন্সপেক্টর খপ করে এসে হাত চেপে ধরলেন আমার, 'এই ব্যাগ কি আপনার দেখুন তো?'

'হ্যাঁ, এই তো সেই ব্যাগ। দেখুন দেখুন, ওর ভেতর আমার নোটগুলো সব আছে কি না দেখুন, এক-শো টাকার পাঁচখানা নোট-এই এই নম্বর-পকেট থেকে কাগজখানা বার করে নম্বরগুলো তিনি আউড়ে গেলেন-আমার নামের কার্ডও রয়েছে ব্যাগের ভেতরে। নরহরি সামন্ত, বৈঠকখানা রোড।'

'হ্যাঁ, রয়েছে। সবই মিলে যাচ্ছে, এই নিন আপনার মানিব্যাগ। ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করছি। আপনি থানায় চলুন আমার সঙ্গে। আপনার অভিযোগ ডায়েরি করবেন।'

'আমার অভিযোগ! আমার কীসের অভিযোগ? পেয়ে তো গেলাম। তা ছাড়া অভিযোগ করবার আমি কে? আমি কি বিচার করবার মালিক? মানুষ কি মানুষের বিচার করতে পারে? কেউ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে সে কথা?'

'আপনি কী বলছেন মশাই?' ইন্সপেক্টর তো অবাক।

'ঠিকই বলছি, ছেলেরা সব দেবতুল্য। কেউই তাদের খারাপ হয়ে জন্মায় না। সঙ্গ দোষে, শিক্ষার ত্রুটিতে খারাপ হয়ে যায়। এর জন্য দায়ী সমাজ, সংসার, পরিবেশ। রাষ্ট্র দায়ী এর এই অপরাধের জন্য। এ নয়, দায়ী হচ্ছে ওর বাবা, কাকা, পিসে, মেসো, মামা। এই আমার অভিমত।'

'কিন্তু আইন মাফিক,' বলতে যান ইন্সপেক্টর।

'আমি যদি ছোঁড়াটাকে জেলের মুখে ঠেলে দিই, সেখানে ও ওস্তাদ বদমায়েশদের পাল্লায় পড়ে তাদের হাতে শিক্ষালাভ করে পাকা চোর হয়ে বেরোবে জেল থেকে। তখন

পকেটমার থেকে চোর হবে, চোর থেকে ডাকাত হবে, ডাকাত থেকে খুনি হবে, তারপর খুনি থেকে ...'

'ফাঁসি হবে। তা ছাড়া আর কিছুই হবে না।'

'আমি ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে যেতে চাই না। আপনি দয়া করে ওকে ছেড়ে দিন।' বলে তিনি আমায় মার্জনা করে চলে যান।

আমিও ইন্সপেক্টরেরও মার্জনা লাভ করি।

এখন মামা মার্জনা করলে হয় আমায়।

*বৈশাখ* ১৩৭১




# গৌরী চৌধুরী

এক ছিল দাঁড়কাক। তার নামধাম গুণগ্রাম চক্ষুলজ্জা কথার দাম এসব কিচ্ছু ছিল না। কারও সঙ্গে ভাব তো ছিলই না, এমনকী আড়ি পর্যন্ত ছিল না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলত না, কারও কথা কানে তুলত না। রোজ খুব ভোরে উঠত, সারাদিন রোদে পুড়ত, কারও কাছে কিছু চাইত না, বৃষ্টির জল ছাড়া নাইত না, খুব খিদে পেলে এঁটোকাঁটা নোংরাঝোংরা যাহোক একটা কিছু খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যে হলে হাটে মাঠে ঘাটে বাগানে বাথানে দোকানে যেখানে হোক একটি নিরিবিলি কোণ বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ত।

একদিন দাঁড়কাকের শরীরটা খারাপ, নামমাত্তর একটু মিরগেলের ঘেসো তেল মুখে ঠেকিয়ে বেলাবেলি এসে সে-ই যে-বাগানে মালিক নেই শালিক নেই মালি নেই তিনটে গাছে ডালই নেই, সেই বাগানের এককোণে একটা গাদা-গুপপো ভাঙা বাক্সোর ওপর শুয়ে শুয়ে-

'টক আমড়ার কামড়া ডাল, স্বপ্নে যাবি কাংড়া কাল

বইয়ের পাতা দুমড়ো না, শুকনো কাপড় নিংড়ো না

ডুমরাওনের দামড়া ষাঁড় হুমড়ে ভাঙে কুমড়ো ঝাড়

আমরুলের জ্বর তাংড়াবেই সোনাব্যাঙের চামড়া ওই-'

এই ছড়াটা বলতে বলতে নিজেই নিজেকে ঘুম পাড়াচ্ছে, এমন সময় কানে গেল চিল গলায় খিলখিল কথাবার্তা। মাথা যেমন কাত তেমনি কাত, বোজা চোখ সোজা করে সামনের দিকে তাকাতেই দাঁড়কাক দেখল-পাঁচিলের পাঁচ ফাটলে গজানো অশ্বত্থ ডালে পাশাপাশি বসে দু-টি ধবধবে শঙ্খচিল।

একটি হচ্ছে জলটুঙ্গির মেঘতুঙ্গীদের কনে-মেয়ে সবে-উড়তি মহাফুর্তি ডানা ঝাড় তো আরও-বাড় তো টরটরে খরখরে একচক্রা, আদুরে নাম একা।

আর-একটি-বালিয়াড়ির দূরপাড়িদের নতুন ছেলে শুধু খেলা-নেই-কাজ খুব সাজ ওড়বাজ পালকে-পালকে-খাঁজ রাতদিন-সুর ভাঁজ পাকচক্র, রাগানো-কিন্তু রাগে না নাম পাকা।

একবার দেখে নিয়েই চোখটা প্রায় বুজিয়ে দাঁড়কাক চুপচাপ শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগল ওদের কথাবার্তা।

পাকচক্র- 'এককা দোককা

আমাদের একরানি বড়ো একরোক্কা'

না-তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে একচক্রা বলল-

‘এটুকু বুঝতে গেল দু-টি দিন পাক্কা?

কী আছে মগজে দেখি দিতে দে তো ধাক্কা’

পাকচক্র মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল-

‘একা একা একানি- চারানির বদলেতে দেব তোকে একানি

ইকড়ি মিকড়ি কান নেই তোকে তাই দিইনি কো মাকড়ি

একলা একলি কিছুই করিনি তবু শুধু শুধু বকলি

আঁকাবাঁকা আঁকনি- পোলাওয়ে মশলা দিতে দিয়েছিস ছাঁকনি’

একচক্রা একচোখে কটমট করে তাকিয়ে আর এক চোখে মিটমিট করে হাসতে লাগল। পাকচক্র আবার ধরল-

‘এক-এককে একা, একা বড়ো বোকা

ধোঁকা ছোঁকা ঠেলে ফেলে শোঁকে শুঁয়োপোকা

মাছ বড়ো আক্রা, তাই একচক্রা

মনে মনে বক্রা

তবুও সাতটি চড়ে কাড়ে না কো এক রা-‘

কথা কেড়ে নিয়ে ডানা দুলিয়ে একচক্রা বলে উঠল-

‘রা কাড়ব কাড়বই

নইলে বিপাকে পাকেচক্রে যে পড়বই

মুখ বুজে চোখ বুজে থাকবার ফাঁক কই?

ঢাক ঢাক গুড় গুড় আর নয়-দুর দুর

হাঁকডাকি জাঁক করি বাজাই দে ঢাক কই?’

পাকচক্র বলল- ’একে একে এক কই? হাঁস আছে প্যাঁক কই?

রাঁধব যে ঝিক কই? শুধু ক্লিক, দিক কই?

দেখবার চোখ কই কইবার লোক কই

সখ কই সুখ কই

এত পড়ে শুধু শিখি ঐক্য না, বাক্যই-‘

একচক্রা বলল-‘তুমি আবার পড়লে কবে গো? তোমাকে তো খালি উড়তেই দেখছি জ্ঞান হয়ে ইস্তক?’

পাকচক্র বলল-‘ওই উড়তে উড়তেই অনেক কিছু পড়ে নিয়েছি। পড়তে পড়তে সামলেও নিয়েছি। যাক এখন বাড়ি যাই চল। সূয্যি ডুবল বলে, রোদ উবল বলে, শন শন পুবে হাওয়ায় ডানা ভাসিয়ে ঝিনুকঝিলের মাথায় অনেক অনেক অ-নে-ক-ক্ষ-ণ ধরে একটা লম্বা চক্কর দিয়ে চল ঘরে ফিরি।’

একা বলল-‘তার আগে একটা কথা বলি শোন।’

পাকা বলল-‘কী?’

‘এ … ই বলছিলুম কি আমাদের যদি নাম না থাকত, তাহলে বেশ হত, না?’

পাকা বলল- ‘সে কী রে একী রে

এ তো ভারি অদ্ভুত শখ তোর কিম্ভূত

তুই যদি হেথা আর আমি হোথা থাকতুম

নাম না থাকলে তোকে কী বলে বা ডাকতুম’

‘কেন? বানানো নাম দিয়ে?’

‘-আগে তো জানানো চাই, তারপর বানানো

আগে শোন শান চাই, তারপরে শানানো

জল চাই, ঢেউ চাই, তবেই না ফেনানো

কান চাই, মন চাই, তবে গান শোনানো’

নাম না থাকলে কখনো হয়? নাম থাকে না কাদের? যাদের মা নেই বাবা নেই ভাই নেই বোন নেই বন্ধু নেই বউ নেই বর নেই কেউ নেই কিছু নেই, সেই তাদের।

একা বলল-‘আহা, এমন বেচারাও আবার কেউ কোথাও আছে নাকি গো?’

পাকা বলল-‘কেন? সেই দাঁড়কাকটি?’

দাঁড়কাক চমকে উঠল। একা-পাকা উড়ে গেল।

সারারাত ধরে দাঁড়কাকের ঘুম হল না। এই সেদিনের একা-পাকা … কবেই বা ইয়ে হল কবেই বা বিয়ে হল, তাদের মুখে এই কথা? তাদের মুখে এমন কথা? ইস তাকে লোকে এমন চোখে দেখে? … ভাবতে ভাবতে শেষরাতের অন্ধকার যখন একটুখানি চিচিং ফাঁক, সেই সময় দাঁড়কাকের মনটা একেবারে আছাড়িপিছাড়ি করে উঠল, দাঁড়কাক আস্তে আস্তে আপনমনে বলল-

‘সেই কাকই আছি তবু যেন সেই কাক নই

শুক নই শুক নই নই সেই শুকনোই

একা একা কা কা করি কাকী কই কাকী কই?

মনের প্রাণের যত বাকি কথা কাকে কই?’

আরও বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা খুব সুন্দর আওয়াজ ভেসে আসতে দাঁড়কাক চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল- পাঁচিলের ওই ওধারে ঝুলোন কালো তারে ন্যাজ ঝুলিয়ে বসে একটি ফিঙে পাখি শিস দিয়ে দিয়ে গান গাইছে। দাঁড়কাক উড়ে গিয়ে পাঁচিলের ওপর বসল, ফিঙে তাকে দেখতেও পেল না, নিজের মনে গান গাইতে লাগল-

‘নামে নামে নামতা সামতা বেড়েতে যেতে আমতেল খামচালি

হাওড়া টু আমতা যাস কেন নিমতা? নামতে না নামতেই

সব তাতে এত কেন জামতাড়া থামতেই ঘামতেলে ঘুম তাড়া

আমতা-আমতা? তা ধিন তা ধিন তা? তুম তেরে তুম তেই-‘

দাঁড়কাক বলল-‘এই যে শুনছেন?’

ফিঙে চমকে ঘুরে তাকিয়ে দাঁড়কাককে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল-‘ওঃ, আচমকা ডেকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন যা হোক-‘

‘রাস্তাঘাটে খুব দেখেছি, কে বলুন তো আপনি?

এই সেদিনের ছোকরা আমি, আমায় আবার আপনি?’

দাঁড়কাক বলল-‘তা কী আর করি? কথা বলা তো তেমন অভ্যেস নেই, তা ছাড়া নাম জানি না, ধাম জানি না-‘

ফিঙে বলল-‘নাম?’

‘আমার নাম তো সবাই জানে পাড়ায়

রাদ্দিনই তো কলসি থেকে জলের মত গড়ায়

পটলভাজার মতন কড়ায় চড়ায়

গঙ্গাজলের মতন রাখে ঘড়ায়

আবার হাতে পায়ে মাড়ায়

ইচ্ছে হলে ছোটো করে ইচ্ছে হলে বাড়ায়

এর ওর তার নামের সঙ্গে ইচ্ছেমতন জড়ায়

ছড়ায় হারায় তাড়ায়

এমনকী দরকার পড়লে ভাঁড়ায়ও।’

‘আর ধাম?’

‘ধাম ওই ক্যানা ঝোপে

যার পাশে ধোপে ধোপে

বোঝাই কাপড় সোডা সোপে

ধপধপ ধোপা থোপে

মালীরা মাটি কোপায় ছেলেটা ঝাঁপাই ঝোঁড়ে

পায়রা ডাকে খোপে খোপে    হাঁপিয়ে হাতপা ছোঁড়ে

মালি বউ ফুল দে খোঁপায়    সারাদুপুর টাপে টোপে

মেহেদিতে হাত-পা ছোপে    মাছ বেঁধে গুলতি লোফে …’

… …?

দাঁড়কাক বলল-‘ও।’

ফিঙে বলল-‘তা, আপনার নামধাম?-অন্তত দাঁড়কাক না পাঁড়কাক সেটুকু …?’

দাঁড়কাক তবুও চুপ।

ফিঙে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে থেকে থেকে শেষকালে বলল-

‘আলাপ কি হয় দাদা চুপ করে থাকলে?

দেখাদেখি হয় শুধু চোখ দিয়ে দেখলে?

সকাল হয়েছে তবু ঝাঁপ কেন দোকানে

এত গান তবু কেন ঠুলি আঁটা দু-কানে

তরোয়ালে খাপ কেন মনে এত চাপ কেন

মা-বাপ কি ছোটোবেলা শুধু শুধু আপনাকে বকতেন ঝকতেন হাঁকতেন ডাকতেন ...'

দাঁড়কাকের চোখ ছলছল করে উঠল। আটকানো গলায় বলল-'বকলে-ঝকলেও তো বুঝতুম একটা কিছু করলেন।'

ফিঙে বলল-'তার মানে?'

-'তার মানে ... তাঁরা ছিলেনই না।'

ফিঙের মুখে আর কথা জোগাল না। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল-'সেই ঝড়ের সময় বুঝি ...'

-'হ্যাঁ ভাই, সেই ঝড়ে আমার সব গেছে। এমনকী এমনকী-আমার একটা নাম পর্যন্ত নেই'-বলতে বলতে দাঁড়কাকের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ফিঙের চোখও ছলছলিয়ে এল, দাঁড়কাকের ডান ডানার পালকে ঠোঁট বুলিয়ে ফিঙে বলল-'দুকখু করবেন না দাদা। জানেন তো, ঠিক দুকখুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা? কুয়ো-ভূত, দুয়ো-ভূত, তোর-সাজাতে ডুকরে-হাসি, দেখতে-মজা-দৌড়ে-আসি আর তুই-বাড়লে-গাবিষবিষ হাত-নিশপিশ চোখ-পিটপিট মন-খিটখিট-এই পাঁচ ভূতের ঢেলা খেতে যদি না চান তো দুক্ষু-টুক্ষু সব মনের একতলাতে ভূষুণ্ডীর মা বড়াইবুড়ির জিম্মায় রেখে সাততলার খোলা বারান্দায় লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করুন, রং খুলবে, গলা খুলবে, চোখ জ্বলবে, শঙ্কর গারুড়ির আসন টলবে। আর নামের জন্যে আবার ভাবনা? ডাকবার লোক হলেই নাম আপনি হবেখন।'

'কত নাম চাই দাদা কতগুলো নাম চাই? এখান ওখান থেকে যত পারি খামচাই

চামচিকে চামচেয় খায় যদি চমচম নামচেবাজারে গিয়ে দেখি যদি রংচং

রামছাগলের শিঙে বেঁধে নিয়ে মোমছাল গামছায় আমচুর ভাঙচুরে রাংঝাল

তৈরি করব সব যার যত নাম চাই কত চিঠি লিখবেন? কতগুলো খাম চাই?'

দাঁড়কাক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল-'চামচিকেতেও চমচম খেয়েছে, আর আমারও নাম হয়েছে। নাম কি সোজা কথা?'

'গাছের ফল নয় যে পেড়ে দেবে, পরের ধন নয় যে কেড়ে আনবে

হাতের মোয়া নয় যে তুলে দেবে, বাড়তি ঘর নয় যে খুলে দেবে-'

ওদিক দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল একটি চড়ুই। ফরফরিয়ে এসে বলল-'ঘর খোলাখুলির কথা কী হচ্ছে একটু শুনতে পারি? ঘরে পোস্ত-টোস্ত আছে কি? নিদেনপক্ষে দু-টি তুলসি পাতা

কলসি যদি থাকে তো থাক আলসেরা সব জলসা করুক

খলসে পুঁটিও থাক না কালসাপেতে মালসা ভরুক

গলসি হয়ে হালসিবাগান ভুলশিলেতে বাটনা বেটে

যে যেতে চায় যাক না কালশিরে পড়াক না

চালশেরা সব চশমা বিনে উলসে উঠে তারপরেতে

হোলসেলেতে হিলশা কিনে মাল টাল সামলাক না-'

'আমার ওসবে দরকার কি? আবার বাপু খোলসা কথা, শুধু দু-টি তুলসিপাতা চাই, ঝলসানো হলেও চলবে! আছে নাকি?'

দাঁড়কাক বলল-'এই আর একটি ছড়ুই এলেন।' চড়ুই একপাক ঘুরে নেচে নিয়ে বলল-

'পেছল থাক না পথে, তবু কেন হড়কাবি তুই না লড়ায়ে ঘোড়া? তবে কেন ভড়কাবি

হুড়কো দিয়েছে ঘরে আড়কাঠি, সাড় কই এই বেলা তিন লাফে পেরিয়ে যা গড়খাই

'বরং তেপান্তরে ছুটে ছুটে ঝড় খাবি

সে-ও ভালো, তবু কেন খড়কের চড় খাবি?

ভিড়কে ভয় কি তোর? বেড় দিয়ে বাঁধ জোড়-'

ফিঙে বলল-'থামো বাপু, একেবারে ড়য় ড়য় ড়য়াক্কার। সকালটা মাটি করলে।'

দাঁড়কাক বললে-'একসঙ্গে এত ড় জীবনে এই প্রথম।'

'র-ই বা কম কি? মাথা ঝিমঝিম করছে। এত রড়ারড়ি কীসের?'

চড়ুই বললে-'দেখলুম আপনি একটু মনমরা হয়ে রয়েছেন। তাই মেজাজটা একটু রগড়ে দিলুম আর কি। আসল রগড় যদি দেখতে চান তো চলুন ওই যেখানে-

'বেলা এখন সাড়ে দশটা-হলদে বাড়ির বেঁটে কেষ্টা কিছুতেই না পেরে শেষটা

এই কলাটা মুলোটা মাছটা আশটা আনবার নাম করে একটা বাজারের থলি হাতে ঝুলিয়ে কাছারির দিকে চলেছে, ওর উলটোপথে উজানে উড়ি। দেখা যাক কী হয়।'

দাঁড়কাক বলল-'চলো।' ফিঙে বলল-'চলো।'

পাঁচ রাস্তা দশ বাগান কলার কাঁদি এক-শোখান পেরিয়ে ঢেউ বেশ-তো হাঁস-ব্যস্ত মস্ত পুকুরের পাড়ে ধত্তোদের গাছপালা-খোলামেলা রেলিঙেতে-ঢেউ-তোলা কাপড় বারান্দায় মিনি-ঘোরে পায়ে পায় খাবারের ধান্দায় রোয়াকে বেঞ্চি পাতা কোণ বেয়ে নীল অপরাজিতার লতা ফোড়নের গন্ধ তেল ঝালটকে খাসা আচারের জারে ঠাসা তেতলার চিলেকোঠা তালাচাবি বন্ধ দক্ষিণদ্বারী সৌখিন বাড়ি। ধত্তোগিন্নির একটি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলের নাম ধত্তো বেতোল-ধরো-না। মেয়ের নাম ক ধাপ বলো না। ছেলের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে, বউয়ের নাম ইশ-বিশ-ধানের শিষ।

ধত্তোবাড়ির পাশেই সায়বাড়ি। সবই প্রায় ওই একইরকম, শুধু অপরাজিতার জায়গায় তরুলতা, মিনির বদলে ভুলো, আর চিলেকোঠায় আচারের বদলে একরাশ সমাচার-দর্পণ। সায়কত্তা পড়তেও পারেন না, বাবার জিনিস প্রাণ ধরে ফেলতেও পারেন না।

সায়গিন্নির একটি মেয়ে একটি ছেলে। মেয়ের নাম ইঁকড়ি-মিকড়ি-চাম-চিকড়ি। ছেলের নাম চামেকাটা মজুমদার। কত্তা খুব আপত্তি করেছিলেন, সায়বাড়ির ছেলের নাম মজুমদার কেন হবে? গিন্নি বললেন-তা আর কী হবে। তাহলে তো মেয়ের নামও পালটাতে হয়। সে সময় মনে ছিল না?

মেয়ের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। জামাইয়ের নাম ধেয়ে-এল দামোদর। বিয়ের পর অবশ্য তাকে আর ধাইতে হয় না, বউই ধেয়ে যায়।

দুই গিন্নিতে খুব ভাব। রোজ পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ি ঢোকার মুখে দু-ঘণ্টা ধরে কথাবাত্তা হয়। চড়ুই দাঁড়কাক আর ফিঙেকে নিয়ে পুকুর ধারের বকুলগাছের ওপর বসতে বসতে বলল-'অন্যদিন হলে এতক্ষণে কথার তোড়ে বাতাস পাক দিত, আজ সব গেলেন কোথায়?' ফিঙে বলল-'তা চুপচাপ বসে না থেকে টুকটাক চালালেই তো হয়।'

দাঁড়কাক বল-'এবার কি ঢয়ে শূন্য ঢ়? তাহলে আমি বাপু ওর মধ্যে নেই।' ফিঙে বলল-'যা বলেছেন দাদা।

'থামলে মিষ্টি ঢাকের বাদ্যি-ওনার ঢঙের কথা বাদ দি

ব্যাজার এক ঢোঁক ওষুধ গিলতে? কী ঢপ শুনছিস ঢুলতে ঢুলতে?

মৌচাকে কে মারলে ঢিল, ঢাকায় ঢোকে তিমিঙ্গিল

ঢের খেয়েছি ঢোঁড়ার ঢুঁ-আর বাবা নয় হা-ডু-ডু'

চড়ুই বলল-'ফাঁকতালে বেশ ঢেইয়ে নিলেন, এবার একটু থামুন তো-

'কাজ তোর এত কেন টিমে তেতালায়-কী আছে খোঁড় তো দেখি ঢিবির তলায়

ঢালু বেয়ে ঢল নামে, ফুলে ভরে মৌ-ঢিমে-আঁচে পাতুড়িটা খাসা রাঁধে বউ'

দাঁড়কাক বলল-'রোসো ভায়া, শোনাশুনি আমারও কেমন যেন ছড়াছড়া পাচ্ছে। দেখো তো একটু, সবে-আড়-ভাঙা জিভে ছড়াটা কেমন দাঁড়াল-

'মরা গাঙে ঢেউ কেন দিতে দিতে দেয় না ঢ্যাঁটাগুলো টিট কেন হতে হতে হয় না

(রাগ ধরে, দেখ দিকি) হতে হতে হয় না (দুর ছাই)-(ধ্যাৎ তেরি)

ঢাউশ ঢালের আড়ে নিধি-রাম সর্দার

জল ফেলে জল ঢালে যত হুঁকাবরদার

সবাইকে কাটব ঢেঁকি ছুঁড়ে মারব-'

মগডালের ওপর থেকে সিলসিলে গলায় কে যেন বলল-'নতুন জিভে ছড়াখানি তো বেশ হয়েছে, ঠিক জিবেগজার মতো, শুধু আর একটু ভাজলে হত, এই যেমন ধরুন-

'আঢ্যিবাড়ির বেঢপ খোকা-ন্যালবেলে গা, চক্ষু ঢোকা

তিন-ঢ্যাঙা এক শেলফে বসে-সাত-সকালে ঢ্যাঁড়স চোষে

'কিংবা যদি আর একটু মুচমুচে করতে চান, তাহলে বলবেন-

'টিকিস টিকিস চলতে দেখে ডেকে বললুম কী নাম?

ওমা আমায় মাঝরাস্তায় ঢিপ করে এক পেন্নাম!'

দাঁড়কাক ফিঙে চড়ুই একসঙ্গে ওপর দিকে তাকিয়ে বলল-

'আড়াল থেকে ছড়া ছুড়ছেন, বেশ তো আপনার আন্দাজ

মুখটা একবার দেখান দেখি কেমন ছড়ন্দাজ

'অন্তত দাদা বলব, না মশাই বলব, না বাবু-'

ছড়ন্দাজ নামতে নামতে বলল-

'বাবুয়ানা? বাবু-ই না, আমি তো বাবুই-ঝড়জল কিছুতেই হই না কাবুই

ঠাসবুনুনিতে খাসা বাসা বুনি উঁচু গাছে-যখন যেমন খুশি ওড়ার আকাশ আছে

জ্বরজারি জানি নে কো, খাইনি সাবু-ই-একে যদি বাবু বল, তাহলে বাবু-ই'

দাঁড়কাক বাবুইয়ের গা পা চোখ ঠোঁট পালক আলোক সব নিরীক্ষণ করে বলল-'বাঃ,

'বাবুই তো নয়, ভাবুই তুমি, বেশ তো ভেবে কাজ করো,

এখন যদি কাজ না থাকে তা হলে এক কাজ করো'

বাবুই বলল-'বলুন কী কাজ?

'যদিও গিন্নি বলেও যাননি

তবুও ফুর্তি মনটা ভরতি

এই সকালটা পুবং খালটা

রোদের শার্সি আকাশ-আরশি

পাতা-তা তা থৈ কথা-কই-কই'

'এক কথায় বেশ লাগছে-

'কীসের গর্ত কী খুশি ঘাসরা

পিঁপড়ে, সর তো তুলছে হররা

দুলছে ফলসা কাঁটারা ফুটছে

জমছে জলসা মাটি-গা খুঁটছে

কাঠকে ঠুকছে ডাল কি? ডাল না

ফোকরে ঢুকছে ছড়ার দোলনা

জল না, জাল তো উড়তে উড়তে

কাঁপছে আলতো ঝরতে ঝরতে

হাওয়ার গন্ধে পাতারা বাদামি

খানায় খন্দে ভাবছে কী দামি

'এখন- খই ভাজতে বলেন যদি তাতেও আমি রাজি

সাধ গিয়েছে আজকে হব সকল কাজের কাজি'

দাঁড়কাক বলল- 'অ্যাদ্দিন তো ছিল আমার কাজের মধ্যে দুই

যেখান থেকে যা পাই খেয়ে ছেঁড়া কাঁথায় শুই

'আজ থেকে আর সে কাজ নয়। এসো আমরা সবাই মিলে একটু খোলা প্রাণে গল্প করি, আড্ডা মারি, গুলতুনি পাকাই। মুখ-গোমড়া যাও তোমরা, চোখনাককান তালা বন্ধ জিভ উশখুশ ফুটো ফুসফুস মনে-সন্দ, দোরে ধরনা, আমি-বাড়লে-একা-বাড়ব তুই-মর না, কিল-খাচ্ছি খিল-দিচ্ছি খুব করলে-তড়পাচ্ছি। অতএব কিছুতেই তল পাচ্ছি না-এসব তো অনেক হল। এবার একটু অন্যরকম হোক।'

বাবুই বলল- 'বেশ বলেছেন, ঠিক বলেছেন,

গড্ডালিকায় আর যাব না, জমিয়ে আসুন আড্ডা দি

হো-হো হি-হি হা-হা হাসি, হেসে-ঘাড়ে রদ্দা দি'

ফিঙে বলল- 'খেয়ে বাবা পস্তাই দিল্লিকা লাড্ডু

না খেয়ে পস্তাগ ওই ওপাড়ার গাড্ডু'

চড়াই বলল- 'উড্ডয়নে না-ও যদি যাই, মুরাডডি তো যাবই

লক্ষ্মীরে হারাই-ও যদি, লকখিকে তো পাবই'

দাঁড়কাক বলল-'উঁহু উঁহু উঁহু। লক্ষ্মীও চাই, লকখিও চাই, পক্ষীও চাই, পঙ্খিও চাই, বিহঙ্গম, বালুচর, বালুচরি, শাঁখা শাড়ি সাঁকো সিঁড়ি শিকে পিঁড়ি সব শিখি পড়ি, তারপর ময়ূরপঙ্খি চড়ে সাগর পাড়ি দেব।

'ময়ূরপঙ্খী দে এনে দে চাই না ময়ূরপুচ্ছ বামুন যদি অচেনা হয়, পইতে দিয়ে চিনবে?

বয়েই গেছে দেখতে আমায় পুছছ কি না পুঁছছ বামুন যদি খুব চেনা-হয়, পইতে দিয়ে

চিনবে?'

দাঁড়কাকের কথা শেষ হতে না হতে একটা ঝিঁ ঝিঁ আওয়াজ পাওয়া গেল। সবাই নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা ঝিঝি আর একটি ঝিঁঝিনি মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কী যেন করছে। সবাই কান খাড়া করলে, ঝিঁঝিনি বলল-

'মুখ-ঝামটা ঝোপ কদ্দুর ঝড় ঝাপটা

আড়-ঘোমটা জগঝম্প ফেল ঝাঁপটা

জ্বর বাড়ছে লাগে কম্প ঝোঁক ছাড় না

ঝামরাচ্ছে ঝুনো নারকোল ঝুলি ঝাড়না

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর ঝেঁকে দেখ খোল'

ঝিঁঝি বলল-'ঝগড়া কেন? লোকটা ঝানু ঝুল কী কালো

থাক বাঁকানো ঝোল রেঁধেছ সামলে চল

বক্রজানু চুল বেঁধেছ? পাগলা-ঝোরা'

তুঁতগাছের পাতার আড়াল থেকে মুখ বার করে শুঁয়োপোকা বলল-'থাম না ছোঁড়া।'

ঝিঁঝি থতমতিয়ে বিষম খেয়ে উলটে পড়তে পড়তে সামলে নিল। ঝিঁঝিনি কটমটিয়ে বিষম রেগে পালটে বলতে বলল-'থামলে চলে?'

বাবুই চড়ুই ফিঙে দাঁড়কাক সকলেই অবাক। ফিঙে বলল-'আহা কেমন দুটিতে ছড়াছড়ি করছিল, থামিয়ে দিল গা!

'বেটার ভারি তো বিশ্রী ব্যাভার ধার ধারব না বাছার বাবার

উচিত বেটার জিভ ধরে টানা যুৎসই চড় দুগালে দু-খানা'

শুঁয়োপোকা বলল-'আমার গালফাল নেই বাপু, গালাগাল দিয়ো না। কী এমন করেছি শুনি? দু-দিন বাদে প্রজাপতি হব, তার মোহড়া দিতে হবে না?

'উত্তর কাড়ব মধুটি লুটব বেছে বেছে ভালো ফুলটি খুঁটব

ডালে ঘোরা ছেড়ে ঘুরব পাতায় ঝাপটা মারব কথায় কথায়

পাখি দেখলেই পাখাটি গুটিয়ে মরার মতন থাকব শিঁটিয়ে

শিখে নেব যা যা আছে কেরামতি এই না হলে-প্রজাপতি?'

দাঁড়কাক বাবুইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল-'এ বলে কী গো!'

বাবুই বলল- 'আ-র কী বলে গো ব্যাটা যেন আরকিপেলেগো

চরগুলো সব রয়েছে উঁচিয়ে কী আছে জানি না জলের নীচে এ'

ফিঙে বলল-'আপনি যে বাবুই ভাষা আরম্ভ করলেন মশাই? আরকিপেলেগো আবার কী? সাদা বাংলায় বলুন।'

বাবুই একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল-'সাদা বাংলা ঠিক জানি না, কালো বাংলায় 'দ্বীপপুঞ্জ'। আর সরাসরি জল-বাংলায় বলতে পারেন 'চরাচরি'!'

চড়ুই উত্তেজিত হয়ে হাত-পা ছুড়ে বলল-'গোলকধাঁধিয়ে দিলেন। সোজা কথা বোঝাতে বোঝাতে একেবারে বোঝা করে ছেড়েছেন। আর বেশি চালালে ওঝা ডেকে আনতে হবে। দয়া করে জ্ঞানমার্গের ফুটোটি একটু বোজাবেন কি?'

দাঁড়কাক বলল-'আহাহা কর কী, কর কী, তোমাকেও দেখছি শুঁয়োর ছোঁয়াচ লাগল, অমন করে কি বলতে আছে?'

চড়ুই বলল-'কেন বলব না শুনি? এঁকে ওঁকে তাঁকে কাউকে ছেড়ে কথা কইব না, এই তো বলছি- শুঁয়ো শুঁয়ো শুঁয়ো দুয়ো দুয়ো দুয়ো

ভেতর-বার সব ভুয়ো খোলসখানাও খুয়ো'

ফিঙে বলল-'সব্বোনেশে। সাত সকালে বাসিমুখে হাসিমুখে ঝগড়াপোকা খেয়ে ফেলেছিলে না কি? এতক্ষণে হজম হল?'

চড়ুই জিভ কেটে বলল-'তাই তো, ঠিক তো বলেছেন, মুখটা একটু তেতো তেতো লাগছিল বটে, তা ভাবলুম বউ বুঝি আমার জন্যে সুক্ত রেঁধেছে। কী কাণ্ড, ইস-'

ফিঙে বলল-'তাতে আর হয়েছে কী?

'বউ দিলে চিরেতারই তার কী! যদি বলে টাকী, যাই টার্কি

বউ যদি পাই তবে রেফ করে রাখি তাকে, নিজেকে র-ফলা, তাতে কার কী?'

কোটরের ভেতর থেকে হেঁড়ে-গলায় কুটুরে প্যাঁচা বলল-'কথোপকথনে অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিকতা অর্বাচীনতার লক্ষণ। তত্রাপি চ শতং বদ মা লিখ। মা দিবা স্বাপ্সীঃ'-বলেই ঘঁড়র ঘঁড়র করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

চড়ুই বোঁ করে দাঁড়কাকের গা থেকে একটি পালক খুলে নিয়ে প্যাঁচার ডাকা নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল-'ও মা দিবা স্বাপ্সী-ঝুপসি বাসায় ভেপসে গেছেন, লপসি খাবেন? লপসি?'

প্যাঁচা ঘুম-জড়ানো গলায় বলল-'স্বধর্মে নিধনং শ্রেঃয় পরধর্মো ভয়াবঃহ। সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ-'

যেই না বলা, অমনি 'ওরে অ ব্রজ, কোথা গেলি রে' বলতে বলতে ধত্তোগিন্নি একবার বেরিয়ে এসেই আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। তার একটু পরেই দু-হাতে চাবির গোছা উলটেপালটে লুফতে লুফতে বেরিয়ে এল ধত্তো-বেতাল ধরো-না ওরফে বেতোল। তার পেছন পেছন বিনুনি দোলাতে দোলাতে ক-ধাপ-খাবে-বল না, ওরফে বলনা।

বলনা বলল- 'এতোল বেতোল তামাক তেতোল মাছের ভেতর দেমাক চিতল

তার ভেতরে পেটি, ঝিনুক দিয়ে খুঁটি! তার ওপরে তেল

সরষে বাটা লঙ্কাকুচি, আটটার ট্রেন ফেল'

বেতোল বলল-'আটটার ট্রেন যদি ফেল হয় হোক না, বারোটার ট্রেনে যাব আমি যে-সে লোক না।

বুকনির জোরে চিঁড়ে ভেজাবই ভেজাব, টাকলামাকানে গাছ গজাবই গজাব, তাতেও যদি না হয়, তাহলে না-হয় কাল থেকে বোকনোর ঢাকনার টাকনা দিয়ে শুকনো শাকনা খেয়ে আপিস যাব,-ভারি তো আপিস নকলের কল, মাথাপেষা জাঁতা ফাইলের ফাইলেরিয়া-রাবিশ, তার জন্যে আবার-। ওসব বাজে কথা ছেড়ে একটা ছড়া দেখি কেমন পারিস, বেশ বুজে সুজে ছড়া।'

বলনা হাত নেড়ে নেড়ে বলল-

'মাছঝাল মজে ভালো কালোজিরে ফোড়নে, লজঝড় গাড়ি চড়ে কে কে যাবি বেড়ানে

একা একা বসে বসে কাঁদছিস কেন বউ, তার চেয়ে পড় বসে ঝভঞ নাজঝলৌ।

সত্যি হয় না তোর নিতি বকাঝকা এ, কী আছে জানি না বাপু মজঝিমনিকায়ে

ঠাকুমার ঝুলি পড়েছিস কিনা আগে বল কোনোদিন খাওয়াব না নইলে মরিচ ঝোল

কেয়ার ঝাড়ের আড়ে ন্যাজঝোলা পাখি ওই'-এই পর্যন্ত বলতেই, বেতোল, বাবুই, দাঁড়কাক, ফিঙে, চড়ুই সব একসঙ্গে কেয়ার ঝাড়ের দিকে ঘুরে তাকাল, ফিঙে 'ওই তো আমার বেশ হবে বউ' বলে লাফিয়ে উড়ল, আর বেতোলের বউ ইশবিশধানেরশিষ দোতলার কোণের ঘরের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল-

'ঠাকুঝঝি, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে টাকাটা কই?'

বলনা বলল- 'ঘুগনিদানা ঝালছোলা চিনেবাদাম ছালতোলা

বুড়ির মাথার পাকাচুল কুলপি মালাই টোপাকুল

মশলামুড়ি মুচমুচে-'

বউ বলল-'আর বলতে হবে না, দাঁড়াও যাচ্ছি।'

বলনা বলল-'দাদাও ছিল।'

বউ দুম করে জানলা বন্ধ করে দিয়ে আঁচলের ঝটকায় লক্ষ্মীর পেতলের থালা বাতাসাসুদ্ধ উলটে ফেলে ঝন ঝন গন গন হন হন শাশুড়ির কাছে চলল। বেতোল আস্তে আস্তে উঠে খুট করে খিড়কির শেকলটা তুলে দিয়ে বলনাকে বলল-আয় আমরা চোর চোর খেলি।

বলনা বলল-'চোর-চোর খেলবি তো গুনতে হবে না?'

বেতোল বলল-'এই তো গুনছি-উবু দশ কুড়ি তিরিশ চলি×শ

কেন বল ইলিশ মাছকে বল্লি হল্লিশ?

থামবাপু পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি যাই তো বাইরে কে কথা কয় দেখে আসি

পরে যাস নিরে নব্বুই! কিরে? শ -আরে বাবা কাতরাস কেন? আরও স'

বলনা বলল- 'কাতরাস কেবল কাতরাস গেলেই পারিস হাথরাস

যা চাস একটু হাতড়াস দেখে শুনে সাঁতরাস'

বেড়ার ওপাশ দিয়ে খড়ম খট খটাং করতে করতে যাচ্ছিল সাতকড়ি সাঁতরা, বলল- 'গুরুজনদের নিয়ে মশকরা হচ্ছে? কন্যা একেবারে যশস্করী, এই বয়সেই এই, পাশ করলে না জানি কী দাঁড়াবে।'

দাঁড়কাক বলল-'আর যাই দাঁড়াক, তুমি না দাঁড়ালেই হল।'

সাতকড়ি বলল-'কথার পৃষ্ঠে কাক ডাকল, লক্ষণ তো ভালো দেখি না। কার মুখ দেখে আজ গাত্রোত্থান করেছি?'

বাবুই বলল-'কার আবার? নিজের। নিজের ও মুখ নিজেই দেখছ টাকেতে লক্ষ্মীবিলাস মাখছ

'মন খুঁতখুঁতে চোখ কুতকুতে হঠাৎ দেখলে আঁৎকাবে ভূতে,

আমরা তো তবু দাঁড়িয়ে আছি।'

সাতকড়ি আপনমনে গজগজ করতে করতে পোস্টাপিসের দিকে চলে গেল। চড়ুই ফুরুৎ করে মগডালে উড়ে গিয়ে সাতকড়ির যাওয়া সবটা দেখে তারপর নামতে নামতে বলল-

'খাওয়া ফেলে আঁচালে, যাক বাবা বাঁচালে

ভয় হয় ঘুরে এসে ফিরে চাল না চালে'

দাঁড়কাক বলল-'ভগবান আছেন না?'

ফিঙে পেছন থেকে বলল-'আর ভগবান। হতভাগাদের কপালে ভগবান সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে ভাগবান।'

দাঁড়কাক চড়ুই বাবুই একসঙ্গে ঘুরে তাকিয়ে বলল-'ওমা, একি একা যে? বউ আনলে না?'

ফিঙে বলল-'তাহলে আর বলছি কী! পাত্তাই দিল না,

আমি যাওয়া মাত্তর বলে কিনা, 'ধুত্তোর

রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি তা ভাবলুম

শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে টুকু হাওয়া খাই

বাত্তুরে বুড়োগুলো তাতেও জ্বালাতে এল'

'আমিও তেমন গুরুর ছাত্তর না, ছেড়ে কথা কইবার পাত্তর নই, বললুম

'থত্থর গাল নেড়ে থুত্থুরে বুড়িগুলো

কী যে ছাই বকে যায়-'

বাবুই বলল-'সব্বোনাশ, করেছ কী?'

ফিঙে হকচকিয়ে বলল-'কেন? কী বলা উচিত ছিল?'

বাবুই বলল- 'বলা উচিত ছিল,

যেমন ডানটি তেমনি বাঁ-চোখ যেমন ডানাটি তেমনি পালক

মাথা ও তো নয়, বুদ্ধির সাজি হার মেনে যায় গাজি হাজি কাজি

কথার ছাঁদ কী! টান কী! সুর কী! উড়কি ধানের যেন রে মুড়কি

কোথায় বাড়ি গো? পরে হবেখন, মা-বাবা আছেন? কটি ভাইবোন?'

ফিঙে হাঁ করে রইল। দাঁড়কাক বলল-'আচ্ছা?'

চড়ুই বলল-'ঠিক ঠিক।' এমন সময় খিড়কির দরজা খটাং খট ঘটঘটাং করে বেজে উঠল, বলনা-বেতোল হাঁসঘরের দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল, আর সায় গিন্নি মাথায় ঝুঁটি হাতে বঁটি নাকে নথ-মস্ত-ফুটো কোমরে-আঁচলগুটো মুখে পান-চুনখয়েরি দু-কানে-ঝুমকোটেঁড়ি সিঁথিটাক-চওড়া-সিঁদুর-জোড়াভুরু-ধেড়ে ইঁদুর চোখ দুটো ধপ্পনাচন প্রাণটি গপ্পবাঁচন হেলতে দুলতে এগিয়ে এসে খুট করে শেকলটি খুলে দিয়ে একগাল হেসে-'বঁটিখানা ফেরত দিতে এলুম। কে বন্ধ করে রেখেছিল ভাই।'

ধত্তোগিন্নি ভাবখানা যেন দেখে-দেখেননি শুনে-শোনেননি মনে মনে নিজেকে বলিহারি বাহা বাহবা ধন্যি সাত-সাবাসি দিয়ে টাটকা-হাসি মুখ করে বললেন-'তোমার সিন্নি কটার সময় ভাই?'

সায়গিন্নি বললেন-'সেই সাতটায়। বলনাকে বউমাকে নিয়ে যাবেন সকাল সকাল।'

তারপর কানের কাছে মুখ এনে বললেন-'বউ কেমন হয়েছে?' ধত্তোগিন্নি বললেন-

'সে আর বলতে? সে আর বলতে? যেমনি কইতে তেমনি বলতে

দেখতে শুনতে নাচতে গাইতে-সাধ করে এটা কি সেটা চাইতে

সাজতে সাজাতে, মজাতে বাজাতে

রাঁধতে বাড়তে গড়তে ভাঙতে, কী যে বউ দিদি সে যদি জানতে

সাতে না পাঁচে না যাবার মুখে হাঁচে না

যে সে বললেই নাচে না

নেই চাল তো তেল চুকচুকে

হাঁটে আল তো রাঙা টুকটুকে

গালে টোল তো হাসি খুঁকখুঁকে

রেঁধে ছাড়া যা তা খায় না কেঁদে ছাড়া কথা কয় না

ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে বেঁধে আনতে বললে মেরে আনে

দিনভর বউ উচ্চস্বরে চ্যাটাং চ্যাটাং বাক্যি ঝাড়ে'

সায়গিন্নির চোখ আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছিল। শেষটা শুনে বললেন-'অ্যাঁ?'

ধত্তোগিন্নি বললেন-'দেখেছ কাণ্ড, কী বলতে কী বলেছি। শাশুড়ি দিনরাত বলতেন কিনা, শুনে শুনে মুখস্ত হয়ে গেছে, তাই ওই সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে আর কি। তা এবার ভাই তোমার জামাইয়ের কথা বলো।'

সায়গিন্নি বাঁ-হাতের ডিবেখানি খুলে একটি পান নিজে নিয়ে ধত্তোর হাতে একটি দিয়ে সিঁড়ির ধাপে বাগিয়ে বসে বললেন-'বেশ হয়েছে ভাই জামাইটি। ঠিক আর পাঁচজনের মতন।

'শীতকালেতে সুটবুটি গ্রীষ্মকালে ছটফটি

ট্যাক্সি করে আপিস যায়

না গিয়ে আর করবে কী? ভিড় বাসট্রাম যা কলকাতায়

আবোল তাবোল কাগজ পেলে আপন মনে বিল্লি আঁকে

মাস ফুরোতে-না-ফুরোতে এক-শো টাকা ব্যাঙ্কে রাখে

এদিকে-খুব ডিবেটি, হাতে লোফে চীন টিবেটই

কাজের কথা উঠলে কাশে ধরে পড়লে কাষ্ঠ হাসে'

ধত্তোগিন্নি বললেন, 'যাই ভাই পিকটা ফেলে আসি', বলে উঠে বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন-'বি তি কি চ্ছি রি।' তারপর ফিরে এসে বললেন-'তারপর?'

-'তারপর আর কী। ভালোই চলছিল, দু-হাতে তালি বাজাত না, চা না পেয়ে চেঁচাত না, ছুতো পেলেও প্যাঁচাত না, বাজে খরচ বাঁচাত, পাকা গণ্ডুষ কাঁচাত, খাওয়া জলেই আঁচাত-এই ইদানীং সবে ক-দিন হল বেচারা একটু মনমরা হয়ে রয়েছে।'

-'কেন-কী হল আবার?'

-'মেয়ের আমার পায়ের তলায় দু-ইঞ্চি লম্বা খুর গজিয়েছে। বাড়ির ভেতর যেমন তেমন, বাইরে বেরোলে জামাই আর পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। বড়ো মনকষ্টে আছে, বলছে একজোড়া রণপা কিনবে। তা ছাড়া-'

ধত্তোকত্তা বাড়ির ভেতর থেকে হেঁকে বললেন-কই গো কোথায় গেলে? রান্নাঘরে যে ইলিশে-তেঁতুলে-কিসমিসে একেবারে ইলতুৎমিস হয়ে আছে-'

ধত্তোগিন্নি বললেন-'দেখেছ ভাই কাণ্ড? একদম ভুলে বসে আছি। যাই আবার দেখি গে।'

সায়গিন্নি বললেন-'আমিও তাহলে উঠি। সিন্নির জোগাড় পড়ে রয়েছে।'

দু-জনে উঠে দু-দিকে চলে যেতেই কেয়ার ঝাড়ের আড়াল থেকে বেতোল বেরিয়ে এসে বলল-

'কেন? রান্নাঘরে আরও খানিকক্ষণ দাসরাজত্ব চালালেই তো হত।'

বলনা বলল-'হ্যাঁ দামোদরের কথাটা আধকপালে হয়ে রইল।'

তারপর একপাক ঘুরে নেচে নিয়ে বলল-

'দামোদরের জারিজুরি রোয়াকে বসে ডালপুরি

ডাল পুড়তে, হল বেলা ভাত খাও সে-ই দুপুর বেলা

তাতে পড়ল হাঁচি, ইঁকড়ি এলে বাপের বাড়ি কোঁদল ফুয়ে নাচি'

বলতে-না-বলতেই সায়েদের লাল ফটক দিয়ে ঠুন ঠুন করতে করতে একটি রিকশা ঢুকল, রিকশার পাদানিতে ইঁকড়ির বাদামি সুটকেশ, ছইয়ের তলায় ঘোমটা-মাথায়

গোমড়ামুখে ইঁকড়ি বসে, পেছন পেছন ছোকরা চাকর গদাই।

বলনা ছুটটে চলে গেল সায়বাড়ির দিকে, বেতোল একা একা দাঁড়িয়ে রইল। সব চুপচাপ দাঁড়কাক, ফিঙে, চড়ুই, বাবুই উড়ব উড়ব করছে, এমন সময়-

চোখ কুটুরে রাম-ঘেঁটুরে ময়লা ধুতি কে আর মেপে দেখতে গেছে নয়হাতি না কয়হাতি আধ ফতুয়া দু-কানছোঁয়া গোঁফওলা একটা লোক ধত্তোবাড়ির রেলিঙের গায় কাগজঝোলা সাইকেল ঠেসান দিতে দিতে হাঁক দিলে-টে লি গ্রা ম। তাই না শুনে যেই না সবাই বিটলে ব্যাঙা পটলি গবাই ছুট দিয়েছে পড়ি-কি-মরি, অমনি সেই ধাক্কায় পড় পড় খোড়ো-চাল না? ঝোড়ো বাংলাবাড়ির আশ দরজা পাশদরজা মুখদরজা, বুকদরজা, খিল জানলা নীল জানলা সব হুড়হাড় দুদ্দাড় খুলে গেল, আর ভেতর থেকে হাত ঝুমঝুম পাঝুমঝুম দু-হাতে দুই রুই কাতলা মুখ চিক চিক হাসি ফিকফিক আধা চাঁদার টিপ কপালে, ফোপরা পানের খিলি গালে, কামরাঙা ঠোঁট শামলা রং একমুখে রা সাতরকম ভাষুড়ে বুড়ি ছড়াই বুড়ি ওড়ফুলের মালা গলায় গাছমাটি জল-নাচছে ঝোলায় এককাঁখে বুড়ো আংলা আর কাঁখে পুরো বাংলা ঝুমুর ঝুমুর বেরিয়ে এসে চড়া গলায় ছড়া গলায় ছাড়া গলায় ডাক পাড়ল-'আর কতক্ষণ লাগাবি রে তোরা?

'আউল বাউল চালতা চাউল সাপ-খোপে জল জ্যান্ত নেউল

অন্নপূর্ণা ডাকে মায় বাছারা সব ঘরে আয়'

সবাই বলল-'আর একটুখানিস সবুর করো মা, এই হল বলে।'

বুড়ি তখন ওপর নীচ আগাপাশতলা সব একনজরে নেক নজরে দেখতে দেখতে যেই দাঁড়কাক দেখা অমনি একগাল হেসে বলল-'অ কালোমানিক, পেলি?'

কালোমানিক বলল-'না পেতে না পেতে পাচ্ছি মা, আবার পেতে পেতে যাচ্ছি না, তাই সাঁতরাচ্ছি হাতড়াচ্ছি আর কাতরাচ্ছি।'

তখন ওরা বলল-'ঃএ হে হাতড়াও? তুমি হাতুড়ে নাকি হে? ভালো চাও তো শিগ্রি ডিগ্রি বার করো বলছি, নইলে-'

কালোমানিক কিছু না বলে ডানার খাঁজ থেকে একটি চুকচুকে কুচকুচে পালক বের করে ফেলে দিল, ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল-

'হাতুড়ে নই তো আমি, আমি শুধু হাতড়াই একঘেঁয়ে জিবে-গজা চিনি-রসে ওখড়াই

(ফের চিনি, ফিরে চিনি, চিনে রস ওখড়াই) হাতুড়িটা নিয়ে করি স্যাকরার ঠুকঠুক

এগোতে এগোতে সারি সারিসারি ভুলচুক দেয়াল পাথর মাটি পলি সবি দাবড়াই

দুয়ে দুয়ে মিললেই চারে মাছ ধরলেই

কামারের এক ঘায় ত্রিভুবন ঘাবড়াই হাতুড়ে নই তো ভাই, আমি শুধু হাতড়াই।'

তবু যখন ওরা ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগল, তখন কালো কী আর করে একে ওকে তাকে নিজেকে সব্বাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল-

'ইতিহাসে কেন তুই গোল্লা পেলি খোকন? কী করব খোঁচালে যে বল্লালি বল্লম

বরং বাড়িয়ে দিই জাঁল্লার পাল্লা কী হবে বানিয়ে ভাই পেল্লাই কেল্লা?

এ বাড়ির বিল্লি কি কল্লে সে হল্লায় পাল×l না দিয়ে খাই এঁচোড়ের ডাঁল্লা

কমলার মধু খেতে আসবেই ভাল্লুক তাই বলে বল লোকে যাবে না কি তমলুক?

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই ভরা নদী পার করে মাল্লার স্বাস্থ্যই

জল্লাদ কুলে তুই পেল্লাদ বল্লি? নিবো দেখি দেশময় রাবণের চুল্লি?'

যেই না বলা অমনি দুম পটাস করে কাগজের ঠোঙাটা ফেটে গিয়ে তার ভেতর থেকে কিলবিল করে বেরিয়ে এল একতাল জট-পাকানো খুলবে-কেন-খুলবে-নাকি? খুলবে না-কি? হোক না-খুঁতো নোংরা সুতো। 'ওমা, ওই তো আমার গুলিসুতোর বল' বলতে বলতে রিদয় মার কাঁধ থেকে লাফিয়ে নেমে সেটাকে বগলদাবা করে দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। পেছন পেছন ছোট্ট হয়ে ঢুকে গেল বাকি সবাই, বাকি স-ব, মায় ওই আকাশখানা পর্যন্ত। আর সেই কুঁচ-পারা আকাশের ছুঁচ-পারা ফুটোয় ফালতো চোখখানি রেখে কালোমানিক মার কোল ঘেঁষে বসে বসে দেখতে লাগল ওপাশ থেকে শব্দ-টব্দ কিছু শোনা যায় কি না।

*শারদীয়া ১৩৭৪*



## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদা বলল, 'আজকাল আমি খুব হিস্ট্রি পড়ছি।'

আমরা বললুম, 'তাই নাকি।'

'যা একখানা বই হাতে পেয়েছি না, শুনলে তোদের চোখ কপালে উঠে যাবে।'

চুয়িং গামটাকে গালের আর একপাশে ঠেলে দিয়ে ক্যাবলা বলল, 'বইটার নাম কী, শুনি?'

টেনিদা 'হযবরল'র কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো গলায় বলল, 'ন্তোরিয়া দে মোগোরা পুঁদিচ্চেরি বোনানজা বাই সিলিনি কামুচ্চি।'

শুনে ক্যাবলার চশমাটা যেন এক লাফে নাকের নীচে ঝুলে গেল। হাবুল যেন 'আঁক' করে একটা শব্দ করল। আমি একটা বিষম খেলুম।

ক্যাবলাই সামলে নিয়ে বলল, 'কী বললে?'

'ন্তোরিয়া দে মোগোরা পুঁদিচ্চেরি-'

'থাক-থাক। এতেই যথেষ্ট। যতদূর বুঝছি দারুণ পুঁদিচ্চেরি।'

'আলবাত পুঁদিচ্চেরি। যাকে বাংলায় বলে ডেনজারাস। ল্যাটিন ভাষায় লেখা কিনা।'

কুঁচো চিংড়ির মতো মুখ করে হাবুল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার ল্যাটিন ভাষা শিখলা কবে? শুনি নাই তো কোনোদিন।'

খুশিতে টেনিদার নাকটা আট আনার সিঙাড়ার মতো ফুলে উঠল, 'নিজের গুণের কথা সব কি বলতে আছে রে। লজ্জা করে না? আমি আবার এ ব্যাপারে একটু-মানে- মেফিস্টোফিলিস-বাংলায় যাকে বলে বিনয়ী।'

ক্যাবলা বলল, 'ধেৎ! মেফিস্টোফিলিস মানে হল-'

টেনিদা বলল, 'চোপ!'

পশ্চিমে থাকার অভ্যেসটা ক্যাবলার এখনও যায়নি। মিইয়ে গিয়ে বলল, 'তব ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি।'

'হ্যাঁ-কোই বাত নেহি।'

এর মধ্যে হাবলা আমার কানে কানে বলছিল, 'ঃহ, ঘোড়ার ডিম-বিনয়ী না কচুর ঘণ্ট-' কিন্তু টেনিদার চোখ এড়াল না। বাঘা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হাবলা, হোয়াট সেয়িং? ইন প্যালাজ ইয়ার?'

‘কিচ্ছু না টেনিদা, কিচ্ছু না।’

‘কিচ্ছু না?’-টেনিদা বিকট ভেংচি কাটল একটা, ‘চালাকি পায়া হ্যায়? আমি তোকে চিনিনে? নিশ্চয় আমার বদনাম করছিলি। এক টাকার তেলেভাজা নিয়ে আয় এক্ষুনি।’

‘আমার কাছে পয়সা নাই।’

‘পয়সা নেই? ইয়ার্কি? ওই যে পকেট থেকে এক টাকার নোট উঁকি মারছে একখানা? গো-কুইক-ভেরি-কুইক-‘

তেলে ভাজা শেষ করে টেনিদা বলল, ‘দুঃখু করিসনি হাবলা, এই যে ব্রাহ্মণ ভোজন করালি, তাতে বিস্তর পুণ্যি হবে তোর। আর সেই ল্যাটিন বইটা থেকে এখন এমন একখানা গপ্পো বলব না, যে তোর এক টাকার তেলেভাজার ব্যথা বেমালুম ভুলে যাবি।’

মুখ গোঁজ করে হাবুল বলল, ‘হুঁ।’

ক্যাবলা বলল, ‘একটা কথা জিজ্ঞেস করব? হিস্টরির এমন চমৎকার বইখানা পাওয়া গেল কোথায়? ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নাকি?’

‘ছোঃ! এসব ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়? ভীষণ রেয়ার। দাম কত জানিস? পঞ্চাশ হাজার টাকা।’

‘অ্যাঁ:!’

ক্যাবলার চশমা লাফিয়ে আর একবার নেমে পড়ল। হাবুল কুট করে আমাকে চিমটি কাটল একটা, আমি চাটুজ্জেদের রোয়াক থেকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলুম।

ক্যাবলা বোধ হয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু টেনিদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ‘স্টপ। অল সাইলেন্ট। আচ্ছা, হ্যামলিন শহরের সেই বাঁশিওলার গল্পটা তোদের মনে আছে?’

‘নিশ্চয়-নিশ্চয়-‘ আমরা সাড়া দিলুম। সে গল্প আর কে না জানে! শহরে ভীষণ ইঁদুরের উৎপাত-বাঁশিওলা এসে তার জাদুকরা সুরে সব ইঁদুরকে নদীতে ডুবিয়ে মারল। শেষে শহরের লোকেরা যখন তার পাওনা টাকা দিতে চাইল না-তখন সে বাঁশির সুরে ভুলিয়ে সমস্ত বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল, কে জানে!

টেনিদা বলল, ‘চেঙ্গিস খাঁর নাম জানিস?’

‘কে না জানে! যা নিষ্ঠুর আর ভয়ংকর লোক!’

টেনিদা বলল, ‘চেঙ্গিস দেশে দেশে মানুষ মেরে বেড়াত কেন জানিস? হ্যামলিনের ওই বাঁশিওলাকে খুঁজে ফিরত সে। কোথাও পেত না, আর ততই চটে যেত, যাকে সামনে দেখত তারই গলা কুচ করে কেটে দিত।’

ক্যাবলা বলল, ‘এসব বুঝি ওই বইতে আছে?’

‘আছে বই কী। নইলে আমি বানিয়ে বলছি নাকি? তেমন স্বভাবই আমার নয়।’

আমরা এক বাক্যে বললুম, ‘না-না, কখনো নয়।’

টেনিদা খুশি হয়ে বলল, ‘তাহলে মন দিয়ে শুনে যা। এসব হিস্টরিক্যাল ব্যাপার, কোনো তক্কো করবিনে এ নিয়ে। এখন হয়েছে কী, আগে মোঙ্গলদের দেশে লোকের বিরাট বিরাট গোঁফ-দাড়ি গজাত। এমনকী, ছেলেপুলেরা জন্মাতই আধ হাত চাপদাড়ি আর চার ইঞ্চি গোঁফ নিয়ে।’

ক্যাবলা পুরোনো অভ্যেসে বলে ফেলল, ‘স্রেফ বাজে কথা। ওদের তো গোঁফ-দাড়ি হয়ই না বলতে গেলে।’

‘ইউ-চোপ রাও!’-টেনিদা চোখ পাকিয়ে বলল, ‘ফের ডিসটার্ব করবি তো-‘

আমি বললুম, ‘এক চড়ে তোর কান কানপুরে রওনা হবে।’

‘ইয়াহ-কারেকট।’-টেনিদা আমার পিঠ চাপড়ে দেবার আগেই আমি তার হাতের নাগালের বাইরে সরে গেলুম, ‘শুনে যা কেবল। সব হিস্টরি। দাড়ি আর গোঁফের জন্যেই মোঙ্গলরা ছিল বিখ্যাত। বারো হাত তেরো হাত করে লম্বা হত দাড়ি, গোঁফগুলো শরীরের দু-পাশ দিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে পড়ত। তখন যদি মঙ্গোলিয়ায় যেতিস না, তাহলে আর লোক দেখতে পেতিস না, খালি মনে হত চারদিকে কেবল গোঁফদাড়িই হেঁটে বেড়াচ্ছে। কী বিটকেল ব্যাপার বল দিকি?’

‘ওইরকম পেল্লায় দাড়ি নিয়ে হাঁটত কী করে?’-আমি ধাঁধায় পড়ে গেলুম।

‘করত কী, জানিস? দাড়িটাকে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক বস্তার মতো করে বেঁধে রাখত। আর গোঁফটা মাথার ওপর নিয়ে গিয়ে বেশ চূড়োর মতো করে পাকিয়ে-‘

হাবুল বলল, ‘খাইছে।’-বলেই আকাশজোড়া হাঁ করল একটা।

‘অমনভাবে হাঁ করবিনে হাবলা’-টেনিদা হাত বাড়িয়ে ঝপ করে হাবুলের মুখটা বন্ধ করে দিলে, ‘মুড নষ্ট হয়ে যায়। খোদ চেঙ্গিসের দাড়ি ছিল কত লম্বা, তা জানিস? আঠারো হাত। বারো হাত গোঁফ। যখন বেরুত তখন সাতজন লোক সঙ্গে সঙ্গে গোঁফদাড়ি বয়ে বেড়াত। বিলেতে রানি-টানিদের মস্ত মস্ত পোশাক যেমন করে সখীরা বয়ে নিয়ে যেত না? ঠিক সেইরকম।

‘আর দাড়ি-গোঁফের জন্যে মোঙ্গলদের কী অহংকার। তারা বলত, আমরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। এমন দাড়ি কোথাও খুঁজে পাবে নাকি তুমি, সকল দাড়ির রাজা সে যে-হুঁ হুঁ!

‘কিন্তু বুঝলি, সব সুখ কপালে সয় না। একদিন কোত্থেকে রাজ্যের ছারপোকার আমদানি হল কে, জানে! সে কী ছারপোকা, সাইজে বোধ হয় এক-একটা চটপটির মতন, আর সংখ্যায় কোটি কোটি অর্বুদ নির্বুদ! কোথায় লাগে হ্যামলিন শহরের ইঁদুর।

‘সেই ছারপোকা তো দাড়িতে ঢুকেছে, গোঁফে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। ছারপোকার জ্বালায় গোটা মঙ্গোলিয়া ইরে ব্বাস গেছিরে-খেয়ে ফেললেরে-বলে দাপাদাপি করতে লাগল। চারটে ধরা পড়ে-বাকি সব দাড়ির সেই বাঘু জঙ্গলে কোথায় লুকিয়ে যায়, কেউ আর তার নাগাল পায় না। আর স্বয়ং সম্রাট চেঙ্গিস। রাতে ঘুমুতে পারেন না-দিনে বসতে পারেন না- গেলুম গেলুম বলে রাতদিন লাফাচ্ছেন আর সঙ্গে লাফাচ্ছে দাড়ি ধরে থাকা সেই সাতটা লোক। গোটা মঙ্গোলিয়া যাকে বলে জেরবার হয়ে গেল।’

হাবুল বলল, ‘অত ঝঞ্ঝাটে কাম কী, দাড়ি গোঁফ কামাইয়া ফ্যালাইলেই তো চুইক্যা যায়।’

‘কে দাড়ি কামাবে? মঙ্গোলিয়ানরা? যা না, বলে আয় না একবার চেঙ্গিস খাঁকে!’ টেনিদা বিদ্রূপ করে বলল, ‘দাড়ি ওদের প্রেস্টিজ-গর্ব-বল না গিয়ে! এক কোপে মুণ্ডুটি নামিয়ে দেবে।’

হাবুল বলল, ‘থাউক, থাউক, আর কাম নাই।’

টেনিদা বলে চলল, 'হুঁ, খেয়াল থাকে যেন। যাই হোক এমন সময় একদিন সম্রাটের সভায় এসে হাজির হ্যামলিনের বাঁশিওলা। কিন্তু সভা আর কোথায়! দারুণ হট্টগোল সেখানে। পাত্র-মিত্র সেনাপতি-উজির-নাজির সব খালি লাফাচ্ছে, দাড়ি চুল ঝাড়ছে-দু-একটা ছারপোকা বেমক্কা মাটিতে পড়ে গেল, সবাই চেঁচিয়ে উঠল মার-মার-ওই যে-ওই যে-

'বাঁশিওলা করল কী, ঢুকেই পিঁ করে তার বাঁশিটা দিলে বাজিয়ে। আর বাঁশির কী ম্যাজিক-সঙ্গেসঙ্গে সভা স্তব্ধ! এমনকী দাড়ি গোঁফের ভেতর ছারপোকাগুলো পর্যন্ত কামড়ানো বন্ধ করে দিল।

'গম্ভীর গলায় বাঁশিওলা বলল, সম্রাট, তেমুজিন-''

'তেমুজিন আবার কোত্থেকে এল?'-আমি জানতে চাই।

ক্যাবলা বলল, 'ঠিক আছে। চেঙ্গিসের আসল নাম তেমুদিনই বটে।'

টেনিদা আমার মাথায় কটাং করে একটা গাঁট্টা মারায় আঁতকে উঠলুম।

'হিস্টরি থেকে বলছি, বুঝেছিস বুরবক কোথাকার! সব ফ্যাকটস! তোর মগজে তো কেবল ঘুঁটে-ক্যাবলা সমঝদার, ও জানে।'

হাবুল বলল, 'ছাড়ান দাও-ছাড়ান দাও-প্যালাডা পোলাপান।'

'এইসব পোলাপানকে পেলে চেঙ্গিস খাঁ একেবারে জলপান করে খেত। যত সব ইয়ে-!' একটু থেমে টেনিদা আবার শুরু করল, 'বাঁশিওলা বলল, সম্রাট তেমুজিন, আমি শহরের সব ছারপোকা এখুনি নির্মূল করে দিতে পারি। একটিরও চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু তার বদলে দশ হাজার মোহর দিতে হবে আমাকে।

'ছারপোকার কামড়ে তখন প্রাণ যায় যায়, দশ হাজার মোহর তো তুচ্ছ চেঙ্গিস বললেন, দশ হাজার মোহর কেন কেবল, পাঁচ হাজার ভেড়াও দেব তার সঙ্গে। তাড়াও দেখি ছারপোকা!

'বাঁশিওলা তখন মাঠের মাঝখানে মস্ত একটা আগুন জ্বালতে লাগল। আগুন যেই জ্বলে উঠল, সঙ্গেসঙ্গে সে পিঁ-পিঁ-পিঁ করে তার বাঁশিতে এক অদ্ভুত সুর বাজাতে আরম্ভ করল। আর-বললে বিশ্বাস করবিনে-শুরু হয়ে গেল এক তাজ্জব কাণ্ড। দাড়ি-গোঁফ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্বুদ-নির্বুদ ছারপোকা লাফিয়ে পড়ল মাটিতে-সবাই হাত-পা তুলে ট্যাঙ্গো-ট্যাঙ্গো জিঙ্গো-জিঙ্গো বলে সংকীর্তনের মতো গান গাইতে গাইতে'-

আমি আর থাকতে পারলুম না, 'ছারপোকা গান গায়!'

'চোপ'-টেনিদা, হাবুল আর ক্যাবলা একসঙ্গে আমাকে থামিয়ে দিল।

'তখন সারা দেশ ছারপোকাদের নাচে গানে ভরে গেল। চারদিক থেকে সব দাড়ি-গোঁফ থেকে, কোটি কোটি অর্বুদ-নির্বুদ ছারপোকা লাইন বেঁধে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে গিয়ে 'জয় পরমাতম' বলে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। ছারপোকা পোড়ার বিকট গন্ধে লোকের নাড়ি উলটে এল, নাকে দাড়ি চেপে বসে রইল সবাই।

'এক ঘণ্টার ভেতরেই মঙ্গোলিয়ার সব ছারপোকা ফিনিশ। সব দাড়ি, সব গোঁফ সাফ। কাউকে একটুও কামড়াচ্ছে না। চেঙ্গিস খোশ মেজাজে অর্ডার দিলেন, রাজ্যে মহোৎসব চলবে সাত দিন।

'বাঁশিওলা বলল, কিন্তু সম্রাট, আমার দশ হাজার মোহর? পাঁচ হাজার ভেড়া?



'আরে, দায় মিটে গেছে তখন, বয়ে গেছে চেঙ্গিসের টাকা দিতে। চেঙ্গিস বললেন, ইয়ার্কি? দশ হাজার মোহর, পাঁচ হাজার ভেড়া? খোয়াব দেখছিস নাকি? এই, দে তো লোকটাকে ছ-গণ্ডা পয়সা।

'বাঁশিওলা বললে, সম্রাট, টেক কেয়ার, কথার খেলাপ করবেন না। ফল তাহলে খুব ডেঞ্জারাস হবে।

'অ্যাঁ! এ যে ভয় দেখায়! চেঙ্গিস চটে বললেন, বেতমিজ, কার সঙ্গে কথা কইছিস, তা জানিস? এই-কোন হ্যায়-ইসকো কান দুটো কেটে দে তো।

'কিন্তু কে কার কান কাটে? হ্যামলিনের বাঁশিওলা তখন নতুন করে বাঁশিতে দিয়েছে ফুঁ। আর সঙ্গেসঙ্গে আকাশ অন্ধকার করে উঠল ঝড়ের কালো মেঘ। চারদিকে যেন মধ্যরাত্রি নেমে এল। হু-হু করে দামাল বাতাস বইল আর সেই বাতাসে-

'চড়াৎ-চড়াৎ-চড়াৎ-

'না, আকাশ জুড়ে মেঘ নয়-শুধু দাড়ি-গোঁফ। ঠোঁট থেকে, গাল থেকে চড়াং চড়াং করে সব উড়ে যেতে লাগল-জমাটবাঁধা দাড়ি-গোঁফের মেঘ আকাশ বেয়ে ছুটে চলল, আর সেই দাড়ির মেঘে, যেন গদির ওপর বসে, বাঁশি বাজাতে বাজাতে হ্যামলিনের বাঁশিওলাও উধাও।

'আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে সারা মঙ্গোলিয়া এ-ওর দিকে থ হয়ে চেয়ে রইল। জাতির গর্ব-দাড়ি গোঁফের প্রেস্টিজ-সব ফিনিশ! সব মুখ একেবারে নিখুঁত করে প্রায় কামানো, কারও কারও এখানে-ওখানে খাবলা খাবলা একটু টিকে রয়েছে এই যা। সর্বনেশে বাঁশি তাদের সর্বনাশ করে গেছে।

'রইল মহোৎসব, রইল সব। এক মাস ধরে তখন জাতীয় শোক। আর দাড়ি-গোঁফ সেই গেল, একবারেই গেল-মোঙ্গলদের সেই থেকে ওসব গজায় না, ওই দু-চারগাছা খাবলা খাবলা যা দেখতে পাস। হ্যামলিনের বাঁশিওলা-হুঁ হুঁ, তার সঙ্গে চালাকি!

'আর সেই রাত্রেই চেঙ্গিস মানুষ মারতে বেরিয়ে পড়ল। বাঁশিওয়ালাকে তো পায় না-কাজে কাজেই যাকে সামনে দেখে, তার মুণ্ডুটিই কচাৎ! বুঝলি-এ হল রিয়্যাল ইতিহাস-স্তোরিয়া দে মোগোরা পুঁদিচ্চেরি বোনানজা বাই সিলিনি কা মুচ্চি ফিফথ সেনচুরি বি-সি!'

টেনিদা থামল।

ক্যাবলা বিড়বিড় করে বলল, 'কী বললি, প্রেমেন মিত্তিরের ঘনা দা! কী যে বলিস! তাঁর পায়ের ধুলো একটু মাথায় নিতে পারলে বর্তে যেতুম রে।'




# ধীরেন্দ্রলাল ধর

সকাল বেলা। গোবিন্দ ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। এক ভদ্রমহিলা এসে ঢুকলেন, বললেন, 'আপনার নাম শুনে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমার একটা উপকার করুন।'

মহিলা সামনের চেয়ারখানিতে বসে পড়লেন। বললেন, 'আমার ছেলেটাকে নিয়ে বড়ো মুশকিলে পড়েছি। ভালো ছেলে, কাজকর্ম করছিল, হঠাৎ তার মাথায় সিনেমা ঢুকল। প্রায়ই রাতে বাড়ি ফেরে না, বলে সুটিং ছিল, পরদিন আপিস কামাই হয়ে যায়। কারখানার চাকরি, কর্তারা বলে দিয়েছেন-এভাবে কামাই করলে চাকরি থাকবে না। চাকরি গেলে, খাব কী? ওই টাকাটাই আমাদের একমাত্র সম্বল, আপনি যেভাবেই হোক, ছেলেটাকে রক্ষে করুন।'

গোবিন্দ বলল, 'আপনার ছেলে তো সাবালক, সে যদি নিজের নিজের ভালোমন্দ না বুঝে, ইচ্ছেমতো চলে তো আমি কী করতে পারি? তা ছাড়া এসব আমার কাজ নয়, আমি উকিল, ওকালতি করি, ফৌজদারি ব্যাপারে কোনো গোলমাল থাকলে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করি।'

'আমার ধারণা ছেলেটা কোনো কুসংসর্গে পড়েছে। কেননা আমি খবর পেয়েছি, যেদিন সুটিং বলে সে রাতে বাড়ি ফেরেনি সেদিন সে সুটিং-এ যায়নি, তার কোনো সুটিং সেদিন ছিল না। পর পর তিনবার আমি নিজে গিয়ে খবর নিয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলেও সে কিছু বলতে চায় না। চুপ করে থাকে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি সংশোধনের ব্যবস্থা করে দিন।'

'আপনার ছেলের বয়স একুশ বছর পার হয়ে গেছে, সে সাবালক, সে যদি নিজের ইচ্ছেমতো চলাফেরা করে, তাকে কিছুই বলার নেই। তবে সে যদি কোনো সময় বেআইনি কোনো কাজ করে বসে তখন পুলিশ তার সমাধানের ব্যবস্থা করবে, আমার এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই।'

'সে যখন কোনো বেআইনি কাজ করবে তখন তো পুলিশ ধরে তাকে জেলে দেবে, তখন তো করার কিছুই থাকবে না, তেমন কিছু যেন না করে সেইজন্যেই তো আপনার শরণ নিয়েছি, আপনি তাকে তার আগেই ধরে এনে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা করুন, আপনি তো অনেক লোকের উপকার করেন।'

গোবিন্দ মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে ক্ষণেক কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'আপনি আপনার ছেলের নাম ঠিকানা, আপিসের নাম ঠিকানা আমার কাছে রেখে যান। আমি সুবিধামতো খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করব, এই ধরনের ব্যাপারে কোনো সুরাহা হবে বলে আমার মনে হয় না।'

‘এই ঠিকানাতেই আপনি সব পাবেন,’ বলে মা একখানি চিঠি গোবিন্দের সামনে ধরে দিলেন। চিঠিখানি একখানা টাইপ করা পোস্ট-কার্ড। এক পাঞ্জাবি কারখানার ম্যানেজার বিশ্বনাথ নন্দীকে জানাচ্ছে যে এই মাসে প্রত্যেকটি শনিবার তার কামাই হয়েছে, এভাবে কামাই করলে কারখানায় কাজের ক্ষতি হয়, ভবিষ্যতে সে যেন সতর্ক হয়, নইলে কর্তৃপক্ষ তাকে ছাঁটাই করতে বাধ্য হবেন।

গোবিন্দ বিশ্বনাথ নন্দী ও কারখানাটির নাম ঠিকানা ডায়েরিতে লিখে নিয়ে চিঠিখানা মায়ের হাতে ফেরত দিল। মা বললেন, ‘আমি গরিব বিধবা, ওই আমার একমাত্র ছেলে, ওই আমার বুড়ো বয়সের ভরসা। আপনি আমার একটা সুরাহা করুন, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।’

মা চলে গেলেন, গোবিন্দ আবার খবরের কাগজে চোখ মেলল। এই ধরনের কত ছেলেই তো বাপ-মায়ের মুখের পানে না তাকিয়ে নিজের মনোমতো পথে চলে, বাপ-মায়ের কত দুঃখের কারণ হয় তাদের মন শোধরাবার কোনো রীতিই আজ অবধি বের হয়নি। গোবিন্দ আর কী করবে?

গোবিন্দ ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি। কয়েকটা দিন কেটে গেল। তারপর একদিন আবার সেই মহিলা এসে দেখা করলেন। বললেন, ‘আপনি হয়তো আবার অযথা ঘোরাফেরা করবেন তাই আপনাকে খবরটা জানিয়ে যাই। আমার ছেলে বিশ্বনাথ সম্পর্কে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। আমিই তার একটা ব্যবস্থা করেছি।’

মহিলা যা করেছেন, বললেন। কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ছেলের চাকরি তিনি বদল করে নিয়েছেন রানিগঞ্জে। খনি নিয়েই কোম্পানির কারবার সেখানে কোম্পানির এক আপিস আছে, কারখানাও আছে। বিশ্বনাথ সেই কারখানায় বদলি হয়েছে, আসছে সোমবার থেকে বিশ্বনাথ সেখানে চলে যাবে, মা-ও যাবে তার সঙ্গে। দূরে থাকলে এখানকার অসৎসঙ্গ আর থাকবে না।

‘আপনার সমস্যা আপনি নিজেই সমাধান করে নিয়েছেন, এ খুব আনন্দের কথা,’ বলে গোবিন্দ মাকে বিদায় দিল। যে ব্যাপারে সে মোটেই মাথা ঘামায়নি সে ব্যাপারে সংক্ষেপে সমাপ্তি ঘটাই ভালো।



কিন্তু বারো ঘণ্টার মধ্যেই সেই সংক্ষিপ্ত ব্যাপারই জটিল হয়ে উঠল। মা এসেছিল সকাল ন-টায়, ছেলে এল রাত ন-টায়।

আদালত থেকে ফিরে এসে একটা মামলার কী ভাবে জেরা করা চলে গোবিন্দ তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল, এমন সময় ধুতি পাঞ্জাবি পরনে এক যুবক এসে ঘরে ঢুকল। সামনের চেয়ারখানিতে বসে বলল, ‘আমার নাম বিশ্বনাথ নন্দী, আমি সর্দার ইঞ্জিনিয়ারিং

কোম্পানিতে কাজ করি। আমার মা আপনাকে ধরেছে, আপনি আমাকে এখান থেকে বদলি করার জন্য হুকুম বের করে দিয়েছেন। চাকরি বজায় রাখতে হলে সোমবার আমাকে রানিগঞ্জে চলে যেতে হবে। আমি কিন্তু রানিগঞ্জে যেতে চাই না, সেখানে খরচপত্র এখানকার চেয়ে অনেক বেশি, আমি চালাতে পারব না। আপনি একবার গিয়ে ম্যানেজারকে বলে এই অর্ডারটা কাটিয়ে দিয়ে আসুন। আমি সেই কথাটাই আপনাকে বলতে এলাম।'

গোবিন্দ বিরক্ত হল, বলল, 'তোমার কারখানা বা তার ম্যানেজার কাউকেই আমি চিনি না, তুমি এখানে থাকো বা বদলি হও তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।'

'আপনি এখন অস্বীকার করলেও আমি জানি, আমার মা আপনাকে ধরে এই সব করিয়েছে। আমি তাই আপনাকে বলতে এসেছি, যদি আমাকে রানিগঞ্জে যেতে হয়, তাহলে আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'তোমার সঙ্গে বাজে বকার অবসর আমার নেই তুমি এখন যেতে পার।'

'ভালো কথা, তাহলে আমার সঙ্গে আপনি রানিগঞ্জে যাচ্ছেন, সেজন্য তৈরি থাকবেন।'

বিশ্বনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার আচরণে এমন একটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেল যা গোবিন্দের ভালো লাগল না। তবে ফৌজদারি আদালতের উকিল হয়ে গুন্ডা-বদমায়েসদের ঔদ্ধত্য যে ইতিপূর্বে অনেক দেখেছে, সে ভয় পেল না। তবে ব্যাপারটা পুলিশে একটু জানিয়ে রাখা ভালো মনে করে সে থানায় টেলিফোন করল।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুধীরবাবু পরিচিত মানুষ, সব শুনে বললেন, 'সোমবারের মধ্যে রানিগঞ্জে নিয়ে যাবে বলে যখন ভয় দেখিয়েছে, তখন দুটো দিন একটু সাবধানে থাকুন। শনিবার রাত তো কেটে যাবে কাল রবিবার আর বাড়ি থেকে বেরুবেন না। আজকালকার ছেলেছোকরারা বেপরোয়া হয়ে গেছে, কখন কী করে কিছু বলা যায় না। যদি বলেন তো আমি একদিনের জন্য একটা লোককে আপনার বাড়ির সামনে মোতায়েন করে রাখতে পারি, কোনো হুজ্জুত করে কেউ সরে পড়তে পারবে না।'

'না, লোকের দরকার হবে না।'

'যাক, রাতে সাবধানে থাকুন, কখন কী হয় ঠিক নেই, আপনার জানালা দিয়ে একটা কিছু ছুড়ে মেরে গেল, তখন ঘরে আগুন ধরে যাবে। হাসপাতালে ছুটতে হবে। গুন্ডা-বদমায়েসদের পিছনে লেগেছ, দু-এক চোট খাবে না তা কি হয়? অবশ্য চোট খাবার পরে তখন আমরা তদন্ত করব, তখন তুমি আমাদের আইনের আওতায় এসে গেলে। কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা না ঘটলে তো পুলিশ কিছু করতে পারে না।'

'ছোকরাকে দেখে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হল, অতটা সাহস করবে বলে মনে হয় না।'

'আজকাল পাড়ায় পাড়ায় ভদ্র গুন্ডা দেখা দিয়েছে। দিশি ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরে পকেট মারতে বেরোয় টেরিলিন-টেরিকটের সুট পরে বোমা ছোড়ে। পোশাক দেখে মানুষ চেনা এখন শক্ত। যাক, তোমার সম্পর্কে একটা দুশ্চিন্তা রইল, কাল সকাল আটটার পরে একটা ফোনে জানব কেমনভাবে রাত কাটল।'

সুধীরবাবু ফোন ছেড়ে দিল, গোবিন্দ আবার মামলার জেরার মুসাবিদা করতে লেগে গেল।

রাত কেটে গেল নির্বিবাদে। সকালও কাটল। আহারাদির পর রবিবার দুপুরে গোবিন্দ খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। বিকালের দিকে যায় ময়দানে হাওয়া খেতে। ঘুম থেকে উঠে খান চারেক বিস্কুট ও এক কাপ কফি খেয়ে সে বেরোবার উদ্যোগ করছে এমন সময় এক ছোকরা এসে ঘরে ঢুকল, বলল, 'আপনার নাম কি গোবিন্দবাবু?'

গোবিন্দ মাথা নাড়তেই ছোকরা গরগর করে বলে গেল, 'এইমাত্র একটা দুর্ঘটনা হয়েছে, ট্রামে ঝুলে এক ছোকরা যাচ্ছিল পাশ থেকে বাস ধাক্কা মারায় সে অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যায় আমি তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছি। ছোকরার হাতে হাতঘড়ি, পকেটে পেন ও মানিব্যাগ ছিল, আমি সে সব সঙ্গে নিয়ে এসেছি, মানিব্যাগে একখানা কাগজে আপনার নাম ঠিকানা ছিল, আপনাকে খবর দিতে এলাম। এসব আপনি রাখুন।' হাতঘড়ি, পেন, মানিব্যাগ টেবিলের উপর রাখল, বলল, 'এখনই যান, আজকালকার হাসপাতালে জানেন তো তদ্বির না করলে কোনো ব্যবস্থাই হবে না।'

গোবিন্দ অবাক হল, বলল, 'তার নাম কী জান?'

'নাম বলবে কে? তার তো জ্ঞান নেই।'

'বয়স কত?'

'বছর কুড়ি-পঁচিশ।'

'তার এই ব্যাগের মধ্যে আমার নাম ঠিকানা লেখা কাগজ ছিল?'

'তাই তো দেখুন না-'

একখানি সাধারণ চিরকুটে গোবিন্দবাবুর নাম ঠিকানা লেখা। তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

গোবিন্দ মানিব্যাগটা খুলল, বারোটা টাকা ও খুচরো কিছু পয়সা ছাড়া কিছুই নেই।

পঁচিশ বছরের যুবক কোনো আত্মীয়ের কথা গোবিন্দ মনে করতে পারল না। বলল, 'একবার মানুষটিকে তো দেখতে হয়।'

'ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে এমার্জেন্সি ওয়ার্ড!'

'আমি তো মানুষটাকে চিনি না, তুমি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।'

'চলুন।'

মানিব্যাগ, পেন, হাতঘড়ি একটি ফোলিও ব্যাগে ভরে নিয়ে গোবিন্দ বেরিয়ে পড়ল। সামনেই ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে দু-জনে উঠে পড়ল।

কিছুটা গিয়ে ট্যাক্সি থামল এক পেট্রোলের দোকানে। পেট্রোল ভরছে এমন সময় একজন মিস্ত্রি উঠে পড়ল, গাড়িতে বসল তার পাশে। গোবিন্দ বলল, 'এ কী?'

মিস্ত্রিটি কিন্তুভাবে বলল, 'আমি ওই মোড়েই নেমে যাব। একটা পার্টস ফেলে এসেছি।'

কালিঝুলি মাখা মানুষটির পাশে গোবিন্দ একটু সংকুচিত হয়ে বসল।

একটা মোড় পার হয়ে ট্যাক্সি দ্বিতীয় মোড়ও ছাড়িয়ে গেল, মিস্ত্রির নামবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

গোবিন্দ বলল, 'কী, তুমি তো নামলে না?'

'তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে নামব,' বলে মিস্ত্রি হাসল।

গোবিন্দ দেখল তার হাতে একখানি ধারালো ছোরা।

লোকটি বলল, 'ভালো ছেলের মতো মুখ বুজে চলো।'

গোবিন্দ সঙ্গী ছোকরাটির মুখের পানে তাকাল, সে পাশে বসেছিল।

ছোকরাটি তার হাত থেকে ফোলিও ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আমার নিজের জিনিসগুলো, এবার আমি নিজের কাছেই রাখি।'

গোবিন্দ বলল, 'এ তাহলে একটা ষড়যন্ত্র!'

ওরা বলল, 'ষড় মানে তো ছয়, আমাদের যন্ত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি মেম্বর আছে। আপনি শতযন্ত্র বলতে পারেন।'

গোবিন্দ গুম হয়ে গেল, এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ঠিক হয়নি, এখন কী করে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, সেই হল চিন্তা।

মোটর বরাবর এল উলটোডাঙ্গা স্টেশনের কাছে। ফাঁকা মাঠের উপর পর পর অনেকগুলি সরকারি বাড়ি তৈরি হচ্ছে। চারিপাশে ইট কাঠ চুন সুরকির স্তূপ। সেইখানে মোটর থামল, লোক দু-টি সেখানে গোবিন্দকে নামাল, বলল, 'কোনোরকম গোলমাল করলেই ছুরি খেতে হবে, মুখ বুঝে চলো।'

একটা বাড়ির একটি তলা সম্পূর্ণ হয়েছিল এরা তিনজন তার মধ্যে ঢুকল। সন্ধ্যা হতে তখন বিশেষ দেরি নেই।

দুটো ছেলে লবণ হ্রদ দেখে ফিরছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এদিকটায় আলো নেই, ফাঁকা মাঠের উপর বরাবর রাস্তা গেছে মানিকতলার দিকে, দু-বন্ধু সেই আবছা অন্ধকারে গল্প করতে করতে ফিরছিল। তাদের নজরে পড়ল, একটা নতুন বাড়ির সামনে মোটর থামল, তিনজন লোক নামল, মোটর চলে গেল। বাড়িটার কাছে যখন এল তখন সেই নির্মীয়মান বাড়ির মধ্যে কোথাও কোনো মানুষ তাদের নজরে পড়ল না। দেবু উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, 'আশ্চর্য, তিনটে মানুষ এই সময় এই বাড়ির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হল বল দিকি? ট্যাক্সি চলে গেল, বাড়িতে থাকার মতো জায়গা নেই, কোথাও কোনো আলো নেই, এ যেন এক রহস্য বলে মনে হচ্ছে। একটু দেখে যেতে হয়।'

দেবুর সঙ্গী নীরু বলল, 'হয়তো মদ চোলাইয়ের একটা আড্ডা হয়েছে এখানে।'

দেবু। 'একটু দেখে যেতে হবে।'

নীরু। 'গুন্ডাদের হাতে পড়লে কিন্তু মুশকিল বাধবে।'

দেবু। 'কীসের মুশকিল, এত ভাঙা ইট পড়ে আছে কী জন্য? কোনো ব্যাটাকে কাছে ঘেঁষতে দেব না। ক্রিকেট খেলায় অনেক বল দিয়েছি, এক-একখানি ইট তাগ করে ঝাড়ব, এক এক ব্যাটা ঘুরে পড়ে যাবে।'

দু-জনে বাড়িটার দিকে এগোল।

নতুন বাড়িটার আগাগোড়াই একতলার গাঁথুনি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, ছাদও ঢালাই করা হয়েছে, জানলা দরজার পাল্লা বসানো বাকি। বাঁশের ভারা পাশ কাটিয়ে ছেলে দু-টি খোলা জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে লাগল। অন্ধকারে কোথাও কোনো সাড়া নেই। লোক তিনটে হাওয়ায় মিশে গেল নাকি?

নীরুর মনটা ছমছম করে উঠল, বলল, 'দরকার নেই, ফিরে চল।'

দেবু বলল, 'এ পাড়াগাঁয়ের শ্মশান নয় যে ভূতের ভয় করব, ব্যাপারটা না দেখে যাচ্ছি না। যতক্ষণ হাতের কাছে এই ইট আছে ততক্ষণ আমার কোনো ভয় নেই, এ দিশি গোলা!'

দেবুর সাহস বেশি, কোনো একসময় সে একখানি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, ফিসফিস করে বলল, 'আয় ওদিকে আলো দেখা যাচ্ছে।'

পিছন দিকের একটা ঘরে বাতি জ্বলছিল, অতি মৃদু তার আলো। সেই আলোয় জানলার এক ধাপের উপর বসে, এক বয়স্ক লোক। সামনে গোবিন্দকে ধরে দাঁড়িয়েছিল দু-জন সহযাত্রী। বয়স্ক লোকটি বেশ মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বলছিল, 'তুমি উকিল হয়ে শখের গোয়েন্দাগিরি শুরু করে অনেক অনেক ক্ষতি করেছ, ক-বার তুমি সহজে পার হয়ে গেছ বলে মনে করেছ এই ভাবেই চলবে, তা চলবে না। তোমার জন্য বিশ্বনাথকে চাকরি ছাড়তে হচ্ছে, রানিগঞ্জে গেলে তার চলবে না, আমরাও এখান থেকে তাকে ছেড়ে দিতে পারছি না। এখন তাহলে তার চলবে কীসে? একটা দোকান-পাট করে তাকে বসতে হবে। একখানা দোকান ভাড়া নিতে তার দু-হাজার টাকা সেলামি দিতে হবে, সে টাকা তুমি এখনই তাকে দেবে, তারপর একমাস পরে তুমি তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে মালপত্তর কেনার জন্য।'

গোবিন্দ বলল, 'আমি তার চাকরি-বাকরির ব্যাপার কিছুই জানি না, আমাকে অনর্থক দায়ী করা হচ্ছে।'

বয়স্ক বলল, 'ওসব আজেবাজে কোনো কথা আমি শুনব না। আমার লোক তোমার সঙ্গে যাবে, বাড়ি পৌঁছেই তুমি দু-হাজার টাকার চেক লিখে দেবে। কোনো চালাকি করার চেষ্টা করলে আজ রাত্রেই তোমাকে আমরা শেষ করব।'

'সে যা করতে হয় করো, টাকা আমি দেব না। আর আমাকে খুন করে তোমরা রেহাই পাবে না, পুলিশে সব কথা জানানো আছে।'

'পুলিশ কিছুই করতে পারবে না, তোমার হাত মুখ বেঁধে রাত দুপুরে খালের জলে ফেলে দেব। মাত্র সাত হাজার টাকার জন্য জলে ডুবে মরাটা যুক্তিযুক্ত কি না, তুমি ভেবে দেখো। বাঁচলে তুমি অনেক সাত হাজার উপায় করতে পারবে।'

'আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই।'

'বেশ! তাহলে ওর হাত-পা মুখ বেঁধে এখানে ফেলে রাখ, রাত দুপুরে সাফ করে দিবি।'

একজন বলল, 'দড়ি?'

'দড়ির অভাব? এই বাঁশের ভারা থেকে খুলে দিচ্ছি,' বলে বয়স্ক লোকটি বাইরে বেরিয়ে এল।

বাঁশের ভারা থেকে সে দড়ি খুলছে, এমন সময় দেবু তাগ করে একখানি আধলা ইট ছুড়ল। দম করে ইটখানা পিঠে পড়তেই সে গঁক করে মুখ থুবড়ে পড়ল। ভিতর থেকে সাড়া এল, 'কী হল?'

'একেবারে জখম হয়ে গেছি রে, ভারার উপর ইট ছিল, পিঠে পড়েছে উঠে দাঁড়াতে পারছি না।'

বয়স্ক লোকটি কোনোমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'তুই দেখ, আমি দেখে আসি,' বলে ঘরের ভিতর থেকে মিস্ত্রি ছোকরা বেরিয়ে এল। সে এসে দাঁড়াতেই দেবুর হাতের আরেকখানি ইট এসে পড়ল তার পিঠে। 'বাপস' বলে সে সেইখানেই বসে পড়ল। ভিতর থেকে সাড়া এল, 'তোর আবার কী হল?'

'কোন শালা আশপাশ থেকে ইট ছুড়ছে রে!'

'আশপাশ থেকে ইট ছুড়ছে?'

দুম করে খোলা জানলা থেকে ঘরের মধ্যে একখানা ইট এসে পড়ল। ঘরের ভিতরে ছোকরা চমকে উঠল। গোবিন্দ ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুট দিল।

ছোকরা পিছনে তেড়ে আসতেই ইট বৃষ্টি শুরু হল। কয়েকটা ইট ছোকরার গায়ে লাগল। ছোকরা থমকে দাঁড়াল। গোবিন্দ শশকের মতো ক্ষিপ্রপদে, ইট কাঠ ডিঙিয়ে লাফিয়ে এসে পড়ল সামনের ফাঁকা মাঠে। পিছু পিছু এসে পড়ল দেবু ও নীরু।

তিনজনে এসে উঠল উলটোডাঙ্গা স্টেশনে।

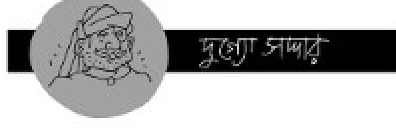
তারপরের ব্যাপার খুব সাধারণ। গোবিন্দ সেখান থেকে লালবাজারে ফোন করল। পুলিশ ভ্যান এল আধঘণ্টা পরে। সুধীরবাবু পুলিশ নিয়ে বাড়িগুলো তল্লাশ করলেন কিন্তু কাউকেই পেলেন না। অবশ্য ধরা পড়বার জন্য ইচ্ছা করে সেখানে ততক্ষণ কেউ বসে থাকবে এমন কথা নয়।

দেবু ও নীরুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গোবিন্দবাবু বাড়ি ফিরল, দশ মিনিটের মধ্যে টেলিফোন এল, 'আপনি বাড়ি ফিরেছেন দেখলাম। বিশ্বনাথের টাকাটার কথা মনে রাখবেন। আপনার কাছ থেকে টাকাটা না পেলে ও কারবার শুরু করতে পারছে না। টাকাটা আপনি হাতে রাখবেন। ও গেলেই যেন পায়। মনে রাখবেন-এক পৌষেই শীত যায় না।'

গোবিন্দ কিছু বলতে চাইছিল, ওদিকের বক্তা তার আগেই লাইন কেটে দিয়েছে।

গোবিন্দ হাসল, বুঝল-এই দলটি তাকে সহজে ছাড়বে না। সাবধান হতে হবে।

*শারদীয়া ১৩৭৭*




# শিবশঙ্কর মিত্র

'সদ্দার! বনটা যেন বড্ড গরম লাগছে!'

'রাখো তোমার গরম! কাটব তো ঝরার পাশের গোলপাতা। চিলতে-পানা গোলঝাড়, তা ছাড়া লাও কোলের কাছেই! অত নরম গরমের হিসেব কীসে!'

সদ্দারের চোটপাটি কথায় লজ্জা পেয়ে হোক বা বনের মাঝে বাকবিতণ্ডার অনিচ্ছায় হোক সবাই কাজে মন দেয়।

গল্প আর প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরবনের বনচারীরা বনের গভীরে এলেই তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে ওঠে। চারিদিকে জীবনের সহজ স্পন্দন পেলেই ওদের মনও সায় দেয়-না, তেমন কিছু অঘটন ঘটবার আশঙ্কা নেই। বনের পাতার ছাতার নীচে ঝিরঝিরে বাতাসে বিচ্ছিন্ন পাতা ডগা একটু-আধটু দুলবে। হরিণের কিছু-না-কিছু সাড়া পাওয়া যাবে দূর থেকে। নতুন নতুন দু-একটা পাখির ডাকও শোনা যাবে। এক-আধটা সাপও দেখা যাবে এখানে-ওখানে। এক-আধটা গো-সাপও ওঠা-নামা করবে ছোটো খালে ও ঝরায়। আর সর্বোপরি বানরের লাফালাফি ও কিচিরমিচির তো শান্ত বনের মূর্ত প্রতীক বলা যেতে পারে। এমনি ধারা সুন্দরবনের সহজ আবহাওয়া ব্যাহত হলেই বনচারী আবাদি মানুষের মন সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। অনুভূতি আসে-বন গরম। কেননা, সুন্দরবনের রাজার একবার আগমন হলে বনের সে অঞ্চলে যেন সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। নিঃশব্দ পদচারণে চুপিসারে এলেও তার আগমন বার্তা যেন কানে কানে পৌঁছে যায় সমস্ত জীব, পাখি ও গাছগাছড়ার কাছে। তা না হলে এমন হবে কেন!

তবু দুর্গা সর্দার কিছুই তোয়াক্কা করতে চায় না। দীর্ঘকায় সবল দেহ। নাম দুর্গা সর্দার; পেলব পলিমাটির মানুষ অমন দুর্দান্ত নামকে সহজ করে নিয়ে ডাকে 'দুগ্যো সদ্দার'। কৃষ্ণবর্ণের মাংসপিণ্ডগুলি যেন ফুলে ফুলে উঠেছে তার দেহে। দেখলেই মনে হবে অসীম শক্তিধর। অমন বিশাল এবং তাগড়া দেহের মানুষেরা সাধারণত স্থবির হয়। কিন্তু সদ্দার তার বিপরীত। কেমন করে সে যে অত চটপটে হয়েছে, তা ভাবাই দায়।

তাহলেও সে কিন্তু দলের নেতা নয়। দলের নেতা কালীপদ। দল বলতে তিনজন। তৃতীয় জন সবের আলি। এমনি ধরনের ছোটো ছোটো পঁচিশ-ত্রিশটি দল এক-একটি বড়ো ডিঙি নিয়ে একত্রে বহর বানিয়ে এসেছে সুন্দরবনের পশ্চিমাঞ্চলে হরিভূষণ বনে। সবাই এসেছে গোলপাতা কাটতে। বনের কোনো কোনো নীচু ও নরম চাতারে, কখনো বা ঝরার পাড় ঘেঁষে গোল গাছের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কোনো কাণ্ড নেই বললেই চলে; সোজা মাটি থেকে ঝাঁক বেঁধে নারকোল গাছের মতো সুদীর্ঘ পাতা ঊর্ধ্বে উঠে চারদিকে নুইয়ে মাথা নীচু করে দেয় খানিকটা ফোটা ফুলের পাপড়ির মতো। নারকোল গাছের পাতার মতো দেখতে হলেও গোল পাতা কিন্তু তেমন করকরে নয়। পাতা, কাঠি ও ডগাও খুবই

নরম, পেলব ও মসৃণ। অমন কমনীয় হলে কী হবে, অত্যন্ত তেজি-আর কোনো গাছ ও গাছড়াকে ওর চাতারের ত্রিসীমানায় হতে দেবে না কিছুতেই। একটানা বিস্তীর্ণ গোল ঝাড়ে ঘন সন্নিবিষ্ট সবুজের ওপর ঈষৎ লালাভ বিনম্র পাতাগুলি ঝিরঝিরে হাওয়ায় যখন দুলতে থাকে, তখন সুন্দরবনের সৌন্দর্য যেন ফেটে পড়ে।

সৌন্দর্য ফেটে পড়ে বটে, কিন্তু গোলঝাড় সুন্দরবনের অন্যতম বিভীষিকা। শিকারের জন্য নরখাদক গোলঝাড়ের আড়ালে ওত পাততে আসে না। আসে নিশ্চিন্তে বিশ্রামের জন্য। মাটি স্পর্শ না করে নরম ডগাগুলি চেপে তার ওপর শুতে ওরা ভালোই বাসে। তার চেয়েও বড়ো কথা, এই ধরনের ঝাড়ে কারও পক্ষে বিনা শব্দে অনুপ্রবেশ করা দায়। ঝাড়ের গভীরে নিশ্চিন্তে যখন নরখাদক ঘুমোয় তখন দক্ষ শিকারির পক্ষেও নিঃসাড়ে এগিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করা দুরূহ। দুরূহতর করবার জন্যই বোধ হয় নরখাদক বিশ্রামের জন্য বিস্তৃত গোল-ঝাড়ই বেছে নেয়। এ কথা জানা ছিল বলেই দুগ্যো সদ্দার চিলতে-পানা ঝাড় দেখে অমন বেপরোয়া কথাবার্তা বলছিল।

ভোর সকাল থেকে তিনজনে কাজে লেগেছে। হু-হু করে পাতা কেটে চলেছে। ভারী পুরুষ্টু ঝাড়! ভালো দাম পাবার আনন্দে ওরা মাতোয়া। এত লম্বা যে একটা করে পাতার চাপান দিলে বুঝি চাষিবাড়ির কুঁড়েঘরের ঘর ও বারান্দার ছাউনি একই সঙ্গে হয়ে যাবে।

গোলপাতা আহরণে জনের হিসাবে কমপক্ষে তিনজন লাগে। একজন উবু হয়ে এক-একটা পাতার ডগা ধরে মাটির কাছাকাছি কোপ মেরে কাটতে থাকে। তার হাত থেকে প্রায় লুফে নিয়ে দ্বিতীয়জন সঙ্গেসঙ্গে দায়ের সুতীক্ষ্ণ মাথাটা আলগোছে ডগার মাঝে বসিয়ে একটানে গোটা ডগাটা দ্বিখণ্ডিত করে চিরে ফেলে। দ্বিখণ্ডিত হতে-না-হতে তৃতীয়জন পাশাপাশি দু-টি পাইলে দুটি খণ্ডকে সাজাতে থাকে।

তালে তালে যেন কাজ এগিয়ে চলেছে। তিনজনের হাতে তিনখানি পাতা-কাটা দা-মাথা বাঁকা ক্ষুরধার কাটারি। এমন ধার যে গোলের ডগা ছুঁতে-না-ছুঁতেই দ্বিখণ্ড হয়ে যায়। এই মাথা-ভারী সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র যখন হাতের মুঠোয় আঠার মতো লেগে থাকে তখন বনচারীদের মনে হয়, এ যেন কোনো অস্ত্র নয়, তাদের অঙ্গেরই অঙ্গ বুঝি। দুগ্যো সদ্দারের তো কথাই নেই; তার দীর্ঘায়ত আঙুলের বজ্র বেষ্টনীতে পিষ্ট ওই অস্ত্রের হাতলে তার দেহের সর্বশক্তি চালনা করতে এতটুকুও আয়াস করতে হয় না। বন্দুক মনের জোর বাড়ায় বটে, কিন্তু তার অনেক হুজ্জুত-তাকে কাঁধে তুলতে হবে, তার ঘোড়া চাপতে হবে, নিরিখ করতে হবে ট্রিগার টিপতে হবে-তবেই তার মারণ অস্ত্র নির্গত হবে। কিন্তু গোলপাতা কাটার দা যখন হাতের মুঠোয় জমে থাকে, তখন মানুষের হাত যেমন আত্মরক্ষায় সহসা উদ্যত হয়, তেমনি এই অস্ত্রও হানবার জন্য অস্ত্রধারীর কোনো চিন্তা-ভাবনার আবশ্যক হয় না।

দুগ্যো সদ্দার পাতা-কাটার কাজে দ্বিতীয় জনের দায়িত্ব পালন করছে। বিরাট দেহখানা প্রায় সোজা রেখেই দাঁড়িয়ে পাতার ডগা বিদীর্ণ করে চলেছে তড়িৎ গতিতে ও একমনে। প্রথম জনের কাজের দায়িত্বে নেতা কালীপদ উবু হয়ে ঝাড়ের মধ্যে প্রায় ডুবে গিয়ে পাতা কাটছে। দলের নেতারাই এই কাজের দায়িত্ব নেয়। এদেরই সবচেয়ে বিপদ। পেছনটা থাকে উঁচু হয়ে আর মাথা থাকে ঝোপের মধ্যে নামানো। এমন সুযোগ ছাড়বে কেন নরখাদক! ঝাঁপিয়ে পড়ে কোমরে দাঁত বসিয়ে সোজা মুখে তুলে একটানে নিয়ে চলে যায়। তৃতীয়জনের দায়িত্ব সবের আলির-একটু দূরে সে খণ্ডিত পাতাগুলি দু-ভাগে পাইল করছে। ঠিকমতো থাকে থাকে রাখবার জন্য ডগাগুলি উঁচু-নীচু করে নাড়াচাড়া করতেই হচ্ছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, সে তার চারপাশে যেন অনবরত লাঠি ঘোরাচ্ছে।

যতই না একমনে কাজ করুক, শঙ্কা যে ওদের মনে ছিল না তা নয়। কিন্তু তা নিবদ্ধ ছিল গোলঝাড়কে নিয়ে। ফাঁকেফুকে ওরা সেদিকেই নজর রাখে। দেখে, দূরে ঝাড়ের কোনো পাতা অস্বাভাবিক ভাবে কেঁপে ওঠে কি না!

ঝাড় আজ ওদের বিপদ আনে না। দুগ্যো সদ্দারের পেছনে ছিল একটু ফাঁকা 'চাতার'। সেই পথেই এল বিপদ।

এল দানবীয় হুংকারে। নরখাদক উদ্যত থাবা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সদ্দারের কাঁধ লক্ষ করে। দুর্দান্ত শক্তিধর থাবার আঘাতে আর তীক্ষ্ণ নখের দংশনে ধরাশায়ী করতে চায় তার শিকারকে।

সচকিত হয়ে দুগ্যো সদ্দারের ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার অবকাশ হয় না। তার চোখের কোণে এক ঝলকে প্রতিবিম্বিত হয়ে শুধু বিস্ফারিত থাবার শ্বেতাভ বক্র নখগুলি আর রক্তাভ গহ্বরের সামনে হিংস্রতায় উজ্জ্বল দু-টি বিশাল দাঁত। উড়ন্ত নরখাদকের আর কোনো কিছুই তার চোখে প্রতিবিম্বিত হয় না-না তার আক্রোশে উদ্বেলিত স্ফীতকায় দেহ, না তার উগ্রতায় অগ্নিসম চোখ, বা তার ঊর্ধ্বমুখী কম্পিত লেজ।

দুগ্যো সদ্দার আর দুগ্যো সদ্দার নেই-নেহাতই হিংস্রতম জীবের লব্ধ শিকার। মৃত্যুর মুখগহ্বর থেকে বাঁচবার তাগিদেই মাথাটা ডান পাশে হেলিয়ে বাঁ-হাতের কনুই উঁচু করেছে। গোলপাতা ধরে রাখতে হাতখানা ভাঁজ করা ছিল। ভাঁজ খুলে সটান হাতে শত্রুর রোখকে রুখবার অবকাশ হয়নি। বিপদকে আড়াল দিতে ভাঁজ করা কনুই উঁচু হয়েছে যেন আপনা থেকেই।

নরখাদকের থাবা পড়েছে বাঁ-হাতের বাহুর ওপর। দৃঢ় মাংসপেশিগুলিতে যেন অতি সহজে বসে গেল থাবার বিস্ফারিত নখগুলি। তবু দাঁড়িয়েই ছিল শক্তিমান দুগ্যো সদ্দার, বাঘকেও তেমনি দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে দু-পায়ের ভরে।

ঝাঁপিয়ে পড়ার বেগ স্তব্ধ হতেই নরখাদক তার বিস্ফারিত মুখ-ব্যাদানকে আরও বিস্ফারিত করে সদ্দারের মাথাটাকে এক কামড়ে ধরবার জন্য গলা বাড়িয়েছে।

দুগ্যো সদ্দার বুঝি আবার দুগ্যো সদ্দার হয়ে ওঠে! ডান হাতের মুঠোতে ছিল পাতা-কাটা দা। অমন কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাতে সজোরে দায়ের আঘাত হানা দুরূহ ছিল, মুহূর্তের অবকাশও বোধ হয় তার জন্য ছিল না। আগুয়ান করাল মুখগহ্বরে সোজা দাখানা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আত্মরক্ষার সর্বশক্তি জড়ো করে সজোরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। লব্ধ শিকারের হাতখানাকে মুখের মধ্যে পেয়েছে ভেবে নরখাদক করকর করে কামড়ে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। সঙ্গেসঙ্গে দুগ্যো সদ্দার প্রাণপণে দাখানাকে মোচড় দিয়ে 'ঘুলিয়ে' দেয়। ক্ষতবিক্ষত মুখ গহ্বর। দিশাহারা হয়ে বাঘ আরও সজোরে কামড়ে ধরে; সদ্দারও তার শেষ অস্ত্র হাতছাড়া হবার ভয়ে প্রাণপণে হাতের মুঠোয় হাতল চেপে ধরেছে। যন্ত্রণা নিশ্চয় এবার অসহ্য। রক্তধারাও গাল বেয়ে ঝরতে আরম্ভ করেছে। বিদ্ধ নখাগ্রে সদ্দারের বাহুর মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যন্ত্রণাকাতর নরখাদক মাটিতে নেমে পড়ল আর সেই সঙ্গে বুঝি গোলপাতার ডগার চেয়েও নরম মাংসে বিদ্ধ দায়ের অগ্রভাগ গোটা জিঘাংসু জিহ্বা চিরে বেরিয়ে এল।

মাটিতে থাবা নামিয়েই নরখাদক মুখ নীচু করে মাটিতে প্রায় ঘষতে ঘষতেই ছুটে গেল অনেকখানি। এমনভাবে সুন্দরবনের হিংস্রতম জীবকে সরে পড়তে কেউই কখনো দেখেনি। তবু টানা ছুটে পালায় না। কিছুদূর এগিয়ে দুগ্যো সদ্দারের দিকে তাকায় আর বারবার থাবাখানা মুখের ধারে এনেও স্পর্শ করতে যেন সাহস পায় না। সেও বুঝি কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

দলের অন্য দু-জন হকচকিয়ে এতক্ষণ জায়গায় দাঁড়িয়ে দায়ের আস্ফালন করে প্রাণপণে চিৎকার করছিল। চিৎকারে আশেপাশের অন্যান্য দলগুলি একত্রে হইচই করে ছুটে এসেছে। দুগ্যো সদ্দার রোখের মাথায় রক্তাক্ত দাখানি উদ্যত করে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ-হাতের নখ-দংশন থেকে তারও গা বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

বাঘ দূরে বসে হুংকার দেবার চেষ্টা করেছিল কি না বোঝা যায় না। বিদীর্ণ জিহ্বায় সে-ক্ষমতা বোধ হয় লুপ্ত। ছিন্নমস্তার মতো নিজের রক্ত নিজেই পান করতে করতে অবশেষে ছুটে পালাল।

* * * *

দুগ্যো সদ্দার আজও এই অভিজ্ঞতার কথা গল্প করে রাঙিয়ে রসিয়ে। কিন্তু প্রতিবারই গল্পের শেষে তার পাটাতনের মতো বুকে হাত বোলাতে বোলাতে ভক্তের মতো বলে, 'জানো! শেষবেশ বাঘ অমন জব্দ হল কেন? মা বনবিবি ওকে নিশ্চয় সেদিন ও তল্লাটে ছেড়ে যেতে বলেছিলেন। মা-র কথা মানেনি, অমান্য করেছে। তাইতে তো অমন হল!'

ভক্তের মতো দুগ্যো সদ্দার অমন কথা বলে বটে, কিন্তু তার বনে যাবার বিরাম নেই। কত কাজে আর কত বার যে সে তারপর বনে উঠেছে, তার ইয়ত্তা নেই-কখনো মাছ ধরতে কখনো বা গোলপাতা কাটতে, কখনো বা মধু কাটতে। আর প্রতিবারই সে তার সযত্নে রক্ষিত সেই দাখানা সঙ্গে নিতে ভুল করে না, কখনো না!

*শারদীয়া ১৩৮০*






## শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

মুকুন্দরাম ছিল দাদাদের ক্রিকেট টিমের ভীষণ মেজাজি ক্যাপ্টেন। ওর তাড়নায় খেলার মাঠে গল্পগুজব করবার উপায় ছিল না। ও বলত ম্যাচের দিনে মাঠে নেবে খেলার সময় বল ফসকে যাওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে অন্যমনস্কতা। নেট প্র্যাকটিসে ব্যাট করবার সময়ও এধার-ওধার তাকালে তার কাছে প্লেয়ারদের ধমক খেতে হত। ম্যাচের দিনে বেজায় গম্ভীর হয়ে যেত। ভাবখানা যেন মরণ-বাঁচন যুদ্ধের সেনাপতি। যতক্ষণ না খেলায় জিত হচ্ছে কেউ তার মুখে হাসি দেখত না। আর হার হলে সে সারা সপ্তাহ মনমরা হয়ে থাকত।

আমি তখন স্কুলে পড়ি। বয়সের অনুপাতে দেখতে বড়ো ছিলাম বলে দাদাদের ক্লাবে তরুণ সভ্যদের মধ্যে ভিড়ে যেতাম। প্র্যাকটিসের সময় দূরে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং বা বড়ো জোর বল করতে পেতাম, ব্যাট করার সৌভাগ্য হয়নি কোনোদিন। ম্যাচ খেলায় চান্স পাওয়া ছিল স্বপ্নমাত্র।

একবার একটা বড়ো ম্যাচ। খেলার দিন মাঠে গিয়ে দেখি মুকুন্দরাম পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। শুনলাম শেষ মুহূর্তে খবর এসেছে যে দু-জন খেলোয়াড় আগের রাত্রে বিয়ের ভোজ খেয়ে অসুস্থ। আসতে পারবে কি না সন্দেহ। আমার সাদা প্যান্ট পরা ছিল বলে ক্যাপ্টেনের সামনে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম যদি ফিল্ডিংয়ে বদলি হিসেবে সুনজরে পড়ি।

টসে জিতে মুকুন্দরামের মনে একটু ভরসা এল। সে বিপক্ষ দলকে ব্যাট করতে পাঠাবে মনস্থ করে আমাকে জুতো বদল করে আসতে নির্দেশ দিয়ে বলল, ‘ফজল মহম্মদ আসা পর্যন্ত সাবস্টিট্যুট খাট।’

আমি তো সেইটুকু সৌভাগ্যেই কৃতার্থ। বুঝলাম প্র্যাকটিসের সময় বেগার খাটা বৃথা হয়নি।

বিপক্ষ দল দুই উইকেট হারিয়ে নব্বই রান তুলে ফেলল। মুকুন্দরামের মেজাজ তিরিক্ষি। পরপর দুটো বাই বাউন্ড্রি হয়ে যেতে উইকেট রক্ষক জোর ধমক খেল। ম্যাটিংয়ের নীচে এক জায়গায় কিছু একটা ছিল যে জন্যে এক-একটা বল গড়াচ্ছিল বা লাফাচ্ছিল। একটা ফাস্ট বল হঠাৎ লাফাতেই উইকেট কিপারের ভুরু কেটে রক্তারক্তি। তার বদলে আর কেউ উইকেটের পিছনে দাঁড়াতে রাজি হচ্ছে না দেখে আমি ভরসা করে ক্যাপ্টেনকে জানালাম যে স্কুলের টিমে আমি নিয়মিত উইকেট কিপিং করে থাকি! মুকুন্দরাম নিজের টিমের খেলোয়াড়দের ওপর চটে থাকবে। বলে ফেলল, ‘শাবাশ, দেখো হুশিয়ারসে-‘। যা আশা করেছিলাম তাই হল। ও ভুলেই গিয়ে থাকবে যে এবার আমাকে

বাধ্য হয়ে ব্যাটিং করতে দিতে হবে। উইকেট কিপারের সাবস্টিট্যুট হয় না। প্যাড গ্লাভস পরিয়ে দিল পাঁচজনে। মন্দ বল আটকালাম না। একটা ক্যাচও ধরলাম।

ওরা ঘণ্টা তিনেক খেলে ৯ উইকেটে ২১৫ রান তুলল। তারপর লাঞ্চ। দু-জন বদলির একজন তো ভাগ্যগুণে কায়েমি হয়ে গেল। বিরতির পর মুকুন্দের খামখেয়ালে দশজন ফিল্ডিং করতে লাগলাম।

আমাদের দলে মুকুন্দ আর আবদুল মজিদ ছিল সেঞ্চুরি ব্যাটসম্যান। তা ছাড়া আরও তিন-চারজন মোটামুটি ভালো ব্যাট করে। যে দু-জন আসতে পারেনি তাদের একজন ভালো মারিয়ে খেলোয়াড়। অন্যজন বোলার। একদিনের খেলাতে সে এখন না এলেও চলে।

যাই হোক লাঞ্চের পর ওরা ২১৭ রানে আউট হয়ে গেল। এমন কিছু বেশি রান নয়। কিন্তু মুকুন্দরাম আর ক্লাবের অন্য চাঁইরা দুশ্চিন্তায় পড়ল কারণ ব্যাট চালানেওয়ালা তো ওই নয় জন। আমি ধর্তব্যের মধ্যে পড়ি না। আর অসুস্থ ভালো ব্যাটসমানের কোনো খবর নেই।

এরা কেউ জানে না আমি মোম্বাসায় থাকতে স্কুলের টিমের হয়ে সব চেয়ে বেশি রান তুলতাম। বাবা নাইরোবিতে বদলি হয়ে আসা পর্যন্ত আমি খেলা দেখাবার সুযোগ পাইনি।

সেদিন ঘণ্টা খানেক খেলার পর সকলের মুখ চুন হয়ে গেল। মুকুন্দরাম ও মজিদ দু-জনেই আউট। বোর্ডে রান সংখ্যা চার উইকেটে মাত্র সত্তর। মুকুন্দ দশ নম্বরে আমার নাম লিখে তার সাইকেলটায় চড়ে ফজল মহম্মদকে তুলে আনতে গেল। নব্বুই রানে সাত উইকেট। আমি প্যাড পরলাম। তখনও মুকুন্দরামের দেখা নাই। গুজব শুনলাম ক্লাবের সেক্রেটারি মুলজিভাইর কাছে খবর এসেছে যে সে নাকি মোহন সিং নামে একজন শিখ মিলিটারি ঘোড়ার ডাক্তারকে পাঠাচ্ছে। ভালো ব্যাট করে। সে আমার আগে ব্যাট করতে নামবে। ততক্ষণ যেন কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখা হয়। আট উইকেটে হল এক-শো দশ। আমি মাঠে নামবার সময় দেখি উল্কা বেগে একটা সাইকেল আসছে। আরোহীর পরনে সাদা প্যান্ট, মাথায় পাগড়ি। পা চালিয়ে ক্রিজে গিয়ে তাড়াতাড়ি গার্ড নিলাম।

ওভারের বাকি বলের দুটোকে ঠেকিয়ে তৃতীয়টিকে লেটকাট করে বাউন্ড্রির বাইরে পাঠিয়ে দিলাম এবং শেষ বলটাকে লাফাতে দেখে হুক করে চার রান। আমার এই হঠকারিতায় ভিন্ন দিকের ব্যাটসম্যানের চক্ষু তো ছানাবড়া। বোধকরি তারই জোরে সে পরের ওভারের প্রথম বলটাই উঁচু ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিল। আমি দিক বদল করে নিলাম।

দেখি একজন দাড়িওয়ালা অচেনা শিখ ব্যাট হাতে একটু খুঁড়িয়ে হেঁটে ক্রিজে আসছে কিন্তু কোনো রানার নেয়নি। আর একটা মাত্র উইকেট বাকি। ফিল্ডাররা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। ফাস্ট বোলারকে সরিয়ে ওদের স্পিন বোলারকে আনা হল। আমি এগিয়ে সোজা ড্রাইভ করে প্রথম বলটাকে বাউন্ড্রির বাইরে পাঠিয়ে দিতে হর্ষধ্বনি উঠল। কিন্তু নবাগত শিখ খেলোয়াড় সে মার তারিফ না করে এগিয়ে এসে বলল, 'স্টেডি'। হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। একটা ঝাঁজালো গন্ধ নাকে এল। মদ খেয়ে এসেছে নাকি? তা ছাড়া চোখে-মুখে যেন কর্তৃত্বের ভাব।

ওকে অগ্রাহ্য করে লেগ গ্লান্স আর লেটকাট মেরেও আরও ছয় রান করে স্কয়্যার বাউন্ড্রির দিকে একটা উঁচু ক্যাচ তুলে দিলাম। সৌভাগ্যবশত সেখানে ফিল্ডার ছিল না। অনায়াসে তিনটে রান হয়ে যেত কিন্তু সর্দারজি দুটোর বেশি নিল না। বুঝলাম যে পরের ওভারটা সে নিজে খেলবার মতলবে আছে। ওদের ফিল্ডাররা নতুন লোককে নার্ভাস করে

দেবার মতলবে কাছাকাছি ঘিরে দাঁড়াল। খোঁড়া লোকের ফুট-ওয়ার্ক দেখে আমি অবাক হলাম। লাফ দিয়ে এসে প্রথম বলটাকে ব্রেকের মুখে উড়িয়ে ফেলল প্যাভিলিয়ানের মাথায়। পরের মার কভার ড্রাইভ বুলেটের গতিতে। তখনও হার অবশ্যম্ভাবী কিন্তু প্যাভিলিয়ান যেন উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল। ভাবলাম তাড়ু হিটার-দু-চারবার লম্ফঝম্পের পর তে-কাঠি ছত্রাকারে ফাঁক হয়ে যাবে। এদিক চড়চড় করে রান উঠছে দেখে বিপক্ষদলের ক্যাপ্টেন মরিয়া হয়ে নিজের হাতে বল তুলে নিল। সে ওভারে সর্দারজি আরও গোটা দুই বাউন্ড্রি মেরে শেষের বলটাকে ফাইন লেগে ঘুরিয়ে দিয়ে একটা রান নেবার মতলবে ছিল, কিন্তু আমি গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে তার পায়ে ব্যথা। সে যেন দাঁত খিঁচিয়ে কী বলল। আমি কোনো গ্রাহ্য না করে নিজের মতো খেলে গেলাম। সে ওভারে দশ রান বাড়ল। তারপর সর্দারজির পালা। আমি তার খেলার কায়দা দেখে মুগ্ধ। পায়ের আঘাত ভুলে সে নেচে নেচে প্রতিটি বলকে ফিল্ডারদের ব্যূহ ভেদ করে বাউন্ড্রি পার করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। পাঁচ বলে বারো রান করে শর্ট রান নিয়ে আমার দিকে আসতে চাইল। কিন্তু আমি নট নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু-নাথিং। বললাম, ‘নো রিস্ক’। ও আমার মুণ্ডুপাত করছে বলে মনে হল। রান ক্রমে বাড়তে বাড়তে এক-শো আশির কোঠায় উঠে যেতে আমাদের ক্লাবের কর্তা ব্যক্তিদের বোধ করি নার্ভাস ব্রেক ডাউন হবার উপক্রম হয়েছিল কারণ দূর থেকে দেখতে পেলাম ছেলে ছোকরাদের লাফালাফি চেঁচামেচি করতে বারণ করা হচ্ছে।

বিপক্ষদল রান বাঁচাবার চেষ্টায় ফিল্ডারদের দূরে দূরে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার মারে তেমন জোর নেই দেখে একজন বোলার লোপ্পা লোপ্পা লেগ ব্রেক ফেলতে শুরু করল। প্রথম দুটো ছেড়ে দিয়ে তৃতীয়টাকে শর্ট পিচ দেখে ঘুরিয়ে দিলাম স্কয়্যার লেগে। ব্যাটের ঠিক জায়গায় লাগেনি। দেখি বল আকাশে উড়ছে আর সর্দারজি একেবারে আমার নাকের ডগায় এসে গর্জন ছাড়ছে, ‘রান রান-বুড়বাক, হি মে মিস ইট।’ সে আমাকে একরকম টেনে তার নিজের উইকেটে পাঠিয়ে দিল। তারপরেই তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলটা ফিল্ডারের আঙুল বাঁচিয়ে বাউন্ড্রির ওপারে গিয়ে পড়ল। বড়ো মাঠে সেই আমার প্রথম ছক্কা। ক্রস করে ফিরে আসবার সময় সর্দারজি আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘নো মোর হিটিং-ওয়ান বাই ওয়ান।’

বললাম, ‘তোমার পা-‘

ও বলল, ‘ভুল যাও-‘ এরপর দুই দুই করে চার রান করলাম। সর্দারজির দান এলে সে একটার পর একটা গড়ানে বাউন্ড্রি মেরে মেরে এক ওভারে ষোলো রান তুলে দিল। প্যাভিলিয়ান তখন নিস্তব্ধ। উত্তেজনায় আশঙ্কায় আমারও শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছে। মাত্র ছ-টা রান বাকি। ফিল্ডাররা আবার কাছে এগিয়ে এল। আমি তড়পে লাফ দিয়ে লেগে ঘোরাতে গিয়ে মিস করে ক্রিজ থেকে বেরিয়ে যেতে দশজনের কণ্ঠে নির্ঘোষ শুনলাম ‘হাউস দ্যাট-‘ দেখি উইকেট ভাঙা। লজ্জায় ক্ষোভে মাটিতে মিশে যেতে চাইলাম। সর্দারজি দেখি উত্তেজনায় এক খামচা দাড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে আর অবাক হয়ে দূরে তাকিয়ে আছে। তার পিছনের আম্পায়ার দেখি বাই বাউন্ড্রির সিগনাল দিচ্ছে। আরও দেখি সর্দারজি ছেঁড়া দাড়িধরা মুঠোটা পকেটে পুরল। আর ভুল করিনি। শ্রেষ্ঠ মার হল কভার ড্রাইভ।

এলোমেলো নানা কথার মধ্যে মনে পড়ে সর্দারজি আনন্দের চোটে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তার মুখে মদের গন্ধ ছাড়া লক্ষ করেছিলাম বুকময় ছেঁড়া দাড়ি।

জয়ের উল্লাস ও হুল্লোড়ের মধ্যে কখন মোহন সিং সরে পড়ল এবং মুকুন্দরাম হাজির হল কেউ খেয়াল করেনি। মুকুন্দরামকে বলতে শুনলাম যে, সে ফজলের জন্যে ডাক্তার ডাকতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছিল, তারপর হেঁটে আসে। সাইকেলটাকে নাকি মোহন সিংয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

আমি কিন্তু ড্রেসিংরুমে জুতো বদলাবার সময় দেখতে পাই মুকুন্দরামের কিটব্যাগ থেকে একটা হালকা নীল রঙের পাগড়ি উঁকি মারছে। ব্যাগ ফাঁক করে দেখি ভিতরে একরাশ ছেঁড়া চুল তাই থেকে ভুরভুরে মদের গন্ধ বার হচ্ছে।

সর্দারজিকে আর কখনো দেখিনি। সে নাকি সেই রাতেই সুদূর উত্তরে সোমালি প্রদেশে চলে যায়।

সেই গন্ধটা কিন্তু মদের নয়। পরে জেনেছিলাম মেক-আপ স্পিরিট গামের ওইরকম উগ্র গন্ধ হয়।

*বৈশাখ ১৩৮১*




## সত্যজিৎ রায়

হাসিমারায় বন্ধুর বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসে অসমঞ্জবাবুর একটা অনেকদিনের শখ মিটল। ভবানীপুরের মোহিনীমোহন রোডে দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকেন অসমঞ্জবাবু। লাজপত রায় পোস্ট অফিসের রেজিস্ট্রি বিভাগে কাজ করেন তিনি; কাজের জায়গা তাঁর বাড়ি থেকে সাত মিনিটের হাঁটা পথ, তাই ট্রাম-বাসের ঝক্কি পোয়াতে হয় না। এমনিতে দিব্যি চলে যায়, কারণ যেসব মানুষ জীবনে কী হল না কী পেল না এই ভেবেই মুখ বেজার করে বসে থাকে, অসমঞ্জবাবু তাদের দলে পড়েন না। তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট। মাসে দুটো হিন্দি ছবি, একটা বাংলা যাত্রা বা থিয়েটার, হপ্তায় দু-দিন মাছ আর চার প্যাকেট উইলস সিগারেট হলেই তাঁর চলে যায়। তবে তিনি একা মানুষ, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও বিশেষ নেই, তাই অনেক সময় মনে হয়েছে একটা কুকুর থাকলে বেশ হত। তাঁর বাড়ির দুটো বাড়ি পশ্চিমে তালুকদারদের যে বিশাল অ্যালসেশিয়ানটা আছে, সেরকম কুকুর না হলেও চলে; এমনি একটা সাধারণ কুকুর, যেটা তাঁকে সকাল-সন্ধ্যে সঙ্গ দেবে, তাঁর তক্তপোশের পাশে মেঝেতে গা এলিয়ে পড়ে থাকবে, তিনি আপিস থেকে ফিরলে পরে লেজ নেড়ে আহ্লাদ প্রকাশ করবে, তাঁর আদেশ মেনে তার বুদ্ধি আর আনুগত্যের পরিচয় দেবে। কুকুরকে তিনি ইংরেজিতে আদেশ করবেন এটাও অসমঞ্জবাবুর একটা শখ। 'স্ট্যান্ড আপ' 'সিট ডাউন' 'শেক হ্যান্ড' এসব বললে যদি কুকুর মানে তাহলে বেশ হবে। কুকুর জাতটাকে সাহেবের জাত বলে ভাবতে অসমঞ্জবাবুর বেশ ভালো লাগে, আর উনি হবেন সেই সাহেবের মালিক-মানে হিজ মাস্টার আর কি।

মেঘলা দিন, সকাল থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, অসমঞ্জবাবু ছাতা ছাড়াই হাসিমারার বাজারে গিয়েছিলেন কমলালেবু কিনতে। বাজারের এক প্রান্তে একটা বেঁটে কুল গাছের পাশে বেতের টোকা মাথায় ভুটানি লোকটাকে দেখতে পেলেন তিনি। তিন আঙুলে একটা জ্বলন্ত চুটা ধরে পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে তাঁরই দিকে চেয়ে কেন যে মিটিমিটি হাসছে লোকটা সেটা বুঝতে না পারলেও, কৌতূহলবশে তিনি লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিখিরি কি? পোশাক দেখে সেটা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়, প্যান্ট আর গায়ের জামাটার অন্তত পাঁচ জায়গায় তাপ্পি লক্ষ করলেন অসমঞ্জবাবু। কিন্তু ভিক্ষের পাত্র বা ঝুলি বলে কিছু নেই; তার বদলে আছে একটা জুতোর বাক্স, আর সেই বাক্স থেকে উঁকি মারছে একটা বাদামি রঙের কুকুরছানা।

'গুড মর্নিং!' চোখ বন্ধ করা হাসি হেসে বলল ভুটানি। উত্তরে অসমঞ্জবাবুও 'গুড মর্নিং' না বলে পারলেন না।

'বাই ডগ? ডগ বাই? ভেরি গুড ডগ।'

কুকুরছানাটাকে বাক্স থেকে বার করে মাটিতে রেখেছে ভুটানি। 'ভেরি চিপ। ভেরি গুড। হ্যাপি ডগ।'

কুকুরছানাটা গা ঝাড়া দিল, বোধ হয় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার দরুণ। তারপর অসমঞ্জবাবুর দিকে চেয়ে তার দেড় ইঞ্চি লম্বা লেজটা বার কয়েক নেড়ে দিল। বেশ কুকুর তো!

অসমঞ্জবাবু এগিয়ে গিয়ে কুকুরটার সামনে বসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। কুকুরটা দু-পা এগিয়ে এসে তার ছোট্ট জিভটা বার করে, অসমঞ্জবাবুর বুড়ো আঙুলের ডগাটায় একটা মৃদু চাটা দিয়ে দিল। বেশ কুকুর। যাকে বলে ফ্রেন্ডলি।

'কেতনা দাম? হাউ মাচ?'

'টেন রুপিজ।'

সাড়ে সাতে রফা হল। অসমঞ্জবাবু জুতোর বাক্স সমেত কুকুরছানাটাকে নিয়ে বগলদাবা করে বাড়িমুখো হলেন। কমলালেবুর কথাটা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন।

হাসিমারা স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী বিজয় রাহা তাঁর বন্ধুর এই শখটার কথা জানতেন না। তাই তাঁর হাতে জুতোর বাক্স এবং বাক্সের মধ্যে কুকুরছানা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন বই কী; কিন্তু দামটা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'নেড়ি কুত্তাই যদি কেনার ছিল তা সে এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কী ভাই? এ জিনিস তোমার ভবানীপুরে পেতে না?'

না, ভবানীপুরে পেতেন না। অসমঞ্জবাবু সেটা জানেন। তাঁর বাড়ির সামনে রাস্তায় অনেক সময় অনেক কুকুরছানা দেখেছেন তিনি। তারা কখনো তাঁকে দেখে লেজ নাড়েনি বা প্রথম আলাপেই তাঁর বুড়ো আঙুল চেটে দেয়নি। বিজয় যাই বলুক-এ কুকুরের একটা বিশেষত্ব আছে। তবে নেড়ি কুত্তা জেনে অসমঞ্জবাবু খানিকটা আক্ষেপ প্রকাশ করাতে বিজয়বাবু তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, জাত কুকুরের ঝক্কি পোয়ানো অসমঞ্জবাবুর পক্ষে সম্ভব হত না। 'তোর কোনো আইডিয়া আছে একটা জাত কুকুরের কত ঝামেলা? মাসে মাসে ডাক্তারের খরচায় তোর অর্ধেক মাইনে বেরিয়ে যেত। এ কুকুরকে নিয়ে তোর কোনো চিন্তা নেই। আর এর জন্য কোনো স্পেশাল ডায়েটেরও দরকার নেই। তুই যা খাস তাই খাবে। তবে মাছটা দিসনি, ওটা বেড়ালের খাদ্য। কুকুর মাছের কাঁটা ম্যানেজ করতে পারে না।'

কলকাতায় ফিরে এসে অসমঞ্জবাবুর খেয়াল হল যে কুকুরটার একটা নাম দেওয়া হয়নি। সাহেবি নাম ভাবতে গিয়ে প্রথমে টম ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছিল না, তারপর ছানাটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মাথায় এল যে রংটা যখন ব্রাউন, তখন ব্রাউনি নামটা হয়তো বেমানান হবে না। ব্রাউনি নামে একটা বিলিতি ক্যামেরা তাঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের ছিল। কাজেই নামটা সাহেবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশ্চর্য, নামটা মনে পড়া মাত্র ব্রাউনি বলে ডাকতেই ছানাটা ঘরের কোনে রাখা বেঁটে মোড়াটার উপর থেকে এক ছোট্ট লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে তাঁর দিকে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। অসমঞ্জবাবু বললেন, 'সিট ডাউন', আর অমনি ব্রাউনি তার পিছনের পা দুটো ভাঁজ করে থপ করে বসে পড়ে তাঁর দিকে চেয়ে একটা ছোট্ট হাই তুলল। অসমঞ্জবাবু এক মুহূর্তের জন্য যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন যে ব্রাউনি ডগশোতে বুদ্ধিমান কুকুর হিসেবে প্রথম পুরস্কার পাচ্ছে।

সুবিধে এই যে, চাকর বিপিনেরও কুকুরটাকে পছন্দ হয়ে গেছে, ফলে দিনের বেলায় যে সময়টুকু তিনি বাইরে থাকেন, সে সময়ে ব্রাউনির দিকে নজর রাখার কাজটা বিপিন খুশি হয়েই করে। অসমঞ্জবাবু তাকে সাবধান করে দিয়েছেন যেন ব্রাউনিকে আজেবাজে

কিছু খেতে না দেয়। 'আর দেখিস রাস্তায়-টাস্তায় না বেরোয়। আজকালকার ড্রাইভারগুলো চোখে ঠুলি দিয়ে গাড়ি চালায়।' অবিশ্যি বিপিনকে ফরমাশ দিয়েও অসমঞ্জবাবুর সোয়াস্তি নেই; রোজ সন্ধ্যে বেলা বাড়ি ফিরে এসে ব্রাউনির লাঙ্গুলসঞ্চালন না দেখা পর্যন্ত তাঁর উৎকণ্ঠা যায় না।

ঘটনাটা ঘটল হাসিমারা থেকে ফেরার তিন মাস পরে। বারটা ছিল শনি, তারিখ বাইশে নভেম্বর। অসমঞ্জবাবু আপিস থেকে ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে শার্টটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে তক্তপোশ ছাড়া তাঁর একমাত্র আসবাব একটা পুরোনো কাঠের চেয়ারে বসতেই সেটার একটা পঙ্গু পায়া তাঁর সামান্য ভারও সইতে না পেরে কাজে ইস্তফা দিল, আর তার ফলে চোখের পলকে অসমঞ্জবাবু চেয়ার সমেত সশব্দে মেঝের সংস্পর্শে এসে গেলেন। এতে তাঁর চোট লাগল ঠিকই, এমনকী চেয়ারের পায়ার মতো তাঁর ডান হাতের কনুইটাও বাতিল হয়ে যাবে কি না সে চিন্তাটাও তাঁর মনে উদয় হয়েছিল, কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ তাঁকে তাঁর যন্ত্রণার কথা ভুলিয়ে দিল।

শব্দটা এসেছে তক্তপোশের উপর থেকে। হাসির শব্দ, বোধ হয় যাকে বলে খিলখিলে হাসি, আর সেটার উৎস হচ্ছে নিঃসন্দেহে তাঁর কুকুর ব্রাউনি, কারণ ব্রাউনিই বসে আছে তক্তপোশের উপর, আর ব্রাউনিরই ঠোঁটের কোণে এখনও লেগে আছে হাসির রেশ।

অসমঞ্জবাবুর সাধারণ জ্ঞানের মাত্রাটা যদি আর সামান্যও বেশি হত তাহলে তিনি জানতেন যে কুকুর কখনো হাসে না। আর এই জ্ঞানের সঙ্গে যদি তাঁর কল্পনাশক্তিও খানিকটা বেশি হত, তাহলে আজকের এই ঘটনা তাঁর নাওয়া-খাওয়া রাতের ঘুম সব বন্ধ করে দিত। এই দুটোরই অভাবে অসমঞ্জবাবু যেটা করলেন সেটা হল, তিন দিন আগে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে আড়াই টাকা দিয়ে কেনা 'অল অ্যাবাউট ডগস' বইটা হাতে নিয়ে বসলেন। তারপর প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে সেটা উলটেপালটে দেখলেন যে তাতে কুকুরের হাসির কোনো উল্লেখ নেই।

অথচ ব্রাউনি যে হেসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু হাসেনি, হাসির কারণে হেসেছে। অসমঞ্জবাবুর স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর যখন বছর পাঁচেক বয়স তখন নরেন ডাক্তার একবার তাঁদের চন্দননগরের বাড়িতে রুগি দেখতে এসে চেয়ার ভেঙে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিলেন, আর তাই দেখে অসমঞ্জবাবু হাসিতে ফেটে পড়ায় বাবার কাছে কানমলা খেয়েছিলেন।

অসমঞ্জবাবু হাতের বইটা বন্ধ করে ব্রাউনির দিকে চাইলেন। চোখাচুখি হতেই বালিশের উপর সামনের পা দুটো ভর করে দাঁড়িয়ে ব্রাউনি তার তিন মাসে দেড় ইঞ্চি বেড়ে যাওয়া লেজটা নেড়ে দিল। তার মুখে এখন হাসির কোনো চিহ্ন নেই। অকারণে হাসাটা পাগলের লক্ষণ; অসমঞ্জবাবু ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে ব্রাউনি ম্যাড ডগ নয়।

এরপর সাত দিনের মধ্যে ব্রাউনি আরও দু-বার হাসার কারণে হাসল। প্রথম বারের ব্যাপারটা ঘটল রাত্রে। তখন রাত সাড়ে ন-টা। ব্রাউনির শোবার জন্য অসমঞ্জবাবু সবে তার তক্তপোশের পাশে মেঝেতে একটা চাদর পেতে দিয়েছেন, এমন সময় ফর ফর শব্দ করে দেওয়ালে একটা আরশোলা উড়ে এসে বসল। অসমঞ্জবাবু তাঁর এক পাটি চটি নিয়ে সেটাকে তাগ করে মারতে গিয়ে বেমক্কা এক চাপড় মেরে বসলেন দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায়, আর তার ফলে সেটা পেরেক থেকে খসে মাটিতে পড়ে ভেঙে চৌচির। এবারে ব্রাউনির খিলখিলে হাসি তাঁকে ভাঙা আয়নার জন্য আপশোস করতে দিল না।

দ্বিতীয়বারের হাসিটা অবিশ্যি খিলখিল নয়; সেটা যাকে বলে ফিক করে হাসা। অসমঞ্জবাবু এবারে বেশ ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন, কারণ ঘটনা বলতে কিছুই ঘটেনি। শুধু ব্রাউনি হাসল কেন? উত্তর জোগাল বিপিন। চা এনে ঘরে ঢুকে মনিবের দিকে চেয়ে সেও ফিক করে হেসে বলল, 'আপনার কানের পাশে সাবান লেগে রয়েছে বাবু।' আসলে আয়নার অভাবে জানলার আরশিতে দাড়ি কামিয়েছেন অসমঞ্জবাবু; চাকরের কথায় দু-দিকের জুলফিতেই হাত বুলিয়ে দেখলেন বেশ খানিকটা করে শেভিং সোপ লেগে রয়েছে।

এই সামান্য কারণেও যে ব্রাউনি হেসেছে তাতে অসমঞ্জবাবুর বেশ অবাক লাগল। তিনি দেখলেন যে পোস্টাপিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার বার ব্রাউনির কৌতুকভরা দৃষ্টি আর হাসির ফিক শব্দটা মনে পড়েছে। অল অ্যাবাউট ডগস-এ কুকুরের হাসির কথা না থাকলেও, কুকুরের এনসাইক্লোপিডিয়া গোছের একটা বই জোগাড় করতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয় কিছু জানতে পারতেন।

ভবানীপুরের চারটে বইয়ের দোকান, আর তারপর নিউ মার্কেটের সবকটা বইয়ের দোকান খুঁজেও যখন তিনি ওই জাতীয় কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া পেলেন না, তখন মনে হল-রজনী চাটুজ্যের কাছে গেলে কেমন হয়? তাঁর পাড়াতেই থাকেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রজনী চাটুজ্যে। কী বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন ভদ্রলোক সেটা অসমঞ্জবাবু জানে না, কিন্তু তাঁর বৈঠকখানাটি যে ভারী ভারী বইয়ে ঠাসা সেটা তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই দেখা যায়।

এক রবিবার সকালে দুগগা বলে রজনী চাটুজ্যের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন অসমঞ্জবাবু। দূর থেকে ভদ্রলোককে দেখেছেন অনেকবার, কিন্তু তাঁর গলার স্বর যে এত ভারী, আর ভুরু যে এত ঘন সেটা জানা ছিল না। তাই রাগী মানুষ হলেও দরজা থেকে ফিরিয়ে দেননি, তাই খানিকটা ভরসা পেয়ে অসমঞ্জবাবু অধ্যাপকের মুখোমুখি সোফাটায় বসে একবার ছোট্ট করে কেশে গলাটা ঝেড়ে নিলেন। রজনীবাবু হাতের ইংরেজি পত্রিকাটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলেন।

'আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে আমি এ পাড়াতেই থাকি।'

'অ। ... কী ব্যাপার?'

'আপনার বাড়িতে একটা কুকুর দেখেছি, তাই ...'

'তাই কী? আছে তো কুকুর। একটা কেন, দুটো আছে।'

'ও। আমারও আছে।'

'আপনারও আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা।'

'বুঝলাম।-তা আপনি কি কুকুর-পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে আসছেন?'

অসমঞ্জবাবু সরল মানুষ, তাই শ্লেষটা ধরতে পারলেন না। বললেন, 'আজ্ঞে না। একটা জিনিসের খোঁজ করতে আপনার কাছে এসেছি।'

'কী জিনিস?'

'আপনার কাছে কি কুকুরের এনসাইক্লোপিডিয়া আছে?'

'না, নেই। ... ও জিনিসটার দরকার হচ্ছে কেন?'

'না, মানে-আমার কুকুর হাসে। তাই জানতে চাইছিলাম কুকুরের হাসিটা স্বাভাবিক কি না। আপনার কুকুরও হাসে কি?'

রজনীবাবুর দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজতে যতটা সময় লাগল, ততক্ষণে একটানা তিনি অসমঞ্জবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'কখন হাসে আপনার কুকুর? রাত্তিরে কি?'

'হ্যাঁ, তা রাত্তিরে ...'

'রাত্তিরে আপনি ক-রকম নেশা করেন? শুধু গাঁজায় তো হয় না এ জিনিস। তার সঙ্গে ভাং, চরস, আফিং-এসবও চলে কি?'

অসমঞ্জবাবু বিনীতভাবে জানালেন যে একমাত্র ধূমপান ছাড়া তাঁর আর কোনো নেশা নেই, আর সেটাও তিনি কুকুর আসার পর থেকে হপ্তায় চার প্যাকেট থেকে তিন প্যাকেটে নামিয়েছেন, কারণ খরচে কুলোয় না।

'তাও বলছেন আপনার কুকুর হাসে?'

'আমি দেখেছি হাসতে। শুনেওছি। আওয়াজ করে হাসে।'

'শুনুন।'

রজনী চাটুজ্যে হাতের পত্রিকাটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসে অসমঞ্জবাবুর দিকে তাকিয়ে একেবারে ষোলো আনা অধ্যাপকের মেজাজে বলেন, 'আপনার একটি তথ্য বোধ হয় জানা নেই; সেটা জেনে রাখুন। ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে জগতে, তার মধ্যে মানুষ ছাড়া আর কেউ হাসে না, হাসতে জানে না, হাসতে পারে না। এটাই হচ্ছে মানুষ আর অন্য প্রাণীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য। কেন এমন হল সেটা জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ সেটা জানি না। শুনেছি ডলফিন নামে শুশুক জাতীয় একরকম প্রাণীর নাকি রসবোধ আছে, তারা হাসলেও হাসতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো প্রাণী হাসে না। মানুষ যে কেন হাসে সেটার কোনো স্পষ্ট কারণ জানা নেই। বাঘা বাঘা দার্শনিকরা অনেক ভেবে এর কারণ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁদের মতের মিল হয়নি।-বুঝেছেন?'

অসমঞ্জ বুঝলেন, আর এও বুঝলেন যে এবার তাঁকে উঠতে হবে, কারণ রজনী চাটুজ্যের দৃষ্টি কথা শেষ করেই চলে গেছে তাঁর হাতের পত্রিকার দিকে।

ডা. সুখময় ভৌমিক-যাঁকে কেউ কেউ ভৌ-ডাক্তার বলেন-কলকাতার একজন নামকরা কুকুরের ডাক্তার। সাধারণ লোকে তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও একজন কুকুরের ডাক্তার সেটা করবে না এই বিশ্বাসে অসমঞ্জবাবু খোঁজ খবর নিয়ে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গোখেল রোডে ভৌমিকের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। গত চার মাসে সতেরো বার হেসেছে ব্রাউনি। এটা অসমঞ্জবাবু লক্ষ করেছেন যে মজার কথা শুনলে ব্রাউনি হাসে না, কেবল মজার ঘটনা দেখলেই হাসে। যেমন বোম্বাগড়ের রাজা শুনে ব্রাউনির মুখে কোনো পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু আধসেদ্ধ আলুর দমের আলু যখন অসমঞ্জবাবুর আঙুলের চাপে পিছলে ছিটকে দইয়ের মধ্যে পড়ল, আর সেই দইয়ের ছিটে যখন অসমঞ্জবাবুর নাকের ডগায় লাগল, তখন ব্রাউনির প্রায় বিষম লাগার জোগাড়। রজনী চাটুজ্যে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণী-টানি বলে তো তাঁকে বিস্তর জ্ঞান দিলেন, কিন্তু অসমঞ্জবাবুর চোখের সামনে যে অধ্যাপকের কথা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে?



এই সব ভেবে-টেবে বিশ টাকা ফি জেনেও অসমঞ্জবাবু গেলেন ভৌ-ডাক্তারের কাছে। কুকুরের হাসির কথা শোনার আগেই তার চেহারা দেখে ডাক্তারের চোখ কপালে উঠল।

'অনেক মংগ্রেল দেখেছি মশাই, কিন্তু এমনটি তো দেখিনি।'

ডাক্তার দু-হাতে ব্রাউনিকে তুলে তাঁর টেবিলের উপর দাঁড় করালেন। ব্রাউনি তার পায়ের সামনের পিতলের পেপারওয়েটটাকে একবার শুঁকে নিল।

'কী খাওয়াচ্ছেন একে?'

'আজ্ঞে আমি যা খাই তাই খায়। জাত কুকুর তো নয়, কাজেই অতটা ...'

ভৌমিক ভুরু কুঁচকোলেন। ভারি মনোযোগ আর কৌতূহলের সঙ্গে দেখছেন তিনি ব্রাউনিকে।

'জাত কুকুর দেখলে অবিশ্যি আমরা বুঝি,' বললেন ভৌমিক, 'তবে সারা বিশ্বের সব জাত কুকুর যে আমাদের চেনা সেকথা জোর দিয়ে বলি কী করে বলুন। এটার চেহারা দেখে ফস করে দোআঁশলা বলতে আমার দ্বিধা হচ্ছে। আপনি একে ডাল-ভাত খাওয়াবেন না, আমি একটা খাবারের তালিকা করে দিচ্ছি।'

অসমঞ্জবাবু এবার আসল কথায় যাবার একটা চেষ্টা দিলেন।

'ইয়ে, আমার কুকুরের একটা বিশেষত্ব আছে, যার জন্য আপনার কাছে আসা।'

'কী বলুন তো?'

'কুকুরটা হাসে।'

'হাসে?'

'হ্যাঁ-মানে, মানুষের মতো করে হাসে।'

'বলেন কী! কই দেখি হাসান তো দেখি।'

এইখানেই মুশকিলে পড়ে গেলেন অসমঞ্জবাবু। এমনিতেই তিনি বেশ লাজুক মানুষ, কাজেই সার্কাসের ক্লাউনের মতো হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী করে তিনি ব্রাউনিকে হাসাবেন এমন ক্ষমতা তাঁর নেই। আর ঠিক এই মুহূর্তে এই ডাক্তারের ঘরের কোণে হাস্যকর ঘটনা

ঘটবে এটাও আশা করা যায় না। তাঁকে তাই বাধ্য হয়ে বলতে হল অত সহজে ফরমাইশি হাসি হাসে না তাঁর কুকুর, কেবল কোনো হাসির ঘটনা দেখলেই হাসে।

এর পরে ডা. ভৌমিক আর বেশি সময় দিলেন না অসমঞ্জবাবুকে। বললেন, 'আপনার কুকুরের চেহারাতেই যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে; তার সঙ্গে আবার হাসি-টাসি জুড়ে দিয়ে আরও বেশি অসাধারণ করে তুলবেন না। তেইশ বছর কুকুরের ডাক্তারির অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আপনাকে-কুকুর কাঁদে, কুকুর ভয় পায়, কুকুর রাগ ঘৃণা বিরক্তি হিংসে এ সবই প্রকাশ করে, এমনকী কুকুর স্বপ্নও দেখে; কিন্তু কুকুর হাসে না।'

এই ঘটনার পর অসমঞ্জবাবু ঠিক করলেন যে আর কোনোদিন কাউকে কুকুরের হাসির কথা বলবেন না। প্রমাণ দেবার উপায় যখন নেই, তখন বলে কেবল নিজেই অপ্রস্তুত হওয়া। কেউ নাই বা জানুক, তিনি তো জানেন। ব্রাউনি তাঁরই কুকুর, তাঁরই সম্পত্তি। তাঁদের দু-জনের এই জগতে বাইরের লোককে টেনে আনার কী দরকার?

কিন্তু মানুষে যা ভাবে সব সময় তো তা হয় না। ব্রাউনির হাসিও একদিন বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন থেকেই অসমঞ্জবাবু অভ্যাস করে নিয়েছিলেন কাজ থেকে ফিরে এসে ব্রাউনিকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকটায় একটা চক্কর মেরে আসা। একদিন এপ্রিল মাসের একটা বিকেলে বেড়ানোর সময় হঠাৎ আচমকা এল তুমুল ঝড়। আকাশের দিকে চেয়ে অসমঞ্জবাবু বুঝলেন এখন বাড়ি ফেরা মুশকিল, কারণ বৃষ্টিরও আর বেশি দেরি নেই। তিনি ব্রাউনিকে নিয়ে মেমোরিয়ালের দক্ষিণ দিকে কালো ঘোড়সওয়ার মাথায় করা শ্বেতপাথরের তোরণটার নীচে আশ্রয় নিলেন।



বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে, চারদিকে লোকজন পরিত্রাহি ছুটছে ছাউনি লক্ষ করে, এমন সময় সাদা প্যান্ট আর বুশ শার্ট পরা একটা মাঝবয়সি ফর্সা মোটা বেঁটে ভদ্রলোক তাদের থেকে হাত পনেরো দূরে দাঁড়িয়ে দু-হাত দিয়ে তার হাতের ছাতাটা খুলে মাথায় দিতেই ঝড়ের দাপটে সেটা হড়াৎ শব্দ করে উলটে অকেজো হয়ে গেল। সত্যি বলতে কী, এই দৃশ্য দেখে অসমঞ্জবাবুরই হাসি পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি হাসার আগেই ব্রাউনির অট্টহাস্য ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে পৌঁছে গেল সেই অপ্রস্তুত ভদ্রলোকের কানে। ভদ্রলোক ছাতাটা আবার সোজা করার ব্যর্থ চেষ্টা বন্ধ করে অবাক বিস্ময়ে ব্রাউনির দিকে চাইলেন। এদিকে ব্রাউনির এখন কুটিপাটি অবস্থা, অসমঞ্জ তার মুখের উপর হাত চেপে হাসি থামানোর চেষ্টায় বিফল হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

হতভম্ব ভদ্রলোক ভূত দেখার ভাব করে এগিয়ে এলেন অসমঞ্জর দিকে। ব্রাউনির হাসির তেজ খানিকটা কমেছে, কিন্তু তাও একজন লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

'লাফিং ডগ।'

ভদ্রলোকের মুখে রা নেই দেখে অসমঞ্জবাবুই বললেন কথাটা।

'লা-ফিং ড-গ!' বহুদূরের পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনির মতো ফিরে এল কথাটা ভদ্রলোকের মুখ থেকে। 'হাউ এক্সট্রার্ডিনারি।'

অসমঞ্জবাবু দেখেই বুঝেছিলেন যে ভদ্রলোক বাঙালি নন; হয়তো গুজরাটি বা পারসি হবে। কোনো প্রশ্ন যদি করেন ভদ্রলোক তাহলে ইংরেজিতেই করবেন, আর অসমঞ্জবাবুকে জবাব দিতে হবে ইংরেজিতেই।

বৃষ্টিটা বেড়েছে। ভদ্রলোক অসমঞ্জবাবুর পাশেই আশ্রয় নিলেন ঘোড়সওয়ারের নীচে, এবং যে দশ মিনিট ধরে বৃষ্টিটা চলল তার মধ্যে ব্রাউনি সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য সব জেনে নিলেন। সেই সঙ্গে অসমঞ্জবাবুর নিজের ঠিকানাটাও দিতে হল। ভদ্রলোক বললেন তাঁর নাম পিলু পোচকানওয়ালা। তিনি কুকুর সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, তাঁর একটা ড্যালমেশিয়ান নাকি দু-বার ডগ-শোতে প্রাইজ পেয়েছে, এমনকী তিনি কুকুর সম্বন্ধে কাগজে লিখে-টিখেও থাকেন। বলা বাহুল্য, তাঁর জীবনে আজকের মতো তাক-লাগানো ঘটনা আর ঘটেনি, ভবিষ্যতে আর ঘটবে না। তিনি মনে করেন এ বিষয়ে একটা কিছু করা দরকার, কারণ অসমঞ্জবাবু নিজে নাকি বুঝতে পারছেন না তিনি কী আশ্চর্য সম্পদের অধিকারী।

বৃষ্টি থামার পরে চৌরঙ্গীর এডওয়ার্ড কোর্টে তাঁর বাসস্থানে ফেরার পথে পোচকানওয়ালা যে মিনিবাসের ধাক্কা খেয়ে কোমর ভাঙলেন, তার জন্য ব্রাউনিকে খানিকটা দায়ী করা চলে, কারণ লাফিং ডগের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকার ফলে ভদ্রলোক রাস্তা পেরোবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেননি। আড়াই মাস হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে পোচকানওয়ালা হাওয়া বদলের জন্য যান নৈনিতাল। সেখানে এক মাস থেকে কলকাতায় ফিরে এসে সেইদিনই সন্ধ্যায় বেঙ্গল ক্লাবে গিয়ে তিনি তাঁর বন্ধু মি. বালাপুরিয়া ও মি. বিসোয়াসকে লাফিং ডগের ঘটনাটা বললেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাটা পৌঁছে গেল ক্লাবের সাতাশজন সদস্য ও তিনটি বেয়ারার কানে, এবং পরদিন দুপুরের মধ্যে এই ত্রিশজন মারফত ঘটনাটা জেনে গেল কমপক্ষে হাজার কলকাতাবাসী।

এই সাড়ে তিন মাসে ব্রাউনি আর হাসেনি। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, হাসির ঘটনা কোনো ঘটেনি। তাতে অবিশ্যি অসমঞ্জবাবু কোনো উদ্বেগ বোধ করেননি। কুকুরের

হাসি ভাঙিয়ে খাবার কোনো অভিপ্রায় তাঁর কোনোদিন ছিল না। এই সাড়ে তিন মাসে তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝেছেন যে ব্রাউনি এসে তাঁর নিঃসঙ্গতা সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছে। সত্যি বলতে কী, কোনো মানুষের প্রতি অসমঞ্জবাবু কোনোদিন এতটা মমতা বোধ করেননি।

পোচকানওয়ালার দৌলতে যারা লাফিং ডগের খবরটা পেলেন তাদের মধ্যে ছিলেন স্টেটসম্যান পত্রিকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি সেই কাগজের এক সাংবাদিক রজত চৌধুরীকে ডেকে অসমঞ্জর সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব করলেন। অসমঞ্জ যে লাজপত রায় পোস্টাপিসের কেরানি সে খবরটা পোচকানওয়ালার জবানিতেই রটে গিয়েছিল।

অসমঞ্জ অবিশ্যি তাঁর বাড়িতে সাংবাদিকদের আগমনের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর বিস্ময় খানিকটা কাটল যখন রজত চৌধুরী পোচকানওয়ালার উল্লেখ করলেন। অসমঞ্জ ভদ্রলোককে ঘরে এনে নতুন পায়া-লাগানো চেয়ারটায় বসিয়ে নিজে খাটে বসলেন। সেই সাতান্ন সালে চাকরির জন্য ইন্টারভিউয়ের পর এই তাঁর প্রথম ইন্টারভিউ। ব্রাউনি ঘরের এক কোণায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে একটা পিঁপড়ের সারির গতিবিধি লক্ষ করছিল, তার মনিবকে খাটে বসতে দেখে সে এক লাফে তাঁর পাশে গিয়ে হাজির হল।

রজত চৌধুরীকে টেপ রেকর্ডারের চাবি টিপতে দেখে অসমঞ্জবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল সাংবাদিককে একটা কথা জানানো দরকার। তিনি বললেন, 'ইয়ে, আমার কুকুর আগে হাসত ঠিকই, কিন্তু ইদানীং বেশ কয়েক মাস আর হাসেনি; কাজেই আপনি ওর হাসি চাক্ষুষ দেখতে চাইলে আপনাকে হতাশ হতে হবে।'

আজকালকার অনেক তরুণ সাংবাদিকদের মতোই রজত চৌধুরী একটা বেশ চনমনে দাঁওমারা ভাব বোধ করছিলেন এই সাক্ষাৎকারের শুরুতে। কথাটা শুনে তিনি খানিকটা হতাশ হলেও মনের ভাবটা যথাসম্ভব আড়াল করে বললেন, 'ঠিক আছে। তবু কতকগুলো ডিটেলস আমি জেনে নিই। যেমন প্রথম হচ্ছে, আপনার কুকুরের নাম কী?'

এগোনো মাইকটার দিকে গলা বাড়িয়ে অসমঞ্জ বললেন, 'ব্রাউনি।'

'ব্রাউনি ...'। এটা রজত চৌধুরীর দৃষ্টি এড়াল না যে নামটা উচ্চারণ হতেই কুকুরের লেজটা দুলে উঠেছে।

'ওর বয়স কত?' দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন রজত চৌধুরী।

'এক বছর এক মাস।'

'আচ্ছা-আপনি এটাকে পে-প্পে-প্পেলেন কোথায়?'

এটা আগেও হয়েছে। অনেক হোমরাচোমরার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েও রজত চৌধুরীর জিভের এই দোষটি তাকে আচমকা অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছে। এখানেও তাই হতে পারত, কিন্তু ফল হল উলটো। এই তোতলামো ব্রাউনির বৈশিষ্ট্যপ্রকাশে আশ্চর্যভাবে সাহায্য করল। পোচকানওয়ালার পরে রজত চৌধুরী হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি নিজের কানে শুনলেন কুকুরের মুখে মানুষের হাসি।

পরের রবিবার সকালে গ্র্যান্ড হোটেলের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত দু-শো সাতষট্টি নম্বর কামরায় বসে আমেরিকার সিনসিনাটি শহরের অধিবাসী উইলিয়াম পি. মুডি কফি খেতে খেতে স্টেটসম্যান পত্রিকায় লাফিং ডগ-এর বিবরণ পড়ে হোটেলের অপারেটরকে ফোন

করে বললেন টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের মিস্টার ন্যানডির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। এই ন্যানডি ছোকরাটি যে কলকাতার রাস্তাঘাট ভালোই চেনে তার প্রমাণ মুডি সাহেব গত দু-দিনে পেয়েছেন। স্টেটসম্যানে লাফিং ডগ-এর মালিকের নাম ঠিকানা বেরিয়েছে। মুডি সাহেবের তাঁর সঙ্গে দেখা করা একান্ত দরকার।

অসমঞ্জ স্টেটসম্যান পড়েন না। তা ছাড়া তাঁর সাক্ষাৎকারটি যে কবে বেরোবে সেটা রজত চৌধুরী বলে যাননি; দিনটা জানা থাকলে হয়তো তিনি কাগজের খোঁজ করতেন। তাঁকে খবরটা বলল যগুবাবুর বাজারে তাঁর পাড়ার জয়দেব দত্ত।

'আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক,' বললেন জয়দেববাবু, 'এমন একটা তাজ্জব জিনিস ঘরে নিয়ে বসে আছেন এক বচ্ছর যাবৎ, আর কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানাননি! আজ বেলা করে যাব একবারটি আপনার ওখানে। দেখে আসব আপনার কুকুর।'

অসমঞ্জবাবু প্রমাদ গুনলেন। উৎপাতের সমূহ সম্ভাবনা। সত্যি বলতে কী, আপিসের বাইরে মানুষের সঙ্গ তাঁর মোটেই ভালো লাগে না। কোনোদিনই লাগত না-ব্রাউনি আসার পরে তো নয়ই। অথচ কলকাতার লোকেরা যা হুজুগে; এমন একটা খবর পড়ে কি আর তারা এই আশ্চর্য কুকুরটি দেখার লোভ সামলাতে পারবে?

অসমঞ্জবাবু দ্বিধা না করে বাড়ি ফিরে দশ মিনিটের মধ্যে ব্রাউনিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর জীবনে প্রথম একটি ট্যাক্সি ডেকে তাতে চেপে সোজা চলে গেলেন বালিগঞ্জ রেলের স্টেশন। সেখান থেকে চাপলেন ক্যানিং-এর ট্রেনে। পথে তালিত বলে একটা স্টেশনে গাড়ি থামলে পর জায়গাটাকে বেশ নিরিবিলি মনে হওয়ায় ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। সারা দুপুর বাঁশবন আমবনের ছায়াশীতল পরিবেশে ঘুরে ভারি আরাম বোধ হল। ব্রাউনিকে দেখে মনে হল তারও ভালো লাগছে। তার ঠোঁটের কোনে যে হাসিটা আজ দেখলেন অসমঞ্জবাবু, সেটা একেবারে নতুন হাসি। এটা হল, প্রসন্নতার হাসি, আরামের হাসি, মেজাজখুশ হাসি। অল অ্যাবাউট ডগস বইতে অসমঞ্জ পড়েছিলেন যে কুকুরের এক বছর নাকি মানুষের সাত বছরের সামিল। কিন্তু এক বছরের ব্রাউনির হাবভাব দেখে তাঁর মনে হচ্ছে এই কুকুরটির মনের বয়স সাতের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি।

বাড়ি ফিরতে হল প্রায় সাতটা। বিপিন দরজা খুলতে অসমঞ্জবাবু জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, কেউ এসেছিল?' বিপিন জানাল সারাদিনে অন্তত চলি×শবার তাকে কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলতে হয়েছে। অসমঞ্জ মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করলেন।

বিপিনকে চা করতে বলে গায়ের জামাটা খুলে আলনায় রাখতেই কড়া নাড়ার শব্দ হল। 'ধুত্তেরি' বলে দরজা খুলে সামনে সাহেব দেখেই অসমঞ্জবাবু বলে ফেললেন, 'রং নাম্বার।' তারপর সাহেবের পাশে চশমা পরা এক বাঙালি যুবককে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'কাকে চাই?'

'বোধ হয় আপনাকে,' বললেন টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের শ্যামল নন্দী। 'আপনার পিছনে যে কুকুরটাকে দেখছি সেটার সঙ্গে আজকের কাগজের বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। ভেতরে আসতে পারি?'

অসমঞ্জ অগত্যা দু-জনকে তাঁর ঘরে এনে বসালেন। সাহেব বসলেন চেয়ারে, নন্দী মোড়াতে আর অসমঞ্জ নিজে বসলেন খাটে। ব্রাউনির যেন কেমন একটা ইতস্তত ভাব; সে ঘরে না ঢুকে চৌকাঠের ঠিক বাইরে রয়ে গেল। তার কারণ বোধ হয় এই যে এর আগে সে এই ঘরে কখনো একসঙ্গে তিনজন পুরুষকে দেখেনি।

'ব্রাউনি! ব্রাউনি! ব্রাউনি! ব্রাউনি!'

ঘাড় নীচু, চোখ সংকুচিত এবং ঠোঁট ছুঁচলো করে সাহেব হাসি হাসি মুখে ব্রাউনির দিকে চেয়ে মিহি গলায় তার নাম ধরে ডাকছে। ব্রাউনিও একদৃষ্টে সাহেবকে পর্যবেক্ষণ করছে।

স্বভাবতই অসমঞ্জর মনে প্রশ্ন জেগেছিল-এরা কারা? সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন শ্যামল নন্দী। সাহেব মার্কিন মুলুকের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি, ভারতবর্ষে এসেছেন পুরোনো রোলস রয়েস গাড়ির সন্ধানে। সকালে ব্রাউনির বিষয়ে খবরের কাগজে পড়ে তাকে একবার দেখার লোভ সামলাতে পারেননি। সাহেব ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারবেন না বলে শ্যামল নন্দী তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

অসমঞ্জ লক্ষ করলেন সাহেব এবার নাম ধরে ডাকা ছেড়ে চেয়ার থেকে নেমে এসে নানারকম মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করতে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ কুকুরকে হাসানোর চেষ্টা চলেছে।

মিনিট তিনেক এইভাবে সংবাজি চালাবার পর সাহেব হাল ছেড়ে অসমঞ্জর দিকে ফিরে বললেন, 'ইঁজ হিঁ সিঁক?'

অসমঞ্জ জানালেন তাঁর কুকুরের কোনো ব্যারাম হয়েছে বলে তিনি জানেন না।

'ডাঁজ হিঁ রিঁয়েলি ল্যাঁফ?'



মার্কিনি ইংরেজি পাছে অসমঞ্জবাবু না বোঝেন তাই শ্যামল নন্দী অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলেন সাহেব জানতে চাইছেন কুকুরটা সত্যিই হাসে কি না।

অসমঞ্জবাবু অন্তরের ভিতর থেকে একটা বিরক্তির ভাব বাইরে ঠেলে বেরোতে চেষ্টা করছিল। সেটাকে মনের জোরে দাবিয়ে রেখে বললেন, 'সব সময় হাসে না। যেমন সব মানুষও হাসতে বললেই হাসে না।'

এবার দোভাষীর অনুবাদ শুনে সাহেবের মুখে লালের ছোপ পড়ল। তারপর তিনি জানালেন যে প্রমাণ না পেলে তিনি কুকুরের পিছনে খরচ করতে রাজি নন, কারণ দেশে ফিরে অপ্রস্তুতে পড়তে চান না তিনি। তিনি আরও জানালেন তাঁর বাড়িতে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে চীন থেকে পেরু পর্যন্ত পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানকার কোনো-না-কোনো আশ্চর্য জিনিস নেই। একটি প্যারট আছে তাঁর কাছে যেটা ল্যাটিন ভাষায় ছাড়া কথা বলে না। 'এই লাফিং ডগটি কেনার জন্য আমি সঙ্গে চেক বই নিয়ে এসেছিলাম।'

কথাটা বলে সাহেব তাঁর বুক পকেট থেকে সড়াৎ করে একটি নীল বই বার করে দেখালেন। অসমঞ্জবাবু আড় চোখে দেখলেন তার মলাটে লেখা সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ

ইয়র্ক।

'আপনার ভোল পালটে যেত মশাই,' বললেন শ্যামল নন্দী, 'আপনার কুকুরকে হাসাবার যদি কোনো উপায় জানা থাকে তাহলে সেইটি এবার ছাড়ুন। ইনি বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে রাজি আছেন ওই কুকুরের জন্য। মানে টাকার হিসেবে দেড় লাখ।'

বাইবেলে লিখেছে ঈশ্বর সাত দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষ কিন্তু কল্পনার সাহায্যে সাত সেকেন্ডেই এ কাজটা করতে পারে। শ্যামল নন্দীর কথা শোনামাত্র অসমঞ্জবাবু যে জগৎটা চোখের সামনে দেখতে পেলেন সেখানে তিনি একটি পেল্লায় ছিমছাম ঘরে বার্ড কোম্পানির বড়ো সাহেবের মতো পায়ের উপর পা তুলে আরাম কেদারায় বসে আছেন, আর বাইরের বাগান থেকে ভেসে আসছে হাসনাহানা ফুলের গন্ধ। দুঃখের বিষয় তাঁর এই ছবি বুদবুদের মতো ফুড়ুৎ হয়ে গেল একটা শব্দে।

ব্রাউনি হাসছে।

এ হাসি আগের কোনো হাসির মতো নয়; এ একেবারে নতুন হাসি।

'বাঁট হিঁ ইঁজ ল্যাঁফিং!'

মুডি সাহেব কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়েছেন, আর দুই চোখ দিয়ে গিলছেন এই দৃশ্য। জানোয়ার হলে তাঁর কানটাও যে খাড়া হয়ে উঠত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই অসমঞ্জবাবুর।

এবার কম্পিত হস্তে মুডি সাহেব তাঁর পকেট থেকে আবার বার করলেন তাঁর চেক বই। আর সেই সঙ্গে একটা সোনার পার্কার কলম।

ব্রাউনি কিন্তু হেসেই চলেছে। অসমঞ্জর মনে খটকা, কারণ তিনি এ হাসির মানে বুঝতে পারছেন না। কেউ তোৎলায়নি, কেউ হোঁচট খায়নি, কারোর ছাতা উলটে যায়নি, চটির আঘাতে কোনো আয়না দেওয়াল থেকে খসে পড়েনি-তাহলে কেন হাসছে ব্রাউনি?

'আপনার কপাল ভালো,' বললেন শ্যামল নন্দী। 'তবে আমার কিন্তু একটা কমিশন পাওয়া উচিত, কী বলেন-হেঃ হেঃ।'

মুডি সাহেব মেঝে থেকে উঠে চেয়ারে বসে চেক বই খুললেন। 'অ্যাঁসক হিঁম হাঁউ হিঁ স্পেঁলস হিঁজ নেম।'

'সাহেব আপনার নামের বানান জিজ্ঞেস করছেন,' বললেন দোভাষী শ্যামল নন্দী।

অসমঞ্জবাবু কথাটার উত্তর দিলেন না, কারণ তিনি হঠাৎ আলো দেখতে পেয়েছেন। আর সেই আলো তাঁর মনে গভীর বিস্ময় জাগিয়েছে। নামের বানানের বদলে তিনি বললেন, 'সাহেবকে বলুন কুকুর কেন হাসছে সেটা জানলে তিনি আর টাকার কথাটা তুলতেন না।'

'আপনি আমাকেই বলুন না,' শুকনো গলায় কড়া সুরে বললেন শ্যামল নন্দী। ঘটনার গতি তাঁর মোটেই মঃনপূত হচ্ছে না। মিশন ফেল করলে সাহেবের ধাতানি আছে তাঁর কপালে এটা তিনি জানেন।

ব্রাউনির হাসি থেমেছে। অসমঞ্জবাবু তাকে কোলে তুলে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বললেন, 'সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়, তাই শুনে কুকুর হাসছে।'

'বটে? আপনার কুকুর বুঝি দার্শনিক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তার মানে আপনি কুকুর বেচবেন না?'

'আজ্ঞে না।'

শ্যামল নন্দী অবিশ্যি তাঁর অনুবাদে কুকুরের মনের ভাবের কথা কিছুই বললেন না, শুধু জানিয়ে দিলেন যে কুকুরের মালিক কুকুর বেচবেন না। কথাটা শুনে কলম চেকবই পকেটে পুরে প্যান্টের হাঁটু থেকে অসমঞ্জর মেঝের ধুলো হাত দিয়ে ঝেড়ে ঘর থেকে বেরোনোর সময় সাহেব শুধু মাথা নেড়ে বলে গেলেন, 'হিঁ মাস্ট বিঁ ক্রেঁজি!'

বাইরে মার্কিন গাড়িটার আওয়াজ যখন মিলিয়ে এল তখন অসমঞ্জ ব্রাউনিকে তাঁর কোল থেকে নামিয়ে খাটের উপর রেখে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর হাসির কারণটা ঠিক বলিনি রে, ব্রাউনি?'

ব্রাউনি ছোট্ট করে হেসে দিল-ফিক।

অর্থাৎ ঠিক।

*শারদীয়া ১৩৮৫*




# অজেয় রায়

‘আরে, রাজেন যে! এসো এসো-অনেক দিন পরে। কবে এলে কলকাতায়?’ প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর পুরোনো বন্ধুকে।

‘আজই এলাম,’ বললেন রাজেন চাটুজ্যে।

‘চেঞ্জে শরীর সারল? কই, মনে তো হচ্ছে না। কেমন শুকনো শুকনো লাগছে যে হে।’

নবগোপাল ঘোষের লাইব্রেরি ঘরটা মাঝারি। চারিদিকে দেয়াল ঘেঁষে বইয়ের তাক-অজস্র বই, নানা বিষয়ের। মাঝখানে বড়ো একটা টেবিল ঘিরে কয়েকখানা চেয়ার। তারই একখানাতে বসে রাজেনবাবু ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, ‘জায়গা তো ভালো, আর ছিলামও ভালোই ...’

‘ছিলে মানে? এখন নেই?’

‘একটা ট্রাবল হচ্ছে। এই কিছুদিন থেকে। যে জন্যে তোমার কাছে আসা।’

‘কী বলো তো! কী ট্রাবল?’

‘পিঁপড়ে।’

‘পিঁপড়ে!’ নবগোপালবাবু প্রায় হেসেই ফেলেছিলেন। রাজেনকে তিনি ছেলেবেলা থেকে চেনেন। বড্ড নার্ভাস টাইপ। এমনি আরও অনেক তুচ্ছ ব্যাপারে ঘাবড়ে গিয়ে আগেও কয়েকবার এসেছে তাঁর কাছে। রাজেনবাবুকে গম্ভীর দেখে নবগোপালবাবু বললেন।

‘ব্যাপারটা খুলে বলো তো। কী করছে পিঁপড়ে?’

‘আক্রমণ,’ বললেন রাজেনবাবু।

‘আক্রমণ!’ নবগোপালবাবু অবাক। ‘এ কি আর্মি অ্যান্ট নাকি? ভারতবর্ষে তো আর্মি অ্যান্ট পাওয়া যায় না। সাউথ আমেরিকায় আছে বটে-আর আফ্রিকায়।’

‘না না, তাও নয়,’ বললেন রাজেনবাবু, ‘এগুলো সাধারণ লাল পিঁপড়ে। এই বাগানে ঘরে-টরে থাকে।’

‘খুলে বলো দিকি ব্যাপারটা। চা খাবে?-ও বংশী, দু-কাপ চা দিয়ো এখানে।’

চায়ে চুমুক দিয়ে রাজেনবাবু তাঁর কাহিনি শুরু করলেন।

‘ব্যাপারটা ঘটল এই দিন সাতেক আগে সকাল বেলা।

‘যে বাড়িটাতে রয়েছি-প্রশান্তধাম-সেটা বেশ ছিমছাম, তিন দিক খোলা, ঘরের জানালা দিয়ে মাঠ আর কাঁকুরে মাটি দেখা যায়। এক কবিরাজের বাড়ি ছিল, তিনি মাস তিনেক

হল ছেড়ে কাশীবাসী হয়ে গেছেন। কলকাতায় ওঁর জামাইয়ের কাছ থেকে বাড়িটা ভাড়া করি আমি মাস দুয়েকের জন্য। একটা মালী আছে তার বউ আর মেয়েকে নিয়ে কম্পাউন্ডেই একটা ঘরে, সেই দেখাশোনা করে, বউ রান্না করে। স্বাস্থ্যকর জায়গা, খাবারদাবার সস্তা, বেশ ভালো চেঞ্জ হচ্ছিল। দিন সাতেক আগে সকালে বারান্দায় বসে বই পড়ছি, এমন সময় এক তীব্র চিৎকার। ঘুরে দেখি মালীর চার বছরের মেয়েটা ওদের ঘরের সামনে ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে আর পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে।

'বিছেটিছে কামড়েছে মনে করে এগিয়ে গিয়ে দেখি বেচারার সর্বাঙ্গ লাল পিঁপড়েতে ছেয়ে গেছে। মেয়েটি রোজ সকালে আমার কাছ থেকে একটা করে বিস্কুট খায়। সেটা তার হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে। পিঁপড়েগুলো বোধ হয় সেই বিস্কুটের লোভেই মেয়েটাকে আক্রমণ করেছে। লাল পিঁপড়ের কামড় কী সাংঘাতিক তা তো তুমি জান। সেই পিঁপড়ে এতগুলো একসঙ্গে কাউকে আক্রমণ করলে তার কী দশা হবে বুঝতেই পারছ।

'আমি প্রথমেই কোনোরকমে মেয়েটির হাত থেকে বিস্কুটটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিলাম। ইতিমধ্যে মেয়ের বাপ এসে গেছে, দু-জনে মিলে কোনোরকমে গামছা ঘষে পিঁপড়েগুলোকে দূর করে মেয়েটির গায়ে ডেটল লাগিয়ে দিলাম। ভরতকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে লাল পিঁপড়ের উপদ্রব ক-দিন থেকেই খুব বেড়েছে। আগে নাকি ছিল না। সবই লাল পিঁপড়ে। ছোটো কালো পিঁপড়ে বা ডেঁয়ো পিঁপড়ে নেই।

'কী আর করি; ফিনাইল জলে ভালো করে ঘর-টর ধোয়ালাম। বাড়ির ও বাগানের আনাচে-কানাচে গ্যামাকসিন পাউডার ছড়িয়ে দিলাম। মনে হল তাতে কাজ হল, দুটো দিন আর লাল পিঁপড়ের দেখা পেলাম না। তিন দিনের দিন ভরতের বউ রান্নাঘরে ঢুকেই ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘরের মেঝেতে আমার রাতের খাওয়া এঁটো বাসন ছিল, গিয়ে দেখি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রান্নাঘরের গোটা মেঝেতে মনে হচ্ছে লাল চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে খেয়ে চলেছে সেই এঁটো। জালে-ঘেরা টুকরিতে একটা পাকা পেপে ছিল-স্রেফ এক টুকরো খোলা ছাড়া সবটুকু উদরসাৎ করে ফেলেছে ওই পিঁপড়ে।

'রান্নাঘর থেকে পিঁপড়ে দূর করতে লেগে গেল ঘণ্টা খানেক। একবার মনে হল ছেড়ে দিই বাড়িটা, কিন্তু এত ভালো বাড়ি, এত কম ভাড়া, পিঁপড়ের কাছে হার মেনে ছেড়ে দেব? তার চেয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে দেখি। তাদের এই একই উপদ্রব ভোগ করতে হচ্ছে কি না জানা দরকার।

'আমার পাশের বাড়িটা অ্যাদ্দিন বন্ধ ছিল। ঠিক আগের দিনই তাতে একটা পরিবার এসে উঠেছে। গেটের সামনে গিয়ে দেখি একটি ভদ্রলোক গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে একটা কাটারি হাতে দুই পাশে দুই পুত্রকে নিয়ে মহা উৎসাহে আগাছা পরিষ্কার করছে। আলাপ করলাম। ভদ্রলোকের নাম অবিনাশ ঘোষ। বছর চল্লিশ বয়স। ব্যাবসাদার। বাড়িটা তাঁর নিজের। পরিবারসুদ্ধ ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছেন, তাই দিন সাতেকের জন্য চেঞ্জে এসেছিল।

'একটু ইতস্তত করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর বাড়িতে লাল পিঁপড়ে দেখেছেন কি না। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, কেন বলুন তো? বললাম, এখানে লাল পিঁপড়ের বড্ড উৎপাত। কিছুতে তাড়াতে পারছি না, তাই ভাবলাম-

'ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, ঘরদোর পরিষ্কার রাখবেন, তাহলে আর পিঁপড়ে আসবে না। আর যদি বাড়াবাড়ি দেখেন তো হাঁক দেবেন-ঝাঁটা নিয়ে চলে আসব।

'ফেরার পথে মেজর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। তিনি থাকেন আমার বাড়ির উত্তর দিকের বাংলোটায়। কথা-টথা এমনিতে বিশেষ বলেন না। তাই আমাকে দেখেই যখন বললেন আমার বাড়িতে আমার খোঁজেই গিয়েছিলেন তখন বেশ আশ্চর্য লাগল। বললাম, কী ব্যাপার? একটা অ্যাডভাইস নিতে গেসলাম, বললেন ভদ্রলোক, আপনার কোনো ট্রাবল হচ্ছে কি না জানি না। আমার বাড়িতে লাল পিঁপড়ের দৌরাত্ম্যে লাইফ মিজারেবল হয়ে উঠেছে। এখানকার লোকেরা ইউজলেস-কেউ কোনো পরামর্শ দিতে পারল না। আপনি যদি কোনোরকম পন্থা বাতলাতে পারেন ...

'তখনই আমার তোমার কথা মনে পড়ল। আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সত্যি বলতে কী আমার মাথার ঠিক ছিল না। তাও ভাবলাম দুটো দিন আরও দেখি-ফিনাইল-গ্যামাকসিন যদি কাজ হয়। কিন্তু পরশু রাত্রে ঘরের দরজায় প্রবল ধাক্কার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেখি অবিনাশবাবু উদভ্রান্ত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন তাঁর বাড়িতে একই ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে। তিনি নাকি দুই ছেলেকে নিয়ে খেতে বসেছিলেন, গিন্নি পরিবেশন করছিল, এমন সময় দেখেন দুটো পিঁপড়ের সারি ঘরের কোণে নর্দমা থেকে বেরিয়ে সোজা তাঁদেরই দিকে এগোচ্ছে। ঝাঁট দিয়ে তাড়াতে গিয়ে তারা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। থালা-বাটি উঠিয়ে শোবার ঘরে খাবার চেষ্টা করে কোনো ফল হয়নি-মুহূর্তের মধ্যে পিপীলিকা বাহিনী সেখানে গিয়ে হাজির হয়। তক্তপোশে উঠেও রেহাই নেই। পায়া বেয়ে উঠতে শুরু করে পিঁপড়ের দল। ফলে খাওয়া আর হয়নি কারোর-থালায় যা ছিল তা পিঁপড়ে সাবাড় করেছে। কাণ্ডকারখানা দেখে অবিনাশবাবুর স্ত্রী আতঙ্কে শয্যা নিয়েছেন।'

রাজেনবাবু তাঁর বিবরণ শেষ করার পর দুই বন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। নবগোপালবাবুর ভুরু কুঞ্চিত। বোঝাই যাচ্ছে তিনি আর বন্ধুর কথা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। শেষে বললেন, 'এই পিঁপড়ের ক্ষুধা সাধারণ লাল পিঁপড়ের চেয়ে অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে। কোনো বিশেষ কারণ না ঘটলে এটা হওয়া উচিত না।'

'সে কারণটা কী সেটা তো আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। তুমি যদি একবারটি আসতে পারতে তাহলে খুব ...'

প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ আজই সকালে রাজেনবাবুর সঙ্গে এসে তাঁর বাড়িতে উঠেছেন। তিনি সঙ্গে এনেছেন একটি ছোটোখাটো গবেষণাগার। রাজেনবাবুর অবর্তমানে ভরত মালী খুব ভালো করে ফিনাইল জলে সারা বাড়ি ধুয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত পিঁপড়ে বাহিনীর কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। কিন্তু তার ফলে যে রাজেনবাবু নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন তা নয়। সকালে চায়ের টেবিলে বসে নবগোপালবাবু লক্ষ করছিলেন যে রাজেনবাবু সন্ত্রস্ত দৃষ্টি রাখছেন এদিকে ওদিকে; মেঝেতে রুটি বিস্কুটের টুকরো পড়লেই তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিচ্ছেন। বেলা বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে লাল পিঁপড়ে দেখা দিতে আরম্ভ করল। দুই বন্ধুতে তখন বারান্দায় বসে গল্প করছিলেন। পিঁপড়ের লাইন দেখেই রাজেনবাবুর কথা থেমে গেল। বাগানের দিক থেকে এসেছে তারা; এখন বারান্দা দিয়ে সোজা চলেছে খাবার ঘরের দিকে।

নবগোপালবাবু একমনে লক্ষ করতে লাগলেন পিঁপড়েগুলোকে। তারপর তিনি উঠে গিয়ে একটা কাঁচের বোতল নিয়ে এসে একটা কাগজের টুকরো দিয়ে কয়েকটা পিঁপড়ে তুলে বোতলের মধ্যে বন্দি করে ফেললেন। রাজেনবাবু অবিশ্যি চাইছিলেন নবগোপালবাবু

এখনই তাঁর পিঁপড়ে তাড়াবার ওষুধটি প্রয়োগ করুন। কিন্তু প্রফেসর বললেন, ‘এখন নয় পরে।’

নবগোপালবাবুকে একখানা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দুপুর থেকে সন্ধ্যে অবধি নিজের ঘরে বসে তিনি শিশির পিঁপড়েগুলো স্টাডি করলেন। রাজেনবাবু একবার উঁকি মেরে দেখলেন নবগোপালবাবু শিশির ভিতর বিস্কুটের টুকরো ফেলছেন।

রাত্রে প্রফেসর ঘোষণা করলেন, ‘বুঝলে রাজেন, তুমি ঠিক বলেছ। তোমাদের বাড়িতে লাল পিঁপড়ের খিদে বড্ড বেশি। সাইজেও বড়ো। এগুলিকে সাধারণ লাল পিঁপড়ের পর্যায়ে ফেলা চলে না।’

‘তার মানে এগুলো কি নতুন জাতের পিঁপড়ে?’

‘জাত এক হলেও কোনো একটা কারণে এদের আয়তন আর খিদে দুইই বেড়ে গেছে। পিঁপড়ে দুর্ভিক্ষে ভুগে থাকলে তাদের খিদে বাড়তে পারে। ভালো খেতে পারেনি অনেকদিন, তাই পুষিয়ে নিচ্ছে। অথবা ভবিষ্যতে না খেতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই এখনই শরীরের পুষ্টি বাড়িয়ে নিচ্ছে, গর্তে খাবার মজুত করে রাখছে। কীটপতঙ্গ আবহাওয়ার অনেক কিছু সম্ভাবনা আগে থেকে টের পায়। আরেকটা আশ্চর্য জিনিস দেখছি যে তোমার ঘরে বা বাইরে কম্পাউন্ডে অন্য পোকামাকড় প্রায় নেই। মরা পোকামাকড় লাল পিঁপড়ের একটা প্রধান খাদ্য। নিশ্চয় তার অভাবেই এরা মানুষের খাবারে হাত বাড়াচ্ছে।’

রাজেনবাবু বললেন, ‘আমি অনেক পোকামাকড় দেখেছি, নবু, আমার মনে হয় এই লাল পিঁপড়ের ভয়েই সব পালিয়েছে।’

‘দেখা যাক, আরেকটু স্টাডি করে,’ মৃদু হেসে বললেন নবগোপালবাবু।

মোটকথা, প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় নবগোপালবাবু প্রশান্তধামের লাল পিঁপড়েদের আচরণে বিশেষ শঙ্কিত হবার কারণ দেখলেন না।

টনক নড়ল পরদিন।

ভোরে বেড়িয়ে ফিরে রাজেনবাবুর সঙ্গে চা খাচ্ছেন নবগোপালবাবু, হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গেল। পাখির চিঁচিঁ আর্তনাদ ও ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

দুই বন্ধু বাইরে বেরিয়ে দেখলেন দুটো মুরগির ছানা পাগলের মতো বাগানে ছুটে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে মাটিতে গড়াচ্ছে। মুখ ঘষছে মাটিতে। মা মুরগিটা ঘুরপাক খাচ্ছে বাচ্চা দুটোকে ঘিরে, আর সেই সঙ্গে প্রাণপণে চিৎকার।

ভরত দৌড়ে এল। ‘পিঁপড়েয় ধরেছে বাবু। বাক্সে ঢুকেছিল। সকালে খুব ডাকাডাকি শুনে বাক্স খুলে দিলাম। অমনি ছুটল সব ক-টা। এই দুটোকেই বেশি ধরেছে। ছাড়াতে পারছি না। যা কামড়ায়!’

মুরগির বাচ্চা দুটোকে ধরে সবাই মিলে তাদের গা থেকে পিঁপড়ে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। পালকের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে গেছে পিঁপড়ে। ডেটল জলে ধুইয়ে তাদের গায়ে গ্যামাকসিন ছিটিয়ে দেওয়া হল। তা সত্ত্বেও একটা বাচ্চাকে বাঁচানো গেল না। ঘণ্টা খানেক পরেই মরে গেল। মাত্র দু-সপ্তাহের ছানা, যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেনি। ভরতের মেয়ে লক্ষ্মী তো কেঁদে-কেটে একশা করল।

রাজেনবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছে; তিনি চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। নবগোপালবাবুর মুখ থমথমে। ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর উঠলেন।

একটা লোহার খুন্তি জোগাড় করে বাড়ির আনাচেকানাচে, বাগানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগলেন।

তিনি যখন রান্নাঘরের দেয়ালের ধারে ধারে উঁচু হয়ে বসে খুঁড়ছেন, তখন রাজেনবাবু তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী করছ?'

'পিঁপড়ের বাসা খুঁজছি,' বললেন রাজেনবাবু।

একটা মোটাসোটা মস্ত লাল পিঁপড়েকে সন্ধ্যায় সাবধানে তুলে শিশিতে ভরে প্রফেসর ঘোষ বললেন, 'এটা হল কুইন পিঁপড়ে।'

তারপর আরও কয়েকটা ছোটো আকারের লাল পিঁপড়ে শিশিতে পুরলেন।

'আর রানি নেই?' প্রশ্ন করলেন রাজেনবাবু।

'না। সাধারণত একটিই থাকে একটি বাসায়।'

'আর অন্যগুলো কি পুরুষ?'

'না। এগুলো স্ত্রী, তবে রানি নয়, শ্রমিক। কদাচিৎ দু-চারটে শ্রমিক স্ত্রী পিঁপড়ে ছাড়া এরা কেউ ডিম পাড়ে না।'

'আর ওগুলো কী?'

প্রফেসর ঘোষ চামচে করে পিঁপড়ের বাসার ভিতর থেকে সাদা রঙের বিন্দু বিন্দু বস্তু তুলে শিশিতে রাখছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'ডিম, লার্ভা আর পিউপা। পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়ে তৈরি হবার আগের তিনটি স্টেজ। এত ডিম দেখো একটা রানির। আশ্চর্য!-ওহে রাজেন, আরে দাঁড়াও-নইলে কামড়ে খাবে। বাসা ভেঙে দিতে কীরকম খেপে গেছে দেখছ তো?'

সারাদিন যতক্ষণ আলো রইল প্রফেসর ঘোষ ঘুরে ঘুরে নমুনা সংগ্রহ করলেন। মেজর চৌধুরীর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করলেন। অবিনাশ ঘোষ সপরিবারে পালিয়েছেন। পিঁপড়ের আতঙ্কে তাঁর স্ত্রী নাকি দু-রাত্তির চোখের পাতা এক করতে পারেননি। প্রফেসর ঘোষ তাঁদের বন্ধ বাড়িটাও দেখে এলেন। শুধু তাই না-আরও পাশের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সব বাড়িতেই গিয়ে পিঁপড়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে এলেন। অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে এই তিনটে কাছাকাছি বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়িতে পিঁপড়ের উপদ্রব নেই। পিপীলিকা-বাহিনীর আবির্ভাবের যদি কোনো বিশেষ কারণ থাকে তাহলে সেটা এই তিনটে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই থাকবে।

পরদিন সকালে রাজেনবাবু ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখেন প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ হাতে একটা ছিপি আঁটা শিশি নিয়ে কম্পাউন্ড দিয়ে হেঁটে তাঁর দিকেই আসছেন।

'গুড মর্নিং,' বললেন প্রফেসর ঘোষ বন্ধুর দিকে চেয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হাসি হেসে। 'আজ একটু কলকাতায় যাচ্ছি!'

'সেকী?' রাজেনবাবু তাঁর বন্ধুর এই অপ্রত্যাশিত ঘোষণাটির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। নবগোপাল বলছে কী? সমস্যার কোনো সুরাহা না করেই সে কলকাতায় চলে যাবে?

‘ভেবো না,’ আশ্বাস দিয়ে বললেন নবগোপালবাবু। ‘একটা সূত্র পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। গবেষণার দরকার। আমার সঙ্গে যা সরঞ্জাম আছে তা দিয়ে হবে না। আমি দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসব।’

‘কিন্তু এই তিনদিনে যে হুলুস্থুল হয়ে যেতে পারে নবগোপাল!’

‘উপায় নেই। একটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি তোমায়। এটা ফিনাইলের চেয়েও বেশি কার্যকরী। প্রতিদিন দু-বার করে ঘর ধোবে এই ওষুধ দিয়ে। আর কতকগুলো নির্দেশ তোমাকে মানতে হবে। যারা চিঁড়ে, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি বিক্রি করতে আসে তাদের কাউকে এ-কদিন বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। দরকার হলে বাজার থেকে কিনে আনবে। এ বাড়ির কোনো জিনিস বাইরে নিয়ে গেলে খেয়াল রাখবে তাতে একটাও লাল পিঁপড়ে যেন না থাকে। এই পিঁপড়ের ব্যাপার নিয়ে স্থানীয় কারোর সঙ্গে কোনো আলোচনা করবে না। মেজর চৌধুরী আর মালীকেও বলে দিয়েছি।’

বন্ধুর এই সিদ্ধান্তে রাজেনবাবুর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘পিঁপড়ের উৎপাত কমবে?’

‘সেই উদ্দেশ্যেই কলকাতা যাওয়া,’ বললেন প্রফেসর ঘোষ। ‘এই তিনটে দিন একটু কষ্ট করতে হবে ভাই। তবে আখেরে তাতে লাভ হবে এটা আমার বিশ্বাস। চেষ্টা করে আমার উপর ভরসা রাখো।’

সন্ধ্যার ট্রেনে প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ তাঁর শিশি বোতল গবেষণার সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে বন্ধুকে মনের জোর রাখার জন্য আরেকবার বলে দিয়ে কলকাতা রওনা দিলেন।

প্রশান্তধামের পরের তিন দিনের অভিজ্ঞতা রাজেনবাবুর জীবনে যেন একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

দ্বিতীয় দিনে ভরত মালী তাঁকে এসে বলল, সে চলে যাচ্ছে বউদের নিয়ে অন্য জায়গায় থাকতে। মাইল খানেক দূরে এক কুঁড়েতে থাকার বন্দোবস্ত করেছে সে। কারণ জিজ্ঞেস করে রাজেনবাবু জানলেন যে ভরতরা যে ঘরে থাকে তার পাশের রান্নাঘর লাল পিঁপড়েতে ছেয়ে গেছে। ভাঁড়ারে কোনো তৈরি খাবার নেই, কোনো রসালো ফলমূল নেই। আছে কেবল চাল ডাল আটা মশলা তেল ইত্যাদি রান্নার উপকরণ। সেগুলো থাকে কৌটো, মাটির হাঁড়ি, শিশি, থলি ইত্যাদিতে। এই সব কিছুর গায়ে থিকথিক করছে পিঁপড়ে। বোধ হয় রাজেনবাবুর ওষুধের গন্ধে টিকতে না পেরে সব লাল পিঁপড়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। পিঁপড়েতে শুকনো আটা, চালের গুঁড়ো আর তেল খেয়ে সাফ করছে এ দৃশ্য অভিনব। কয়েকটা আলু পেঁয়াজ ও কুমড়ো ছিল, তার মধ্যে আলু আর কুমড়োটা খেয়ে শেষ করেছে, কেবল পেঁয়াজটা ছোঁয়নি।

ভরত যাবার সময় বলে গেল যে দু-বেলা এসে সে বাবুর কাজ করে দিয়ে যাবে। ‘কলকাতার বাবু এসে তো কিছুই করতে পারলেন না, গরিবের কথা শুনুন-পুজো-টুজো দিন, নইলে এই রাক্ষুসে পিঁপড়েরা যাবে না।’

মেজর চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে রাজেনবাবু জানলেন যে তাঁর রাঁধুনি পালিয়েছে। ভাঁড়ার ঘরে ঢোকা যাচ্ছে না। তিনি সকালে পাঁউরুটি খাচ্ছেন, সঙ্গে টিনের খাবার। সকালে বেড়িয়ে ফেরার সময় রুটি কিনে আনেন। মাখন রাখেন কৌটোর জলে ডুবিয়ে। ছাতে বসে আহার করেন, প্রতিদিন চারবার করে ঘর ধোন। প্রফেসর ঘোষ তাঁকে খানিকটা ওষুধ দিয়ে গেছেন।

সেই রাত্রে রাজেনবাবু মাইল খানেক দূরে একটা হোটেলে গিয়ে ভাত খেয়ে এলেন। হোটেলওয়ালা বিস্ময় প্রকাশ করতে বললেন রাঁধুনি ছুটি নিয়েছে তাই এই ব্যবস্থা।

রাত্তিরে ঘুম হল না। বার বার খালি টর্চ জ্বেলে দেখেন ঘরে পিঁপড়ে এসেছে কি না। আর যদি বা তন্দ্রা আসে, অমনি শুরু হয়ে যায় পিপীলিকাবাহিনীর আক্রমণের বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন। চতুর্থ দিন সকালে তাঁর কথামতো প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ ফিরে এলেন কলকাতা থেকে। তাঁর বাইরের হাবভাবে কিছুই বোঝার উপায় নেই। এই সাংঘাতিক সমস্যার কোনো সমাধান করতে পেরেছেন কি না সেটা অন্তত রাজেনবাবুর পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

মালীর নতুন ঘরে বসে চা খেতে খেতে রাজেনবাবু প্রসঙ্গটা তুললেন। তবে সরাসরি নয়। বন্ধুর দিকে ফিরে সামান্য হেসে প্রথম যে প্রশ্নটা করলেন সেটা রাজেনবাবুর কাছে অবান্তর বলেই মনে হল। 'বলো তো রাজেন, পৃথিবীর প্রভু কোন প্রাণী।'

রাজেনবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন মানুষ।'

'কীসের জোরে?'

'বুদ্ধি। বিদ্যে।'

'কিন্তু সংখ্যায় কারা বেশি বলো তো। মানে, ভূমণ্ডলের স্থলবিভাগে?'

রাজেনবাবু উত্তর জানেন না।

'কীটপতঙ্গ,' বললেন নবগোপাল ঘোষ, 'আর এদের কারও কারও স্বভাব বেশ হিংস্র। সর্বভুক-অর্থাৎ আমিষ-নিরামিষ দুইই চলে। এবং সংখ্যায় অগুণতি-যেমন, তোমার লাল পিঁপড়ে।'

রাজেনবাবুর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল।

'মনে করো হঠাৎ যদি লাল পিঁপড়ের বংশবৃদ্ধির হার অনেকগুণ বেড়ে যায়, যদি তাদের খিদেও বেড়ে যায় প্রচণ্ডরকম-তার পরিণতি কী ভাবতে পার?'

রাজেনবাবু ভাবতে চাইলেন না।

'তখন তাদের স্বাভাবিক খাবারে আর কুলোবে না,' বলে চললেন প্রফেসর ঘোষ। 'তখন তারা সমস্ত পশুপাখি, এমনকী মানুষের খাবারেও ভাগ বসাবে। মানুষের খাবার থাকে তাদের নাগালের কাছে-সুতরাং সেটার দিকেই তাদের চোখ পড়বে আগে। অথচ মুশকিলটা কোথায় দেখো-অত্যাচারী জানোয়ারের মতো তাদের বন্দুক দিয়ে মারা যায় না। বিষ দিয়ে মারাও বিপদ আছে, কারণ সে বিষ মানুষের পক্ষেও অনিষ্টকর হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝেছ?'

'বুঝেছি,' বললেন রাজেনবাবু। 'কিন্তু একটা জিনিস বুঝছি না হঠাৎ এ পরিবর্তনটা হবে কেন?'

'হঠাৎই হয়,' বললেন নবগোপালবাবু। 'প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাস বড়ো অদ্ভুত। হাজার হাজার বছর ধরে ঠিক এই ভাবে চলে এসে হঠাৎ কোনো অ্যাকসিডেন্টের ফলে তাদের দেহযন্ত্রে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দেয়। জীবজগতে তখন নতুন ধারার সূচনা দেখা দেয়।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও আমার বাড়ির লাল পিঁপড়ের মধ্যে এমনি কোনো পরিবর্তন দেখা দিয়েছে?'

'রাইট।'

'কিন্তু তাহলে-?'

নবগোপাল ঘোষ চায়ের কাপ রেখে উঠে পড়লেন। তারপর ভরত মালীকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, 'এখানে মাটির থালা পাওয়া যায়?'

'আজ্ঞে বাজারে পাওয়া যায়।'

'দু-ডজন নিয়ে এসো। আর তিনসের টাটকা দুধ। এই নাও পয়সা।'

প্রফেসর ঘোষ তাঁর ব্যাগ থেকে তিনটে সিরাপের শিশি বার করলেন। রাজেনবাবু তাঁর বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে চলেছেন। ভরতও প্লেট আর দুধ এনে দিয়েছে বাজার থেকে। দুধের বালতিতে কিঞ্চিৎ জল মিশিয়ে চার-পাঁচটা মাটির প্লেটে আধাআধি মতন ঢাললেন। তারপর একটা শিশির ঢাকনা খুললেন। তীব্র মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। শিশি ভরতি ঘন তরল পদার্থের রং ঈষৎ হলুদ।

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করলেন রাজেনবাবু।

'লাল পিঁপড়ের খুব প্রিয় খাদ্য,' বললেন নবগোপালবাবু।

প্রতি পে×টের দুধের সঙ্গে বড়ো এক চামচ হলদে পদার্থ ঢেলে দিয়ে বেশ করে গুলে দিলেন তিনি। তারপর প্রত্যেক ঘর ও বারান্দার মেঝেয় একটি করে প্লেট রেখে বললেন, 'আধ ঘণ্টা থাক তারপর দেখবে।'

'তা তো দেখব,' বললেন রাজেনবাবু, 'কিন্তু আমাদের পিঁপড়ের এরকম দশা কেন হল সেটার কিছু বুঝলে?'

'তাও বুঝেছি। এসো আমার সঙ্গে।'

বন্ধুর মতিগতি কিছুই বুঝতে পারলেন না রাজেনবাবু, কিন্তু তাঁর আজ্ঞা পালন করতেই হবে। কারণ তাঁর উপরেই ভরসা।

রাজেনবাবুকে নিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে কম্পাউন্ডের দেয়াল ঘেঁষে নবগোপাল ঘোষ সোজা চলে গেলেন রান্নাঘরের পিছন দিকটায়। সেখানে একটা আমড়া গাছের নীচে একটা ভাঙা শুকনো চৌবাচ্চা। এটা এর আগে রাজেনবাবু কোনোদিন দেখেননি। কারণ এদিকে আসেননি। চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চাইতেই রাজেনবাবু শিউরে উঠলেন।

অজস্র লাল পিঁপড়ে ঘোরাফেরা করছে ওই শুকনো চৌবাচ্চার সিমেন্টের মেঝেতে গাছের পাতা আর খড়কুটোর মধ্যে।

রাজেনবাবু আরও দেখলেন যে মেঝের উপর একরকম কালচে পদার্থ জমে আছে। আসলে কালো নয়, খুব গাঢ় লাল রঙের পাতলা আস্তরণ। এই পদার্থটাকে ঘিরেই পিঁপড়েগুলো ঘোরাফেরা করছে। প্রফেসর ঘোষ বললেন, 'এখানে লাল পিঁপড়ের বাসা খুঁড়ে আমি ঠিক ওইরকম কালচে গুঁড়ো পাই। আর তারপর এই চৌবাচ্চাটা আবিষ্কার করি। এর খানিকটা নমুনা আমি এবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করি। ওই পদার্থটি খেয়েই এখানকার পিঁপড়ের খিদে অত বেড়ে গেছে তা তো কোনো সন্দেহ নেই। এতে খিদে মেটায় না, শুধু বাড়িয়ে তোলে। এবং সেই সঙ্গে হজমশক্তি। আবার এটাও দেখেছি যে এটা বারবার খেতে খেতে পিঁপড়েদের হজম শক্তিতে একটা স্থায়ী পরিবর্তন আসে। এই উত্তেজক পদার্থের সাহায্য ছাড়াই তখন তারা অনেক বেশি পরিমাণ খেতে থাকে। মনে হয় লার্ভাগুলোকে এই জিনিসই খাইয়েছিল শ্রমিক পিঁপড়ে। কারণ এখনকার

সদ্যোজাত পিঁপড়েদের পরীক্ষা করে দেখেছি তারা ওই বয়সের অন্য জায়গাকার লাল পিঁপড়ের তুলনায় অন্তত আড়াই-তিন গুণ বেশি খাওয়ার ফলেই এখানকার লাল পিঁপড়ের আকারও বাড়তে শুরু করেছে। আর সেইসঙ্গে আরও একটা পরিবর্তন এসেছে-রানির ডিম পাড়ার পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে।'

রাজেনবাবু হতবাক হয়ে শুনছিলেন। প্রফেসর ঘোষ থামতে তিনি বললেন, 'কিন্তু ওই পদার্থটা কী?'

নবগোপালবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'আমার নিজের একটা ধারণা আছে। সেটা ঠিক কি না সেটা বোধ হয় ভরতকে জিজ্ঞেস করলে বোঝা যাবে।'

ভরতকে ডাকা হল। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'ও জিনিস তো আমিই ফেলেছিলাম ওখানে, বাবু।'

'সেকী!' রাজেনবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল।

'সেই কবরেজমশাই-যিনি এ বাড়িতে থাকতেন, আপনি আসার আগে তিনি কাশী যাবার সময় কিছু শিশি বোতল কাগজের ঠোঙা-এইসব ফেলে গেছিলেন। তাকের উপরে পড়ে ছিল। আমি ঘর সাফ করব বলে শিশি বোতল খালি করে সব কিছু এই চৌবাচ্চার মধ্যে ফেলে দিই। সেই সব একসঙ্গে মিশে অমনধারা চেহারা হয়েছে।'

'বুঝলে তো!' বললেন নবগোপাল ঘোষ। ওইসব রাসায়নিক বস্তু আর নানান ফলমূলের নির্যাস মিশে তৈরি হয়েছে পিঁপড়ের আশ্চর্য টনিক। কবিরাজ মশাই কি আর জেনেশুনে ও জিনিস তৈরি করতে পারতেন? মনে তো হয় না।'

ভরতের চোখ ছানাবড়া। সে ভাবতে পারেনি এই রাক্ষুসে পিঁপড়ের অত্যাচারের জন্য একরকম সেই দায়ী।

'চলো এবার আরেকটা জিনিস দেখাই,' বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে বললেন নবগোপাল ঘোষ। 'এটা আমার লেটেস্ট আবিষ্কার।'

বাড়ি ফিরে এসে রাজেনবাবু দেখলেন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে-দেয়াল আর মেঝের ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে লাল পিঁপড়ের দল, তাদের লক্ষ্য সেই দুধের প্লেট।

দেখতে দেখতে লাল পিঁপড়েরা দুধের প্লেটে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর দেখতে দেখতে দুধের উপর লাল পিঁপড়ের সর পড়ে গেল। নবগোপালবাবু একটা ছাঁকনি দিয়ে পিঁপড়ের স্তর ছেঁকে ফেলে দিলেন মাটিতে, অমনি নতুন পিঁপড়ের ঝাঁক গিয়ে হুমড়ি দিয়ে পড়ল প্লেটের উপর। রাজেনবাবু অবাক হয়ে দেখলেন ফেলে দেওয়া পিঁপড়েগুলো সব নেতিয়ে পড়ছে।

'ওরা মরবে,' বললেন নবগোপাল ঘোষ, 'কারণ সলিউশনে মারাত্মক বিষ মেশানো আছে। পিঁপড়ের যম।'

এই পিপীলিকা-মারণ যজ্ঞ চলল দু-দিন ধরে তিন বাড়িতে। চারদিনের দিন নবগোপাল ঘোষ কলকাতা ফিরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে রাজেনবাবুকে বললেন, 'আরও এক বোতল সলিউশন রয়েছে-রেখে গেলাম, তুমি আর চৌধুরী ভাগ করে পনেরো দিন পরে পরে একবার করে এই অস্ত্র প্রয়োগ করবে, তাহলে আর পিপীলিকার পুনরুভ্যুত্থানের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।'

‘কিন্তু তুমি ওগুলো কী নিয়ে যাচ্ছ সঙ্গে?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন রাজেনবাবু। প্রফেসর ঘোষের ব্যাগে দুটো কাঁচের শিশি দেখা যাচ্ছে-তার মধ্যে লাল পিঁপড়ে।

নবগোপালবাবু মুখ তুললেন।

‘দেখো রাজেন, মানবজাতির স্বার্থে জীবজগতের এক আশ্চর্য বিবর্তন থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আমার বৈজ্ঞানিক মন যে অতৃপ্ত রয়ে গেল। তাই এই রাক্ষুসে পিঁপড়েগুলোকে সঙ্গে নিচ্ছি। দেখব আরও ওদের কী কী পরিবর্তন হয় এবং কতখানি। ভয় নেই, রাজেন, এই পিঁপড়েরা আর কখনো স্বাধীনভাবে বাঁচবার সুযোগ পাবে না। ওরা চিরটাকাল ল্যাবরেটরিতে বন্দি থেকে আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মেটাবে।’

*শারদীয়া ১৩৮৫*




# নলিনী দাশ

সে রাতের সমস্ত ঘটনাই এখনও আমার কাছে রহস্যাবৃত। সত্যিই কি সেরকম ঘটেছিল? ঘটা কি সম্ভব? নাকি সবটাই সেই ভয়ংকর দুর্যোগের রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম।

কিন্তু ... কিন্তু ... তাই বা কেমন করে হবে? আমাদের নাকি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বাংলো থেকে অনেক মাইল দূরে, পথের ধারে। সকালে কতগুলি লোক সে-পথে উটে চড়ে যাবার সময়ে, আমাদের অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে, তাদের উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল। ভাগ্যিস এনেছিল! শরীরের ওই অবস্থায় দুপুরের প্রচণ্ড রোদে পথে পড়ে থাকলে আমরা সম্ভবত মারা পড়তাম। কিন্তু ... কিন্তু, সেখানে আমরা গেলাম কেমন করে? সেও কি ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নের মধ্যে?

গ্রামে ফিরিয়ে আনতেই সম্পন্ন গৃহস্থ জয়সিংহজির ছেলে বিজয়সিংহকে সবাই চিনতে পেরেছিল, সেবা-শুশ্রূষা করে, একটু সুস্থ করে তুলে, আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। প্রবল জ্বরে বিজয়ের তখনও অচৈতন্য অবস্থা। ডাক্তার এলেন, ওষুধপত্র দিলেন। তবু সেই জ্বরের প্রকোপ চলল বেশ কয়েক দিন। ইতিমধ্যে আমার মেয়াদ শেষ হল। দুঃখিত মনে, তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ না দেখেই আমি দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।

ভীষণ জ্বরের ঘোরে বিজয় ক্রমাগত প্রলাপ বকছিল, এলোমেলোভাবে বারবার কেবল তাদের সেই প্রাচীন হারানো রাজপ্রাসাদের কথাই বলেছিল।

বিজয়ের মা কপালে করাঘাত করে বিলাপ করেছিলেন।

'হায় বাপ! তোদের সে প্রাসাদ তো কবেই স্বয়ং ভগবান কেড়ে নিয়েছেন! এখনও তার কথা কেন?'

প্রলাপের ঘোরে বিজয় যখন বারবার তাঁর পরলোকগত ঠাকুরদার কথা বলেছিল, তখন তার বাবা-মা ভীত হয়ে পড়েছিলেন! তাঁর মা কেঁদে উঠেছিলেন, 'তুইও তাঁর পথে চলবি নাকি বাবা? ভুলে যা-ভুলে যা, মন থেকে মুছে ফেলে দে তাঁর কথা'-

চিন্তিত মুখে জয়সিংহজি বলেছিলেন, 'হারানো অতীতের কথা এত সমস্তক্ষণ চিন্তা করে করেই কি ছেলেটা অসুখে পড়ল? ওকে সেখানে যেতে দেওয়াই উচিত হয়নি দেখছি!'

আমাকে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা, বিজয়ের বন্ধুরা তাকে বোঝাতে পার না যে অতীতের রাজলক্ষ্মীর জন্য আক্ষেপ করে কোনো লাভ নেই! লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক, কাজকর্ম করে আবার নতুন সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে ঘরে আনুক!'

আমি তাঁর কথার উত্তরে মাথা নেড়ে শুধু সায় দিয়েছিলাম। কথা বলব কী? বিজয়ের অসংলগ্ন প্রলাপ শুনতে শুনতে আমার মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। ছাড়া ছাড়া ভাবে বিজয় তাদের প্রাসাদের সেই দীর্ঘ অলিন্দ আর তার ধারে সারি সারি কুলঙ্গিতে রাখা

অপূর্ব সুন্দর মূর্তিগুলির বর্ণনা দিচ্ছিল একে একে আর আমি আমার ‘স্বপ্নে দেখা’ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার হুবহু মিল খুঁজে পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। বিজয় নিজেও তো সেই অলিন্দ কোনোদিন দেখেনি, আর আমি, এর আগে তো তার বর্ণনাও শুনিনি! তবে কি আমরা দু-জনে ঠিক একই স্বপ্ন দেখেছিলাম? সেটা কি সম্ভব?

অবশ্য, বিজয়ের পূর্বপুরুষদের সেই প্রাসাদের কথা আমি বহুবার তার কাছে শুনেছি। কিন্তু, সে হল শোনা গল্পের পুনরাবৃত্তি। বিজয় কেন, তার বাবা কি ঠাকুরদাও সে প্রাসাদ কোনোদিন স্বচক্ষে দেখেননি। কিন্তু সেদিন জ্বরের ঘোরে, বিজয় যা বলেছিল সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট আর উজ্জ্বল বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা, আর সেই বর্ণনা, আমার নিজের ‘স্বপ্ন’ বা অভিজ্ঞতার স্মৃতির সঙ্গে হুবহু এক!

তবে কি কোনো অলৌকিক উপায়ে আমরা দু-জন সে-রাত্রে কোনো এক অতীত যুগে চলে গিয়েছিলাম? আমার আধুনিক বিজ্ঞান-পড়া মন একথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু, সমস্ত ব্যাপারটা যদি স্বপ্ন হয়ে থাকে, তাহলে সেই আশ্চর্য সুন্দর জিনিসটা আমার কাছে এল কী করে?

* * *

এই রহস্যের সমাধান খুঁজতে হলে সমস্ত ঘটনাটা গোড়া থেকে জানা দরকার।

বিজয়সিংহের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পিলানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসে। আমরা দু-জনে কলেজের একই ক্লাসে ভরতি হয়েছিলাম আর স্থান পেয়েছিলাম হোস্টেলের একই ঘরে। ‘রুমমেট’ না হলে হয়তো বিজয়ের সঙ্গে আলাপই হত না। সে ছিল ভীষণ স্বল্পবাক আর অমিশুক, কলেজ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ক্লাসের অধিকাংশ ছেলের সঙ্গে তার ভালো করে পরিচয়ই হয়নি। ওদিকে, আমি বন্ধুবান্ধব ভালোবাসি। সুদূর পশ্চিমবঙ্গ থেকে এতদূরে পড়তে এসে প্রথম কিছুদিন সঙ্গীর অভাবে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম, কতকটা গায় পড়েই বিজয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম।

বিজয় যে দাম্ভিক বা রূঢ় ছিল তা নয়। তার চেহারা ছিল গল্পে বর্ণিত রাজপুতের মতো সুন্দর, তার স্বভাবের মধ্যেও কেমন একটা স্বাতন্ত্র্য আর আভিজাত্য ছিল যে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সহজ ছিল না। একই ঘরে থেকেও অনেকদিন পর্যন্ত আমরা পরস্পরের সঙ্গে কেবল দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনা আর নৈর্ব্যক্তিক জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলেছি, পরস্পরের পারিবারিক বিষয়ে কোনো কথাই বলিনি। ক্রমে বিজয়ের বাবা-মার কথা শুনেছিলাম। তার কোনো ভাইবোন ছিল না সে-কথাও জেনেছিলাম। বলা বাহুল্য তার অনেক আগেই আমার বাবা-মা, ভাইবোনের কথা বিজয়কে বলেছিলাম। তাকে আমাদের বাড়ি যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম যদিও জানতাম যে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে না।

বড়ো বড়ো ছুটিতে সব ছেলেরাই বাড়ি যেত। বিজয়ের মতো যাদের বাড়ি কাছাকাছি, সে সব ছেলেরা অনেক সময়ে দু-চারদিনের ছুটিতেও বাড়ি ঘুরে আসত। আমরা, দূরাগত ছেলেরা দল বেঁধে দিল্লি, আগ্রা, মথুরা, জয়পুর বা চণ্ডীগড় দেখতে যেতাম।

এমনি একটা ছোটো ছুটির আগে বিজয় কিছুটা কুণ্ঠিতভাবে আমাকে বলেছিল, ‘চলো না, এবার ছুটিতে আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি।’

সম্মতি জানাবার আগে আমি হয়তো একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। দ্বিধার সঙ্গে বিজয় বলেছিল, ‘আমরা খুব সাধারণভাবে থাকি, তোমার হয়তো কষ্ট হবে, এখন তো আর-সে যাক, তুমি উর্বর দেশের ছেলে, কখনো মরুভূমি তো দেখনি’-হেসে বলেছিলাম, ‘আমি তো ভাই সাধারণ ঘরেরই ছেলে, চিরদিনই

সাধারণভাবে থেকেছি। মরুভূমির কথা কেবল বইয়ে পড়েছি, স্বচক্ষে দেখতে নিশ্চয় ভালো লাগবে।' তিক্ত হেসে বিজয় বলেছিল, 'ভালো লাগা বা ভালোবাসার জিনিস নয়-তবু-তবু-'

উত্তেজিত হয়ে সে পায়চারি করছিল, 'তবু জানো কি-ওর ওপর আমার যেমন রাগ, তেমনি ওকে ভয় করি-আর তেমনিই ভালোবাসি-'

নিরুত্তাপ, স্বল্পভাষী ছেলেটির এই প্রগলভ উত্তেজনা দেখে খুবই অবাক হয়েছিলাম।

পরে অবশ্য সব কিছুই বুঝেছিলাম।

ছুটিতে বিজয়ের বাড়ি গেলাম। তার বাবা-মা খুব আদরযত্ন করলেন। ছোটোবেলা থেকেই নাকি বিজয় অমিশুক, তার বন্ধু ছিল না, তাই আমার সঙ্গে ছেলের অন্তরঙ্গতা দেখে তাঁরা আমাকেও ছেলের মতন ভালোবেসে ফেললেন।

পরে আরও বেশ কয়েকবার বিজয়দের বাড়ি গেছি। তার বাবা-মার কাছেও তাঁদের পূর্বপুরুষের গল্প শুনেছি। কিন্তু তাঁরা কখনো বিজয়ের সামনে সেসব প্রসঙ্গ তুলতে দিতেন না। যদিও সেই প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত সব কিছুর প্রতি তার প্রচণ্ড আকর্ষণের কথা তাঁরা জানতেন। অথবা, সেই জন্যই হয়তো তার কাছে সেসব কথা বলতেন না।

বিজয়দের পূর্বপুরুষেরা রাজা ছিলেন। একদিকে বীর যোদ্ধা বলে তাঁদের খ্যাতি ছিল, অপরদিকে সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, সব কিছুরই তাঁরা চর্চা করতেন। যেখানে তাঁদের রাজ্য ছিল, সে সমস্ত অঞ্চলই এখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, সেদিনকার জনকোলাহল মুখরিত নগরগুলির প্রাসাদ-মন্দির-গৃহ, শস্যশ্যামল খেত, মাঠ, ফলমূলের বাগান, সব কিছুই বালুকারাশির তলায় চাপা পড়েছে। অবশ্য এ-সব একদিনে ঘটেনি, কয়েকশত বৎসর ধরে মরুভূমি পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করছে, মানুষও একটু একটু করে পূর্বদিকে হটে আসছে; আবার যখন তাদের সেই নতুন বাসস্থান বালির স্তূপে পরিণত হচ্ছে, তখন তারা আরও পূর্বে সরে এসে নতুন জনপদ গড়ে তুলছে।

এইভাবে বহু জনপদ ও সমৃদ্ধ নগরী সেই মরুবালুর তলায় চাপা পড়ে গেছে। শত সহস্র মানুষ তাদের সব ধনসম্পদ হারিয়ে, রিক্তহাতে নতুন জীবনযাত্রা শুরু করেছে। হয়তো সেই সব পরিবারেও পুরাতন ঐশ্বর্যের কাহিনি একটা কিংবদন্তীর মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠাকুরদা-ঠাকুরমারা সেই হারানো সম্পদের গল্প বলে ছোটো ছোটো নাতি-নাতনিদের ভোলান। কিন্তু বিজয় যখন নিভৃতে আমার সঙ্গে তাদের পূর্ব ইতিহাসের কথা বলত, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা আর গভীর আবেগ প্রকাশ পেত!

প্রথম যেবার বিজয়দের বাড়ি যাই, সে আমাকে মরুভূমি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তার বাবা-মা প্রথমে কিছুটা আপত্তি জানিয়ে, শেষে রাজি হয়েছিলেন। ওদের বাড়িও রুক্ষ অনুর্বর জমিতে, কিন্তু আসল মরুভূমি আরও অনেকটা পশ্চিমে, একদিনে দেখে ফিরে আসা কষ্টকর। আগের রাত্রেই আমরা মরুভূমির প্রান্তে একটা বাংলোয় গিয়ে শুয়েছিলাম। কথা ছিল, ভোর হলে আমরা মরুভূমি দেখতে যাব, আবার বেলা বাড়বার আগেই বাংলোতে ফিরে আসব।

কিন্তু ঘুমোতে-না-ঘুমোতেই মাঝরাতে বিজয় আমাকে ডেকে তুলে দিল, সকাল অবধি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারল না।

সেদিন বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি ছিল, বেশ ফুটফুটে চাঁদের আলোয় বালির রাজ্য যেন স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল স্তূপের পরে স্তূপ, টিলার পর টিলা, কেবল বালি, বালি, বালি আর বালি!

পশ্চিমে মুখ করে আমরা দু-জনে একটা টিলার ওপর বসেছিলাম। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখছিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর সে বলেছিল, 'ভাবতে পারো, এই সব টিলার তলায় চাপা পড়ে আছে মানুষের ঘরবাড়ি! কোথাও ছিল মন্দির, কোথাও রাজপ্রাসাদ- এখন সব সমান-ওপর থেকে দেখতে সব একইরকম!'

'তোমাদের প্রাসাদ ঠিক কোথায় ছিল, সেটা কি জানো?'

'একেবারে সঠিক জানি না, তবু লোকমুখে শুনে শুনে একটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি-তা ছাড়া'-

'কী? তা ছাড়া, কী?'

কিন্তু সেদিন বিজয় আর কোনো কথা বলেনি। কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলেছিল।

পশ্চিম থেকে বয়ে আসা মৃদু হাওয়া ভারি ভালো লাগছিল, কিন্তু সেই ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে সামান্য একটু মিহি বালিও ফুরফুর করে উড়ে আসছিল। বিজয় বলল যে, বেলা যত বাড়ে, ততই বাড়ে হাওয়ার গতি আর উড়ে আসা বালির পরিমাণ। দুপুরে দারুণ গরম হয় আর জোর বাতাসে প্রচুর বালি উড়ে আসে, তার মধ্যে পথ চলা বিপদজনক হয়ে পড়ে। আর যখন বালির ঝড় ওঠে তখন প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে উড়ে আসা রাশি রাশি বালির মধ্যে পড়ে কত মানুষ ও পশু যে প্রাণ হারায় তার ঠিক নেই!

আমি বললাম, 'এইভাবে যদি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, ক্রমাগত পশ্চিম থেকে পুবে বালি উড়ে আসতে থাকে, তাহলে ক্রমে সমস্ত ঘরবাড়ি গাছপালা বালিতে চাপা পড়ে যাবে আর সমস্ত মরুভূমিটাই ক্রমে আরও পুবে এগিয়ে আসবে, সে আর বিচিত্র কী?'

সেদিন বিজয় আর কিছু বলেনি, কিন্তু পরে অনেকবার আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আরও কয়েকবার তার সঙ্গে ওই বাংলোয় থেকে মরুভূমি দেখতে গিয়েছি। আশ্চর্য, প্রত্যেকবারই বিজয়ের বাবা-মা প্রথমে খুব আপত্তি করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছেন।

সম্প্রতি ভারত সরকার নাকি নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই মরুভূমির অগ্রগতি রোধ করবার চেষ্টা করছেন। নদীর মুখ ঘুরিয়ে আর খাল কেটে জল এনে মরুভূমির পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনাও নাকি আছে। এই বিষয়ে যত বই পাওয়া যায়, বিজয় আর আমি সবই সংগ্রহ করে পড়ে ফেলেছিলাম।

আমি বলতাম, 'আমরা যতদিনে পাশ করে বেরোব, চাকরি খুঁজব, ততদিনে হয়তো আরও কত নতুন উপায় ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে, তোমাদের মরুভূমির দেশকে শস্যশ্যামল করবার কত নতুন পরিকল্পনা হবে। তুমি নিজেই হয়তো এইসব কাজে হাত লাগাবার সুযোগ পাবে।'

বিজয়ের বাবা-মার কিন্তু সে বিষয়ে কোনো উৎসাহ দেখতে পেতাম না। তাঁরা চাইতেন যে বিজয় পাশ করে কোনো বড়ো শহরে চাকরি নিয়ে বসবাস করুক-রাজস্থান থেকে যদি অনেক দূরে যেতে হয়, সে আরও ভালো!

অবশেষে আমাদের পড়াশোনা আর পরীক্ষা শেষ হল। বাড়ি ফিরে যাবার আগে কয়েকদিনের জন্য বিজয়দের বাড়ি গেলাম, তার মধ্যেই একদিন মরুভূমিতে বেড়াতে গেলাম। যথারীতি আমাদের মধ্যে পরীক্ষার ফল বেরোনো আর চাকরি খোঁজার কথা উঠল।

কথায় কথায় বিজয়কে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কাছাকাছি কোথাও চাকরি কর, এটা তোমার বাবা-মা চান না কেন? তুমি তো তাঁদের একমাত্র ছেলে। এইসব এলাকায় যদি কোনো পরিকল্পনা হয়, তার কাজে তোমারই তো অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজয় বলল, 'ওঁরা তো বোঝেন যে কেবলমাত্র মরুভূমির অগ্রগতি রোধ করেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারব না, আমি চাইব আমাদের সেই লুপ্ত ধনসম্পদ আবার উদ্ধার করতে, যেমন আমার দাদু চেয়েছিলেন-'

কথা অসমাপ্ত রেখে বিজয় হঠাৎ থেমে গেল।

আমি বললাম, 'সে তো খুব ভালো হবে। যখন এখানে আবার জনপদ গড়ে উঠবে, তখন প্রত্নতাত্ত্বিকের দল নিয়ে এসে সে সবও আবার পুনরুদ্ধার করা যাবে।'

'তার জন্য তো দাদু অপেক্ষা করে থাকতে পারেননি, আমিও যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে না পারি-এই হল বাবা-মার ভয়।'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না-জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'তোমার ঠাকুরদাদাকে নিয়ে কী একটা রহস্য আছে বলো তো? তোমার বাবা-মা তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই কথা ঘুরিয়ে নেন, আর তুমিও কথা বলতে বলতে চুপ করে যাও?'

বিজয় বলল, 'রহস্য আর কিছু নয়, আসল কথা দাদুর এই মরুভূমিতে ঘোরার এমন একটা নেশা ছিল যে সমস্ত জীবন ভালো করে বিষয়কর্মে মন দিতে পারেননি। তখন আমাদের খুবই আর্থিক দুরবস্থায় পড়তে হয়েছিল। অবশেষে, বাবা যখন বহুকষ্টে নিজের পায় দাঁড়াতে পারলেন তখন সংসারটাকেও আবার দাঁড় করালেন।'

'তাই বুঝি তোমার বাবা-মা ভয় পান যে তুমিও তোমার দাদুর মতন হয়ে যাবে? কিন্তু, তুমি তো আর পড়াশোনা ছেড়ে কেবল মরুভূমিতে ঘুরতে যাওনি? মাঝে মাঝে এসে ঘুরে গেলে ক্ষতিটা কী?'

বিজয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ; তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'কেন বারবার মরুভূমিতে আসি জানো? না এসে পারি না তাই আসি, আর বাবা-মা সেটা বোঝেন বলেই আসতে দিতে চান না। বার বার এসে আমি দেখতে চাই হাওয়া আবার ঘুরে যায় কি না। আমার রোজ রোজ আসতে ইচ্ছা করে!'

'হাওয়া আবার ঘুরবে কেমন করে? এখানে তো দেখছি সব সময়েই পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে হাওয়া বয়।'

'কিন্তু লোকে বলে যে নাকি অনেক বছর পরে একবার করে হাওয়া ঘুরে যায়, তখন পুব থেকে পশ্চিমে প্রচণ্ড বালির ঝড় ওঠে-'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেকী? কে বলেছে?'

'দাদুর কাছে শুনেছিলাম। তা ছাড়া লোকেও বলে। বাবা-মাও বহুবার শুনেছেন সে-কথা, কিন্তু বিশ্বাস করেননি। আমি দাদুর কথা অবিশ্বাস করতে পারি না।'

'তোমার দাদু কেন এরকম কথা বলতেন?'

‘এরকম একটা প্রচলিত কিংবদন্তী আছে। কিন্তু দাদু বলতেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে।’

সেই অন্ধকার রাতে, আকাশভরা তারার নীচে বসে বিজয়ের ঠাকুরদার অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনি শুনতে শুনতে রাত গভীর হয়েছিল।

ছোটোবেলা থেকেই নাকি বিজয়ের দাদুর অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল এই মরুভূমির প্রতি। অন্য ছেলেরা যখন খেলে বেড়াত, তিনি একা একা মরুভূমির প্রান্তে ঘুরতেন। তখন অবশ্য মরুভূমি এতটা পুবে এগিয়ে আসেনি। এইসব অঞ্চলে দু-একটা গ্রাম ছিল, বিজয়ের দাদুরা তখন এখানেই থাকতেন।

গ্রামে এক আধপাগলা ফকির ছিলেন, তিনিও এই মরুভূমিকে ভীষণ ভালোবাসতেন, আর হয়তো সেইজন্যই, বিজয়ের দাদুকেও খুব বেশি স্নেহ করতেন। একটু সুযোগ পেলেই এই দুই অসমবয়সি বন্ধু এই মরুভূমির ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতেন। ফকির খুব ভালো লোক ছিলেন বলে বিজয়দের বাড়ির লোকেরা এতে কোনো আপত্তির কারণ দেখেননি।

এই ফকিরের কাছেই বিজয়ের দাদু হাওয়া ঘুরে যাওয়ার কথা প্রথম শুনেছিলেন। বৃদ্ধ ফকির নাকি খুব ছোটোবেলায় একবার হাওয়া ঘুরে যাবার কথা শুনেছিলেন, যারা তখন মরুভূমির কাছে ছিল, তাদের নাকি অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আবার হাওয়া একদিন ঘুরে যাবে সেই আশাতেই সেই বৃদ্ধ আর বালক মরুভূমির প্রান্তে বার বার আসতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা ছোটোখাটো বালির ঝড়েও পড়তেন, কিন্তু অভিজ্ঞ ফকির ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার কায়দা কৌশল জানতেন, কোনোদিন তাই তাঁদের কোনো বিপদ ঘটেনি।

এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন তাঁরা এক প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েন। ফকিরের নির্দেশ মতন, মোটা চাদরে মাথা মুখ ঢেকে একটা উঁচু টিলার পুবদিক ঘেঁষে দু-জনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন যাতে পশ্চিম থেকে ঝোড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড বেগটা সোজা ওঁদের গায়ে লাগতে না পারে। কিন্তু হঠাৎ তারা নির্বাক বিস্ময়ে উপলব্ধি করলেন যে ভীষণ বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে অজস্র বালুকণা ছুঁচের মতন ওঁদের সর্বাঙ্গে বিঁধছে-ঝড় আসছে পুবদিক থেকে!

তখন আর কিছু চিন্তা করবার অবস্থা ছিল না। কোনোমতে দাঁড়িয়ে, বসে, হামাগুড়ি দিয়ে টিলা পার হয়ে তাঁরা পশ্চিম পৌঁছেছিলেন, যথারীতি মাথা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েছিলেন। ক্রমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। কতক্ষণ এই ঝড় চলেছিল তাঁরা জানেন না। যখন জ্ঞান হল, তাঁরা দেখলেন যে এক অপরূপ মনোহর নতুন রাজ্যে এসে পড়েছেন। দূরে দেখা যাচ্ছে অপূর্ব সুন্দর মন্দিরের চুড়ো, ছোটো বড়ো অট্টালিকা আর প্রাসাদের খিলান ও গম্বুজ। তাঁরা যেন এক স্বপ্নপুরীতে এসে পড়েছিলেন। আর সেই স্বপ্নের ঘোরেই দাঁড়িয়ে উঠে সেই অজানা রাজ্যের দিকে ছুটেছিলেন।

এই পর্যন্ত বলে বিজয় থেমেছিল।

আমি রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘তারপর? তারপর কী হয়েছিল?’

বিজয় মৃদুস্বরে বলল, ‘দাদুদের ভাগ্য নেহাতই মন্দ ছিল সেদিন, তাঁরা সেইসব প্রাসাদ মন্দিরের কাছে পৌঁছোবার আগেই আবার প্রচণ্ড বালির ঝড় শুরু হয়েছিল, এবার পশ্চিম দিক থেকে! তাঁরা আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন-যখন জ্ঞান হল, তখন আবার দেখেন যে মরুভূমির বুকে শুয়ে আছেন। যতদূর দৃষ্টি চলে, বালি, বালি আর বালি-বালির স্তূপ আর টিলা, উড়ে আসা বালি ওঁদের প্রায় কবরস্থ করে ফেলেছে-কোনোদিকে কোনো বাড়ি

ঘরের চিহ্ন নেই, এমনকী কোনদিকে কোন কোন টিলার নীচে সেসব চাপা পড়েছে তাও বোঝার উপায় নেই।'

আমি বললাম, 'কী দুঃখের কথা।'

বিজয় কেবল মাথা নেড়ে সায় দিল।

এই ঘটনার পরে নাকি সেই বৃদ্ধ ফকিরের মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বাঁচেনওনি আর বেশিদিন। তাঁদের মুখে হাওয়া ঘুরে বাড়িঘর বেরিয়ে পড়া, আবার উলটোমুখো বাতাস বয়ে সব বালি চাপা পড়ার কথা শুনে বিশেষ কেউ বিশ্বাস করেনি। কেবল গ্রামের দু-চারজন অতিবৃদ্ধ মানুষ বলেছিলেন যে এরকম ঘটনার কথা অতীতেও আরও শোনা গেছে। বিজয়ের বাবা-মার মনে দৃঢ় ধারণা যে বালির ঝড়ে অজ্ঞান হয়ে তাঁরা এসব স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঠাকুরদার বাবা-মাও তাই মনে করেছিলেন, তাঁকে তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজয়ের ঠাকুরদার নাকি এমনই নেশা ধরে গিয়েছিল যে প্রতিদিন মরুভূমির প্রান্তে ঘুরে আসতেন। পড়াশোনা করলেন না, বড়ো হয়ে বিষয়কর্ম কিছুই দেখতেন না। বিজয়ের বাবাকে বহু কষ্টে অভাবের সংসারে নিজের চেষ্টায় মানুষ হতে হয়েছিল। কাজেই, বিজয়কে ছোটোবেলা থেকেই দাদুর সঙ্গী হয়ে মরুপ্রান্তে ঘুরতে দেখে যে তার বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়বেন, সেটা আর আশ্চর্য কী?

ক্রমে যখন এইসব অঞ্চল প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হল, তখন তাঁরা আরও অনেকটা পুবে, তাঁদের বর্তমান বাসস্থানে নতুন বাড়ি করে চলে যান। তখনও বিজয়ের ঠাকুরদা সুবিধা পেলেই কোনো পথযাত্রীর উটে চড়ে মরুভূমির প্রান্তে চলে আসতেন, আর বাবা-মার চোখ এড়িয়ে বিজয়ও তাঁর সঙ্গ নিত। তখন বিজয়ের বাবা-মা সকলকে বলে দিলেন যেন কেউ তাঁদের মরুভূমিতে নিয়ে না আসে! বৃদ্ধ বয়সে এইভাবে মরুভূমিতে ঘুরলে তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না!

এত করেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। সকলকে ফাঁকি দিয়ে বিজয়ের বৃদ্ধ ঠাকুরদা একদিন পায়ে হেঁটে এতটা পথ একাই পার হয়ে মরুভূমিতে চলে এসেছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, বেশ কয়েকদিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর প্রায়-পুঁতে-যাওয়া মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

এতদিনে বুঝতে পারলাম কেন বিজয়ের এই প্রচণ্ড মরুভূমির নেশা, আর কেন সে বিষয়ে তার বাবা-মার এই নিদারুণ আশঙ্কা।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বিজয় চিৎকার করে উঠল 'ঝড়! ঝড়! দারুণ ঝড় আসছে বন্ধু- তাড়াতাড়ি টিলার পুবদিকে নেমে মাথা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ো।'

তার নির্দেশমতো কাজ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রায় একসঙ্গে দু-জনেই বুঝতে পারলাম যে প্রচণ্ড বালির ঝড় উঠেছে, কিন্তু, হাওয়া পশ্চিমদিক থেকে আসছে না-বইছে পূর্বদিক থেকে!



কোনোমতে, প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে, টিলার পশ্চিমে নেমে আমরা নিজেদের কোট খুলে, তাই দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লাম উপুড় হয়ে। প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যেতে লাগল, মনে হল যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। সে যে কী সাংঘাতিক অনুভূতি তা বুঝিয়ে বলার মতন ভাষা আমার নেই। কারও যদি জীবন্ত কবরস্থ হবার বা জলে ডোবার অভিজ্ঞতা থাকে, সেই কেবল উপলব্ধি করতে পারবে সেই নিদারুণ দম-বন্ধ-হয়ে-আসা অবস্থাটা কেমন!

কতক্ষণ যে এরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম তা জানি না, হঠাৎ টের পেলাম যে বিজয় আমার দুই কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে, উত্তেজনায় সে ভালো করে কথা বলতে পারছে না, কেবল আঙুল বাড়িয়ে কী যেন দেখাচ্ছে! ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চোখ মেলে তাকিয়ে আমিও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তখনও গভীর রাত, আকাশভরা ঝলমলে তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখতে পেলাম যে অনতিদূরে বালির উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলি প্রাসাদের গম্বুজ আর মন্দিরের চুড়ো।

বিজয় কোনো কথা বলেনি। বলবার দরকারও ছিল না। দুইজনে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই অট্টালিকার দিকে ছুটলাম-মানে সেই বালির উপর দিয়ে যতটা জোরে ছোটা সম্ভব।

একটা প্রাসাদের চুড়োগুলোই কেবল বালির ওপর জেগে উঠেছিল, বাকি প্রাসাদটা তখনও বালির তলায় চাপা ছিল। কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম যে সমস্ত জানলা মোটা মোটা সেকেলে কাঠের কারুকার্য করা পাল্লা দিয়ে শক্ত করে বন্ধ-দু-জনে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলেও একটা পাল্লাও একচুলও নাড়াতে পারলাম না।

অবশেষে একটা কপাট খুলে গিয়েছিল। টর্চের আলোয় আমরা সেই অন্ধকার রাতে, জানলা দিয়ে অচেনা গৃহে প্রবেশ করেছিলাম। ভিতরেও বালি ছিল-বন্ধ কপাটের ভিতর দিয়ে গলে আসা মিহি বালি। কিন্তু বালিতে সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়নি। একটা মস্ত লম্বা প্যাসেজের মধ্য দিয়ে আমরা কিছুদূর গিয়েছিলাম। দু-ধারে সারি সারি কুলঙ্গিতে সাজানো ছিল সুন্দর কারুকার্য করা সব পাথরের মূর্তি-কত দেবদেবী, যক্ষ-যক্ষিনী, কিন্নর-কিন্নরী, আর নাম-না-জানা অদ্ভুত সব কল্পিত জীবজন্তুর মূর্তি।

খুব বেশি দূর এগোতে সাহস হয়নি আমাদের। বহুদিন চাপা পড়ে থাকা এই গৃহের আবহাওয়া এমন বন্ধ দম-বন্ধ-করা যে, কিছু দূর গিয়েই আমরা হাঁফিয়ে পড়েছিলাম-তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে মুক্ত বাতাসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চেয়েছিলাম। বেরিয়ে এসে পাল্লা দুটো আবার চেপে বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা আমাদের

ভাগ্যে লেখা ছিল না। বাইরে আসার কিছুক্ষণের মধ্যে আবার প্রচণ্ড বালির ঝড়ের মধ্যে পড়লাম-এবার হাওয়া বইছিল পশ্চিম দিক থেকে।

তারপর? তারপরের ঘটনাগুলো আজও আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। ভালো করে সব কথা মনে করতে পারি না-কেমন যেন সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। সেই নিদারুণ বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমরা কি ভূতে-তাড়া-খাওয়া মানুষের মতন মাইলের পর মাইল ছুটে চলেছিলাম? যাই করে থাকি সেটা আমরা সচেতনভাবে ভেবেচিন্তে করিনি- নিজেদের অজ্ঞাতসারে জীবনরক্ষার জৈব তাগিদে করেছিলাম। অবশেষে দেহযন্ত্র যখন আর কাজ করতে পারেনি, তখন অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম। তা না হলে সেই মরুভূমির ধারের বাংলো থেকে অত দূরে আমাদের পরদিন পাওয়া গিয়েছিল কেন?

কিন্তু তার আগের ঘটনাগুলো? সেগুলো কি সত্যি ঘটেছিল? সত্যিই কি মরুভূমির হাওয়া ঘুরে গিয়েছিল? বহুদিন চাপা পড়ে থাকা অট্টালিকার শিখর কি সত্যি বেরিয়ে পড়েছিল? আমরা কি সত্যিই তার মধ্যে ঢুকেছিলাম?

মন বলে, স্মৃতি বলে নিশ্চয় ঢুকেছিলাম, নাহলে এত স্পষ্ট সে সব জিনিসের কথা মনে আছে কী করে? স্বপ্ন তো এমন হয় না।

জানি, এ সব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, ভাববে যে হয় আমি বানিয়ে বলছি, নয় তো বালির ঝড়ে অজ্ঞান হয়ে অসুস্থতার ঘোরে স্বপ্নের মধ্যে এসব দেখেছি। তাদের সন্দেহ আর অবিশ্বাস দূর করবার জন্য কোনো কিছুই প্রমাণ করতে পারব না, কারণ নিশ্চিত জানি যে পশ্চিম থেকে উড়ে আসা বালুকা রাশি সেই অট্টালিকার উচ্চতম চুড়োও ঢেকে ফেলেছে। এমনকী, ঠিক কোনখানে যে সেই অট্টালিকা আছে, তারও কোনো চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু সবই যদি আমার স্বপ্ন বা কল্পনা হয় তাহলে এই অপূর্ব সুন্দর কিন্নরীর মূর্তি আমার কাছে আসল কেমন করে?

স্বপ্নের মতন মনে পড়ে যে সেই রহস্যময় অলিন্দের মূর্তিগুলি মুগ্ধ চোখে দেখবার সময়ে একটি ছোট্ট মূর্তি তুলে বিজয় আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল। বলেছিল, 'নাও ভাই আমার স্মৃতি চিহ্ন! দেশে গিয়ে আমার কথা মনে রেখো।'

সমস্ত ঘটনাটাই তাই আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত, ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পাই না! যখনই ভাবি সযত্নে-তুলে-রাখা মূর্তিটা বার করে দেখি, সুন্দরী কিন্নরী আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসে!

*শারদীয়া ১৩৮৫*






## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হিমালয়ের খুব গহন অঞ্চলে দু-জন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একজন খুব রোগা, লম্বা আর শুকনো চেহারার বুড়ো। আর একজন বেশ শক্ত, সমর্থ, জোয়ান কিন্তু তার মাথার চুলের মাঝখানে একটা গোল গর্ত। কেউ একসময় তার মাথায় ওই জায়গায় চুল কেটে নিয়েছিল, সেখানে আর চুল গজায়নি।

হিমালয়ের এরকম জায়গায় কোনো মানুষজন দেখা যায় না। পরপর বিরাট বিরাট পাহাড়, যেন একেবারে আকাশচুম্বী, আর মাঝে মাঝে উপত্যকা। এ ছাড়া দারুণ গভীর সব খাদও আছে। পাহাড়ের চূড়াগুলোয় বরফ কিন্তু মাঝামাঝি জায়গায় বেশ ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যেই থাকে ওই লোক দু-জন। ওদের বাড়িঘর কিছু নেই। রাত্তির বেলা গাছতলায় ঘুমোয় আর সারাদিন টোটো করে ঘোরে।

এখানকার জঙ্গলে ফলমূল বিশেষ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তাও খাওয়া যায় না, এমন বিস্বাদ। তবে কিছু খরগোশ আর হরিণ আছে। ওরা তাই মেরে খায়। বুড়ো লোকটির আর শিকার করার ক্ষমতা নেই, জোয়ানটির কাঁধে ঝোলে ধনুক আর কয়েকটা তির-ভরতি তূণীর। এমনি জামাকাপড়ও নেই ওদের, গাছের বাকল দিয়ে কোনোরকমে পোশাক বানিয়েছে।

পরপর দু-দিন ওরা কোনো শিকার খুঁজে পায়নি। পেট জ্বলছে খিদেয়। এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে এসে ওদের মনে হচ্ছে সব জন্তুজানোয়ার বুঝি ওদের ভয়ে নিরুদ্দেশে চলে গেছে।

জোয়ানটি বলল, 'মামা, আর যে পারি না।'

বুড়ো লোকটি বলল, 'ওরে আশু, আমিই কি আর পারছি! কিন্তু উপায় তো নেই, বেঁচে থাকতে হবেই, আর বাঁচতে হলে খাদ্যও খুঁজতে হবে।'

আশু বলল, 'এই বনজঙ্গল আর ভালো লাগে না। চলো, যেখানে মানুষজন আছে, সেখানে যাই!'

মামা বলল, 'খবরদার না! ও কথাও বলিস না! লোকজনরা যদি আমাদের চিনে ফেলে? তবে সর্বনাশ হবে!'

আশু বলল, 'এতকাল পরে আমাদের কে চিনবে? ওঃ খিদেয় আমার পেট একেবারে পুড়ে যাচ্ছে চিঁ-হিঁ হিঁ-হিঁ।'

মামা চমকে উঠে বললেন, 'ওকী! অমন শব্দ করছিস কেন?'

'খিদে পেলে আমার অমন হয়!'

‘না, না, ছি! অমন করতে নেই! ছোটোবেলায় তোর ওই দোষ ছিল, অনেক কষ্টে সারিয়েছি!’

‘চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ, মামা, আমি আর পারছি না, চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।’

‘আরে ছি ছি ছি ছি, অমন করে না। চল চল, খাদ্য খুঁজে দেখি।’

আরও কিছুক্ষণ বনে বনে ঘুরল ওরা। তারপর মামাই বেশি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর।

সঙ্গেসঙ্গে গাছের গুঁড়িটা নড়ে উঠল!

মামা উলটে চিৎপাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ভাগনে আশু তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে ফেলল। মামা বলে উঠল, ‘ওরে বাপ রে, এটা কী রে?’

সেটা আসলে একটা ময়াল সাপ। বনের শুকনো পাতায় তার মুখটা ঢাকা পড়ে আছে। এবার সে সরাৎ করে মাথাটা ঘুরিয়ে আনল এদিকে।

ভাগনে আর মামা দু-জনেই কিছুটা সরে দাঁড়িয়েছে। মামা প্রথমে চমকে উঠেছিল, কিন্তু এখন আর মুখে বেশি ভয়ের চিহ্ন নেই।

ভাগনে ধনুকে তির জুড়ে বলল, ‘মামা, আজ এই সাপটাকে মেরে তারপর এটাকে পুড়িয়ে খাবে?’

মামা বলল, ‘আরে ছি ছি, রাম রাম! আমরা উচ্চ বংশের লোক, ব্রাহ্মণ, আমরা কখনো অসভ্য বুনো লোকদের মতন সাপ খেতে পারি!’

ভাগনে বলল, ‘এখানে কে আমাদের দেখতে যাচ্ছে।’

মামা বলল, ‘তা ছাড়া এই সাপটা কোনো শাপগ্রস্ত মুনি-ঋষি কিংবা বিশিষ্ট লোক কি না তাই বা কে জানে। ওকে মেরে কাজ নেই।’

এমন সময় সাপটা মুখ ঘুরিয়ে এনে মামার একখানা পা কামড়ে ধরল।

মামা তাতে একটুও ভয় না পেয়ে হাসতে হাসতে বলল, ‘ওরে, তাহলে এটা মুনি-ঋষি নয়, আসল সাপ!’

ভাগনে তখন সাপটার মাথায় একটা ধারাল তির ছুড়ল। সাপটা অমনি মামার পা ছেড়ে দিয়ে ছটফট করতে লাগল যন্ত্রণায়।

ভাগনে সাপটাকে একেবারে মেরে ফেলবার জন্যে আর একটা তির ছুড়তে যাচ্ছিল, মামা তাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘ওরে আশু থাক, থাক! আর মারবার দরকার নেই। আমরা সত্যিই তো আর সাপ খাব না। চল।’

সাপটা যে মামার পায়ে কামড়ে দিয়েছে, তাতেও মামার পায়ে একটুও দাঁত বসেনি, রক্তও বেরোয়নি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাগনেকে মামা টানতে টানতে নিয়ে গেল সেখান থেকে।

আরও প্রায় দু-ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে কিছুই না পেয়ে বিরক্ত আর ক্লান্ত হয়ে ওরা একটা খাদের ধারে বসল। তারপরই চমকে উঠল একটা গাছের দিকে তাকিয়ে।

গাছটা উঠেছে একেবারে খাদের ধার ঘেঁষে। গাছটা বেশ বড়ো, লম্বা ধরনের, সোজা উঠে গেছে। নীচে কোনো ডালপালা নেই, একেবারে ডগার কাছে দু-টিমাত্র ডাল, তাতে

কয়েকটি ফল ফলে আছে। গাছটাকে দেখতে অনেকটা ইউক্যালিপটাস গাছের মতন, আর ফলগুলো আমের মতন। এমন আশ্চর্য গাছ এই জঙ্গলে আর একটাও নেই।

মামা বলে উঠল, 'আরে!'

ভাগনে বলল, 'এতক্ষণে বাঁচলুম, এবার খিদে মেটাব, চিঁ-হিঁ-হিঁ।'

মামা বলল, 'চুপ কর। এটা কী গাছ জানিস? বহু ভাগ্যে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এর নাম মৃতসঞ্জীবনী। এ গাছের ফল খেলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে।'

ভাগনে বলল, 'মরা মানুষের কথা আমরা জানি না। এই ফল খেলে আমাদের পেট তো ভরবে। চিঁ-হিঁ-হিঁ!'

মামা বলল, 'ছিঃ, আশু, এমন আওয়াজ করে না। ফলগুলো কী করে পাড়া হবে, সেই কথা ভাব। ওই একট ফল খেলেই আমাদের পেট ভরে যাবে।'

গাছটায় ওঠা অসম্ভব। নীচে কোনো ডালপালা নেই, গা-টা মসৃণ। ফলগুলো এমন পাকা পাকা রসে ভরা যে দেখলেই লোভ হয়।

ভাগনে বলল, 'সে আমি ব্যবস্থা করছি।'

সে অমনি ধনুকে তির জুড়ল। তারপর এক চোখ বন্ধ করে ছুড়ল তির। ভাগনের হাতের টিপ বেশ ভালোই, তিরটা গিয়ে বিঁধল একটা ফলে। কিন্তু ফল-সমেত তির মাটিতে না পড়ে গিয়ে পড়ল খাদে। ভাগনে বলল, 'এই রে।'

মামা বলল, 'ইস অমন দামি ফল তুই নষ্ট করলি?'

তির দিয়ে ফল পাড়ায় সুবিধে হবে না। তাহলে কী করা যায়? গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে দু-জন ওপরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

ভাগনে বলল, 'মামা, এক কাজ করা যাক। তুমি আমার কাঁধের ওপর দাঁড়াও। তাহলে তুমি ঠিক হাত পেয়ে যাবে।'

মামা বলল, 'ওরে বাপরে, এই বুড়ো শরীর নিয়ে তা কি আমি পারব?'

ভাগনে বলল, 'তাহলে তোমার কাঁধে আমি উঠি?'

মামা বলল, 'ওরে না, না, তোর ভার আমি সইতে পারব না। তার চেয়ে আমিই উঠছি বরং।'

ভাগনে তখন হাঁটু গেড়ে বসল, মামা তার দু-কাঁধে পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্যালান্স রাখবার জন্য মামা এক হাতে খামচে ধরল ভাগনের মাথার চুল। তাতে চুলের মাঝখানের গর্তটাতেও হাত লেগে গেল।

ভাগনে বলল, 'উঁহুহু, ওখানে হাত দিয়ো না। ওখানে হাত দিলে এখনও ব্যথা লাগে।'

তারপর ভাগনে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। মামা এক হাতে গাছটা ধরে অন্য হাত বাড়িয়ে দিল ওপরের দিকে। তাতেও ঠিক হাত পাওয়া যায় না। মামা ডিঙ্গি মেরে আর একটু উঁচু হবার চেষ্টা করতে তার আঙুলের ডগা ছুঁয়ে গেল একটা ফলকে। কিন্তু ধরা যায় না।

ভাগনে জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে?'

মামা বলল, 'আর একটু উঁচু।'

ভাগনে আঙুলে ভর দিয়ে আর একটু উঁচু হল। মামা তখন দু-হাত তুলে গাছের একটা ডাল ধরবার চেষ্টা করল কোনোক্রমে।

ফলসুদ্ধ একটা ছোটো ডাল ধরামাত্রই সেটা ভেঙে গেল মটাস করে, তাল সামলাতে না পেরে মামাও পড়ে গেল হুড়মুড়িয়ে।

ভাগনে চোখ কপালে তুলে দেখল, একটা ফল দু-হাতে নিয়ে মামা পড়ে যাচ্ছে খাদের মধ্যে। ভাগনে হাত বাড়িয়েও কিছু করতে পারল না!

সে খাদ যে কত গভীর তা চোখে দেখে বোঝা যায় না। নীচের দিকটা মিশমিশে অন্ধকার। ভাগনে হায় হায় করে উঠল।

ফল খাওয়া তো হবেই না, সে তার মামাকেও হারাল। মামা যতই বুড়ো হোক, তবু তো একজন কথা বলার সঙ্গী ছিল। এখন তাকে একা থাকতে হবে।

সে কেঁদে চেঁচিয়ে উঠল, 'মামা-!'

অমনি খাদের বহু নীচ থেকে খুব অস্পষ্ট গলায় উত্তর এল, 'আশু-।'

ওরকম খাদে পড়ে গেলে কোনো মানুষ কিছুতেই বাঁচতে পারে না। কিন্তু মামা বেঁচে আছে।

ভাগনে আবার চেঁচাল, 'মামা, তুমি কোথায়?'

মামা সেইরকম বহুদূর থেকে উত্তর দিল, 'আমি এখানে। ওপরে উঠার উপায় নেই, খাড়া পাহাড়!'

ভাগনে বলল, 'আমিই বা নামব কী করে?'

মামা বলল, 'তুই নামতে পারবি না! বি-দা-য়! আ-র আ-মা-দে-র দে-খা হ-বে না।'

ভাগনে বলল, 'মামা, আমি যেকোনো উপায়ে হোক তোমায় উদ্ধার করব। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই!'

খিদে তেষ্টা ভুলে গিয়ে ভাগনে দৌড়োতে লাগল উলটো দিকে ফিরে। তার একটা কথা মনে পড়েছে। মামাকে উদ্ধার করার সেই একটা মাত্র উপায়ই আছে।

এখান থেকে তিনখানা পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে। অত দূরে তারা বহু বছর যায়নি। মামাই বারণ করত সব সময়। ওখানে বিপক্ষ দলের একজন থাকে। এখন বাধ্য হয়েই তার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে হবে।

এক-একটা পাহাড় পেরিয়ে যেতে লাগল ভাগনে। মাঝখানে একটা ঝরনার জল খেয়ে পেট ভরিয়ে নিল। একসময় মাথার ওপর দিয়ে একটা এরোপে×ন যেতে দেখে সে লুকিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে। সে এরোপ্লেনের শব্দে ভয় পায় না বটে, কিন্তু তাকে কেউ দেখে ফেলুক, এটা সে চায় না।

শেষ পর্যন্ত তিনখানা পাহাড় ডিঙিয়ে সে উপস্থিত হল একটা উপত্যকায়। সেখানে একটা ঝরনার পাশে গাছের ছায়ায় একটি ছোট্ট বাঁদর শুয়ে আছে।

ভালো করে দেখলে অবশ্য বোঝা যায়, সেটি বাঁদর নয়, হনুমান। মুখটি কালো, চার পায়ের হাতের পাঞ্জাও কালো, লেজটি বেশ লম্বা।

হনুমানটি ঘুমিয়ে ছিল। ভাগনে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে কাতর গলায় ডাকল, 'প্রভু! প্রভু!'

দু-তিনবার ডাকার পর হনুমানটি চোখ মেলে বলল, 'আঃ ! কে রে বিরক্ত করে!'

হনুমানটি সত্যিই মানুষের মতন কথা বলতে পারে। কারণ ইনি যে-সে হনুমান নন, ইনি রামায়ণের সেই হনুমান। রামচন্দ্রের সেবক। এঁর তো মৃত্যু নেই, ইনি অমর, যতকাল পৃথিবী থাকবে, ততকাল ইনিও বেঁচে থাকবেন। আগে এঁর শরীরটা ছিল ইলাস্টিক, ইচ্ছে মতন বড়ো কিংবা ছোটো করা যেত। বহুকাল কেটে গেছে বলে এখন এঁর শরীরের কলকবজায় মরচে পড়েছে, এখন আর শরীরটা বড়ো হয় না।

হনুমানের প্রশ্ন শুনে ভাগনে বলল, 'আজ্ঞে আমি দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা।'

হনুমান বললেন, 'আমায় এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন?'

'আজ্ঞে আমার বড়ো বিপদ।'

'তোমার বিপদ তাতে আমি কী করব। যাও, যাও।'

'প্রভু, আমি বহুদূর থেকে এসেছি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।'

'কী আপদ! এটা আবার এখানে এত উৎকট শব্দ করে কেন? যা, যা!'



'প্রভু, আমার মামা খাদে পড়ে গেছেন! তাকে আপনি বাঁচান! ইয়ে, মানে বাঁচাতে হবে না, উদ্ধার-'

'তোমার মামা খাদে পড়েছেন, বেশ করেছেন। আমি তাকে উদ্ধার করতে যাব কেন? তোমার মামাটা কে?'

'আমার মামার নাম কৃপ। একসময় ছিলেন মহাবীর। কৌরব-পাণ্ডবদের পাঠশালায় অস্ত্র শিখিয়েছেন।'

'হু:। ভারি তো মহাবীর। কোন যুদ্ধটা তিনি জিতেছেন শুনি? তাকে উদ্ধার করার কী দায় পড়েছে আমার?'

'প্রভু আমরা তো মোট সাতজন আছি। আমরা যদি পরস্পরকে বিপদের সময় সাহায্য না করি, তাহলে কে করবে বলুন? এতদিন পরও শত্রুতা মনে রাখতে আছে?'

'তা সাতজন যখন আছে, তখন অন্য কারোর কাছে যাও না। আমাকে বিরক্ত করছ কেন?'

‘আর কার কাছে যাব বলুন। আমাদের মধ্যে বলি আছেন পাতালে। আর ব্যাসদেব সকলের ঠাকুরদা, অতি বুড়ো মানুষ, তাঁকে কি খাদে নামতে বলা যায়? তা ছাড়া, শুনেছি তিনি থাকেন কাশীতে। বিভীষণ আছেন শ্রীলঙ্কায়। পরশুরাম দক্ষিণ সমুদ্রতীরে তপস্যা করতে চলে গেছেন, এদিকে আর আসেন না। রইলাম বাকি আমরা তিনজন। এখন আপনি যদি সাহায্য না করেন-‘

‘আমি এত বুড়ো হয়েছি, আমার গায়ে আর শক্তি নেই। নড়তেচড়তেই পারি না, আমি যাব খাদে নামতে!’

অশ্বত্থামা এবার রেগে গিয়ে ধনুকে বাণ জুড়ে বলল, ‘তবে রে ব্যাটা, হনুমান, এত করে বলছি, তবু তুই যাবি না? তাহলে তোকে মেরেই শেষ করব।’

হনুমান চোখ পিটপিট করে একটু দেখলেন অশ্বত্থামাকে। তারপর হঠাৎ তাঁর লেজটা দিয়ে অশ্বত্থামার গলায় তিন পাক জড়িয়ে তাঁকে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দিলেন।

আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে হনুমান বললেন, ‘বুড়ো হয়েছি বলে কি গায়ে একটুও শক্তি নেই যে তোর মতন একটা চুনোপুঁটিকেও টিট করতে পারব না?’

লেজের পাকে বন্দি অবস্থায় অসহায় ভাবে অশ্বত্থামা হনুমানের স্তব করতে লাগল। সে বলল, ‘হে প্রভু, আপনাকে একটু উত্তেজিত করার জন্যই আমি মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিলাম। নইলে আপনাকে ভয় দেখাব এমন সাধ্য কী আমার। আপনি মহা শক্তিমান, আপনি জন্মাবার পরই আকাশের সূর্যকে একটা ফল ভেবে এক লাফে ধরতে গিয়েছিলেন, আপনি এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন, আপনার মতো মহাবীর আর কেউ নেই …’ ইত্যাদি!

প্রশংসা শুনে একটু খুশি হলেন হনুমান।

তারপর অশ্বত্থামার গলায় তাঁর লেজের পাক একটু আলগা করে বললেন, ‘হ্যাঁ, একসময় ওসব করেছি বটে, কিন্তু এখন আর লাফঝাঁপ দিতে ভালো লাগে না। মরণ নেই, তাই কোনো রকমে বেঁচে আছি।’

অশ্বত্থামা বলল, ‘কিন্তু আপনি ছাড়া কেউ পারবে না আমার মামাকে বাঁচাতে। আপনি লঙ্কা থেকে লাফিয়ে মন্দার পাহাড়ে গিয়েছিলেন, আর হিমালয়ের একটা খাদ লাফানো তো আপনার কাছে নস্যি। ছোট্ট একটা লাফ দিলেই হবে।’

হনুমান জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথায় সে পড়েছে?’

অশ্বত্থামা হাত তুলে তিনটে পাহাড় দূরে জায়গাটা দেখালেন।

হনুমান বললেন, ‘ওরে বাবা, অতদূর আমি হাঁটতেই পারব না, হাঁটুতে দারুণ ব্যাথা।’

‘আজ্ঞে, হাঁটতে হবে কেন? আপনি এক লাফেই তো পৌঁছে যেতে পারেন।’

‘বুড়ো বয়সে যখন-তখন কেউ তিড়িং তিড়িং করে লাফায়? একবার লাফালে সেই ঢের। আমি যদি-বা লাফিয়ে যাই, তুই যাবি কী করে?’

‘আপনি যদি আমায় পিঠে করে নিয়ে যান।’

‘লজ্জা করল না ওই কথাটা বলতে? আমি বুড়ো মানুষ, তোর মতন একটা জোয়ানকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাব? তুই যদি আমায় ঘাড়ে করে নিয়ে যাস, তাহলে যেতে পারি।’

শেষ পর্যন্ত তাই করতে হল, হনুমান কিছুতেই হেঁটে বা লাফিয়ে যেতে রাজি নয়। অশ্বত্থামা তাকে কাঁধে করে সেই তিনখানা পাহাড় ডিঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পরদিন সকালে পৌঁছোল খাদটার কাছে।

অমররা কিছুতেই মরবে না, কৃপ বেঁচে আছে ঠিকই, তবু জ্ঞান আছে কি না জানবার জন্য অশ্বত্থামা ডাকল, 'মামা-'

খাদের তলা থেকে উত্তর এল, 'আশু, আমায় এখান থেকে তোল, এখানে বড্ড পিঁপড়ে-'

অশ্বত্থামা বলল, 'মামা, ভয় নেই, ব্যবস্থা হয়ে গেছে, হনুমানজি এসেছেন।'

হনুমান ততক্ষণ দেখলেন গাছটাকে। বয়সের জন্য চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে, সব জিনিস ভালো দেখতে পান না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা মৃতসঞ্জীবনী গাছ না?'

অশ্বত্থামা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই গাছের ফল পাড়তে গিয়েই তো-'

হনুমান অমনি এক লাফে গাছটায় উঠতে গেলেন।

কিন্তু কী কাণ্ড, হনুমান মোটে গাছটার আধখানা উঁচু পর্যন্ত উঠতে পারলেন, তারপরই পড়ে গেলেন ধপ করে। আর একটু হলেই খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিলেন।

হনুমান বললেন, 'ইস, দেখলি কী অবস্থা হয়েছে আমার। এইটুকুও লাফাতে পারি না। খাদ থেকে তোর মামাকে তুলব কী করে?'

অশ্বত্থামা নিরাশ হয়ে বলল, 'তাহলে কী হবে?'

'দেখছি কী ব্যবস্থা করা যায়!'

হনুমান গাছটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন, আর আস্তে আস্তে উঠতে লাগলেন গাছটা বেয়ে। নিজের জাতের এই পুরোনো অভ্যেসটা তিনি এখনও ভোলেননি। ক্রমে একেবারে উঠে গেলেন গাছের ডগায়।

একটা ফল ছিঁড়ে কামড়েই তিনি বললেন, 'আঃ , কী অপূর্ব স্বাদ!'

অশ্বত্থামা লোভীর মতন বলল, 'প্রভু, আমায় একটা দিন। আপনি ছুড়ে দিন, আমি লুফে নেব।'

হনুমান এক ধমক দিয়ে বললেন, 'দাঁড়া বাপু! আমি আগে পেট ভরে খেয়ে নিই। এক হাজার বছর কিছু খাইনি, শুধু রাম নাম জপ করে খিদে মিটিয়েছি।'

এক-এক করে সে গাছের সব ক-টা ফলই খেয়ে ফেললেন তিনি। অমনি তাঁর শরীরটাও বড়ো হতে লাগল মৃতসঞ্জীবনী ফলের গুণে। তিনি বিশাল হয়ে গেলেন এবং এমন গর্জন করে উঠলেন যে সমস্ত বন কেঁপে উঠল।

তারপর লাফিয়ে নীচে নেমে এসে অশ্বত্থামাকে নিজের এক বগলের মধ্যে চেপে ধরলেন।

অশ্বত্থামা বলল, 'একী, একী! আপনি আমায় একটাও ফল দিলেন না।'

হনুমান বললেন, 'চল।'

তারপর অশ্বত্থামাকে বগলে চেপে রেখেই তিনি এক লাফে চলে এলেন খাদের তলায়।

সেখানটায় একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। কেউ কারোকে দেখতে পাচ্ছে না। শব্দ শুনে কৃপ বললেন, ‘ওরে আশু, এসেছিস? হনুমানকে পাওয়া গেছে, আর চিন্তা নেই। ওই গাছের ফলগুলো যে কী সুন্দর, কী মিষ্টি তোকে কী বলব। একটা ফল খেয়েই আমার গায়ে যেন অনেক জোর বেড়ে গেছে। হনুমান আমাদের ফলগুলো পেড়ে দেবে, নিশ্চয়ই দেবে, তাই না হনুমান?’

হনুমানের বগলের চাপে অশ্বত্থামার প্রায় দম আটকে আসার মতন অবস্থা। সে চিঁ চিঁ করে বলল, ‘মামা, উনি সব ফলগুলো খেয়ে ফেলেছেন। চিঁ-হিঁ-হি-হি।’

হনুমান বললেন, ‘কী আপদ, এটা ঘোড়ার মতন ডাকে কেন? এটা মানুষ না ঘোড়া?’

কৃপ বললেন, ‘আপনি জানেন না, জন্মাবার সময়ই ও ঘোড়ার মতন ডেকে উঠেছিল বলেই তো ওর নাম অশ্বত্থামা রাখা হয়েছিল। অনেকদিন এরকম ডাকেনি, আবার শুরু করেছে। ও হনুমান, তুমি ফলগুলো সব খেয়ে ফেলেছ, অ্যাঁ?’

হনুমান বললেন, ‘বেশ করেছি।’

অশ্বত্থামা বললেন, ‘ও হনুমানজি প্রভু, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, আমার লাগছে- চিঁ-হিঁ-হি-হি।’

হনুমান প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে বললেন, ‘চোপ!’

তারপরেই তিনি কৃপকে উদ্দেশ্য করে পেল্লায় এক চড় কষালেন।

কৃপ বললেন, ‘একী!’

হনুমান বললেন, ‘এখন আমার সব মনে পড়ে গেছে। ভীম আমার সম্পর্কে ভাই হয়। সেই হিসেবে সব পাণ্ডবরাই আমার ভাই। তোমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলে। শুধু তাই নয়, পাঁচটা কচি কচি ছেলে তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন তাদের গলা টিপে মেরে ফেলেছিল এই পাষণ্ড অশ্বত্থামা। আর তুমি কৃপ, তখন তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলে। আমার ভাইপোদের তোমরা মেরেছিলে, আজ আমিও তোমাদের গলা টিপে মেরে ফেলব।’

কৃপ বললেন, ‘ওসব পুরোনো কথা আর এখন কেন মনে করছ ভাই? যা হবার তা তো হয়ে গেছে অনেক কাল আগে। তা ছাড়া আমাদের কী মরণ আছে যে তুমি মারবে?’

হনুমান বললেন, ‘তাহলে তুমি এই খাদের মধ্যে অন্ধকারে নরকে থাক। আমি এর অন্য ব্যবস্থা করছি।’

কৃপ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, ‘ও হনুমান ভাই, আমাকে এখানে ফেলে যেয়ো না, এখানে ভীষণ পিঁপড়ে, আমায় সর্বক্ষণ কামড়াচ্ছে।’

‘নরকেও এরকম পিঁপড়ে থাকে।’

এই বলেই হনুমান ‘হুপ’ শব্দ করে একলাফে উঠে এলেন খাদের ওপরে। তারপর সেখান থেকে আর এক লাফে চলে এলেন কাশ্মীরে। সেখানে পির পাঞ্জাল পর্বতমালার একটা চূড়ায় এসে নেমে হনুমান অশ্বত্থামাকে বগল থেকে মুক্ত করলেন।

অশ্বত্থামা বললেন, ‘এ কোথায় এলাম, চিঁ-হিঁ-‘

হনুমান বললেন, ‘তোকে খুব ভালো জায়গায় এনেছি, আঙুল দিয়ে অনেক নীচের একটা উপত্যকা দেখিয়ে বললেন, ওখানে কী ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখছিস?’

অশ্বত্থামা বলল, 'ঘোড়া মনে হচ্ছে।'

হনুমান বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানে একজাতের খুব ভালো ঘোড়া থাকে। কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত ওদের ধরতে পারেনি, কারণ ওখানে কেউ নামতে পারে না। আর যদি-বা নামে, উঠতে পারে না। শিশু হত্যাকারী পশু তুই চিরকাল ওই ঘোড়াদের সঙ্গে থাকবি। ভীম তোর মাথার চুল কেটে মণি কেড়ে নিয়েছিল, তাতেও তোর ঠিক শাস্তি হয়নি। আমি তোকে এই শাস্তি দিলাম।'

অশ্বত্থামা বাধা দেবার আগে হনুমান তার ঘাড় ধরে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিলেন যে, সে ছিটকে পড়ে গিয়ে গড়াতে লাগল-গড়াতে গড়াতে একেবারে সেই অনেক নীচের উপত্যকায় গিয়ে পড়ল। ওখান থেকে আর উঠতে পারবে না কোনোদিন।

সন্তুষ্ট মনে হনুমান 'জয় রাম' বলে এক লাফ দিয়ে আবার ফিরে এলেন হিমালয়ে, সেই ঝরনাটার ধারে, তাঁর নিজের জায়গায়!

*শারদীয়া ১৩৮৬*




সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বড়োমামা প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে নীচে থেকে ওপরে উঠে এলেন। এমন চেহারা এর আগে আর কখনো দেখিনি। কপালের ডান পাশটা ফুলে টাঁপা লাল। দু-হাতের কনুইয়ের কাছ পর্যন্ত কুঁচোকুঁচো খড় বড়ো বড়ো লোমের সঙ্গে আটকে আছে। চোখ দুটো লাল টকটকে। গাঢ় নীল রঙের সিল্কের লুঙ্গি একটু উঁচু করে পরা। পায়ে কালো ওয়াটার-প্রুফ জুতো।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে বড়োমামা দোতলার ঢাকা বারান্দায় উঠে এলেন। ঝলমলে রোদ জাফরির নকশা পেতে রেখেছে ঝকঝকে লাল মেঝের ওপর। দূর কোণে মেজোমামা বসে বসে ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করছিলেন। আমি তাঁর ফাইফরমাস খাটছিলুম। 'এটা দে, ওটা দে।'

মেজোমামার কোলের ওপর ক্যামেরা। হাতে হলদে রঙের ফ্ল্যানেলের টুকরো। চোখ আর ক্যামেরার দিকে নেই, বড়োমামার দিকে। মেজোমামা হঠাৎ বললেন, 'স্টপ। ঠিক ওই জায়গাতেই এক সেকেন্ড। আমি চট করে তোমার একটা স্ন্যাপ নিয়ে নি। তোমাকে ঠিক দিশি কাউবয়ের মতো দেখাচ্ছে। বেড়ে দেখতে হয়েছ তো! কী করে হল?'

বড়োমামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'শাট আপ। শা-আট আ-আপ!'

মেজোমামা ফিসফিস করে আমাকে বললেন, 'সাবজেক্টটা ভালো ছিল তবে একটু খেপে আছে।'

বড়োমামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে বললেন, 'কাম হিয়ার। কুইক।'

'শুনে আসি মেজোমামা।'

'হ্যাঁ, শুনে আয়। কেসটা কী আমাকে জানিয়ে যাবি।'

'আচ্ছা।'

ঘরে ঢুকতেই বড়োমামা বললেন, 'কী হবে?'

'কীসের কী হবে?'

'জুতো পরে ঢুকে পড়েছি যে!'

'ও কিছু হবে না।'

'এটা যে রাস্তার জুতো। কুশি দেখলে খ্যাঁক খ্যাঁক করবে।'

'মাসিমা তো এখন ধারে-কাছে নেই।'

'মেজেতে যে দাগ পড়ে গেল।'

'আমি পা দিয়ে পালিশ করে দিচ্ছি।'

'আমি যে দাঁড়িয়ে পড়েছি!'

'চলতে চান তো চলেফিরে বেড়ান না। অসুবিধে কীসের!'

'যেদিকে যাব সেই দিকেই তো দাগ পড়ে যাবে!'

'জুতো খুলে ফেলুন।'

'ইয়েস, দ্যাটস রাইট।'

বড়োমামা জুতো খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে বারকতক নেচে নিলেন। লাল চকচকে মেঝেতে নাচে জুতোর নকশা তৈরি হল।

'দেখলি, দেখলি! সাধে কুশি আমার ওপর রেগে যায়! রেগে যাবার অনেক কারণ আছে! পৃথিবীতে কোনো কিছুই কি সহজ নয় রে!'

'জুতোটা না খুলে অমন করে নাচছেন কেন?'

বড়োমামা রেগে উঠলেন, 'আমি কি ইচ্ছে করে নাচছি। আমাকে নাচাচ্ছে যে! রবারের জুতো পরে একবার দেখ না। পরা সহজ, তারপর পা থেকে আর খুলতে চায় না। ক্রীতদাসের জাত। পায়ে ধরে বসে থাকতে চায়।'

'এখন তাহলে কী হবে! সারাদিন এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'আমি বরং দাগে দাগ মিলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। তুই ওই মারকিউরোক্রোমের শিশি আর খানিকটা তুলো নিয়ে আয়। ও, না।'

'কী হল আবার?'

'বাইরে তো উনি ক্যামেরা তাক করে বসে আছেন। এখুনি ফট করে একটা ছবি তুলে এত বড়ো করে বাঁধিয়ে রাখবেন।'

'তাহলে আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, আমি পা থেকে জুতো দু-পাটি খুলে দি।'

'না, দেখে ফেলবে।'

'দেখলে কী হয়েছে? আর কেই-বা দেখবে?'

'ও বাবা, দেখলে কী হয়েছে! হোল বাড়িতে হইচই পড়ে যাবে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ভাগনেকে দিয়ে জুতো খোলাচ্ছে! মনে নেই সেদিনের কথা। তোকে বলেছিলুম পিঠে একটু তেল ঘষে দিবি, সেই নিয়ে কত রকমের কথা!'

'তাহলে আমি চেয়ারটাকে টেনে আনি, আপনি বসে বসে খুলে ফেলুন।'

'অগত্যা তাই করতে হবে। আমার আবার জুতোয় হাত দিতে কীরকম গা ঘিনঘিন করে। পায়ের জিনিস পায়ে পায়েই খোলা উচিত। আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল, এটা হল সন্ধ্যের জুতো, সকালের নয়।'

'সে আবার কী, জুতোর আবার সকাল-সন্ধ্যে আছে নাকি?'

'জুতোর নেই। শরীরের আছে। সারারাত ঘুমের পর সকালের শরীর হল ফুলো ফুলো, তাজা! মুখ ফুলো, চোখ ফুলো, হাত ফুলো, পা ফুলো। শরীর যত সন্ধ্যের দিকে এগোচ্ছে তত শুকোচ্ছে, চুপসে যাচ্ছে। এসব হল অ্যানাটমি ফিজিওলজির ব্যাপার। ডাক্তার হলে বুঝতে পারতিস।'

বড়োমামা ডাক্তার। চেয়ারটাকে প্রথমে দু-হাতে তুলে আনার চেষ্টা করলুম। বেজায় ভারী। এখন টেনে আনার চেষ্টা করলুম। ঘষটাতে ঘষটাতে আসছি তেলা মেঝের ওপর দিয়ে। চেয়ার ঠেলতে বেশ মজা লাগে। ইচ্ছে করেই বেশ একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনছি। সোজা রাস্তায় আনছি না। পথ ফুরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি!

'একী, একী, অ্যাঁ ঘরের এ কী অবস্থা, তুই সারা ঘরে চেয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন! বসার জায়গা পাচ্ছিস না! ও মাগো, মেজেটার কী অবস্থা!'

দরজার সামনে মাসিমা। আমি যেখানে যেভাবে ছিলুম সেইভাবে, বড়োমামাও সেই একইভাবে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে।

বড়োমামা চোখ দুটো কেবল বুজিয়ে ফেলেছেন। এটা বড়োমামার নিজস্ব টেকনিক। ভয় পেলেই তো চোখ বুজিয়ে ফেলা।

সেই চোখ বোজানো অবস্থাতেই বড়োমামা বললেন, 'কুশি, আমি আহত।'

'তোমাকে কিছু বললেই তো তুমি আহত!'

'আমি সেভাবে আহত নই, এই দেখো আমার কপাল।'

বড়োমামা মাসিমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কপালটা এর মধ্যে আরও ফুলেছে। খেঁতো হয়ে গেছে।

'তোমার কপালে এই সবই লেখা আছে আমরা জানতুম!'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।' মাসিমার পাশে মেজোমামা এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে ক্যামেরা।

মেজোমামাকে দেখেই বড়োমামা লাফিয়ে উঠলেন, 'ও, নো নো-নো ফটোগ্রাফ।'

'ছোট্ট করে একটা। ফ্যামিলি অ্যালবামে মানাবে ভালো।

মাসিমা মেজোমামাকে থামিয়ে দিলেন, 'রাখো তো তোমার ক্যামেরা। আগে ছবি তোলা শেখো। ঠ্যার ঠ্যার করে হাত কাঁপে, ফোকাস করতে পার না! কেবল পয়সা নষ্ট!'

'হাত কাঁপে! আমার হাত কাঁপে?'

'হ্যাঁ, কাঁপে। ছবি না তুলে তোমার কম্পাউন্ডার হওয়া উচিত ছিল। জল দিয়ে পেনিসিলিন গোলাবার জন্য কসরত করার দরকার হত না, তোমার কাঁপা হাতে শিশিটা ধরিয়ে দিলেই আপনি গুলে যেত!'

মেজোমামা একটু মুষড়ে গেলেও হেরে যেতে প্রস্তুত নন। আমার মামারা সহজে হারতে চান না। মেজোমামা বললেন, 'আমি যখন রেগে যাই তখনই আমার হাত কাঁপে, তা না হলে আমার হাত ল্যাম্পপোস্টের মতোই স্টেডি।'

'তোমার সবসময়েই হাত কাঁপে, তাহলে বুঝতে হবে সবসময়েই রেগে আছ। কথা বাড়িয়ো না, যা করছিলে তাই করোগে যাও।'

মাসিমাকে সুবিধে করতে না পেরে মেজোমামা বড়োমামার ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন।

'আহা, তোমার কপালটা বেশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে বড়দা। কীসে ঠুকলে অমন করে!'

বড়োমামা যেন হালে পানি পেলেন। মাসিমা যেভাবে তাকিয়ে আছেন, একমাত্র কপালের জোরেই বড়োমামা বাঁচতে পারেন।

'ঠোকা? ঠোকাঠুকির মধ্যে আমি নেই। ওই লক্ষ্মীছাড়া! যার নাম রাখা হয়েছিল লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মী পেছনের পায়ে ঝেড়েছে এক লাথি।'

আমি চেয়ারটা যেখানে ছিল সেইখানেই চতুষ্পদ করে রেখে, ওষুধ আর তুলো নিয়ে মাসিমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকেও তো একটা বাঁচার রাস্তা বের করতে হবে। সারা মেঝেতে চেয়ার টানার লম্বা লম্বা দাগ।

'এই নিন মাসিমা, ওষুধ।'

মাসিমা ওষুধ আর তুলোটা হাতে নিয়ে বড়োমামাকে ধমকের সুরে বললেন, 'তুমি সাতসকালে গোরুর কাছে কী করতে গিয়েছিলে? তোমার অন্য কোনো কাজ ছিল না!'

মেজোমামা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো, তোমার অন্য কোনো কাজ ছিল না! তুমি কি পশু-চিকিৎসক? তুমি তো মনুষ্য-চিকিৎসক!'

বড়োমামা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, কথা শোনো দু-জনের। যা হয় একটা কিছু বলে দিলেই হল! তোরা জানিস না...'

'কী জানতে হবে?' মাসিমা তুলোয় লাল ওষুধ লাগালেন।

'তোরা জানিস না, আমার সব ক-টা কাজের লোক পালিয়ে গেছে। মালী গন, কুকুরগুলোকে যে দেখত সেই বিশে ব্যাটা হাওয়া। গোরুটাকে যে দেখত সেই রামখেলোয়ান সরে পড়েছে। দেন হু উইল বেল দ্যা ক্যাট? তোমরাই বলো?'

'ইংরেজিটা ঠিক হল না বড়দা।' অধ্যাপক মেজোমামা আবার বানান ভুল, ভাষার ব্যবহারের ভুল একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

'তোমার অবশ্য দোষ নেই। তুমি তো লিটারেচারের লোক নও। সারা জীবন প্রেসক্রিপসানই লিখে গেলে, টিডি, বিডি। তোমার বলা উচিত ছিল...।'

মাসিমা কটমট করে মেজোমামার দিকে তাকাতেই মেজোমামা আমতা-আমতা করে চুপ হয়ে গেলেন, যেন গান শেষ হল, 'না, মানে ভুল, মানে বেল মানে, ক্যাট দি বেল মানে, না না বেল দি ক্যাট মানে...'

মাসিমা আবার তাকাতেই মেজোমামার রেকর্ড একেবারেই থেমে গেল।

'দেখি কপালটা নীচু কর। ওঃ লম্বা বটে! তাল গাছ।'

বড়োমামা অভ্যর্থনা সভার সভাপতির মতো কপালে যেন তিলক নিচ্ছেন।:

মাসিমা একহাতে বড়োমামার মাথার পেছন দিকটা ধরে সামনে ঝুঁকিয়ে আর এক হাতে অ্যান্টিসেপটিক ভেজানো তুলো থ্যাঁতলানো কপালে চেপে ধরেছেন। বড়োমামার যেন চুল কাটা হচ্ছে সেলুনে। তুলোটা কপালে চেপে ধরতেই বড়োমামা বিশাল একটা চিৎকার ছাড়লেন। মানুষ উঁচু ছাদ থেকে পড়ে :যাবার সময়েই অমন চিৎকার করে। চিৎকার শুনেই কোথা থেকে ছুটে এল:বড়োমামার কুকুরদের অন্যতম, সবচেয়ে দুর্দান্ত স্প্যানিয়েল, 'ঝড়ু'। সবকটা কুকুরের বাংলা নাম। ঝড়ু, সুকু, ডাকু।

ঝড়ু বড়োমামাকে বাঁচাতে এসেছে। সামনের থাবার ওপর মুখ নামিয়ে, ঝিঁকি মেরে মেরে, বার কতক ঘেউ ঘেউ করে খুব খানিকটা বকাঝকা করল। যখন দেখল মাসিমা তবু

তার প্রভুকে ছাড়ছে না, তখন শাড়ির আঁচল ধরে হিড়হিড় করে টানতে শুরু করল। ফাইন লাগছিল ব্যাপারটা। ঝড়ুর মুখটা ভারি সুন্দর। সেই মুখে আঁচলের আধখানা, পেছনের দু-পায়ে ভর রেখে, মুখটা সামান্য ওপরে তুলে, টান টান, টানাটানি, টাগ অফ ওয়ার।

বড়োমামার কপাল ততক্ষণে মেরামত হয়ে গেছে। মাসিমার দু-হাত এখন মুক্ত। দু-হাতে আঁচল ধরে টানছেন। নতুন শাড়ি। সহজে ছিঁড়ছে না, কুকুরেও ছাড়ছে না। মেজোমামা তারিফ করে বললেন, 'ডগ ইজ এ ফেথফুল অ্যানিম্যাল। প্রভুভক্ত জীব।'

'প্রভুভক্তি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। এই, লাঠিটা নিয়ে আয় তো।'

লাঠির নাম শুনে ঝড়ু একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর চোখ দুটো আধবোজা করে যেমন টানছিল তেমনি টানতে লাগল, ঝটকা মারতে লাগল, খোঁটায় বাঁধা প্রাণীর মতো অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। বড়োমামা একটু সামলেছেন। মুখ দেখে মনে হল ঝড়ুর বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে বেশ গর্বিত, তবে লাঠি থেকে বাঁচাতে হবে। ভক্তেরই তো ভগবান! বড়োমামা শাসনের সুরে বললেন, 'ঝড়ু, ঝড়ু, ছেড়ে দাও, নো অসভ্যতা।'

উত্তরে ঝড়ু আরও মরিয়া হয়ে মাসিমার আঁচলে হ্যাঁচকা টান মারতে লাগল। মেজোমামা বললেন, 'ঝাড়ু ছাড়া ঝড়ুর কিছু করতে পারবে না। কুকুরের সঙ্গে কুকুরের ল্যাঙ্গোয়েজেই কথা বলতে হবে।' বড়োমামা কুকুরের পক্ষেই গেলেন, 'আসলে কী হয়েছে জানিস, কুকুরের তো বাঁকা বাঁকা দাঁত, কুশির শাড়িটা তাঁতের জ্যালজেলে, দাঁতে আটকে গেছে। ও টানছে না, ও দাঁত থেকে খুলে ফেলার জন্য ছটফট করছে। দেখি, কাঁচিটা দেখি, এ কেসটা হল সার্জারির কেস।'

মাসিমা বললেন, 'শাড়িটার দাম জান? সেভেনটি-সিক্স। সার্জারি নয় লাথি।'

মাসিমা সত্যি সত্যি একটা লাথি চালালেন। ঝড়ুর গায়ে লাগল না, কিন্তু ভয়ে ছেড়ে দিল। শাড়ির আঁচলটা ফুটো ফুটো, চিবানো চিবানো। মাসিমার চোখে জল এসে গেছে।

'আজই নতুন শাড়িটা সবে ভেঙে পরলুম, হতচ্ছাড়া, জানোয়ার কুকুর। শাড়িটার কী সুন্দর রং ছিল!' মাসিমার কাঁদো-কাঁদো গলা শুনে মেজোমামা বললেন, 'ছিল বলছিস কেন, এখনও তো সুন্দর রংই রয়েছে! জলে পড়লে রং ওঠে, কুকুর ধরলে রং উঠবে কেন?'

বড়োমামা বললেন, 'বারো হাত শাড়ির হাতখানেক কেটে ফেলে দিলেও এগারো হাত থাকে। যেকোনো মহিলার পক্ষে এগারো হাতই যথেষ্ট। কী বল?'

মেজোমামা বললেন, 'ইয়েস ইয়েস। ইলেভেন ইয়ার্ডস'-

'তোমার ইংরেজিটা শুদ্ধ করো, ইয়ার্ড মানে গজ, হাত নয়।' বড়োমামা হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেছেন।

নীচে 'হাম্বা' করে একটা শব্দ শোনা গেল, 'গোরু খুলে গেছে, ওমা গোরু খুলে গেছে, গোরু যাঃ যাঃ, হায় গো, ডাঁটার ঝাড়টা নিয়ে পালাল গো!'

'কী হল মানুর মা!' মাসিমা শাড়ির শোক ভুলে সিঁড়ির দিকে দৌড়োলেন।

মেজোমামা বললেন, 'দাদা, তোমার ভিটামিন বি-কমপ্লেকস গবায় নঃম হয়ে গেল। আসল কাটোয়ার ডেঙ্গো ছিল।'

বড়োমামা বললেন, ‘নো ক্ষমা, আর ক্ষমা করা চলে না, সেই লাইনটা, অন্যায় যে করে অন্যায় সে সহে-’

আমরা সদলে নীচের উঠোনে নেমে এলাম। মাসিমার পেছনে ঝুলছে কুকুরের চিবোনো আঁচল। পেছনে আমি। আমার পেছনে বড়োমামা। বড়োমামার পেছনে মেজোমামা।

লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মী উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজিয়ে ডেঙ্গোর ঝাড় চিবোচ্ছে। এত চিৎকার, চেঁচামেচি, কোনোদিকে কোনো দৃকপাত নেই। নিজের কাজ করে যাচ্ছে আপন মনে। ডাঁটাঝাড়ের আধখানা চলে গেছে গলায়, বাকি অংশটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঢুকছে। মাসিমা সেই বাড়তি অংশটা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। যতটুকু পারা যায় উদ্ধারের চেষ্টা।

মেজোমামা গম্ভীর গলায় বললেন, ‘ছেড়ে দে কুশি। পারবি না। বোভাইন-টিথের স্ট্রাকচার জানা থাকলে তুই আর চেষ্টা করতিস না। গোরুর ওপর আর নীচের পাটিতে ক-টা দাঁত, কী ভাবে সাজানো থাকে জানিস?’

মাসিমা বললেন, ‘তোমরা জানো, আমার জেনে দরকার নেই।’ মাসিমা পাতা ধরে টানতে লাগলেন। লক্ষ্মী চিবিয়েই চলেছে। এক ঝটকায় মাসিমাকে ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে টলমল করে দিয়ে লক্ষ্মী পেছন ফিরে দাঁড়াল। ন্যাজটা মাঝে মাঝে দুলছে। বিরক্তি ভালো লাগছে না তার। শান্তিতে কাটোয়ার ডাঁটা চিবোতে চায়। গোরুটাকে দেখতে ছবির গোরুর মতো। সাদা ধবধবে গায়ের রং। ন্যাজের দিকটা চামরের মতো। ডগাটা কালো। শিং দুটো তেলা। চোখ দুটো বড়োবড়ো, ভাসা ভাসা।

‘বড়োমামা, আপনার গোরুটাকে ভারি সুন্দর দেখতে।’

‘অতি অসভ্য গোরু। একগুঁয়ে অবুঝ। গোরুর সম্পর্কে আমার ধারণা পালটে দিয়েছে। মানুষের চেয়েও অসভ্য!’ মাসিমা কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সামলে নিলেও ভীষণ রেগে গেছেন।

‘অনেকদিন তোমাকে বলেছি দাদা, তোমার এই গোরু কুকুর এসব হাটাও। বাড়িতে টেঁকা যায় না। এ আমাদের কম সর্বনাশ করেছে! আদরে আদরে বাঁদর তৈরি হয়েছে।’

বড়োমামা বললেন, ‘আর মায়া নয়, আজই একে বিদায় করতে হবে। মানুর মা, আজই, এখনই তুমি এটাকে নিয়ে যাও।’

‘আমি গোরু নিয়ে কী করব দাদাবাবু! আমার নিজেরই থাকার জায়গা নেই। চাল নেই, চুলো নেই।’

‘কেন, তোমার বাড়ির পাশের মাঠে বেঁধে রেখে দেবে। যখন দুধ হবে দুধ খাবে, দই খাবে, ক্ষীর খাবে, চেহারা ফিরে যাবে।’

মেজোমামা বললেন, ‘মাঝে মাঝে লাথিও খাবে। সভ্যতা এতবছর এগিয়ে গেল, গোরু কিন্তু সেই গোরুই রয়ে গেল। প্যালিওলিথিক গোরু, নিওলিথিক গোরু আর এই স্পেস-এজ গোরু, বিবর্তনের ধারাটা কত স্লো দেখেছ দাদা। আমরা কত অসম্ভবকে সম্ভব করলুম! গোরু কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল, তার তরল দুধকে আমরা গুঁড়ো করে টিনে ভরে ফেলব?’

উঠোনে একটা বাঁধানো বসার জায়গা ছিল, বড়োমামা তার ওপর বসে পড়লেন। চুল উড়ছে। কপালের একটা পাশ গোলাপি। ফর্সা চেহারায় বেশ মানিয়েছে। মাসিমা ডাঁটা

উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে ভীষণ যেন রেগে গেলেন। সকালে বাজার এসেছে। মানুর মা সব ধুয়ে ধুয়ে রেখেছে। আলু, পটল, কুমড়ো, কাঁচালঙ্কা, পাতিলেবু।

'এই নে সব খা, সৃষ্টি খা, তুইই খা।' ঝুড়িসুদ্ধ সব টান মেরে মাসিমা লক্ষ্মীর মুখের সামনে ছড়িয়ে দিলেন।

লক্ষ্মী খুব চালাক গোরু, ভেবেছিলুম পটলের সঙ্গে লঙ্কা চিবিয়ে আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। লক্ষ্মী জানে কোনটার পর কী খেতে হয়। সে কুমড়োটা মুখে পুরেছে। ডেঙ্গো শাক কুমড়ো দিয়েই রাঁধে। এরপরই হয়তো আলু আর পটল খাবে, সঙ্গে একটা কাঁচালঙ্কা। পেটে গিয়ে হয়ে যাবে আলু পটলের ডালনা।

মেজোমামা বললেন, 'শিশু আর গোরু বুদ্ধিবৃত্তিতে সমান স্তরের প্রাণী। যা পাবে তাই মুখে পুরবে। যত রকমের অপকর্ম আছে নির্বিবাদে করে যাবে। হ্যাঁ, শিশু আর গোরু এক জিনিস, সেম থিংস, চেহারা ছাড়া সব এক।'

বড়োমামা বললেন, 'তাহলে দেখো, সেই শিশু স্নেহ পায় বলেই মানুষ হয়। গোরুর বেলায় উলটো। গোরু স্নেহ পায় না, তাই বড়ো হয়েও গোরুর গোরুমি যায় না। হ্যাঁরে বাংলাটা ঠিক হল তো?'

'কী বললে, গোরুমি! বাঁদর-বাঁদরামি, পাগল-পাগলামি, ছাগল-ছাগলামি, গোরু থেকে বোধ হয় গররামি হবে। সংস্কৃত গো শব্দ থেকে উৎপত্তি। গো, আর রামি।'

'আমরা কত স্বার্থপর দেখো? গোরু মানেই আমাদের কাছে দুধ, মাখন, ছানা, দই, রসগোল্লা, গব্য ঘৃত, ফুলকো লুচি!'

হঠাৎ লক্ষ্মী একটা লাফ মারল। বালতি, ঝুড়ি সব উলটেপালটে, সেই ছোট্ট উঠোনে টাট্টু ঘোড়ার মতো গোল হয়ে ছুটতে লাগল। মাসিমা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। মেজোমামা দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে, বড়োমামা যে বেদিটায় বসেছিলেন সেইটার ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

দোতলার বারান্দা থেকে আমি বললুম, 'ওর ঝাল লেগেছে বড়োমামা, কাঁচালঙ্কা খেয়েছে।'

'একটু পরেই রতন আসবে।'

রতনের খাটাল আছে। মাসিমাই রতনের কথাটা বললেন। বড়োমামা যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন। বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ কুশি! রতনের ওখানে থাকলে লক্ষ্মীটি মানুষ হবে, সঙ্গী পাবে। একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসবে। আর পাঁচটা গোরুকে দুধ দিতে দেখলে নিজের দুধ দেবার ইচ্ছে হবে।'

মেজোমামা বললেন, 'ইয়েস, কম্পিটিশন। প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকলে গোরু ভালো রেজাল্ট দেখাতে পারবে।'

লক্ষ্মী সেজেগুজে রেডি হল। নীল নাইলনের দড়ি। গোয়াল থেকে উঠোনে এসেছে, একটু পরেই সদর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

'বাবু আছেন, ডাক্তারবাবু?' ওই যে রতন এসে গেছে। গায়ে হলদেটে ফতুয়া। নীচের দিকে দুটো পকেট, নানারকম জিনিসে ফুলে আছে। লুঙ্গিটা একটু উঁচু করে পরা। কালো তেল চুকচুকে রং, কদমছাঁট কাঁচা-পাকা চুল।

'এসো রতন এসো।' ধরা ধরা গলায় রতনকে ডাকলেন।

'বাঃ লক্ষ্মী তো লক্ষ্মীই, বেশ চেহারাটি! গোরু হলে এইরকম গোরু হওয়াই উচিত।'

'একটা রিকোয়েস্ট রতন, তুমি নজর দিয়ো না।'

'হাসালেন ডাক্তারবাবু, ও তো এখন থেকে আমার নজরেই থাকবে। আমি চেহারা-ফেহারা বুঝি না, আমি বুঝি দুদ। দুদ দিলে খাতির, না দিলে জুতো।'

'জুতো মানে, গোরুকে জুতো পেটা?'

'না, না, হিন্দুর ছেলে গোরুকে জুতো মারতে পারি? মহাপাপ! গোরু মেরে জুতো তৈরি হবে।'

বড়োমামা চমকে উঠে লক্ষ্মীর পিঠে আঙুল ঠেকালেন। তার গা-টা কেঁপে উঠল থিরথির করে। ন্যাজটা দুলে উঠল চামরের মতো।



'অবাক হবার কী আছে এতে!' রতন বলল, 'এত জুতো তাহলে আসবে কোথা থেকে? লাখ লাখ জোড়া পা, লাখ লাখ জোড়া জুতো। বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গোরু বড়ো উপকারী জন্তু!' রতন লক্ষ্মীর পিঠে হাত রেখে বলল, 'এই দেখুন চামড়া, কমসে কম এক-শো জোড়া জুতো হবে। এই শিং আর পায়ের খুর থেকে কেজি খানেক সিরিশ তৈরি হবে। তারপর হাড়। হাড় থেকে তৈরি হবে বোন মিল। গোরু কি মানুষ? মরল আর পুড়ে ছাই হল?'

বড়োমামা রতনের কথা শুনে লক্ষ্মীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। রতন তখনও শেষ করেনি কথা।

'ওই জন্যে আমরা করি কী, ফুকো দি।'

'ফুকো? সে আবার কী?'

'ডাক্তারবাবু, বিজ্ঞানের কম উন্নতি হয়েছে? ফুকো হল ইঞ্জেকশন।'

'ও ইঞ্জেকশন।' বড়োমামা খুশি হলেন, 'ভালো ভালো, গোরুর স্বাস্থ্য ঠিক রাখলে দেশের স্বাস্থ্য ভালো হবে।'

'সে ইঞ্জেকশন নয়, দুধ বাড়াবার ইঞ্জেকশন। যে গোরু আড়াই দেয় সে দেবে পাঁচ, যে পাঁচ দেয় সে দেবে দশ। ডবল ডবল দুধ, ডবল ডবল রোজগার, হ্যা হ্যা।'

'ম্যাজিক নাকি? সে তো জল মেশালেই দুধ বাড়ে!'

‘তা বাড়ে, তবে দুধ বাড়লে জল বাড়ে, সব মিলিয়ে আরও বাড়ে। ফুকো দিলে গোরুর রক্তটাই দুধ হয়ে বেরিয়ে আসে। হিসেব করুন না, একটা গোরু দশ বছর বেঁচে আড়াই সের দুধ দেওয়া লাভের, না পাঁচ বছর বেঁচে পাঁচ সের দেওয়া লাভের? নিজে তো খাইয়ে দেখেছেন, গোরুর খোরাক তো জানেন? যত তাড়াতাড়ি পার সব দুধ শুষে নিয়ে, জ্যান্ত কঙ্কালটাকে কষাইখানায় পাঠিয়ে দাও। হ্যা হ্যা। চল লক্ষ্মী চল।’

‘বেরোও! গেট আউট,’ বড়োমামা পা থেকে জুতো খুলে হাতে নিয়েছেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। ‘চামার, তুমি গোরুরও অধম। নিকালো, আভি নিকালো।’

বড়োমামা ঠকঠক করে কাঁপছেন। মাসিমা দৌড়ে এসে বড়োমামাকে ধরেছেন। রতন বলছে, ‘কী হল, হঠাৎ! বেলাড পেসার মনে হচ্ছে!’ মেজোমামা ইশারা করে রতনকে চলে যেতে বলছেন। লক্ষ্মী গোরু হলেও তার বোধশক্তি আছে। লম্বা জিভ দিয়ে বড়োমামার পিঠ চেটে দিচ্ছে। তবে ওই, সামান্য একটু ভুল করে ফেলল। বড়োমামার পৈতেটা তার মুখে। সে আর কী হবে! মানুষের কাজেও তো অনেক ভুল থাকে।

*শারদীয়া ১৩৮৬*




# অজয় হোম

বেশির ভাগ মানুষেরই কিছু-না-কিছু সংস্কার থাকে। আমারও আছে, তোমাদেরও হয়তো আছে। বিশেষত পরীক্ষার সময়। কলা ডিম এইসব খেয়ে পরীক্ষা দিতে যেতে অনেকেই চাইবে না। এমনকী রসগোল্লা খেয়েও না। এক-একজনকে এমনও দেখেছি যে বিশেষ একটা কলম ছাড়া পরীক্ষা দেবে না।

এই সংস্কার খেলার জগতেও বাদ নেই। শুনেছি কলিন কাউড্রি একটা পুরোনো শার্ট ব্যবহার করতেন টেস্ট খেলার সময়, অন্য সময় নয়। কেউ বুটে, প্যাডে কালি লাগায় না, কেউ আবার ময়লা প্যান্ট পরে। তোমাদের কমলদা-বেতার ভাষ্যকার কমল ভট্টাচার্য-খেলার মাঠে নামত চোখের পাশে নাকে তর্জনী ও বুড়ো আঙুল চেপে, তারপর সেখান থেকে বুকে ঠেকাত এই ভাবে তিন বার। স্মরণ করত গুরু দুখিরাম বাবুকে। এরকম কত লোকের কত দেখেছি।

আমাদের কলেজে পড়ত ইন্দ্রজিৎ রায়। ক্রিকেট খেলতও বেশ। ব্যাক-ফুটেড প্লেয়ার, অর্থাৎ মারত বেশি হুক পুল কাট ও লেট কাট। মাঝে মাঝে কভার ড্রাইভ। ডিফেন্সও ছিল ভালো। প্রায় প্রতি ম্যাচেই কুড়ি-তিরিশ করত। কখনো-বা তার বেশিও করত। সাধারণত নামত ছ-সাত নম্বরে। প্রয়োজনে ঠেকা দিয়ে ড্র-ও করত।

এক খেলায় টস হয়ে গেছে। টসে জিতে আমাদের ক্যাপ্টেন বেরি-বেরি সর্বাধিকারী-ব্যাটিং অর্ডার স্কোর বুকে লিখে দেবে বলে স্কোরারের কাছে যাচ্ছে, সে সময় ইন্দ্র গিয়ে বলল, 'আজ আমি ওয়ান ডাউন খেলব!' বেরি ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'বেশ!' পাশ থেকে পিশু, নিপু বলে উঠল, 'ব্যাটা আমার ব্র্যাডম্যান এসেছেন!' কে যেন বলল, 'বাংলার অমরনাথ।' সেই বছরেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বোম্বে টেস্টে অমরনাথ ক-দিন আগে সেঞ্চুরি করেছে ওয়ান ডাউন নেমে।

বেরি ও সুধীর ওপেন করতে গেল। বোর্ডে বোধ হয় তখন কুড়ি-পঁচিশ, ঠিক মনে নেই, সুধীর আউট হয়ে গেল। ইন্দ্র নামল, আমাদের পাশ দিয়ে গেল। আমরা সবাই চুপ। জানি মোটামুটি খেলবে। সুধীরও প্যাড ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'বল এমন কিছু নয়, স্টাম্পের ঠিক বাইরে বলটা ছিল, খোঁচা লেগে গেল, ছেড়ে দিলেই হত।'

হঠাৎ শুনি মাঠের মাঝে বিপক্ষদের উল্লাস। তাকিয়ে দেখি ইন্দ্র ফিরছে। এক বলেই খতম। পিশু বলল, 'ব্র্যাডম্যানকে সংবর্ধনা জানাতে হবে।' সবাই মিলে হাততালি শুরু করলাম। টেন্টের মধ্যে দৌড়ে পালিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। তখনও হাততালি চলছে।

বেরির কাছে পরে জেনেছিলাম ওই বল খেলা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। বল খুব লেটে প্রায় ব্যাটের গোড়ায় এসে সুয়িং করে, ব্যাটটা বিট করে সোজা হয়, এবং মিডল স্টাম্পে লাগে। এই বল লাখে একটা পড়ে। সুতরাং ইন্দ্রকে আর কিছু বলা গেল না।

পরের ম্যাচেই ইন্দ্র আবার বলল, 'ওয়ান ডাউন খেলব।' বেরি মুচকি হেসে ওর নামটা লিখে দিল স্কোর বুকে। যথারীতি ইন্দ্র মাঠে নামল, আর দ্বিতীয় বলে বোল্ড হয়ে ফিরে এল। আমরাও ব্র্যাডম্যানকে সংবর্ধনা জানালাম।

এর পরের ম্যাচ হাওড়া স্পোর্টিং-এর সঙ্গে হাওড়া ময়দানে। সবাই মাঠে গেছি সময় মতো। ইন্দ্র আমাদের আগেই পৌঁছেছে। দেখি সে মাঠের মাঝে গিয়ে পিচ দেখছে। বেরি বলল, 'কিছু বলিস না ওকে। বেচারা!'

আজও প্রথম বলেই ইন্দ্র আউট হল। আমরা সবাই অবাক। ইন্দ্র কালেভদ্রে হাঁস মেরেছে। অর্থাৎ গোল×া করেছে।

খেলার শেষে ফিরছি হেঁটে হেঁটে। কারণ, হাওড়া ময়দানে খেলা হলেই আমরা হেঁটে ফিরি হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত। পথে বড়োবাজারে সদলবলে ফুচকা খাওয়া ছিল আমাদের একটা বিলাস। নরেন মালী মাঠ থেকেই জিনিসপত্তর নিয়ে রিকশা চড়ে মার্কাস স্কোয়ারে চলে যেত।

এখনকার হাওড়া ব্রিজ নয়, সেই ভাসমান কাঠের সেতু। তার উপর দিয়ে চলেছি। হঠাৎ দেখি ইন্দ্র শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ডান হাতের গুলি থেকে কী যেন বের করে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলল। নিপু আর পিশু চিৎকার করে ওকে চেপে ধরে বলছে, 'কী ফেললি? কী ফেললি?' অনেক ধস্তাধস্তির পর স্বীকার করল, পাঁজির বিজ্ঞাপন দেখে পাঞ্জাব থেকে ভিপি-তে তিন টাকা দিয়ে একটা মাদুলি আনিয়েছিল। বিজ্ঞাপনে ছিল, যে কাজে যাবে তাতেই অভীষ্ট সিদ্ধি। সব মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে। তাই সে ওয়ান ডাউন খেলতে চেয়েছিল। আর জীবনে ওই পোজিশনে সে আর খেলবে না। সে যেমন ছ-নম্বরি সাত নম্বরি খেলে তাইই খেলবে। বেরিও শুনল সেই কথা।

এরপর খেলা রেঞ্জার্স মাঠে ডালহাউসির বিরুদ্ধে। সাহেব টিম।

ডালহাউসি প্রথমে ব্যাট করে লাঞ্চের একটু পরে দু-শো কি দু-শো কুড়ি করে দান ছেড়ে দিল। মাঠে রোলিং চলছে। বেরি স্কোরের খাতায় নাম লিখে দিল। বেরি ও সুধীর প্যাড পরছে। ওয়ান ডাউন কে? তাকেও তো প্যাড পরে রেডি থাকতে হবে।

আমাদের ফাস্ট বোলার তরুণ এসে বলল, 'ওয়ান ডাউন ইন্দর।' ইন্দ্র চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'না, না, আমি না, কখনোই না।' বেরি একটু হেসে বলল, 'যা বলছি তাই শুনবে। ক্যাপ্টেনস অর্ডার।' সুধীরকে নিয়ে সে মাঠে নেমে পড়ল।

গোটা তিরিশেক রান উঠেছে, বেরি আউট হল। গজ গজ করতে করতে ইন্দ্র মাঠে নামছে-'আমাকে সং বানানো ... খুব মজা হাততালি দিতে ... স্রেফ ইয়ার্কি! ইডিয়টিক সব কারবার। খেলাই ছেড়ে দেব। ...'

বেরি আর ইন্দ্র যখন ক্রস করছে, দেখলাম বেরি তার পিঠ চাপড়ে দিল। মনে হল তখনও সে রাগে গরগর করছে।

ইন্দ্রর সে খেলা জীবনে ভুলব না। নির্ভুলভাবে পারফেক্ট টাইমিং-এ হুক পুল কাট লেট কাট কভার ড্রাইভ, মাঝে মাঝে পুল ড্রাইভ, স্কোয়ার ড্রাইভও। যা তাকে কখনো মারতে দেখিনি। এক আমাদের মধ্যে সন্তোষ গাঙ্গুলি মারত কখনো-সখনো। ইন্দ্রর ব্যাট থেকে যেন ফিনকি দিয়ে রান বেরোচ্ছে যেন ওর ওপর কারোর ভর হয়েছে।

স্কোরারের কাছে গিয়ে ইন্দ্রর কত রান হচ্ছে মাঝে মাঝে দেখে আসছি। পঞ্চাশ হল। হাততালি দিলাম সবাই। ইন্দ্রর ভ্রূক্ষেপ নেই। টুপি খুলল না, ব্যাট তুলে অভিবাদনও গ্রহণ

করল না। তার কানে যেন কিছুই পৌঁছোয়নি।

দেখতে দেখতে আশি পেরিয়ে গেল। কে যেন বেরিকে বলল, 'ওকে বলে আসব একটু দেখে খেলতে?' বেরি বলল, 'না, নার্ভাস হয়ে পড়বে। যেমন খেলছে খেলুক, বললে আউট হয়ে যাবে।'

সেঞ্চুরির হাততালিতে সে সংবিত ফিরে পেল। বিপক্ষের সাহেব ক্যাপ্টেনকে দেখলাম হ্যান্ডশেক করতে, অন্যান্যরাও ওর খেলার তারিফ করে হাততালি দিল। ও তখন বুঝতে পারল একটা অঘটন সে ঘটিয়ে ফেলেছে। অভিভূত হয়ে পড়ল। পরের বলেই ক্যাবলার মতো খেলে আউট হয়ে ফিরল।

ড্রেসিং রুমে ইন্দ্র যখন জামাকাপড় ছাড়ছে। পিশু বলল, 'ও, তাই বল! তুই উলটো গেঞ্জি পরেছিস। তাই এমন খেললি! ওটা যে গুড লাক।'

তারপর থেকে ইন্দ্র উলটো গেঞ্জি পরে খেলেছে। ওটাই ওর সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

হঠাৎ ডালহাউসি স্কোয়ারে অর্থাৎ এখনকার বি-বা-দী বাগে ইন্দ্রর সঙ্গে দেখা। বহু বছর পর। আমরা সবাই বুড়ো হয়েছি। সুখ-দুঃখের অনেক কথাই হল। জিজ্ঞেস করলাম, এখনও কি উলটো গেঞ্জি পরিস? ও কথা না বলে হাওয়াই শার্টের বুকের বোতাম খুলে দেখিয়ে দিয়েই চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল।

*ফাল্গুন ১৩৮৬*




# মঞ্জিল সেন

এলাহাবাদের লুকারগঞ্জে রোজকার মতো সেদিনও সন্ধ্যের পর আমরা বেঙ্গলি ক্লাবে জড়ো হয়েছি। নামে বেঙ্গলি ক্লাব হলেও বেশ কিছু অবাঙালি ভদ্রলোক এই ক্লাবের সদস্য, মি. মালহোত্র তাঁদের একজন। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কোঠায়, মাথার চুল ধবধবে সাদা, কিন্তু শরীরের বাঁধুনি এখনও মজবুত। বয়সকালে তিনি যে রীতিমতো বলিষ্ঠ ছিলেন তা এক নজরেই বোঝা যায়। খুব অমায়িক ভদ্রলোক। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, ফাঁক পেলেই চলে আসেন।

ডিসেম্বর মাস, জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। আমরা সব গরম পোশাকে নিজেদের ঢেকেঢুকে কনকনে হাওয়ার ছোবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি। মি. মালহোত্র তাঁর হাতের মোটা লাঠিটা দোলাতে দোলাতে ক্লাবঘরে এসে ঢুকলেন। এত শীতেও তাঁর গায়ে কিন্তু একটা গেরুয়া রঙের সুতির পাঞ্জাবি আর একটা সাদা খদ্দরের চাদর। স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি হেসে আর 'নমস্তে' বলে তিনি চেয়ার টেনে বসলেন।

আমাদের আলোচনা হচ্ছিল অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আলোচনা থেকে তর্ক, তর্ক থেকে চেঁচামেচি। দিব্যেন্দু আমাদেরই বয়সি। গোলমালের মধ্যে সে একসময় মি. মালহোত্রের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আচ্ছা মালহোত্র সাহেব, আপনি কি এসব অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করেন?'

আচমকা এই প্রশ্নে ভদ্রলোক বোধ হয় ক্ষণিকের জন্য কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না, তারপর একটু হেসে বললেন, 'আমি বরং জীবনের একটা ঘটনা বলি। আপনারা তা থেকেই জবাবটা খুঁজে নেবেন।'

আমরা সবাই জমাটি এক গল্পের আশায় তাঁকে ঘিরে বসলাম। মি. মালহোত্র তাঁর কাহিনি শুরু করলেন,

'আমার বয়স তখন ষোলো কি সতেরো, ভরাট স্বাস্থ্য। হঠাৎ কী খেয়াল হল, কাউকে কিছু না বলে একদিন লোটা-কম্বল নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রথমে গেলুম হৃষীকেশ। এখন হৃষীকেশের ভোল পালটে গেছে, বিরাট অ্যান্টিবায়োটিক কারখানা, বিজলি বাতি, রীতিমতো শহর। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন এসব কিছুই ছিল না।

'হৃষীকেশ থেকে সরু এক বনপথ ধরে গাড়োয়াল অধ্যুষিত টিহরিতে পৌঁছোলাম। তখন পথ ছিল দুর্গম, মাঝে মাঝে ঝোলানো দড়ির সেতু। টিহরি থেকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে প্রায় মাইল কুড়ি হাঁটা পথ দেবপ্রয়াগে গিয়ে মিশেছে। ওটাই ছিল তখন গঙ্গোত্রীর পথ। দেবপ্রয়াগ থেকে ধরাসু হয়ে একটা পথ উত্তরকাশী ছুঁয়ে আরও উত্তরে চলে গেছে। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলেছি। চোখে পড়ে

হিমালয়ের বরফঢাকা ধবল শিখরে শিখরে সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করছে। অপূর্ব দৃশ্য।

‘উত্তরকাশী প্রাচীন তীর্থস্থান। ওখান থেকে গঙ্গোত্রী উত্তরে প্রায় ষাট-বাষট্টি মাইল। উত্তরকাশী ছাড়িয়ে দুর্গম পথ ধরে আমি চলেছি। প্রায় বারো মাইল কঠিন চড়াই পেরিয়ে কমলহাটি চটি। এরপর শুরু হল সাপের মতো আঁকাবাঁকা বিপুল চড়াই। সত্যি কথা বলতে কী, পরিশ্রম হচ্ছিল খুবই, কিন্তু এভাবে পথ চলাতে যে কী আনন্দ তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। হরশিল উপত্যকায় পৌঁছোলুম। এটা হল গঙ্গার তীরভূমি। যে দিকে চোখ ফেরাই ঘন নিবিড় পাইন বন আর সামনে ধবল তুষারে ঢাকা গিরিমালা, নীচে ভাগীরথী কলধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে। চঞ্চল নীল জলরাশি, পাইন বনের ঘন সবুজের সমারোহ আর গিরিশৃঙ্গের তুষার শুভ্রতা-যেন বিরাট এক ক্যানভাসে মনের খুশিতে রং বুলিয়েছে জাদুকর শিল্পী।

‘হরশিলে পাহাড়ের মাথায় ঝুলন্ত সেতুর উপর দিয়ে নদী পার হয়ে ধরালি পৌঁছোলুম। এখন অবশ্য শক্ত ব্রিজ তৈরি হয়েছে। পথ আরও শ্রীময়ী হয়ে উঠল। চারদিকে নাম-না-জানা নানা রঙের অজস্র ফুল ফুটে আছে। রঙের সে যে কী বাহার তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যেন অমরাবতীর দৃশ্য।

‘আমি এগিয়ে চলেছি। কঠিন বরফের উপর দিয়ে সরু পথ, তারপর আবার দুরন্ত চড়াই। আমার সঙ্গী ছিলেন জনা কয়েক তীর্থযাত্রী আর তাঁদের মালবাহক কুলিরা। তীর্থযাত্রীরা পাহাড়ি ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছিলেন। আমার অত পয়সাকড়িও ছিল না, তা ছাড়া আমার তখন জোয়ান বয়স, রক্ত গরম, পথকষ্টকে জয় করার দুর্দম বাসনা আমাকে পেয়ে বসেছিল।’

মি. মালহোত্র একটু থামলেন, তারপর শ্রোতাদের মুখের উপর চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, ‘আপনারা ভাববেন না আমি নিছক একটা ভ্রমণকাহিনি আপনাদের শোনাচ্ছি। আমার কাহিনির এটা হল পটভূমিকা।’ মৃদু হেসে একটু যেন কৌতুক করেই তিনি বললেন, ‘জানেন তো, পটভূমিকা ছাড়া কোনো কিছুই সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় না।’

আমরা কাহিনির গতি কোনদিকে মোড় নেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মাথা হেলিয়ে তাঁর কথায় সায় দিলাম।



‘চড়াই পেরিয়ে,’ মি. মালহোত্র আবার শুরু করলেন, ‘পাহাড়ের চূড়ায় ভৈরবঘাটি চটিতে পৌঁছোলুম। ওখানে নাগা সাধুই বেশি চোখে পড়ল। গঙ্গোত্রী ভৈরবঘাটি থেকে মাইল ছয়েক পথ, কিন্তু এই ছ-মাইল শুধু দুর্গম নয়, বিপদজনক চড়াই। মাঝে মাঝে ধস

নামছে। কত তীর্থযাত্রী যে এই ধসের মুখে প্রাণ হারিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। অনেক নীচে, বেগবতী ভৈরবী উত্তাল ভাগীরথী সগর্জনে ছুটে চলেছে। গঙ্গাগর্ভ থেকে প্রায় দু-হাজার ফুট উঁচু খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল।

'অবশেষে ভাগীরথীর উৎসলোক গঙ্গোত্রী পৌঁছোলুম। গঙ্গোত্রী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু, যোগ-তপস্যার লীলাভূমি। আগে যেমন ভাগীরথীর জল নীল দেখেছি, এখন কিন্তু তা নয়, অনেকটা যেন গৈরিক। ভোরের দৃশ্য ভোলবার নয়। অভ্রের কুচির মতো তুষারপাত হচ্ছে, চারদিকে তুষার শুভ্রতা। সূর্যের আলো হিমালয়ের বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে লক্ষ কোটি হিরের মতো জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। ধ্যানমগ্ন হিমালয়ের যেন শুভ্র তপস্বীর বেশ। গঙ্গার উত্তর তীরে গঙ্গামাইর মন্দির। মন্দিরের পাশেই গঙ্গার কোল ঘেঁষে ভগীরথের মন্দির। সামান্য কয়েকটা আশ্রম ছাড়া নির্জন, জনশূন্য অঞ্চল।

'এখানেই আমার আসল কাহিনি শুরু। গঙ্গোত্রী পৌঁছে সাধুদের মধ্যে একটা উত্তেজনা লক্ষ করে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। পরে জানতে পারলুম গত ক-দিন ধরে ওই অঞ্চলে এক বিরাটাকৃতি পুরুষের দেখা পাওয়া গেছে। কোথা থেকে তিনি এসেছেন, কোথায় তাঁর আস্তানা, কেউ জানে না। তাঁকে সবসময় দেখাও যায় না। খুব ভোরে আবছা অন্ধকারে দু-জন সাধু তাঁকে দেখেছেন কিন্তু চোখের পলকেই তিনি যেন মিলিয়ে গেছেন। বরফের উপর তাঁর মস্ত পায়ের ছাপও দেখা গেছে। এই ব্যাপারে সাধুদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে শুনে আমি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলাম।

'গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ প্রায় বারো মাইল। শেষের দু-মাইল সরু এক ফালি পায়ে-চলা পাহাড়ি পথ। উপল খণ্ডের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হয়, একবার পা হড়কালেই গভীর সলিলসমাধি। আমি ভাবলুম এতটা পথ যখন এসেছি, গোমুখের উৎস না দেখে ফিরব না। আমার সংকল্প শুনে এক বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী আমার সঙ্গী হতে চাইলেন। বয়সের ভারে তিনি ঝুঁকে পড়েছেন, কিন্তু অসাধারণ তাঁর মনোবল।

'ভোর রাতে আমরা যাত্রা করলুম। জনশূন্য তুষারলোক দিয়ে আমরা এক শিলাখণ্ড থেকে আর এক শিলাখণ্ডে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছি। বিকেলের দিকে গোমুখ পৌঁছোলুম। সামনে প্রকাণ্ড হিমবাহ। সেই হিমবাহের নীচেই একটা গহ্বর, ওটাই গঙ্গার উৎস। কলকল শব্দে ভাগীরথীর গৈরিক জলধারা বেরিয়ে আসছে ওই গহ্বরের মুখ থেকে, তারপর বয়ে চলেছে আপন গতিপথে। সে এক অপরূপ শোভা।

'গোমুখ সমুদ্রপিঠ থেকে প্রায় তেরো হাজার ফুট উঁচু। প্রচণ্ড হাড়-কাঁপানো শীত। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে কোনোমতে রাতটা কাটালুম। যে পথে এসেছি, ভোর বেলা সে পথেই ফিরব। সারা রাত আমি দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। প্রচণ্ড ঠান্ডা আর বিচিত্র পরিবেশ আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। আমার বৃদ্ধ সঙ্গী কিন্তু পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন।

'তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, চারদিকে ঘন কুয়াশা। আমি একটু ঘুরে বেড়াবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। জীবনে দ্বিতীয়বার হয়তো এমুখো হবার সৌভাগ্য হবে না। সঙ্গীর ঘুমের ব্যাঘাত না করে আমি এদিক-ওদিক হাঁটতে লাগলুম। ভয় ছিল, একটু অসাবধান হলেই নীচে পড়ে যাব আর তাহলেই নির্ঘাত গঙ্গাপ্রাপ্তি।

'কতক্ষণ এভাবে কেটেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালুম। আমার কয়েক গজ দূরে কুয়াশা ভেদ করে কী যেন একটা আকার নিচ্ছে। দেখতে দেখতে সেটা এক

মানুষের আকৃতি ধারণ করল। বিরাট এক পুরুষ, মাথায় রুক্ষ জটা। আমি হতভম্ব! দু-চোখ কচলালুম; স্বপ্ন দেখছি না তো!

'যখন নিঃসন্দেহ হলুম যে চোখের ভুল নয়, তখন আমার দারুণ কৌতূহল হল। তবে কি ইনিই সেই পুরুষ যাঁকে দেখে সাধুদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে? আগেই বলেছি, আমার বয়স ছিল কম, বুকে ছিল প্রথম যৌবনের দুঃসাহস। সেই বিরাট পুরুষ আমার দিকে পিছন ফিরে স্থির দৃষ্টিতে অসীম দিগন্তের পানে তাকিয়েছিলেন। আমি পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলুম। বোধ হয় আমার উপস্থিতি টের পেয়েই তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ শ্মশ্রু। ঘন ভুরুর তলায় দীর্ঘায়ত পিঙ্গল দু-চোখে কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আমি চমকে উঠলুম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে গেল। কিছু না ভেবেই দু-হাত কপালে ঠেকালুম।

'মুহূর্তকাল তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, তারপরই জমাট কুয়াশা তাঁকে ঢেকে ফেলল। তিনি মিলিয়ে গেলেন, না কুয়াশায় ঢাকা পড়লেন, তা আজও আমি জানি না। তবে তাঁর মুখে যে অভিব্যক্তি সেদিন আমি লক্ষ করেছিলুম, তা কোনোদিনই আমি ভুলতে পারব না।'

মি. মালহোত্র চুপ করলেন।

'কী দেখেছিলেন আপনি?' আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম।

মি. মালহোত্র সঙ্গেসঙ্গেই জবাব দিলেন না। একটু থেমে আপন মনেই যেন তিনি বললেন, 'নিদারুণ হতাশা আর ব্যর্থতার এক ছবি। পুঞ্জীভূত বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই করুণ মুখে।'

দিব্যেন্দুই প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কে সেই বিরাট পুরুষ?'

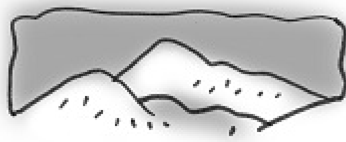
মি. মালহোত্র একটু রহস্যময় হাসি হাসলেন, তারপর বললেন, 'পরে দেশ-বিদেশের নানান কাগজে ওই ঘটনা ফলাও করে ছাপা হয়েছিল, আরও কয়েক জায়গায় তাঁর পায়ের ছাপ নাকি দেখাও গিয়েছিল। এখন যাঁরা বয়সে প্রবীণ, তাঁদের হয়তো মনে থাকতে পারে, কারণ সে সময় ওই ঘটনায় খুব হইচই পড়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু তিনি কে, সে কথা আপনি কেন বলছেন না?' এবার অধৈর্য কণ্ঠে বললাম আমি।

মি. মালহোত্র একটু মুচকি হেসে সবার উপর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন, তারপর বললেন, 'কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন উনি আর কেউ নন, মহাভারতে বর্ণিত অশ্বত্থামা, যিনি অমর হয়ে আজও পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে মি. মালহোত্র আবার বললেন, 'এই বিশাল পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ জীবন যে কী বেদনাময়, অমরত্ব যে কত বড়ো অভিশাপ, তাই বোধ হয় ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখের রেখায় রেখায়।'

*পৌষ ১৩৮৮*






# মীরা বালসুব্রমনিয়াম

রোববার সকালে জলখাবার শেষ করে একখানা সায়েন্স ফিকশনের বই নিয়ে সবে বসেছি, এমন সময় মেজকার ফোন এল, 'আজ বিকেলে আমি আর পুল্লা রেড্ডি একজায়গায় যাচ্ছি। রন্টু তুইও আসছিস তো?'

সেদিন বিকেলে টিভিতে একটা ভালো সিনেমা হবার কথা। ভাবলাম মানা করে দিই। কিন্তু তার আগেই মেজকা বলে ফেলেছেন, 'ঠিক পাঁচটায় আসব আমরা, তৈরি থাকিস।'

মেজকা বিয়ে-থা করেননি। আমাদের বাড়ির কাছেই একটা ছিমছাম ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন। সংসারের ঝামেলা নেই তাই ব্যায়াম করা, খেলা দেখা, বেড়ানো এসব করেই অবসর সময় কাটান। আমারও এসব দিকে খুব ঝোঁক, এজন্য মেজকা আমায় খুব পছন্দ করেন। কোথাও যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যান। পুল্লা রেড্ডি মেজকার বন্ধু। এক অফিসে কাজ করেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি আর জানেন শোনেনও খুব। কোথাও যেতে হলে মেজকা শুধু আমাকে নয়, পুল্লা রেড্ডিকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

বিকেলে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় গাড়ি এসে হাজির। গাড়ি চালাচ্ছেন মেজকা, সামনের অন্য সিটে পুল্লা রেড্ডি। আমি পেছনে উঠে বসলাম। কোথায় যাচ্ছি জানি না। তবে মেজকা যখন পুল্লা রেড্ডিকে সঙ্গে নিয়েছেন তখন ধরে নিলাম যে কোথাও কোনো একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে যার সুরাহা করার জন্য পুল্লা রেড্ডির শরণাপন্ন হতে হয়েছে, কেননা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পুল্লা রেড্ডির মাথা খুব পরিষ্কার।

একটু পরেই অবশ্য শুনলাম যে আমরা যাচ্ছি গণপতি ব্যানার্জির বাড়ি। তবে মেজকা নিজেই জানেন না ঠিক কী জন্য উনি ডেকেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'গণপতি ব্যানার্জি কে মেজকা?'

'উনি বিরাট বড়োলোক। গেঞ্জি আর মোজার কারখানা করে প্রচুর টাকা করেছেন। তবে ব্যাবসা ছাড়াও অন্য দিকে ঝোঁক আছে ওঁর। আর্টের একজন বড়ো সমঝদার, অনেক মূর্তি আর ওরিজিন্যাল ছবি ওঁর কালেকশানে আছে।'

পুল্লা রেড্ডি বললেন, 'ওঁর নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। ওঁর একটা মিনিয়েচার ছবির কালেকশান আছে না?'

মেজকা বললেন, 'ছবির ব্যাপারে আমার কাছে মিনি ম্যাক্সি দুই-ই সমান। ওনার খবর আমি রাখি না।'

একটু পরেই গণপতিবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। উঁচু পাঁচিল দেওয়া বড়ো বাড়ি, গেটে গুর্খা দরওয়ান। বাড়িটা পুরোনো ধাঁচের। বড়ো বড়ো থামওয়ালা বারান্দা। হল ঘরখানা বিরাট আর তেমনি সব ভারী ভারী পুরোনো আসবাবে সাজানো। গণপতিবাবুর

চেহারাখানাও ফরসা আর দশাশই। আমাদের আদর করে বসালেন। সঙ্গেসঙ্গেই প্রায় চা জলখাবার এসে গেল। দেখলাম উনি বেশ অল্প কথার লোক। দু-এক মিনিটের মধ্যেই আসল কথায় চলে এলেন। বললেন, 'আপনাদের যে জন্য ডেকেছি সেটা বলছি এবার। আপনারা কি জানেন যে আমার একটা মিনিয়েচার ছবির কালেকশান আছে?'

'শুনেছি-' বলে মেজকা তাকালেন রেড্ডির দিকে।

'কয়েক মাস আগে আমি একটা মুঘল মিনিয়েচার কিনেছি। খুব মূল্যবান ছবি ওটা। ছবিটা কেনার পর দু-দুবার এ-বাড়িতে চুরির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দু-বারই আমার অ্যালসেশিয়ান কুকুর টের পেয়ে যাওয়ায় চোর ছবি না নিয়েই পালিয়ে যায়। তারপর আমি ছবিখানা ব্যাঙ্কের লকারে রেখেছি, ব্যাঙ্কে যাবার পথেও ক-জন লোক ধাক্কা দিয়ে আমায় মাটিতে ফেলে ছবি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।'

পুল্লা রেড্ডি বললেন, 'এসব কারা করাচ্ছে, সে সম্বন্ধে আপনার কি কোনো ধারণা আছে?'

'সন্দেহ আছে, ধারণা নয়। মানে ছবিটা যখন নিলামে ওঠে তখন আরও অনেকে ছবিটা কিনতে চেয়েছিল। হয়তো তাদেরই কেউ-'

'এখন কী করতে চান?'

'বলছি। বম্বেতে মিনিয়েচার ছবির একটা একজিবিশন হচ্ছে, তাতে ছবিটা পাঠাব, কিন্তু ভয় হচ্ছে পথে না চুরি হয়ে যায় ছবিটা।'

মেজকা বললেন, 'আপনি ছবি বম্বে পাঠাচ্ছেন তা জানবে কী করে চোরেরা?'

গণপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বলতে লজ্জা হচ্ছে কিন্তু লুকিয়ে লাভ নেই। আমার আত্মীয় পোষ্য অনেক। কর্মচারীও। মনে হচ্ছে ওদের মধ্যে কেউ মিনিয়েচার সংক্রান্ত খবর অপর পক্ষকে পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু সেটা কে তা ধরতে পারিনি।'

পুল্লা রেড্ডি প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের কী করতে বলছেন?'

'একজিবিশনের জন্য আমি বম্বে যাব প্লেনে। সবাই জানবে ছবিটা নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার একদিন আগে ছবিটা নিয়ে আপনারা চলে যাবেন ট্রেনে। ওখানে সি গ্রিন হোটেলে আপনাদের জন্য বুকিং করা থাকবে। আমিও থাকব। অর্থাৎ এখানে ব্যাঙ্কের লকার থেকে বার করে ছবিটা নিয়ে বম্বে গিয়ে আমাকে পৌঁছে দেবেন।'

মেজকা বললেন, 'এটা আর এমন কী কঠিন কাজ?'

গণপতিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়। তাহলে আপনাদের ডাকতাম না। অপর পক্ষ এখন পর্যন্ত ছোরা পিস্তলে হাত দেয়নি বটে, কিন্তু দেবে না এমন কোনো গ্যারান্টি নেই।'

'সেটা ঠিক। প্রস্তুত হয়ে যাওয়াই ভালো,' বললেন পুল্লা রেড্ডি। 'কবে নাগাদ যেতে হবে আমাদের?'

'আগামী শনিবার।'

'ট্রেনের রিজার্ভেশন?'

'লোক আছে-হয়ে যাবে। আপনারা তো সবাই-' বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন গণপতিবাবু।

আমিও ভয়ে ভয়ে তাকালাম মেজকার দিকে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে নাকি? মেজকা বম্বে অভিযানে আমায় নেবেন তো?

মেজকাও তাকালেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, তিনজনে গেলেই ভালো। মানে রন্টু ছেলেছোকরা-হাতাহাতি হলে সাহায্য করতে পারবে।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। শনিবার দিন প্রথমে ব্যাঙ্কে গিয়ে লকার থেকে ছবিটা বার করব আমরা। এজন্য পুল্লা রেড্ডি ও মেজকার নামে অথরিটি লেটার দিলেন গণপতিবাবু। তারপর ছবিটা নিয়ে বিকেলে তিনজনে ভায়া নাগপুর বম্বে মেলে চড়ে বসব। আমাদের টিকিট ইত্যাদি পাঠাবেন গণপতিবাবু।

এর আগে বম্বে যাইনি। তাই বম্বে দেখার এই সুযোগ পেয়ে খুব ভালো লাগছিল, গাইড বুক দেখে বম্বের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলির একটা তালিকাও করে ফেললাম।

শনিবার সকালে মেজকার গাড়ি করে ব্যাঙ্কে এলাম আমরা। ছবিটা লকার থেকে নিতে হবে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে গণপতিবাবুর চিঠি দেখাতে উনি লকার খোলবার অনুমতি দিলেন। ছবিটা লকার থেকে বার করে চটপট হাতের ব্রিফকেসে পুরে ফেললেন মেজকা। কিন্তু বাইরে যাবার জন্য দরজায় আসামাত্র হঠাৎ দুটো লোক এসে মেজকাকে ধাক্কা মারল ও তাঁর হাতের ব্রিফকেস নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। কিন্তু মেজকার ব্যায়াম করা শরীর। ওঁর হাতের বজ্র আঁটুনি ছাড়িয়ে কোনো কিছু কেড়ে নেওয়া অত সোজা নয়। তার ওপর একপাশ থেকে আরেকজন ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে-'আরে-আরে এ কী' বলে ব্রিফকেস সমেত মেজকাকে জড়িয়ে ধরলেন। ভয় পেয়েই হয়তো, ধাক্কা-মারা লোক দুটো তখন পালিয়ে গেল।

ওই ভদ্রলোকটি মেজকাকে বললেন, 'গিয়েছিল তো আরেকটু হলেই ব্রিফকেসটা। টাকা পয়সার ব্যাপার, সাবধানে থাকবেন। আমার সঙ্গে গাড়ি রয়েছে, আসুন আপনাকে পৌঁছে দি।'

ভদ্রলোকের কালো ষণ্ডামার্কা চেহারা ও ধূর্ত চোখ দেখে আমার একটুও ভালো লাগল না। অথচ মেজকা দেখলাম ওঁর সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলেন।

পুল্লা রেড্ডি কিন্তু এগিয়ে এসে বললেন, 'গাড়ি তো আমাদের সঙ্গেও রয়েছে। অবশ্য থ্যাংকস ফর দ্য অফার। চলো বোস,' বলে একরকম জোর করেই মেজকাকে টেনে ওঁর গাড়ির দিকে নিয়ে গেলেন।

গাড়িতে উঠবার আগে পেছন ফিরে দেখি সেই ভদ্রলোক খুব কটমট করে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। পুল্লা রেড্ডিকে বলায় উনি বললেন যে ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক।

সেটা আরও বুঝতে পারলাম যখন দেখলাম যে কালো রঙের একখানা অ্যামবাস্যাডার আমাদের গাড়ির পেছন পেছন আসছে। মেজকা সরে গিয়ে পথ করে দিলেও গাড়িখানা আমাদের পিছু পিছুই আসতে লাগল। তবে মেজকা এক্সপার্ট ড্রাইভার। পুল্লা রেড্ডিকে জিজ্ঞেস করে হঠাৎ একটা ইউ-টার্ন নিয়ে বাঁ-দিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়লেন। ওদিকে কালো অ্যামবাস্যাডারটা পেছনের গাড়ির তাড়া খেয়ে এদিকে যেতে বাধ্য হল। মেজকাও এদিক-ওদিক ঘুরে বাড়ির পথ ধরলেন।

পথে পুল্লা রেড্ডিকে ওঁর বাড়িতে নামাবার কথা। মেজকা বললেন, 'রেড্ডি, ছবিটা তোমার কাছেই রাখো।'

পুল্লা রেড্ডি ব্রিফকেস খুলে ছবিটা বার করলেন। ছবিটা লম্বায় আট-ইঞ্চিটাক হবে, চওড়ায় ইঞ্চি পাঁচেক। এর জন্যই এত মারামারি! পুল্লা রেড্ডি ছবিখানা কোটের ভেতরকার পকেটে ঢুকিয়ে নিজের বাড়িতে নেমে গেলেন। বিকেলে হাওড়া যাবার পথে ওঁকে তুলে নিয়ে যাব আমরা।

বিকেলে পুল্লা রেড্ডি ও তাঁর ভি.আই.পি. সুটকেস নিয়ে ভালোয় ভালোয়ই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে রিজার্ভেশন চার্টে আমাদের নামও খুঁজে পেলাম সহজেই। চার বার্থের একটা কামরায় আমরা তিনজন। চতুর্থজন হচ্ছেন কোনো এক নিবারণ ঘোষাল। গাড়ি ছাড়ার একটু আগে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। হাতে ছোটো একটা সুটকেস মাত্র। মাঝারি বয়েস, চুলে অল্প পাক ধরেছে, শুনলাম একটা ওষুধ কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ উনি।

প্রথম রাতটা আমরা বই ম্যাগাজিন পড়েই কাটালাম। সহযাত্রীটিও বেশি কথাবার্তা বললেন না। পুল্লা রেড্ডি নিজের সুটকেসটা মাথার কাছে রেখে ওপরের বাঙ্কে ঘুমুতে গেলেন।

পরদিন কিন্তু নিবারণ ঘোষালের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। শুনলাম ইগতপুরী যাচ্ছেন উনি। পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গা ঘুরেছেন, অনেক গল্প করলেন। ব্রেকফাস্টে আমাদের সঙ্গে ওঁকে ডেকে নিলেন মেজকা। বিকেলে নাগপুরে আমাদের মিষ্টি খাওয়ালেন নিবারণবাবু, সন্ধ্যে বেলা পুল্লা রেড্ডি সবাইকে খাওয়ালেন গরম কফি। এ ছাড়া নিয়মমাফিক লাঞ্চ ডিনার তো ছিলই। আবার ডিনারের পর মি. ঘোষাল কী একটা স্টেশনে নেমে সবার জন্য গরম দুধ নিয়ে এলেন। আমরা তো অবাক। রেলওয়ে স্টেশনে যে এমন দুধ পাওয়া যায় জানতাম না। শুতে যাবার আগে মেজকা বললেন, 'ট্রেন জার্নিতে যদি ডানহাতের ব্যাপারটা এমন চমৎকার হয় তবে ঘন ঘন জার্নি করা চলে।'

পরদিন ঘুম ভাঙল মেজকার ধাক্কায়। চোখ খুলে দেখলাম বেশ বেলা হয়ে গেছে। হাত ঘড়িতে দেখি সাড়ে আটটা বাজে। মেজকা আর পুল্লা রেড্ডি দু-জনকেই খুব গম্ভীর মনে হচ্ছিল। কামরায় নিবারণ ঘোষালকে দেখতে পেলাম না। বিরাট একটা হাই উঠছিল সেটাকে চেপে বললাম, 'নিবারণবাবু ইগতপুরীতে নেমে গেছেন বুঝি?'

পুল্লা রেড্ডি বললেন, 'শুধু নেমে যাননি। আমাদের সুটকেস তিনখানাও নিয়ে গেছেন।'

'সেকী!' আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম।



‘ব্যাপারটা খুবই সোজা।’ পুল্লা রেড্ডি বললেন, ‘দেখা যাচ্ছে যে নিবারণ ঘোষালও ছবি চোরদের এজেন্ট। গরম দুধে নির্ঘাত ঘুমের বড়ি ফেলে দিয়েছিলেন, আমরাও তাই খেয়ে অঘোরে ঘুমিয়েছি। কাজেই তিনখানা সুটকেস নিয়ে কোনো একটা স্টেশনে নেমে যাওয়া ও ধীরে-সুস্থে ছবিটা খোঁজা একটুও কষ্টকর ব্যাপার নয়।’

মেজকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘এখন গণপতিবাবুকে কী ভাবে মুখ দেখাই?’

পুল্লা রেড্ডি বললেন, ‘অত নিরাশ হবেন না। কন্ডাক্টর গার্ডকে কমপ্লেন করেছি। ও বলেছে সামনের স্টেশনে নেমে ইগতপুরীতে টেলিগ্রাম করাবে।’ কিন্তু ওর আশ্বাসে খুব আস্থা রাখতে পারলাম না।

যথাসময়ে ট্রেন বম্বের ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশনে পৌঁছোল। দেখলাম গণপতিবাবু নিজেই আমাদের নিতে এসেছেন। কিন্তু সুটকেসবিহীন তিন মূর্তির ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা দেখেই বুঝে নিলেন ব্যাপারখানা কী। জিজ্ঞেস করায় পুল্লা রেড্ডি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বললেন।

দেখলাম গণপতিবাবুর ফর্সা মুখখানাতে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিল। উনি শুধু বললেন, ‘ইস-এত কষ্ট জলে গেল।’

এমন সময় একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার এসে বললেন, ‘আপনারাই কি নলিনাক্ষ বোস অ্যান্ড পার্টি?’

‘হ্যাঁ।’

‘ইগতপুরী থেকে এইমাত্র ট্রাংকল এসেছে যে আপনাদের সুটকেস ওয়েটিং রুমে পাওয়া গেছে-অবশ্য তালা ভাঙা অবস্থায়। ওগুলো জামাকাপড়ে ঠাসা। মনে হচ্ছে কিছু খোয়া যায়নি। তবে মূল্যবান কিছু ছিল কি?’

গণপতিবাবু একটু তিক্ত হাসি হেসে বললেন, ‘চোরেরা সুটকেসের তালা ভেঙেও মূল্যবান জিনিস ফেলে রেখে যাবে এমন কখনো শুনেছেন কী? কিন্তু ভাবছি কন্ডাক্টর গার্ডের চোখের ওপর নিয়ে একটা লোক তিন-তিনটে সুটকেস নিয়ে নেমে যায় কী করে!’

অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘একজন লোকের তিনটে মাল থাকতে পারবে না, এমন কোনো আইন তো নেই।’

এমন সময় ছোটো সুটকেস হাতে একটি দক্ষিণী ছেলে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। পুল্লা রেড্ডি ওকে দেখে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘এই যে রাজেন্দ্রন-এভরি থিং ও কে?’

‘হ্যাঁ আংকল-‘

‘ম্যাগাজিনগুলো?’

‘এই যে,’ বলে খানকয়েক তেলুগু ভাষার ম্যাগাজিন পুল্লা রেড্ডির হাতে দিল ছেলেটি। উনি একটু উলটেপালটে দেখলেন ওগুলো। তারপর বললেন, ‘ঠিক আছে, তুমি এসো। মাতুংগাতে তোমার কাকার ওখানে পরে খোঁজ করব আমি।’

আমরা চারজনে এরপর হোটেলের দিকে রওনা হলাম। বম্বে এই প্রথম এলাম-কিন্তু মিনিয়েচারখানা চুরি যাওয়াতে মনটা এত খারাপ হয়েছিল যে মেরিন ড্রাইভ দেখেও রোমাঞ্চিত হলাম না।

সি গ্রিন হোটেলটা মেরিন ড্রাইভের ওপর। আমাদের জন্য তিন বেডের একটা কামরা রিজার্ভ করেছিলেন গণপতিবাবু। সামনেই ব্যালকনি-দাঁড়ালে সমুদ্র দেখা যায়।

গণপতিবাবু বললেন, 'যা আমার কপালে ছিল হয়েছে, এ নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। আপনারা বিশ্রাম করুন। বিকেলে রন্টুকে জুহু বিচে নিয়ে যাব।'

পুল্লা রেড্ডি বললেন, 'তার আগে গরম কফি আনতে বলুন দিকি, নয়তো মৌজ হচ্ছে না।'

মেজকা বললেন, 'রেড্ডি তুমি তো বেশ লোক-অমন দামি ছবিটা চুরি গেল আর তুমি মৌজের কথা ভাবছ!'

পুল্লা রেড্ডি মিটি মিটি হেসে বললেন, 'ছবি চুরি গিয়েছে কে বলল?'

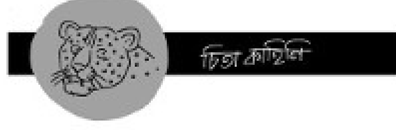
আমরা তো ছার-অমন যে ভারিক্কি গণপতিবাবু, বিস্ময়ে ওঁর কথাও আটকে গেল। বললেন, 'তার মানে?'

পুল্লা রেড্ডি রাজেন্দ্রনের দেওয়া একটা তেলুগু ম্যাগাজিন বার করলেন। নজর করে দেখলাম ফিল্মস্টারের ছবিওলা দুটো পাতা সেলোটেপ দিয়ে সাঁটা। ক্ষিপ্র হাতে সেলোটেপ ছিঁড়ে ফেললেন পুল্লা রেড্ডি। আর দুটো পাতার মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল গণপতিবাবুর সেই মিনিয়েচার। পুল্লা রেড্ডি বললেন, 'ছবিখানা ছিলই না আমাদের সঙ্গে। কালো অ্যামবাস্যাডারের ঘটনার পর বুঝে গিয়েছিলাম যে আমাদের ওপরও নজর থাকবে চোরদের। রাজেন্দ্র অবশ্য বম্বে আসছিলই। তাই ভাবলাম এটাই সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা।'

পুল্লা রেড্ডির কাণ্ডকারখানা দেখে আমি আর মেজকা তখন সত্যি সত্যিই হাঁ। গণপতিবাবু শুধু বললেন, 'ছবিটা ওভাবে খোলা ম্যাগাজিনের ভেতর রেখে নিয়ে এল ছেলেটি, তাও সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারে। খুব রিস্ক নিয়েছিলেন তো মশাই?'

পুল্লা রেড্ডি হেসে বললেন, 'আপনি তো বিজনেস ম্যান, জানেন না, নো রিস্ক নো গেইন?'

*শারদীয়া ১৩৯০*




# রণজিৎ রায়

এই পর্যায়ের দু-টি গল্প এর আগে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, একটি গত বছরের শারদীয়া সংখ্যায় এবং অন্যটি এই বছরের বৈশাখ মাসে। আজ এই পর্যায়ের তৃতীয় কাহিনি বলব।

আজকের কাহিনিতে আমার মালদহ জেলায় ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে তিনবারের শিকারের ঘটনার কথা লিখছি। এর জন্যে প্রথমে একটু মুখবন্ধের দরকার হবে।

মালদহ শহরের প্রায় ছয় মাইল উত্তরে কোতোয়ালি গ্রামে এক প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারের বাসস্থান। সে সময়ে সেই পরিবারের প্রধান খান বাহাদুর গণি খান চৌধুরী তখনও বর্তমান ছিলেন। (তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু বরকত আতাহার গণিখান চৌধুরী বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের মন্ত্রী।) খান বাহাদুর তখন বয়সে প্রবীণ হলেও বেশ সুস্থসমর্থ ছিলেন এবং তাঁর সহৃদয় বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সব শ্রেণির লোকের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন।

তাঁর শিকারের শখও ছিল খুব প্রবল। জমিদারির ভার নেবার পর থেকে প্রায় প্রত্যেক বছরই শীতকালে তাঁর উদ্যোগে কোতোয়ালিতে খুব ঘটা করে শিকারের আয়োজন করা হত এবং সেই সব শিকারে যোগ দেবার জন্যে তিনি পরিচিত বহু শিকারিকে তাঁর অতিথি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। অনেক উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীও এই সব শিকারের দলে যোগ দিতেন। সেই সময়ে এইসব সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই সিভিলিয়ান বা 'ইন্ডিয়ান পুলিশ' সংস্থার (আই.পি.) কর্মী ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই শিকারে উৎসাহ এবং দক্ষতা দুইই ছিল।

কোতোয়ালিতে এই শিকারের আকর্ষণ ছিল দুই ধরনের। কোতোয়ালির আশেপাশে বড়ো বড়ো আম বাগান ছাড়াও হালকা বনজঙ্গলে ভরা অনেক পতিত জমি ছিল, সেই জায়গাগুলি ছিল প্রচুর বুনো মুরগি এবং চিতাবাঘের স্থায়ী আস্তানা। এই দুইরকম শিকারেরই ব্যবস্থা করা হত এবং অতিথিরা প্রায়ই হতাশ হতেন না। আমি খান বাহাদুরের নিজের মুখেই শুনেছি যে তাঁর শিকার জীবনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেখানে প্রায় পাঁচ-শো চিতাবাঘ শিকার করা হয়েছিল। এখনকার দিনে এরকম শিকার প্রায় কল্পনার বাইরে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এইভাবে নিয়মিত বাৎসরিক শিকারের পরও সেখানকার শিকার নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তার কারণ মনে হয় কোতোয়ালিতে চৌধুরী পরিবারের বাইরে স্থানীয় শিকারি বেশি ছিল না এবং সাধারণ লোকদের মধ্যে শিকারের শখ এবং আগ্নেয়াস্ত্র দুইয়েরই অভাব ছিল। বছরে দুয়েকবার করে বড়ো রকমের শিকারের ব্যবস্থা হলেও, তারপর সারাবছর চিতা বাঘ এবং বুনো মুরগিরা নিরুপদ্রবে বংশবৃদ্ধি করতে পারত বলেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে কিন্তু কোতোয়ালিতে শিকারের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। ইংরেজ অফিসারেরা তখন সকলে বিদায় নিলেন; তাঁদের স্থলাভিষিক্ত ভারতীয়েরা অধিকাংশই শিকার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং নিস্পৃহ ছিলেন। সুতরাং সাবেকি বাৎসরিক শিকারের পাটও উঠে গেল। ওইসব বাৎসরিক শিকারে যেভাবে বহু শিকারির জন্য ক্যাম্প পড়ত এবং ভালোভাবে জঙ্গল তাড়াবার জন্যে অনেক হাতি এবং 'বিটার' জড়ো করা হত, যথেষ্ট শিকারির অভাবে সে ব্যবস্থা আর চালু রাখা সম্ভব রইল না। তা ছাড়া খান বাহাদুর তখন বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়ায় তাঁর পক্ষে আর সক্রিয়ভাবে শিকার পরিচালনা করাও সম্ভব ছিল না। তাঁর পরিবারের তরুণরাও এই পরিচালনায় অনভিজ্ঞ হওয়ায় নিজেদের উৎসাহে স্বল্পতর আয়োজনের শিকারের ব্যবস্থা করতে বিশেষ আগ্রহ বজায় রাখেননি।

আমি প্রথম যেবার মালদহে সেখানকার জেলা অফিসের কাজ দেখবার জন্যে যাই, সেটা ছিল ১৯৫৬ সাল। আমি সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ল্যান্ড-রিফর্মস কমিশনার ছিলাম এবং ভূমি রাজস্বসংস্কার বিভাগ পরিচালনার কাজ দেখবার জন্যে নিয়মিতভাবে জেলা অফিসগুলি পরিদর্শনের কাজে মাসে ১৫-২০ দিন সফরে যেতে হত। মালদহে শিকারের সুবিধার কথা আমি আগে থেকেই জানতাম এবং এবিষয়ে খান বাহাদুরের উৎসাহের কথাও শুনেছিলাম।

মালদহে পৌঁছে সেখানকার সার্কিট হাউসে থাকবার ব্যবস্থা করে আমি কোতোয়ালিতে খান বাহাদুরের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে গেলাম এবং তিনিও আমাকে সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করলেন। একটু পরেই শিকারের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি উৎসাহের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবনের অনেক আনন্দময় অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণা করলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু বিষাদের সুরে জানালেন সেইসব জমজমাট বাৎসরিক শিকার ক্যাম্পের ব্যবস্থা অনেকদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবু আমার উৎসাহের কথা শুনে তিনি তার পরের দিন একটি ছোটোখাটো শিকারের ব্যবস্থা করবেন বললেন, তার জন্য তাঁর নিজের হাতিটি ছাড়াও আরও দু-টি হাতি স্থানীয় জোতদারদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে বলে জানালেন। তাঁর পরিবারের তরুণরাও এই শিকারে যোগ দেবার জন্য উৎসাহ দেখাল। যতক্ষণ এইসব আলাপ হচ্ছিল সেই সময়ে খান বাহাদুর তাঁদের বাড়ির সবগুলি আগ্নেয়াস্ত্র আনিয়ে আমাকে দেখালেন। আমি দেখলাম অস্ত্রগুলি যদিও অধিকাংশই দামি বিলিতি জিনিস, কিন্তু বহুদিন অব্যবহারে এবং অযত্নে সেগুলি ময়লা এবং মরচে জমে শ্রীহীন হয়ে গিয়েছে। অস্ত্র সম্বন্ধে আমার আজীবন প্রায় নেশার মতন আকর্ষণ। আমি আমাদের আলাপ চলবার মধ্যেই সেগুলিকে খুলে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলাম, যাতে পরের দিন শিকারের সময় সেগুলি চালাতে কোনো অসুবিধা না ঘটে।

তার পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সেরেই আমি কোতোয়ালিতে গেলাম একটি জিপ নিয়ে এবং ঠিক হল যে আমরা খান বাহাদুরের বাড়ির কাছেই একটি শুকিয়ে যাওয়া জলাশয়ের নীচু জমিতে যে কাঁটাগাছ এবং ঝোপঝাড়ের জঙ্গল আছে, সেইখানে শিকারের খোঁজ করব। ওই জায়গাটির স্থানীয় নাম 'চৌবাচ্ছা'-বোধ হয় আগে সেখানে জল থাকত বলেই। কিন্তু তখন সেটি স্থানীয় চিতাবাঘদের একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ঘাঁটি বলেই সকলের ধারণা।

চৌবাচ্ছায় পৌঁছে হাতি তিনটি দিয়ে লাইন করে যখন আমি এবং আমার সঙ্গীরা পূর্বদিকে সেখানকার জঙ্গলে ঢুকে ঝোপঝাড়ে নাড়া দিতে দিতে পশ্চিম সীমানার কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখন একটি মাঝারি আকারের চিতাবাঘ ঘন জঙ্গলের ভিতর থেকে

তড়িদগতিতে একলাফে পুকুরের উঁচু পাড়ের উপর উঠে পড়ল এবং সঙ্গেসঙ্গেই বাঁ-দিকে ঘুরে সেই পাড়ের কিনারা বরাবর ছুটে পালাতে লাগল। কোনো চিতাবাঘকে দিনের বেলায় খোলা জায়গায় এভাবে ছুটতে আমি আগে কখনো দেখিনি-এরকম হালকা সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি বোধ হয় অন্য কোনো জন্তুরই নেই, মনে হচ্ছিল সে যেন মাটিতে পা না ফেলে প্রায় হাওয়ায় উড়েই চলেছে।

আমি লাইনের একেবারে ডাইনে ছিলাম, চিতাবাঘ আমাকে পিছনে ফেলে যখন আমার বাঁ-দিকের হাতি দু-টিকেও পার হয়ে গেল এবং ওই দুই হাতির শিকারিরা কেউই গুলি চালালেন না, তখন শিকার চলে যায় দেখে অগত্যা আমি আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূর থেকেই বন্দুকের বাঁ-নল থেকে 'এস জি' ছররার গুলি চালালাম। আমি বাঘের কানের ঠিক পিছনে নিশানা করেছিলাম, কিন্তু 'ট্রিগার' চাপবার মুহূর্তেই সে পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং ঠিক তখনই একটু ডান দিকে বেঁকে গিয়ে কোনাকুনি পুকুরের কোণায় উঁচু ঢালু জায়গা বেয়ে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তখন একটু হতাশ হয়ে মনে করলাম আমার গুলি ওইভাবে দিক পরিবর্তনের জন্যে বোধ হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

তখন আমরা হাতি চালিয়ে বাঘ যেখান দিয়ে চলে গিয়েছিল পুকুর পাড়ের সেই জায়গায় উঠে গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, কিন্তু বাঘকে কোথাও দেখা গেল না। একটু দূরে গ্রামের পথ ধরে সেই সময়ে কয়েকজন লোক পূর্বদিকে যাচ্ছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম কোনো বাঘকে তারা ওই পুকুর থেকে উঠে এসে পালাতে দেখেছে কি না। তারা কিছু দেখেনি বলে জানাল। প্রায় আশা ছেড়ে দিয়ে তখন আমি আমার হাতিটিকে নিয়ে, বাঘ যে লাইন ধরে উপরে উঠে গিয়েছিল, সেই লাইন ধরে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম আর খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগলাম। এমন সময়ে আমার হাতিটি হঠাৎ ভয়ে চিৎকারের সঙ্গে এমন দাপাদাপি করে গা-ঝাড়া দিতে শুরু করল যে, মনে হল আমি তার পিঠ থেকে পড়ে যাব, মাহুত তার কানে অঙ্কুশ লাগিয়ে প্রাণপণে টেনেও তাকে বাগ মানাতে পারবে না মনে হল। তখন হঠাৎ বাঁ-দিকে পুকুরের উঁচু পাড়ের ঠিক কিনারায় একটি ঝড়ে-পড়ে-যাওয়া গাছের উপর আমার চোখ পড়ল। দেখলাম সেই গাছের জটপাকানো শিকড়ের মাঝখানে বাঘটি মুখ গুঁজে পড়ে আছে, তার শরীরটি এমন অস্বাভাবিকভাবে সেখানে আটকে রয়েছে যে দেখামাত্র বুঝতে পারলাম তার দেহে আর প্রাণ নেই। বুঝলাম বাতাসে ওই বাঘের গন্ধ নাকে আসাতেই হাতি ভয়ে অমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমি ততক্ষণে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য হাতির পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছি। তারপর সাবধানে বাঘের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে লক্ষ করলাম তার নিশ্বাস পড়ছে কি না। সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তার পাশে মাটিতে বসে তার শরীর পরীক্ষা করে দেখলাম যে আমার গুলি সে হঠাৎ ডাইনে বেঁকে যাবার জন্যে তার মাথায় না লেগে বাঁ-দিকের কাঁধের পিছনে লেগেছে এবং 'এস.জি' গুলির ন-টি ছররার মধ্যে পাঁচটিই কোনাকুনি ভাবে তার শরীর ভেদ করে হৃৎপিণ্ডকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে ডানদিকের কাঁধের জোড়া এবং ঘাড়ের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়ে প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই মৃত্যু ঘটিয়েছে। ততক্ষণে আমার সঙ্গীরা সবাই কাছে এসে গেছেন এবং আমার সফল লক্ষ্যভেদের জন্যে অনেক তারিফ জানালেন। তারপর সাফল্যের আনন্দে খুশির মেজাজ নিয়ে আমরা খান বাহাদুরের বাড়িতে ফিরলাম।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বিকেল বেলায় আমরা আরেকবার চৌবাচ্ছায় গিয়ে জঙ্গল তাড়ালাম। এবারেও আমি হাতির লাইনের ডানদিকে ছিলাম, অন্য হাতি দু-টির সোয়ারিরা আমার বাঁ-দিক ধরে এগোলেন। আর বাকি তিনজন শিকারি পুকুরের যে কোনা দিয়ে বাঘ পালাবার চেষ্টা করেছিল সেখানে

পুকুরের পাড়ের কিনারায় মাটিতে পড়ে থাকা একটি প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়ালেন।

এবারেও আগের মতোই পূর্বদিক থেকে ঝোপজঙ্গল ঠেলে আমাদের হাতির লাইন এগিয়ে গেল। যখন চৌবাচ্ছার পশ্চিম পাড়ের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি, তখন পর্যন্ত কোনো জন্তুর আভাস না পাওয়ায় আমরা আর শিকার পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। তখন হঠাৎ দেখলাম হাতির লাইনের বাঁ-দিকে পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার জঙ্গলের একটু ফাঁকের ভিতর থেকে একটি প্রকাণ্ড বড়ো চিতাবাঘ একলাফে বেরিয়ে তার দ্রুত সাবলীল গতিতে পাড়ের নীচের কিনারা দিয়ে ছুটে চলেছে। সেইখানে ঠিক তার উপরেই পাড়ের কিনারায় গাছের গুঁড়ির আড়ালে যে তিনজন শিকারি দাঁড়িয়েছিলেন, বাঘ মনে হল তাদের দশ গজের মধ্যে দিয়েই চলে গেল, কিন্তু শিকারিরা কেউই বন্দুক ওঠালেন না দেখে আমার মন হতাশা এবং ক্ষোভে ভরে গেল, কারণ এমন সুবর্ণ সুযোগ কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। আমার পক্ষে তখন কিছুই করা সম্ভব ছিল না, কারণ বাঘকে আমি দেখেছিলাম প্রায় নব্বই গজ দূর থেকে। অতদূর থেকে শটগানের গুলিতে তাকে ফেলবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আমার বাঁ-দিকের দুই হাতির সোয়ারি শিকারিরা বাঘকে পাল্লার মধ্যে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরাও গুলি চালাননি- বুঝলাম ওইভাবে ছুটন্ত জন্তুর উপর সঠিক নিশানায় গুলি চালাতে তাঁরা অভ্যস্ত নন।

বাঘ চলে যাবার পর পাড়ে দাঁড়ানো শিকারিদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁরা অমন সুযোগ পেয়েও তা ছেড়ে দিলেন কেন। তাঁরা অপ্রস্তুত ভাবে আমতা-আমতা করে যা বললেন, তাতে বুঝলাম তাঁরা মাটিতে দাঁড়িয়ে অত কাছাকাছি অমন বিপজ্জনক জন্তুকে গুলি করতে ভরসা পাননি। পরে আরও জানলাম যে তাঁরা এর আগে গাছের উপর বা হাতির পিঠ থেকে ছাড়া কখনো চিতাবাঘ মারবার চেষ্টা করেননি।

এই বাঘটির মতন বিশালকায় দর্শনীয় চিতাবাঘ আমি আর কখনো দেখিনি। মনে মনে স্থির করলাম এরপর আবার যখন মালদহে যাব তখন তার জন্যে আবার চেষ্টা চালাব।

তার পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে, আবার যখন মালদহে সফরে যাই সেবারেও একদিনের জন্যে কোতোয়ালিতে শিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেবারে মাত্র একটি হাতিই জুটেছিল, সেটি খান বাহাদুরের নিজের। অন্যগুলি পাওয়া যায়নি, কারণ সে সময়ে জমিদারি অধিগ্রহণের ফলে অনেক জমিদার এবং জোতদারদের অবস্থায় মন্দা যাচ্ছিল, তাঁরা ব্যয়সংকোচের জন্যে হাতি বিক্রি করে দিচ্ছিলেন।

সেবারে ওই একটি হাতি নিয়েই সীমিত শিকারের চেষ্টায় একটি চিতাবাঘ পাওয়া গিয়েছিল। আমি নিজেই ওই হাতিতে থেকে আমার নির্দেশ মতন হাতি চালিয়ে একটি টুকরো জঙ্গল থেকে সেই বাঘটিকে তাড়িয়ে একটি আম বাগানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। অন্য শিকারিরা সেই নির্দিষ্ট জায়গায় আগেই গাছে উঠে তৈরি হয়ে বসেছিলেন। বাঘ সেখানে পৌঁছোনোমাত্র সবাই একসঙ্গে গুলি চালিয়ে তাকে ধরাশায়ী করলেন। কিন্তু সেই বড়ো বাঘটির খোঁজ সেবারে পাওয়া যায়নি।

এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে আমি যখন আবার মালদহে যাই, আমার সেবারের শিকার একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সে দিনটি ছিল ৬ এপ্রিল, তখন ইস্টারের ছুটি ছিল বলে মনে হয়।

সেদিন সকালে কোতোয়ালিতে পৌঁছে যে খবর পেলাম তা একই সঙ্গে উত্তেজনাময় এবং একটু নৈরাশ্যজনক। শুনলাম সেই বড়ো চিতাবাঘটি প্রায় একবছর ধরে কোতোয়ালি

গ্রামেই স্থায়ীভাবে তার আস্তানা গেড়েছে এবং ওই সময়ের মধ্যে প্রায় আশিটি গৃহপালিত জন্তু মেরেছে। তার মধ্যে ছাগল, ভেড়া এবং কুকুর ছাড়াও হালের বলদ এবং গোরুও অনেক ছিল, এমনকী খান বাহাদুরের একটি প্রিয় ভুটিয়া ঘোড়াও সে মেরেছিল। এই সময়ে খান বাহাদুর তাঁর হাতিটিও বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং হাতি না থাকায় তাঁর পরিবারের তরুণ শিকারিরা এই বাঘটিকে মারবার কোনো উদ্যোগ করেননি। মাচায় বসে টোপ হিসাবে ছাগল বেঁধে প্রচলিত উপায়ে তাকে মারবার কোনো চেষ্টা হয়নি-বুঝলাম ওভাবে শিকার করবার জন্যে যে ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাস দরকার, অভিজ্ঞতার অভাবে সে প্রস্তুতি এই তরুণদের ছিল না। আরও শুনলাম ওই চিতাবাঘটির একটি সঙ্গিনীও তখন জুটেছে এবং তারা অবাধে সেই লোকালয়ের মধ্যেই তাদের দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি যেদিন সেখানে গেলাম, তার আগের রাতেই বাঘটা কাছের এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে একটি বড়ো ভেড়া টেনে নিয়ে গিয়েছে এবং সেই ভেড়াটির ভুক্তাবশিষ্ট দেহাংশ সেদিন সকালেই কাছের একটি জঙ্গলে দেখা গিয়েছে বলেও শুনলাম। তখন আমি প্রস্তাব করলাম হাতি না পেলেও কয়েকজন লোককে যদি জঙ্গল তাড়াবার জন্যে পাওয়া যায়, তাহলে আমি তাদের নিয়ে ওই চিতাবাঘের সন্ধানে যাব। তবে আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্দুকধারী থাকা দরকার তা না হলে জঙ্গল তাড়াবার সময়ে একটিমাত্র বন্দুক দিয়ে বাঘেদের পালাবার সবগুলি পথ আগলানো যাবে না।

আমার উৎসাহ দেখে বাড়ির যুবকদের কয়েকজন আমার সঙ্গী হতে রাজি হলেন এবং বরকত তাদের নেতৃত্ব করবার ভার নিলেন। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই খান বাহাদুরের প্রজা কয়েকজন সাঁওতাল যুবককে ডেকে আনা হল। এরা সবসময়েই শিকারে উৎসাহী। তির ধনুক, টাঙ্গি এবং লাঠি নিয়ে তারা আমাদের সঙ্গী হল।

যে টুকরো জঙ্গলটিতে ভেড়ার দেহাবশিষ্ট দেখা গিয়েছিল, আমরা সেখান থেকেই আমাদের খোঁজ শুরু করলাম। বিটাররা জঙ্গলের একধার থেকে লাইন করে ঝোপঝাড়ে লাঠির বাড়ি মারতে মারতে এগিয়ে চলল, আর আমরা সেই জঙ্গলের অন্য কিনারায় এক-একটি ঝোপের পিছনে নিজেদের আড়াল করে জন্তু চলবার সরু পথগুলি আগলে দাঁড়ালাম। যে পথটি দিয়ে বাঘের চলে যাবার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা বলে মনে হল, আমি সেই পথটি আগলিয়ে রইলাম, আর অন্য শিকারিরা পরস্পরকে যেন দরকার হলে সাহায্য করতে পারেন এমনভাবে কাছাকাছি জায়গা বেছে দাঁড়ালেন। এই শিকারে আমরা সবাই ছররার বন্দুক (শট গান) নিয়েছিলাম, কারণ কাছাকাছি চারদিকেই লোকের বসতি থাকায় দূরপাল্লার রাইফেল ব্যবহার করা সেখানে বিপজ্জনক হত।

আমরা খুব সতর্কভাবে এই জঙ্গলটি তাড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু সেখানে কোনো বাঘের দেখা মিলল না। তারপর একের পর এক সেদিকটার প্রত্যেকটি টুকরো জঙ্গলই ওইভাবে তাড়ানো হল, কিন্তু চিতাবাঘের কোনো সন্ধানই না পেয়ে আমরা বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম। ততক্ষণে বেলা এগারোটার বেশি হয়ে গিয়েছে, প্রচণ্ড রোদের মধ্যে অতক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আমরা একটু ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলাম (সেদিন তাপমাত্রা ছায়ায় ১০৬ ডিগ্রি ফারেনহিট ছিল)। সুতরাং একটু বিশ্রাম এবং তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে আমরা খান বাহাদুরের বৈঠকখানায় ফিরে গেলাম। তিনি আমাদের অসাফল্যের কথা শুনে একটু ভেবে তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় সিকি মাইল উত্তরে একটি ছোটো হালকা জঙ্গলে শেষ চেষ্টা করতে বললেন।

এই জঙ্গলটি সেখানকার অন্য সব ঘন জঙ্গলভরা জায়গাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন। মাঝখানে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে আগে আম বাগান ছিল, গাছগুলি পুরোনো হয়ে যাবার পর সেগুলিকে কেটে ফেলে জমি সাফ করা হয়েছিল। একটি লম্বাটে চতুষ্কোণ জায়গায়

একধরনের হালকা নতুন গাছের চারা লাগিয়ে এই চারা-বাড়িটি (plantation) তৈরি করা হয়েছিল। এটি লম্বায় প্রায় এক-শো গজ, কিন্তু চওড়ায় গজ ত্রিশের বেশি নয়। এই জঙ্গলের ঠিক উত্তর সীমানা বরাবর একটি লোকাল বোর্ডের রাস্তা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে গিয়েছিল। আমার সঙ্গী শিকারিরা সবাই এই রাস্তায় সার বেঁধে এমনভাবে দাঁড়ালেন যাতে বাঘ সেদিক দিয়ে পালাতে না পারে এবং তাঁরা দরকার হলে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারেন।

এই জঙ্গলটি পূর্বদিকে যেখানে শেষ হয়েছে সেই সীমানার গজ পনেরো দক্ষিণে, খোলামাঠের মধ্যে একটি কেটে-ফেলা আম গাছের গুঁড়ির পিছনে আমি এমনভাবে বসলাম যাতে জঙ্গলের দিক থেকে আমাকে সহসা না দেখা যায়। আমার বসবার জন্যে একটি নীচু ভাঁজ করা 'ক্যাম্পস্টুল' (campstool) খান বাহাদুরের বুড়ো মাহুত বয়ে এনেছিল। এই জায়গাটিতে বসবার উদ্দেশ্য ছিল। যদি পশ্চিম দিক থেকে জঙ্গল তাড়িয়ে আনবার সময়ে বাঘ (সেখানে থাকলে) সোজাসুজি পূর্ব দিকের সীমানা পর্যন্ত না এসে ওই জঙ্গলের দক্ষিণ দিকের একটি সরু জন্তু চলার পথ ধরে বেরিয়ে এসে, সেখান থেকেই যে একটি ছোটো নালা সরু হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছে তার ভিতরে নেমে পড়ে পালিয়ে যায়, তাহলে তাকে আর পাওয়া যাবে না।

ওই জঙ্গলের পথটি বেরিয়েছিল আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে। আমি ততদূর আমার বন্দুকের পাল্লায় পাব জানতাম। এইভাবে বসাতে জঙ্গলের দক্ষিণ দিকের কোনাটি আমার ডানদিকে পড়ল। চোখের কোণ থেকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখবার দরকার আমি খেয়ালে রেখেছিলাম। এই জঙ্গলটি যেখানে শেষ হয়েছিল, তার পরে প্রায় বিশ গজ একেবারে ফাঁকা মাঠ, তারপরেই আবার হালকা ঝোপে ঢাকা জমি শুরু হয়ে ক্রমেই সেই সব ঝোপঝাড় ঘন আর উঁচু হয়ে দূরের বড়ো জঙ্গলে গিয়ে মিশেছিল।

এইভাবে বাঘের আশায় প্রতীক্ষা করবার সময়ে আমার দু-জন সঙ্গী ছিল। একজন স্থানীয় একটি যুবক (তার নাম এখন আমার মনে নেই), তার বন্দুক চালাবার অভিজ্ঞতা ছিল তবে বুনো মুরগির চেয়ে বড়ো কোনো শিকার সে তখনও করেনি। তাকে আমি আমার সামনে গজ পঁচিশেক দূরে বসিয়েছিলাম, যাতে জঙ্গলের দক্ষিণ দিকের সরু পথটি দিয়ে যদি বাঘ বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাহলে তার নজরে আসে এবং সে আমাকে জানিয়ে দিতে পারে। অন্যজন খান বাহাদুরের বুড়ো মাহুত। তাকে আমি আমার পিছনে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা আম গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকতে বললাম।

সব আয়োজন ঠিক হলে বিটাররা লাইন করে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ে লাঠির বাড়ি মেরে এগোতে লাগল। আমি তাদের কোনোরকম হাঁকডাক করতে বারণ করেছিলাম, কারণ তাতে বাঘ অযথা চমকে গিয়ে এত জোরে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে পারে যে তাকে সময় মতন দেখা বা গুলি করবার সুযোগ পাওয়া যাবে না, কিংবা লাইন কেটে জঙ্গলের বাঁ-দিক বা পিছন দিক থেকেও বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমি তাকে দেখতেই পাব না।

বিটাররা যখন জঙ্গলের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পার হয়ে এগিয়েছে তখন আমার মনে হল বাঘ বোধ হয় সেখানে নেই। এমন সময় হঠাৎ আমার ডান চোখের কোণা থেকে এক ঝলকের মতন দেখলাম একটি প্রায় কালো রঙের জন্তু আমার ডান দিকের জঙ্গলের সীমানা থেকে প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে বেরিয়ে প্রায় হাওয়ায় ভেসে উড়ে যাবার মতন গতিতে আমাকে পার হয়ে চলে যাচ্ছে। প্রথম লাফেই সে প্রায় কুড়ি ফুট পার হয়ে

গিয়েছিল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে ডানদিকে ঘুরে বন্দুক কাঁধে তোলবার আগেই সে আরেক লাফে আরও কুড়ি ফুট চলে গেল। যতক্ষণে আমি বন্দুকের নল ঘুরিয়ে তার মাথায় নিশানা নিতে পারলাম ততক্ষণে সে তার তৃতীয় লাফে ওই ফাঁকা জমিটুকুর শেষ প্রান্তে যে নীচু ঝোপের লাইন ছিল সেটি টপকিয়ে যখন ঝোপের ওধারে নেমে পড়েছিল ঠিক সেই সময়ে আমার গুলি ছুটল। কিন্তু তখনই আমি বুঝলাম আমার 'বাকশটে'র ঝাঁক তার মাথায় লাগেনি, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে তার মাথা সামনে বাড়ানো তার দুই পায়ের মাঝখানে আড়াল হয়ে গিয়েছিল। তবে গুলি যে সম্ভবত তার কাঁধেই লেগে থাকবে তাই মনে হল। তখনই চিতাবাঘের শরীরের আশ্চর্য নমনীয়তা এবং সাবলীল ক্ষিপ্রতার একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখলাম। গুলি লেগে ঝোপের ওধারে পড়ে যাবার আগেই বাঘ শূন্যেই একমোচড়ে তার শরীরটিকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়ে আমার দিকেই তার মুখ ফিরিয়ে নেমে গেল। তার পরমুহূর্তেই দেখলাম আমাকে আক্রমণ করবার জন্যে চিতাবাঘ শূন্যে লাফিয়ে উঠে সেই ঝোপের উপর দিয়ে আমার দিকে চলে আসছে। আমার বন্দুক তার দিকে নিশানা করে কাঁধেই ওঠানো ছিল। আমার দ্বিতীয় 'বাকশটে'র ঝাঁক তার গলা এবং বুকের সন্ধিস্থানে যে নীচু জায়গাটি ছিল সেই জায়গায় লাগল।

এই দ্বিতীয় গুলি চলবার পর এমন একটি অভাবনীয় দৃশ্য দেখলাম যা আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি বা অন্য কারও কাছে শুনিনি এবং কোনো প্রসিদ্ধ শিকারির লেখা বইয়েও এ রকম ঘটনার বর্ণনা পড়িনি। এই গুলিটির সঙ্গেসঙ্গেই যেন সামনের কোনো অদৃশ্য বাধা পেয়ে বাঘের শরীর আর ঝোপ পার হতে পারল না, ঝোপের ওধারেই তার পিছনের দুই পায়ে ভর রেখে বাঘটি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর নৃত্যশিল্পীরা যে ভাবে পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে ঘুরপাক খায়, ঠিক সেই ভাবেই চার-পাঁচবার ঘুরপাক খেয়ে ঝোপের ওধারেই পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর সব চুপচাপ। ঝোপের পিছনে কোনোরকম শব্দ বা নড়াচড়ার কোনো আভাসই পাওয়া গেল না।

আমি ততক্ষণে বন্দুকে আবার গুলি ভরে নিয়েছি। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে খুব লক্ষ করে দেখে এবং শুনে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম গুলি লাগবার পর বাঘ সেখানেই পড়ে আছে, না অন্য কোথাও সরে গিয়েছে। যখন কিছুই জানতে পারলাম না তখন সাবধানে এগিয়ে গিয়ে সেই ঝোপজঙ্গলের ভিতরেই বাঘকে খুঁজে দেখা স্থির করলাম।

বাঘ গুলি খেয়ে যেখানে পড়েছিল আমি সোজাসুজি সেদিকে এগোলাম না, কারণ সে যদি সেখানেই থাকে তাহলে একেবারে তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়বার আগে তাকে দেখা যাবে না, কিন্তু বেঁচে থাকলে সে আগে থেকেই আমাকে ঝোপের তলা থেকে দেখতে পাবে এবং অত কাছ থেকে আক্রমণ করলে তাকে ঠেকানো খুবই কঠিন হবে। সেজন্যে আমি ডান দিক থেকে ঘুরে গিয়ে যেখানে তাকে শেষ দেখা গিয়েছিল তার অনেকটা পেছনে পৌঁছে সেখান থেকে সতর্কভাবে প্রত্যেকটি ঝোপের তলা ভালো করে দেখে নিয়ে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু ঝোপের লাইনের শেষ সীমানা পর্যন্ত গিয়েও তাকে দেখতে পেলাম না। ততক্ষণে আমার সঙ্গী শিকারি যুবকটি যেখানে দাঁড়িয়ে আমি গুলি করেছিলাম সেইখানে চলে এসেছিল-সে হঠাৎ ভীষণ ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল, 'বাঘ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এখুনি চার্জ করবে। শিগগির গুলি করুন।' আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার ডানদিকে তাকালাম, কিন্তু বাঘকে সে কোথায় দেখছে তা ঠাহর করতে পারলাম না। আমার সঙ্গীর চিৎকার বেড়েই চলল। আমি হাত নেড়ে ইশারায় তাকে থামাবার চেষ্টা করলাম, কারণ বাঘের যদি তখনও আক্রমণ করবার শক্তি থাকে তাহলে তার চেঁচানো শুনে তাকেই আক্রমণ করবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাকে থামানো গেল না। সেই সঙ্গেই আরও দেখলাম, যে বুড়ো মাহুত আমার বসবার আসনটি বয়ে এনেছিল

সে তার প্রায় অকর্মণ্য এবং বেঁকে-যাওয়া পা দু-খানি অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত গতিতে চালিয়ে ফাঁকা মাঠ পার হয়ে প্রায় খান বাহাদুরের বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

এই অবস্থায় মনের উত্তেজনা খুবই বেড়ে যায়। আমি প্রবল চেষ্টায় মাথা ঠান্ডা রেখে শিকারি যুবককে হেঁকে জিজ্ঞাসা করলাম বাঘকে সে কোথায় দেখতে পাচ্ছে। সে হাত বাড়িয়ে আমার ডানদিকে ঝোপের লাইনের শেষ প্রান্তের ঠিক পরেই একটি বড়ো কুল গাছের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ওই গাছের তলায়,' আমি তখন সতর্কভাবে সেই দিকে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু কুল গাছের পনেরো গজের মধ্যে পৌঁছেও প্রথমে কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। তখন দুপুরের সূর্যের আলো কুল গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে যেখানে মাটিতে পড়েছিল সেখানে গাছের পাতার গোল গোল কালো ছায়া আর উজ্জ্বল রোদের আলোয় মিশে এমন একটি বিচিত্র জমাট বুটিদার নকশা তৈরি হয়েছিল যা চিতাবাঘের শরীরের হলদে চামড়ার উপর চক্রাকার কালো রঙের বুটির সঙ্গে একেবারে অভিন্ন। সেই পরিবেশে খোলা জায়গাতেও চিতাবাঘ গাছের ছায়ার সঙ্গে বেমালুম একাকার হয়ে মিলিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে।

একটুক্ষণ সেই গাছের নীচে আলোছায়ার নকশার দিকে তাকিয়ে থাকবার পর মনে হল যেন সেখানে সামান্য নড়াচড়ার একটু স্পন্দন এক মুহূর্তের জন্যে খেলে গেল। আর সেই সঙ্গেই সেই অবয়বহীন একটানা কালো-হলুদের নকশার একটা অংশ যেন হঠাৎ জমে গিয়ে চিতাবাঘের সমস্ত দেহটি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল, ঠিক ভোজবাজির মতন চমক দিয়ে। দেখলাম চিতাবাঘটি উপুড় হয়ে আমার দিকেই মুখ করে মাটিতে সটান লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে। তার মাথাটা জমি থেকে একটুখানি ওঠানো আর তার উজ্জ্বল হলুদ রঙের চোখ দু-টি স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। আমি আবার গুলি চালাবার জন্যে বন্দুক কাঁধে ওঠাবার সঙ্গেসঙ্গেই কিন্তু তার চোখ দুটি বুঁজে এল আর তার মাথাটি তার সামনে বাড়ানো দু-পায়ের উপর নেমে এসে স্থির হয়ে গেল। আমি আর গুলি চালালাম না, স্থির ভাবে লক্ষ করতে লাগলাম তার শরীরে তখনও প্রাণের কোনো চিহ্ন দেখা যায় কি না।

এমন সময় চিতাবাঘের পিছন দিক থেকে তাঁর বাঁ-দিকের রাস্তা দিয়ে কোলাহল করে আমাদের সাঁওতালি বিটারদের এগিয়ে আসবার আওয়াজ পেলাম। 'বাঘ পড়েছে, বাঘ পড়েছে' বলে চিৎকার করে তারা ছুটে আসছিল। আমি চেঁচিয়ে তাদের তখুনি কাছে আসতে বারণ করলাম, কারণ বাঘ মরেছে কি না সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে গেলে বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু যখন দেখলাম তারা আমার নিষেধ না শুনে উৎসাহের ঝোঁকে এগিয়েই আসছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাঘের মাথায় আরেকবার গুলি করলাম। সেটার বোধ হয় একেবারেই দরকার ছিল না। তারপর নিজে এগিয়ে বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে আসতে অনুমতি দিলাম। তখন বিটারদের সঙ্গে বরকত এবং তাঁর সঙ্গী শিকারিরাও সবাই হইহই করে এসে সেখানে জড়ো হলেন। বাঘটির প্রকাণ্ড আকৃতি, অসাধারণ মজবুত গড়ন এবং চামড়ার উজ্জ্বল সৌন্দর্য দেখে সবাই এই শিকারের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং আমাকেও তারিফ জানালেন।

তারপর বাঘটিকে একটি বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে ছ-জন লোক দিয়ে তাকে বয়ে নিয়ে খান বাহাদুরের বৈঠকখানার সামনে নিয়ে যাওয়া হল। বাঘটিকে দেখে খান বাহাদুর বললেন বহু বছরের মধ্যে এত বড়ো চিতাবাঘ তাঁর এলাকায় শিকার হয়নি। মাপ নিয়ে দেখা গেল বাঘটি লম্বায় নাকের ডগা থেকে লেজের আগা পর্যন্ত সাত ফুট নয় ইঞ্চি ছিল। লোকালয়ের কাছের জঙ্গলের চিতাবাঘেরা সাধারণত এর চাইতে অনেক ছোটো হয় এবং

তাদের গায়ের রংও অনেকটা হালকা হয়ে থাকে। এই বাঘের গায়ের চক্রাকার গোল ছাপগুলি উজ্জ্বল কালো রঙের এবং খুব ঘন সন্নিবিষ্ট থাকায় তার চামড়ার জৌলুস সত্যিই দেখবার মতন ছিল। তা দেখে বুঝতে পারলাম বাঘটি যখন বনের ভিতর থেকে বাইরে সূর্যের আলোয় বেরিয়েছিল তখন প্রথম দৃষ্টিতে হঠাৎ কেন তাকে কালো রঙের বলে মনে হয়েছিল। এরকম চেহারার বাঘ লোকালয় থেকে দূরে গভীর বনাঞ্চলেই সাধারণত দেখা যায়-কেমন করে যে এই গ্রামের জঙ্গলে তার দেখা মিলল তা আমার অজানা।

এই বাঘটি পাবার পর সেদিন দুপুরের খাওয়া খান বাহাদুরের বাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে মিলে মহা আনন্দে সারা হল। তারপর বিকেলে আমরা আরেকবার বেরোলাম বাঘের সঙ্গিনীটির খোঁজে, কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন খান বাহাদুরের বৈঠকখানাতেই চায়ের পাট শেষ করে যখন জিপের বনেটের উপরে বাঘকে চড়িয়ে সার্কিট হাউসে ফিরলাম তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

সেখানে ফেরবার কিছুক্ষণ পরেই একজন ভদ্রলোক একটি ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি জানালেন তিনি মালদহ শহরের একজন ফটোগ্রাফ-ব্যবসায়ী। যখন আমার জিপ তাঁর স্টুডিয়োর সামনে দিয়ে ফিরছিল তখন বাঘটির অমন দর্শনীয় চেহারা দেখে তার ছবি তুলে রাখবার জন্যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছেন।

বাঘটিকে তখন সার্কিট হাউসের সামনে বারান্দায় নামিয়ে রাখা হয়েছিল। ফটোগ্রাফারের পছন্দমতন সেটিকে শোয়াবার পর তিনি বললেন যে বাঘের মাথাটি যদি একটু উঁচু করে তুলে ক্যামেরার দিকে মুখ করে রাখা যায় তাহলে ছবিটি খুব ভালো উঠবে। দু-পাশে দু-টি কাঠি লাগিয়ে ঠেকা দিয়ে বাঘের মাথাটি তুলে রাখবার চেষ্টা করে সফল হওয়া গেল না, বারান্দার মসৃণ শানের মেঝেতে কাঠি দু-টি পিছলে পড়ে যেতে লাগল। তখন আমি নিজেই বাঘের পাশে বসে দু-হাত দিয়ে তার মাথাটি উঁচু করে ধরে রাখলাম এবং সেই ভঙ্গীতে খুশি হয়ে ফটোগ্রাফার তার ছবি তুললেন।

*শারদীয়া ১৩৯০*




# রেবন্ত গোস্বামী

সকাল থেকেই দিনটা ছাইরঙা স্যাঁতসেতে একটা চাদর জড়িয়ে যেন ঢুলছে। চৈত্র মাসের মাঝামাঝিতেই মনে হচ্ছে আষাঢ়ে বর্ষা। সন্ধ্যের দিকে আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাতেও শুরু করেছে। আর তার সঙ্গে ভারসাম্য রাখতেই হয়তো মানুষের তৈরি বিদ্যুৎ ঝপ করে বিদায় নিয়ে সারা বাড়ি একেবারে অন্ধকারে ভরিয়ে দিল।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিরক্তি নিয়ে সৈকত নন্দী কপালটা টিপে ধরে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে থাকেন। সকালে একটু ভেজার দরুন মাথাটা টিপটিপ করছে। এসময় একটু চা খেতে পারলে ভালো হত। তাঁর স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে ভবানীপুরে বাপের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন। কাল ফিরবেন। বাড়িতে কাজের লোক নিবারণ আছে, অবশ্য নামে মাত্র। তাল বুঝে সেও অনেকক্ষণ আগে বেরিয়েছে, কাকার সঙ্গে একটু দেখা করেই চলে আসবে বলে। বলেছে, এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে। অবশ্য তার সময়ের সঙ্গে সব সময়ই দু-তিন ঘণ্টা যোগ করে রেখে দেন সৈকত নন্দী-বিশেষত তার বউদিমণি বাড়ি না থাকলে। জানে, দাদাবাবু একটু ধমকালে, চা করবে কি না জিজ্ঞেস করলেই দাদাবাবুর রাগ জল। এখন নিজে উঠে চা তৈরি করা যায়। কিন্তু তাতে চা খাওয়ার মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া এই অন্ধকারে খুটখুট করে ওসব করার চেয়ে চুপচাপ শুয়ে কোনো গল্পের প্লট ভাবা অনেক ভালো। 'মিহিদানা' পত্রিকার সম্পাদক দু-সপ্তাহের মধ্যে একটা ভিন্ন স্বাদের গল্প দিতে বলেছেন। সৈকত নন্দী অবাক হয়ে ভাবেন, সম্পাদকরা কি গল্পগুলো চেটে চেটে দেখেন?

ভিন্ন স্বাদ কেন, অভিন্ন স্বাদের কোনো গল্পও মনে আসছে না। অথচ খুব কাজের ভিড়েও এমনকী ভিড়-ভরতি বাসে চলতে চলতেও কত গল্পের বীজ শিমুলের বীজের মতো বাতাসে ভাসতে ভাসতে তার মাথায় এসে আটকে যায়। এখন শুধু কাগজের জমির ওপর তাকে বুনে গোড়ায় কালি ঢাললেই গল্পের গাছ গজিয়ে ওঠে শাখাপাতা নিয়ে অথচ আজ মাথাটা যেন সাহারা মরুভূমি।

সৈকত নন্দী ভাবেন, এসময় হঠাৎ কোনো বন্ধু যদি এসে হাজির হয়, মন্দ হয় না। কিছুক্ষণ আড্ডা দিলেও শরীর আর মনের এই ম্যাজমেজে ভাবটা দূর হয়ে যায়। তা তো আসবে না। যখন লেখা নিয়ে বসেছি, তখন ওরা কেউ-না-কেউ এসে হাজির হবে। আর ওঠারও নাম করবে না। বন্ধুদের ওপর তার মনটা বিরক্তিতে ভরে যায়।

চুপচাপ অন্ধকারে বসে থাকার একঘেয়েমিটা কাটানোর জন্যেই সৈকত নন্দী মোমবাতি জ্বাললেন। কলমের ডগায় একটা লাইনও আসবে না জেনেও কাগজ আর কলম নিয়ে বসলেন। ঠিক এই সময়ে দরজায় টোকা পড়ল।

অচেনা করাঘাত। চেনাজানা সকলেরই টোকা দেওয়ার শব্দ সৈকত নন্দীর চেনা। ঠিক তাদের পায়ের শব্দের মতন। তাই তিনি একটু ইতস্তত করলেন দরজা খুলতে। দিনকাল ভালো যাচ্ছে না, তায় আবার লোডশেডিং-এর অন্ধকার। দরজায় বসানো পরকলায় চোখ রেখে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলেন। আবছা আলোয় যে চেহারাটা দেখলেন, সেটা নেহাত গোবেচারা এক বৃদ্ধের। ধুতির ওপর ফুলহাতা সাদা শার্ট পরা, ডান হাতে প্রয়োজনহীন একটা বেতের হাতলওয়ালা সেকেলে পুরোনো ছাতা। সৈকত নন্দী দরজা খুললেন।

এবার কাছের থেকে ভদ্রলোককে দেখে তাঁর একটু চেনা চেনা মনে হল। কোথায় দেখেছেন যেন এঁকে। শীর্ণ চেহারা, নাকের নীচে টুথব্রাশের মতন কাঁচাপাকা গোঁফ। হয়তো পাড়াতেই দেখেছেন। কিংবা ট্রামে বাসে, কি বাজারে। দরজা খুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক ছাতাসুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'আমি সৈকতবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি। তিনি কি-'

সৈকত নন্দী একটু অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলেন। কী উদ্দেশ্যে এসেছেন আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন। আশা করেছিলেন, কোনো বন্ধুবান্ধব এলে একটু হালকা গল্পগুজব করে অন্ধকার সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দেবেন-তা না-ইনি আবার কী জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, কে জানে! মাথাটা যেন আবার দপদপ করতে লাগল তাঁর। তিনি অপ্রসন্নভাবেই বললেন, 'আমি সৈকত নন্দী। কিন্তু আপনাকে তো-'

'আমার নাম বটুকেশ্বর বটব্যাল। আপনি 'মিহিদানা' পত্রিকায় একটা গল্প লিখেছেন-'

সৈকত নন্দী চমকে উঠলেন। এও কি বাস্তবে সম্ভব! তিনি তো স্বপ্ন দেখছেন না! এখন তিনি কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেন, ভদ্রলোকের চেহারাটা এত চেনা চেনা লাগছে কেন। গত সংখ্যার 'মিহিদানা' পত্রিকায় তাঁর একটা গল্প বেরিয়েছিল-'বটুকেশ্বর বটব্যালের ব্যাবসা।' তাতে আর্টিস্ট দেবল দেবের আঁকা যে ছবি ছিল, তার সঙ্গে ভদ্রলোকের চেহারায় আশ্চর্য মিল। কিন্তু গল্পের চরিত্র এরকম জ্যান্ত চেহারা নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব। তাই বোধ হয় তিনি ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই থাকেন ভদ্রলোকের দিকে।



বটুকেশ্বরবাবু তাঁর অবস্থাটা বোধ হয় বুঝতে পারলেন। বললেন, 'আপনার গল্পের চরিত্রের সঙ্গে আমার নামের মিল হওয়াতে আমার অবস্থাটা কী হয়েছে, সেটা জানাতেই আমি এসেছি। একটু যদি বসতে-'

যন্ত্রচালিতের মতো সৈকত নন্দী বটুকেশ্বরবাবুকে ভেতরে ডেকে নিয়ে এলেন। বিবর্ণ ছাতাটাকে কোলের ওপর তুলে বটুকেশ্বরবাবু চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, 'আমাকে নিয়ে কেন এরকম গল্প লিখলেন, বলুন তো? তার ওপরে আবার আমার ছবিটা। জানেন কি আপনি, এর জন্যে আমার জীবনটা কীরকম অসহনীয় হয়ে উঠেছে! পাড়ার ছোটো ছোটো ছেলেরা পর্যন্ত রাস্তায় আমাকে দেখলে 'তেলাপোকা' 'তেলাপোকা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। বড়োরা পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমাকে শুনিয়ে সরষের তেলের দামের আলোচনা করে। আমি প্রথমে বুঝতে পারতাম না। পরে একজন 'মিহিদানা' পত্রিকাটি আমাকে দেখায়। তখন আমি সব জানতে পারি। বলুন, আমি আপনার কাছে কী এমন অপরাধ করেছি যে আপনি আমাকে এভাবে-'

কান্নায় যেন ভদ্রলোকের গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। জামার হাতাটা দু-চোখের ওপর বুলিয়ে নেন তিনি।

সৈকত নন্দী হতভম্ব হয়ে বটুকেশ্বরবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। সত্যিই তিনি 'মিহিদানা' পত্রিকায় এরকম একটা গল্প লিখেছেন। আজগুবি ধরনের গল্প। বটুকেশ্বর বটব্যাল নামে একজন লোভী ব্যাবসাদারের গল্প। তার একটা কোক কয়লার দোকান ছিল। কিন্তু সে নানা জিনিস মজুত করত। যখন জিনিসটা বাজারে পাওয়া যেত না, সেই সময় বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা করত। কিছুকালের মধ্যে সরষের তেলের সংকট দেখা দেবে, এরকম কথা শুনে সে সরষের তেল জমা করছিল। যে ঘরে সরষের তেলের টিনগুলো জমিয়ে রাখত, যখের ধনের মতো পাহারা দিতে সেই ঘরেই সে রাত্তিরে শুত। একদিন রাত্তিরে তেলের টিনগুলো হুড়মুড় করে বটুকেশ্বরের ওপর পড়ে গিয়ে তাকে তেলে চুবিয়ে দিল ঘুমন্ত অবস্থায়। পরদিন ঘরের দরজা খুলতে না দেখে পাড়ার লোক তার সেই ভাঁড়ার ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল। কিন্তু বটুকেশ্বরকে দেখতে পেল না। শুধু দেখল, একটা বড়ো সাইজের আরশোলা তেলের ওপর সাঁতার কাটছে। আরশোলাটা একটু অদ্ভুত ধরনের। তার দুটো শুঁড় ছাড়াও খোঁচাখোঁচা সাদাকালো ছোটো ছোটো শুঁড়ও ছিল-ঠিক যেন গোঁফ।

সেই বটুকেশ্বর বটব্যাল নামে সত্যিই যে কোনো লোক থাকতে পারে, সেটা সৈকত নন্দীর কল্পনাতেও আসেনি। অস্ফুটস্বরে সেই কথাটাই বললেন তিনি।

বটুকেশ্বরবাবু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'অন্য কোনো সাধারণ নামও তো আপনি দিতে পারতেন। যেমন, এই ধরুন, বিশ্বনাথ দত্ত। অথবা সুনীল দাশ। কিংবা অনিল ব্যানার্জি। এরকম নামে অনেক লোক থাকতে পারে। কিন্তু এত থাকতে আমার নামটাই আপনি ব্যবহার করলেন কেন? তার ওপর আমারই চেহারার ছবি?'

সৈকত নন্দী এবার মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন, 'দেখুন, বটুকেশ্বর বটব্যাল নামে যে সত্যিই কেউ আছে, আমিও তা জানতাম না। আপনাকে আমি চিনতামই না। তাহলে নিশ্চয়ই গল্পে এ নাম ব্যবহার করতাম না। আমরা লেখকরা অনেক সময় এমন নাম ব্যবহার করতে চাই, যাতে সত্যিকারের কোনো লোকের সঙ্গে নাম না মিলে যায়। অবশ্য পদবিসুদ্ধ নাম ব্যবহার করার সময়। কিন্তু এরকম উলটো বিপত্তি যে হবে, কেমন করে জানব। অবশ্য হওয়া অসম্ভব নয়। এই দেখুন না, আমার নাম সৈকত নন্দী। খুব কমন নাম নয়। তবুও সম্প্রতি এই নামেই একজন তরুণ গায়ক উঠেছেন। তার ফলে, গান না গেয়েই আমাকে চেনা অচেনা লোকের কাছে আমার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নানা কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। আমি জানি না, সেই গায়ক সৈকত নন্দীর কাছে কেউ গল্প চেয়েছে কি না। আর গল্পের ছবিটার জন্যে আমি তো দায়ী নই। যে শিল্পী এঁকেছেন, তিনি বোধ হয় নিজের মন

থেকেই এঁকেছেন। নামটা শুনে হয়তো তাঁর মনে এরকম চেহারা ভেসে উঠেছিল। এরকম হয় অনেক সময়। যেমন, ভোম্বল বা হাবুল নাম শুনলেই একটা মোটাসোটা ছেলের চেহারা মনে ভেসে ওঠে। যাই হোক, আমার গল্পগুলো যখন বই করে প্রকাশ করব, তখন নামটা নিশ্চয়ই বদলে দেব।'

প্রসঙ্গটা যথাসম্ভব হালকা করার চেষ্টা করলেন সৈকত নন্দী। কিন্তু বটুকেশ্বর ভুলবার নন। খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'আপনার বই ক-টা বিক্রি হয় মশাই? কিন্তু 'মিহিদানা' পত্রিকা যে ছোটো-বড়ো সবাই পড়ে। আপনি আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে এখন বলছেন, নাম পালটাবেন। এ যে সেই ডি.এল. রায়ের নাটকের মতন আমাকে হত্যা করে তারপর আমার মূর্তি গড়িয়ে পুজো করতে চাইছেন। যদি খবরের কাগজে বটুকেশ্বর বটব্যাল নামে কারও আত্মহত্যার খবর পড়েন, তবে জানবেন তার মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী। আমি উঠলাম-'

সৈকত নন্দী আরও কিছু বলার জন্যে হাত বাড়িয়ে বটুকেশ্বরকে আটকাতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোল না। তার আগেই বটুকেশ্বর ছাতাটা বগলে করে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন সৈকত নন্দী। ভয়, বিস্ময় আর অস্বস্তি তাঁকে ঘিরে থাকে। কপালের দপদপানিটা যেন সরে মাথার মধ্যে গিয়ে ঝিঁঝিঁ পোকার মতন শব্দ করে চলেছে। এমন সময় ঝপ করে আলো চলে এল।

তাঁর মনে হল, হয়তো তিনি তন্দ্রার মধ্যে কোনো অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে উঠলেন। এরকম আজগুবি ব্যাপার কোনো লেখকের ভাগ্যে ঘটেছে বলে তাঁর জানা নেই। কিন্তু ওই তো, বটুকেশ্বরের ভিজে চটি রাখার ছাপটা দরজার কোণে। এখনও শুকোয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে নিবারণ ফিরে এল। একগাল হেসে তার দেরিতে আসার কৈফিয়ত দিতে বসল। কিন্তু দাদাবাবুর কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে একটু অবাক হল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'দাদাবাবু, চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছি। আর-বাড়ির সামনের দোকানে বেগুনি ভাজছে। গোটা কয়েক নিয়ে আসব কি?'

অস্বস্তির মধ্যেও সৈকত নন্দী হেসে ফেলেন। লেখাপড়া শিখলে নিবারণ যে বড়ো মনস্তত্ত্ববিদ হত, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

গরম গরম বেগুনির সঙ্গে চা খেতে খেতে তিনি কিছুক্ষণের জন্যে বটুকেশ্বর প্রসঙ্গ মন থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। টেবিলের ওপরেই বেগুনির ঠোঙাটা পড়ে ছিল। সেদিকে নজর পড়তেই আরেক চমক খেলেন সৈকত নন্দী। 'মিহিদানা' পত্রিকার যে পাতাটা ছিঁড়ে ঠোঙা বানানো হয়েছে, তাতে তাঁরই গল্প-বটুকেশ্বর বটব্যালের ব্যাবসা। তিনি তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন-'এদিককার ফ্ল্যাটগুলোর মেন সুইচ এক জায়গায় পাশাপাশি। বটুকেশ্বর চুপিচুপি গিয়ে সবগুলো অফ করে দিল। সবাই ভাবল, লোড শেডিং। তখন বটুকেশ্বর সেই অন্ধকারের মধ্যে তেলের টিন-ভরতি বস্তাগুলো রিকশা থেকে নামাতে লাগল। যারা দেখল, তারা ভাবল, কোক কয়লার বস্তা। বটুকেশ্বরের ধূম্রহীন কয়লার গুলের ব্যাবসা আছে, সেটা তো কারও অজানা নয়।'

নিজের লেখার এরকম ঠোঙা পরিণতি লাভ, এটা যেকোনো লেখকের পক্ষেই মনোকষ্টের কারণ। কিন্তু সৈকত নন্দীর মনকে যা অধিকার করল, সেটা সেই ভীতি, বিস্ময় আর অস্বস্তি মেশানো এক অসহ্য অবস্থা। তিনি আরও অবাক হলেন, যখন দেখলেন, দেবল দেবের আঁকা বটুকেশ্বর ছবিটা বেগুনির তেলে জবজবে হয়ে গিয়েছে।

সারাটা রাত সেই অস্বস্তির মধ্যে কাটালেন সৈকত নন্দী। ঘুম এলেই একই দুঃস্বপ্ন যেন বারবার দেখে জেগে ওঠেন। ছাতাবগলে সেই লোকটা তাঁর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলছে, 'তুমিই-তুমিই দায়ী!'

সকালে সেই ম্যাজমেজে অবসাদে ভরা শরীরটা নিয়েই তিনি বিছানা থেকে উঠলেন। নিবারণ চা করে এনে দিল। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তিনি বারবার জানলার দিকে তাকাতে লাগলেন। ওই জানলা দিয়েই সকালের কাগজটা ধপাস করে ফেলে দিয়ে যায়।

কোন খবরের জন্যে তিনি এমন করে কাগজের জন্যে অপেক্ষা করছেন? নিজের ওপরেই রেগে যান সৈকত নন্দী। কে না কে এক বটুকেশ্বর বটব্যাল কবে আত্মহত্যা করবে-তার জন্যে তাঁর নিজের ঘুম থাকবে না! ভাবলেন, কাগজ এলেও অনেকক্ষণ তিনি সেটা দেখবেনই না। এভাবে মনের জোর বাড়াতে তিনি নিজেই শিখেছিলেন। একবার তিনি বাজি রেখে সাত দিন তাঁর পরমপ্রিয় পানীয় চা না খেয়ে ছিলেন। ধূমায়িত সুরভিত চায়ের পেয়ালা সামনে রেখেও বন্ধুরা তাঁকে বাজি হারাতে পারেনি। এই জোর নিয়ে আজ তিনি বটুকেশ্বরকে মন থেকে তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। আর তাঁর অস্বস্তির কারণই বা কী? বটুকেশ্বর তার আত্মহত্যার কারণ লিখে যাবে তাঁর নাম জড়িয়ে? লোকে জিনিসটা কাকতালীয় বলেই বিশ্বাস করবে। আর তা ছাড়া ছবিটা এঁকেছে আরেকজন। নামের মিলের কথা ভাবলে আর গল্প লেখা যায় না।

আবার মনে হল, এতই যখন মিল হয়েছে লোকটার সঙ্গে তখন লোকটাও যে গল্পের বটুকেশ্বরের মতন পাজি নয়, তার ঠিক কী? ওরকম লোকের এমনিতেই আত্মহত্যা করা উচিত। এসব ভেবে হঠাৎ তাঁর মনটা বেশ হালকা মনে হল।

নিবারণ দুধের ডিপো থেকে দুধ আনতে গিয়েছিল। দুধের সঙ্গে একটা খামও দিয়ে গেল। বলল, 'দাদাবাবু, আপনার চিঠি। বিশুদা দিলেন।'

'বিশুদা কে?' তাঁর প্রশ্নে অবাক হয়ে নিবারণ বলল, 'বিশুদাকে চেনেন না? ওই যে ওপারের গোলাপি বাড়িতে থাকেন। কত বইয়ে পাট করেন। 'বর হেসে কয় ঠাট্টা' বইয়ে পুরুত ঠাকুর সেজেছিলেন।'

'বই' মানে সিনেমা, 'পাট করা' মানে অভিনয় করা। নিবারণ ওভাবেই কথা বলে।

নিবারণ আবার হেসে বলল, 'বাঃ, উনিই তো কাল আপনার জন্যে বেগুনি ভাজা কিনে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। নিজের হাতে ঠোঙাতে ভরে দিলেন। এত নাম, তবুও কেমন মিশুকে। একটুও দেমাক নেই। আপনাকেও খুব শ্রদ্ধা করেন। আপনার গল্প পড়েন।'

তাঁর ঢাকটা নিবারণই পিটিয়েছে তার বিশুদার কাছে, সৈকত নন্দী সেটা বুঝতে পারলেন। চিঠিটা নিশ্চয় কোনো সভা-সমিতি-সম্মেলন-সভাপতি সংক্রান্ত। এরকম চিঠি পেতে সৈকত নন্দী অভ্যস্থ। তিনি নিরুৎসাহের সঙ্গে খামটা খুললেন।

কিন্তু সম্বোধনটা দেখেই অবাক হলেন। সেই বিস্ময় নিয়েই পড়ে চলেন চিঠিটা-

ভাই সৈকত,

চিনতে পারছিস না বোধ হয়। রাস্তাঘাটে কত দেখা হয়, তবু চিনতে পারিস না, বুঝতে পারি। কাছ থেকে অনেকক্ষণ দেখেও যে চিনতে পারবি না, সেটা বুঝতে পারিনি।

হরচন্দ্র হাইস্কুলের বিশেকে মনে পড়ে? নিশ্চয় মনে মনে পড়বে। আমার সেই অঙ্ক না করে আনা-তারপরে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে পেটের ব্যথায় বেঞ্চের ওপর ছটফট করা। হেডমাস্টার মশাই পর্যন্ত ভয় পেয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন অঙ্কের ক্লাসের আগেই। তোর ওপরেই ভার পড়েছিল আমাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার। অর্ধেক রাস্তায় এসেই আমাকে তড়াক করে সোজা হয়ে হি-হি করে হাসতে দেখে তোর কী রাগ! ভয় দেখিয়েছিলি, বলে দিবি। বলিসনি। সেজন্যে সেদিন তোকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। আজ মনে হয়, বললেই ভালো করতিস। তাহলে তখনকার মতন শত্রু হলেও আজ তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু হতিস। আমি তাহলে মানুষ হতে পারতাম। অভিনয় ছোটোবেলা থেকে জানি। কিন্তু তার সঙ্গে শিক্ষা যোগ হলে হয়তো আমি অভিনয় জগতে বড়ো হতে পারতাম।

তোর নাম শুনেই খটকা লেগেছিল। দেখে নিশ্চিত হলাম। তোর কপালের মাঝামাঝি যে আঁচিলটা ছিল সেটা তো আর সামনের চুলের মতো ঝরে যায়নি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। তুই বড়ো অসামাজিক। দু-বছর এ-পাড়ায় এসে অবধি শুধু ঘর আর অফিস, অফিস আর ঘর। একদিন রাস্তায় তোর পথ আগলে দাঁড়ালেও তুই আমার দিকে না তাকিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে গেলি। আমিও কাঁকড়া বিছে। একটা মতলব ভাঁজলাম।

গতকালের তারিখটা এ কাজে খুবই শুভ দিন। তোর লেখক জীবনের গল্প নিবারণের কাছে আগেই শুনেছিলাম। তার আগেও অবশ্য তোর গল্প অনেক পড়েছি। তবে জানতাম না, তুই-ই এই সৈকত নন্দী কি না।

দেবলের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। ওর হাতে তোর গল্পের পাণ্ডুলিপি দেখে জিজ্ঞেস করতেই শুনলাম, 'মিহিদানা' পত্রিকার জন্যে গল্পটার ইলাসট্রেশন দেবলই করবে। ব্যাস, একটা বুদ্ধি এল মাথায়। আমার সামনে বসে দেবল স্কেচ করল। তবে তোকে এ ব্যাপারে একটু আঁচও দিতে দেবলকে বারণ করেছিলাম।

তোর চাকর নিবারণ আমাকে খুব ভক্তিছেদ্দা করে। ওর কাছেই জানলাম এপ্রিলস্য প্রথম দিবসের এই শুভ দিনটিতে বউঠান বাপের বাড়ি থাকবেন। নিবারণও কোথায় বেরোবে। আর ও তো অভিমন্যুর উলটো। বেরোতেই জানে, বাড়িতে ঢুকতে জানে না। কাজেই আমার সুবিধা হল।

আমি বটুকেশ্বর সাজলাম। মেকআপ অবশ্য বেশি নিতে হয়নি। চুলে একটু সাদা ক্রীম, নাকের নীচে গোঁফ, হাতে ছাতা। দেবল তো আর সব কাজ করেই রেখেছিল।

তোর সঙ্গে বটুকেশ্বরের সাক্ষাতের পরে বেগুনিটি আমিই নিবারণকে ঠোঙাতে ভরে দিই। আমার বাড়ি থেকে আনা ঠোঙা। কিন্তু এমনভাবে ওটা বের করলাম, যে নিবারণ বা তেলে ভাজাওয়ালা কেউ বুঝতে পারেনি। ভাবল, দোকানের ঠোঙাই আমি নিয়েছি। ঠোঙাটা তোর টেবিলের ওপর রাখতে আমিই নিবারণকে বলেছিলাম। বলেছিলাম, প্লেটে তেলেভাজা রাখলে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়! আর আমার কথা নিবারণের কাছে তো বেদবাক্য।

আশাকরি, ঠোঙাটা তোর নজরে পড়েছিল। যাতে পড়ে সেভাবেই ঠোঙাটা তৈরি করা হয়েছিল।

যাই হোক, আমার 'মিহিদানা' পত্রিকাটি ছিঁড়ে নষ্ট করতে হয়েছে। যদি পারিস, সংখ্যাটা জোগাড় করে রাখিস আমার জন্যে।

এইবার স্বরূপেই তোর কাছে যাব। কালকে যদি কোনো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা করিস ভাই। ছোটোবেলার কথা ভেবে। ইতি-

তোরই বিশে।

চিঠিটা পড়ে একটা আনন্দ আর কপট রাগ-মেশানো গলায় সৈকত নন্দী নিজের মনে বলে উঠলেন, 'হুঁ, এই ব্যাপার! ওরে বিশে, তুই সেই কাঁকড়া বিছেই আছিস।'

তারপরে নিবারণকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোদের বিশুদার পুরো নাম জানিস?'

একগাল হেসে নিবারণ জবাব দিল, 'জানব না কেন, দাদাবাবু? বিশ্বনাথ দত্ত।'

আষাঢ় ১৩৯০




# সুধীন্দ্র সরকার

ভাগ্যলক্ষ্মী আচমকা নিবারণের ওপর বিরূপ হলেন। এতদিন বেশ ভাগ্যের চাকা তরতর করে গড়িয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাঁচ বছরের মধ্যে লোয়ার গ্রেডের কেরানি থেকে এখন বিভাগীয় বড়োকর্তা। অফিসে এক ডাকেতে সবাই চেনে এবং সম্মানও করে।

সেই নিবারণ হালদার বর্তমানে ভীষণ অসুখী। হঠাৎ বোম্বের হেড অফিস থেকে ওর ঠিক নীচের পোস্টে বদলি হয়ে এল একজন ষণ্ডামার্কা পালোয়ানি চেহারার লোক। লোকটা মিষ্টভাষী, তবে কাজকর্মের ধারেকাছে যায় না। বাধ্য হয়ে ফাইলের বোঝা সব নিবারণের ঘাড়েই চাপে। দশটা-পাঁচটা ঠায় সাত ঘণ্টা নিবারণকে ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকতে হয়।

ইদানিং ওর ঘাড়ে পিঠে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, স্পন্ডিলাইটিসের পূর্বলক্ষণ। নিবারণ ওর বসের কাছে আর্জি পেশ করে, 'এভাবে তো আর চাকরি করা যায় না, স্যার। একা আর কতদিক সামলাব? আপনি রতন সমাদ্দারকে কিছু বলুন। উনি তো কোনো কাজই করেন না।'

নিবারণের কথায় এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়েন, 'আপনি যান, আমি দেখছি।'

ব্যস, ওই পর্যন্ত। নিবারণ জানে বসের কাছে মিছিমিছি বলা। দু-জনের কাজ যথারীতি ওকেই একা করতে হবে। রতন সমাদ্দার ইউনিয়নের একজন বড়োদরের নেতা। ইউনিয়নের কাজ করতেই দিন কেটে যায় ওর, অফিসের কাজ আর করবে কখন? যার ফলে যত চাপ পড়ে নিবারণের ওপর। তা ছাড়া এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বেয়ারা অবধি রতনকে সমীহ করে। আসলে প্রত্যেকেই ভয় করে ওকে। এর আগেও দু-বার নালিশ করেছিল, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।

মনে মনে গজরাতে থাকে নিবারণ। প্রোমোশনই ওর কাল হল। উচ্চপদে প্রোমোশন না পেয়ে বেশ ছিল এতদিন। অফিসে যেত আসত, নিজের কাজ করত। বিরাট কোনো দায়িত্ব মাথার ওপরে ছিল না। কিন্তু, এখন ওর অবস্থা ঠিক শাঁখের করাত। কাজও কর, আবার ওপরওয়ালার চোখ রাঙানিও খাও।

অথচ ম্যানেজমেন্ট রতন সমাদ্দারকে কাজের কথা বলে চটাতে চায় না। পাছে কিছু করে বসে লোকটা। কানাঘুষায় শোনা গেছে, রতন সমাদ্দার নাকি বোম্বে অফিসের ফিল্ড সুপারভাইজারকে ঘুসি মারার অপরাধে কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে।

অফিস ফেরতা কার্জন পার্কের রানি রাসমণির মূর্তির নীচে বসে আপন মনে চীনে বাদাম খাচ্ছিল নিবারণ। রতন সমাদ্দারের ব্যাপারে মনটা বেশ কিছুদিন যাবৎ খিঁচড়ে আছে।

অথচ ওর কিছু করার ক্ষমতা নেই। আজকাল বাড়িতে তাড়াতাড়ি ঢুকতে ইচ্ছে করে না। সংসারের ঝুটঝামেলা ছাড়া লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণা তো লেগেই আছে। তবু এখানটায় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ একটু শান্তি। ময়দানের ঠান্ডা হাওয়ায় মনে বেশ আমেজ আসে ওর।

বাদুড়ঝোলা বাসগুলো গাঁক গাঁক করে ছুটে যাচ্ছিল রাজভবনের সামনে দিয়ে। ওদিকে এসপ্লানেড ইস্টে একদঙ্গল ঠেলা-রিকশাওয়ালার সমাবেশ। সম্প্রতি কলকাতার বেশ কিছু জনবহুল রাস্তায় ঠেলা-রিকশার যাতায়াত বন্ধ করার জন্য ওদের বিক্ষোভ।

সন্ধ্যের পর একটা ফাঁকা মিনিবাস দেখে চেপে পড়ল নিবারণ। ওর পেছন পেছন আরও একজন লোক ছুটতে ছুটতে বাসের পাদানিতে পা রাখল।

লোকটা এতক্ষণ অনুসরণ করছিল ওকে। নিবারণ বাসের বাঁ-দিকের জানালার ধারে জায়গা পেয়ে গেল। লোকটা তড়িঘড়ি নিবারণের ডানপাশের ফাঁকা জায়গাটা দখল করে ধপ করে বসে পড়ল।

নিবারণ তাকাল লোকটার দিকে। লোকটা মুখ টিপে হাসছিল। নিবারণ লোকটাকে চেনে। ওরই অফিসের একজন অধস্তন কর্মচারী। অভিরাম দত্ত। একটু রগচটা বলে বদনামও আছে।

অভিরামই মুখ খুলল প্রথমে, ‘কার্জন পার্কে আমরা কয়েকজন তাস খেলছিলুম। দূর থেকে হঠাৎ দেখলুম আপনাকে। খুব উদবিগ্ন দেখাচ্ছিল। ব্যাপার কী স্যার, শরীর খারাপ নাকি?’

নিবারণ ঘাড় নাড়ল, ‘না।’ তারপর অভিরামকে অফিসের কাজের চাপের কথা বলল। এবং রতন সমাদ্দারের প্রতি ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতার কথাও বলতে ছাড়ল না। একজন অধস্তন কর্মচারীকে এসব বলা ঠিক নয় জেনেও রাগের মাথায় গড়গড় করে বলে ফেলল সব কিছু। কতদিন আর মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখা যায়?

অভিরাম সব কথা শুনে-টুনে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ‘রতন সমাদ্দারকে শেষ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়?’

‘কী বলছেন আপনি?’ নিবারণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

হেঁহেঁ করে হেসে উঠল অভিরাম। ইনিয়েবিনিয়ে বলে, ‘সিনিয়রিটি লিস্টে রতন সমাদ্দারের পরেই আমার নাম। অনেকদিন স্যার কোনো প্রোমোশন-ট্রোমোশন হয়নি। রতনের অবর্তমানে আমিই হব আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট। দেখবেন, তখন আর আপনাকে অত খাটতে হবে না।’ অভিরাম চোখ বন্ধ করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, ‘আমাদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কোনো পার্সোনালিটি নেই, বুঝলেন? রতন সমাদ্দারকে অত ভয় করার কী আছে? ও বাঘ, না ভাল×ñক? কাছে গেলেই সাহেব খালি বেড়ালের মতো মিউ মিউ করেন? ওকে ডেকে ধমকাতে কিংবা চার্জশিট ধরাতে পারেন না?’

নিবারণ কোনো উত্তর দিল না। জানলার বাইরে তাকিয়ে ভাবছিল, জাপানে কোনো কোনো কারখানা বা অফিসে একটা করে অ্যাংরি রুম আছে। সেই অ্যাংরি রুমে বিভাগীয় বসদের মূর্তি বসানো থাকে। যখন কোনো অধস্তন কর্মচারীর বসের সঙ্গে মনোমালিন্য বা কথা কাটাকাটি হয়, তখন সেই কর্মচারী অ্যাংরি রুমে ঢুকে সেই বসের মূর্তিকে যারপরনাই অপমান করে মনের ঝাল মেটায়। এমনকী পাথরের মূর্তির গালে চড়চাপড়ও

চালায়। আমাদের দেশে সেরকম কোনো ব্যবস্থা থাকলে বসের মূর্তিতে দুটো ঘুসি মেরে মনটা খানিক হালকা করা যেত।

'কী ভাবছেন স্যার?' অভিরাম জিজ্ঞেস করে।

নিবারণ সাড়া দেয় না।

অভিরাম ফের বলে, 'আমার ওপরে রতন সমাদ্দারের কেসটা ছেড়ে দিয়ে দেখুন না? একটা-না-একটা ব্যবস্থা করব।'

নিবারণ আর চুপ থাকতে পারে না। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যবস্থা করবেন আপনি? ও সামনে দাঁড়ালে তো পালাবার পথ খুঁজে পাবেন না।'

'তা যা বলেছেন। তবে আমার প্ল্যান তো এখন বলব না।' অভিরাম খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল, 'তা ছাড়া বাসে এই ভিড়ের মধ্যে-'

অভিরামের কথা শেষ হতে-না-হতেই কন্ডাক্টর 'মেডিকেল! মেডিকেল!' বলে চিৎকার করতেই অভিরাম তড়াক করে সিট ছেড়ে উঠে বলল, 'কালকে আর অফিস যাচ্ছি না। পরশু রবিবার, যদি পারেন দয়া করে সকালে আমার বাড়িতে চলে আসুন। গরিবের ঘরে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। আর নিভৃতে রতন সমাদ্দার সম্বন্ধে একটা জরুরি আলোচনা করব। ওতে আপনারই মঙ্গল হবে, স্যার।'

নিবারণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল অভিরামের দিকে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই, 'ওই ডানদিকের গলিটায় আমার বাড়ি। ৮৩/১ আরপুলি লেন,' বলে অভিরাম চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়ল।

বাসের দরজার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল নিবারণ। ওর কানে এল দূর থেকে অভিরাম যেন চিৎকার করে বলছে, 'পরশু সকালে পজিটিভলি।'

বাড়িতে ফেরা ইস্তক নিবারণের মনে শান্তি ছিল না। চোখের সামনে বার বার ঘুরপাক খাচ্ছিল অভিরামের ধূর্ত চাহনি। কী এমন ব্যবস্থা করতে পারে অভিরাম? নিবারণ মাথামুণ্ডু কিছু ভেবে পেল না। তবু স্থির সিদ্ধান্তে এল, অভিরামের বাড়িতে পরশু যাবে। দেখবে কী করতে চায় ও। নাকি, সবই শুধু মুখের কথা।

অভিরামের বাড়িতে পা দিয়েই চমকে উঠল নিবারণ। বাড়ির ভেতর থেকে রতন সমাদ্দারের গলা ভেসে আসছিল। এই সাতসকালে রতন সমাদ্দারকে অভিরামের ঘরে বসে থাকতে দেখে অবাক হল খুব। রতন সমাদ্দার হঠাৎ এখানে কেন? ও তো থাকে ভবানীপুরে? তবে কি রতন আর অভিরাম মিলে ওর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র এঁটেছে? নাকি রতনকেও ওর মতো নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছে? কী জানি বাবা, কী উদ্দেশ্য অভিরামের?

'এই যে আসুন স্যার।' রতন সমাদ্দারই সদর দরজা থেকে ডেকে নিয়ে গেল নিবারণকে।

নিবারণ চেয়ারে বসে ভাবছিল, আচ্ছা ধড়িবাজ লোক অভিরাম; যাকে দু-চোখে দেখতে পারে না, তাকেই এখানে এনে হাজির করেছে। রতনের সামনে বেইজ্জত করবে না তো?

একটু পরেই অভিরাম চা-জলখাবার নিয়ে এল। খেতে খেতে তিনজনের মধ্যে অনেক রকমের আলোচনা হল। তবে ওরা কেউই ভুলেও অফিসের কাজের কথা তুলল না। কথা প্রসঙ্গে যখন ইউনিয়নের কথা উঠল তখন হঠাৎ সমাদ্দার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে অভিরাম। নিবারণের মনে হল অভিরাম যেন পায়ে পা চাপিয়ে ঝগড়া শুরু করল। প্রমাদ গুণল নিবারণ। বিপদের আশঙ্কায় মন দুলে উঠল। রতন আর অভিরামের ঝগড়া এখন মুখ ছেড়ে হাতে এসেছে। একটু পরেই দু-জনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হল। তারপরই মারামারি।

নিবারণ বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ওদের দৈহিক শক্তির কাছে নিবারণ পরাজয় স্বীকার করল। হঠাৎ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল রতন সমাদ্দার। বুক কেঁপে উঠল নিবারণের। ভয়ার্ত চোখে দেখল, রতন সমাদ্দার চিত হয়ে পড়ে আছে। ঘরের মেঝেতে টকটকে লাল রক্ত। একটা তীক্ষ্ণ ছুরি রতনের বুকে আমূল বিদ্ধ করা। নিবারণের হাত-পা থর থর করে কেঁপে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ। দরদর করে ঘামতে শুরু করল ও। ভয়ে নিবারণ শিউরে উঠল।

কিন্তু অভিরাম কোথায়? একটু আগেও তো ঘরের ভেতরে ছিল। হঠাৎ এরকম একটা হাড়-হিম-করা ঘটনার জন্য নিবারণ কোনোরকম প্রস্তুত ছিল না। অভিরাম একটা জলজ্যান্ত খুনে। রতন সমাদ্দারকে খুন করে চোখের নিমেষে গা ঢাকা দিয়েছে। অভিরামের কথায় এখানে এসে খুনের দায়ে ধরা পড়বে ভেবে নিবারণের বুক ফেটে যাচ্ছিল। কেন যে মরতে অভিরামকে রতন সমাদ্দারের কথা বলেছিল? পরিণতির কথা ভেবে ভয়ে কেঁদে ফেলল নিবারণ।

অভিরাম খুন করেই নিজেই পুলিশ ডাকতে যায়নি তো? ওকে পুলিশের সামনে খুনি বলে প্রমাণ করিয়ে ধরিয়ে দেবে না তো? রতন সমাদ্দারের পোস্টে প্রোমোশনও পাবে, আর এদিকে ওর অপরাধের শাস্তি পাবে নিবারণ। যে লোক মানুষ খুন করতে পারে, সে যে ওকেও ধোঁকা দেবে এতে আর সন্দেহ কী? দ্রুত বুক ওঠানামা করতে লাগল ওর। এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেমনি ঘর থেকে বেরোতে যাবে অমনি পেছন থেকে কে যেন হাত রাখল কাঁধে। ভয়ে দম বন্ধ হয়ে এল নিবারণের। দু-চোখের পাতা বুজে গেল ভয়ে। ভারী গলায় কে যেন বলল, 'এই যে স্যার?'

'এই যে স্যার?'

চোখ খুলে পেছনে তাকাতেই নিবারণের চক্ষু চড়কগাছ। একজন সেপাই পেছন থেকে ওকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?' চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল নিবারণ। মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের আলোতে ঝলমল করছে চৌরঙ্গির রাস্তা। হাতঘড়ির দিকে তাকাল নিবারণ, দশটা পাঁচ। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছল। পুলিশটা বলল, 'দেখে নিন টাকাপয়সা খোয়া গেছে কি না। জায়গাটা ভালো না।'

নিবারণ রানি রাসমণির পাথরের বেদির সিঁড়ি থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'সত্যি ভালো না!'

*আষাঢ় ১৩৯২*






## সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়

রোজ সন্ধ্যে বেলা বাড়ি ফিরে নীলাম্বর দাশগুপ্ত এক কাপ চা খান। এই কাজটি করে তাঁর খাস বেয়ারা দামু ওরফে শ্রীদাম নায়েক। সাড়ে ছ-টা নাগাদ বাথরুমে গরম জল তৈরি থাকে। অফিসের পোশাক ছেড়ে স্নান সেরে দাশগুপ্ত সাহেব পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে ফেভারিট রকিং চেয়ারটিতে এসে বসেন আর দামু হাতে দার্জিলিং চায়ের বোন চায়নার পেয়ালাটি ধরিয়ে দেয়-চা আর দুধের হিসেব নিখুঁত, চিনি আধ চামচে। নীলাম্বর দাশগুপ্তর জীবনে দু-টি নেশা- একটি এই সন্ধ্যে বেলার চা, অন্যটি ক্রিকেট। ছেলেবেলা থেকেই নীলাম্বর ক্রিকেট পাগল। স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়তে কিছুদিন নিজে খেলার চেষ্টা করেছিলেন। তখনই বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি যে খেলা ওঁকে দিয়ে হবার নয়। সেই সময় থেকেই খেলা দেখা শুরু করেন। যখন বয়স কম ছিল, সময় ছিল অঢেল-তখন কোনো খেলাই বাদ দিতেন না। গড়ের মাঠের ডিভিশন ক্রিকেট তো বটেই-এমনকী ছুটির দিনে রাস্তায় ইঁট লাগিয়ে ছেলেদের টেনিস বলে ক্রিকেট খেলা দেখলেও দাঁড়িয়ে পড়তেন। ইডেন গার্ডেনে টেস্টের আসর বসলে গ্যালারির টিকিটের জন্য আগের রাত থেকে লাইন দিতেন। তারপর চাকরিতে ঢুকলেন। ধাপে ধাপে পদোন্নতির সঙ্গে ক্রমে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অ্যানুয়াল মেম্বার, তারপর অ্যাসাসিয়েট মেম্বার এবং গত বেশ কয়েক বছর থেকে লাইফ মেম্বার।

ডিরেক্টর হওয়ার পর থেকে অফিসের ফেস্টিভ্যাল ক্রিকেট ম্যাচের লাঞ্চের খরচের মোটা অংশটা তিনি দেন। এবারের টেস্ট ম্যাচের জন্য দাশগুপ্ত সাহেবকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার করার কথা উঠেছিল। কিন্তু ইদানিং ব্লাড প্রেশারটা বেড়েছে। ডাক্তার বক্সি বললেন অফিসের পরিশ্রমের পর আর বাড়তি ধকল নেওয়া উচিত হবে না, তাই নীলাম্বর দাশগুপ্ত পিছিয়ে এলেন।

সাহেব বাথরুমে ঢুকেছেন প্রায় মিনিট পনেরো। চায়ের সরঞ্জাম রকিং চেয়ারের পাশের টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে দামু ভাবল সাহেবের বেরোতে এত দেরি তো কখনোই হয় না। তা ছাড়া অফিস থেকে ফিরেই আজ দামুকে বলেছেন কাল সকাল থেকে খেলা শুরু, আজ তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়বেন। টেলিফোনটা ওপরের ঘরে আনার দরকার নেই। বাথরুমে জলের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে?

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পরও যখন সাহেব বেরোলেন না তখন দামুর হঠাৎ কেমন ভয় হল। মেমসাহেব বাড়িতে নেই, সাহেবের একমাত্র ছেলেও বিদেশে। যদি কিছু হয়ে থাকে? বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে দামু ডাকল, 'সাহেব চা ঠান্ডা হচ্ছে।' সাড়া নেই। আর একবার ডাকল, আর একটু জোরে-এবারেও নিঃশব্দ। তখনই মনে পড়ল বাথরুমের দরজার ল্যাচটা কাজ করে না, ভিতর থেকে বন্ধ করার উপায় নেই। সাহস

করে ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। নীলাম্বর দাশগুপ্ত সটান বাথরুমের মেঝের ওপর পড়ে আছেন-অজ্ঞান। মুখটা একপাশে ফেরানো, নাক দিয়ে সামান্য রক্তের ধারা।

সেই রাত্রেই নীলাম্বর দাশগুপ্তকে অচৈতন্য অবস্থায় নার্সিং হোমে ভরতি করা হল। সেরিব্রো ভাসকুলার অ্যাক্সিডেন্ট-ব্লাড প্রেশার ছিলই। রুগিকে পরীক্ষা শেষ করে সহকারী ডাক্তারকে নির্দেশ-টির্দেশ দেওয়ার পর রায়চৌধুরী মিসেস দাশগুপ্তকে বললেন, 'যতক্ষণ জ্ঞান না ফিরছে ততক্ষণ কিছুই বলা যাবে না। তবে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। মিস্টার বোস তো রইলেনই, আমার দু-জন হাউস ফিজিশিয়ানও পালা করে ওঁর কাছে থাকবে। তারপর দেখা যাক।' 'থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর,' বলতে গিয়ে মিসেস দাশগুপ্তর হঠাৎ কেন জানি মনে হল আগামী কাল ইডেন গার্ডেনে ভারত ইংল্যান্ডের ফোর্থ টেস্ট ম্যাচ শুরু হচ্ছে এবং এত বছরের মধ্যে এই প্রথম নীলাম্বর দাশগুপ্ত মাঠে বসে খেলা দেখবেন না।

সকাল ন-টা পঁয়তাল্লিশ। রাত্রে যে সব ইনভেস্টিগেশনগুলো করা হয়েছিল তার রিপোর্ট আনবার জন্যে সিস্টার হাওয়েলকে নির্দেশ দিয়ে ডা. রায়চৌধুরীর সহকারী সমীর বিশ্বাস ব্যাগ থেকে ট্রানজিস্টার রেডিয়োটা বার করল। ওরও মাঠে যাবার কথা ছিল আজ-এই কেসটা কাল রাত্রে না এসে পড়লে এতক্ষণে ও ইডেন গার্ডেনে। টিকিটটা ভাইকে দিয়ে দিতে হল। রুগির অবস্থা এখন মোটামুটি ঠিক। জ্ঞান নেই, তবে অবস্থার অবনতিরও কোনো লক্ষণ নেই। জানলার কাছাকাছি চেয়ারটা টেনে নিয়ে রেডিয়োটা খুলল সমীর-শিবাজি দাশগুপ্তর গলা। হঠৎ মনে হল রুগি কথা বলছে। ভল্যুম কমিয়ে রুগির দিকে তাকাল সমীর। নিস্পন্দ, নাকে অক্সিজেন আর খাওয়ানোর নল, চোখ বন্ধ কিন্তু ঠোঁট দুটো যেন অল্প অল্প নড়ছে। মনে হল রুগি বলছে 'একি পিচে তো মোটেই ঘাস নেই।' রেডিয়োতে তখন বিশেষজ্ঞ ভাষ্যকার হনুমন্ত সিং বলছেন ইডেনে এমন ঘাসবিহীন ন্যাড়া পিচ এর আগে কমই বানানো হয়েছে। সমীরের কেমন খটকা লাগল। সত্যি সত্যি কি রুগি ওই কথা বলল না রেডিয়োর কমেন্টারি আর ওর নিজের মনে খেলার চিন্তা থেকে ওর মনে হল এইরকম। না, রুগি কিছু বলছে ঠিকই। রুগির কাছে সরে এল সমীর। অজ্ঞান অচৈতন্য নীলাম্বর দাশগুপ্তর গলায় অস্পষ্ট মৃদুস্বর, কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই কথাগুলো বোঝা যায়, 'গাভাসকার শেষ অবধি টসে জিতল তাহলে।' সমীর ট্রানজিস্টারের ভল্যুম বাড়িয়ে শুনল, বেশ কয়েকবার টসে হারার পর গাভাসকর টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশ্চর্য তো! অজ্ঞান রুগি কখনো কখনো প্রলাপ যে বকে না তা নয়, কিন্তু প্রায়শই তা এত পরিষ্কার বোঝা যায় না। তা ছাড়া রুগি যা বলল তার সঙ্গে ক্রিকেটের মাঠে যা ঘটছে তা মিলে যায় কী করে? টেলিপ্যাথি নাকি! সমীর ট্রানজিস্টার রেডিয়োতে হেডফোনটা লাগাল তারপর চেয়ারটা টেনে রুগির খাটের কাছে নিয়ে এসে বসল-সন্দেহটার নিরসন হওয়া দরকার। মিনিট কুড়ি বাদে সমীরের খেয়াল হল ওর রীতিমতো ঘাম হচ্ছে-এই শীতের সকালে এয়ার কন্ডিশনড ঘরের মধ্যে! গত কুড়ি মিনিটে রুগি যা যা বলেছে তার প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে মাঠে যা যা ঘটছে তার হুবহু মিল। এ যেন অচৈতন্য রুগির প্রলাপ নয়, মাঠে বসা একজন ক্রিকেট পাগল দর্শকের প্রতিক্রিয়া। গাভাসকর অফ স্টাম্পের বাইরের বল অনর্থক খোঁচা মেরে টেলারের হাতে ক্যাচ আউট হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সমীর ডা. রায়চৌধুরীকে টেলিফোন করল।

রায়চৌধুরী এসে পৌঁছোতে পৌঁছোতে সোয়া বারোটা বাজল। ইতিমধ্যে অজ্ঞান নীলাম্বর দাশগুপ্তর মুখে সমীর ভারতের তিনটে উইকেট পড়ার খবর শুনেছে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত-এবং ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে রুগির অবস্থাও সামান্য অবনতির দিকে-ব্লাড প্রেশার খানিক ওঠা-নামা করছে-পালস একটু ইরেগুলার, দ্রুত। রুগিকে পরীক্ষা করার পরে রায়চৌধুরী সমীরের দিকে তাকালেন!

'তুমি কী যেন বলেছিলে সমীর?'

সমীর ইতস্তত করছিল, 'হ্যাঁ স্যার। একটা কথা, মানে, ঠিক কীভাবে যে-'

সমীরের মুখে ঘটনাটার কথা শুনতে শুনতে অভ্যাসবশে রায়চৌধুরী মাথার সামনের দিকে টাকের পিছন থেকে বেশ গোটাকতক চুল ছিঁড়ে ফেললেন! 'বল কী সমীর! আর ইউ কোয়াইট সিরিয়াস?'

'পুরোপুরি স্যার। আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না প্রথমে।'

'আচ্ছা! খোলো তো তোমার রেডিয়োটা। সিস্টার একটু বাড়িতে খবর দিয়ে দিন তো ভাই, ফিরতে দেরি হবে।' রায়চৌধুরী রুগির বিছানার পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন, কানে সমীরের রেডিয়োর হেডফোন। লাঞ্চের পর খেলা ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে-মাঝে মাঝেই নীলাম্বর দাশগুপ্তর গলায় মৃদুস্বরে সেইরকম মন্তব্য-যার সঙ্গে ইডেনের মাঠের খেলার ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ মিল।

প্রায় দু-ঘণ্টা বাদে রায়চৌধুরী চেয়ারটা ঠেলে উঠলেন। বেশ উত্তেজিত। ইতিমধ্যে টাকের পিছনের বিরল কেশদাম আরও একটু পাতলা হয়ে এসেছে। বললেন, 'অ্যামেজিং! বুঝলে সমীর, অবিশ্বাস্য! ইনক্রেডিবল! একটা পাবলিশ করার মতো কেস। রুগিকে সর্বক্ষণ মনিটর করার দরকার। আর প্রলাপটা-প্রলাপই বা বলি কী করে, প্রত্যেকটা কথাই তো বাস্তবের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, ওটা রেকর্ড করো। একটা টেপ রেকর্ডার লাগাও। মোস্ট ইন্টারেস্টিং। ঘটনাগুলো সিকোয়েন্স অনুযায়ী নোট করে রাখো, বুঝলে। ব্রেন স্ক্যানের রিপোর্টটা এসেছে? এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে আর একবার রিপিট করাতে হবে। আর একটা কথা। এ সম্বন্ধে এখন কেউ না কিছু জানতে পারে। যতক্ষণ না ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে-একেবারে চুপ। রুগির আত্মীয়স্বজনকেও এখন কিছু বলার দরকার নেই। গুরুত্বটা বুঝতে পারছ তো? আর, নো ভিজিটর্স। আমি যাবার সময় গুপ্তাকে বলে যাচ্ছি। সিস্টার, ঘরের বাইরে 'নো ভিজিটর্স' বোর্ডটা টাঙিয়ে দিন তো।'

আজ ৪ জানুয়ারি। নীলাম্বর দাশগুপ্তর নার্সিংহোম বাসের ষষ্ঠ এবং ভারত ইংল্যান্ড ফোর্থ টেস্ট ম্যাচের পঞ্চম দিন। সকাল ন-টা। রুগির শারীরিক অবস্থা প্রায় একইরকম। সমীর বিশ্বাস ডায়েরিতে কেসটার জরুরি পয়েন্টগুলো লিখে রাখছিল। ইনভেস্টিগেশনে মস্তিষ্কের বিশেষ কোনো ক্ষতি ধরা পড়েনি। জ্ঞান কিন্তু ফিরে আসা উচিত ছিল। আরও একটা কথা। খেলার গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রুগি যে সর্বক্ষণ মন্তব্য করে গেছে তাই নয়, খেলার ওঠা-নামার সঙ্গে রুগির শারীরিক অবস্থাও ওঠা-নামা করেছে। অন্য সময় রুগি চুপ, অবস্থারও বিশেষ তারতম্য নেই। খেলার পঞ্চম এবং শেষ দিনে ভারত বিপর্যয়ের মুখে। ইনিংসে হার এড়ানোর জন্যে এখনও ২০৩ রানের দরকার। চতুর্থ দিনের শেষে বথামের শেষ ওভারের শেষ বলে শ্রীকান্ত লেগ বিফোর উইকেট আউট হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে নীলাম্বর দাশগুপ্তর মুখে শেষ কথা, 'হায় ভগবান!' এখন ন-টা পঁচিশ! খেলা আজ আধঘণ্টা আগে শুরু। সমীর টেপরেকর্ডারটা চালিয়ে দিয়ে রেডিয়োর হেড ফোনটা কানে লাগাল। সিস্টার হাওয়েলের চোখ মনিটরের দিকে।

ফোর্থ টেস্টের শেষ দিনের চায়ের বিরতি এইমাত্র শেষ হয়েছে। খেলা এখনও ভারতের প্রতিকূল-ছ-উইকেটে ১৩৫। একমাত্র ভরসা গাভাসকর এখনও ক্রিজে, সঙ্গে যশপাল শর্মা-দু-জনেই রক্ষণাত্মক। দর্শকরা উত্তেজনায় নিস্তব্ধ। নীলাম্বর দাশগুপ্ত রেস্টলেস-ব্লাড প্রেশার আবার ওঠা-নামা করছে-নাড়ির গতি দ্রুত। দুপুর থেকেই ডা. রায়চৌধুরী রুগির

ঘরে। তাঁর আমন্ত্রণে বম্বের বিখ্যাত স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডা. জাল পোস্তওয়ালাও এসে পৌঁছেছেন। অজ্ঞান রুগির মুখে অস্ফুট ভগবানের নাম।

ম্যান্ডেটরি ওভার শুরু হবার ঠিক আগের ওভারের দ্বিতীয় বলের সঙ্গে সঙ্গে রুগির মুখে পরিষ্কার শোনা গেল-'ওহ্ নো, আউট।' সারা মাঠ তখন হায় হায় করে উঠেছে। উইলিসের বলে যশপাল শর্মা ক্লিন বোলড। এবারে ব্যাট করতে আসছে সন্দীপ পাতিল। নীলাম্বর দাশগুপ্তর কাছ থেকে তখন অবশ্য ঘরের সবাই জানতে পেরেছে সন্দীপ পাতিল প্রথম ইনিংসে প্রথম বলেই আন্ডারউডের টপ স্পিনের লাইন সম্পূর্ণ মিস করে শূন্য রানে বোল্ড হয়েছিল। ভারতের সংকট ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রুগীর অবস্থাও আবার অবনতির দিকে। ছটফটানি একটু বেড়েছে-পালস ইরেগুলার। সমীরের নির্দেশে সিস্টার হাওয়েল চট করে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন।

পঞ্চম ম্যান্ডেটরি ওভার। গত ছ-ওভারে স্কোর বোর্ডে রান বেড়েছে মাত্র তিন। সন্দীপ পাতিলের স্বভাবসিদ্ধ মারকুটে খেলার চিহ্নমাত্র নেই। ব্যাট না তুলে মাটি কামড়ে খেলছে। ইয়ান বথাম এবং বব উইলিসের দুর্ধর্ষ আক্রমণের সামনে গাভাসকর পাহাড়ের মতো অনড়। নীলাম্বর স্থির, বিড়বিড় করে মন্ত্র জপ করার মতো বলে যাচ্ছেন, 'লেট দেম স্টিক, স্ট্রোক চাই না, খেলাটা বাঁচাও হে ভগবান।'

এগারো নম্বর ওভার শুরু হতে নীলাম্বর দাশগুপ্তর সঙ্গে সঙ্গে মাঠের সব দর্শক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। গাভাসকরের বিরুদ্ধে বল করতে এসেছে গ্রাহাম গুচ। শার্টের হাত কবজি অবধি নামানো, চোখে সানগ্লাস, বাঁ-হাতে বল-হুবহু দিলীপ দোশীর ভঙ্গি। নীলাম্বরের চোখের পাতা অল্প অল্প কাঁপছে, ঠোঁটের কোনে হাসি। গাভাসকর স্ট্রোক করার ভঙ্গি করে শেষ মুহূর্তে ব্যাট তুলে নিল-বল অবশ্য ক্রিজের হাত দুয়েক বাইরে দিয়ে একমাত্র স্লিপ ফিল্ডার গ্যাটিংয়ের হাতে। যেটুকু সময় বাকি তাতে আর ডিসিশন হওয়া সম্ভব নয়।

প্রায় পুরো ছ-দিন বাদে নীলাম্বর দাশগুপ্ত চোখ খুললেন। খাটের ডানদিকে বসা সমীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে পরিষ্কার গলায় বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল তাহলে!'

রুগির ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েই ডা. রায়চৌধুরী মিসেস দাশগুপ্তর মুখোমুখি হলেন। বললেন, 'বিপদ বোধ হয় এ যাত্রা কাটল। জ্ঞান ফিরেছে। আপনি যান না ভেতরে, দেখে আসুন।'

'এই প্রথম, জানেন ডাক্তারবাবু,' আধখোলা দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস দাশগুপ্ত রায়চৌধুরীকে বললেন, 'কলকাতা টেস্ট ম্যাচ হল আর উনি দেখতে পেলেন না।' রুগির খাটের কাছে গিয়ে মিসেস দাশগুপ্ত দেখলেন নীলাম্বর দাশগুপ্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। স্বাভাবিক ঘুম। প্রশান্ত মুখে কেমন একটা রহস্যময় হাসি।

*কার্তিক* **১৩৯২**




## সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

### কাকতালীয় যোগ

সেদিন সকালে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধু স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় ঢুকে আমি অবাক। একটি ছোট্ট ডিমালো আয়না মুখের ওপর তুলে উনি নিজের বিশাল টাকটি খুঁটিয়ে দেখছেন। বললেন, 'এসো ডার্লিং। তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

বললাম, 'টাকের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'আছে।' কর্নেল আয়নাটি টেবিলে রেখে একটু হাসলেন। 'কারণ একটি বিজ্ঞাপন। যেটি তোমাদেরই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় সম্প্রতি বেরিয়েছে। পড়ে দেখতে পার।'

উনি একটা বিজ্ঞাপনের কাটিং এগিয়ে দিলেন। পড়ে দেখি বেশ মজার একটা পদ্য।

টাক! টাক!! টাক!!!

ট্রাই ইয়োর লাক

যদি থাকে দাড়ি

সুফল তাড়াতাড়ি

ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়

১১১/১পি, খাঁদু মিস্তিরি লেন

কলকাতা-১৩

বি.দ্র.-আগে টাক পরীক্ষা করিয়ে তবে ভরতি। ২৪ ঘণ্টা সময় লাগবে। দরাদরি নিষিদ্ধ।

বললুম, 'ইন্দ্রোদ্ধারটা বোঝা যাচ্ছে না তো?'

কর্নেল বললেন, 'ইন্দ্র মানে কালো চুল। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে টাক পড়াকে ইন্দ্রলুপ্ত বলা হয়।'

'কিন্তু হঠাৎ টাক নিয়ে আপনি চিন্তিত কেন? এতদিন তো টাককে জ্ঞানী ও দার্শনিকের লক্ষণ বলে খুব গালভরা বুলি আওড়েছেন। আজ আবার-'

'কাক!' কর্নেল বিমর্ষমুখে বললেন। 'কাকের অত্যাচারে, জয়ন্ত! টাকের সঙ্গে কাকেরও গূঢ় সম্পর্ক আছে।'

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি আনছিল। কথাটা শুনে গম্ভীর মুখে বলল, 'এতবার করে মনে পড়িয়ে দিই, ছাদে যাবার সময় কেপ পরে যান। বাবুমশাই তবু কথাটা কানে করবেন না। কাকের দোষটা কী?'

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকালে ষষ্ঠী ট্রে রেখে কেটে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। ছাদের বাগানে গিয়ে আবার কাকের ঠোকর খেয়েছেন। তবে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভালো। যত রাজ্যের বিদঘুটে গড়নের ক্যাকটাস, উদ্ভুট্টে সব অর্কিড আর দুর্লভ প্রজাপতির ঝোপঝাড়। পাশের বাড়ির গা-ঘেঁষে ওঠা বুড়ো নিম গাছটা সম্ভবত কলকাতার কাকদের রাজধানী। তাড়ানোর জন্যে একবার পটকা ছুড়ে নাকি মামলা বাধার উপক্রম হয়েছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, 'ষষ্ঠী ঠিক বলেছে। আপনার টাককে কাকেরা পাকা বেল-টেল ভাবে। অবশ্য বেল পাকলে কাকের কী বলে একটা কথা চালু আছে।'

কর্নেল কফির সঙ্গে চুরুটও টানেন। জ্বেলে নিয়ে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, 'বেল কেন? তালের সঙ্গেও কাকের সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে একটা কথা চালু আছে।'

ঝটপট বললুম, 'জানি। কাকতালীয় যোগ। কাক এসে তাল গাছে বসল, সেই মুহূর্তে একটা পাকা তাল খসে পড়ল। নিছক আকস্মিক যোগাযোগ। লোকে যদি ভাবে কাকের সঙ্গে তাল পড়ার সম্পর্ক আছে, তাহলে এটা বোকামি।'

'ডার্লিং, প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে কাকতালীয় ন্যায় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।' কর্নেল সায় দেবার ভঙ্গিতে বললেন। 'যাই হোক, বিজ্ঞাপনটা দেখা অবধি মন ঠিক করতে পারছি না। কী করি তুমিই বলো!'

'যদি থাকে দাড়ি/সুফল তাড়াতাড়ি। আপনার দাড়ি আছে। অতএব ট্রাই ইয়োর লাক।'

'তাহলে চলো! কফিটা শেষ করে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।'

বেরিয়ে পড়া গেল না। কারণ কলিং বেল বাজল এবং আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই এক ভদ্রলোক আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঢুকে ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন। তারপর দু-হাতে মাথার চুল-কালো কোঁকড়া একরাশ চুল আঁকড়ে ধরে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন, 'ওঃ টাক। হায় রে টাক।'

কর্নেল হাঁ। আমিও হাঁ। তবে এটুকু বুঝলুম। এই হল কাকতালীয় যোগ। একেবারে হাতেনাতে আর কি।...

## টাক নিয়ে দুর্বিপাক

গরম কফি খাইয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভদ্রলোককে শান্ত-সুস্থ করা হল। তাঁর নাম মুরারিমোহন ধাড়া। ষাটের ওধারে বয়স। ঢ্যাঙা, রোগা গড়ন। বেজায় লম্বা নাক। মুখে গোঁফ-দাড়ি নেই। তবে মাথার চুল দেখার মতো-উজ্জ্বল কালো, মাঝখানে সিঁথি। পরনে ধুতি ও তাঁতের ছাইরঙা পাঞ্জাবি। পায়ে যেমন-তেমন একটি চটি। আর হাতে একটা ছড়ি। ছড়িটি কিন্তু সুন্দর।

মুরারিবাবু যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন দেখে গতকাল ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে যান। একটা ঘিঞ্জি গলির ভিতর জরাজীর্ণ বাড়ি। কোনো ব্যবসায়ীর গুদাম বলে মনে হয়েছে। দোতলায় অ্যাজবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ঘরের মাথায় নতুন সাইনবোর্ড ছিল। বেঁটে, হোঁতকা-মোটা, গোলগাল চেহারার ডাক্তারবাবুটি অবশ্য খুবই অমায়িক। উঁচু বেডে শুইয়ে মুরারিবাবুর টাক পরীক্ষা করে বলেন, 'ঠিক আছে। চলবে। তবে দাড়ি কামাতে হবে।' মুরারিবাবুর তাতে আপত্তি ছিল না। ডাক্তারবাবু নিজেই যত্ন করে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দেন। তারপর বলেন, 'চোখ বুজুন।' মুরারিবাবু চোখ বোজেন। এরপর কী হয়েছে

তাঁর জানা নেই। একসময় চোখ খুলে দেখেন, ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। উঠে বসেই সব মনে পড়ে। মাথায় হাত দিয়ে টের পান, টাক নেই, সারা মাথা চুলে ভরতি। খুশি হয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকাডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে অবাক হন। ঘোরালো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন অগত্যা। এই হল রহস্যের প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব কিন্তু মারাত্মক। মুরারিবাবু কলকাতায় সবে এসেছেন। রেলে চাকরি করতেন। পাটনায় থাকার সময় রিটায়ার করেছেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতার লেক প্লেসে বহু টাকা সেলামি দিয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন। দিন পাঁচেক আগে জিনিসপত্র নিয়ে উঠেছেন। একা মানুষ। স্বাবলম্বী। স্বপাক খান। গতকাল সন্ধ্যায় মাথার চুল গজানোর পর নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে দেখেন, অন্য কে একজন ঢুকে বসে আছে। কতকটা তাঁর মতোই চেহারা ও গড়ন। মাথায় টাক, মুখে দাড়িও আছে। মুরারিবাবুকে দেখে সে বলে, 'কাকে চাই?' মুরারিবাবু ভড়কে যান। তারপর হইচই বাধান। অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকেরা এসে পড়ে। তারা একবাক্যে রায় দেয়, এই কালো চুলের মুরারিবাবুকে তারা চেনে না। এমনকী ওপরতলা থেকে বাড়ির মালিক এসে পর্যন্ত শাসিয়ে বলেন, পুলিশ ডাকা হবে। বেগতিক দেখে মুরারিবাবু চলে আসেন। রাত্তিরটা হোটেলে কাটিয়ে এখন কর্নেলের শরণাপন্ন হয়েছেন। থানায় যাননি, তার কারণ তিনি এখন কীভাবে প্রমাণ করবেন যে তিনিই আসল মুরারিমোহন ধাড়া? কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, চেনা লোকও নেই। থাকলেও কালো কোঁকড়া চুল গজিয়ে তাঁর চেহারাকে একেবারে বদলে দিয়েছে যে!

আর একটু রহস্য আছে। কর্নেলের কাছে আসার পথে ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে গিয়েছিলেন, টাক পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তো বটেই, কিন্তু গিয়ে দেখেন, ঘরে তালা। সাইনবোর্ড নেই। খোঁজ করলে কেউ কিছু বলতে পারল না। কর্নেলের কীর্তিকাহিনি মুরারিবাবু খবরের কাগজে পড়েছেন। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকেই তাঁর ঠিকানা জোগাড় করেছেন। এই দুর্বিপাক থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে পারবেন না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

## ছড়ি বদল পর্ব

ঘটনাটি শোনার পর গোয়েন্দাপ্রবর মন্তব্য করলেন, 'হুঁ, টাকের আমি, টাকের তুমি, টাক দিয়ে যায় চেনা।'

বললুম, 'উহুঁ, গোঁফ। সুকুমার রায়ের 'গোঁফচুরি' পদ্যে আছে।'

কর্নেল হাসলেন। 'যাই হোক, এক্ষেত্রে টাকচুরি নিয়েই সমস্যা বেধেছে।' বলে মুরারিবাবুর দিকে তাকালেন। 'মুরারিবাবু, সেলফ-আইডেন্টিটি ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর। আমিই যে আমি, আপনি মুরারিবাবুই যে মুরারিবাবু, কোনো কোনো সময়ে প্রমাণ করা কঠিন হয়। তবে এ জন্য আদালত আছে।'

মুরারিবাবু করুণ স্বরে বললেন, 'আছে। আদালতে তো যেতেই হবে। রেলের কর্তারা এবং আমার কলিগরা আছেন। নানা জায়গায় আমার আত্মীয়স্বজন আছেন। টেলিগ্রাম-ট্রাংকল করে সবাইকে ডাকব। ব্যারিস্টারের কাছে যাব। সবই করব। কিন্তু সে তো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সর্বনাশ হবার তা হতে চলেছে। কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বিজ্ঞাপন দিয়ে চক্রান্ত করে কেউ বা কারা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে চেয়েছিল,

এবং ঢুকে পড়েছে। কেন এ চক্রান্ত, কেন আমার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে, সেটা নিয়েই আপাতত দুর্ভাবনা!'

'কেন?' কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। রহস্যের গন্ধটা এবার ঝাঁঝালো তো বটেই।

মুরারিবাবু চাপাস্বরে বললেন, 'হিরে। একটা-দুটো নয়, তিন-তিনটে হিরে। দাম এ-বাজারে কমপক্ষে দেড় লাখ টাকা।'

কর্নেল নড়ে বসলেন। 'কোথায় রেখেছেন হিরেগুলো?'

মুরারিবাবু তাঁর কালো রঙের ছড়িটা দেখিয়ে বললেন, 'অবিকল এইরকম একটা ছড়ির ভেতরে। মাথাটায় প্যাঁচ আছে। সেজন্য ছড়িটা সব সময় হাতে রাখতুম। কাল বিজ্ঞাপনটা দেখেই তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে ছড়িটা নিতে ভুলে গিয়েছিলুম। বুঝলেন না? টাক পড়া অব্দি কলিগরা তো বটেই, যে দেখত ঠাট্টাতামাশা করত। বেজায় বিদঘুটে টাক কিনা। আপনার টাক অবশ্য মানানসই। তো-'

কর্নেল ওঁর কথার ওপর বললেন, 'এই ছড়িটা নতুন কিনেছেন, আসার পথে?'

'ঠিক ধরেছেন। নিউ মার্কেটের ওখান থেকে কিনে আনলুম।' মুরারিবাবু ছড়িটা এগিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'ওরা হিরেগুলো খুঁজে হন্যে হচ্ছে। পাবে না। তবে বলা যায় না কিছু। যদি দৈবাৎ ছড়িটার বাঁট খুলে ফেলে-তার আগেই দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। আপনার হাতে ধরে বলছি কর্নেল স্যার! আপনি সব পারেন। কোনো ছুতো করে এই ছড়ি হাতে আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনি আগে ঢুকুন। আলাপ জুড়ে দিন। তারপর আপনার এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোক গিয়ে কলিং বেল টিপবেন।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'জয়ন্ত আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট নয়। খবরের কাগজের রিপোর্টার।'

মুরারিবাবু সঙ্গেসঙ্গে আমাকে নমস্কার করে বলল, 'তাই বলুন! কাগজে কর্নেলের কীর্তিকলাপ তো আপনিই লেখেন। দারুণ আপনার লেখার হাত, মশাই!' বলে ফের ফিসফিসিয়ে উঠলেন। 'তাহলে তো আরও চান্স! রিপোর্টার যেতেই পারে ওখানে। কারণ একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। কে প্রকৃত মুরারিমোহন ধাড়া এই নিয়ে অন্তর্তদন্ত করা খুবই স্বাভাবিক। কর্নেল স্যার যাওয়ার মিনিট কতক পরে জয়ন্তবাবু যাবেন। জাল মুরারি তক্ক করবে দরজায় দাঁড়িয়ে। সেই ফাঁকে কর্নেল স্যার দেওয়ালের ব্র্যাকেটে-ঝোলানো ছড়িটা হাতিয়ে এই ছড়িটা রাখবেন। ব্যাটা টেরই পাবে না। বাকিটা সহজ।'

ছড়িটা কর্নেল নিলেন। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার চুল গজানোটা একটু দেখতে চাই।'

মুরারিবাবু মাথা বাড়িয়ে বললেন, 'আলবাত দেখবেন। দেখুন! মিরাকল বলা যায়।'

কর্নেল একটুখানি হেসেই বললেন, 'সত্যিই মিরাকল। ভেবেছিলুম, আঠা দিয়ে পরচুলা পরিয়েছে নাকি। তা নয়। প্রকৃত চুল। ঠিক আছে আপনি সন্ধ্যা ছ-টা নাগাদ আসুন।'

মুরারিবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে কর্নেল বললেন, 'তুমি সম্ভবত কী জিজ্ঞেস করার জন্য উশখুশ করছিলে, ডার্লিং!'

উত্তেজনা নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বললুম, 'ছড়ি বদলানোটা রিস্কি হবে না? যদি দৈবাৎ-'

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'রিস্ক না নিলে রহস্য ভেদ করা তো সম্ভব হয় না ডার্লিং।'

'কখন বেরোবেন ভাবছেন?'

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে এবং অভ্যাসে সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'যাবার সময় তোমার আপিস হয়ে তোমাকে ডেকে নেবখন।'

## হুঁকো বিষয়ক প্রবাদ

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার আপিসে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছি, কর্নেলের পাত্তা নেই। দুটোয় ফোন করলুম, ষষ্ঠী বলল, 'বাবামশাই তো লাঞ্চো খেয়েই বেইরেছেন।' তিনটে বাজল। চারটে বাজল। পাঁচটায় উদবিগ্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে আবার ফোন করলুম, ষষ্ঠী ফোন ধরে বলল, 'বাবামশাই এইমাত্তর ফিরেছেন। ছাদে গেছেন! কেপ পরেই গেছেন। বুঝলেন না কাগুজে দাদাবাবু? কাক-কাক।' রাগে-অভিমানে ফোন রেখে ভাবলুম, 'এর অর্থ কী?' আমাকে নিয়ে বেরোনোর কথা। অথচ একা বেরিয়েছিলেন। হলটা কী?

যখন কর্নেলের তিন-তলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোলুম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। রাস্তায় যা জ্যাম। সটান ছাদে ওঁর 'প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডে' চলে গেলুম। দেখলুম, একটা বিদঘুটে ক্যাকটাসের দিকে ঝুঁকে আছেন প্রকৃতিবিদ। মাথায় সত্যিই 'কেপ'। কাছে গিয়ে বললুম, 'আশ্চর্য মানুষ আপনি!'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন, 'আমার চেয়েও আশ্চর্য মানুষ বিস্তর আছে, ডার্লিং! চলো নীচে যাই। মুরারিবাবুর আসার সময় হয়েছে।'

'আপনি গিয়েছিলেন ওঁর ফ্ল্যাটে? কী দেখলেন? ছড়িটা বদলাতে পারলেন?'

'হুঁউ। আসলে জয়ন্ত, টাক ও দাড়ির সঙ্গে টাক ও দাড়ির বন্ধুত্ব খুব ঝটপট গড়ে ওঠে। এটা বরাবর দেখে আসছি।'

নীচের ড্রয়িং রুমে ঢুকে কর্নেল বাথরুমে গেলেন গার্ডেনিং-এর জোব্বা বদলে হাত ধুতে! শুনলুম গলা চড়িয়ে ষষ্ঠীকে কড়া কফির হুকুম জারি করেছেন। এই সময় কলিং বেল বাজল। দরজা খুলে দিলুম। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়লেন মুরারিমোহন ধাড়া। দম-আটকানো গলায় বললেন, 'গিয়েছিলেন? কাজ হয়েছে তো?'

কর্নেল পর্দা তুলে বললেন, 'বসুন, আসছি।' তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মুরারিবাবু সোফায় বসে উদবিগ্ন মুখে বললেন, 'আমার ঠাকুরদার কেনা হিরে, জয়ন্তবাবু! এক সায়েব দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল মাইনিং বিজনেসে। ঠাকুরদাকে মাত্র দেড় হাজারে বেচেছিল। তা সেসব কথা পরে বলবখন। বলুন, খবর কী? আমার হার্ট ধুকপুক করছে খালি।' বুকে হাত দিলেন মুরারিবাবু।

কর্নেল সেইরকম একটি ছড়ি হাতে ফিরে এলেন। মুরারিবাবু খপ করে সেটি প্রায় কেড়ে নিয়ে বাঁটের প্যাঁচ ঘোরাতে শুরু করলেন। খিখি হেসে বললেন, 'জ্যাম হয়ে গেছে প্যাঁচ। বহুকাল খোলা হয়নি কিনা।'

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, 'আগে একটু কফি খান পাঁচুবাবু! তারপর কথা হবে।'

মুরারিবাবু চমকে উঠলেন। 'পাঁচুবাবু! ও কী বলছেন কর্নেল স্যার? আমার না-'

কর্নেল চোখ বুজেই বললেন, 'প্যাঁচ খুলবে না পাঁচুবাবু। কারণ ওটা আপনার কেনা সেই ছড়িটাই।'

মুরারিবাবু কিংবা পাঁচুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী অদ্ভুত রসিকতা!'

'রসিকতা আপনারও কম নয়, পাঁচুবাবু?' কর্নেল চোখ খুলে ফিক করে হাসলেন। 'আপনি আমার হাত দিয়ে আপনার মনিব মুরারিবাবুর হিরে চুরি করতে চেয়েছিলেন। একেই গ্রাম্য প্রবাদে বলে, অন্যের হাতে হুঁকো খাওয়া।'

'মুরারিবাবু' কিংবা 'পাঁচুবাবু' দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই পাশের ঘরের অন্য দরজার পর্দা তুলে এক পাঞ্জাবিপরা ভদ্রলোক বেরোলেন। ঢ্যাঙা, মাথায় টাক, মুখে দাড়ি। তিনি 'তবে রে ব্যাটা পেঁচো।' বলে গর্জন করে ঝাঁপ দিলেন এবং 'পাঁচুবাবু'র পাঞ্জাবির কলার খামচে ধরলেন। তারপর একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক পুলিশ অফিসার এবং দু-জন সেপাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমি হাঁ। তক্ষুনি দলটা বেরিয়ে গেলে ঘুরে কর্নেলের দিকে তাকালুম। স্বপ্ন না, সত্যি?

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে শুরু করেছেন ফের। বললেন, 'হুঁ, একেই বলে পরের হাতে হুঁকো খাওয়া। মাঝখান থেকে পাঁচুবাবুর বিজ্ঞাপন-খরচটা গচ্চা গেল। লম্বা-চওড়া একটা গুলগপ্পও কাজে এল না। ডার্লিং তোমার অবশ্য একটা বড়ো লাভ হল। বড়োবাজারের শিশি-বোতলের কারবারি মুরারিমোহন ধাড়ার কর্মচারী পাঁচু বা পঞ্চানন্দকে নিয়ে কাগজে দারুণ খবর হবে।'...

*শারদীয়া ১৩৯৩*






# মতি নন্দী

গোপীনাথ ঘোষের মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে কলাবতীর দাদু রাজশেখর সিংহ আর ছোটোকাকা সত্যশেখরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল 'বঙ্গবাণী' দৈনিকের মালিক-সম্পাদক সদানন্দ চক্রবর্তীর। গোপীনাথ হুগলির একটা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত এম.এল.এ.। সদানন্দর পৈতৃক বাড়ি সেই অঞ্চলেই, কলাবতীদেরও। 'বঙ্গবাণী' খুবই পুরোনো কাগজ এবং ওরা বলে 'বহুল প্রচারিত'।

কলাবতীর খুব ইচ্ছে সাংবাদিক হওয়ার, বিশেষ করে খেলার। সে নিজে ক্রিকেট খেলে, বাংলার মেয়েদলের ডিপেন্ডেবল ব্যাটসউওম্যান। টেস্ট দলে আসার সম্ভাবনাও আছে। তার লেখার হাতটিও ভালো। স্কুল ম্যাগাজিনে ক্রিকেট সম্পর্কে দুটো প্রবন্ধ দিদিমণিরা প্রশংসা করেছেন। বড়দি অর্থাৎ হেডমিস্ট্রেস মলয়া মুখার্জি ওকে ঘরে ডাকিয়ে বলেছিলেন, 'কালু তোমার কলমটা খুব জোরালো। মেয়ে প্লেয়ারদের অসুবিধাগুলো, অভিযোগগুলো খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছ। কিন্তু স্কুল ম্যাগাজিনের লেখা ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের চোখে পড়বে না। এসব কথা খবরের কাগজে বেরোনো উচিত। তুমি কাগজে লেখার চেষ্টা করো।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বড়দি ঠাট্টার স্বরে বলেছিলেন, 'তোমার লেখাটা কেউ ব্রাশ আপ করে দেয়নি তো? অবশ্য তোমাদের বাড়িতে ভালো গদ্য কেই-বা আর লিখতে পারে।'

মলয়া মুখার্জি বকদিঘি গ্রামের মুখুজ্জেবাড়ির, আর তার পাশের গ্রাম আটঘরার সিংহবাড়ির কলাবতী। একদা জমিদার এই দুই পরিবারের মধ্যে রেষারেষি কর্নওয়ালিসের আমল থেকে আজও চলে আসছে। সুযোগ পেলেই ওরা পরস্পরের লেগ পুল করতে ছাড়ে না এখনও। ব্যাপারটা বিশেষ করে হয় কলাবতীর ঠাকুরদা রাজশেখরের সঙ্গে মলয়ার বাবা হরিশঙ্করের আর সত্যশেখরের সঙ্গে মলয়ার। কলাবতী একে বলে, ডাবল-উইকেট কম্পিটিশন, আর সে নিজে নিউট্রাল উইকেটকিপার। ওদের ফসকানো বলগুলো ধরাই তার কাজ, তবে ক্যাচ বা স্টাম্পড করায় কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব তার নেই।

কলাবতী গদ্যর খোঁচাটা হজম করে শুধু হেসেছিল। কিন্তু বড়দির ওই কথাটা, 'তুমি কাগজে লেখার চেষ্টা করো'-তার মাথায় ঢুকে যায়। বঙ্গবাণীর সম্পাদকের সঙ্গে তাদের আলাপ হবার পরই তার মনোবাসনা ছয়ের পর ছয় হাঁকিয়ে অবশেষে তাকে রাজশেখরের কাছে পৌঁছে দিল।

রাতে খাওয়ার টেবিলে ওরা তিন জন। তখন রাজশেখর বললেন, 'কালু রিপোর্টার হতে চায়, সতু তোমার কী বক্তব্য?'

'দারুণ হবে, দারুণ।' সত্যশেখর তাঁর কাঁচাপাকা চুলের মধ্যে আঙুলের চিরুনি চালাল।

‘কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিক পাশটা না করে এইরকম একটা প্রফেশনে যাওয়া কি ওর উচিত হবে?’

‘দাদু আমি তো ফুলটাইম রিপোর্টার হব বলছি না। ক্রিকেট সিজন এসেছে, আমি ক্রিকেট নিয়ে টুকটাক কিছু লিখতে চাই। স্টাফ রিপোর্টার ছাড়াও বাইরের অনেকেই তো খবর-টবর লেখে।’

‘কোন কাগজে লিখবি, কথাবার্তা হয়ে গেছে?’ সত্যশেখর জানতে চাইল।

‘বঙ্গবাণীর সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করব। দাদুর কাছে তাই একটা চিঠি চাইছি। দাদুর রিকোয়েস্ট নিশ্চয় ফেলতে পারবে না।’

‘হয়তো পারবে না! সদানন্দর বাবা কাগজ বার করে কিছুদিন পর আর চালাতে পারছিল না। উঠে যায় যায় অবস্থা। তখন আমার বাবার কাছে টাকার জন্য এসেছিল। বাবা দশ হাজার দিয়েছিলেন। আমি তখন খুব ছোটো কিন্তু ব্যাপারটা জানি। সে-টাকা আর শোধ দেয়নি। কোনো লেখাপড়া করে টাকা দেওয়া হয়নি, আমিও আর চাই-টাইনি। যদি রিকোয়েস্ট করি হয়তো রাখতেও পারে। কিন্তু তুই কি পারবি? আগে কখনো লিখেছিস কোথাও?’ সত্যশেখর উদবিগ্ন স্বরে বলল। পিতৃ-মাতৃহীন একমাত্র ভাইঝিকে অবিবাহিত এই ব্যারিস্টার-কাকা মেয়ের মতো ভালোবাসে।

‘স্কুল ম্যাগাজিনের লেখাটা পড়ে বড়দি বলেছেন আমার কলম খুব জোরালো।’

‘হুঁ। তার মানে ধরে নিতে পারিস, তোর লেখাটা বাজে।’

‘সতু!’ ছোট্ট একটা বজ্রনির্ঘোষ অর্থাৎ রাজশেখরের বিরক্তি টেবিল গড়িয়ে ওপারে পৌঁছোল। সত্যশেখর দ্রুত নিজের প্লেটে মুখ নামিয়ে নিল। বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও এখনও সে বাবাকে বাঘের মতোই ভয় করে।

‘কালুর কলম জোরালো নয় অর্থাৎ মলয়া বাজে কথা বলছে এ ধারণা তোমার হল কেন?’

সত্যশেখর ডালের বাটিতে রুটি ডুবিয়ে বইঠা চালাবার মতো নেড়ে যাচ্ছিল।

‘লন্ডন টাইমসে একটা চিঠি ছাপাব বলে সেটা লিখে প্রথমে মলয়াকে একবার দেখতে দিয়েছিলাম। সে ওটাকে ধুয়ে মুছে এমন করে দিয়েছিল যে লেখার বক্তব্যই বদলে গেল।’ সত্যশেখর কাঁচুমাচু হয়ে বলল। যদিও ‘শত্রুপক্ষ’ বাড়ির মেয়ে কিন্তু মলয়ার সঙ্গে তার পরিচয় বাল্য থেকেই। দু-জনে প্রায় একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে গেছল, ওদের দু-জনের মধ্যে যত ভাব, তত ঝগড়া, এই বয়সেও। কলাবতী এটা খুব উপভোগ করে।

‘তোমাকে ব্যারিস্টার হতে বিলেত পাঠিয়েছিলাম, চিঠি লেখার জন্য নয়। হরির পয়সায় মলয়া গিয়েছিল পড়াশোনা করতে, চিঠি ঠিক করে দেওয়ার জন্য নয়।’

‘কিন্তু বাবা, আমরা দু-জনেই তো পাশ করে…’

‘তাতে কী হল?’ বজ্রনির্ঘোষে কলাবতীর আঙুলে ট্যাংরা মাছের কাঁটা ফুটে গেল।

‘তুমি হরির মেয়েকে দিয়ে চিঠিটা ঠিক লিখেছ কি না যাচাই করিয়েছিলে! নিশ্চয় এটা মেয়ের কাছে শুনেছে আর নিশ্চয় সে লোককে বলে বেড়িয়েছে সিংগিরা মুখ্যু। উফফ। তা চিঠির বিষয়টা কী ছিল?’

‘বেড়ালের ডাক, মানে বেড়ালের ঝগড়া।’

‘য়্যা!’

কলাবতীর ভাতের গ্রাস হাত থেকে পড়ে গেল।

‘এত বেড়ালের ঝগড়া, রাত্তিরে ঘুমোতে পারতাম না।’

‘তা মলয়া কী করল?’

‘সাহেবদের বেড়াল পোষার উপর কষে গালাগাল দিয়ে চিঠিটাকে আচ্ছাসে ঝালাই করে দিল।’

‘হরির মেয়ে তো, এসবে পোক্ত তো হবেই।’ রাজশেখরকে খুশিতে নরম দেখাল, বললেন, ‘কী লিখল?’

‘মনে নেই এখন, আঠারো-কুড়ি বছর আগের কথা তো। তবে সেটা বেড়ালের উপর একটা থিসিসের মতো হয়েছিল। প্রমাণ করেছিল, লন্ডনের বেড়ালরা কলকাতার বেড়ালের থেকে বেশি বাঁদর। বেশ বড়োই হয়েছিল চিঠিটা, কিন্তু ছেপেছিল, কুকুর-বেড়ালের জন্য ওরা কাগজে জায়গা দেয়।’

‘রিয়্যাকশান কিছু হল? তাতে বেড়ালরা কি ঝগড়া বন্ধ করল?’

‘আমাকে ডবল গালাগাল দিয়ে শুধু গুচ্ছের চিঠি বেরোল।’

‘হরির মেয়ে তো, গালাগাল খাইয়ে সিংগিদের হেনস্থা করার ব্যবস্থা করল আর কি।’ রাজশেখর টক দইয়ের প্লেটটা টেনে নিলেন। চামচেয় এক খামচা তুলে বললেন, ‘কালু, আমি তোমায় একটা চিঠি লিখে দেব।’

পরদিনই চিঠি নিয়ে কলাবতী হাজির হল বঙ্গবাণী সম্পাদকের ঘরে। চিঠি পড়তে পড়তে সদানন্দ চক্রবর্তীর মুখ হাসিতে ভরে গেল।

‘তোমাদের বাড়িতে বাবা যেতেন খুবই। কিন্তু তোমার ঠাকুরদা যে আমার বাবার কাছ থেকেই বাংলা লেখার তালিম পেয়েছেন তা তো জানতাম না! তা উনি তো আমায় মুশকিলে ফেলে দিয়েছেন। তোমাকে বাংলা লেখার ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব আমার উপর চাপালেন কিন্তু আমার সময় কোথা? স্পোর্টসেরও আমি কিছু বুঝি না। কিন্তু উনি যা লিখেছেন, ‘এই বংশের সবাই বঙ্গজননীর বাণী শিক্ষা করিয়াছে বঙ্গবাণী হইতে’...কী দারুণ বাংলা! হবেই তো, বাবার কাছে শিক্ষার ফল। কিন্তু আমি যে মুশকিলে পড়লাম।’

সদানন্দ চক্রবর্তী ডাকিয়ে আনলেন ক্রীড়া সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মাঝারি উচ্চতা, থলথলে ভুঁড়ি, মোটা ফ্রেমের চশমা, মিশমিশে রং, ধূসর খদ্দরের হাওয়াই শার্ট। এই সব মিলিয়ে কলাবতীর একদমই মনে হল না এই লোকটি এবং খেলা, এই দুইয়ের মধ্যে সহাবস্থান হতে পারে। খুবই বিগলিত দেখাল অনন্তবাবুকে। সদানন্দবাবু তাকে বসতে বলে কলাবতীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি উৎসাহ ভরে বললেন, ‘চিনি খুবই চিনি, খুব নামি ক্রিকেটার, গতবারই তো মেয়েদের রঞ্জি ট্রফিতে ইডেনে সেঞ্চুরি করেছে।’

‘মেয়েদের রঞ্জি ট্রফি’ শুনে কলাবতীর যতটা হাসি পেল ততটাই সে ভয় পেল সেঞ্চুরির কথা শুনে। এখনও তার সেঞ্চুরি নেই, ক্লাব ক্রিকেটে ছাড়া। প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না। দরকার কী ক্ষুণ্ণ করে, চটে থাকলে মুশকিল হতে পারে।

কলাবতীর আগমন-উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়ে সম্পাদক বললেন, ‘আজকাল তো মেয়েরাও রিপোর্টিং করছে, একে যদি তৈরি করে নিতে পারেন...অবশ্য বয়সটা খুবই কম,

ফুলটাইম স্টাফ ও হতে পারবে না, পড়াশোনা করছে। কিন্তু টুকটাক লেখার কাজ, প্রেস কনফারেন্সে যাওয়া, হ্যাঁ সেদিন যে বললেন রবিবারে মাঠে যাওয়ার লোক থাকে না, তা একে তো পাঠানো যায়।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। ক্রিকেটারকে ক্রিকেট মাঠে পাঠানোই তো দরকার। খেলার টেকনিক্যাল সাইডটা নিয়ে আমাদের পর এখন তো কেউ লেখেই না, এখন তো শুধু কাব্যের ফুলঝুরি। ক্রিকেট যে খেলেছে শুধু সেই পারে।'

অনন্তবাবু তার ভাসমান অবস্থা থেকে এবার ডাঙায় উঠেছেন। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সম্পাদক তাকে থামিয়ে বললেন, 'ওকে এখন নিয়ে গিয়ে সব বুঝিয়ে দিন, একটু কেয়ার নিয়ে শেখাবেন, দেখাবেন। ওর ঠাকুরদা আমার বাবার কাছে বাংলা শিখেছেন এটাও মনে রাখবেন।'

কলাবতীকে সঙ্গে নিয়ে ক্রীড়া বিভাগে এলেন অনন্তবাবু। দুটো বড়ো টেবিল, তাতে প্যাড, ছড়ানো কাগজ, পেপার ওয়েট, পিনকুশন আর কাচের গ্লাস। কাঠের একটা চাকতিতে সরু শিক লাগানো। এর নাম শূল বা স্পাইক। লম্বা হলঘরের একধারে কয়েকটা টাইপ রাইটারের মতো যন্ত্র। সেগুলো অবিরাম খটখট করে চলেছে। সংবাদ, যা টেলিপ্রিন্টার মারফত দেশ-বিদেশের নানান জায়গা থেকে এসেছে, তার মধ্যে যেগুলো কাজে লাগবে না সেগুলি এই শূলে গেঁথে রাখা হয়। দুটো লোক টেবিলে ঘাড়গুঁজে লিখছে। আর একজন টেলিপ্রিন্টার কপি পড়ছে আর শূলে গাঁথছে। জিনস আর হাফ শার্টপরা, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল কলাবতীকে দেখে সে পড়া বন্ধ করে তাকিয়ে রইল। অনন্তবাবু ওদের সঙ্গে কলাবতীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার থেকে কলাবতীই রোববারে মাঠ করবে। তোমরা তো বল সোমবারের কাগজে জায়গা অনেক, ভরাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। এবার কলাবতীই ভরিয়ে দেবে, ব্যাস, নিশ্চিন্ত।'

'আমাকে কোন ম্যাচ করতে হবে?'

'সব ম্যাচ।' অনন্ত দু-হাত ছড়িয়ে বললেন, 'গড়ের মাঠে যত খেলা সব।'

কলাবতী বিভ্রান্ত হল। দুটো ডিভিশন মিলিয়ে তো ডজন-দুই লিগ খেলা হয়, সব ম্যাচ কী করে একজনের পক্ষে সম্ভব?

'সব ম্যাচের শুধু রেজাল্ট জোগাড় করবে। ঘুরতে হবে না তোমায়। ওরাই স্কোর বই নিয়ে হাওড়া ইউনিয়ন টেন্টে আসে তুমি শুধু টুকে নেবে। দরকার হলে জিজ্ঞাসা করে নেবে কে কেমন খেলল, রেকর্ড-টেকর্ড কিছু হল কি না...তাই তো হে নকুল, তোমরা তো তাই কর?'

নকুল নামক ধুতি-পাঞ্জাবিপরা লোকটি 'হুঁ' বলল লিখতে লিখতেই।

'সেঞ্চুরি করলে ক-টা বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি মেরেছে সেটাও লিখবে আর ক-বলে কত মিনিটে। আজকাল আউট-ফাউট নিয়ে খুব ঝামেলা হয়, আম্পায়ারকে ধরে ঠ্যাঙায়ও! অবশ্য এসব বড়ো ক্লাবের খেলাতেই হয়। যদি এরকম হয়েছে শোনো তাহলে দু-পক্ষের বক্তব্যও নেবে। যদি ইনজুরি হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয় তাহলে খবর নেবে কেমন আছে, না না হাসপাতালে গিয়ে নয়, এখান থেকে ফোন করলেই হবে, এই আর কি!'

কলাবতী যাবতীয় উপদেশ শুনে, এই রবিবারই মাঠে যাবে কথা দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। দোতলায় উঠেই মুরারির কাছে শুনল, দাদু তার জন্য লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছেন।

‘কাজ হল?’

গদিমোড়া ইজিচেয়ারে রাজশেখর বই পড়ছিলেন, হাতের পাশের টেবিলে দুটো বই।

‘দারুণ কাজ দিয়েছে।’

‘চিঠি লিখতে জানা চাই, এটা একটা আর্ট। লেট কাট কি সবাই পারে? সতুটা কিছুই শিখল না, না পারে চিঠি লিখতে, না পরে ক্রিকেটটা খেলতে। সদানন্দর বাবা আমায় বাংলা শেখাবে? ঘেঁচু শেখাবে! আমি নিজেই বাংলা শিখেছি।’

অঃতপর কলাবতীর কাছে সবিস্তারে সব শুনে বললেন, ‘শুধু রেজাল্ট-টোকা জার্নালিজম তোর ভালো লাগবে?’

‘তা কেন, উনি বললেন বলেই কি আমি তাই করব? আমি দুটো ম্যাচ ভালো করে দেখব, লাঞ্চের আগে পর্যন্ত একটা, আর তার পরে একটা। কে কীরকম বল করছে, উইকেট কিপ করছে; নতুনদের মধ্যে ভালো কেউ খেললে তার সম্পর্কে লিখব যাতে সি.এ.বি.-র নজরে আসে।’ কলাবতী উৎসাহে কলকলিয়ে উঠল।

রাজশেখর হাতের বইটা তুলে ধরে বললেন, ‘নেভিল কার্ডাস; তোর জন্যই আবার পড়ছি। কতকগুলো জায়গা দাগিয়ে রেখেছি টুকে নিয়ে যাবি, লেখায় বসিয়ে দিবি। রবার্টসন-গ্ল্যাসগো আর ফিঙ্গলটনের বইও বার করেছি।’

‘কিন্তু দাদু, ময়দানের ক্রিকেটে কি কার্ডাস একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?’ কলাবতী তার ঘোরতর সন্দেহটা জানিয়ে দিল। ‘সেরকম ক্রিকেট কি ময়দানে খেলা হয় নাকি যে ম্যাকলারেন, উলি, ভেরিটি, হ্যামন্ডের মতো প্লেয়ার দেখতে পাব। বাংলা তো এখন ইস্ট জোন লিগেই আঁকুপাঁকু করে।’

রাজশেখর গম্ভীর হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর মৃদুস্বরে বললেন, ‘সমাজের অবস্থা সব থেকে ভালো বোঝা যায় খেলার মাঠ থেকে। তার উদ্দীপনা, সাহস, ভয়, সংকোচ, দারিদ্র্য, উদারতা সব ফুটে ওঠে ক্রিকেটের মধ্য দিয়ে। ইটস অ্য গেম অব লাইফ অ্যান্ড লাইফ ইজ অ্য গেম। বাংলার ক্রিকেটই আমাদের এখনকার অবস্থাটা জানিয়ে দিচ্ছে।’ রাজশেখর বইটা বন্ধ করে চোখ বুজলেন।

রবিবার দশটার আগেই কলাবতী বাস থেকে শহিদ মিনারের কাছে নামল। সে ঠিক করেই রেখেছিল ছোটো ক্লাবের ম্যাচ প্রথমে দেখবে। ময়দানে কোন মাঠ কোথায় সবই তার জানা। হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকেই এ-মাঠ সে-মাঠের খেলা দেখতে দেখতে অবশেষে একটা মাঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মিনিট দশেক হল খেলা শুরু হয়েছে কিন্তু টেলিগ্রাফিক স্কোর বোর্ডে দেখা যাচ্ছে পাঁচ রানে চার উইকেট, লাস্ট ম্যান চার রান করে আউট হয়েছে। নিশ্চয় দারুণ বল করেছে কেউ! কলাবতী শামিয়ানার নীচে স্কোরারদের টেবিলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

‘দাদা উইকেট চারটে কে নিল?’

কলাবতী দু-জন স্কোরারের একজনকে জিজ্ঞাসা করল খুব বিনীতভাবে। সযত্নে বোলিং অ্যানালিসিসের ঘরে পেনসিলের একটা ফুটকি বসিয়ে লোকটি মুখ তুলে একটি মেয়েকে দেখে বলল, ‘জেনে কী করবেন?’

‘না এমনিই।’ থতোমতো হল কলাবতী।

‘ওই যে ছেলেটা এখন বল করতে যাচ্ছে, ও একাই চারটে নিয়েছে। দুটো বোল্ড, একটা এল.বি., একটা কট। সাত বলে শূন্য রানে।’

কলাবতীর ইচ্ছা হচ্ছে বোলারের নামটা জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু স্কোরারের মেজাজ দেখে ভরসা পেল না। সে একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল। তখন কানে এল স্কোরার তার পাশের জনকে বলছে, ‘এখন মেয়েরাও ক্রিকেট বোঝে, কালে কালে কতই যে দেখব!’

‘ক্রিকেট মাঠে যাওয়াটা এখন ফ্যাশন হয়েছে, এদের জন্যই খেলাধুলো গোল্লায় গেল।’

ওভারের শেষ তিনটি বল কলাবতী দেখল। ছেলেটির বোলিং স্টাইলটা কপিলদেবের মতো, বেশ জোরেই বল করে। ডিরেকশন আর লেংথ তো বটেই বল সিম করাচ্ছেও চমৎকার। শেষ বলটায় ব্যাটসম্যান পিছিয়ে খেলে ক্যাচ দিয়েছিল উইকেট-কিপারকে, তার আগের বলটায় এল.বি.ডব্লু. অ্যাপিল করেছিল বোলার। কী বল করছে দেখার জন্য কলাবতী সাইট স্ক্রিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ছেলেটি তার তৃতীয় ওভার বল করার জন্য এগিয়ে আসছিল কিন্তু ক্যাপ্টেন হাত নেড়ে তাকে ফাইন লেগ বাউন্ডারিতে যেতে বলে, আর একজনকে বল করতে ডাকছে। ছেলেটির মুখে অবিশ্বাস ও বিস্ময় একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে। কলাবতী প্রথমে অবাক হয়ে রেগে উঠল। লিখতে হবে এটা। নোট বইয়ে সে লিখে রাখল কয়েকটা কথা।

লাঞ্চ পর্যন্ত সে খেলা দেখল। ছেলেটিকে আর একবারও বল করতে ডাকা হল না। চার উইকেটে পাঁচ রান থেকে স্কোর গেল চার উইকেটে ১৯০ রানে। কলাবতী টেন্টের কাছে এসে তার এক বন্ধুর দাদাকে দেখতে পেল। মনে হল এই ক্লাবেরই কর্তা-গোছের কেউ। তিনি তো ওকে দেখে অবাক। আরও অবাক হলেন বঙ্গবাণীর জন্য রিপোর্ট করবে শুনে।

‘ওই ছেলেটিকে আপনার ক্যাপ্টেন আর বল করতে দিল না। এরকম ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে নিশ্চয় আপনারা ব্যবস্থা নেবেন।’

‘ছেলেটা মানে রবীন? হ্যাঁ খুব প্রমিস আছে।’

‘আর ওকে কিনা দু-ওভার পরই বসিয়ে দিল।’

‘ব্যাপার আছে। এদিকে সরে এসো।... সি.এ.বি.-র এক কর্তা, নাম বলব না, তার টিমের সঙ্গে খেলা। সামনে টেস্ট ম্যাচ, নানান কমিটি হবে, আমাদের ক্লাবের দুই মাতব্বর তাতে ঢুকবে। এই ম্যাচটায় ওদের অন্তত দু-শো রান করিয়ে না দিলে কি কমিটিতে নেবে? তা ছাড়া রবীন তো ভেরি ইয়াং, ওর সামনে এখনও বহু বছর পড়ে, অনেক উইকেট ও পাবে। একটা ম্যাচে বল না করলে ওর কিছু ক্ষতি হবে না। ক্যাপ্টেনকে বলেই দেওয়া হয়েছিল ওকে দিয়ে বল না করাতে, তবুও যে কেন দিল! দু-ওভারেই ম্যাচটা রুইন করে দিচ্ছিল।’

শুনতে শুনতে কলাবতী স্তম্ভিত হয়ে গেল। দারুণ বল করা মানে ম্যাচ ধ্বংস করা! এমন বোলারকেই তো উৎসাহ দিতে আরও বল করানো উচিত। ছেলেটিকে তার সমবয়সিই মনে হচ্ছে। ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য সে কাছে এগিয়ে গেল। দু-জনের বক্তব্যটাই লেখার জন্য তার দরকার।

‘ভেরি স্যাড, সত্যিই দুঃখ হচ্ছে, তোমার হচ্ছে না?’

‘না। আমাকে বলেছিল উইকেট না নিলে জুনিয়ার বেঙ্গল টিমের জন্য ট্রায়ালে রাখবে। কিন্তু আমি চারটে উইকেট নিয়ে ফেলেছি। কী যে হবে!’ ভয়ে রবীনের মুখ শুকিয়ে

রয়েছে।

শুনে, কলাবতী আর একবার স্তম্ভিত হয়ে পায়ে পায়ে সরে গেল। প্যাকেটে স্যান্ডউইচ আর কলা এনেছে। মাঠের ধারে বসে সেগুলো শেষ করে লাঞ্চের সময়টা কাটিয়ে সে খেলা খুঁজতে বেরোল। কয়েকটা মাঠ দেখল। একটাতেও তার চোখ বা মন বসল না। এসব খেলার থেকে তাদের আটঘরার ক্রিকেট অনেক ইন্টারেস্টিং মনে হল। বল করার মধ্যে বুদ্ধি নেই, ব্যাট করায় সাহস নেই। অপরিচ্ছন্নতা আর একঘেয়েমি খেলাগুলোয় ঠাসা, একসময় ক্লান্ত বোধ করে সে একটা মাঠের বাউন্ডারিতে বসে খেলা দেখতে লাগল।

হঠাৎ তার মনে হল কিছু যেন একটা হচ্ছে। মাঠের মধ্যে আম্পায়াররা কেমন অন্যমনস্ক, একজন তো খেলা চলার মধ্যেই হাতের ইশারায় কথা বলল মাঠের বাইরে কার সঙ্গে। স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারির ফিল্ডার বুট দিয়ে শট মেরে একটা বল মাঠ থেকে বার করে দিল। কোনো অ্যাপিল হচ্ছে না, বল এনতার শর্ট পিচ পড়ছে, বাই হয়ে বল বাউন্ডারিতে গেল পরপর চার বার। কলাবতীর পিছনে কয়েকজন দর্শক চেঁচিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে।

'শাবাশ, শাবাশ, সেঞ্চুরিটা হয়ে এল।'

'আরে আরে, এ যে সত্যি সত্যিই ফিল্ড করল, ওরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, নইলে সিজনের মতো বসে যাবি।'

'বোলার চেঞ্জ, বোলার চেঞ্জ, এ গুড লেংথে বল ফেলছে, চেঞ্জ করো একে।'

কলাবতী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল স্কোর বোর্ডের ২৩ সংখ্যাকে একটি ছেলে গিয়ে ৪৪ করে দিল!

'ভাই এর মধ্যেই একুশটা রান হয়ে গেল?' একজন জিজ্ঞাসা করল বিদ্রূপের স্বরে।

'যান না স্কোর বইটা দেখে আসুন না।' ছেলেটি নির্বিকার হয়ে চলে গেল।

কলাবতী উঠে গিয়ে দুই স্কোরারের পিছন থেকে দেখল, দুটো খাতাতেই হুবহু একই স্কোর। গুনে দেখল এক ব্যাটসম্যানের নামে দশটা বাউন্ডারি আর চারটে এক।

'দুটো চার জি. ভট্টাচার্যের।' এক স্কোরার বলে দিল, অন্যজন খাতায় তাই বসাল।

'ফিফটি হয়ে গেছে রে, স্কোর বায়ান্ন কর।' বোর্ডে চুয়াল্লিশ হল বাহান্ন। মাঠের মধ্যে কয়েকটা চটপট শব্দ হল, বেঁটে মোটা ব্যাটসম্যানটি ব্যাট তুলল। প্যাড পরে বসে থাকা একজন কলাবতীকে দেখতে পেয়ে হাসল।

'বিশুদা কী ব্যাপার বলুন তো। এটা কি খেলা হচ্ছে?'

'ওর পাঁচটা সেঞ্চুরি এই সিজনে হয়েছে, আর একটা দরকার। বেঙ্গল টিমে আনার জন্য সিলেক্টরদের কাছে ওর যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে না?' বিশুদা গলা নামিয়ে বলল।

'অপোনেন্ট এতে রাজি হল?'

'লিগ টেবিলে তলায় রয়েছে, চ্যাম্পিয়ানশিপ ফাইট তো করছে না। এখন একটা ম্যাচ হেরে বা জিতে ওদের কিছুই ক্ষতি বা লাভ হবে না, বরং আমরা ঋণী রইলাম। যখন ওদের দরকার হবে আমরা শোধ দেব ম্যাচ ছেড়ে দিয়ে।'

কথা বলতে বলতেই আবার হইচই শুনে কলাবতী দেখল ৫২টা ৭৫ হয়ে গেছে। মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা পৌঁছোল সেঞ্চুরিতে এবং খেলাও শেষ। করমর্দন আর পিঠ

চাপড়ানি নিয়ে জি. ভট্টাচার্য তাঁবুতে ঢুকে গেল।

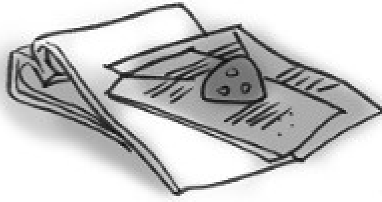
কলাবতীর মনে হচ্ছে সে যেন অ্যালিসের মতো কোনো আজব দেশে রয়েছে। তার মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করছে। বোধ হয় ডেনিস লিলির বল মাথায় লাগার পর মিঁয়াদাদের এই রকমই লাগছিল। কী যে রিপোর্ট লিখবে ভেবে পাচ্ছে না সে। ক্রীড়া সম্পাদকের কথাটা মনে পড়ল, কার কী বক্তব্য আছে জেনে নেবে।

স্কোর খাতায় সই করে আম্পায়ার দু-জন ফিরছেন। তাদের একজনকে সে প্রশ্ন করল, 'এইভাবে রান বাড়ানো হল, আর আপনারা তাতে আপত্তি করলেন না?'

'বাড়ানো হয়েছে নাকি!' তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। 'আমরা তো মাঠে ছিলাম, স্কোরে কী হয়েছে তা তো আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়! স্কোরার তো দু-দলেরই রয়েছে, কেউ আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ করেনি, সুতরাং আমাদের কিছুই করার নেই।'

ময়দানের খেলার রেজাল্টগুলো সংগ্রহ করে কলাবতী বঙ্গবাণীর ক্রীড়া বিভাগে এসে দেখল চেয়ারগুলো ফাঁকা, কেউ তখনও আসেনি। সে একটা প্যাড টেনে নিয়ে লিখল, 'কিছুই লেখার নেই।' রেজাল্টগুলো প্যাডটার উপর পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রেখে সে বাড়ি ফেরার জন্য বঙ্গবাণী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

*শারদীয়া ১৩৯৩*






## প্রণব মুখোপাধ্যায়

কয়েক বছর আগের কথা।

ছেলে পড়িয়ে খাই, মোড়ের মাথায় চারজন লোক গরম হয়ে কথা বললে উলটো পথে হাঁটি, নিজে কখনো ভোট দিইনি। আর সেই আমাকেই কিনা ভোট নিতে যেতে হল! আর এমন এক জায়গায় যার নাম শুনেই লোকে চমকে উঠে কেমন চুপ মেরে যেতে লাগল, আর আমার দিকে এমন করুণার চোখে তাকাতে লাগল যেন এই আমাকে শেষবারের মতো দেখছে।

তবু বুকে সাহস আর সঙ্গে ছয় সঙ্গী, পঞ্চাশ রকমের জরুরি কাগজপত্র আর ফর্দ মিলিয়ে একাত্তরটি মালপত্র-হ্যারিকেন থেকে ছুঁচ অবধি নিয়ে বাসে চাপলাম। বহুদূর চলার পর বালির ওপর ঘসটে চাকা টেনে বাস চলল, সবাই বলল নাকি নদী পেরোচ্ছি। এখন একটু শুকিয়ে গেছে এই যা। তারপর আরও বহুক্ষণ চলার পর নামা গেল দুনিয়ার আর এক প্রান্তে। সঙ্গে দু-টি সেপাই ছিল, নেহাতই নাবালক। ওরা নাকি ওদের জমি চষছিল। এমন সময় গভর্নমেন্টের লোক এসে লাঙ্গল কেড়ে পেয়ারা গাছের খেঁটে লাঠি ধরিয়ে দিয়ে জোর করে সেপাই করে দিয়েছে। ভোটের পর ছেড়ে দেবে।

সব শুনে গেঁথে, সেপাই দু-টিকে ঘুম থেকে তুলে ফর্দ খুলে চৌকিদারের নাম খুঁজতে লাগলাম। এ সময় তার এখানে থাকার কথা। নাম ধরে কয়েকবার চেঁচালাম 'পঞ্চু হালুই' 'পঞ্চু হালুই' করে। দূর থেকে কী একটা পাখি বারবার সাড়া দিয়ে গা পিত্তি জ্বালিয়ে দিলে। হাঁক ডাক শুনে সেক্টর আপিসের জিপ এসে আমাদের নিয়ে চলল। পঞ্চু হালুইয়ের পাত্তা মিলল না। অথচ ওর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কথা। সেক্টর অফিসার গজরাতে লাগলেন, 'দাঁড়াও ব্যাটার চাকরি ঘোচাচ্ছি।'

গাড়ি আমাদের নিয়ে তো চলল, কিন্তু কোথায়? রাস্তা কই? এ তো উঁচু-নীচু ঢিপি আর গাছের ঝোপঝাড় বিছিয়ে আছে চারদিকে। তবু চলল জিপ সেই সব মাড়িয়ে। বার চারেক উলটোতে গিয়েও সোজা হল। আমাকে শূন্যে তুলে লুফতে লুফতে মাইল তিনেক মাঠ পেরিয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা ডোবার মধ্যে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে ইশকুল বাড়িতে হাজির হল গাড়ি। এখানেই কাল ভোট নেওয়া হবে।

এই নাকি স্থানীয় ইশকুল। গোটা আষ্টেক খুঁটির ওপর একটা খোড়ো চাল ঝুলে আছে কোনোমতে। গোবর ল্যাপা নড়বড়ে মাটির দেওয়াল। ঝোড়ো হাওয়া বইলে কাল অবধি টিকবে কি না সন্দেহ।

জিপ বিদায় নিল।

কোত্থেকে এগিয়ে এলেন এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর। বললেন, 'আগেই আমরা এসে গেছি। ওই ওধারে একটা ঘরে আছি।' দেখলাম বেশ বড়ো ধরনের একটা পুলিশ দল।

এই ধু-ধু জনপ্রাণীহীন প্রান্তরে এত পুলিশ কেন রে বাবা! বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

আসবাব বলতে দুটো ভাঙা চেয়ার, একটা তিন ঠ্যাঙো টেবিল আর কয়েক সার লজগজে বেঞ্চি। ওগুলোতেই ভোট নেবার কাজ চালাতে হবে। এর মধ্যে জিপের আওয়াজ পেয়ে দু-চারজন স্থানীয় মানুষ এসে হাজির।

এমনভাবে তারা আমাদের দেখতে লাগল যেন মঙ্গল গ্রহ থেকে আসছি। আমাদের সেনবাবুর চশমাটা দেখিয়ে একটা ছেলে বুক ফুলিয়ে আর একজনকে জানাল যে তার কোন খুড়োও নাকি চোখে ওরকম পরে। তারপর বিস্ময় কমলে সেই ছেলেটিই, নাম বলল ভূতনাথ, মুড়ি আর জল নিয়ে এল। তারপর দেখি দু-জন লোক একটা খাটিয়া ছেড়ে ঘুম থেকে উঠে হাই তুলে সামনে দাঁড়াল। তাদের একজন জামা তুলে পেটের তলা থেকে একটা পেতল আঁটা বেল্ট বার করে জামার ওপর পরে নিল। বুঝলাম এই চৌকিদার। বললাম, 'কী গো, তোমার না থাকার কথা ছিল বড়ো রাস্তায়? অফিসার বাবু চটেছেন।' তাতে ওর বিকার হল না। আরও বড়ো একটা হাই তুলে বলল, 'কী করব বাবু, গাড়ি গেলে তো। বাম দিকের গোরুটি শিষ্ট। কিন্তুক ডানদিকেরটি মাথাগরম করল।' তারপর ভূতনাথকে ধমকে বলল, 'কী রে, আমরা একগাল মুড়ি-টুড়ি পাব না?'

খাটিয়ার অপরজন চুল-টুল আঁচড়ে একটা ভাঙা সাইকেল তুলে ছোটো সেলাম দিয়ে বলল, 'ক্রাসিন আনতে হবে তো বলুন যাই! আমার নাম হারানিধি, লিস্টির সঙ্গে মিলিয়ে নিন।' লিস্টে দেখলাম নাম রয়েছে, হারানিধি চৌবে, সাইকেল মেসেনজার। বললাম, 'এত তাড়া কীসের? একটু রোদ পড়ুক না।' ও চমকে উঠে বলল, 'আলো পড়ে এলে স্যার কোথাও যেতে পারব না, মাপ করবেন।' স্থানীয় একজন মুরুব্বি মতো লোক মজা দেখছিল। বলল, 'আলো পড়ে গেলে ওই খালপারের মাঠ কেউ পেরোই না আমরা। ওখানে ডাকাতির মহড়া হয়। দু-পাঁচ টাকা আর তেল-নুন সঙ্গে থাকলে ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে কেড়েকুড়ে নেয়। মানুষ মারায় হাত পাকানোও হল, কিছু পাওয়াও গেল।' আমি জায়গাটার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোঁক গিললাম। আর আমার দলের সেপাই দু-জন লাঠি হাতে আমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। এমন সময় সাব-ইন্সপেক্টর সায়েব এগিয়ে এসে ইশকুল ঘরের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

চেয়ারটা একটা সন্দেহজনক শব্দ করল। তারপর, 'কোনো ভয় নেই স্যার, আমি খোঁজ খবর নিয়ে এলাম, গণ্ডগোলের কোনো চান্স নেই,' বলে জাঁকিয়ে যেই হেলান দিয়েছেন অমনি সমস্ত জোড়টোড় খুলে চেয়ারটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল। স্থানীয় মুরুব্বিটি অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'ঃএ হে হে, নিতাই স্যারের চেয়ার'-আকাশ থেকে ঠ্যাং নামিয়ে ধড়ফড় করে পুলিশ সায়েব উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ভাঙা টুকরোগুলো লোকটির হাতে গুনে গুনে তুলে দিয়ে দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'নিতাই স্যারকে অ্যারেস্ট করা উচিত।'

তারপর কেরোসিন এল, হ্যারিকেন জ্বলল, কাগজপত্রের কাজ নিয়ে বসলাম। কাপড় টাঙিয়ে গোপন ভোটকক্ষ তৈরি হল। পুলিশদের সঙ্গে মুরগির ঝোলভাত খেয়ে, ব্যালট পেপারের বান্ডিল মাথায় দিয়ে ঘুম দিলাম। ঘরের একটা দরজাতেও খিল নেই। টেবিল বেঞ্চিগুলো দরজায় লাগিয়ে পুলিশদের সতর্ক থাকতে বলে তবুও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। খালি দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে চমকে উঠলাম-ওই বুঝি কে দোর ঠেলে ছায়ার মতো এগিয়ে এল, ওই বুঝি আমার মুণ্ডুটা বাঁ-হাতে তুলে ডান হাতে ব্যালট পেপার ছিনতাই করল।

ভোর না হতেই, বাপরে বাপ, সে কী বিরাট লাইন! কোত্থেকে সব মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি সার সার গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে। সবাই আগে ভোট দেবে।

পুলিশরা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল ভিড় সামলাতে। সারাদিন ধরে চলল ভোট দেবার জন্যে কাড়াকাড়ি। অতি উৎসাহী কেউ আবার টাটকা ভোটের কালি মাথায় মুছে কিংবা চেটেপুটে আঙুল থেকে তুলে ফেলছিল। ধান্দা ছিল পরে ফের বেনামে আর একবার ভোট দেবার ফিকির খুঁজবে। তাদের ধরে ধরে ভালো করে কালি মাখানো হল। পুলিশ দিয়ে চোখ রাঙিয়ে, জেল খাটাবার ভয় দেখিয়ে তবে কোনোমতে নিরস্ত করা গেল।

কোথা দিয়ে যে দুপুর গড়িয়ে সাড়ে চারটে বেজে গেল টেরই পেলাম না। শুধু হাত-পাগুলো অবশ হয়ে এল আর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। মাঝেমধ্যে একটু-আধটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল বটে, বাইরে দাঁড়িয়ে দু-পক্ষ মুখোমুখি আস্তিন গোটাচ্ছিল। তবে তা সামাল দিতে অসুবিধা হয়নি। একবার শুধু দুম করে কোথায় একটা পটকা ফাটল। দেখতে যাচ্ছি, ধাক্কা খেলাম সেই দুই সেপাইয়ের সঙ্গে। ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ঘরে এসে ঢুকল। তাদের লাঠি দুটো কুড়িয়ে হাতে গুঁজে ধমকেধামকে ফের বাইরে দাঁড় করিয়ে দিলাম। পুলিশ লাগাতে হয়নি। শুধু জোড়হাতে অনুনয় করে বললাম, ‘দয়া করে নির্বিঘ্নে ভোট হতে দিন। হাঙ্গামা বাধালে মালপত্র তুলে নিয়ে বাক্স উলটে ভোট বাতিল করে চলে যাব।’ এই কথাতেই কাজ হচ্ছিল খুব।

দিনের শেষে হাঁপ ছাড়লাম। ভোটের বাক্সপ্যাঁটরা গুণে, লোকজন নিয়ে জিপে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় সাদা কাগজ হাতে সেই ভূতনাথ এসে হাজির। একগাল হেসে কাগজটা সামনে মেলে ধরে বলল, ‘একটা সার্টিফিকেট দিন স্যার।’ বললাম, ‘কীসের সার্টিফিকেট?’ ‘ওই যে কত কাজ করলুম! মুড়ি জল এনে দিলুম, পুলিশদের জামা-টুপি টাঙাবার পেরেক হাতুড়ি-‘

অন্ধকার নামছিল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে খসখস করে কোনোরকমে কিছু প্রশংসা লিখে দিয়ে বললাম, ‘কী হবে এটা দিয়ে?’ ও বলল, ‘পঞ্চায়েত আফিসে চাকরি চাইব।’ আমি বললাম, ‘ইশকুলে পড় না?’ ভোটের ঘরটা দেখিয়ে ও বলল, ‘এই তো আমাদের ইশকুল। চাকরি পেলেই পড়া ছেড়ে দোব।’

আমাদের গাড়ি ফিরে চলল মাঠের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে।

*পৌষ ১৩৯৪*






## শিশিরকুমার মজুমদার

সূর্যটা লাল থালার মতো সমুদ্রের উপরে যখন উঠল, লালে লাল হয়ে গেল আকাশ। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো সব রং মেখে ভেসে বেড়াতে লাগল আকাশজুড়ে। ও মেঘে বৃষ্টি হয় না। কে বলবে আজ থেকে ঠিক বারোদিন আগে আকাশজুড়ে কালো মেঘের তাণ্ডব শুরু হয়েছিল, আকাশ ভেঙে পড়েছিল, সঙ্গে ঝড়-তুফান! খেপে উঠেছিল সাগর। দু-দিন ঘরে বসে থেকে ভোরের খেপে মাছ ধরতে যারা বার হয়েছিল তাদের দলের সকলেই একে একে ফিরে এসেছিল দু-দিন পরে। শুধু ফেরেনি একদল, তাদের মাঝেই পঞ্চুর বাপ হিরু জেলে, আর তার নৌকোর অন্য সকলে, গজুদাদা, ভূপেনকাকা, বিষ্টুকাকা আর মদন ভাই। তারাই হিরু জেলের সঙ্গী ছিল।

সূর্য উঠলে সাগরের জলের রং বদলায় না। তবে দূরে আরও দূরের সবকিছু কেমন যেন পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তখন স্পষ্ট দেখা যায় আকাশটা যেখানে বেঁকে গিয়ে সাগরে ডুব মেরেছে, সেই জায়গাটা। ওখানেই কোথাও আছে নতুন কোনো দেশ। সেখানেই ঝড়ের দাপটে ভেসে গেছে পঞ্চুর বাপ তার দলবল নিয়ে। আসবে তাই কোনোদিন ঠিক ফিরে, আবার তাদের নাও ভাসিয়ে। আসবে সামনের ওই বড়ো বড়ো ঢেউ পাড়ি দিয়ে। উঃ , কত ঢেউ সাগরে, ঢেউয়ের পর ঢেউ!

রোজ সকালে পঞ্চু এসে তাই দাঁড়ায় সাগর তীরে। চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকে সেই দূরের দিকে, যেদিকে গাঁয়ের সবাই গেছে তাদের নাও ভাসিয়ে মাছ ধরতে। তারা যখন ফিরবে, তখন তাদের সঙ্গেই ফিরে আসবে ওর বাপ তার দলবল নিয়ে। নাও ভরতি থাকবে মাছে।

বড়ো বড়ো ঢেউগুলো এখন যতই আছাড়িপিছাড়ি করুক না, তা পাড়ি দিয়েই ফিরে আসবে ওর বাপ। একথা জানে পঞ্চু। জানে বলেই না রোজ সকালে এসে দাঁড়ায় সাগরতীরে।

ওর মা কেন যে রাতে লুকিয়ে কাঁদে, তা বোঝে না পঞ্চু। ওর ঠাউরদা, যাকে পাঁচখানা গাঁয়ের জেলেরা মান্য করে, আপনি আজ্ঞে, কাকা জ্যাঠা বলে কথা বলে, সেই ঠাউরদা তো ওই সাগরের সব কথাই জানে। ঠাউরদাই তো ওকে বলেছে, 'আইবো, আইবো রে হিরু ফিইর্যা, দেহিস। তুই রোজ হক্কালে গিয়া সাগর তীরে খাড়াইয়া থাকিস।'

ঠাউরদা ওর সবার বড়ো। এতদিন বসে বসে শুধু হুঁকো টানত। ভুড়ুক ভুড়ুক করে। ঝড় থামতেই ঠাউরদাও ওর বৈঠ্যা কাঁধে তুলে নিয়ে সাগরের তীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভজনকাকাকে ডেকে বলেছিল, 'ভজইন্যারে, আজ থেইক্যা আমিও তগো লগে যামু।'

ভজনকাকা ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, 'কী যে কয়েন কাকা, আপনে যাইবেন ক্যান? আমরা নিচ্চয় করছি হক্কলেই কিছু কিছু হিস্যা ছাইড়া দিয়া আপনাগোরে দেখুম। আর আমাগো

পোনচু তো দ্যাখতে দ্যাখতে বড়ো হইয়্যা যাইবো। তখন ও নিজেই সাগরে যাইতে পারবো। কয়টা দিন সবুর করেন কাকা।'

সেকথা শোনেনি ওর ঠাউরদা। সেই থেকে রোজ যাবে সাগরে। একদিন পঞ্চু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ও ঠাউরদা, তুমি যে কইল্যা বাপে আমার ফিইর্যা আইবো, তা হ্যায় আয়ে না ক্যান? তুমি রোজ নাও ভাসাইয়া যাও, আরও একটু আগাইয়া গিয়া দেহ না ক্যান, কোন চড়ায় উঠছে আমার বাপ?'

বারো দিন আগে আকাশ অন্ধকার করে সাগরে তুফান উঠেছিল বিকালে। তুফানের মাস। হাঁক দিয়ে বাতাস ছেড়েছিল। পাহাড়প্রমাণ ঢেউ উঠেছিল সাগরে। তারপর দিক অন্ধকার করে নেমেছিল বৃষ্টি। ঠাউরদা মাথা নেড়ে বলেছিল, 'লক্ষণ ভালো বুঝি নারে হিরু, এ হইল কালাপানির তুফান, নাগাড়ে চলবো কয়টা দিন। আমি কই, কয়দিন আর সাগরে যাওনের কাম নাই রে। ঘরে বইয়া থাক। হগ্গলেরে খপর পাঠাইয়া দে।'

পঞ্চুর বাবা হিরু রাগ করে বলেছিল, 'ইডা তুমি কইলা কী? জানো, গত দুই দিন কারও জালে তেমন কিছু পড়ে নাই। ঘরে ঘরে অরন্ধন চলতাছে। বইয়া থাকলে গুষ্টিসুদ্ধু না খাইয়া মরুম।'

ঠাউরদা তবুও বলেছিল, 'মাছ মারা আপিসে গিয়া দেইখ্যা আয় তুফানের সিনগ্যাল দিছেনি? দিলে আর যাইস না বাপ। দু-দিন না খাইলে মানুষ মরে না।'

দু-দিন চুপচাপ বসেছিল সকলে তারপর কারও কথা শোনেনি পঞ্চুর বাপ। শোনেনি অন্য কোনো জেলে।

তুফান যখন থামল, এক-এক করে ফিরে এল সবাই। ফিরে এল না পঞ্চুর বাপ হিরু জেলে তার দলবল নিয়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাউরদা ওর বলেছিল, 'আইবো, ফিইর্যা আইবো, দেহিস।'

দূর আকাশের গায়ে কালো কালো বিন্দুগুলো দেখা গেল। পঞ্চু এক দুই করে গুনতে থাকল। নয় দল ভোর রাতে নাও ভাসিয়েছিল। ছ-টা কালো বিন্দু ও দেখতে পেয়েছে। ঠিক গুনেছে তো ও! এক দুই তিন ... পাঁচ সাত আট ... না না, এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়, ... ওই, ওই আর একটা, ওই আর একটা, ওই তো তার পিছনেই আর একটা। তার মানে তো সবগুলোই হল। এইবার ও বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই তাহলে ও আর একটা কালো বিন্দু দেখতে পাবে, কত দূর দেশ থেকে আসছে তারা, নাও বোঝাই মাছ নিয়ে! বিন্দুগুলো বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। একসময় সেগুলো নাও বলে বোঝা গেল। কিন্তু ওই, মাত্র ন-টা! ভিন দেশ থেকে নাওটা ওর আজও ফিরে এল না! একটা একটা করে তো দশটা দিন গেল!

বালিতে পায়ের আওয়াজ হতেই ও ফিরে তাকাল। যা ভেবেছে ও তাই। ফুটফুটি এসে দাঁড়াল ওর পাশে। বলল, 'গুনছসনি ঠিক কইর্যা রে পোনচু?'

পঞ্চু বলল, 'হ, গুনছি রে, ফুদবুদি, হ্যারায় আসে নাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফুটফুটি বলল, 'আইবো না, হ্যারায় কেউ। আর ফিরবো না রে পোনচু। তর ঠাউরদায় মিছা কথা কইছে। তুফানে নাও ডুবি হইয়া সক্কলে মইর্যা গেছে। তর বাপ, আমার বাপ, দুলার কাকায়, আর লখার দাদায়। হেই সঙ্গে গজাদাও ভাইস্যা গেছে। তার কেউ নাইরে কান্দনের।'

ভীষণ রাগে পঞ্চু বলল, 'মুখপুড়ি, তুই আইছস ক্যান এইহানে? কে তরে আইতে কইছে? ঘরে গিয়া তুই বইয়া বইয়া কাঁদ গিয়া। তরে তো আমি ডাকি নাই।'

ফুটফুটি একথা শুনেও জায়গা ছেড়ে নড়ল না। হাত তুলে এক এক করে সাগরের বুকের কালো বিন্দুগুলি আপন মনে গুনতে লাগল। 'এক, দুই, তিন ... তিন ... হ্যা রে পোনচু আজ কয়খান নাও ভাসছিল রে?'

গম্ভীর ভাবে পঞ্চু বলল, 'নয়খান।'

শুনে কেমন যেন ছটফট করে উঠল ফুটফুটি। শূন্যে হাত নেড়ে নেড়ে ও সাগর থেকে ফেরা কালো বিন্দুর মতো নৌকোগুলো গুনতে লাগল। একসময় প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'পোনচুরে, আমি জ্যান দেহি দশখান নাও ফিইর্যা আইতাছে!'

কেমন যেন করে উঠল পঞ্চুর বুকের মধ্যে। পরক্ষণেই মনে পড়ল ওর, ও আর ফুটফুটি দু-জনেই ভালো করে গুনতেই জানে না। কতর পর কত হলে যে দশ হয় তা আর তাহলে ফুটফুটি জানবে কী করে! তবুও ও ওর বুদ্ধি মতো ফের গুনতে চেষ্টা করল, এক দু ... আরে, দশখানাই তো! না, না, তিনের পর চার, কখনো কি পাঁচ হতে পারে! তাহলে ...! ও বলল, 'তরে লইয়া আর পারুম না রে ফুদবুদি, লিখা পড়া তো শিখলি না, নয়রে তাই দশ কইতাছস! তাকাইয়া দ্যাখ ভালো কইর্যা, কয়খান নাও আইতাছে।'

মুখটা ম্লান হয়ে গেল ফুটফুটির। যে আশা জেগেছিল ওর মনের কোণে, তা নিমেষে মুছে গেল। পঞ্চুর বাপের নৌকোতেই তো ওর বাপও ছিল। একজন ফিরলে তো অন্যজন ফিরবে! বলল, 'আমি তো হেই কথাডা জানিরে পোনচু। ত্যানেরা আর ফিইর্যা আইবো না রে। তর বাপ আর আমার বাপে। সাগরেই তাগো নিছে!'



'হ, হ, তুই না হগল কিছুই জাইন্যা বইসা আছস!' ভীষণ রাগে ভেংচি কেটে বলল পঞ্চু।

'আমার মায়ে কইছে। মায়ে তো শাখা ভাইঙ্গা ফেলাইছে। কপালে সিঁদুর মুইছ্যা ফেলাইছে। দাদারে কইছে, ঝড়-তুফান হইলে তরে আর আমি সাগরে যাইতে দিমু না। না খাইয়া মরুম, হ্যাও বালা।'

'আমার মায়েও রাইতে লুকাইয়া কান্দেরে ফুদবুদি।'

'তয়?'

'কিন্তু ঠাউরদায় যে কইছে।'

'হ্যায় তরে পোলাপান দেইখ্যা ভুলাইছে।'

‘মিথ্যা কইলে হ্যাসে পাপ অইবো না?’

‘এই মিথ্যায় পাপ নাইরে পোনচু।’

হঠাৎ আবার ভীষণ রাগে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু। বলল, ‘তুই চইল্যা যা এইহান থিক্যা। অলক্ষ্মী মুখপুড়ি, তুই সব জাইন্যা বইস্যা আছস! যাঃ, যাঃ গেলি, তর লগে আড়ি, আড়ি।’

‘ক্যান রাগ করস। আমি ঠিকই কইছিরে পোনচু।’

‘তরে না দূর হইয়া যাইতে কইলাম। তর লগে আড়ি কইলাম না? তর লগে আর আমি কথা কমু না। চইল্যা যা তুই।’

করুণ মুখে ফুটফুটি তাকিয়ে রইল পঞ্চুর দিকে। চলে গেল না ও! ও তো জানে পঞ্চুর মনে কত দুঃখ। তা ছাড়া পঞ্চু তো ওর থেকে ছোটো। ছোটোরা সব কিছুই বুঝতে চায় না। ওর দাদা তো বলেছে, ‘ঠাউরদার হগল কথাই মিছা। হিরুকাকার নাও তুফানে ডুবছেরে ফুদবুদি। সাগরের কূলকিনারা নাইরে, তার মাঝে চড়া আইবো কোথা থিক্যা? হিরুকাকার নাওয়ের লগে আমাগো বাপও ডুবছেরে, আর ফিইর্যা আইবো না রে কোনোদিন।’ ওর দাদা আরও বলেছে, ‘এহন আমি যামু সাগরে মাচ মারতে, আমি ডুবলে তরা না খাইয়া মরবি।’

ফুটফুটির তাই ভীষণ ভয়। রোজ ভোর রাতে ওর দাদা যখন ঘুম থেকে ওঠে, মা পান্তা আর লঙ্কা এগিয়ে দেয় তাকে, ওরও তখন ঘুম ভেঙে যায়। ও উঠে বসে। ওর দাদা পান্তা গিলতে গিলতে বলে, ‘তয় উঠলি ক্যান? হুইয়্যা পর, হুইয়্যা পর। রাইত অনেক বাকি।’

মা ওর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ‘অর নি বড়ো ডররে ন্যাপলা, বাপেরে সাগরে খাইছে, ভাইরে না খায়। আমারে কথা দে ন্যাপলা, সাগরের হাল ব্যাহাল দ্যাখলে ফিইর্যা আইবি। উপাস দিমু সেও বালা। তরে আর হারাইতে পারুম না।’

হা-হা করে হাসে নেপাল। ওর মুখের ভাত ছিটকে পড়তে থাকে! ঢোক গিলে ও বলে, ‘কী যে কও তার ঠিক নাই। হগ্গলেরই পরাণের ডর আছে না? বেহাল দ্যাখলে কে যাইবো কও সাগরে?’

পান্তা খেয়ে উঠে পড়ে নেপাল। ও জানে, মাছমারাদের ঘরে সব সময়ই সব কিছু বাড়ন্ত। ঝড়-তুফান কি আর তাদের ঘরে আটকে রাখতে পারে! বার হয়ে পড়ে ও।

ফুটফুটি ওর দাদার যাবার পথের দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকে। ঠিক কিছু ও ভাবতে পারে না। দু-চোখে ওর তখন রাজ্যের ঘুম। মা কুঁড়ের দোর বন্ধ করে, লম্ফ নিবিয়ে ফের এসে ওর পাশে শুয়ে পড়ে। ঘুম-জড়ানো চোখে হাই তুলে আপন মনেই বলে, ‘বদর বদর।’

যেদিন পারে ফুটফুটিও বলে, ‘বদর বদর।’ ওতে নাকি সাগরে যারা যায় তাদের ভালো হয়।

ছাই হয়। ঝড়ের রাতে ওর বাবা যখন বার হচ্ছিল, মা কত মানা করেছিল। দাদা বলেছিল, ‘আজ আর যাওনের কাম নাই, ঘরে যা আছে তাতেই চইল্যা যাইবো।’ বাবা তখন ওর সে কথা শোনেনি। তখন মা তো দু-হাত ঠেকিয়ে জোরে জোরে চেঁচিয়ে বলেছিল, ‘বদর বদর।’ কিন্তু বাবা আর ওর ফিরে আসেনি!

ঘুম ভাঙলেই ফুটফুটির মনে পড়ে যায় ওর দাদার কথা। দাদা ওর সাগরে গেছে। ও ধড়মড় করে উঠে বসে। আকাশের দিকে তাকায়। আপন মনে বলে বদর বদর। তারপর পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় সাগর তীরে। ও জানে, ওর আগেই পঞ্চু এসে দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে। ফুটফুটি আসে ওর দাদার জন্য, কিন্তু বোকা ছেলেটা এখনও আসে বাপের খোঁজে। বড়ো ছোট্ট ও তো, এখনও তাই বোঝে না কিছুই। আ হা রে!

নৌকোগুলো স্পষ্ট দেখা গেল। বড়ো বড়ো ঢেউয়ের মাথায় নাচছে। মানুষজন চেনা যাচ্ছে না। দাঁড় পড়ছে ঘন ঘন। একসময় রোদে জলে পোড়া কালো কালো মানুষগুলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল। ফুটফুটি দেখতে পেল তার দাদাকে। ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। খুশিতে ও বলল, 'চল পোনচু আমরা শোচিনকত্তার কাছে গিয়ে জিগাই। হ্যার কাছে নি কোনো খপর আইছে। হ্যায় মানুষটা বালা। টেলিফোক কইর্যা চারিদিকে খপর লইবো অনে, চল, যাবি?'

ঠাউরদার নৌকোর দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থেকে পঞ্চু বলল, 'যামু। আগে ঠাউরদার লগে বোঝাপড়া কইর্যা লই। হ্যায় ক্যান মিছা কথা কয়।'

অবাক ফুটফুটি বলল, 'কী কইলি! তর পেত্যয় অইছে!'

একথার কোনো উত্তর দিল না পঞ্চু। কী-ই-বা ওর বয়স। ও বোঝেই-বা কী। ওর বাবাকে ও ফিরে পেতে চায়। ও যে জানে, ওর বাবা ছিল বড়ো মাঝি। সেই কাটাকাটি মারামারির পর দেশ ছেড়ে এ দেশে এসে, ওর বাবাই তো ঠাউরদার সঙ্গে মিলে প্রথমে সাগরে নাও ভাসায়। তারপরই না এক-এক করে অন্য সবাই এসেছে এখানে। ওর বাবা ঝড়-তুফান পাড়ি দিতে না পারলে কীসের বড়ো।

নৌকোগুলো পাড়ে ভিড়ল এক-এক করে। ভেড়ার আগেই গাঁয়ের সবাই ভেঙে পড়ল সেখানে। এগিয়ে এল পাইকার আর ব্যাপারীরা। এক-এক নাওয়ের বড়ো মাঝি একাই দরদাম নিয়ে মাথা গরম করে। অন্যরা তখন জাল গোটায়, মাছ ভাগ করে। শেষমেষ নৌকো ঠেলে পাড়ে তোলে। যাতে জোয়ারে ফের না ভেসে যেতে পারে ওগুলো। এসব কাজ হয়ে গেলে বিড়ি ফোঁকে।

পঞ্চুর ঠাউরদা তো আর বড়ো মাঝি নয়। অন্যর নাওয়ে জন খাটা জেলে। বয়স অনেক, তাই কেউ আর ওকে নৌকো ঠেলতে বলে না। মাছ ভাগ শেষ হলেই ও বিড়ি টানতে টানতে উঠে আসে নাতির কাছে। নাতি কিছু বলার আগেই বলে, 'আজও পাই নাইরে পনচা। চড়ায় নাইম্যা এইদিক-ওইদিক কত খুজছি। আমি যহন এই পাশে যাই হ্যায় তহন ওই পাশে। বুঝলি, খপর নিচ্চয় পাইছে। আইয়া পড়ল বইল্যা। কয়ডা দিন আরও সবুর কর।'

ঠাউরদার একটা হাত ধরে টানতে লাগল পঞ্চু। বলল, 'পিথিমির শ্যাষ আছে, সাগরের শ্যাষ নাই। বাপে আমার আর ফিরবো না। আমি এহন বুঝছি। ক্যান তুমি আমারে মিছা কইলা, কও, ক্যান এতগুলান মিছা কইলা, আমার দুস্কু হয় না?' কথাগুলো চাপা কান্নায় ভারী হয়ে গেল। ঠাউরদার হাত ধরে ও ঝাঁকাতে লাগল। দু-চোখ ওর জলে টলটল করে উঠল।

আশেপাশের সবাই থমকে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। এমন ঘটনা তো ওদের জীবনে কত বারই ঘটেছে। তবুও ওরা এমন করেই থমকে যায় প্রতিবার।

হর্ষনাথ এগিয়ে এসে খপ করে পঞ্চুকে কাঁধে তুলে নিল। অবিনাশ তার পিছনে হাত তালি দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে খেঁদি নাকি সুরে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, এত বড়ডা হইছস, এহনও

তর চক্ষুতে জল আহে! লজ্জা করে না তর! আজ বাদে কাল না সাগরে যাবি আমাগো লগে?'

ঠাউরদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কাইন্দা করবি কী? কাইন্দা ভাসাইলে আইবো নাকি হ্যায় ফিইর্যা? হইত্য মিথ্যার বুঝস কী তুই? যা কইছি, কইছি। পেত্যয় না অইলে আমার তো আর করনের কিছু নাই।'

অবাক হল পঞ্চু, ঠাউরদার এমন রাগ দেখে। ঠাউরদা তো কখনো রাগ করে না।

ও তড়বড় করে হর্ষনাথের কাঁধ থেকে নেমে পড়ল। চোখের জল মুছল না। ঠাউরদার দিকে মুখ করে বলল, 'এই আমি তোমারে কইত্যাছি, আমি ইহ জীবনে সাগর যামু না, যামু না, যামু না। না খাইয়া মইর্যা যামু, তবুও যামু না।' টপ টপ করে দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ল ওর দু-চোখ থেকে। ওখান থেকে ছুটে চলে যাবার আগে শেষ বারের মতো চেঁচিয়ে বলে গেল, 'বুড়া হইছে, হ্যায় তবুও মিছা কয়। কইল ফিইর্যা আইবো। মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী।' যে দিকে দু-চোখ যায় ও চলতে লাগল।

ফুটফুটিও ছুটল ওর পিছন পিছন। ছুটে কাছে গিয়ে বলল, 'শোচিনকত্তার কাছে যাইবি না? হ্যায় কিন্তুক অনেক খপর রাহে। চল যাই গা তার কাছে।'

পঞ্চু ভীষণ রাগে ওর দিকে ফিরে বলল, 'মুখপুড়ি, আইতাছস ক্যান আমার লগে? আমি কোথাও যামু না।'

তবুও ফুটফুটি বলল, 'চোখের জল মুইছ্যা ফেলারে পোনচু, ওই দিকে যাইস না। এই দিক দিয়া গেলে না সিধা অইবো। শোচিনকত্তায় মানুষটা বালা। হ্যার মনে দয়ামায়া আছে। চল, তার কাছে যাই।'

শচীন ব্যানার্জি ফিশারি অফিসার। পাকা রাস্তার ধারে পাকা দালানে তার অফিস। তারই এক পাশে তার পাকা কোয়ার্টার। মানুষ সত্যিই ভালো। জেলেদের সত্যিকারের বন্ধু।

এ দেশের সব কিছু চলে সরকারের সুবিধার জন্য। আর মন্ত্রীরাই তো সরকার, কিন্তু তারা তো আর মাছ ধরা জেলে নয়। তাই জেলেদের যখন যা দরকার তার উলটো জিনিসের আইন পাশ হয়। তারই মাঝে শচীনকর্তা যা পারেন তা করেন প্রাণপণ। সবাই তাই ওঁকে মান্য করে, ভালোবাসে। বিপদে-আপদে ওঁরই কাছে ছুটে আসে বুদ্ধি পরামর্শ নিতে। জেলেপাড়ার ছেলে-মেয়ে বাচ্চা-বুড়ো সবাই এ কথা জানে। জানে, খাঁটি বেরাম্ভন মানুষটা সবার ছোঁওয়া জল খায়! ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ জ্ঞান নেই তাঁর।

বড়ো ফটকের পাশেই নাজির দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ই হল অফিসের আর্দালি। পঞ্চু আর ফুটফুটিকে দেখেই বলল, 'কে তোরা রে? কী মনে করে?'

ফুটফুটি বলল, 'আমরা শোচিনকত্তার কাছে যামু নাজিরচাচা।'

'কেন? কী তোদের দরকার?'

'তুমি তো শুনছ, অর বাপ আর আমার বাপ একই নাওয়ে ভাইস্যা গেছে। আর ফিরস্ত আসে নাই।'

নাজির স্থানীয় লোক। একটু ঝুঁকে দেখে বলল, 'তুই ফুদবুদি, অর ওই বুঝি পোনচু?'

'হ। ঠিকই কইছ চাচা।' বলল ফুটফুটি, 'শোচিনকত্তায় উঠছেন নি?'

'না রে, সাহেব এখনও ওঠেনি। তোরা পরে আয়। সাহেব তোদের অনেক খপর দেবে। বাড়ির লোকদের আসতে বল গিয়ে। বুঝলি? তোরা না এলে, আমিই যেতাম ডাকতে।'

বড়ো বড়ো চোখ করে ফুটফুটি বলল, 'কী কইল্যা নাজিরচাচা? শোচিনকত্তায় খপর দিব নি? কীসের খপর? পোনচুর ঠাউরদায় বুঝি মিছা কয় নাই?'

নাজির বলল, 'আহা, এখনই অমন করছিস কেন? আয় আয়, কিছুক্ষণ পরে বাড়ির সবাইকে নিয়ে। ক-দিন ধরে সাহেব তো সারা দিন আর মাঝ রাত পর্যন্ত দূরে দূরে অনেক জায়গায় শুধু ফোনই করছেন। নিখোঁজ নৌকোর খোঁজে। দেখ, এখন কী খপ্পর দেন উনি।'

তখনই কোয়ার্টারের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মাঝবয়সি একজন মানুষ। চেঁচিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাজির, ওখানে কে?'

নাজির খুশি হয়ে বলল, 'ওই তো সাহেব উঠেছেন। যা, যা, তোরা যা, দেখ কী বলেন।'

বড়ো বড়ো পা ফেলে দু-জনে গিয়ে দাঁড়াল বারান্দার সামনে। শচীনকর্তা ঝুঁকে পড়ে দেখে বললেন, 'উঠে আয় উপরে। কী নাম, তোদের বল।'

'আইজ্ঞা আমার নাম, ফুদবুদি।' বলল ফুটফুটি, 'আর অ অইলো গিয়া আমাগো পোনচু।'

'কেন এসেছিস এখানে?'

'ওই যে নাও ভাইস্যা গেছে, আপনে তো জানেন হগল কথা। ওই নাওয়ে ছিল অর বাপ আমার বাপে। আরও কয়জন, আপনে নাকি খপর দিবেন।'

একথা শুনে করুণ হয়ে উঠল শচীনকর্তার মুখ। আবারও বললেন, 'আয় উঠে আয় উপরে কী খবর চাস তোরা? বাড়ির কেউ আসেনি কেন?'

পঞ্চু কথা বলতে পারে না তেমন। তাই ফুটফুটিই বলল, 'আইবো ক্যামনে? আমার দাদায় আর অর ঠাউরদায় তো রোজই সাগরে যায় মাছ ধরতে। ফিরনের পর তাগোর আর নড়নের ক্ষমতা থাকে না। হেই কারণেই তো আমরা দুয়োজনে আইছি। কী খপর আছে কন।'

'ও গস!' কেমন করে যেন বললেন শচীনকর্তা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, 'ঝড়ের দিন থেকে আমি চুপ করে বসে নেই রে। ফোনে রোজ সব জায়গায় যোগাযোগ করছি। মেদিনীপুরে ওরা পৌঁছোয়নি। কাল রাতে জানতে পারলাম, ওড়িশার কোস্টেও তারা পৌঁছোয়নি। এখন বাকি তামিলনাড়ু। সে বড়ো দূরের পথ রে। আমি ব্যবস্থা করেছি সমুদ্রপথে যত জাহাজ যাবে তারাও সবাই চারদিকে নজর রাখবে। হোম ডিপার্টমেন্টকে বলেছি শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এতগুলো দিন কেটে গেল, এখনও কোনো খবর এল না, এখন দেখ শেষ পর্যন্ত কী হয়। দশ-দশটা দিন তো কম কথা নয়।' এত কথা বলে শচীন কর্তার মনে হল, এত ছোট্ট ছেলে-মেয়ে দুটো এ সব কথার সঠিক মানে বুঝতে পারল তো? গভীর ভাবে নিশ্বাস ছাড়লেন উনি।

বেশ রাগই হল পঞ্চুর। ও আর তাই চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, 'কী যে কইলেন আপনে আমি বুঝি নাই। ফিরবেনি আমার বাপে আর অর বাপে? হেই কথাডা সহজ কইর্যা বলেন। ইনজিরি আমি বুঝি না।'

ফুটফুটিও রাগ করেই বলল, 'এত খপর লইলেন আপনে, কিন্তুক আপনে তো তাগোর নামই জানেন না! তা অইলে বুঝবেন ক্যামন কইর্যা কে হারাইলো, কে আইলো না ফিইর্যা।'

ভীষণ দুঃখে শচীনকর্তা বললেন, 'শোন, শোন, তোরা বাড়ি যা, গিয়ে বড়ো কাউকে পাঠিয়ে দে। তারা বুঝতে পারবে আমি কী বলতে চাইছি। তোরা তো বড্ড ছোটো রে।'

ফুটফুটি ভীষণ রাগ করে বলল, 'আমরা আর ছোট্টো নাই। আমার দশ অইছে, পোনচুর সাত। আপনে ফের কইর্যা কয়েন কী কইলেন। আমরা বুঝুম।'

ঠিক তখনই বড়ো ফটকের সামনে পঞ্চুর ঠাউরদা আর ফুটফুটির দাদাকে দেখা গেল। ওরা হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকল। কাছে এসে দু-জনেই ঝুঁকে হাত জোড় করে শচীনকর্তাকে প্রণাম জানাল।

ওদের দেখে শচীনকর্তা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী, কী চাও তোমরা? কী করতে আর এসেছ? আমার কোন কথাটা তোমরা শোন, শুনি? যা যখন বলব, তার উলটো করবে। এখন এই বাচ্চা দুটোকে কী বলে বোঝাবে বল? আমি বারবার বলছিলাম না, আবহাওয়া ভীষণ হবে। নৌকো বার কোরো না। শুনেছিলে সে কথা তোমরা কেউ? তবে?'

পঞ্চুর ঠাউরদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আইজ্ঞা কর্তায় আমরা অগোরে লইয়া যাইতে আইছি। দুয়োজনায় রাগ কইর্যা আইছে আপনার কাছে। আপনেরে বুঝি জ্বালাইতে ছিল?'

শচীনকর্তা কিছু বলার আগেই ফুটফুটির দাদা বলল, 'তুই আইছস ক্যানরে ফুদবুদি? তরে তো কইছি আমি, নাও তুফানে ডুবছে। তারা হঙ্গলে মরছে। আর তো ফেরনের কথা নাই। পোনচু না হইল পোলাপান, অবুঝ, তুই তো বড়ো হইছস।'

পঞ্চু ভীষণ রাগ করে বলল, 'তোমরা চইল্যা যাও ঠাউরদা। আমি আর ফুদবুদি যামু না। কত্তায় আমাগো কথা বুঝাইবেন। না বুইঝ্যা আমি যামু না।'

শচীনকর্তা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক কথা আছে। তোমরা দু-দণ্ড শান্ত হয়ে বসো। কী যে হয়েছে তা তো বুঝতেই পারছ? তবুও আমার পক্ষে যা যা করা দরকার তা আমি করেছি। এখন দেখো মিরাকেল ঘটে কি না।'

সব কথাই আবার উনি ওদের খুলে বললেন!

সব কথা শুনে পঞ্চুর ঠাউরদা আবার ঝুঁকে হাত জোড় করে প্রণাম জানাল শচীনকর্তাকে। বলল, 'আপনে দ্যাবতা। এ্যাহন আমাদের বরাত। দশ-দশটা দিন কাইট্যা গেছে ... আর কি আইতে পারবো তারা?'

জোর করেই দু-জনকে টেনে নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরল। সারাদিন ঝোপজঙ্গল আর বালিয়াড়িতে ঘুরে বেড়াল পঞ্চু। একবার কাঁকড়ার পিছনে তাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর রোদের তেজ কমতেই আবার গিয়ে বসল সমুদ্রের ধারে। বড়ো বড়ো ঢেউগুলো সমানে এসে আছড়ে পড়ছে তীরে। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে ফেনায় ভরে যাচ্ছে তীরে। ওই ঢেউগুলোর উপর দিয়েই ও তাকাল দূরের দিকে, আকাশটা ঠিক যেখানে হেলে পড়েছে সাগরের বুকে, ওখানে ওই জায়গা থেকেও অনেক অনেক দূরে কোথাও কি ডাঙা আছে? চড়া আছে? থাকলে তো ওর বাপ নাও ভাসিয়ে ফিরে আসবে। ফিরে আসবে অন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়েই। কিন্তু যদি ডাঙা না থাকে, না থাকে কোনো চড়া, তাহলে? না, না, না, তা কখনোই হতে পারে না। যে যাই বলুক না কেন, ওর বাপ ঠিক ফিরে আসবে, সেই দূরের চড়া থেকে নাও ভাসিয়ে, ঢেউয়ের বুকে নাচতে নাচতে, ভেসে আসবে নাওটা তীরের দিকে! উঃ কত বড়ো বড়ো ঢেউ আজ। আজও কি সাগর আবার খেপে উঠবে? উঠুক, না উঠুক, আর তাকিয়ে থাকতে পারছে না পঞ্চু। কী হবে তাকিয়ে থেকে আর?

ফুটফুটিও আসবে না আর ওর পাশে এসে দাঁড়াতে। আজ তো জানতে পেরেছে পঞ্চু, এই সাগরের শেষ নেই। দু-হাতে মুখ ঢেকে ও আপন মনেই কেঁদে ফেলল।

পিছনে পায়ের আওয়াজ হতেই ও চোখ না মুছেই বলল, 'ফের ক্যান তুই আইলি রে ফুদবুদি? আর এইহানে খাড়াইয়া থাইক্যা কী অইবো? আমিও আর আসুম না দেহিস।'

ফুটফুটি শান্ত ভাবে বলল, 'শোচিনকত্তায় কী কী কইলেন, বুঝছস তার কিছু? বুঝস নাই বুঝি? কয়ডা দ্যাশের নাম কন নাই ত্যানে?'

চমকে উঠল পঞ্চু। হ্যাঁ তাইতো কী যেন সব দেশের কথা উনি বলছিলেন! তাহলে কি সেই সব দেশ থেকেও ওর বাপ ফিরে আসতে পারে! এমন কত গল্পই না ও শুনেছে সেই ছোট্টবেলা থেকে। রাজপুত্তুর আর সওদাগর পুত্তুরদের কথা! মহা উৎসাহে ও প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'হ: ওই হগল দ্যাশের কথা তো ভাবি নাই ফুদবুদি! তা অইলে বাপে আমার ফিইর্যা আইবোরে নাও চইড়্যা, ওই যে ওই হকল দ্যাশের থেইক্যাই আইবো দেহিস। শোচিন কত্তায়নি তাই কইলেন।'

ফুটফুটি ওর পাশে বসে পড়ে বলল, 'বড়ো বড়ো ঢেউ দেখতাছস না? আজ রাইতে ফ্যার তুফান আইবোরে পোনচু! আমার মন কইতাছে!'

'না, না,' চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু, 'মুখপুড়ি অলক্ষুইন্যা, তুফান হইবো না। ককখনো হইবো না। তরে আমি মারুম, হ, মারুম।'

ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ফুটফুটি বলল, 'মার, মার, আমারে তুই মার। তুফান আমিও চাইনারে পোনচু। তর বাপে আইলে তো আমার বাপেও আইবো রে। বড়ো বড়ো ঢেউগুলানের উপর দিয়া নাও ভাসাইয়া আইবো। বদর বদর হাঁক দিবো হক্কলে! তরে কোলে নিব তর বাপে, আমারে আমার! সে বড়ো মজা হইতো রে পোনচু। কিন্তুক শোচিনকত্তায় যে কী কইছে তাতো তুই বুঝস নাই।'

পঞ্চু তেমনি রাগ করেই বলল, 'চুপ যা, চুপ যা। আমি কিছু বুঝবার চাই না। ফের কথা কইবি তো তরে হত্যই মারুম।'

ফুটফুটি আর কিছুই বলল না। ওর মতোই সামনের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

তখনই পঞ্চুর মনে পড়ল, ঠাউরদা ওর শোচিনকত্তার কাছ থেকে ফিরেই মাকে যেন কী বলল! শুনে মা ওর কাঁদতে লাগল। ঠাউরদা তবুও বলেছিল, 'আর কেন বউমা, হাতের শাখা ভাইঙা ফেলাও।' এ কথা শুনে আর পঞ্চু সেখানে দাঁড়ায়নি। যে যাই বলুক না কেন, ও মানবে না, বিশ্বাস করবে না। কখনো ভাববে না ওর বাপ সাগরে হারিয়ে গেছে! সেই থেকেই পঞ্চু একা একা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে তীরে। বড়ো ঢেউ, ছোটো ঢেউ, কত কত ঢেউ! সেই ঢেউয়ের উপর দিয়ে দূরের দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে রইল পঞ্চু। কোথাও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। না দেখা যাক, পঞ্চু রোজ আসবে। রোজ এসে বসে থাকবে সাগর তীরে। যত দিনে না ওর বাপ ফিরে আসে। দু-চোখ জ্বালা করে বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল ঝরে পড়ল ওর দু-চোখ থেকে। ও মোছার চেষ্টাও করল না। বাপ কি আর ওর ফিরে আসবে সত্যিই কোনোদিন!

ওর দিকে তাকিয়ে ফুটফুটি করুণ ভাবে বলল, 'পোনচু বাই, উইঠ্যা পর। মিছামিছি বইয়্যা থাকলে কী অইবো!'

দু-জনেই উঠে পড়ল। পায়ে পায়ে কুঁড়েগুলোর কাছে পৌঁছে যে যার কুঁড়ের দিকে চলে গেল। কারও মুখে তখন আর কোনো কথা ছিল না।

রাতে ঠাউরদা পঞ্চুকে বুকের মাঝে জড়িয়ে শুলো। কথা কিছুই বলল না। শুধু বার কতক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন যেন পঞ্চুর দু-চোখ জ্বালা করে ফের জল এল। ও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বুড়ো ঠাউরদাও কান্নাভরা গলায় বলল, 'কান্দে না, কান্দে না, কাইন্দা আর কী করবি রে পোনচু। কান্দনের কী আর আছে।'

তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল পঞ্চু। গভীর ঘুমে স্বপ্ন দেখল কি দেখল না। এ-পাশ ও-পাশ করল না। কিন্তু হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠল ও। বাইরে বাতাস ডাকতে আরম্ভ করেছে। দূর সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউগুলো যে তীরে আছড়ে পড়ছে তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। না তা শুধু নয়। সে সব শব্দ ছাপিয়ে কে যেন পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে 'কই হে, কই হে, কেউ কোথাও আছ নাকি জেগে? আছ কেউ কোথাও? শোনো শোনো, বাইরে এসো তাড়াতাড়ি।'

শোচিনকত্তার গলা। ঠাউরদা উঠে পড়ল ধড়ফড় করে। মা লম্ফ জ্বালল। কুঁড়ের ঝাঁপ খুলতেই দমকা বাতাসে লম্ফ নিভে গেল। দরজায় ছায়া পড়ল মানুষের।

সে বলল, 'এটা কার ঘর গো?'

ঠাউরদা উত্তর দিল, 'আইজ্ঞা হিরু জেইল্যার, তারে সাগরে নিছে, দশ দিন আগে।'

'না, না, না,' চেঁচিয়ে উঠলেন শচীন কর্তা। হুড়মুড় করে কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে বললেন, 'কী অন্ধকার বাপরে! হিরু মরেনি। ওর দলের কেউই মরেনি। এই তো কিছুক্ষণ আগেই আমার এক বন্ধুর ফোন এল। সেও ফিশারিতে কাজ করে। কোকোনদ জানো কোথায়? জানো না! ওরা ভাসতে ভাসতে সেখানে পৌঁছেছে নয় দিনের মাথায়। না জল, না খাবার ছিল সঙ্গে। বেজায় তাই কাহিল হয়ে পড়েছে। ও দেশের সরকার তাদের হাসপাতালে দিয়েছে। আজই সুস্থ হয়ে প্রথম কথা বলেছে। ডাক্তার ছাড়লেই ওরা দেশের দিকে রওনা হবে। ও দেশের সরকারই ওদের ট্রেনে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। ওঃ ভালো কথা, কাল ভোরে কেউ কিন্তু সাগরে যাবে না। আবার ডিপ্রেসন হয়েছে। ঝড় তো প্রায় এসেই গিয়েছে। কই সেই ছেলেটা আর মেয়েটা কই। ওরে কোথায় গেলি তোরা?'

কুঁড়ে ততক্ষণে লোক ভরে গেছে। কোথায় যেন কারা আবার শাঁখে ফুঁ দিল। লম্ফটা শাঁখে আড়াল করে জ্বালাল পঞ্চুর মা। আলোয় দেখা গেল বড়ো বড়ো চোখ করে সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফুটফুটি। সে দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে পঞ্চু বলল, 'আইছস লক্ষ্মীছাড়ি, তরে আমি মারুম। না, নারে ফুদবুদি, তর কথাই ঠিক। তেনেরা ঢেউ পাড়ি দিয়া আইবো না রে। আইবো টেরেনে চইড়্যা। শোচিনকত্তাই কইলেন।'

*বৈশাখ* ১৩৯৬




# শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধকারী মলম আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে পৃথিবীতে নানারকম উড়ান যন্ত্র আবিষ্কারের একটা খুব হিড়িক পড়ে গেছে। কেউ ডাইনিদের বাহন ডান্ডাওলা ঝাঁটার মতো, কেউ নারদের ঢেঁকির মতো, কেউ কার্পেটের মতো, কেউ কার্তিকের বাহন ময়ূরের মতো উড়ান যন্ত্র আবিষ্কার করে তাতে চড়ে বিষয়কর্মে যাতায়াত করছে। আকাশে তাই সবসময়েই নানারকম জিনিস উড়তে দেখা যায়। এমনকী কৃত্রিম পাখনাওলা মানুষকেও।

সালটা ৩৫৮৯। ইতিমধ্যে চাঁদ, মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে মানুষ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে, সূর্যের আরও দু-টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জানা গেছে আর কোনো গ্রহ নেই, মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাজার হাজার মানুষ আলোর চেয়েও গতিবেগসম্পন্ন মহাকাশযানে রওনা হয়ে গেছে এক-দেড়-শো বছর আগে থেকে এবং এখনও অনেকে যাচ্ছে। কাছেপিঠে যারা গেছে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। তবে সেটা এক মিনিট পর না এক-শো বছর পর তা জানবার উপায় নেই। তা বলে পৃথিবীর মানুষেরা হাল ছাড়েনি। সেই এক-দেড়-শো বছর আগে যারা জন্মেছিল তারা সকলেই সশরীরে বর্তমান। আজকাল পৃথিবীতে মানুষ মরে না। যারা মহাকাশে গেছে তারা ফিরে এসে সেই আমলের লোকেদের দেখতে পাবে। তবে সব মানুষই বেঁচে আছে বলে নতুন মানুষের জন্মও আর হচ্ছে না। গত দেড়-শো বছরের মধ্যে কেউ পৃথিবীতে শিশুর কান্না শোনেনি।

এদিকে ঘরে ঘরে মানুষ এত বেশি বিজ্ঞান নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে যে, প্রতিঘরের প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো চর্চাই নেই। কবিতা, গান, ছবি আঁকা, কথাসাহিত্য, নাটক, সিনেমা এসব নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না। খামোখা সময় নষ্ট।

খেলাধুলোর পাটও চুকে গেছে। অলিম্পিক উঠে গেছে। বিশ্বকাপ বিলুপ্ত। আছে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান। পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে, কোকিলের ডাক শুনলে বা পলাশ ফুল ফুটলে কেউ আর আহা উহু করে না। বর্ষাকালের বৃষ্টি দেখলে কারও মন আর মেদুর হয় না! ওগুলোকে প্রাকৃতিক কার্যকারণ হিসেবেই দেখা হয়! গোলাপ ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার অ্যানালাইসিসটাই বেশি জরুরি। দয়া মায়া করুণা ভালোবাসা ইত্যাদিরও প্রয়োজন না থাকায় এবং চর্চার অভাবে মানুষের মনে আর ওসবের উদ্রেক হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য এক-আধজন আছে। যেমন পাগলা গণেশ। পাগলা গণেশের বয়স দু-শো বছর। পঞ্চাশ বছর বয়সে, অর্থাৎ আজ থেকে দেড়-শো বছর আগে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়। গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল। ফলে তার মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেল। দেড়-শো বছর আগে যখন সুকুমার শিল্পবিরোধী আন্দোলন শুরু হল এবং শিল্প সংগীত সাহিত্য ইত্যাদির পাট উঠে যেতে লাগল তখন গণেশের ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তা ছাড়া বিজ্ঞানের বাড়াবাড়িরও একটা সীমা থাকা দরকার বলে তার মনে হল। গণেশ

অনেক চেষ্টা করে যখন দেখল কালের চাকার গতি উলটোদিকে ফেরানো যাবে না তখন সে সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকার জন্য হিমালয়ের একটি গিরিগুহায় আশ্রয় নিল।

তা বলে হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা তা নয়। এভারেস্টের চূড়া চেঁছে অবজার্ভেটরি হয়েছে, রূপকুণ্ডে বায়োকেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি, কে টু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী, মানস সরোবর সর্বত্রই নানা ধরনের গবেষণাগার। সমুদ্রের তলাতেও চলছে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অর্থাৎ ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে এবং অন্তরীক্ষে কোথাও নিপাট নির্জনতা নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। কিন্তু তারা সমস্ত পৃথিবীতে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, নির্জনতা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ।

এই তো আজ সকাল থেকে গণেশ বসে কবিতা লিখছে। একটু আগে একটা ঢেঁকি আর একটা ভেলায় চড়ে দুটো লোক এসে বলল, 'এই যে গণেশবাবু, কী করছেন?'

'কবিতা লিখছি।'

'কবিতা? হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ! তা আপনার কবিতা শুনছেই বা কে আর পড়ছেই বা কে?'

'আকাশ শুনছে, বাতাস শুনছে, প্রকৃতি শুনছে। কবিতার পাতা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যদি কেউ কুড়িয়ে পায় আর পড়তে ইচ্ছে হয় তো পড়বে।'

'হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!'

ক-দিন আগে সন্ধ্যে বেলা গণেশ একদিন গলা ছেড়ে গান গাইছিল। তার গানের গলা বেশ ভালোই।

হঠাৎ দুটো পাখাওলা লোক লাসা থেকে ইসলামাবাদ যেতে যেতে নেমে এসে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, 'ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?'

'শব্দ কী! এ যে গান!'

'গান! ওকেই কি গান বলে নাকি! ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ!'

একদিন পাহাড়ের গায়ে যান্ত্রিক বাটালি দিয়ে পাথর কেটে ছবি আঁকছিল গণেশ। হঠাৎ একটা ধামা নেমে এল। এক মহিলা খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে চলেন, 'এটা কীসের সার্কিট ডিজাইন বলুন তো! বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে!'

'ডিজাইন নয়, ছবি! খেয়ালখুশির ছবি।'

ভদ্রমহিলা চোখের পলক না ফেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই! ছবি হচ্ছে! হুঁঃ!'

গণেশ জানে, একা সে পৃথিবীর গতি কিছুতেই উলটে দিতে পারবে না। কিন্তু একা বসে বসে যে নিজের মনের মতো কিছু করবে তারও উপায় নেই। এই মৃত্যুহীন জীবন, এই অন্তহীন আয়ু কি এভাবেই যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হবে? সুইসাইড করে কোনো লাভ নেই। আজকাল মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা শক্ত কাজ তো নয়ই, বরং পৃথিবীর জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখতে তা করা আবশ্যিক।

গণেশের তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড়ো ছেলের বয়স এক-শো চুয়াত্তর বছর, মেজোর এক-শো একাত্তর, ছোটো ছেলের এক-শো আটষট্টি এবং মেয়ের বয়স এক-শো ছেষট্টি। প্রত্যেকেই কৃতী বিজ্ঞানী। তারা অবশ্য বাপের কাছে আসে না। অন্তত গত এক-শো বছরের মধ্যে নয়। গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে। গণেশের স্ত্রী ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশ

গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন, দেড়-শো বছর আগে তিনি অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জে রওনা হয়ে যান। এখনও ফেরেননি।

আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে। কবিতা লিখছে আর ভাসিয়ে দিচ্ছে বাতাসে। কবিতার কাগজগুলো বাতাসে কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে, পাক খাচ্ছে, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। প্রতিদিন যত কবিতা লিখেছে গণেশ সবই এইভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে। যদি কারও কাছে পৌঁছোয়, যদি কেউ পড়ে।

আকাশে একটা পিপে ভাসছিল। গণেশ লক্ষ করেনি। পিপেটা ধীরে ধীরে নেমে এল। নামল একজন পুলিশম্যান। গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল, 'স্যার, এককালে আপনি যখন কলকাতার সায়েন্স কলেজে মাইক্রো ইলেকট্রনিকস পড়াতেন তখন আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু এসব আপনি কী করছেন? পাহাড়ময় কাগজ ছড়াচ্ছেন কেন? এটা কি নতুন ধরনের কোনো গবেষণা?'

গণেশ মাথা নাড়ল, 'না হে না, ওসব গবেষণা-টবেষণা আমি ভুলে গেছি। আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।'

'তার মানে? পৃথিবী তো দিব্যি বেঁচে আছে। মরার কোনো লক্ষণই নেই।'

'মরছে। পৃথিবী মরছে। পরে টের পাবে।'

'এ কাগজগুলো কি কোনো প্রেসক্রিপশন? পৃথিবীর বাঁচবার ওষুধ?'

'ঠিক তাই। ওগুলো কবিতা। তুমি পড়ে দেখতে পার।'

লোকটা মাথার হেলমেট খুলে মাথা চুলকে হতভম্বের মতো বলল, 'কবিতা!'

'হ্যাঁ। কবিতা। পড়ো।'

লোকটা পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা পাক-খাওয়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

'কিছু বুঝলে?'

লোকটা অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। কোনোদিন এ জিনিস পড়িনি।'

'তোমার বয়স কত?'

'এক-শো একান্ন বছর।'

'বাচ্চা ছেলে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমাদের আমলে শিক্ষানিকেতনে এসব পড়ানো হত না। শুনেছি তারও অনেক আগে কবিতা নামে কী যেন ছিল।'

লোকটা নিরীহ এবং ভালোমানুষ দেখে গণেশবাবু হুকুমের সুরে বলে উঠল, 'মনে মনে পড়লে হবে না। জোরে জোরে পড়ো।'

লোকটা কাগজটার দিকে চেয়ে থেমে থেমে পড়তে লাগল, 'গ্রহটি সবুজ ছিল, গাঢ় নীল জল, ফিরোজা আকাশ ... কোকিলের ডাক ছিল, প্রজাপতি, ফুলের সুবাস ... আধো আধো বোল ছিল, টলে টলে হাঁটা ছিল, শিশু ভোলানাথ-শৈশব ভাসায়ে জলে, কবি যে বৃহৎ হলে, নামিল আঘাত।-'

‘থামো, বুঝলে কিছু?’

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, ‘কিছুই বুঝিনি স্যার।’

‘একটুও না?’

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, ‘শুধু মনে পড়ছে একসময়ে আমিও টলে টলে হাঁটতে শিখেছিলুম-‘

গণেশ হতাশ হল। কবিতা তার ভালো হয়নি ঠিকই, কিন্তু না বুঝবার মতো নয়।

লোকটা গণেশকে অভিবাদন করে চলে গেল, যেন একটু ভয়ে ভয়েই।

পরদিন সকালে রোজকার মতো কবিতা লিখতে বসেছে গণেশ। এমন সময় একটা বড়োসড়ো পিপে এসে সামনে নামল।

‘স্যার।’

গণেশ তাকিয়ে দেখে, সেই লোকটি, সঙ্গে দুই মহিলা।

‘আমার স্ত্রী আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমার মা কবিতার ব্যাপারটা খানিকটা জানে। এরা দু-জনেই কবিতা শুনতে চায়।’

গণেশ অবাক এবং খুশি দুইই হল। তবে কবিতা শুনিয়েই ছাড়ল না। গান শোনাল, ছবি দেখাল।

তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

‘কিছু বুঝতে পারছ তোমরা?’

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানাল, ‘না!’

লোকটা বিনীত ভাবেই বলল, ‘না বুঝলেও আমার মধ্যে কী যেন একটা হচ্ছে।’

‘কী হচ্ছে?’

‘ঠিক বোঝাতে পারব না।’

পরদিন লোকটি ফের এল। সঙ্গে আরও চারজন পুলিশম্যান।

‘এরা স্যার আমার সহকর্মী, কবিতা গান ছবির ব্যাপারটা বুঝতে চায়।’

গণেশ খুব খুশি, ‘বোসো বোসো।’

পাঁচজন শ্রোতা ও দর্শক ঘণ্টা দুই ধরে গণেশের কবিতা শুনল, গান শুনল, ছবি দেখল। কেউ ঠাট্টা বিদ্রূপ করল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

পরদিন লোকটা এল না। কিন্তু জনাদশেক লোক এল, পুলিশ আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, টেকনিশিয়ান আছে।

পরদিন আরও কিছু লোক বাড়ল।

পরদিন আরও।

আরও।

এক সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়। ‘এ আপনি কী কাণ্ড করেছেন? পৃথিবী যে উচ্ছন্নে গেল! লোকে গান গাইতে লেগেছে,

কবিতা মকশো করছে, হিজিবিজি ছবি আঁকছে।'

গণেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, 'যাঃ, তাহলে আর ভয় নেই। দুনিয়াটা বেঁচে যাবে ...'

*শারদীয়া* ১৩৯৬




# অরুণিমা রায়চৌধুরী

বেলা দুপুর। উৎপলাক্ষী ছেলের খোঁজে সমুদ্রের ধারে এসে দেখলেন সেতুবন্ধনের কাজ প্রায় শেষ। ভিড়ের মধ্যে স্বামী উল্লম্ফককেও দেখতে পেলেন। ঘর্মাক্ত শরীরে আর সবার সঙ্গে পাথরের চাঁই নিয়ে জলে ফেলছেন। নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই কারও। মনে হয় কাজ শেষ না করে আজ আর কেউ বাড়ি ফিরবেন না।

কিন্তু ঝম্পক কোথায়? ছেলেমানুষ বলে তাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বানরেরা কাছে ঘেঁষতে না দিলেও সে আশেপাশেই থাকে অন্যদিন। হঠাৎ খিলিখিলি কিচিমিচি হাসির শব্দে উৎপলাক্ষী ঘাড় ফেরালেন। কিছু দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় ঝম্পক আরও দু-টি কিশোর বয়স্ক বানরের সঙ্গে খেলায় মত্ত। একে অন্যের লেজ ধরে ত্রিভুজাকৃতি হয়ে ছড়া বলতে বলতে বাঁই বাঁই করে ঘুরছে। শিশু বানরদের খুব প্রিয় খেলা এটি। নিজের শৈশবের কথা মনে পড়ায় উৎপলাক্ষীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। ছড়াটা তাঁর এখনও মনে আছে-

লেজে লেজে বেন্ধে নাও

হুপ হাপ লম্ফ দাও।

ক্ষুদ্র বৃহৎ লাঙ্গুলে

লাঙ্গুলে আর আঙ্গুলে।

আম্রফলার চাটপোট

আমরা সবাই একজোট।।

উৎপলাক্ষী তাকিয়ে দেখলেন, অন্য বানর দু-টি হেসে গড়িয়ে পড়ছে। তিনি একটু গলা চড়িয়ে ডাকলেন, ‘ঝম্পক! বেলা হল, বাড়ি আসবি না?’ ঝম্পক মাকে দেখে তিন লাফে কাছে এসে বলল, ‘মা, ওই ওরাও আজ আমাদের সঙ্গে খাবে।’ উৎপলাক্ষী বললেন, ‘বেশ তো, কিন্তু ওদের মা ভাববেন না?’

‘না, মা, ওদের মা-বাবা তো এখানে নেই। ওরা এখানকার নয়। বাইরে থেকে এসেছে সেতুবন্ধন দেখতে।’

‘ও, ঠিক আছে। পাকা কলা, পেয়ারা, বদরী, অনেক আছে। ওদের ডেকে নিয়ে আয়।’

ঝম্পক মহা উল্লাসে হুপ করে একটা লাফ দিয়ে বলল, ‘তুমি যাও মা, আমরা এক্ষুনি আসছি।’

বাড়ি ফিরে উৎপলাক্ষী খাবার গুছিয়ে রাখছেন, এমন সময় কিচিমিচি হুপহাপ করে শোরগোল তুলে ঝম্পক দুই বন্ধু নিয়ে এসে পড়ল। চোখ তুলে উৎপলাক্ষী অবাক। এরা কারা ঝম্পকের সঙ্গে? বানর নয় তো! প্রচণ্ড বলশালী সুগঠিতদেহ দুই কিশোর। আকৃতি

মানুষের মতো হলেও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দেখলে ঠিক মানুষ বলেও মনে হয় না। তিনি আশ্চর্য হয়ে ঝম্পকের দিকে তাকাতে সে হ্যা-হ্যা করে হেসে বলল, 'কী, মা? কেমন ঠকিয়েছি? খুব চমকে গেছ তো? ওরা কে শুনলে আরও চমকাবে।' তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই বল না।'

কিশোর দু-টি হাত জোড় করে বলল, 'খুড়িমা, আমরা রাক্ষসবংশীয়। লঙ্কা থেকে এসেছি সেতুবন্ধন দেখতে।'

খুড়িমা সম্বোধনেই উৎপলাক্ষীর মন গলে গিয়েছিল। তিনি সস্নেহে বললেন, 'বসো বাবা। কিন্তু লঙ্কা থেকে এখানে কোন সাহসে এলে তোমরা? ভয় করল না?'



'খুড়িমা, আমরা তো বানরের ছদ্মবেশে এসেছি। মা বলেছেন যুদ্ধ শুরু হলে লঙ্কা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরাও আর থাকব না হয়তো। তাই ভাবলাম এই বেলা সেতুবন্ধনটা দেখে নিই, নইলে একটা আফশোস থেকে যাবে।'

ছেলে দু-টির কথায় উৎপলাক্ষী চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি সজল চোখে বললেন, 'ছদ্মবেশ ছেড়ে ভালো করনি বাছারা, কে কোথা থেকে দেখতে পাবে।' ছোটো ছেলেটি বলল, 'এই ঝম্পকটা আমাদের আসল চেহারা দেখতে চাইল।' বড়োটি হেসে বলল, 'নিজেদের চেহারায় এসে আমরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। বেশিক্ষণ ছদ্মবেশে থাকতে গেলে হাঁসফাঁস লাগে বড্ড।'

'তোমাদের নাম কী বাবা?'

'আমার নাম ব্যূঢ়োরস্ক, আর আমার ছোটো ভাইয়ের নাম বৃষস্কন্ধ।'

'বাপরে! দারুণ খটোমটো নাম তো! আমি বরং তোমাদের বুড়ো আর বিশু বলে ডাকব।' দুই কিশোর রাক্ষস একগাল হেসে বলল, 'আমাদের বাবা-মাও তাই ডাকেন।'

তিন বন্ধু আর মা মিলে গল্পগুজব করে খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় দরজায় ছায়া পড়ল। চারজন তাকিয়ে দেখে উল্লম্ফক। উৎপলাক্ষীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, তবু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললেন, 'সেতু বাঁধা শেষ?' উল্লম্ফক ভেতরে এসে বসতে বসতে বললেন, 'হ্যাঁ, একেবারে সম্পূর্ণ। তারপর দুই নবাগত কিশোরকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা?'

দুইজনেই নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'পিতৃব্য, আমরা রাক্ষস। লঙ্কা থেকে এসেছি। সেতুবন্ধন দেখতে ভারি ইচ্ছে করছিল, তাই।'

উল্লম্ফক ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, ‘রাক্ষস? গুপ্তচর?’

ঝম্পক তাড়াতাড়ি বলল, ‘বাবা, ওরা আমার বন্ধু।’ উৎপলাক্ষী বললেন,

‘গুপ্তচর হলে কি ওরা প্রথমেই নিজের পরিচয় দিত? ওরা ছেলেমানুষ, ওসব ছলাকলা জানে না?’

উল্লম্ফক গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের নাম?’

‘আমার নাম ব্যূঢ়োরস্ক আর ও বৃষস্কন্ধ।’

বৃষস্কন্ধ হেসে বলল, ‘বাবা-মা আমাদের বুড়ো আর বিশু বলে ডাকেন। খুড়িমা আর ঝম্পকও তাই।’

‘বিশু?’ উল্লম্ফক একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, ‘অনেকদিন আগে বিশু নামে আর একজন রাক্ষসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। যুবরাজ বালীর আদেশে আমি একবার লঙ্কায় গিয়েছিলাম লঙ্কাধিপতির কাছে দূত হয়ে। সেই সময় আলাপ হয়েছিল। তার নাম ছিল বিশঙ্কট।’

বুড়ো আর বিশু একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, ‘তিনি তো আমাদের বাবা।’

‘বল কী? প্রভঞ্জন রাক্ষসের ছেলে বিশঙ্কট?’

‘হ্যাঁ, প্রভঞ্জন তো আমাদের ঠাকুরদাদার নাম।’

‘তোমরা তো তাহলে আমার বন্ধুপুত্র। বাঃ বাঃ, ভারি খুশি হলাম তোমাদের দেখে।’

উৎপলাক্ষী এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

‘প্রভঞ্জন তো খুব বুড়ো হয়েছেন বোধ হয়?’

বুড়ো বলল, ‘হ্যাঁ তা হয়েছেন।’ বিশু ওকে বাধা দিয়ে বলল, ‘তবে গায়ে এখনও যা জোর না। এখনও একাই এক-শোটা বা-‘

উল্লম্ফক হেসে বললেন, ‘বলো বলো, থামলে কেন? আমি দেখেছি তোমার দাদা তোমাকে চিমটি কেটে থামিয়ে দিয়েছে। ভয় নেই, আমি কিছু মনে করব না। তুমি বলতে যাচ্ছিলে, এখনও একাই এক-শোটা বানর খেতে পারেন। তাই তো?’

বিশু লজ্জিত হয়ে বলল, ‘না, না, আমি বলছিলাম ঠাকুরদা এখনও একাই এক-শো জন বানরের সঙ্গে লড়তে পারেন।’

‘আরে এদিকেও অনেক বানর আছেন যাঁরা একাই এক-শো জন রাক্ষসকে ঘায়েল করতে পারেন। দু-পক্ষেই মহাবীরও যেমন আছেন, আবার আমার মতো ভিরু কাপুরুষও আছেন। আমার আবার যুদ্ধ-টুদ্ধ একদম ভালো লাগে না বুঝলে? কী জানি, তবু হয়তো সেই যুদ্ধেই এবার প্রাণটা দিতে হবে।’

কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বুড়ো বলল, ‘কাকা, মা আমাদের সূর্যাস্তের আগেই ফিরে যেতে বলেছেন।’

উল্লম্ফক আর উৎপলাক্ষী দু-জনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বিকেল হয়ে গেল, আর দেরি নয়। তোমরা ছদ্মবেশ ধরে নাও।’

মুহূর্তেই দু-জনে দুই কিশোর বানরে রূপান্তরিত হল। ঝম্পক তার বাবা-মার সঙ্গে ওদের এগিয়ে দিতে এল সমুদ্রের ধারে। বিশু বলল, ‘চলি রে ঝম্পক। মনে রাখিস, যুদ্ধে

যে পক্ষই জিতুক, আমরা কিন্তু বন্ধু।' ঝম্পক বলল, 'তোরাও মনে রাখিস।'

কয়েকদিন পরের কথা। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। উল্লম্ফক ঘরে ঢুকে বললেন, 'একী, মায়ে-পোয়ে চুপচাপ বসে আছ? বিজয়োৎসবে যাওনি?' তারপর একটু উৎকর্ণ হয়ে বললেন, 'কাঁদে কে?'

উৎপলাক্ষী বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'পাশের বাড়ির শিলাঙ্গী কাঁদছে। ওর স্বামী আর ছেলে দু-জনেই যুদ্ধে মারা গিয়েছে।'

ঝম্পক করুণ কণ্ঠে বলল, 'বুড়ো আর বিশু কেমন আছে কে জানে! আচ্ছা বাবা, ওরা তো আমাদের বন্ধু। ওদের সঙ্গে তো আমাদের কোনো ঝগড়া নেই। তবে?'

উল্লম্ফক প্রথমে উত্তর দিতে পারলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ওরা বালক, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। কিন্তু ওদের বাবা, আমার বন্ধু বিশঙ্কট হয়তো বীরের মতো প্রাণ দিয়েছে।'

ঝম্পক হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমি চললাম। যুদ্ধ শেষ এখন তো আর কোনো ভয় নেই। আমি লঙ্কায় চললাম।'

উৎপলাক্ষী আর্ত স্বরে বললেন, 'ওরে যাস না।'

উল্লম্ফক ধীর স্বরে বললেন, 'একটু দাঁড়া, আমিও আসছি।'

অনেক রাত। রাক্ষস বিশঙ্কটের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দের সঙ্গে কিচিমিচি গলায় শোনা গেল, 'বুড়ো, বিশু দরজা খোল।' বিশুর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতবিক্ষতদেহ বিশঙ্কট এসে দরজা খুলে দিলেন। উল্লম্ফক আর ঝম্পক ঢুকল, পিছন পিছন উৎপলাক্ষী। ঝম্পক বিশুর দিকে চেয়ে বলল, 'মাও এসেছেন জোর করে। বুড়ো কই?' বিশঙ্কট রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'বুড়ো বোধ হয় আর বাঁচবে না।'

'সেকী?'

'বুড়ো কাল কৌতূহলী হয়ে একটা গাছের উপর চড়ে যুদ্ধ দেখছিল। একটা ত্রিশূল কোথা থেকে এসে ওর বুকে বিঁধে যায়। সেটা টেনে তুলে ফেলেছি। কিন্তু আজ বিকেল থেকে ও আর কথা বলছে না। নিশ্বাসও একটু আগে বন্ধ হয়ে গেল।'

'কই দেখি!' তিন বানর মিলে খাটে শুয়ে থাকা বুড়োর কাছে এগিয়ে গেল। মাথার কাছে বসা বুড়োর মা হাউহাউ করে কেঁদে বললেন, 'কতবার যেতে বারণ করেছিলাম।'

হঠাৎ বুড়োর মুখ থেকে একটা অস্ফুট কাতরোক্তি শুনে ঝম্পক লাফিয়ে উঠে বলল, 'এই তো বুড়ো বেঁচে আছে। এই যে, নিশ্বাস পড়ছে।' বিশঙ্কট, বিশু আর ওর মা ব্যগ্র হয়ে বুড়োর মুখের দিকে চাইলেন। ঝম্পক উদ্ভাসিত মুখে চেঁচিয়ে বলল, 'মা, আমাদের মৃতসঞ্জীবনীতে কাজ হয়েছে। তার মানে বিশল্যকরণীতেও হবে। মৃতসঞ্জীবনীর গন্ধেই বুড়োর নিশ্বাস বইছে। জ্ঞানও আসবে।'

উৎপলাক্ষীর মুখে এইবার হাসি ফুটল। বিশঙ্কটের স্ত্রী রাক্ষসী কৃশোদরীর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'দিদি আর ভয় নেই। হনুমানদাদা যখন গন্ধমাদন নিয়ে এসেছিলেন, তখন আমরা অনেকেই চুপিচুপি মৃতসঞ্জীবনী আর বিশল্যকরণীর চারা সেখান থেকে নিয়ে বাড়িতে লাগিয়েছিলাম। অনেক চারা হয়েছে বাড়িতে। তাই, নিয়েই এসেছিলাম সঙ্গে করে। একটু ভয় ছিল, কী জানি কাজ হয় কি না! যান, শিগগির খল-নুড়ি নিয়ে আসুন।'

তিন বানর আর তিন রাক্ষস-রাক্ষসী মিলে দারুণ ব্যস্ত হয়ে মৃতসঞ্জীবনী আর বিশল্যকরণীর রস করতে লেগে গেল।

*শারদীয়া* **১৩৯৬**




সলিল চট্টোপাধ্যায়

## প্রস্তাব

সবাইকে দিয়ে সব কিছুই হয় না-সবাই সব কাজ পারেও না। তাই তো পরাণেকে বলা। অথচ রোদ কোথায় উঠে এল-একটু পরে বাপ জাল কাঁধে ঘরে ঢুকবে, আর সে লবাবের পাত্তাই নেই। অথচ শম্ভু উঠছে শেষ রাতে। বাপের হাতে সব জুগিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছে। কোথায় পরাণে! এ যদি ইদ্রিসকে বলত-ছোটো হলে কী হবে-গামছাটা জড়িয়ে ঠিক মাঝ রাতে উঠে আসত-'শম্ভা! এয়েচিরে।' কিন্তু ইদ্রিসকে দিয়ে হবে না-একে চিপুরির বিল-তার ওপর মহাশোলের ব্যাপার। চিপুরির বিল-শুধু যে এখান থেকে দূরে তাই নয়, এই ভোরের ভাঁটায় ভাঁটায় রসুল নগরের খাল ধরে গেলেও ঘড়ি দুই তিন। এখন গরম পড়ছে-বিলের জল টানটান-জল সরে কোথাও কাদা, ভেলা নিয়ে চলা মুশকিল; কখন যে কোথায় আটকে যাবে! দিন দুপুরে পাকা মাঝিদেরও ঘোল খাইয়ে দেয়। আসলে এই মস্ত বিল যার বেশ খানিকটা হাওড় আর বাওড়-তার অনেকখানে নৌকো যাবে না। এমনি ঘন হোগলা আর নলখাগড়ার বন-জায়গায় জায়গায় বুক অবধি ডুবে যায় এমনি পাঁক-ছোটো-বড়ো চর-এরই মাঝে নাকি এঁকেবেঁকে আছে সেই মরা নদী-পরাণেটা বলে মায়া নদী-তার কোথাও তাল গাছ ডুবে যায় এত গভীর। আর এই বিলেরই কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দলবল নিয়ে মহাশোল। পরাণে কত বার গিয়েছে; বাপ যখন বেঁচে-তার সঙ্গে নৌকোয় ওই বিলে মাছ ধরতে। সে কী মাছ এক-একটা গায়ে শ্যাওলা ধরে গেছে-এই হুমদোপারা মুখ, জল থেকে টেনে তুলতেই দু-তিন জন লোক লাগে। তেমন একটা মাছ ধরেছিল পরাণের বাপ-অনেক দামে বিক্রি হয়েছিল। আরেকদিন ডোঙ্গা নিয়ে ধরল এক কচ্ছপ-ওজন কী! ডোঙ্গার মাঝে রেখে দিল। সে কী সহজে থাকে-কেবলই গড়িয়ে এদিক-ওদিক। শেষে ভুলকিলতা দিয়ে তিন গেরো ডোঙ্গার সঙ্গে; বিক্রি হল ষাট টাকায়। নাঃ, মহাশোলের দেখা পায়নি ওরা। মহাশোল আসলে 'ঠাকুর'-হাজার বয়স তাঁর। তাঁকে ধরে কার সাধ্যি।

চিপুরির ধারে কুসুমগঞ্জ-পরাণের সইমার বাড়ি। 'সানযাত্তার' মেলায় দেখবে কুসুমগঞ্জের ঘাটে কত লোক মহাশোল ঠাকুরকে মুড়ি ভোগ দিচ্ছে-খই বাতাসা ছিটিয়ে দিচ্ছে-জেলেবউরা পান সুপুরি দেয়-সন্ধ্যা বেলা ঘাটে প্রদীপ দেখায়। এই নদী নালা জলায় জলায় সারা বচ্ছর ঠাকুরের আশীর্বাদ না হলে চলে?

মহাশোলকে ধরা নয়-ওর আশেপাশে কত তিন কেজি চার কেজি সব 'দোষ পাওয়া' মাছ। তাদের দু-একটা ধরতে পারলেই হল। কিন্তু পরাণেকে ছাড়া গিয়ে লাভ নেই; পরাণে বাপের সঙ্গে অনেক গেছে-বিলের হাল হদিশ জানে-হাওড় বাওড়ের মাঝে মরা নদীর সোঁতা চেনে-কোথায় ডোবা কোথায় পাঁক সে জানা না থাকলে সারাদিন ভেলা কেঁদরে বসেই থাকবে-শ্যাওলা-ধরা মাছের গল্প শুনেই ফিরে আসবে।

শম্ভুর বাপও তো জেলে; বাপের সঙ্গে কি যাওয়া যেত না? তিন বচ্ছর রোগে ভুগে ভাগের নৌকো বেচে এখন এই রসুলনগরের খালের ধারে ভোর ভোরে জাল টানে আর এথা-ওথা মজুরি করে। সে জালে আর কী ওঠে-বড়োজোর কুচো চিংড়ি পোটাক-দু-চারটে নলা কি গালই। কত দিন বলেছে শম্ভু চিপুরি যাওয়ার কথা। বাপ চুপচাপ শোনে, রা দেয় না। এই সেদিন ভোর রাতে জাল গুছিয়ে দিতে দিতে শম্ভু বলেছে, 'আজ চলো না, চিপুরি'- একেবারে খা খা করে উঠল-কী যেন একটা খারাপ কথাই বলেছে। কিন্তু কার্তিক মোড়লের পো শম্ভু মোড়ল যা স্থির করে তা স্থির-চিপুরি ও যাবে-ওই ঠাকুরের ঝাঁক থেকে মাছ ও ধরে আনবে-পরাণে আসুক চাই না আসুক। আর এক দিন শুধু দেখবে তারপর ওই ইদ্রিসকে নিয়ে ভেলা ঠেলে যদি না গিয়েছে।

## আয়োজন

পরাণে এল বিকেল নাগাদ। দাঁত বার করে হাসছে-'আগ করিস না! সককালে মা পেঠিয়ে ছিল ভাঁড়ারি মাস্টারের খেতে-এই এনু। তুই ভাবিস না-এট্টা বুদদি এল। একেন থেকে যাব কুসুম গনজো-সই মার ঘর। তারপর বড়দার শালতি ধরে বিলে। ই ভেলা মেলা ধরে কি অদ্দূর যাওয়া চলে?' শম্ভুর রাগ আরও চড়ল-এত খেটে সে ভেলা বানাল-এখন বলছে এ ভেলা চলবে না! 'তুই যাবি কবে?' ভাঁড়ারি মাস্টারের খেতে আর দু-দিনের কাজ আছে! পরশু এই বিকেল বিকেল হাঁটা লাগাব-বেশ রাত হবার আগেই কুসুমগঞ্জ। পরদিন ভোরেই বিলে নেমে যাব। কিন্তু শম্ভুর বাপ তো ছাড়বে না। ভোরে বেরিয়ে দুপুর নাগাদ ফিরে আসা যায় না? অসম্ভব। বিলের মাঝে যেখানটা মায়ানদীর মজা দহ সেখানে পৌঁছোতেই দুপুর। বাপকে যদি বলে সই মার বাড়ি যাচ্ছি 'ভুজ' খেতে-বাপ ছাড়বে না? মনে হয় না-রাঁধা-বাড়া ঘরের কাজ সবই তো শম্ভুকে করতে হয়। পরাণে বলল-'আমি মেসোকে আজি করাব।'

কিন্তু মেসোকে রাজি করাতে হল না। রাতের বেলা বাপ এসে বলল পরশু সদরে যেতে হবে, কোর্টে সাক্ষী আছে। চৌধুরীবাবুরা নে যাবে নে আসবে-ধুতি, শার্ট, পঞ্চাশ টাকা এমন সুযোগ জীবনে ক-টা আসে বাপ! বাপ হয়তো ভয় পাচ্ছিল শম্ভু বায়না ধরবে 'আমো যাবো'- তাহলে পাঁচটা টাকা দিয়ে বুঝিয়ে যেত। কিন্তু শম্ভু যখন বলল, সে পরাণের সইমার বাড়ি যাবে 'ভুজ' খেতে-বাপ ভুরু কোঁচকাল-'কুসুমগঞ্জ! খবরদার! বিলে নাববিনি!'

'ক্যানো?'

'আবার কতা? না তো না! কী? দেঁড়িয়ে রলি যে! আত হয়নি? ভাত লাগা।' শম্ভু দু-ঠোঁট চেপে খাবার জোগাড় করে।

ল্যাটা মাছের ঝোলটা নাকি ভালো হয়েছে। শম্ভু নাকি এখন ওর মার মতোই প্রায় রাঁধে। খেতে খেতে বাপ বলে-চিপুরি জায়গাটা ভালো নয়। ওইখানে কত যে দুঘঘটনা ঘটেছে! বাপ ছেলেবেলায় তাঁর দাদুর মুখে শুনেছিল-কত রাজার সুলুপ সওদাগর বজরা ডুবেছে ওখানে। একসময় একটা নদী ছিল ওখানে-মায়ামতী-মস্ত বড়ো নদী। এক রাজকন্যেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল ফিরিংগি ডাকাতরা। রাতে নোঙর ফেলে সবাই ঘুমাচ্ছে-এই মেয়ে কী করে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরে। শাপ লেগেছিল তার। পরদিন ভরা কোটালের বান-জলে 'ঘুন্নি'-সব নৌকো উথালপাতাল-একটা তো কামান-টামান সুদ্ধোই তলিয়ে গেল। বাকিরা অনেক করে পালিয়ে যায়। সে কন্যে এখন সরে গেছে অন্যদিকে

কিন্তু ওখানকার লোকেরা বলে কখনো কখনো নাকি 'সোত' আসে বিলের জলে, একেবারে দুজ্জয় সাতসমুদ্দুর বান-শালতি ডোঙা উলটেপুলটে যায়! কোত্থেকে কেমন করে আসে কেউ বলতে পারে না। ওই বিশাল বিল-দশ গাঁয়ের মাজে ছড়ানো-এপার-ওপার করতে দিন যায়। এর কোনখানে জল কম-কোথায় গভীর, পাকা মাঝিরাও ঠাহর পায় না। মাসি বাড়ি 'ভুজ' খেয়ে আসুক শম্ভু। কিন্তু খবরদার বিলে যেন মাছ ধরতে না যায়।

বাপ গেল সকালে। পরদিন সাক্ষী দিয়ে রাত রাত ফিরবে। শম্ভু যেন তার আগে ফিরে আসে। পরাণে এল দুপুরের কিছু পরে। ভাঁড়ারি মাস্টারের বউ খুশি হয়ে একটা প্রায় নতুন গেঞ্জি দিয়েছে-ছাপ ছাপ আঁকা-দ্যাখাচ্ছে যেন নেড়ি ভুলির দাদাভাইটি। পরাণে বলেছে 'হাসচিস? এই দ্যাখ একটা পাঁচ টাকার নোট।' মার কাছ থেকে দু-টাকা আর মাস্টারের বউ তিন টাকা। শম্ভুও পেয়েছে দু-টাকা বাপের কাছ থেকে। 'কিন্তু খবরদার, ওসব ভাজামাজা খাওয়া চলবেনি। মাছের মশলা বানাতে হবে। মাছ কি এমনি এমনি আসবে?'

হাঁটাপথে হাসিমপুর, রায়বসুর চক হয়ে কুসুমগঞ্জ পৌঁছোতে রাত আঁধার। কতদিন পরে আসা; পরাণেকে গাঁয়ে পৌঁছেও জিজ্ঞাসা করতে হল 'সমীর হালদার-রঘু হালদারের বাড়িটা কোতায়?' সইমা কাজ কাম সেরে ঘাটে গেছে। বড়দা মেজদা বাড়ি নেই। সইমার শ্বশুরবুড়ো চৌকিতে বসে ছোটো কত্তাল বাজিয়ে হরিনাম করছে। বড়োপিসিও প্রথমটা পরাণেকে চিনতে পারেনি। সোনার গাঁ বলতে বুঝল 'উঠে এসো-বড়ো বউ আসচে।' সইমা কি খুশিটাই না হল পরাণেকে দেখে। পরাণের বন্ধু বলে শম্ভুও খুব খাতির পেল। খেতে খেতে রাত-চাঁদ উঠে এসেছে নারকেল গাছের ওপর।

বড়দা এসেই খেয়ে শুয়ে পড়ল-কাল ভোরের ট্রেন ধরে সদর যেতে হবে। পরাণে গুটিপায়ে গিয়ে দাঁড়াল-'কাল সকালে একটু শালতিটা-'

বড়দা সঙ্গেসঙ্গেই ধমক। তারপর বলল, 'ভালো করে ঘাড়টা টিপে দে তো-বেদম টনটনাচ্ছে!' শম্ভুকে ইশারা করে পরাণে দু-জনে মিলে ঘাড় পিঠে এমনি টিপতে লাগল-বড়দা বলল, 'যা যা হয়েছে। যা ফনেকে বলিস আমি নিতে বলেছি।'

আসার পথে রায়বসুর চক থেকে মাছের মশলা কেনা হয়েছিল। সেসব তৈরি করে শুতে আরও রাত। তাদের শোবার জায়গা হয়েছে বড়োপিসির খাটে। শুয়ে শুয়ে বড়োপিসির গল্প- পিসির স্বচক্ষে দেখা ঘটনা। পিসির তখনও বিয়ে হয়নি-চারদিকে খোঁজখবর চলছে। খুব ভোরে একদিন ঘাটে গিয়ে দেখে-ওই পারে এক সাধু যেন বুক জলে দাঁড়িয়ে ধ্যান করছে। পিসি গিয়ে তার মাকে খবর-'দেকে যাও ঘাটে এক সাধু-জলে দেঁড়িয়ে-এই জটা!' মা শুনে চমকে উঠল-'চল তো দেখি কেমন সাধু-ঘাটে সাধু!' সবাই ঠাট্টা করছে পিসিকে। শুধু মা এল তার পিছু পিছু-ও-ও মা! সাধু কোথায়, এই মস্ত একটা মাছ-জলের ওপর মাথাটা তুলে ভাসছে-লাল টকটকে গায়ের রং-মুখ-ভরতি দাড়ি-গোঁপ-মাথাটা মানুষের মতো কি তার চেয়ে বড়ো! মা সেখানেই মাটির ওপর উবুড় হয়ে গড় করছে- 'ঠাকুর-ঠাকুর! আমার মেয়েটা ভালো ভাবে পার করে দাও!' বলছে আর কাঁদছে। সেই মাছ এগিয়ে এল একদম ঘাটের কাছে-পিসি ভয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেছে-ঠিক যেন সোনার বরন সন্ন্যেসি ঠাকুর। তারপরে সে ভুস করে এক ডুব-আর উঠল না।

মাছ ঠাকুরের আশীর্বাদে খুবই ধুম করে পিসির বিয়ে হয়ে গেল-রাজপুত্রের মতো বর। পরপর দুই সন অজন্মা হয়ে পিসির বাপের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। কিন্তু কী করে টাকা জোগাড় হল-কিছুতেই আর আটকাল না। গল্প শুনতে শুনতে ওরা কখন ঘুমিয়ে গেল। মাঝরাতে হাওয়া উঠেছে-ঘরের চালে মটমট, শনশন-ওদের ঘুম ভাঙল না-যদিও এই শব্দটা ওদের ঘুমের ভেতরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির আকার নিল-বিল যেন এখন এক সমুদ্র-

জল উথাল পাতাল নৌকো ডুবছে নাকি-না বড়দা নৌকো ঠেলছে। শম্ভুকে বকছে বাবা, না করেছিল না বিলে নাবতে।

## অভিযান

পরাণের ঘুমই আগে ভাঙল। তখন চাঁদ নেমে গেছে। বাইরে হালকা অন্ধকারে ঝিঁঝি পোকার স্বর। সাবধানে শম্ভুকে ঠেলল-পাছে পিসি জেগে যায়। শম্ভু উঠল প্রায় লাফিয়ে এবং পিসি 'কে রে!' বলে দেশলাই হাতড়াচ্ছে।

'কিছু না, আমরা!'

'কী হয়েছে?'

'নাঃ, এই বাইরে যাব।'

শালতিটা ঘাটেই বাঁধা। সামনে দশ-পনেরো হাত জল তারপর ও কি ধান খেত? না ওগুলো বিলের জলে ঘাস হয়ে আছে। জল ওখানে কম-ওই দিকে গভীর-ও দিকেই বেরোবে ওরা। শালতিতে ওঠার আগে জলের ধারে গিয়ে পরাণ মাথা নীচু করে গায়ে মাথায় একটু জল ছিটিয়ে নিল-কী বিড়বিড় করছে?

'কচ্ছিস কী?' শম্ভু হাসে।

'হাসবি নে। তুইও কর। বল জলে হাত দে বল :

'জলরাজ মীনরাজ

সিদধ কাম হই আজ।

দোষ নালইও আশীর্বাদ দেও।

হরি হরি বলো ঠাকুর হরি হরি বলো।'



শম্ভু তবু হাসছে। এটাই ওর দোষ। কিছুই মানবে না, সব কথাতেই বলবে 'পেরমান কী? পেরমান দ্যাকা!'

শালতিতে বইঠা একটা। শম্ভু একটা বাঁশের লগি নিয়েছে হাত ছয় লম্বা। বিলে লগিটারই ভরসা বেশি-কোথায় ঘাস কোথায় পানা, কোথায় দাম-তাতে কি আর বইঠা চলবে? তবে আছে, মাঝে অনেকখানি ফাঁকা-যেকান যেকান দিয়ে নৌকো কি ভটভটি এগাঁ থেকে ওগাঁ যাতায়াত করে-যাতায়াতের পথে মাঝিরা পানা বা দাম দু-পাশে ঠেলে সরিয়ে পথটা পরিষ্কার রাখে। সা বাবুরা ভটভটি নামিয়েছে হরিগঞ্জ থেকে কেনার গাঁ-

সারাদিনই যাতায়াত করছে লোকজন মালপত্র নিয়ে। তারাও অনেকখানি পরিষ্কার করিয়েছে।

পানা ঠেলে ঠেলে ওরা এসে পড়ল সেই ভটভটির রাস্তায়-বিলের মাঝে মাঝে ডাই করা পানা। এখানে জল বেশি-পরাণে বইঠা চালাল-শম্ভু লগি তুলে দাঁড়িয়ে। পরাণে শেষ এসেছিল দু-বছর আগে। দু-পাশে দেখছে-এই বিল কি তেমনি আছে? তেমনি পানা ঘাস হোগলা নলখাগড়ার মাঝে লুকোনো-মাঝে মাঝে নৌকো চলার পথ। কী দেখে বুঝবে এর কোথায় সেই মরা নদীর সোঁতা? কোনটা বাওড়? কোন জলে মহাশোল ঘুরে বেড়ায় তাঁর শিষ্য সেবক দলবল নিয়ে?-সে দলে কোনটা 'দোষ লাগা' যে নাকি অন্যায় কাজ করে মাছ হয়েছে?-এখন ঠাকুরের পাছু পাছু ঘুরছে প্রায়শ্চিত্ত করতে-জাল ফেললেই ধরা পড়বে? ওটাই তো প্রায়শ্চিত্ত হল তার। এসব শম্ভু বিশ্বাস করতে পারছে না-ভেবে পায় না পরাণে কি চিনতে পারছে-কোন জায়গায় যেতে হবে? এখন দ্যাখো কোনো জবাবই দিচ্ছে না। এত প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলল-'র'।

শেষ পর্যন্ত বোধ হয় পরাণে হদিস করতে পারল। হঠাৎই 'এইখেনে!' বলেই উলটো মোচড়ে শালতি ঘুরিয়ে দিয়েছে হোগলা বনের ভেতরে। 'পথ কই?' শম্ভুর সে কথার জবাবে যেন ধমকে ওঠে-'কাঁচিটা নে! কাট! কাট!' শম্ভু কাস্তেটা নিয়ে-সামনের হোগলা কাটতে শুরু করে। হোগলা কেটে পথ করে ঢোকা কি সোজা? পরাণে বইঠা রেখে লগি হাতে ঠেলছে-শম্ভু কাস্তেটা টানছে-খচাখচ-মুঠোয় ধরে হবে না। হয়তো এ পথে নৌকো কখনো ঢোকে-তত যেন ঘন নয় হোগলা বন। শম্ভুর মনে হল কিছুদিন আগেই বোধ হয় হোগলা কেটে কেউ পথ করেছিল। যেন ডগাকাটা কিছু হোগলাও দেখা যায়। আশ্চর্য! ভেতরে কি দিঘি একটা! না, বিলের খানিকটা কারা পরিষ্কার করে রেখেছে চারদিকে হোগলা বন- মাঝখানে অনেকখানি জলের ঠাঁই-মস্ত এক দিঘি যেন। অথচ বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। এমন কেন?

জেলেরাই মাছ ধরার জন্য ঝিলের মাঝে মাঝে এমন করে রাখে। আরও আছে এমন। সরকারি জলা-অন্য কেউ এসে চুপিচুপি মাছ ধরে পালাল। এনিয়ে মারামারি, খুনোখুনিও হয় কত। শম্ভু কি এখানেই জাল ফেলবে? পরাণে বলে 'চুপ! কারা আসছে! ঠেল! ঠেল!' বইঠা, লগি ঝপাঝপ। কারা আর আসবে-যারা খেটেখুটে এই জলা পরিষ্কার করেছে-মাছ ধরার জন্যে-তাদেরই কেউ হবে।

শালতি কোনাকুনি পার হয়ে ওদিকের হোগলা বনে সেঁধিয়ে গেল। পেছন থেকে সাড়া আসছে-'হো-ও-ই! কে র্যা একেনে! মাতাটা পুঁতে দোব না! ধর!' পরাণে হাসে-ধত্তে পারবে না! ওরা একটা মাত্তর নাও। হোগলা বনের ভেতর চুপচাপ খানিক বসে থাকে। যারা এসেছিল তারা কেউ ধেয়ে এল না। এখনও দক্ষিণের হাওয়া-সকালে এমনি বয়। বাতাসে পোড়া তামাকের গন্ধ। ওরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। ওখানটায় দু-চার খেপ জাল ফেলতে পারলে মাছ উঠত নিশ্চয়। কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই। এর ওপাশে একটা চড়া আছে-ওখানে মা মনসার থান-মস্ত দুটো অজগর অজগরনি থাকে-তারও ওদিকে জল কম-কোমর কি বুক অবধি-ওখানে জাল চলবে না তবে ওইটে চলবে-শম্ভুর কোঁচটা দেখায় পরাণে। শম্ভু খুশি হয়ে 'শাল গজার কি বোলও দু-একটা পাই!'

বিলের মাঝে মাঝে কোথাও এরকম চর-ছোটো-বড়ো গাছ, নারকেল দু-চারটে আম জাম-বহু পুরোনো একটা মন্দির। তার চুড়োয় কোনো সময় একটি অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে ছিল-সে গাছ এখন মন্দির ধসিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে-এক বিশাল মহীরুহ! বছর

দশেক আগেও এক বুড়ো পূজারি থাকত এখানে। তার মাটির ঘরের দুটো দেওয়াল মাত্র দাঁড়িয়ে।

এপাশে বিলের গভীরতা কম। কিন্তু এদিকেই ওই কোণ দিয়ে কালীনদীর লোনা জল জেয়ারের তোড়ে এই বিলেও ঢুকে পড়ে। লোনা জলের জন্যই বোধ হয় এদিকে হোগলার তেমন বন নেই-পানাও কম। শুধু ধানি ঘাসের সূক্ষ্ম ডগাগুলো জলের ওপরে-শিউরে ওঠা গায়ের মতো রোঁয়া খাড়া। এতক্ষণে সূর্য বেশ ওপরে উঠে গেছে। মনসার চর ছাড়িয়ে ওরা এগোচ্ছে। এখানে মনে হয় মাছের লোভে অনেকেই এরকম নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়- সবখানেই নৌকো চলার ছাপ-ঘাসে, দামে। কিন্তু এখানে কোথায় যে জাল ফেলবে। পরাণে বইঠা তুলে নিল। শালতিটা আস্তে আস্তে সরে যায়। ওদের চোখ জলের ওপর স্থির-যদি কোথাও বুড়বুড়ি কি সামান্য কাঁপন জলে। খিদেও পেয়েছে। থলির ভেতরে পুঁটুলিবাঁধা মুড়ি; কিন্তু ওই মুড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। যতক্ষণ কুসুমগঞ্জে না ফিরছে এই মুড়িই খেতে হবে, তাই খিদের কথা মনে না করাই ভালো। কে না জানে খিদের কথা ভাবলেই খিদে বেশি পায়।

হঠাৎ। এত আচমকা শম্ভু ঘাবড়েই গিয়েছিল। পরাণে হঠাৎই কোঁচটা তুলে জলের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে-'ইসশা-মার লগি।'

শম্ভু ঝটপট লগি নামিয়ে ঠেলে দিল শালতিটাকে-কোঁচটা যেখানে জলের মধ্যে আড় হয়ে আছে। শাবাশ বটে-ওদ্দুর থেকেই গেঁথে ফেলেছে-শাল মাছ একটা-পরাণের হাতের এক হাত হবে।

জল কি বাড়ছে? বোধ হয়। কালীনদীর ঘোলা জল কোন অদৃশ্য পথে এখানে ঢুকছে-এদিকে বিলের জল ততটা স্বচ্ছ নয়-যেন আরও ঘোলা হয়ে উঠছে। ঘাসের মধ্যে কী একটা নড়ছে; জাল তুলতে গিয়ে শম্ভু কোঁচটাই তুলে নিল, তারপর হুপ! কোনোকিছুতে লেগে কোঁচটা পিছলে গেল যেন। কী ওটা? ওরে বাবা! মস্তবড়ো কাছিম একটা-একটু ক্ষণের জন্যই দেখা গিয়েছিল তাও পিঠের খানিকটা-সেটুকুই এ্যাতবড়ো! নিশ্চয় হাত দুই চওড়া হবে। সমুদ্রের কাছিম এটা, কালীনদী থেকে বিলে ঢুকে পড়েছে। পরাণে ঘাড় নাড়ে-'না সমুদ্রের নয়-এই বিলেই কত আছে। বুঝলি না-একেনটায় নদী থেকে মাছ আসে যায়- তাই ইনি ঘোত হয়ে বসে আচেন মাছ খাবার জন্যে-গোপাল ঠাকুর!' পরাণে হাসে-হাসে শম্ভুও। এ্যাতবড়ো কাছিমটাকে মারতে পারলে নাম হত তার-বাবাও থ হয়ে যেত-'তুই মেরেচিস এ্যাত বড়োটাকে!' আরও সরে এল তারা। সত্যি এখানে অনেক মাছ, ছোটো যদিও। পরাণে বলে 'জাল মার!' 'দূর! এটুকু টুকু মাচ ধত্তে একেনে এয়েছি নাকি!'

পরাণেই মারল আরও একটা বোয়াল-ওই শম্ভুর কোঁচটা দিয়ে। শম্ভুর জেদ চেপে গেছে-চোখ জলের ওপর লেগে আছে-কোথাও যদি এতটুকু সাড়া পাওয়া যায়! বেলা বাড়ছে। পরাণে বলে 'ও ই শম্ভু! তু দ্যাক দ্যাক চাদ্দিক ভালো করে। এ দুটো তো সইমাকেই দে যেতে হবে-খালি হাতে ঘর যাব নাকি।' অগত্যা শম্ভু জাল তুলে নিল। অজস্র কুঁচো মাছ-নিশ্চয়ই চিংড়ি। দু-চারটে বাগদাও আছে অবশ্য। তবু হাত খুলুক। জালে শম্ভুর কাছে কেউ না। তার জাল ছোটো-বাপ একটু-আধটু দেখিয়েছিল বটে, বাকি প্রায় পুরোটাই ওর নিজের হাতে বোনা। এ জালে কত মাছ ধরেছে শম্ভু। পরাণে লগি ঠেলছে। শালতির মাথায় দু-পায়ে সামলে দাঁড়িয়েছে শম্ভু। শম্ভু ইশারা করে আস্তে-তারপরেই জাল ছুড়ল-পদ্মপাতার মতো গোল হয়ে জাল পড়ছে। পরাণে লগি তুলে নিল। জাল টানছে শম্ভু-জলে দু-বার আছড়ে তুলে ফেলল। ঠিকই ভেবেছে চিংড়িই উঠেছে একরাশ, আরও

সব কুঁচো কাঁচা। শালতির খোল জাল ঝাড়তে ঝাড়তে শম্ভু সুর করে ছড়া কাটে-'কচি ছানা যেকেনে মা-রে খোঁজো সেকেনে।' জাল মাঝে মাঝে ঘাসে আটকে যাচ্ছে-গেঁড়ি গুগলি ঝিনুক উঠে আসছে গাদা গাদা। আরও কবার জাল বাইল শম্ভু। দু-চারটে নলা মলা বাদে সবই তো কুঁচো-আধ কেজিটাও হবে কি না! পরাণে বলল, 'খালি হাতে যাওয়ার চেয়ে এ ভালো।' তারপর শালতির মুখ ঘোরায়-'চ ঘর চ!' শম্ভু বিরক্ত হল-'এ্যাকন কী?'

'বাবু খিদে লেগেছে-বেলা দুপহর হলনি!'

'খা না-মুড়ি খা।'

'মুড়ি খেলেই হবে?'

আর কেউ কোনো কথা বলে না। জলে ঘাসে শম্ভুর চোখ ঘুরছে। পরাণে ঠোঁট পেঁচিয়ে লগি ঠেলছে। মাছ কি এক জায়গায় দাঁড়ায়? পরাণের শালতি চলে-আশপাশ বেশ দূর তক মাছেরা সাড়া পেয়ে যায়। ধাড়ি দু-একটার বুড়বুড়ি দেখা গেলেও মারা গেল না। শম্ভুর আপশোস-এখন অবধি এমন জায়গা পেল না যেখানে তৈরি মশলা ছড়িয়ে মাছ ধরতে পারে; তিনটে টাকা গেছে ওই মশলাটুকু করতে।

এখন দুপুর। এ সময় নাকি জলে মাছ নড়ে না। শম্ভু সায় দিলে পরাণে লগিটা দু-হাত আছড়ে পুঁতে ফেলে। একটা হালকা গেরো দিয়ে শালতিটা আটকে, পুঁটুলি খুলল পরাণে। শুধু মুড়ি নয়-সইমা কতগুলো নাড়ুও দিয়েছে, আছে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কাও। মুড়ি খেতে খেতে আবার সেই মহাশোলের প্রসঙ্গ ওঠে। শম্ভুর সংশয়-'তেনার অতবড়ো শরীরখানা থাকপে কোতায়? জল কই-একেনে তো বুক জলও হবে নি।' পরাণে গম্ভীর-মাথা নাড়ে-তাঁকে কি সবাই দেখতে পায় নাকি-নাকি রোজই দেখা যায়। তিনি কখন কোতায় থাকবেন-সে কেউ বলতে পারে না, হয়তো এ্যাকন একেনেই-আমাদেরই সামনে-কিন্তু ...' শম্ভুর মুখের দিকে তাকিয়ে পরাণের মুড়ি চিবোনো বন্ধ হয়ে গেল-শম্ভু তাকিয়ে আছে দূরে- স্থির দৃষ্টি-পরাণে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখতে যায়-'উরিব্বাস! ওটা কী করে!' পরাণের গা শিউরে উঠল। শম্ভু ততক্ষণে শালতি খুলে লগিতে জোর ঠেলা দিয়েছে, মুড়ির পুঁটুলি এলোমেলো-সেদিকে কে তাকায়।

কিন্তু কী যে ওরা দেখেছিল-কাছাকাছি যাবার আগেই তা জলে মিলিয়ে গেছে-শুধু জলের ঢেউগুলোই প্রমাণ দিল যাই ছিল-সেটা মস্তবড়ো কিছু। শম্ভু ছাড়বে না-যেন ভূতে পেয়েছে; পাগলের মতো লগি ঠেলে চলেছে-পানা দাম, ঘাস ভ্রূক্ষেপ নেই-মাঝে মাঝে নৌকো চলার এলোমেলো পথ। এগোতে এগোতে ছোট্ট একটা চর তার পাশ ঘুরতেই তেমনি যেন দিঘি একটা-স্থির জল-গভীর-এ তো বিল নয়-হোগলা কেটে সাফ করা এমনও মনে হয় না। লগি চলবে না। শম্ভু লগি রেখে দিয়েছে-পরাণেকে বইঠা বাইতে ইশারায় নিষেধ করছে। তার চোখ এখন নীচে জলের গভীরে। এই কি সেই মহাশোলের ঝাঁক? জলের অনেক নীচে মস্ত মস্ত শরীর নিয়ে কালো পাখনা নেড়ে পাক খাচ্ছে-এগুলো কি সেই লোক মুখের 'দোষ লাগা' যারা ঠাকুরের পিছে পিছে ঘোরে।

শালতি সামান্য দুলছে। শম্ভুর হাতে কোঁচ-কোঁচটাকে এখন আর তেমন ভরসা করতে পারছে না বুঝি-এ মাছ এত বড়ো-এত নীচে এ কোঁচ হয়তো ছুঁতে পারবে না-আর পয়লা মার ফসকালে বাকিদিনে আর দ্বিতীয় সুযোগ পাবে না। কিন্তু না-অনেক কিছুই মনে পড়ল শম্ভুর! সে যে শম্ভু আরও একবার মনে করাল নিজেকে। তারপর যেমন দেখেছে সাধুকাকাকে-ডান পায়ের ওপর ভর রেখে বাঁ-পাটা একটু এগিয়ে কোনাকুনি জলের ভেতর সমস্ত শক্তিতে ছুড়ে মারল কোঁচটাকে-হয়তো 'উফ' এরকম একটা শব্দও বেরিয়ে

এল মুখ থেকে। কোঁচটা চলে যাচ্ছে অস্পষ্ট বোঝা গেল মাত্র। আন্দাজেই ছোড়া। বুঝতে পারল না শম্ভু বা পরাণে-জলের নীচে গিয়ে কী আটকে রইল? ভেসে উঠল না কোনোটাই-না কোঁচ, না মাছ। শম্ভু ভাবল এবার আর হল না-সুযোগটা চলে গেল! পরাণের কাছে ছোটো হয়ে গেল বোধ হয়। এতদিনের আশা-সাধুকাকার কোঁচ! পরাণেটা এরকমই। যখন চেঁচাবে, মনে হবে যেন বাঘে ধরেছে ওকে। শম্ভু চমকে উঠেছিল। 'হুইই যো!' সত্যিই-ওই দূরে ভেসে উঠেছে নাকি কোঁচটা-সাধুকাকার তৈরি-মোম সুতোয় বাঁধা। কী আশ্চর্য! জলের ওপর ছটফট করছে-ওটা কী? এক লহমার জন্য শম্ভুর মনে হল-সে ঠাকুর মহাশোলটাকে মেরে বসেছে বুঝি। পরাণের বইঠা পড়ছে ঝপাঝপ। শম্ভু দু-হাতে জল কাটছে। জল ওখানটায় ফেনা হয়ে যাচ্ছে-আছাড়িপিছাড়ি গোল হয়ে কখনো পাক খাচ্ছে।-এটা কী?

পরাণে ফুর্তিতে লাফিয়ে উঠল-'গজার! গজার!' অনেকক্ষণ ঝটপটাল মাছটা-ক-বার কোঁচটাসুদ্ধ জলের গভীরে ডুব মারল-আবার ভেসে উঠল। শম্ভু স্পষ্ট দেখতে পেল সাধুকাকার কোঁচটা মাছটার পিঠের ওপর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়েছে বুঝি। বিশ্বাসই হচ্ছে না-এ্যাতবড়ো মাছটাকে শম্ভুই মেরেছে। আরও খানিক ধস্তাধস্তির পরে মাছটা কাত হয়ে খাবি খাচ্ছে। শালতিটা একদম কাছে নিয়ে গেল-এখন হাত বাড়িয়ে মাছটাকে ধরাও যায়। কোঁচটার শলা বেয়ে সরু রক্তের ধারা উঠছে জলে। কী বিশাল বড়ো মাছ-তার হাতের তিন হাতেরও বেশি হবে-গায়ের দু-পাশে সাদা কালো বড়ো বড়ো ফোঁটা। শাল মাছ! পরাণে এটাকে গজার বলছে। কোঁচসুদ্ধ তুলতে গিয়ে টের পেল মাছটা কীরকম ভারী-শালতি উলটে যেত বোধ হয়-দু-জনে প্রায় বুকে জড়িয়ে তুলে আনল মাছটাকে-'ক-কেজি হয় বলদিনি?' 'পাঁচ-ছ-কেজি হবে।'-'কী যে বলিস। পাঁচ কেজি কি চাট্টিখানি রে।'

মাছটা খোলের ভেতর শোল নলা বোয়ালের ওপর ঘটোৎকচের মতো শুয়ে পড়েছে। মাঝে লেজ আর পাখনা নেড়ে বোঝাতে চাইছিল সে এখনও মরেনি।

শম্ভুর মুখে হাসির চাইতে গর্বের রংটাই যেন বেশি। সে যে শম্ভু, তার সঙ্গে আর কেউ পারে না-পরাণে নিশ্চয়ই সেটা অনুভব করছে-এটাই বোধ হয় তাকে সবচেয়ে আরাম দিচ্ছিল। পরাণে বলে 'মুড়িটা খেনি!' শম্ভু বসে পড়ল। খোলা পুঁটলি থেকে মুড়ি অনেকটাই পড়ে গেছে-একটা নাড়ু গড়িয়ে মাছগুলোর মধ্যে। পরাণে সেটা নিয়ে শাল মাছটার মুখের সামনে ধরে-'খা!' বলে হেসে ওঠে-শম্ভুও হাসে।

পেটের অনেকটাই খালি। মুড়ি কিন্তু দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল-পেটে খিদেটা ঘাটের শ্যাওলার মতো-থেকেই যায়-যতই ঘষ। বিলের জল একটু লোনামতো-খাওয়া যায় না। শালতিতে বড়দা একটা জলের হাঁড়ি রেখে দিয়েছে-তাতে কদ্দিনের জল কে জানে-আছেও এইটুকু। জল ভরার কথা তাদের একবারও মনে হয়নি। এতক্ষণ মুড়ি চিবিয়ে গলা এখন শুকনো কাঠ-ওইটুকু জলে দু-জনের দু-ঢোঁকও বুঝি হয় না। পরাণে বলে, 'জলদি ঘর চ।' শম্ভু জবাব দেয় না-সে দেখছে জলের নীচে-যেখানে আলো যেতে যেতে ফুরিয়ে যাচ্ছে-এখন আর সেই মস্ত কালো কালো শরীরগুলোর একটাকেও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো আরও গভীরে তারা চলে গেছে-হয়তো ওখানেই আছে সেই মহাশোলটা। যাকে খানিক আগে দেখেছিল। জলের ওপর ভেসে আছে প্রায় একটা মানুষেরই মতো-মতো কেন-বোধ হয় মানুষই নাকি; পলক ফেলতে জলে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু সত্যি জল খাওয়া দরকার। হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে-ঘাম গড়াচ্ছে গায়ে। এখানে খাবার জল কোথায়? যদি অন্য কোনো নৌকোর দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু গোলমাল লেগে গেল। এখানে তারা এল কোনদিক থেকে? মনসার চর যেটাকে ভেবেছিল কাছে গিয়ে

দেখা গেল সেটা মনসার চর নয় এবং মনসার চরটা যে কোনদিকে তাও বোঝা গেল না। পরাণে বলে, 'দখনে চ-উত্তরে উজিয়ে এনু, তো দখনেতে সে ভুটভুটির রাস্তা পাব।' কিন্তু দক্ষিণে জলের গভীরতা কম-হোগলা আর ঘাসবন এত ঘন যে এগুনো অসম্ভব। পরাণে ঘাবড়ে গেল। গলা দিয়ে শব্দ ফুটছে না।

কিন্তু শম্ভু? সে তখন মনে আনার চেষ্টা করছে যখন একটা মানুষের মতো মাছ বা মাছের মতো মানুষ জলের ওপর ভাসতে দেখে এখানে ছুটে এল-সে মাছ মানুষ বা মানুষ মাছটা নৌকোর কোনদিকে ছিল-ডান হাতে না বাঁয়ে? যদি ডান হতে হয়ে থাকে-তখন মনসার চর ছিল বাঁ-দিকে। তার মানে যেদিক থেকে তারা এসেছে ঠিক ঠিক সে দিকেই মনসার চর- চরে পৌঁছে ভটভটির পথ পেতে অসুবিধা হবে না-আর ভটভটির পথ ধরে সোজা দক্ষিণেই হবে কুসুমগঞ্জ। এখান থেকে দক্ষিণে যাবার চেষ্টায় তারা কুসুমগঞ্জে কোনোদিন পৌঁছোতে পারবে না। জল ওদিকে কম মানে বোধ হয় বিল শেষ। গভীর জলে কি আর হোগলা হয়? তাহলে এখন ঠিক হবে পেছিয়ে যাওয়া-আবার সেই কালো গভীর জলে, তা ছাড়িয়ে হোগলার বন, তা পেরিয়ে কালীনদীর জল, ঢোকার মুখে সেই বাওড়-ওরই সামনে সেই মনসার চরে পৌঁছোনো। কাজটা সহজ নয়। শম্ভু উঠে দাঁড়াল-মনে মনে বোধ হয় বুক চাপড়াল-সে সর্দার শম্ভু। মুখে বলল, 'র দিকি।' তারপর আন্দাজ মতো বইঠা চালাল-বইঠা ফেলে লগি এবং লগি ঠেলতে ঠেলতে হোগলার বন পেরিয়ে মনসার চরের কাছাকাছি চলেও গেল।

তখন রোদ হেলে গেছে। চরে কারা বসে তামাক খাচ্ছে। পরাণে ফিসফিস করে বলে 'দূর দে চল। মাছ দেখলে কেড়ে নেবে।' ওরা কিন্তু দূর থেকেই হাঁক পাড়ল, 'কের্যা? কাদের শালতি?'

পরাণে পালটা হাঁক চেঁচায়-'রঘু হালদারের।' 'কে রঘু হালদার'-'কুসুমগঞ্জের!' খানিক চুপ। কে বলছে-'এরাই সকালে মাছ চুরি করতে এয়েছিল নাকি?' আবার হাঁক আসে-'তুই কে? এখেনে কিছু করতে এয়েছিলি নাকি?' আবার হাঁক আসে-'তুই কে? এখেনে কী?'

'রঘু হালদারের সইমার ব্যাটা!' শম্ভু ঝপাঝপ লগি ঠেলে ফের হোগলা বনে ঢুকে গেছে। বাতাসে হুমকি ভেসে আসে-'আমাদের ঘেরায় মাছ ধরলে ছাড়বুনি!' পরাণে চেঁচায়- 'সাইনবোট লাগিয়ে দাও কেনে!' ওরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে-'ধর ধর তো-দেখছ কী বদমাশ ছোঁড়া!' পরাণে তেমনি চেঁচিয়ে বলে, 'এসো কেন! দেঁড়িয়ে আচি!' পরাণে হাসছে, গজারটা দেখতে পেলে কেড়ে নিত, বলত, 'আমাদের ঘেরার মাছ।'

হয়তো একটু বেশি দূর দিয়ে যাবার চেষ্টায় ওরা যখন ভটভটির রাস্তায় এসে পড়ল সন্ধ্যা লাগছে, জলের কিনারে কিনারে অন্ধকার ভাসছে। দূর থেকে একটা ভটভটি আসে-নিশ্চয় হরিগঞ্জ থেকে কেনার গাঁ। শালতির কাছাকাছি হতে কে টর্চ ফেলল নৌকোয়, 'কী মাচ র্যা?' পরাণে জবাব দিল-'বিকরির নয়।' 'আরে ব্বাপ কত বড়ো একটা শাল ধরেছে রে ছোঁড়া দুটো। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও!' ভটভটি আস্তে হয়ে গেল। ভরতি লোক। 'এই শালটা দিয়ে দে পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি।' লোকটার মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। পরাণে বলল, 'বিকরির নয়।'

'কেন? এর চেয়ে বেশি দাম পাবি?'

পরাণে রেগে গেল-'বলচি না বিকোবে না। ঘর নে যাব।'

'আরে কথা শোন ছোঁড়ার। কোথা ঘর তোর?'

'কুসুমগঞ্জ।'

'কুসুমগঞ্জ? কার বাড়ি?'

'হালদার বাড়ি-রঘু হালদার।' নামটা নিশ্চয় পরিচিত।

ভেতর থেকে কে বলল, 'ছেড়ে দ্যান!' কে কাকে জিজ্ঞাসা করছে 'কে রঘু হালদার?' 'বিডিও আপিসের বড়োবাবু' কে যেন উত্তর দেয়। যে ভটভটি চালাচ্ছিল সে বলল, 'তুমি ফণীর কে হও?'

'ভাই। এটা বড়দার শালতি।' ভটভটির ইঞ্জিন আবার চালু হল। যে চালাচ্ছিল সেই বোধ হয় বলল, 'অনেকদূর চলে এয়েছ তাড়াতাড়ি ঘর যাও-বিল খুব খারাপ জায়গা!'

বইঠা একটা। পরাণে প্রাণপণে চালাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকারে ডান দিকে ঘোরার বাঁকটা ঠাহর করা কঠিন। শম্ভু আশ্বাস দেয়-'র। একটু বাদে চাঁদ উটপে।' চাঁদ উঠল-কিন্তু সেই আলোয় সবুজ হোগলা নলখাগড়ার বন নীল জল সবই একাকার। সেই বাঁকটা কি পেরিয়ে এল? ভটভটিটা এতক্ষণে বোধ হয় কেনার গাঁ পৌঁছে গেল-ট ট শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। পরাণে ভাবছে বড়দা ফেরার আগে ঘরে পৌঁছোতে না পারলে বিপদ। বইঠা এখন শম্ভুর হাতে-এই মাছটা এখন কী হবে? আজ রাতে আর বাড়ি ফেরা সম্ভব হবে না-বাপকে দেখানো গেল না কত বড়ো মাছ ধরেছে চিপুরির বিল থেকে।

জলে যেন আলো জ্বলছে-এখানে ওখানে। পরাণে বলে 'দেও,' ইদ্রিস বলত 'জিন'। কোণার ঘাটে আটকে জোরে মোচড় মারে বইঠায়-শালতি যেন লাফ দিল জলে। নৌকোর ঠিক সামনে জলে একটা আলো ভাসছে যেন-আলোটা কমছে বাড়ছে। পরাণে ফিসফিস করে বলে 'সাপধান! পথ ভোলাচ্ছে!' শম্ভুর গলায় থমথম-'ডরাস নাকি?' তেমনি মোচড় দেয় বইঠায়-যেন জলের সঙ্গেই লড়াই লেগেছে ওর-বইঠা ঝপাঝপ মেরেই যাচ্ছে-যেন কখনোই থামবে না-আস্তেও করবে না। তবু জলও যেন ফুরায় না-আরও জল-আরও। পরাণে বুঝি ভয় পেয়ে গেছে-ঠাকুর দেবতাকে ডাকছে নিশ্চয়।

আলোটা জলে পাক খাচ্ছে-ডানদিকে ঘুরে যাচ্ছে। শম্ভু যেন তেড়ে গেল আলোটাকে-শালতি ছুটেছে। পরাণের গলা শুকিয়ে খটখটে। সে জানে শম্ভুর সাহস, গায়ের জোর; জানে শম্ভু বাহাদুর। কিন্তু জলের ওই আলোকে তেড়ে যায়-এ শম্ভু তো ভয়ংকর। একটু আগেও সে দু-হাত দিয়ে জল কাটছিল, হাত তুলে নিল-ভয়ে নাকি? না, এখন মনে হচ্ছে শম্ভুকে সাহায্য করার দরকার নেই। ও শম্ভু-ও ঠিক নিয়ে যাবে কুসুমগঞ্জের ঘাটে- নাহয় সারাদিনই লগি ঠেলেছে-নাহয় ভাতই খায়নি-শম্ভু সব পারে। পরাণে শালতির সঙ্গে আঠা লেগে জুড়ে গেছে যেন-মনে ভাবে শম্ভুর সঙ্গে আর নয় এমন যাওয়া! একবার বলতে গেল-'যাচ্ছিস কোথায়? কুসুমগঞ্জ ফিরবি না?' কিন্তু চাঁদনির আবছা আলোয় শম্ভুর ঘাম চকচকে মুখ-ঘামভেজা গায়ে আলো পিছলে যাচ্ছে-চোখ-মুখ আবছা- চকচকে, ওকে দেখে কেমন ভয় করছে পরাণের-ও কোনো শব্দই করতে পারল না।

জলের আলোটা কোথায়? ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি যেন আকাশ ছেড়ে জলের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে-হোগলা নলখাগড়ার বন ছেয়ে আছে তাদের ফুল ফুল আলো। 'তোদের ঘাটে এয়েচি!' শম্ভুর গলাটা কেমন খসখস করে উঠল-সত্যি! হালদার বাড়ির ঘাট! ঘাটে আলো জ্বলছে-লোকজন দাঁড়িয়ে নৌকোও যেন কয়েকটা!

'সব্বোনাশ!' পরাণের গলা দিয়ে ফসফস করে একটু হাওয়া বেরোল শুধু। কাছাকাছি হতে একসঙ্গে কতগুলো টর্চের আলো এসে পড়ল ওদের ওপর-'ওই যে! ওই যে ওরা।' আট-দশজন লোক দু-খানা নৌকো নিয়ে বেরোচ্ছিল ওদের খুঁজতে। বড়দা, ছোড়দা,

মেসো, সেই পিসি-সবাই ঘাটে। বড়দা কাউকে কিছু বলতে দিল না, শুধু মাছটা দু-হাতে তুলে বলল, 'শাবাশ! এটাকে তুললি কী করে? এ যে অরিজিনাল তেনার ঝাঁকের মাছ!'

সব মাছ হেঁসেলে চলে গেলেও সেই বিশাল শাল বা গজার আঙিনায় পড়ে রইল তেমনি চিত হয়ে। তার সামনে পিসি একটা হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল। পাড়ার লোক আসছে তো আসছেই-ভিড়ই হয়ে গেল। কেউ বিশ্বাসই করছে না ওটা ওরা মেরেছে। আশ্চর্য!

## মহাশোল

সইমা কাঁদছিল খুব। বকল পরাণেকে, 'এমন কত্তে আচে রে পোড়া কপালে! বাপকে খেয়ে আচিস-তোর যদি কিছু হত? মার কতা কি ভাবিস?-মার কী হত রে অভাগা!' সইমা সে মাছের কপালে তেল সিঁদুর দিল-ধান দুর্বো দিয়ে গড় করল-আর ঝাঁকের মাছ যে অনেক পুণ্যে ঘরে এসেছে। সে রাতেই মাছটার দর উঠল একশো পঁচিশ টাকা। বড়দা বলল, 'বেচেদি-শম্ভু পরাণের বাড়িতে উপকার হবে-এ তো নিয়ে যাওয়া চলবেনি।' হাজরাবাবুরা কিনে নিলেন। কে বলল 'ছ-কেজির ওপর মাছটা, হাজিপুরে কম করে দেড়-শো।' বড়দা বলে, 'নে যাবেটা কে?'

রাতে নানারকম রান্না হল-মাছ ভাজা, চচ্চড়ি, ঝোল, টক। মেসো আর বড়দার মাঝখানে বসেছে শম্ভু আর পরাণে। 'জানো বড়দা, আসচি-দেকি জলের ভেতর আলো জ্বলচে।' মেসো বলল, 'সে আলো আমিও একবার দেকিচি। সরোর সম্বন্ধ এল হবিগঞ্জ থেকে- কানাইকে নে গেলাম। বাবার সেই দুই দাঁড়ের নাওটা ছিল-যায় যেন লাপিয়ে লাপিয়ে। খেয়ে-দেয়ে ফিরতে অনেক রাত। তিন নম্বর ছাড়িয়ে আসচি-দিকি জলে দাউদাউ আগুন-দপ করে জ্বলে উঠে-তারপরেই আর নেই।' 'ও তো আলেয়া!' বড়দা হেসে ওঠে। মেসো খুব রেগে গেল-'কীসের আলেয়া? আলেয়া আমি চিনি নে?'

ভোরে উঠতে হবে ভোরেই ফিরতে হবে-না হলে বাপ ভাববে-পরাণের মাও কাঁদতে শুরু করবে। শুয়ে শুয়ে শম্ভু ভাবছে পরাণেকে বলবে কি না কথাটা। 'তুই যে আলো দেকেচিস জলে-কী রে ঘুম লাগল নাকি?'

'না, ঘুমোইনি। কী বলছিলি আলোর কথা?' পরাণ এপাশ ফেরে।

'ওই যে আলো দেকেছিস জলে-ওটা আলো ছিল না।'

'তবে?'

'ওটাই তো মহাশোল। পথমটা আমো বুজতে পারিনি। পরে দেকেচি। আর সারাক্ষণ ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেছিল কখনো শালতির নীচে-কখনো সামনে। ওর পাছু পাছুই তো ঘাটে চলে এলাম। আমি কি তোদের বিলের রাস্তা চিনি?'

*শারদীয়া ১৪০২*




# দেবাশিস সেন

## রজতের কথা

আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী সকলেই এ ধরনের লম্বা, উদ্দেশ্যবিহীন সফরে বেরোতে বারণ করেছিল। কিন্তু রজত কারও কথায় কান দেয়নি। রজত মিত্রের বয়স সাতাশ, একটা আধা বিদেশি কোম্পানির ফাইনান্স ম্যানেজার। অফিস থেকে ওকে গাড়িটা দিয়েছিল বছর দুয়েক আগে। গাড়ি চালানোটা ও সেই সময়েই শিখেছে। কিন্তু তার আগে থেকেই ওর মাথায় সেই ইচ্ছেটা ঘুরপাক খাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী সকলকেই ও বলত ওর শখটার কথা, 'আমার ইচ্ছে করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। একা, একদম একা, সঙ্গে কেউ থাকবে না। কোনো ফিক্সড ডেস্টিনেশন থাকবে না। মাইলের পর মাইল শুধু গাড়ি চালিয়ে যাব। এনজয় করব রাস্তার দু-ধারের নেচারকে। খিদে পেলে রাস্তার পাশের দোকানগুলোর তড়কা-রুটিতে পেট ভরাব। আর ঘুম? সেটা গাড়িতেই সারব। এই স্বপ্নটা আমি ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি। মাঝে মাঝে মনে হয় একের পর এক ডিগ্রি হাসিল করা, ভালো চাকরি, প্রোমোশান, বাড়ি, প্রপার্টি এ সব নয়; গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়াটাই বোধ হয় আমার লাইফের এইম।'

বন্ধুরা হাসত, 'অনেক ধরনের হবির কথাই শুনেছি। কেউ সিনেমা দেখে, কেউ আড্ডা মারে, কেউ দল বেঁধে হুল্লোড় করে বেড়াতে যায়, কেউ-বা নিদেনপক্ষে একা একা পাহাড়ে যায়। কিন্তু তোর মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে বোধ হয় কেউ বেড়াতে চায় না, তাও আবার গাড়িতে চেপে।'

রজত বলল, 'তোমরা হাসছ! কিন্তু আজ নাহয় কাল এভাবেই আমি বেড়াব। একা, একদম একা।'

অফিস থেকে গাড়ি পাবার পর গত দু-বছরে রজত বিন্দুমাত্র ফুরসত পায়নি। গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ... বেশিরভাগ শনি, রবিবারেও ওকে অফিসে ঢুঁ মারতে হত। দু-বছর পর অনেক কষ্টে চার দিনের ছুটির জোগাড় করতে পেরেছে রজত। বন্ধুবান্ধবরা বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে দু-একজন সঙ্গী হতে চেয়েছিল। কিন্তু রজত নারাজ, 'তোদের সঙ্গে দল বেঁধে একসঙ্গে বেড়াতে আমার খুবই ভালো লাগবে। কিন্তু সেটা অন্য সময়। এ বার আমার সঙ্গী আমি কাউকেই করব না।'

ভোর ছ-টার সময় রজত বাড়ি থেকে মারুতি জেন গাড়িটায় বেরিয়ে পড়েছে। এখন বেলা প্রায় এগারোটা। মাঝে দু-একবার গাড়ি থামিয়ে দু-পাশের সবুজ ধানের খেতগুলো দু-চোখ ভরে দেখেছে। বুক ভরে নিয়েছে দূষণমুক্ত হাওয়া। এখন রজত পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে তা বলতে পারব না। কেননা, রাস্তার ধারের পথ নির্দেশিকাগুলি থেকে ও যতটা পারে চোখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

বাঁ-দিকে একটা মোড় ঘুরতেই রজতের স্নায়ুগুলো টানটান হয়ে উঠল। উলটো দিক থেকে একটা লরি মাঝরাস্তা ধরে তির বেগে এগিয়ে আসছে। রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার জায়গা নেই। লরিটা ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল বলে। শেষ মুহূর্তে রজত গাড়িটাকে নামিয়ে দিল বাঁ-দিকের ঢালু জমিতে। একই সঙ্গে দ্রুত ডান হাতে দরজার লকটাও খুলে ফেলল ও। সামনের জমিটা যেন মনে হল উলটে যাচ্ছে ... মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা ... চাপ চাপ অন্ধকার রজতকে চারপাশে ঘিরে ধরল।

## রামেশ্বরের কথা

চোখ খুলতেই সূর্যের আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। মাথাটা দপ দপ করছে। পিঠের নীচে শক্ত অসমান কোনো জিনিসের অস্তিত্ব টের পেল। ও কোথায় শুয়ে আছে? এখানে এলই বা কী করে? আস্তে আস্তে ওর সব মনে পড়ল। নরহরির জমিটা কেনার জন্য ও শহরে গিয়েছিল। রেজিস্ট্রি অফিসে সই-সাবুদের পর কাঁধের ঝোলায় দলিলটা ভরে ও আর নরহরি বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। শুকনো হেসে নরহরি বলেছিল, ‘খুব সস্তায় দাঁওটা মারলে রামেশ্বরদা। নেহাত একটু অসুবিধেয় পড়ে গেছি, টাকাটার খুব দরকার, তাই তো জমিটা বেচে দিলাম। না হলে এমন সোনা-ফলানো জমি কেউ বেচে?’

ভুরু কুঁচকে ও বলেছিল, ‘এখন এ সব কথা তুলছ কেন? তোমাকে তো আমি ঠকাইনি। তুমি যা দাম চেয়েছিলে আমি তাই দিয়েছি। টাকাপয়সাও সব মিটিয়ে দিয়েছি। এখন আর ও সব কথা বলে লাভ কী?’

নরহরি কিছু বলার আগেই হঠাৎ ওর মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছিল। বুকে একটা ব্যথা ... আস্তে আস্তে ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল। হাঁটু ভেঙে রাস্তায় বসে পড়েছিল ও। অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে কানে ভেসে এসেছিল নরহরির ডাক, ‘কী হল রামেশ্বরদা, কী হল, ... ও রামেশ্বরদা ... রামেশ্ব ...’

এ বার ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রামেশ্বর। না, দলিল দস্তাবেজ সমেত ঝোলাটা ওর কাঁধে নেই। আশেপাশেও পড়ে নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল ও বসে আছে খোলা মাঠের মধ্যে। তার পরেই নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে ও চমকে উঠল ... একী, ওর শরীরে এ সব কী? ও তো জীবনে ধুতি আর লুঙ্গি ছাড়া আর কিছু পরেনি। কিন্তু এখন ওর পরনে শহুরে বাবুদের মতো শার্ট, প্যান্ট, পায়ে জুতো! নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে ও ভয়ংকর ভাবে চমকে উঠল ... ওর হাত দুটো এত ফর্সা হয়ে গেল কী করে? নিজের অজান্তে হাত দুটো উঠে এল মুখে ... আবার চমক! ওর গাল-ভরতি লম্বা দাড়িগুলো গেল কোথায়? মসৃণ গালের ওপর ওর হাত দুটো পিছলে গেল।

আস্তে আস্তে রামেশ্বর উঠে বসল। পেছন ফিরতেই গাড়িটা ওর নজরে পড়ল। সাদা রঙের গাড়িটা উলটে পড়ে আছে। গাড়িটার দিকে ও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রামেশ্বর বার কয়েক শহরে গেছে, কিন্তু এ ধরনের গাড়ি তো ও কখনো দেখেনি। গাড়িটার দিকে ভালো করে চোখ রেখে ও চিনতে পারল। বছর খানেক আগে হরিহরপুরের মেলায় বায়োস্কোপে ও এরকম গাড়ি দেখেছে। কিন্তু ও তো শুনেছিল এ ধরনের গাড়ি অনেক দূরের বড়ো বড়ো শহরে পাওয়া যায়। এ গাড়ি এখানে এল কোত্থেকে! গাড়ির ভেতরে বা চারপাশে কোনো মানুষজন তো নেই। আস্তে আস্তে গাড়িটার দিকে দু-পা এগোতেই সূর্যের আলোয় মাটিতে কী যেন একটা চকচক করে

উঠল। একটা ছোট্ট আয়না। হাত বাড়িয়ে আয়নাটা তুলে নিল ও। আয়নাটা মুখের সামনে আনতেই ভয়ংকর রকম চমকে উঠল রামেশ্বর। শিথিল হাত থেকে আয়নাটা মাটিতে পড়ে গেল। আয়নায় ওটা কার মুখ? ভয়ে ভয়ে রামেশ্বর আবার আয়নাটা হাতে তুলল। নিজের মুখের সামনে আয়নাটা নিয়ে ও হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ওর পঁয়ষট্টি বছরের একমাথা সাদা চুল আর গাল-ভরতি দাড়ি-সহ মুখটা বেমালুম বদলে গেছে! আয়নায় ভাসছে বছর তিরিশের এক ছোকরার মুখ!

ওলটানো গাড়িটার গায়ে হাত দিয়ে রামেশ্বর ঘুরে-ওঠা মাথাটা সামলাল। ঘটনাটা কী ঘটছে ও আদৌ বুঝতে পারছে না। ও কি পাগল হয়ে গেল নাকি? এ সব কী উলটোপালটা ঘটনা ঘটছে! এই জায়গাটাই বা কোথায়? এদিক-ওদিক তাকাতেই হাত কয়েক দূরে লম্বা টানা বাঁধটা ওর নজরে পড়ল। আস্তে আস্তে বাঁধের ওপরে উঠে আসার পর ওর ভুল ভাঙল। এটা বাঁধ নয়। একটা পাকা রাস্তা। রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ও থমকে গেল। ওই দূরের মন্দিরটা তো ওদের সোনাঝুরি গ্রামে ঢোকার মুখের সেই বুড়ো শিবের মন্দির। তার পাশের জঙ্গলমতো জায়গাটা তো বাঁশঝাড়। ও তো ওর গ্রামের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই পাকা রাস্তাটা এল কোথা থেকে? দু-দিন আগে শহরে যাবার সময়েও তো এই রাস্তাটা ছিল না। আর এদিক-ওদিকের জায়গাজমিগুলোও তো খুব একটা চেনা ঠেকছে না। তবে কি ও অসুস্থ হয়ে অনেকদিন কোথাও পড়ে ছিল? ও নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না, তবে ওর বাড়ির লোকেরাই বা ওকে কী করে চিনবে? ও যদি গ্রামে গিয়ে বলে ওর নাম রামেশ্বর দাস, তবে তো গ্রামবাসীরা ওকে বুজরুক বলে পিটিয়েই মেরে ফেলবে। কিন্তু একটা ধন্দ ওর কাটছে না। ও যদি অনেকদিন অসুস্থ হয়েই পড়ে থাকে তবে ওর ছেলে সুবোধ ওর খোঁজ করেনি কেন এতদিন? ওকে এই মাঠের মাঝখানেই বা কে ফেলে রেখে গেল?

কিছুক্ষণ ভাবনাচিন্তার পর ও হাঁটা দিল সোনাঝুরি গ্রামের দিকে। ওর ধন্দগুলো গ্রামে না গেলে কিছুতেই পরিষ্কার হবে না।

বুড়ো শিবের মন্দিরকে পাশ কাটিয়ে বাঁশঝাড়টাকে ডাইনে রেখে কয়েক পা এগোতেই পরিচিত দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ফুটে উঠল। কিন্তু সব চেনা চেনা জায়গাগুলোও যেন কেমন পালটে গেছে। নন্দীপুকুরের পাশের ঘোষালদের দোতলা দালানবাড়িটা যে তিনতলা হয়ে গেছে ... মনসা তলার মাঠটাতে এত বাড়িঘর হল কবে! ফিঙের ডাক শুনে সে দিকে তাকিয়ে অবাক ... বিজলির তার! গ্রামে কারেন্ট এসে গেছে। আশেপাশের লোকজন ওর দিকে তাকাচ্ছে। কাউকেই চিনতে পারল না রামেশ্বর। গ্রামের পরিচিত লোকেরা সব গেল কোথায়? জিজ্ঞাসু চোখগুলোকে এড়িয়ে ও দ্রুত পা চালাল বাড়ির দিকে।

দূর থেকে বাড়ির চেহারা দেখে চমকে উঠল রামেশ্বর। এ কী হতশ্রী অবস্থা হয়েছে বাড়িটার! দেওয়ালের বাঁশের বেড়া জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে, ছাদের অবস্থাও একই রকম। তুলসী মঞ্চটা অর্ধেক ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। সামনের দাওয়ায় বাঁশের খুটিতে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে সুবোধ। খালি গা, পরনে ময়লা ধুতি। সুবোধ বলে চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল রামেশ্বর। না, না, এ তো সুবোধ নয়। চেহারায় মিল থাকলেও এ তো অন্য লোক। তা ছাড়া ও নিজের পরিচয়ই বা কী দেবে?

আস্তে আস্তে রামেশ্বর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লোকটা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। অবাক চোখে তাকাল রামেশ্বরের দিকে। একটু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে রামেশ্বর বলল, 'ইয়ে সুবোধ ... সুবোধ বাড়ি আছে?'

'বাবা তো বাড়ি নেই। শক্তিনগরে গেছে। কাল ফিরবে।'

বাবা! ভীষণরকম চমকে উঠল রামেশ্বর! এ তাহলে সুবোধের ছেলে-তপন কিংবা রতন। কিন্তু দু-দিন আগে শহরে যাবার সময় ওদের বয়স ছিল ছয় আর চার। কিন্তু এই ছোকরার বয়স তো তিরিশ-পঁয়ত্রিশের কম নয়। তাহলে মাঝখানের এই তিরিশটা বছর গেল কোথায়?

ছেলেটি আবার বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

সংবিৎ ফেরে রামেশ্বরের। দ্রুত চিন্তা করে নেয় ও। সুবোধ কালকের আগে ফিরছে না। পরিচয়ের ঝামেলাটা এড়ানো যাবে। কিন্তু তিরিশ বছরের হিসেবটা মেলাতে গেলে ওকে কিছুক্ষণ তো এখানে থাকতেই হবে, 'না, না, তুমি আমাকে চিনবে না। তোমার বাবা অবশ্য আমাকে খুব ভালো করে চেনে। তা তোমার নামটা কী? মানে তুমি তপন না রতন?'



অবিশ্বাসী দৃষ্টি নিয়ে তাকাল ছেলেটি, 'আমি তপন। কিন্তু বাবা আপনাকে ... মানে ...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কয়েক বছর আগে আলাপ হয়েছিল। আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।'

'ও আচ্ছা।' দোনোমনোভাবে একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে তপন বলল, 'আপনি বসুন। আমি আসছি।'

রামেশ্বর বসতে তপন ঘরের ভেতরে চলে গেল। এদিক-ওদিক তাকাল রামেশ্বর। সব চেনা দৃশ্য। দাওয়ার দিকে নজর ফেরাতে চোখে পড়ল ওর ঠিক হাতখানেক দূরে বেশ কিছু অদরকারি ভাঙা জিনিসপত্র ডাঁই করে রাখা। ওগুলোর ফাঁকে একটা চেনা জিনিসের একটুকরো চোখে পড়তেই দ্রুত হাতে ও সেটা টেনে নিল। এই তো সেই ছবিটা। হরিহরপুরের মেলাতে করকরে দুটো টাকা দিয়ে ছবিটা তুলিয়েছিল রামেশ্বর। তপন আর রতনকে দু-হাতে জড়িয়ে বসে আছে ও। এই তো ওর ধবধবে সাদা চুল, এক মুখ সাদাকালো গোঁফদাড়ি। এটাই তো ওর নিজের মুখ। তাহলে ওর মুখটা এভাবে পালটে গেল কীভাবে? ঘরের ভেতর থেকে মানুষজনের এদিকে আসার আওয়াজ পেয়েই রামেশ্বর দ্রুত ছবিটা শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল।

ঘরের ভেতর থেকে তপন বেরিয়ে এল। ওর পেছনে আরেকটি ওরই বয়সি ছেলে। মুখের আদলে মনে হয় এ রতন। রতন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রামেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবার কাছে কি আপনার কোনো দরকার আছে?'

‘আরে না না, এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। কিন্তু তোমাদের বাড়ি ঘরদোরের এ কী অবস্থা? তোমার ঠাকুরদার আমলে তো তোমাদের অবস্থা ভালোই ছিল।’

রতন ছেলেটা বোধ হয় রামেশ্বরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, ‘ঠাকুরদার সময়ের কথা আপনি জানলেন কী করে?’

‘আরে তোমার বাবার কাছে কত গল্প শুনেছি। তোমার বাবা ঘরের বেড়া একটু ভাঙলেই সঙ্গেসঙ্গে ঠিক করে দিত। ঘরের ভেতরে নাকি কোনোদিন একফোঁটা জল পড়লেই পরের দিন চালের খড় পালটে দিত। চাষ করে যা পেত তাতে তো সংসার বেশ ভালোভাবেই চলত। তা ছাড়া আমি … ইয়ে মানে রামেশ্বরবাবু যে জমিটা কিনেছিলেন তাতে করে তো এতদিনে তোমাদের দালান তৈরি করা উচিত ছিল।’

হো-হো করে হেসে উঠল রতন, ‘কীসব উলটোপালটা বকছেন। ঠাকুরদা আবার কবে জমি কিনলেন। এ সব খবরও কি বাবা আপনাকে দিয়েছিল। নাঃ, বাবার দেখছি ভীমরতি ধরেছিল। শুনুন বাবু, আমাদের নিজের এক ছটাকও চাষের জমি নেই। অন্যের জমিতে জন খাটি। এ বছর কাজকর্মও তেমন নেই। তাই বাড়ি ঘরদোরের এই হাল হয়েছে।’

‘কেন?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রামেশ্বর, ‘বোসপুকুরের পশ্চিম দিকের সেই তিরিশ বিঘে জমিটার কী হল?’

‘ওখানে তো আমাদের কোনো জমি নেই,’ এ বার মুখ খুলল তপন, ‘ওটা তো সুবলের জমি।’

সেকী! চমকে উঠল রামেশ্বর। সুবল মানে তো নরহরির ছেলে। ও এতদিন কোথায় ছিল কে জানে? এই সুযোগে নরহরি জমি বিক্রির কথাটা বেমালুম চেপে গেছে। অথচ ও ওর সমস্ত জমানো টাকা দিয়ে জমিটা কিনেছিল। ভুল একটাই করেছিল, ও শহরে যাবার আগে কাউকেই জমি কেনার কথা বলে যায়নি।

রতন বলল, ‘ঠাকুরদা মারা গেছেন প্রায় তিরিশ বছর হল। কখনো তো শুনিনি ঠাকুরদা কোনো জমি কিনেছেন।’

মারা গেছে! থরথর করে কেঁপে উঠল রামেশ্বর। বলছে কী এরা! ত্রিশ বছর আগে রামেশ্বর মারা গেছে! তাহলে ও কে? সংবিৎ ফিরতে ওর মনে হল রামেশ্বরের তো বেঁচে থাকারও কথা নয়। শহরে যাবার সময় ওর বয়স পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গিয়েছিল। তার পরে তিরিশ বছরে তো ওর বয়স এক-শো ছুঁইছুঁই করবে। একটু আগে আয়নায় ও যে মুখ দেখেছে সেটা তো বছর পঁচিশ-তিরিশের এক ছোকরার মুখ। মাথা ঠান্ডা করে রামেশ্বর ভাবল, নিজেকে নিয়ে চিন্তাটা পরে করলেও চলবে। আগে জমির ব্যাপারটা ফয়সালা করতে হবে। উঠে দাঁড়িয়ে রামেশ্বর বলল, ‘এখনই সুবলের বাড়ি চলো। ওই জমিটা তোমাদের। রামেশ্বর ওই জমিটা কিনেছিলেন নরহরির কাছ থেকে। চলো এখনই চলো।’

অবাক হয়ে দু-ভাই ওর দিকে তাকাল। আমতা-আমতা করে রতন বলল, ‘কিন্তু আপনি কী করে … মানে …’

ওকে থামিয়ে রামেশ্বর বলল, ‘এখন আর কোনো কথা নয়। এসো আমার সঙ্গে। আচ্ছা দাঁড়াও। গ্রামের মাতব্বরদের ডাকো। দলবল বেঁধে না গেলে ও স্বীকার করতে চাইবে না।’

রামেশ্বর যখন নরহরির বাড়ির সামনে দাঁড়াল তখন ওর সঙ্গে তপন আর রতন ছাড়াও আরও বেশ কিছু লোক ওর সঙ্গী হয়েছে। ঘটনাটা শুনে সকলেই দোটানার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু রামেশ্বরের চেহারা, চালচলনে পুরো ব্যাপারটা কেউ উড়িয়েও দিতে পারছে না। রামেশ্বর নরহরির বাড়ির দিকে তাকাল। ভোল পালটে গেছে বাড়িটার। ছিল কুঁড়েঘর। এখন হয়েছে দোতলা দালান। পথে আসতে আসতে ও নরহরির মৃত্যু সংবাদও শুনে নিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে রামেশ্বর বলল, 'ডাকো সুবলকে।'

তপন ডাকল, 'সুবলদা, ও সুবলদা। বাড়ি আছ নাকি? একবার বাইরে এসো তো।'

সুবল বাইরে আসতে তপন বলল, 'সুবলদা, এই শহরের বাবু কী যেন বলছে। ওই বোসপুকুরের পাশের জমিটার ব্যাপারে। ওটা নাকি ইয়ে মানে ...'

ওকে থামিয়ে রামেশ্বর সরাসরি সুবলের দিকে তাকাল, 'ওই জমির দলিলটা নিয়ে এসো।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল সুবল।

'মানে আর কিছুই নয়। তোমার বাবা আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগে রামেশ্বরকে যে জমিটা বিক্রি করেছিলেন তার কাগজপত্র নিয়ে এসো।'

কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে মুচকি হেসে সুবল বলল, 'কত্তা কি ওই বিক্রির সাক্ষী ছিলেন নাকি? কিন্তু কত্তা ত্রিশ বছর আগে কি আপনি জন্মেছিলেন?'

'থামো।' ধমকে উঠল রামেশ্বর, 'ভালোয় ভালোয় কাগজপত্র দিয়ে দাও।'

মুখের চেহারা পালটে গেল সুবলের। হিংস্র মুখে ও বলল, 'কীসের কাগজপত্র? জমি কি বিক্রি হয়েছিল নাকি? যান যান। শহরে থাকেন ওখানেই যান। গেরামের মামলায় নাক গলাতে আসবেন না।'

'ও আচ্ছা,' ঘুরে দাঁড়িয়ে রামেশ্বর গ্রামের মাতব্বরদের দিকে তাকাল, 'এ সোজা রাস্তায় দলিল দেবে না। তবে তপন চিন্তা কোরো না। শহরে উকিল বীরু রায়ের কাছে এই জমির দলিলপত্র আছে। ওর কাছে চলে যাও। উনি যদি বেঁচে নাও থাকেন ওর ছেলেও তো উকিল। বাপের কাজকর্ম ওই দেখত। ওর কাছে সব পাবে। তবে হ্যাঁ' ... এ বার গলা চড়িয়ে রামেশ্বর বলল, 'এতদিন সুবল জমি বিক্রির কথা চেপে গিয়েছিল। জঘন্য অপরাধ করেছে ও। কাগজপত্র নিয়ে আসার পর ওকে আমি চোদ্দো বছর জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়ব। তবে এখনও সময় আছে, সুবল যদি কাগজপত্র দিয়ে দেয় তবে সব অভিযোগ আমরা তুলে নেব। কী বল তপন? আপনারা গ্রামের বিজ্ঞজনেরা আছেন। আপনারা দেখুন বুঝিয়ে কিছু করতে পারেন কি না।'

মৃদু গুঞ্জন শুরু হল। রামেশ্বরের গলার স্বরে কিছু একটা ছিল যাতে গ্রামবাসীরা সকলেই ব্যাপারটা সত্যি বলে ধরে নিল। জেলের ঘানি টানার হুমকিটাও সুবলকে কিছুটা ঘায়েল করেছে। রামেশ্বর চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ দু-পক্ষের কথাবার্তার পরে সুবল ভেঙে পড়ল। স্বীকার করল জমি বিক্রির কথা। মাথা নীচু করে ঘর থেকে নিয়ে এল দলিলটা।

বেলা পড়ে এসেছে। অনেক কষ্টে তপন-রতনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে রামেশ্বর আস্তে আস্তে গ্রামের বাইরে বেরিয়ে এল। দুপুর থেকেই তপনরা ওকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে রয়েছে। ওদের কাছে রামেশ্বর যেন আকাশ থেকে নেমে আসা এক দেবদূত। কিন্তু

রামেশ্বর নিজে কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না। নিজের পরিচয় নিয়ে ওর ধন্দটা কাটছে না। হাঁটতে হাঁটতে ওলটানো গাড়িটার সামনে এসে ও থমকে দাঁড়াল। ও কে? কোথা থেকে এসেছে? এখন যাবেই বা কোথায়? এই গাড়িটার সঙ্গে কি ওর কোনো সম্পর্ক আছে?

পিছনে একটা পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল রামেশ্বর। কয়েক হাত দূরে একটা লাঠি হাতে এগিয়ে আসছে সুবল। রামেশ্বর তাকাতেই একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে ও ছুটে এল। ধারেকাছে কেউ নেই। প্রাণ বাঁচাতে রামেশ্বরও ছুট দিল।

পাকা রাস্তাটার ওপরে উঠে রামেশ্বর আর রেহাই পেল না। সুবলের লাঠিটা সজোরে আঘাত করল ওর মাথায়। হাঁটু ভেঙে আস্তে আস্তে ওর শরীরটা শুয়ে পড়ল রাস্তার ওপরে।

## রজতের কথা

চোখের সামনে ঝাপসা কয়েকটা মুখ। আস্তে আস্তে দৃশ্যগুলি সব পরিষ্কার হয়ে এল। উদবিগ্ন দৃষ্টিতে রজতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ওর বাবা, মা, দুই বন্ধু দীপক আর সুহাস। রজত চোখ খুলতেই দীপক বলল, 'থ্যাংক গড। তা অ্যাকসিডেন্ট করলি কী করে?'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে রজত বলল, 'আমি কোথায়?'

রজতের বাবা বললেন, 'তোকে নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়েছে। সোনাঝুরি বলে একটা গ্রামের কাছে তোর গাড়িটা উলটে গিয়েছিল। গাড়িটা রাস্তা থেকে নীচে পড়েছিল। তুই ঠিক রাস্তার ওপরে। তোর মাথায় চোট লেগেছে শরীরের আর কোথাও বিশেষ কিছু হয়নি। এক ট্রাক ড্রাইভার তোকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তুলে এনেছিল।'

আস্তে আস্তে রজতের সব মনে পড়ল। একটা মোড় ... লরি ছুটে আসছে ... সরু রাস্তা ... গাড়িটা নামিয়ে দিল ঢালু জমিতে ... তার পর, তার পর ... তার পর সব অন্ধকার। ও বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে সব।'

ওর মা দু-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কতবার তোকে নিষেধ করেছিলাম এভাবে একা লং ড্রাইভে না যাবার জন্য, তুই তো শুনলি না কোনো কথা।'

মৃদু হেসে রজত বলল, 'যা বলেছ। শখ আমার মিটে গেছে। সত্যি ব্যাপারটাতে বড্ড রিস্ক থেকে যায়। এবার বেরোলে দলবল নিয়েই বেরোব।'

অন্যরা কেউ কোনো কথা বলার আগেই ঘরে ঢুকল একজন নার্স, 'আপনারা এখন যান। ওঁকে রেস্ট নিতে দিন।'

ঘর ফাঁকা। পাশ ফিরতে রজতের নজরে পড়ল বেডের পাশের ছোট্ট টেবিলে ওর মানিব্যাগ। কিন্তু মানিব্যাগের নীচে ওটা কী? হাত বাড়িয়ে টেনে নিল রজত। একটা বহু পুরোনো ছবি। ধবধবে সাদা চুল, এক মুখ সাদাকালো দাড়ি-সহ এক বৃদ্ধ দুটো বাচ্চা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হাসিহাসি মুখে বসে আছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রজত। এ কার ছবি? ওর মানিব্যাগের সঙ্গেই বা এই ছবিটা কেন রয়েছে?




স্বাতী ভট্টাচার্য

মুকুল আর মিল্টি স্কুল থেকে ফিরে দেখে বাড়িতে রীতিমতো হইহই কাণ্ড। বোন চায়নার বাসনগুলো দেওয়াল-আলমারির তাক থেকে নেমে এসেছে টেবিলের এক্কেবারে মধ্যিখানে। মানদা ব্যাজার মুখে কোমরে ময়লা আঁচল জড়িয়ে ফরসা একটা কাপড় দিয়ে সেগুলো মুছছে। রান্নাঘরে মা আর বেবি-আন্টি ঝানাঝন ঘটাঘট শব্দে রান্না করছে। তার গন্ধগুলো যেমন অদ্ভুত তেমনি সুন্দর। একদিকে ওভেনে হলুদ কেক ব্রাউন হবার পথে, অন্যদিকে মিক্সি চলছে ঘরঘর। গিরিধারী চোখমুখ কুঁচকে সোফার হাতল, টেবিলের কাচ, টি-পয়ের পায়া ঝেড়ে চলেছে তো চলেছেই। ফোন বেজে উঠল দু-বার। কপালে অনেকগুলো ভাঁজ নিয়ে মা কী সব কথা বলে আবার দৌড়ে চলে গেল রান্নাঘরে। ওরা দুটো জলজ্যান্ত লোক দাঁড়িয়ে আছে, তা চেয়েও দেখল না মোটে। ভাবা যায়!

শোবার ঘরে ঢুকে ধপাধপ ব্যাগগুলো আছড়ে ফেলল ওরা। মুকুলের জুতো দুটো একছুটে কোথাও উধাও হল, তাদের ফিরিয়ে আনতে মনে হয় স্পেসশিপ লাগবে। মিল্টি মোজা খুলে গুঁজল বালিশের নীচে। তারপর বলল, 'ব্যাপার কী বল তো?'

উত্তর দিল তিন বছরের মিতুল। ছাড়া কাপড়ের বাস্কেটে টেকো পুতুলটা নিয়ে বসে বসে আঙুল চুষছিল ও। বলল, 'বাবাল বছ আসবে।'

'কে আসবে?'

'বছ।'

'ওঃ, বস,' বলল মুকুল। 'সেই যে রে, গত মাসে আসার কথা ছিল নিউ ইয়র্ক থেকে।'

'নিউ ইয়র্ক নয়, ডেট্রয়েট-' বলল মিল্টি।

'নিউ ইয়র্ক।'

'ডেট্রয়েট।'

'তুই ছাই জানিস।'

'তুই ডবল ছাই।'

ছাইয়ের পিঠে ছাই চাপল খানিকক্ষণ। অন্যদিন কয়েক টন ছাই জমার আগে থামত না ভাইবোন। কিন্তু আজ ফরসা গোল গোল নুড়ি ফেলা রাস্তার উপর গাড়ির চাকার আওয়াজ পেয়েই ছুটল মুকুল, মিল্টু, মিতুল, 'বাবা এসে গেছে।'

'বস কখন আসবে বাবা?'

'কোত্থেকে আসছে?'

‘কেমন দেখতে, গোঁফ আছে?’

‘শুধু ইংরেজি বলে, না বাবা?’

‘ললিপপ আনবে না বছ?’

মা বেরিয়ে এসে তাড়া দিলেন, ‘তোমরা তিনজন যাও তো, আমার অনেক দরকারি কথা আছে বাবার সঙ্গে।’

বাবার পিছন পিছন শুধু ওরা হাজির হল খাবার টেবিলে। মা প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘জানতে পারলে কোথাকার লোক?’

‘নাঃ,’ হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন বাবা। ‘এমনকী নামটাও উদ্ধার করতে পারলাম না। শুধু ওই একটা টেলিগ্রাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর কামিং ফ্রম ডেট্রয়েট।’

মুকুল বিজেতার হাসি হাসল। মিল্টি পাত্তা দিল না মোটেও। ডেট্রয়েট আর নিউ ইয়র্ক কতটুকু বা দূর?

মা অভয় দিলেন, ‘তুমি চিন্তা কোরো না, সব রাজ্যের রান্নাই করছি আমি। মোগলাই, সাউথ ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল সব ক্যুজিনই থাকছে। বাঙালির মাছ ভাত তো থাকছেই। এ্যাদ্দিন পরে দেশের খাবার খেতে ইচ্ছে হতে পারে তো।-এ্যাই বেবি, পাবদার একটা ছোটো পিস নিয়ে আয় না!’ ছোটো নয়, বেশ জাবদা সাইজেরই পাবদা এল একটা। তারপর মটন বিরিয়ানি, তারপর সম্বর ডাল, ফুলো ফুলো ইডলি। তারপর নারকোল গুঁড়োর পাউডার মাখা ঝিঙের স্লাইস।

‘একী!’ আঁতকে বাবার গলায় সম্বর আটকে যাচ্ছিল।

‘ভেজিটেবিল ভেংকটেশ্বর’ জানালেন মা। ‘সাউথ ইন্ডিয়ান। আর এইটা-‘ থিকথিকে দইয়ে পটল ভাসছে। ‘পরোয়ার ভোজপুরিয়া।’ মা আলাপ করিয়ে দিলেন। ‘আর এইটা হল বাঁশের কাঁড়ের চচ্চড়ি, নাগা প্রিপারেশন। এ ছাড়া পুলিপিঠে, মোহনভোগ, কেক উইথ কাস্টার্ড …’

‘করেছ কী?’ বাবার গলায় প্রশংসা আর বিস্ময় মিলেমিশে গেল যেন স্ট্রবেরি মিল্কশেক। ‘সায়েব কালকের ট্রেনে কলকাতা যেতে চাইলে হয়।’

‘তাও তো শুঁটকি মাছের পদ কিছু রাখা হল না।’ খুঁতখুঁত করতে লাগলেন মা।

‘থাকগে থাকগে,’ বললেন বাবা। ‘শুঁটকি মাছের জন্য আমার প্রমোশন আটকাবে না।’

‘তা কি বলা যায়,’ মায়ের গলা গম্ভীর, ‘চেষ্টা তো করতেই হবে এই অজ পাড়াগাঁ বিলাসপুর থেকে কলকাতা ফিরতে। নইলে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনারই বা কী হবে, আর আমার কুকিং ক্লাস, ইকেবানা, সিনে ক্লাব, লেডিজ সার্কেল, সোশাল স্কোয়ার তাদেরই বা কী হবে?’

‘সে তো ঠিকই,’ বাবা উঠে পড়লেন তাড়াতাড়ি। ‘মুকুল, মিল্টি একটু চিকেন চিংকারা টেস্ট করবি নাকি?’

আসলে বাবা জানেন বিলাসপুরের খোলা মাঠ, হাজার বন্ধু, নিশ্চিন্ত পথঘাট ছেড়ে কলকাতা যাবার ইচ্ছে মোটেই নেই মুকুল-মিল্টির।

দুপুর বেলা তিন ভাইবোন বসে প্ল্যান অফ অ্যাকশন ঠিক করল। সায়েব রকমারি খেয়ে খুশি হয়ে প্রমোশনটি করে দেবে, আর ওরাও তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ভিড়েভিড়াকার

কলকাতায় ফিরে যাবে, তা হতে দেওয়া যায় নাকি? তেমন কিছু ভাবতে হল না অবশ্য, অ্যাটাকের নকশা ওদের তৈরি থাকে। প্রথমে হাতে বিছুটি লুকিয়ে হ্যান্ডশেক, তারপর চেয়ারের তলায় মার্বেল, আর চেয়ারের ওপরে গাবের আঠা, ডালে লঙ্কা, পায়েসে নুন, মৌরিতে পাথর। এতেও যদি না শানায় গাড়ির টায়ারের হাওয়া খুলে দিলেই হবে। অমন ওরা ঢের দিয়েছে।

বিকেল হতেই মা টেবিল সাজানো শুরু করলেন। অন্যদিন লোডশেডিংয়ের সময় মোমবাতি জ্বালতে হলে বিলাসপুরকে কত গালাগালি করেন। আজ নিজেই লম্বা লম্বা বাহারি মোমবাতি রাখলেন টেবিলে। ছ-টা ম্যাট পড়ল, উপুড় করা ডিশ, পাশে ভাঁজ করা ন্যাপকিন। মধ্যিখানে বোলে ধরা থাকবে খাবার।

বস এলেন সাতটার পর। গাড়ি থেকে সুট, বুট, হ্যাট-পরা সাক্ষাৎ সায়েব নামলেন। তারপরে বাবার পিছন পিছন ঢুকতেই তার মুখের দিকে প্রথমে অবাক হয়ে চেয়ে রইল মুকুল মিল্টি, তারপর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ওই ঢুলুঢুলু চোখওয়ালা বড়োসড়ো মুখ চেনা চেনা লাগছে কেন? এমনকী মিতুলও আঙুল চোষা থামিয়ে রইল চেয়ে। মা অবশ্য কিছু খেয়াল করেননি। হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে সায়েবের হাতটা ধরতেই 'আঁ-আঁ আঁ' সে কী চেঁচানি সায়েবের। ড্যাবাড্যাবা চোখ উলটে এ্যায়সা বড়ো হাঁ করে চেঁচিয়েই চলেছেন। আর সঙ্গেসঙ্গে হাড়গোড়ে যেন ঠোকাঠুকি লাগছে, এমনকী ঢক ঢক আওয়াজে বাবা তাড়াতাড়ি ওকে ধরে বসিয়ে দিলেন সোফায়, মা ব্যস্ত হয়ে একটা টেবিল-ম্যাট তুলে হাওয়া করতে লাগলেন আর গিরিধারী দৌড়ে এক গ্লাস জল এনে-সটান সায়েবের মুখে। 'গাগ গাল গ্লপ' জল গেলার সঙ্গেসঙ্গে চেঁচানিও থামল ভদ্রলোকের। মুকুল হাত আড়াল করে বিছুটি লুকিয়ে ফেলল আবার। একটু ছুঁলেই যদি এমন হয়-



ওরা তিনজন একে একে গিয়ে সায়েবকে 'হ্যালো' বলল। তিনি কিছুই বললেন না, এমনকী মাথার হ্যাটটাও খুললেন না। একবার শুধু গলার মাফলারটা টেনে সর্দি মুছে নিলেন। মস্ত মুখের নীচে গলাটা কী সরু!

বাবা খানিকক্ষণ কী সব কাজের কথা বললেন সায়েবের সঙ্গে। সায়েব শুধু ঢুলুঢুলু চোখে মাথা নেড়ে গেল। হ্যাটটা খুলল না পর্যন্ত। খানিক পরে মা হেসে হেসে ডিনারে বসতে অনুরোধ করলেন। বাবার পিছু পিছু সায়েবও এলেন টেবিলে। কেমন যেন

ল্যাগব্যাগে হাঁটা। তারপর চেয়ারে বসেই-না, হড়কে পড়া নয়। মার্বেলগুলো সরিয়ে নিয়েছে মিল্টি আগেই- ওই চেঁচানি শুনেই। ওই চিলচিৎকার আর শুনতে চায় না কেউ।

'এটা কী, কী এটা?' ডিশের পাশে সুন্দর ফুলকাটা ন্যাপকিনের দিকে আঙুল দেখিয়ে সায়েব কেমন আঁতকে উঠল। যেন মুকুলের হাতের বিছুটিই দেখে ফেলেছে।

'ও, এ তো ন্যাপকিন,' মা ভারি অপ্রস্তুত।

সায়েব ঘন ঘন মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ ওটা চলবে না। মা তাড়াতাড়ি সায়েবের ন্যাপকিন সরিয়ে তারপর সকলেরই ন্যাপকিন সরিয়ে নিলেন। সেটাই ভদ্রদস্তুর কিনা।

মিল্টি আর মুকুল স্পষ্ট শুনল সায়েব বিড়বিড় করছেন, 'একবার ডিনারের সঙ্গে ন্যাপকিন খেয়ে ফেলে যা দশা হয়েছিল, বাপরে বাপ।'

মুকুলের মাথার মধ্যে হঠাৎ কে যেন সুইচ টিপে দিল। মিল্টির দিকে ফিরে তাকাল ও। দেখল মিল্টিও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আর ওর চুলগুলো এমন খাড়া হয়ে উঠেছে যে হেয়ার ব্যান্ডটা উঠে গেছে দু-ইঞ্চি।

ওদিকে তখন মা এক-এক করে ক্যাসারোলের ঢাকা খুলছেন, আর আবির্ভূত হচ্ছে এক একটা অপূর্ব খাবার। ভিণ্ডি কা ভিণ্ডালু, বেইগন খুবসুরতি, কাঁচকলার কোপ্তাকারি, মোচার মচমার্চ, সবজিপাঁচরতন। সায়েব ঢুলুঢুলু চোখে বসেই রইলেন, একবার চামচের দিকে হাত বাড়ালেন না। তারপর নানা আমিষ পদ-মটন মাৎওয়ালা, চিকেন চিংকারা, মেটুলির বাগাডুলি, কিমা দিয়ে সেফার্ড পাই, সায়েব তথৈবচ, চোখের পাতা উঠল না এক ইঞ্চিও। বিজলি বাতি নেভানো মোমের নরম আলোয় সায়েবের চেহারাটা এত চেনা, এত অদ্ভুত লাগছিল, কী বলব!

'একটু মিষ্টি অন্তত খান,' মিনতি করলেন মা। সামনে ধরলেন কাজু ছড়ানো ঘন ক্ষীরের পায়েস। সায়েবের নাক দিয়ে এমন এক দীর্ঘশ্বাস বেরোল যে রুপোর মোমদানিতে বাতিটা নিভু নিভু হয়ে আবার সোজা হল অনেক কষ্টে।

এমন অবস্থায় কেই-বা খেতে পারে? বাবা তা কোনোমতে কাঁটা-চামচে খানিকটা খাবার নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন। সায়েব ততক্ষণে উশখুশ করতে শুরু করেছেন। মা মিল্টিকে ইশারা করতেই মিল্টি সায়েবকে সঙ্গে করে বাথরুমে নিয়ে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল সায়েবও। আর তক্ষুনি-চেয়ারের নীচের থেকে মার্বেল সরালেও উপর থেকে আঠা সরানো হয়নি। সময়ই ছিল না। সায়েব উঠলেন। সায়েবের প্যান্টের পিছনের কাপড় খানিকটা আটকে রইল চেয়ারে।-'হি হি হি' করে মিতুল হেসেই ফেলল। মুকুল ফিক করে হাসতে গিয়েও যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। ছেঁড়া প্যান্টের ফাঁক দিয়ে প্যাঁচানো ওটা কী? ওদিকে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মিল্টির তখন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। সায়েব দু-হাতে বেশ করে সাবান মাখিয়ে হাতে জল নিয়ে ধুয়ে ফেলার বদলে মুখ ধোওয়ার মতো করে বেসিনে ঝুঁকে পড়ে সাবান গোলা খেয়ে ফেলেছেন-'সুপ সুপ সুপ'!!

এরপরে বোঝার আর কী বাকি থাকে?

সায়েবের হাতে তোয়ালে তুলে দিয়ে মিল্টি ফিসফিস করে বলল, 'হারু কেমন আছে?'

'রিটায়ার্ড,' জবাব দিলেন সায়েব। তারপর ফোঁস করে আরেকটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমিও ভাবছি-'

‘ধ্যাত,’ হেসে ফেলল মিল্টি। ‘তুমি থাকবে না, তা হয় নাকি?’ এই প্রথম সায়েব হাসলেন একটু। তারপর তেমনি ল্যাগব্যাগে চালে বেরিয়ে এসে বাবা-মাকে গুড নাইট, থ্যাংক ইউ আরও কীসব বলে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল মুকুল আর মিতুল। মিতুলের হাতে খাবার টেবিল থেকে তুলে আনা ছ-টা লম্বা মোমবাতি। চুপিচুপি সায়েবের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘এই নাও।’ দ্বিতীয়বার হাসলেন সায়েব। আগের বারের চেয়েও বেশি। গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা। নিজে চালিয়ে সায়েবকে পৌঁছে দেবেন স্টেশনে, গাড়ির পিছনে অন্ধকারে বসে তিন জোড়া চোখের সামনে মোমবাতিতে কামড় দিলেন সায়েব। মট করে আওয়াজও হল যেন।

পায়ে পায়ে ওরা আবার ফিরে এল ঘরে। মুখ অন্ধকার করে সোফায় বসে আছে মা। মিতুল দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে-‘মা, খিদে।’

‘আমাদেরও,’ কোরাসে গলা মেলাল মিল্টি মুকুল। কাঁদো-কাঁদো গলায় মা বললেন, ‘কিছুই খেল না, কেমন লোক বল তো?’

‘লোকই না, গোরু,’ বলল মিল্টি।

‘গোরু নয় রে, পাখি,’ শুধরে দিল মুকুল।

‘এ্যাই, গুরুজনদের নামে এসব কী?’ মা ছোট্ট একটা ধমক দিলেন। তারপর মিতুলকে কোলে তুলে ওদেরকে টেবিলে বসিয়ে ভালো ভালো খাবার সব সাজিয়ে দিলেন প্লেটে। আর ওরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। খেতে খেতে মুকুল বলল, ‘মা, তুমি খাও।’ মনের দুঃখে একটু শুধু পায়েস খেলেন মা। এক চামচ মুখে দিতেই মুড অনেকটা ভালো হয়ে গেল। পাঁচ চামচ খাবার পর মা বললেন, ‘আরে! মোমবাতিগুলো গেল কোথায়?’

‘পেটে!’ বলল মিল্টি। তারপর ‘হি-হি’ করে হেসে উঠল ওরা তিনজনেই। পায়েসের চামচ হাতে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন মা।

*বৈশাখ ১৪০৬*




## নবনীতা দেব সেন

এক বোকা রাজার একটি ছেলে ছিল। রাজার নিজের মাথায় বুদ্ধি নেই, তাঁর ছেলের মাথাতেও বুদ্ধি নেই। রানির মাথাতে কিন্তু অনেক বুদ্ধি ছিল। ভাগ্যিস ছিল! তাই যখনই রাজা আর রাজপুত্তুর মিলে পাশের রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে চাইতেন রানি অমনি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখতেন, এবং বলতেন যে, সেই স্বপ্নের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করা যাবে না। তার মধ্যে যুদ্ধ করলেই হেরে ভূত হয়ে যাবেন রাজা। স্বপ্নে রানি জানতে পেরেছেন, এরকমই বিধির বিধান! আর তবে উপায় কী? রাজাকে শুনতেই হয়।

তা প্রথমবার রাজা যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন-ঘোড়া সেজেছে, রথ সেজেছে, হাতি সেজেছে, ঢাল মেঘর ঘাঘর বেজেছে-বাজতে বাজতে চলল ডুলি-

ডুলি কোথা যাবে? না পাশের রাজ্যে। ডুলির ভেতর কে? না, রাজদূতমশাই, আর রাজপুরোহিতমশাই। তাঁরা কেন ডুলিতে? কেননা তাঁরা ঘোড়ায় চড়তে জানেন না আর রথে চড়তে ভয় পান। পাশের রাজ্যে গিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন রাজদূত, আর তার লগ্নটা স্থির করে দেবেন রাজপুরোহিত।

হঠাৎ দৌড়োতে দৌড়োতে রানিমার খাস দাসী এসে ডুলি ধরলেন। ‘কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?’

‘রানিমা স্বপ্ন দেখেছেন, দুটো গ্রাম পেরিয়ে এক গ্রাম আছে, তার নাম আন্ধারা গ্রাম। সেখানে কোনো বাড়িতে দিনের বেলাতেও আলো নেই। সেই গ্রামের ঘরে ঘরে আলো না এনে দিয়ে যুদ্ধে গেলে যুদ্ধে হেরে যাব আমরা।’

‘ওঃ এই কথা, তা আমরা যাচ্ছি, এক্ষুনি গিয়ে রাজাকে বলছি।’ রাজপুরোহিত আর রাজদূতমশাই সভায় ফিরে চললেন।

রাজা শুনে বললেন, ‘ওই, এই? তা এক্ষুনি ওদের গ্রামে আমি বালতি পাঠিয়ে দিচ্ছি আড়াই-শো। সৈন্যরা সারাদিন ধরে বালতি করে সূর্যের আলো ভরে ভরে ঘরে ঢালুক। ঘর আলো হয়ে যাবে।’ আপাতত যুদ্ধযাত্রা বন্ধ রইল।

আড়াই-শো বালতি নিয়ে সৈন্যসামন্ত হাজির হল আন্ধারা গ্রামে। সারাদিন তারা সূর্যের আলো ভরতি করে আর প্রজাদের ঘরে নিয়ে ঢালে। কিন্তু ঘরে আলো আর হয় না। এরকম চলতেই থাকল অনেক বছর। রাজা তো অস্থির-যুদ্ধযাত্রা আর হচ্ছে না। পাশের রাজ্যের রাজকুমারী একদিন আন্ধারা গ্রামের সামনে দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। এতগুলি বালতি নিয়ে লোকেরা ছুটোছুটি করছে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ‘কী করছে এরা? কী ব্যাপার!’

‘অন্ধকার ঘরে সূর্যের আলো ধরে আনার চেষ্টা করছি।’

রাজকুমারী গিয়ে দেখলেন, এ গ্রামের কোনো ঘরেই জানলা নেই, ঘুলঘুলি নেই, কেবল ছোট্ট একটা দরজা আছে। অমন গুহার মতন ঘরে আলো ঢুকবে কোথা দিয়ে?

আপন মনে হেসে নিয়ে রাজকুমারী বললেন, বোকা রাজার সেনাপতিকে ডেকে, 'আমি তোমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে সূর্যের আলো ভরে দিতে পারি। কিন্তু তার বদলে তোমাদের রাজাকে আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করতে হবে। জিজ্ঞেস করে এসো তিনি রাজি কি না?'

সেনাপতি তো তক্ষুনি ঘোড়া ছুটিয়ে রাজসভায় ফিরে এলেন। শূন্য বালতি বইতে বইতে ততক্ষণে তার সৈন্যসামন্ত প্রায় পাগল হবার জোগাড়। রাজা বার্তাটি পেয়ে খুব খুশি। তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলেন তথাস্তু। তাই হবে। ঘরে ঘরে রোদ্দুর নিয়ে দিতে পারলে একটা ইচ্ছে পূরণ করতে রাজি।

শুনে রাজকন্যা সৈন্যসামন্তদের ডেকে প্রত্যেকটা বাড়িতে রুজু রুজু জানলা কাটিয়ে দিতে বললেন। দেওয়াল কেটে প্রত্যেক ঘরে দুটো করে জানলা বসাতেই ঘরে ঘরে প্রচুর রোদ্দুর খেলতে লাগল। আন্ধারা গ্রামে আলো আর ধরে না। আহ্লাদ আর ধরে না!

'রাজামশাইয়ের কাছে চলুন এবার আপনার ইচ্ছে পূরণ করতে?' হাতজোড় করে সেনাপতি রাজকুমারীকে ডাকলেন।

কিন্তু রাজকুমারী বললেন, 'থাক, এখন নয়, পরে বলব।'

বোকা রাজার খুব আনন্দ। আবার নতুন করে সেজেগুজে অন্যপথ ধরে পাশের রাজ্যে আক্রমণ করতে বেরোচ্ছেন, রানিমাও আবার ঠিক ওই সময়েই স্বপ্ন দেখে ফেললেন-আর রানিমার স্বপ্ন সফল হবার আগে যুদ্ধ যাওয়া মানে যুদ্ধে হার নিশ্চিত!

রাজামশাই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে রানিমার মহলে প্রবেশ করলেন, 'কী রানি? আবার কী স্বপ্ন দেখলে তুমি? সহজ স্বপ্ন তো বেশ? অ্যাঁ? বেশি কঠিন নয়?'

রানিমা বললেন, 'কেন মহারাজ, স্বপ্নের আবার সহজ কঠিন কী? খুব সহজেই তো দেখা গেল। দিব্যি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে-কোনো কষ্টই হয়নি তো স্বপ্ন দেখে!'

'আহা, সে কথা নয়। বলি স্বপ্নটা কেমন?'

'খুব সহজ স্বপ্ন দেখলুম-আমাদের এই বুড়ো বাজে-পোড়া পিপুল গাছটাকে আমাদের হাওয়া খাবার ঘরে ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু ঘরের কোনো ক্ষতি হয়নি।'

'এ আবার এমন কী?' রাজামশাই তক্ষুনি হুকুম দিলেন, 'গাছটা উপড়ে এনে ঘরে ঢোকানো হোক।'

সৈন্যসামন্ত সব লেগে গেল কাজে। সে বুড়ো পিপুল কি সোজা গাছ? প্রায় চার-শো বছর বয়েস হয়েছে তার। ইয়া মোটকা গুঁড়ি। গাছ উপড়ে, ডালপালা ছেঁটে তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করা হতে লাগল রাজারানির হাওয়া খাবার ঘরে ঢোকানোর। সে ঘরে যদিও অনেকগুলো দরজা-জানলা কিন্তু এত মোটা গাছের গুঁড়ি ঢোকানোর মতন দরজা একটাও নেই। প্রাসাদসুদ্ধ ভেঙে পড়ার জোগাড় হচ্ছে চেষ্টায়। এমন সময়ে পাশের রাজ্যের রাজকুমারী আবার ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। অত সুন্দর রাজপ্রাসাদের হাওয়াঘরে সৈন্যরা একটা গাছ দিয়ে ধাক্কা মারছে দেখে তাড়াতাড়ি ঘোড়া থামালেন, 'কী ব্যাপার?'

এবারেও স্বপ্নের কথা বলা হল তাঁকে। গাছটা যে ঘরে ঢোকাতেই হবে, রানির স্বপ্ন সফল না হলে যুদ্ধযাত্রা হচ্ছে না।

রাজকন্যে আবার মনে মনে হাসলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, আমি যদি এই সমস্যাটার সমাধান করে দিই তাহলে কিন্তু রাজামশাইকে আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করতে হবে। এখন আগে আপনারা গাছ নামান।'

রাজামশাই তো একপায়ে রাজি ইচ্ছে পূরণ করতে, যদি রানিমার স্বপ্ন পূরণ হয়।

রাজকন্যে বললেন সৈন্যদের, পিপুল গাছের গুঁড়িটাকে টুকরো টুকরো করে চিরে ঘরে ঢোকাতে। তাহলেই পুরো গাছটা ঢুকে যাবে, ঘরও ভাঙবে না। তাই হল। রাজা আহ্লাদে আটখানা, 'কী ইচ্ছে তোমার রাজকন্যে মা?'

'এখন থাক, পরে হবে।' বলে রাজকন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। রানিমা জানলা থেকে সবটা দেখলেন আর মনে মনে ভাবলেন-'বাঃ! চমৎকার মেয়ে। এমনি মেয়েই বউ চাই আমার।'

রাজামশাই তো আবার যুদ্ধের সাজ শুরু করেছেন। সৈন্যসামন্ত সেজেছে, হাতিঘোড়া সেজেছে, কাড়ানাকাড়া বেজেছে, রাজদূত বা রাজপুরোহিত ডুলিতে চেপে বসেছে। রানিমার খাসদাসী এসে রাজামশাইয়ের সামনে দাঁড়ালেন। অমনি রাজামশাই বললেন, 'অ্যাঁ আবার? রানিমা আবার স্বপ্ন দেখলেন নাকি?'

'রানিমা এবারে স্বপ্ন দেখেছেন-তাঁর চিলের ছাদের ফাটলে যে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়েছে, রাজহস্তিনী প্রেমকুমারী সেই ঘাস খাচ্ছে খুব আনন্দ করে।'

রাজার তো মাথায় হাত। চিলের ছাদে মানুষই উঠতে পারে না মই দিয়ে ছাড়া-ওখানে যাবার কোনো সিঁড়ি নেই। আর হাতি তো সিঁড়ি বেয়ে ওঠে না-সে প্রথমে প্রাসাদের চারতলায় উঠবে তো? তারপরে চিলের ছাদের ঘাস! আরও এক তলার ধাক্কা।

হাতিকে তো সিঁড়ি দিয়ে তোলা যাবে না। কপিকল আনাও। কপিকলে হাতি বেঁধে তাকে টেনে ছাদে তোলা হবে।

কপিকল তৈরি হল, কিন্তু কিছুতেই তাতে বাঁধা যাচ্ছে না প্রেমকুমারীকে। সে শুঁড় তুলে বৃংহতিধ্বনি করে বেজায় আপত্তি জানাচ্ছে। বেশি জোর করতে গেলে পিছনের দুই পায়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

প্রেমকুমারীকে বশ মানাতে পারছে না মাহুতও। রাজহস্তিনী বলে কথা? তা ছাড়া এই কপিকলে হাতি বাঁধার ব্যাপারটা মাহুতেরও পছন্দ হয়নি, তবু রাজার হুকুম তাই চেষ্টা করছে।

এই সময়ে রাজকুমারী বিদিশা সেই পথ দিয়ে ঘোড়া চড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। হাতির দুর্দশা দেখে তিনি তো অস্থির, 'ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে?'

এবার তো রাজকন্যেকে চিনে গিয়েছেন সেনাপতি সৈন্যসামন্ত সকলেই। তাঁকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ পেল-যাক! এবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। রানিমার স্বপ্নের কথা জানানো হল রাজকন্যেকে।

রাজকন্যা বললেন, 'ও এই? যাও তোমাদের মধ্যে চারজন সৈন্য রাজপ্রাসাদের ছাদে ওঠো কাস্তে আর অ্যাসিড নিয়ে, ঘাসগুলো সব কেটে বান্ডিল বেঁধে নিয়ে নেমে এস

নীচে। আর ঘাস কাটার পরে ফাটলে অ্যাসিড ঢেলে দেবে, যাতে আর ঘাস-টাস না গজায় ছাদে। কবে বট গাছই গজিয়ে যাবে। ছাদ ভেঙে রাজপ্রাসাদসুদ্ধু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

সেনাপতি তো হাতে মুরাটিক অ্যাসিডের শিশি নিয়ে মই দিয়ে ছাদে উঠলেন। সঙ্গে উঠলেন চারজন জওয়ান, কাস্তে হাতে। ঘাস-টাস কেটে নামিয়ে আনলেন। রাজকন্যা সেই ঘাস নিয়ে আদর করে প্রেমকুমারীর মুখে ধরলেন। প্রেমকুমারী আদরে গদগদ হয়ে ঘাস খেতে লাগল।

সেবারের মতো স্বপ্ন সফল।

পরের ঋতুতে রাজামশাই আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, মন্দিরে প্রণাম করে বেরোবেন, রানিমা নিজেই চলে এলেন, 'মহারাজ, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী দেখলে আবার? এ তো মহা জ্বালা? যেই আমি যুদ্ধে যাব অমনি তুমি স্বপ্ন দেখবে?'

'তা আমি কী করব মহারাজ? স্বপ্ন কি কারোর হাতে থাকে? আমি স্বপ্ন দেখেছি-শাঁখ বাজছে, সানাই বাজছে, আর আমি লাল বেনারসি পরে কোলে করে সেই ঘোড়ায়-চড়া রাজকন্যাকে বধূবরণ করে আমাদের ঘরে তুলছি।'

খুশি হয়ে রাজা বললেন, 'বাঃ, এ তো বড়ো চমৎকার স্বপ্ন। চলো সেনাপতি, আমরা সেই ঘোড়ায়-চড়া রাজকন্যেকে খুঁজতে যাই। কিন্তু তাকে পাব কোথায়? তার নামধাম কিছুই তো জানা নেই!'

তখন রাজসভার চর বলল, 'আমি জানি মহারাজ। আমি তো চর? আমাদের এ সব খবর রাখতে হয়। রাজকন্যে পাশের রাজ্যের রাজার মেয়ে। যে রাজ্যে আমরা এখন যুদ্ধ করতে যাচ্ছি!'

'ও, তাহলে তো এখন হল না?' রাজার একটু মন খারাপ।

রানি তখন রাজদূত আর রাজপুরোহিতকে বললেন 'আপনারা যেমন ডুলি চড়ে যাচ্ছেন তেমনি যান, সঙ্গে অত বেশি সৈন্যসামন্ত চাই না, আপনারা গিয়ে সবিনয়ে পাশের রাজ্যের রাজামশাইয়ের কাছে রাজকুমারীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা পাড়ুন।' বলে রানি থালা থালা মিষ্টান্ন, বড়ো বড়ো মাছ, দই-রাবড়ির হাঁড়ি সৈন্যদের হাতে সব তুলে দিলেন। অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রেখে তারা তত্ত্বতালাস নিয়ে চলল-সঙ্গে সঙ্গে চলল তাদের মিলিটারি ব্যান্ড, 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে' গান বাজাতে বাজাতে।

বিয়ে-থা হয়ে গেল। খুব ঘটাপটা। অনেকদিন হইহই চলল দুই রাজ্যে। খাওন-দাওন, নাচন-গাওন, দেওন-থোওন! সবাই খুশি। সবচেয়ে খুশি রানিমা। বোকা রাজকুমারের কপালে বুদ্ধিমতী বউ জুটেছে বলে। নইলে রাজ্য চলবে কী করে?

আহ্লাদ পেহ্লাদ একটু জুড়োতেই রাজা বললেন, 'তাহলে যাই পাশের রাজ্যে যুদ্ধ করতে যাই গে?'

রানি তো অবাক। 'ওমা সে কী কথা? ওরা আমাদের বেয়াই-বেয়ান। কুটুমবাড়িতে যুদ্ধ করতে যাবে কী গো?'

রাজা বলেন, 'আমি কি এতই বোকা? ওপাশের রাজ্য নয় এবার যাচ্ছি এপাশের রাজ্যে যুদ্ধ করতে। বউমা তুমি কিচ্ছু ভেব না।'

বউমা তখন এগিয়ে এসে বললেন, 'কিন্তু বাবামশাই, আপনার কাছে আমার তিনটে ইচ্ছে-পূরণ পাওনা আছে। সেগুলোর একটা কি এখন দেবেন?'

'কী চাও বলো বউমা, নিশ্চয়ই দেব।'

'জীবনে কোনোদিন নিজে থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন না, কোনোদিন কাউকে অযথা আক্রমণ করবেন না। এ আমার প্রথম ইচ্ছে। আমরা শান্তির রাজ্য হব, যুদ্ধের নয়।'

রানিমা বললেন, 'বাঃ বাঃ বউমা। আমাদের সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী!'

রাজার খুব মন খারাপ। রানিমা তো আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছেন! ওঃ! কত বুদ্ধি করে করে তাঁকে প্রত্যেকবার যুদ্ধযাত্রা আটকে দিতে হয়। শুধু শুধু ছোটো ছোটো ছেলেদের প্রাণ যাবে, এ দেশে, ও দেশে। রানিমার একদম যুদ্ধ ভালো লাগে না। তাই তিনি প্রত্যেকবার একটা স্বপ্নের গল্প ফাঁদেন।

কথা দিয়ে কথা রাখবেন না সে তো আর হতে পারে না। বউমার কাছে রাজামশাই শপথবদ্ধ। অতএব যুদ্ধযাত্রা শেষ হয়ে গেল।

রাজকুমারীর হাতে আরও দু-খানা ইচ্ছে বাকি আছে পূরণ করতে। সেগুলো এখন তোলা থাক। পরে যদি রাজামশাই বুদ্ধির ভুলে আবার কোনো বোকামির কাজ করে প্রজাদের ক্ষতি করতে যান তখন সেই ইচ্ছাপূরণের শর্তগুলো আঁচল থেকে বের করবেন রাজকুমারী। এখন থাকুক ওরা গেরোয় বাঁধা-ভবিষ্যতের জন্য।

বোকারাজার রাজপুত্তুর কিন্তু বুদ্ধিমতী মা আর বুদ্ধিমতী বউয়ের কল্যাণে ক্রমশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছেন। কিছুদিনের মধ্যে আর একটুও বোকামি থাকল না তাঁর মগজে। সব সুবুদ্ধিতে ভরে গেল। এ রাজ্যে, ও রাজ্যে, সব রাজ্যের রাজা-প্রজা সবাই সুখেশান্তিতে রইল। আর সৈন্যরা সব অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে চাষবাসের কাজে নেমে পড়ল। খেতের ধান উপচে পড়তে লাগল-

*আমার গপ্পো ফুরাল, দুধের বাটি জুড়ুলো*

*শারদীয়া ১৪০৬*






# বলরাম বসাক

ইতিহাস পরীক্ষা দিয়ে এসেই টিপলু একটা 'হুম' করে হুংকার ছুড়ে দিল, 'দেখে নেব কে আমার মার্কস আটকায়,' বলল সে দাদু-দিদা, মামনি, ঝান্টুপিসি আর ছোট্ট বোন টুপুরের সামনে। তাঁরা তখন বিকেল বেলার চা-টা খাচ্ছিলেন, টিপলুও চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলল, 'ওহ কী দুর্দান্ত পরীক্ষা দিয়েছি। প্রাণ খুলে, মন খুলে, হৃদয় চিচিং ফাঁক করে লিখে গেছি। লুজ শিটের পর লুজ শিট নিয়েছি আর লিখে গেছি।'

'তাহলে তুই এক-শোয় এক-শো পাবি?' বলল সিক্সে-পড়া ছোট্ট টুপুর, বিস্ময়ে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে। দিদা বললেন, 'ইতিহাসে কি এক-শোয় এক-শো পাওয়া যায়, কী জানি বাপু আজকাল কী হচ্ছে?'

'ওই তো, বড়োজোর এক নম্বর কাটতে পারে,' বলল টিপলু বিস্কুট খেতে খেতে, 'নিরেনব্বই ঠিক ঠিক পাচ্ছি।'

কিন্তু ইতিহাসে টিপলুর, হায় কপাল মন্দ, একেবারে নিরেনব্বই-ই কাটা গেল। পেল মাত্র এক।

'এক? তুই এক পেয়েছিস? এক-শোতে মোটে এক,' বললেন দাদু-দিদা।

'ইস এক! মোটে এক? ছি-ছি-ছি, এ বাড়িতে এক কেউ কোনোদিন পায়নি।' বললেন টিপলুর বাপি, তারপর গাটটুকাকুকে বললেন, 'গাটটু, দেখ তো কী ব্যাপার, ইতিহাসে কী করে এক পায়?'

গাটটুকাকু তিন-তিনবার বি.এসসি.-তে গাড্ডু খাবার পর তিন-তিন বার বি.কম. পরীক্ষাতেও গাড্ডু খেয়ে এইবারেই বি.এ. পরীক্ষা দেবার জন্যে খুব পাঁয়তারা কষছিল, সে এসেই টিপলুর মাথায় গোটা কয়েক গাঁট্টা ঠুকেই চিকন চিঁহি স্বরে ধমকাতে ধমকাতে নিজের ঘরে নিয়ে গেল টিপলুকে। বলল, 'কই তোর হিসটিরি পরীক্ষার খাতা? বের কর।'

বলির পাঁঠার মতো টিপলু, তখনও গাঁট্টা-খাওয়া মাথায় হাত বুলোচ্ছিল, তাড়াতাড়ি নড়েচড়ে স্কুলের ব্যাগ থেকে খাতাটা বের করে দিল, 'এই যে।'

'সব নম্বরগুলো প্রশ্ন অনুসারে ঠিকঠাক পড়েছে তো,' খাতাটা নিয়ে চশমা নাকে এঁটে ভুরু-টুরু কুঁচকে গাটটুকাকু খাতাটা দেখল। খাতার ওপর লাল কালিতে লেখা রয়েছে '১'। পাতা উলটিয়ে বলল, 'নম্বরগুলো অ্যাডিশন করে ভালো করে চেক করে দেখেছিস? '১' হয়?'

তারপর খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে টেবিল ও ল্যাম্প জ্বেলে পাতা উলটিয়ে উলটিয়ে পড়তে শুরু করল গাটটুকাকু-

## প্রথম প্রশ্নের উত্তর

*গোল টেবিল বৈঠক*

১৮৩৫ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে কোনো এক সময় বিশাখাপত্তনাম অর্থাৎ ভাইজাগে একটি রৌপ্য নির্মিত তাজমহলের অভ্যন্তরে একটি শ্বেত পাথরের গোল টেবিল দেখতে পাওয়া যায়। সেই গোলটেবিলের একপাশে মহাত্মা গান্ধী ও অন্য পাশে মহারানি ভিক্টোরিয়া বিকেলবেলা চা পান করিতেন। ইতিহাসে ইহাকে গোল টেবিল বৈঠক বলা হয়।

ইতিহাস স্যার হুতাশনবাবু নম্বর দিয়েছেন শূন্য।

## দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

*গৌড় বাংলার মাৎস্যন্যায় অবস্থা*

রাজা শশাঙ্কের পর দুই শত বৎসর ধরিয়া গৌর-নিতাইয়ের বাংলাদেশে অরাজকতা রোগ দেখা দেয়। এই রোগ রাজাদের হইতে লাগিল ও তাহারা জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া যুদ্ধ করিতে না পারিয়া দলে দলে মরিতে লাগিল। ফলে যে সকল রাজা তখনও মরিল না তাহারা যার যার রানি লইয়া এদিক-ওদিক পলাইতে শুরু করিল। ফলে রাজ্যে আদৌ রাজা না থাকিলে যাহা হয় তাহাই হইতে থাকে, কেহ কাহারও কথা শুনিল না। ফলে জঙ্গল কাটার লোক জঙ্গল কাটিল না। সারা দেশে বনজঙ্গলে ঢাকিয়া গেল। আবহাওয়াতাত্ত্বিকগণ বলিয়া থাকেন দেশে অধিক বনজঙ্গল থাকিলে অধিক বৃষ্টি হয়। তাহাদের কথা সেকালে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল (আজকাল ফলে না)। বঙ্গদেশে প্রচুর বৃষ্টি হইতে লাগিল। নদী-নালা-খাল-বিল-পুকুর সব জলে ভরিয়া গেল। পদ্মা, মেঘনা, গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলি, মাতলা, মাথাভাঙ্গা, করতোয়া, ইছামতী, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, যমুনা, জলঙ্গী, জলঢাকা, দামোদর, ভৈরবী, রূপনারায়ণ, মহানন্দা, কুন্তী, বিদ্যাধরী, আদিগঙ্গা, ধানসিঁড়ি, কপোতাক্ষ, ফুলহার, তিস্তা, তোর্সা, দ্বারকা, কোপাই ইত্যাদি ইত্যাদি বঙ্গদেশে যত নদ-নদী আছে সব ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল। ফলে নদ-নদী, খালে, বিলে, পুকুরে, ডোবায়, জলায় এবং শহরের রাস্তায় বৃষ্টির জমা জলে এন্তার ছোটো ছোটো মাছ দেখা দিল। ফলে ওই সকল ছোটো ছোটো মাছ গিলিয়া খাইতে মাঝারি আকৃতির এন্তার মাছ দেখা দিল। ফলে মাঝারি আকৃতির মাছগুলিকে গিলিয়া খাইবার জন্য বড়ো বড়ো মাছ দেখা দিল। ফলে বড়ো মাছগুলিকে গিলিয়া খাইবার জন্য তিমিমাছ ইত্যাদি বিশাল বিশাল আকৃতির মাছ দেখা দিল। ফলে বঙ্গদেশে ছোটো বড়ো মাঝারি বিশাল মাছ গিজগিজ করিতে লাগিল, ইহাকে বলে মাৎস্যন্যায় অবস্থা। এই অবস্থায় বড়ো বড়ো মাছ ছোটো ছোটো মাছ গিলিয়া খাইয়া নিঃশেষ করিল। বিশাল বিশাল মাছগুলি বড়ো বড়ো মাছ গিলিয়া খাইয়া নিঃশেষ করিয়া আর কোথাও মাছ দেখিতে পাইল না। তখন ক্ষুধার তাড়নায় ডাঙায় উঠিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া যেটুকু রাজারানি অবশিষ্ট ছিল গিলিয়া খাইল। খাইয়া রাজারানিদের হজম করিল বটে, কিন্তু রাজারানিদের গায়ের হিরে, মুক্তো, মণি, মরকতখচিত সোনা রুপার মুকুট, হার, বালা কঙ্কন, নূপুর, নথ, কানের দুল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ, বল্লম, তির, ধনুক, বন্দুক, কামান, মেশিনগান, তরোয়াল, লাঠি ইত্যাদি হজম করিতে পারিল না। সেইগুলি তাহাদের পেটে গিজগিজ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দুই শত বৎসর কাটিয়া যাওয়াতে প্রজারা গোপালদেবকে ঘিরিয়া ধরিয়া বলিল, ‘এই

মাৎস্যন্যায় অবস্থা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।' গোপালদেব তখন বিশাল বিশাল মাছগুলির পেট কাটিয়া ফেলিলেন এবং তক্ষুনি পেট থেকে ঝরঝর করিয়া সোনা, দানা, গয়না, রত্নরাজি বিপুল ধনসম্পদ এবং বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে পড়িতে লাগিল। এই ভাবে সারা বঙ্গদেশের রাজসম্পদ মৎসের পেট থেকে পাইয়া গোপালদেব রাজা তো দূরে থাক, সম্রাটই হইয়া গেলেন এবং পাল বংশ স্থাপন করিলেন।

ইস এতটা লিখেছে টিপলু তবু হুতাশন স্যার বসিয়েছেন শূন্য।

## তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

*আকবর ও আওরঙ্গজেবের চারিত্রিক পার্থক্য*

আকবরের দাদুর নাম বাবর। কিন্তু আওরঙ্গজেবের দাদুর নাম জাহাঙ্গির। আকবর হুমায়ুনের পুত্র। কিন্তু আওরঙ্গজেব শাহজাহানের পুত্র। আকবর দিন-ইলাহি লিখিয়েছেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব কোরান লিখিয়াছেন। আকবর হা-হা-হা-হা করিয়া দিলখোলা হাসি হাসিতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব 'দাঁতে দাঁত চেপে' আস্তে আস্তে হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিতেন। ইহাদের হাসি কেবল মাত্র যাত্রা থিয়েটার সিনেমা ও টি.ভি.-র পর্দায় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। আকবর হিন্দুপ্রিয় ছিলেন কিন্তু আওরঙ্গজেব মুসলিমপ্রিয় ছিলেন। ফলে উঁহাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মারপিট এবং শেষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইতিহাসে নাতিপুতির সহিত দাদু বা দাদুর বাবার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ঘটিয়াছে। মহাভারতেই আছে ভীষ্মের সহিত ভীমপুত্র ঘটোৎকচের যুদ্ধ। আকবরের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের প্রবল যুদ্ধ চলিয়াছিল। শাহজাহান তাজমহলে বসিয়া জানালা দিয়া এই যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। অবশেষে আওরঙ্গজেবের হাতে আকবরের পরাজয় ঘটে ও তাঁহাকে গৃহবন্দি থাকিতে হয়। ইহা দেখিয়া শাহজাহানের চোখে অশ্রুজল দেখা দেয়। অশ্রুজল দেখিয়া কবিগুরু কাগজের ওপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া তর তর করিয়া 'শাহজাহান' কবিতাটি লিখিয়া ফেলেন,

'এ কাণ্ড জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাহজাহান ...'

ইতিহাস স্যার হুতাশনবাবু এবারেও বসিয়েছেন শূন্য।

## চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর

*মুঘল সম্রাজ্যের পতনের কারণ*

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লর্ড কার্জন বলিয়াছেন, 'সম্রাটগণের পতন ঘটিলেই সম্রাজ্যের পতন ঘটে।' এই উক্তি অনুসারে মুঘল সম্রাটগণের পতন ঘটিয়াছিল বলিয়াই মুঘল সম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। মুঘল সম্রাটগণের পতনের কারণ নাদির শাহ। এই নাদির শাহ মুঘল আমলে ভারতে আসিয়া বার বার লুঠ করিয়াছিলেন এবং লুঠ করিতে বার বার আসিয়াছিলেন। প্রতিবারই ময়ূর সিংহাসন লুঠ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পারিতেছিলেন না। কারণ ময়ূর সিংহাসনের পায়াগুলি ভারী ছিল। এত ভারী যে তুলিতে পারিতেছিলেন না। তাই এর পরের বার লুঠ করিতে আসিয়া নাদির শাহ ময়ূর সিংহাসনের একটি পায়া ভাঙিয়া লইয়া যান। ফলে মুঘল সম্রাটদের যিনিই ওই সিংহাসনে বসেন, তাঁহারই পতন ঘটিয়া যায়। এই ভাবে মুঘল সম্রাটগণের ক্রমাগত পতন ঘটিতে থাকে। অবশেষে শেষবার লুঠ করিতে আসিয়া নাদির শাহ ময়ূর সিংহাসনটি পেছনে না

তাকাইয়া বসিতে গিয়া একেবারেই ধরাশায়ী হইতে থাকেন। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

এবারেও হুতাশনবাবুর মার্কস শূন্য।

## পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর

*মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি*

ফাঁসির মঞ্চে বাঙালি তরুণগণ যাহাতে জীবনের জয়গান গাহিয়া যাইতে পারে সেই উপলক্ষ্যে ব্রিটিশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ডালহৌসি স্কোয়ারে (বর্তমান বিনয় বাদল দীনেশ বাগ) লাল দিঘির ধারে একটি ফাঁসির মঞ্চ স্থাপন করিয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমারকে সেখানে ফাঁসিতে লটকাইয়া লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস সর্ব প্রথম ফাঁসির মঞ্চ উদবোধন করেন এবং বঙ্গদেশে ফাঁসির প্রবর্তন করেন এবং ইহার একশত বৎসর পরে ক্ষুদিরামের ফাঁসি দিয়া বঙ্গদেশ ফাঁসির শতবার্ষিকী পালন করেন। ফলে বাঙালির ঘরে ঘরে তরুণ যুবকগণ 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটি গাহিতে গাহিতে যাহার যাহার মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফাঁসিতে ঝুলিয়া পড়িতে শত শত সংখ্যায় ফাঁসির মঞ্চে যেই না উঠিতে শুরু করিল, অমনি তাহাদের ভারে মঞ্চ মর মর করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। ফাঁসির দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। ফাঁসির কাঠের খুঁটি, পোস্ট সব এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়িল। ব্যাপার দেখিয়া ইংরেজরা প্রমাদ গুনিল এবং আর বাঙালি তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফাঁসিতে লটকাইয়া মারা যাইবে না দেখিয়া, দেশ ছাড়িয়া পালাইবার জন্য বাঁধা-ছাঁদা শুরু করিয়া দিল। তখন ছোটো লাটের ছোটো মেয়ে জামাইয়ের বাঁধা-ছাঁদায় দড়ি কম পড়িয়া যাইতেছিল বলিয়া ফাঁসির ছেঁড়া দড়িগুলি তিনি কুড়াইয়া লইয়া কাজে লাগাইয়াছিলেন। তাই ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিষ্ঠিত ফাঁসির মঞ্চের দড়িগুলিকে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পাওয়া যায় নাই। কাঠের খুঁটি পোস্টগুলিও পাওয়া যায় নাই। কাঠের যা দাম-'

নাহ, হুতাশন স্যার এতেও এক দেননি। শূন্যই দিয়েছেন। মাথা চুলকায় গাটটুকাকু। তা হলে টিপলু এক পায় কী করে? পাঁচটা শূন্য যোগ করলে তো শূন্যই হয়। তা ছাড়া উত্তরগুলো সঠিক হয়ছে কি না-মার্কসগুলো যথাযথ কি না? সেটা গাটটুকাকু ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চোখ মুখ নাক ভেরি ভেরি সিরিয়াস মতন করে বুঝবার চেষ্টা করে। নাহ বোঝা সম্ভব নয়। তিন-তিনবার বি.এসসি. পরীক্ষা ও তিন-তিনবার বি.কম. পরীক্ষা দিয়ে গাটটুকাকু সায়েন্স ও কমার্সে একেবারে যাকে বলে 'ইসপিশ্যালিসট'। কিন্তু এ যে 'হিসটিরি'-'আটস' সাবজেক্ট। অবশ্য এ বছরেই গাটটুকাকু বি.এ. পরীক্ষা দেবার জন্যে ওয়ার্ম আপ শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু তাতে যে সব কম্বিনেশন সাবজেক্ট পড়তে হবে (এখনও পড়া শুরু হয়নি অবশ্য) তার মধ্যে ওই 'হিসটিরি'টাই তো নেই। তা যাই হোক ধরে নেওয়া গেল টিপলুদের হুতাশন স্যার ঠিকঠাকই মার্কস বসিয়েছেন অর্থাৎ পাঁচটি শূন্য। কিন্তু পাঁচটি শূন্য যোগ করলে কি 'এক' হয়?

এটা নিশ্চয়ই হুতাশন স্যারের একটা 'ক্ষমার অযোগ্য' মারাত্মক 'মিসচিভোওউস মিসসট্যাক'। তাঁর ছাত্ররা যদি এইরকম করে ভুল যোগ করতে শেখে তাহলে খুউব খারাপ ব্যাপার। গাটটুকাকু খাতাটা নিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে চলে গেল টিপলুর বাপির কাছে। বলল, 'দাদা, খাতার সব ঠিক আছে, উত্তরও ঠিক আছে, মার্কসও ঠিক আছে, শুধুমাত্তর, হে-হে-হে, যোগে ভুল হয়েছে, হে-হে-হে।'

‘যোগে ভুল?’ টি.ভি.-তে তখন চিকিরমিকির হচ্ছিল, নব ঘুরিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে করতে টিপলুর বাপি বলল, ‘যোগে নিরেনব্বই হবে বুঝি?’

‘না-না ধ্যাৎ,’ মাথাটা জোর জোর নাড়তে থাকে গাটটুকাকু।

‘টিপলু যে বলেছিল নিরেনব্বই পাবে।’

‘আরে না-না, ওটা জিরো হবে, জিরো। আমাদের বাড়ির টেরেডিশন, এ বাড়ির সবাই কোনো-না-কোনোটাতে জিরো পেয়ে এসেছে, টিপলুও তাই পাবে। খালি ওদের হিসটিরি স্যার হুতাশনবাবু, বি.এসসি., বি.কম. তো পড়েননি, তাই অঙ্কে ভুল করে ফেলেছেন, হে-হে। পাঁচটা শূন্যের যোগফল এক লিখে ফেলেছেন।’

সুতরাং ভুলটার সংশোধন হওয়া দরকার। পরীক্ষার খাতা গারজেনকে দেখিয়ে তাঁর সই নিয়ে স্কুলে জমা দিতে হবে। ঠিক হল জমা দেবার সময় টিপলু হুতাশনবাবুকে বলবে যে তাঁর যোগে ভুল হয়েছে। ওটা ‘এক’ হবে না ‘জিরো’ হবে। তাই শুনে টিপলু ঢোক গিলতে শুরু করল, শেষে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

না কেঁদে উপায় নেই। এযে হুতাশন স্যার। পুরো নাম ‘হুতাশন অন্ধোপাধ্যায়,’ কিংবা ‘হুতাশন অ্যানার্জি’। ‘অন্ধোপাধ্যায়’ কারণ তিনি চোখ বুজে পড়ান, চোখ বুজে পড়া ধরেন, চোখ বুজে খাতা দেখেন, কেবল হাঁটেন চোখ খুলে। আর শাস্তি দেবার সময় মুখ খোলেন, বলেন, ‘আমার ভুল ধরা হচ্ছে। ইয়ারকি পায়া হায়, আমার যথেষ্ট অ্যানার্জি আছে। দেখতে চাস কতটা অ্যানার্জি?’ বলতে বলতে ছাত্রটির চুলের মুঠি ধরে, তার মাথাটা নামিয়ে পিঠে ধু-ধুম, ধু-ধুম ...।

টিপলুর চিৎকার টাইপের ভ্যাঁ-ভ্যাঁ কান্না শুনে ঝান্টুপিসি আর থাকতে পারেননি। ছুটে এসে টিপলুকে আদর করে কাছে টেনে ‘না-নারে কাঁদিস নে, অত বড়োটি হয়েছিস না’ বলতে বলতে চোখ কটমট করে গাটটুকাকুকে ধমকে দিলেন, ‘কেন তুই ওকে গাট্টা মারিস, কেন ওকে খালি খালি টচচার করিস ...’

‘ঝান্টু পিসি, আমি কাল ইশকুলেই যাব না।’

‘আচ্ছা, আচ্ছা, কাল তুই ইশকুলে যাস না।’

ঝান্টুপিসি টিপলুর বাপির চেয়েও বড়ো। নিজের ছেলেপুলে নেই। তাই টিপলু তাঁর খুব আদরের। তাঁর সামনে টিপলুকে কেউ কিছু বলতে পারেন না। এমনকী টিপলুর বাপিও ঝান্টুপিসির মুখ ঝামটা খেয়ে থাকেন।

গাটটুকাকু তাই কী আর করে, টিপলুর পরীক্ষার খাতাটা গার্জেনস সিগনেচার হয়ে গেলে, জমা দিতে পরের দিন নিজেই যায় স্কুলে। কারণ হুতাশনবাবুর ভুলটা তো সংশোধন করতে হবে।

হুতাশনবাবু চোখ বুজে সব শুনে বললেন, ‘পাঁচটা শূন্য যোগ করলে যে শূন্য হয় তা আমি জানি। খাতার যেখানটায় এক বসিয়েছি বলছেন, ওটা আদপেই ‘১’ নয়। ওটা আপনার ভাইপোর কান এঁকে দিয়েছি। হ্যাঁ কান। ঠিক আস্ত কান নয়, কানের যেটুকু ধরে আচ্ছা করে মুলে দিতে হয় সেটুকু শুধু এঁকে দিয়েছি। আপনার ভাইপো যা উত্তর লিখেছে তাতে ওর কানমলাই প্রাপ্য। ওরই সংশোধন দরকার! এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে ওর কানটা আচ্ছা করে মুলে দিন, যান।’

উত্তরে গাটটুকাকু বলল একটি ছোট্ট শব্দ, ‘কোররেকট।’ তারপর মিলিটারি কায়দায় অ্যাবাউট টার্ন হয়ে সটান বাড়ি চলে এল। কান মুলে দেওয়ার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে রেখে

গাটটুকাকু টিপলুর খোঁজ শুরু করল। কোনো ঘরেই তাকে পাওয়া গেল না ঝান্টুপিসির ঘর ছাড়া। ঝান্টুপিসির ঘরে খাটের তলায় বসে আছে টিপলু মাথায় বাপির স্কুটারের হেলমেট চেপে। কান ঢাকা হেলমেট।

*শারদীয়া ১৪০৬*






# হীরেন চট্টোপাধ্যায়

একেবারে সেই আবোল তাবোলের 'বিস্ময়ে বাকবন্ধ' হয়ে যাবার মতো খবর!

চুরি হয়ে গিয়েছে 'চক্রবর্তী ভিলা'য়। না, নিশুতি রাতে নয়, দরজা-জানলা ভেঙে নয়, একটা জলজ্যান্ত মানুষের চোখের সামনে একেবারে ভরদুপুর বেলায় এই একটু আগে! ভাবা যায়! তবে তার চেয়েও যেটা বুকে বিঁধছে আমাদের সেটা হল, চুরি গিয়েছে আমাদের বিখ্যাত তিন দাদুর সেই সব সোনার মেডেল, যা এতদিন প্রায় গল্প কথায় পরিণত হয়েছিল। আমাদের বাবা-কাকারা তার গল্প করেছেন আমাদের কাছে, আর আমরা তার গল্প করতাম বাড়িতে নতুন লোকজন কেউ এলে-টেলে।

করবার অবশ্য কারণও আছে। দাদু কি আর নেই আমাদের এই মোহনপুর গ্রামে! দাদু, জ্যেঠু, কাকা, কাকি-এই সবই তো বলি আমরা সবাইকে, কিন্তু তাই বলে বড়োদাদু, মেজোদাদু আর ছোটোদাদু! সেরকম কি আর কাউকে পাওয়া যাবে ওখানে! শুধু মোহনপুর কেন, গোটা নীলগঞ্জ রোড ধরে যাও যেখানে খুশি-কোথাও পাবে না।

তিন ভাই একেবারে তিন রত্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু উঁচু পরীক্ষা পাশ, তিনজনেই। আর তিনজনেই একেবারে সেরা ছাত্র। সেইজন্যেই তো মেডেলগুলো সব পেয়েছিলেন। কাজকর্মও করতেন সব তেমনি-একজন ছিলেন কোন একটা কলেজের প্রিন্সিপাল, একজন জুট রিসার্চের হোমরাচোমরা কেউ, আর একজন ডাকসাইটে অধ্যাপক। সবাই অবশ্য রিটায়ার করেছেন, বয়স হয়েছে তো!

অবশ্য বয়স যে হয়েছে সেটা ওঁদের হাবভাব দেখে বোঝা মুশকিল। না, চুল আর গোঁফ তো ধপধপ করছেই, কিন্তু চেহারা একেবারে বেতের মতো টানটান। গায়ের রং এখনও যা, দেখলে অবাক লাগে। আর তেমনি সব ব্যবহার, হাসিটা যেন মুখে লেগেই রয়েছে। সে তুলনায় বরং দিদা, মানে ওঁদের একমাত্র বোনকে একটু খিটখিটে বলা যায়। চোখে সর্বদাই বিরাট ঠুলি এঁটে বসে আছেন, আর দেখা হলেই এটা-ওটা হাজারটা প্রশ্ন। চক্রবর্তী পরিবারে বিয়ে হয়েছিল একমাত্র দিদারই, তিন দাদুদের কেউ বিয়ে-থা করেননি, কিন্তু এমনই কপাল, দিদাও বাচ্চা নাতিকে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন একটা বিচ্ছিরি ব্যাপারের পর-কী একটা দুর্ঘটনায় নাকি দিদার স্বামী-ছেলে-বউমা সবাই মারা গিয়েছিল। সবেধন নীলমনি ওই হাবুদাই এখন ওঁদের একমাত্র সম্বল।

এসবই অবশ্য আমাদের শোনা কথা, কারণ হাবুদা আমাদের চেয়ে অন্তত আট-দশ বছরের বড়ো। পরে হাবুদাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছি। ওই বাড়িতে ওরকম একটা অপদার্থ ছেলে যে কী বেমানান সে আর কী বলব! লেখাপড়ায় একেবারে ক-অক্ষর গোমাংস, নীচু ক্লাসেই দু-চার বার গোঁত্তা খেয়ে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে বসে আছে। শিং ভেঙে ঢুকে গিয়েছিল বাছুরের দলে-একে শাসানো ওকে শাসানো, বাঁ-হাতে ঠকাস ঠকাস করে গাঁট্টা

মারা, আসলে বেঁয়ো তো, বাঁ-হাতটাই সব ব্যাপারে চলে ভালো-এক কথায় সবাইকে গুঁতিয়ে বেড়ানোই হচ্ছে ওর প্রধান কাজ। ওকে দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায় আমাদের।

আসলে এত কথা ভাবতে পারছিলাম এইজন্যে যে আমরা একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলাম। গোটা ব্যাপারটা যেন মাথাতেই ঢুকছিল না আমাদের। বহুক্ষণ ওইরকম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার পর আমাদের মধ্যে বিচকে বলল, 'কথাটা তুই ঠিক শুনেছিস তো বিশু?'

বিশুই এনেছিল খবরটা, কাজেই রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে সে বলল, 'শুনেছি মানে? দেখে এলাম তো নিজের চোখে! বাড়ির সামনেটা ভিড়ে ভিড়-দাদুরা উত্তেজিত হয়ে কী সব বলাবলি করছে।'

'কী বলছে?'

'দূর, অত কি আর আমি শুনতে পেয়েছি! মোটামুটি যা বুঝলাম, নানকুদের বাড়ি গিয়েছিল সকলে-শ্রাদ্ধ ছিল না নানকুর ঠাকুমার! সেই আর কি, দুপুরের নেমন্তন্ন। দিদাই শুধু বাড়িতে ছিল একা, সেই সময়েই জিনিসটা চুরি গেছে।'

'মানে? কেমন করে চুরিটা হল, কী কী চুরি হল, তাকে কেউ দেখতে পেয়েছে কি না-'

'ওসব আমি জানি না'-বিশু বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'যেটুকু জানতাম বলে দিলাম, ব্যাস। আর কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করিস না।'

বিশু ব্যাস বলা মানে আমাদেরও ব্যাস, কিন্তু বিচকের তো তা নয়। সবটা না শুনে বিচকে ছাড়ে কী করে! কাজেই বললে, 'চল না জেনে আসি কী হল ব্যাপারটা! যাবি তোরা কেউ আমার সঙ্গে?'

যাবার জন্যে তো সত্যি কথা বলতে কী, আমরা মুখিয়েই আছি, কিন্তু তিন দাদুর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো এই সময়ে-

'ঠিক বুঝতে পারছিস না বিচকে'-আমাদের মনের কথাটাই মুখ থেকে বেরিয়ে এল পিঙ্কুর, 'মানে আমাদের দেখে যদি রাগ-টাগ করেন'-

'কেন, রাগ করতে যাবে কেন! আমরা তো ভালোর জন্যেই যাচ্ছি, যদি ব্যাপারটার কোনো সুরাহা করা যায়'-

ও, 'এই' কথা! একটু যেই রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, অমনি সেটার সমাধান করার জন্যে ছোঁক ছোঁক করছে।

বিচকেকে যে চেনে না তার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগতে পারে-একটা ক্লাস এইট-নাইনের ছেলে আবার রহস্যের 'সমাধান' করবে কী। কিন্তু আমরা হইনি, কারণ ও হল 'বিচকে'।

বিচকের নামটা কে দিয়েছিল কে জানে। বিচ্ছু নয়, মিচকেও নয়, বিচকে। কিন্তু আমরা জানি বিচকে আসলে দুটোই। তবে বুদ্ধিটা যে ওর বেশ সে কথা স্বীকার করতেই হবে। পড়ে তো আমাদের সঙ্গেই, কিন্তু ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের পরীক্ষা দেবার জন্যে কিংবা সরকারি চাকরির জন্যে যেসব ধাঁধা আর আঁকিবুকির বই পাওয়া যায়, দিব্যি দেখি সেই সব বই জোগাড় করে তাতে বুঁদ হয়ে আছে। আরও কী সব বইপত্তর যে ছাই পড়ে-যত অদ্ভুত আর বিদঘুটে জিনিসই ওর ভালো লাগে। আমায় একটা বই দেখিয়েছিল একবার-রিপলির বিশ্বাস করো আর নাই করো। বইটা অবশ্য মজার।

আসলে বিচকে ওর মধ্যেই দুটো-চারটে ঘটনায় আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে একটা স্বয়ং বড়োদাদুর ব্যাপার। বড়োদাদুর পুরোনো ঐতিহাসিক জিনিসপত্র জমানোর শখ আছে। কে একজন নাকি একটা চিঠি লিখেছিল বড়োদাদুকে-মিশর থেকে এক ফারাওয়ের প্রস্তরলিপি নিয়ে এসেছে, মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা পেলেই দিয়ে দেবে। অনেকগুলো টাকার ব্যাপার, বেশ দোনোমনো করছিল বড়োদাদু, সেই জন্যেই বিচকে সেটা দেখবার একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। চিঠিতে একজায়গায় লেখা ছিল ফারাওয়ের রাজত্বকাল ১২০৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১২৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। দেখেই বিচকে বলেছিল, লোকটা ঠক, টাকা রোজগারের জন্যে এই সব করে বেড়াচ্ছে, কারণ কোনো পণ্ডিত মানুষ এই ভুল করতেই পারে না-খ্রিস্টপূর্বাব্দ লিখবার সময় সময়টা বেশি থেকে কমের দিকে যায়, খ্রিস্টাব্দের ঠিক উলটো।

এই হচ্ছে বিচকে। কাজেই সে যে নির্ভয়ে দাদুদের বাড়ি যাবে এতে আর আশ্চর্যের কী আছে।

আমরা দু-জন যখন পৌঁছোলাম তখন অবশ্য বাড়ির সামনেটা ফাঁকা। দোতলা বাড়ি, আগেও এসেছি একবার। একতলায় ছোটোদাদুর বিশাল এক লাইব্রেরি আছে, সেখানে ছোটোদাদু এখনও বেশ খানিকটা করে সময় কাটান। কিন্তু নীচে কেউ থাকেন না, থাকা বলতে একমাত্র বঙ্কুদা, ওঁদের অনেক দিনের কাজের লোক। বঙ্কুদাকে আমরা সবাই চিনি। একটু যেন হেঁচকি টানার মতো করে কথা বলে, কিন্তু মানুষটা বেশ। একদিন আমায় ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, খুব খাইয়েছিল-বেগুনপোড়া-মুড়ি আর খেজুরের রস।

ভেজানোই ছিল দরজা, ঠেলতে খুলে গেল। কাউকে দেখতে না পেয়ে বিচকে আলতো গলায় ডাকল, 'বঙ্কুদা'-

অবশ্য তার আগেই দিদার গলা ভেসে এসেছে, 'কে রে ওখানে?'

'আমরা দিদা'-গলা তুলে বলছে বিচকে, 'আমি আর শ্যাম। ওই শুনলাম কী সব চুরি-টুরি হয়েছে, তাই'-

'ওপরে আয়!' বড়োদাদুর গলা, সুতরাং এবার নির্ভয়ে ওঠা যায় ওপরে। সিঁড়ি থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম বড়োদাদু আর দিদা বসে আছে মুখোমুখি। নাক কুঁচকে আমাদের দেখতে চেষ্টা করছিল দিদা, ঠিকমতো ঠাহর না পেয়েই বোধ হয় দাদুকে বলল, 'বললাম তোমায় লাগিয়ে এসো দরজাটা।'

'কী আর হবে?' বড়োদাদু বললেন, 'যা হবার তা তো চলেই গেল।' আমরা ওপরে উঠে এসেছিলাম, বড়োদাদু ইঙ্গিতে বসতে বললেন। বিচকে ভূমিকাটা তৈরি করবার জন্যে বলল, 'সত্যি বড়োদাদু, দিনদুপুরে যে ওগুলো ওইভাবে চুরি হয়ে যাবে-মানে দিদা বাড়ি থাকতেও যে লোকটা কিচ্ছু বুঝতে না দিয়ে-'

'থাম থাম!' দিদা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদা কী করবে! এই শরীর নিয়ে দৌড়ে গিয়ে চোর ধরবে?'

'তুমি জানতে পেরেছিলে?'

'কেন পারব না! চোখের মাথা তো আর খাইনি-চোরকে তো আমি দেখতে পেয়েছি।'

'দেখতে পেয়েছ! তুমি চেনো তাকে?'

'আদিখ্যেতা! বলি বঙ্কুকে চিনব না!'

‘মানে!’ একেবারে হকচকিয়ে গেছে বিচকে এবার, গলা শুনেই বুঝতে পারছি আমি। বেচারির রহস্য সমাধানের চেষ্টা যে এইভাবে পটল তুলবে, আগে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারেইনি। অনেক কষ্টে নিজেকে একটু সামলে নেবার চেষ্টা করে বললে, ‘শেষ পর্যন্ত বঙ্কুদা! মানে এত দিনের বিশ্বাসী লোক হয়ে-‘

‘বিশ্বেস-টিশ্বেস আর নেই কাউকে! আমি একলা থাকব শুনেও যখন বলল একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে দুপুরে, তখনই ওর মতলব বোঝা উচিত ছিল আমার।’

বঙ্কুদার বাড়ি কতটা দূর আমার জানা ছিল, তাই বললাম, ‘তাহলে তো আজ ফিরবে বলেও মনে হয় না!’

‘থাম দিকি!’ গজগজ করতে লাগলেন দিদা-‘আজ! ও আর কোনোদিনই ফিরবে না। সেই জন্যেই তো দারোগার কাছে গেছে সব। কোমরে দড়ি বেঁধে না আনলে কি আর সে-‘

‘আঃ , কী হচ্ছে কী!’ এতক্ষণ কথা বলেননি, এবার বোনকে বাধা দিলেন বড়োদাদু, বললেন, ‘কথাটা ওদের খুলে বলবে তো! নইলে ওরা জানবে কী করে!’

‘খোলাখুলির আর আছে কী! এমনিতেই পোড়া চোখে ঘুম আসে না, বাড়ি খালি হয়ে গেলে আসবে! চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম-একা থাকলেই এলোমেলো হাজার চিন্তা-হঠাৎ চোখ খুলে দেখি বড়দার ঘরে বঙ্কু!’

‘কোন ঘরটা?’

একেবারে শেষের ঘরটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ‘সিন্দুকটা ওঘরেই তো-কালই সবে নতুন করে রং করা হয়েছে। কিন্তু সিন্দুকের পাশে বঙ্কু দাঁড়িয়ে, সন্দেহ তো হতেই পারে আমার-‘

‘দাঁড়াও দাঁড়াও’-বিচকে মাঝখানে বলল, ‘বঙ্কুদা ঢুকল কী করে বাড়িতে? দরজা খুলে দিল কে! নাকি পাঁচিল-টাঁচিল ডিঙিয়ে-‘

বড়োদাদু চোখ ফেরালেন বিচকের দিকে, ভাবখানা এই যে প্রশ্নটা তাঁর ভালো লেগেছে, বললেন, ‘বাইরের দরজার ছিটকিনিটা সোজা করে তুলে ধরলে, মানে তুলে আর না ঘোরালে বাইরে থেকেও ওটা খোলা যায়, দরজার দুটো কড়া একটু জোরে টেনে ধরলেই হল। বাড়ির সবাই সেটা জানে। কুসুম, মানে যে দু-বেলা রান্না করে দিয়ে যায়, সেও ওইভাবেই দরজা খোলে।’

‘বঙ্কুও ওইরকমই করে দরজা খুলেছিল নিশ্চয়ই’-দিদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ‘কথাটা আমায় শেষ করতে দে আগে। আমার একটা বিচ্ছিরি হাঁচির রোগ আছে জানিস তো! সেটাই ওই মাথা তোলার সঙ্গেসঙ্গে চাগিয়ে উঠেছিল-‘

‘মাটি করেছে!’ কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল আমার। বেরিয়ে আসা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই হাঁচির জন্যেই দিদা এখানে বিখ্যাত। শুরু হল তো চলল অন্তত দু-তিন মিনিট ধরে। তাও আবার পর পর-থামাথামির ব্যাপার নেই, কমসে কম শ-খানেক বার হিঁচ্চিক হিঁচ্চিক করে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে থামবে। তা সেইরকমই যদি চলে-

‘বুঝতেই পারছিস অবস্থা’-আমার কথাকে পাত্তা না দিয়েই দিদা বলে চলেছেন বুঝতে পারলাম, ‘সবই দেখতে পাচ্ছি-সিন্দুকের তালা খোলা, মেডেলের বাক্স বঙ্কুর হাতে, কিন্তু

এগিয়ে গিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরব, সে অবস্থা তো নেই। বেমালুম পালিয়ে গেল ব্যাটা তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে-

বিচকের মুখচোখের চেহারা দেখে বুঝতে পারছিলাম একটা কিছু হয়েছে। হঠাৎ একটা কিছু মাথায় এসে গেলে ওর চোখের দৃষ্টিটা এইভাবে পালটে যায়। আমি অবশ্য দিদার কথায় এরকম ভাবান্তর ঘটার মতো কিছুই পাইনি। তাই নিজেই একটু সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'তবু ভালো বঙ্কুদা অন্য জিনিস কিচ্ছু নিতে পারেনি! দাদুরা বুঝি দারোগাবাবুর কাছে বলতে গেছেন ওর কথা?'

'বলবে না? বজ্জাতটা যদি পালিয়ে যায়!'

'না না, পালিয়ে যাবে কোথায়'-বিচকের মুখে তখনও কোনো কথা নেই বলে আমাকে বলতে হচ্ছিল, 'আমি তো ওর বাড়ি চিনি।'

'বাড়িতে এখন বসে আছে ও!' চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে দিদার চোখ অনেক বড়ো বড়ো দেখায়, বললেন, 'ব্যাটার সাহসটা একবার দেখ! আমারই খাবে আমারই পরবে, অথচ-'

'বড়োদাদু!' বেশ বুঝতে পারছি আমাদের এতক্ষণকার কথাবার্তা বিচকে কিছুই শোনেনি, বলল, 'সিন্দুকটা একবার দেখব আমি?'

'আয় না'-বড়োদাদু নিজেই উঠে দাঁড়ালেন, দিদা ভুরু কুঁচকে বসেই রইলেন।

পুরোনো আমলের সিন্দুক। সত্যিই একেবারে কাঁচা রং। বঙ্কু হাত দিয়েছে বলেই বোধ হয় ডানদিকে কোণের কাছটা-না, হাতের ছাপ ঠিক নয়, হাতের ভর-টর দিয়েছে বলে একটু যেন রং উঠেছে ওই তেলোর মাপের জায়গায়। বিচকেও দেখলাম বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে জায়গাটা। বুঝতে পেরে নিজেকেই মনে মনে একটু তারিফ করে নিলাম, আমারও চোখে পড়েছে ওটা। দু-পাল্লার দরজা, মাঝখানে একটা খোলা তালা। অর্থাৎ ডুপ্লিকেট চাবি করানো হয়েছে, তালা ভাঙা-টাঙা হয়নি।

বড়োদাদু বললেন, 'ওর ভেতরেই থাকত মেডেলগুলো। ব্যাঙ্কে রাখার কথা ভেবেছি কয়েকবার, কিন্তু ও জিনিস আর কে নেবে, এই ভেবে আর করা হয়নি কিছু।'

'বঙ্কুদা জানত নিশ্চয়ই এগুলোর কথা?'

'কে জানত না তাই বল।'

'আপনার নিজের সন্দেহ হয় বঙ্কুদাকে?'

এর সঙ্গেসঙ্গে যে উত্তরটা বেরিয়ে আসা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে, নিশ্চয়ই। কারণ দিদা নিজের চোখে দেখেছেন বঙ্কুদাকে, সন্দেহের চেয়েও বড়ো ব্যাপার। একেই তো ইংরেজিতে বলে কট রেড হ্যান্ডেড। এখন শুধু ওই কটটা হতেই যা বাকি।

কিন্তু আশ্চর্য, বড়োদাদু কোনো উত্তর দিলেন না। চেয়ে রইলেন শুধু বিচকের দিকে। বিচকে আবার করল প্রশ্নটা-'বলুন না দাদু, আপনার বিশ্বাস হয় ব্যাপারটা?'

এবারেও কোনো উত্তর দিলেন না বড়োদাদু, তবে চোখের ইঙ্গিতে বাইরের বারান্দাটা একবার দেখিয়ে দিলেন বিচকেকে, তারপর দিদার দিকে চেয়ে বলেন, 'ওপর থেকে একবার দেখিয়ে দিই বিচকেকে, কোন রাস্তা দিয়ে বঙ্কু পালাতে পারে।'

বারান্দায় এসে বললেন, 'তোর দিদার দারুণ কান, কোনো রিস্ক নিলাম না। বুঝতে পেরেছিস নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, দিদার কান আমি ঢোকার সময়ই বুঝতে পেরেছি-দরজা ঠেলতে প্রায় আওয়াজই হয়নি কোনো, কিন্তু উনি শুনতে পেয়েছেন।'

'এবার বল কী বলবি।'

'সবচেয়ে আগে বলব একটা ফোন করুন থানায়।'

'মানে?'

'মেজোদাদুরা যেন থানায় কোনো রিপোর্ট না করে চলে আসেন, এই কথাটা জানিয়ে দিন।'

'কী বলছিস তুই! ওরা গেল এফ.আই.আর. করতে, আর আমি বলব-'

'দরকার হলে আমি আর আপনি যাব, আধঘণ্টা পরে। আধঘণ্টায় বঙ্কুদা দেশ ছেড়ে পালাতে পারবে না।'

বড়োদাদু ভুরু কুঁচকে কী ভাবলেন, তারপর সত্যিই ফোনের রিসিভার তুললেন। ফোনটা সেরে এসে বললেন, 'বল এবার তুই কী বলবি।'

ব্যাপারটা বড়ো বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল আমার। এতবড়ো গোয়েন্দা বিচকে নিশ্চয়ই হয়ে যায়নি এখনও। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে দু-বার করা প্রশ্নটাই ফের করল ও বড়োদাদুকে-'আপনি বিশ্বাস করেন, বঙ্কুদা চুরি করেছে?'

'খুবই শক্ত বিশ্বাস করা, কিন্তু তোদের দিদা যখন বলছে-'

'দিদা যদি সত্যি কথা না বলে থাকেন?'

না, ছেলেটা একটা চড়-চাপড় খাবে দেখছি এবার। কিন্তু বড়োদাদু শান্ত, বললেন, 'মিথ্যে কথা বলে ওর লাভ? নিজের চোখে দেখেছে বলছে-'

'সেইটেই যে সম্ভব নয় বড়োদাদু। বরং যদি বলতেন কানে শুনে বুঝেছেন, সেটা অনেক সহজে বিশ্বাস হত।'

'কেন?'

'আপনিই চিন্তা করুন, ভেজানো দরজার পাল্লা ঠেললে দিদা শুনতে পান, আর বঙ্কুদা বাইরে থেকে পাল্লা টানলেন, খটাস করে ছিটকিনি পড়ল দিদা শুনতে পেলেন না? দিদা একেবারে আপনার ঘরের মধ্যে দেখলেন বঙ্কুদাকে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দেখেছে যে সেটাও তো ঠিক।'

'ঠিক হতেই পারে না, অসম্ভব। একটা মানুষ ঘরের ভেতরে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কিন্তু সে যে বঙ্কু, এটা বোঝা দিদার ওই চোখে ভারি শক্ত। অবশ্য তা ছাড়াও একটা ব্যাপার আছে।'

'কী বল তো।'

'দিদার হাঁচি। ওই বিচ্ছিরি হাঁচি, দু-তিন মিনিট ধরে।'

'তাতে কী হল?'

'অত ঘন ঘন হাঁচলে চোখে কিছুই দেখা সম্ভব নয়।'

'এ তত্ত্বটা আবার কোত্থেকে আবিষ্কার করলি?'

‘আমি করিনি, রিপলি সাহেব করেছেন বড়োদাদু! চোখ খুলে হাঁচা অসম্ভব, ‘বিলিভ ইট আর নট’ বইয়ে আছে। তো চোখই যদি বন্ধ হয়ে গেল তো দিদা আবার দেখবেন কেমন করে!’

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন বড়োদাদু বিচকের মুখের দিকে। আমার অবশ্য খুব মজা লাগছিল দেখতে, অত বড়ো পণ্ডিত মানুষ একটা পুঁচকে ছেলের কথা শুনে অবাক হয়েছেন। একটু পরে থেমে থেমে বললেন, ‘তার মানে তোদের দিদা ইচ্ছে করে কথাটা বানিয়ে বলেছে?’

‘এক্কেবারে তাই।’

‘অথচ ও জানে না জিনিসটা কে চুরি করেছে, এ-ও তো হতে পারে না। কান যার এত পরিষ্কার-কেউ ঢুকল, সিন্দুকের তালা খুলল, জিনিসটা নিল-‘

‘নিশ্চয়ই! আমিও তো তাই বলছি।’

‘মানে? তোর দিদা জানে চোর কে, তাও বলছে না! মিথ্যে কথা বানিয়ে বলছে? ধ্যাৎ, এটা কিন্তু তুই-‘

‘আচ্ছা বড়োদাদু!’ যেন দাদুর কথা শুনতেই পায়নি, এইভাবে কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠল বিচকে, ‘হাবুদা আপনাদের সঙ্গে নেমন্তন্নে গিয়েছিল?’

‘কেন যাবে না?’

‘ছিল সব সময় মানে যতক্ষণ আপনারা ছিলেন?’

‘না, খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বাইরে বেরিয়েছিল-মানে, তোরা তো জানিসই দু-একটা বদ অভ্যেস করে ফেলেছে! ওই সেই জন্যেই বোধ হয়-‘

‘কতক্ষণ হবে সেটা?’

‘তা প্রায়-হ্যাঁ, একটু বেশিই হবে বোধ হয় সময়টা-ধর ঘণ্টা খানেক।’

‘নানকুদের বাড়ি থেকে এখানে আসতে ধরুন মিনিট কুড়ির বেশি লাগার কথা নয়। তার মানে সময়ের কথা ভাবলে কাজটা হাবুদার পক্ষে করে আসা সম্ভব।’

‘এই! কী বকছিস আবোলতাবোল।’ বড়োদাদু এমনি করে ধমকে উঠেছেন যে আমি চমকে উঠেছিলাম। সত্যিই তো, এসব কী পাগলামি করছে বিচকে! কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বিচকে নিজে একটুও বিচলিত নয়, বলল, ‘আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না বড়োদাদু, কেন সমস্ত জেনেও দিদাকে মিথ্যে কথা বলতে হয়!’

‘তুই বলছিস-তার মানে-‘

‘হ্যাঁ, একমাত্র হাবুদাকে বাঁচানোর জন্যে!’

‘কিন্তু এ তো তোর মনগড়া কথা! কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ না পেয়ে তুই-‘

‘প্রমাণ আছে বড়োদাদু। বঙ্কুদার এত সাহস হবে না সে সিন্দুকের তালার ডুপ্লিকেট চাবি করাতে, দিদা বাড়ি থাকতে গোপনে বাড়ি ঢুকে সিন্দুক থেকে আসল জিনিসটা সরিয়ে নেবে, ধরা পড়ে গেলে পায়ে ধরে ক্ষমা না চেয়ে জোর করে পালাবে! বঙ্কুদাকে তো আমরা চিনি দাদু!’

‘তাও এসব তোর অনুমান! ডেফিনিট কোনো প্রমাণ ছাড়া এ কথা আমি-‘

'আছে দাদু, তাও আছে। ওই সিন্দুকের ছাপ।'

'ওটা কার? হাবুর?'

'আমি জানি না দাদু এখানে হাতের ছাপ তোলার ব্যবস্থা আছে কি না, কিন্তু তুললে সেটা যে হাবুদার সঙ্গে মিলবেই এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'এত জোর দিয়ে বলছিস কী করে? বুঝিয়ে দে!'

'এক হাতে ভর দিয়ে অন্য হাতে তালাটা খোলা হয়েছিল তাই তো? সাধারণ লোক হলে কী হত! বাঁ-হাতে ভর দিয়ে ডান হাতে চাবিটা খুলত, তাতে দাগটা থাকত সিন্দুকের বাঁ-দিকে। কিন্তু লেগেছে দেখুন, উলটো দিকে। তার মানে কাজটা যে করেছে সে বেঁয়ো, আর আপনি তো জানেন বড়োদাদু-'

কিন্তু কোথায় তখন বড়োদাদু! সোজা চলে গিয়েছেন তিনি দিদার কাছে। চোখমুখ থমথম করছে। কোনোরকম ভনিতা না করেই বলেন, 'ছি ছি ছি-নিজের নাতির কীর্তি তুমি বন্ধুর ঘাড়ে চাপাতে চাইছিলে!'

'অ্যাঁ! না, মানে-'

'যাক, তোমাদের দুটোকে ধরেই আমি জেলে দেব। ছিঃ! তোমার লজ্জা করল না? এই বুড়ো বয়সে নাতিকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে করে তুমি-'

'শোন দাদা, শোন-হাবুর সে মূর্তি তো তুমি চোখে দেখনি! এমন করে এসে দাঁড়াল-বলল, একটা কথা কেউ জানতে পারলে সবাইকে শেষ করে দেবে! আমি তো ভয় পেয়ে-'

'করাচ্ছি শেষ! কিছু হলে বন্ধুটার কী দশা হত ভাব তো? কিচ্ছু জানল না, কিচ্ছু শুনল না-পুলিশ গিয়ে তাকে একেবারে'-হঠাৎ বিচকের দিকে ফিরলেন বড়োদাদু, বললেন, 'ওঃ, কী বাঁচান যে বাঁচালি না সবাইকে! তুই অনেক বিদ্বান হবি, অনেক বড়ো হবি, আমি প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছি তোকে।'



গদগদ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আরও অনেকক্ষণ প্রশংসা শুনতে পারত বিচকে, কিন্তু বাইরে সদলবলে দাদুদের ফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। এর পরের দৃশ্য খুব মনোরম হবে না বুঝতে পেরে বিচকে টুক করে বড়োদাদুকে একটা পেন্নাম ঠুকে বলল, 'আমরা তাহলে এখন যাই দাদু-'

না, পুলিশে শেষপর্যন্ত দেওয়া হয়নি হাবুদাকে। ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে চাউর করতে কেউই চাননি। তবে তিন দাদু ধরে এমন ঠেঙিয়ে ছিলেন ওকে যে শুনছি বেচারি নাকি এখনও বাড়িতে হাড়গোড় ভাঙা 'দ' হয়ে পড়ে আছে। আর একটা ব্যাপারও হয়েছিল। দিন তিনেকের মধ্যেই কলকাতা থেকে ঝকঝকে মলাটের বুক অব নলেজের একটা দামি সেট বড়োদাদু নিজে বিচকের বাড়ি এসে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। বিচকে এখন তাতে এমনই ডুবে আছে যে মাস খানেকের মধ্যে তাকে টেনে তুলবার সাধ্যি আমাদের নেই।

*শারদীয়া ১৪০৬*




# এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

'এই যে ক্যাপ্টেন!' বাজখাঁই গলায় এক হুংকার-আর একটু হলেই কার্নিশ থেকে হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছিল ফন্টে। কোনোমতে গোঁফ আর লেজ ব্যালান্স করে সামলে নিল নিজেকে-না হলে নির্ঘাত চারতলা থেকে সোজা পপাত ধরণীতলে।

চারতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তুতান। দেখছিল আর নানারকম চিন্তা করছিল। প্রথম চিন্তা হল পড়ে গেলেও বেড়ালদের কিছু হয় না কেন? ওদের কি শরীরে হাড় বলে কিছু নেই? দ্বিতীয় চিন্তা নেড়ুকাকু হঠাৎ হঠাৎ একা বসে 'এই যে ক্যাপ্টেন' বলে চেঁচান কেন? চেঁচানো বলে চেঁচানো-একেবারে আকাশ ফাটিয়ে। সেই আওয়াজে ছোটো বাচ্চারা ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে, বড়োদের হাত থেকে জিনিসপত্র ছিটকে যায়, রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে থাকে, আরও কতরকম কাণ্ড হয়-তুতান কি তার সব খবর রাখে? সকাল বেলা খালি গায়ে লুঙি পরে খবরের কাগজ হাতে হঠাৎ খেপে উঠে হাঁক পাড়েন, 'এই যে ক্যাপ্টেন!' দুপুরে ভাত খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আবার সেই পেল্লায় হাঁক, 'এই যে ক্যাপ্টেন!' সারা দিনে থেকে থেকেই পাড়া-কাঁপানো এই হুংকার!

কে এই ক্যাপ্টেন! তুতান যতদূর জানে পাইলটদের বলে ক্যাপ্টেন, ক্রিকেট টিমেও একজন ক্যাপ্টেন থাকে, আর্মিতে থাকে, আর থাকে নেভিতে। তেমন তো কেউ ধারে কাছেও নেই। তাহলে উনি ডাকছেন কাকে? মা বলেন, 'উনি আসলে ভগবানকে ডাকেন।' ভগবানকে ডাকেন এই নামে! এটা বিশ্বাস করা একটু শক্ত। মা নাকি ছোটোবেলায় একজন বুড়োমানুষকে চিনতেন, যিনি হঠাৎ হঠাৎ ডেকে উঠতেন-'হরি হে মাধব'। তার তবু একটা মানে বোঝা যায়। ধরা যাক ভগবানের সঙ্গে ওঁর একটা কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথাবার্তা হয়, তাহলে 'এই যে ক্যাপ্টেন' বলে ডাকলে ভগবান কেমন ভাবে সাড়া দেন? দেন কি? যখন-তখন ডাকলেই কি ভগবান শুনতে পাবেন? ভেবে কিছুরই কুল পায় না তুতান। তখন তার মাথার মধ্যে অন্য সব ভাবনারা এসে ভিড় জমায়।

তার মধ্যে প্রধান হল আম গাছ। তুতানের একটা নিজস্ব আম গাছ আছে। নিজের হাতে আঁটি পুঁতে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিল সে-সত্যিই গাছ গজায় কি না দেখবার জন্য। শেষ অবধি কচি কচি পাতা উঁকি দিল। প্রথমে দুটো এরপর আস্তে আস্তে আরও মাথা চাড়া দিয়ে তৈরি হল আমের চারা গাছ। ঘুম থেকে উঠেই দৌড়ে নীচে চলে আসে তুতান, গাছটা কেমন আছে দেখবার জন্য। গাছ বেশ ভালোই বড়ো হতে লাগল, কিন্তু তুতানের হাঁটু অবধি লম্বা হয়ে এখন কেবল মোটা হচ্ছে। মনে হয় বাড়বার খুব একটা ইচ্ছে নেই। দেখা যাক সামনের বছর বর্ষাকালে কী হয়!

অন্য অনেকরকম গাছও আছে এপাশে-ওপাশে। যেমন পাশের ফাঁকা জমিটায় একটা পেল্লায় বেল গাছ। পুজোর সময় লাঠি নিয়ে অনেকে এই গাছের পাতা পাড়ার জন্যে

লাফালাফি লাগায়। ভাগ্যিস বেল গাছে ফুল হয় না, না হলে রোজই ফুলই পাড়বার জন্য লাইন লেগে যেত। টগর গাছটায় যেমন হয়। এ ছাড়া আছে শিউলি-একটু ঝাঁকালেই ঝরঝর করে ফুলের বৃষ্টি নামে শিউলি গাছ থেকে, তবে সারা বছর নয়।

তুতানের সঙ্গে এই সব গাছেদের সম্পর্ক খারাপ নয়-মোটামুটি ভালোই বলা চলে, যদিও এরা কেউ তার হাতে-পোঁতা আঁটি থেকে গজায়নি। তা ছাড়া টগর কিংবা শিউলি গাছের তো আর আঁটি বলে কোনো ব্যাপার নেই। বেল গাছটা এত বড়ো যে তার জন্ম খুব সম্ভব আজ থেকে কুড়ি-তিরিশ বছর আগে, সে সময় এ দিকটায় খুব বেশি বাড়িঘর ছিল না। হোগলা বন ছিল নাকি। বলা যায় না বেল গাছের বয়স হয়তো আরও বেশি-পঞ্চাশ কিংবা ষাট! তা না হলে এত মোটাসোটা ডালপালা আর শক্ত শক্ত গাঁট হল কী করে!

বেল গাছের তলায় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। তারপর থেকে অনেকের ধারণা ওই গাছে নাকি ভূতের বাসা। ঘটনাটা হয়েছিল এইরকম-একদিন গভীর রাত্রে কয়েকজন চোর বেল গাছতলায় বসে চোরাই মালের ভাগ-বাঁটোয়ারা করছিল। হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই এক ঝাপটায় তাদের জিনিসপত্র সব কোথায় হাওয়া হয়ে গেল! চোরেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যে যেদিকে পেরেছে দৌড় দিয়েছে। পরে পুলিশের হাতে একজন ধরা পড়ে কবুল করেছিল সব। মানে চুরির কথা কবুল করেছিল। কেননা, পরের দিন সকালে সব চোরাই জিনিসপত্র দেখা যায় গাছের ডালে আটকে আছে। পাড়ার লোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে পুলিশকে খবর দেয়। যাদের জিনিস খোওয়া গেছে তারা এসে প্রমাণ দিয়ে যে যার জিনিস ফেরত পায়। ধরা পড়া চোরটা যা বলেছিল তা খুবই আশ্চর্য! তারা নাকি খুব মন দিয়ে হিসেব-নিকেশ করছে- মাঝখানে জিনিসপত্র ডাঁই করে রাখা-এমন সময় বেল গাছের একটা ডাল নাকি দুলতে দুলতে নেমে তাদের পিঠে সপাসপ সে কী মার! কাঁটা ফুটে রক্তারক্তি কাণ্ড। হঠাৎ বেল গাছের ডাল ধরে কে নাড়া দিল! ঘাবড়ে গিয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পিঠটান দিয়েছিল। ওদের মনে হয়েছিল বেল গাছ যখন, তখন নির্ঘাত তার মধ্যে বেহ্মদত্যির বাস। দ্বিতীয় বার আর ফিরে তাকাবার সাহস হয়নি তাদের। প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে সকলে-থাক পড়ে বাবা জিনিসপত্র- শেষে লোভে পড়ে দত্যির হাতে প্রাণটা যাবে নাকি!

গল্পটা শুনে পুলিশদের 'হো-হো' করে সে কী হাসি। পাড়ায় কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করেছিল গল্পটা। নেড়ুকাকার সব জিনিসে মাতব্বরি করা স্বভাব। তিনি বলেছিলেন, 'হুঁহুঁ বাবা, বোঝো ব্যাপারখানা।' তাতে অবশ্য তিনি বেহ্মদত্যির কথা বিশ্বাস করলেন কি করলেন না বোঝা যায়নি। একটু পরেই নিজের বাড়ির বারান্দায় পৌঁছে আবার একখান হাঁক ছেড়েছিলেন 'এই যে ক্যাপ্টেন'। বোধ হয় পরীক্ষা করে দেখছিলেন বেহ্মদত্যি এই ডাকে সাড়া দেয় কি না। তুতানের মনে হয়েছিল গাছে বেহ্মদত্যি থাকলেও তাকে কেউ 'ক্যাপ্টেন' বলে সম্বোধন করবে, সম্ভবত এটা সে কোনোমতেই ভাবতে পারেনি। বিশেষ করে খালি গা, লুঙিপরা নেড়ুকাকুও। তবে ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই-এ বিষয়ে তুতান নিশ্চিত। সুতরাং বেল গাছেও কেউ নেই। থাকতেই পারে না।

বেল গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় অনেকবার ওপরে তাকিয়ে সে কাউকে দেখতে পায়নি-কেবল গাছের দু-চারটে ডাল একটু নড়েচড়ে উঠছে। ঠিক যেন মানুষের হাতনাড়া। ওরা কি আমাকে দেখে হাত নাড়ছে? তুতান প্রশ্নটা করতে গিয়ে দেখে পিছন পিছন খুকুমাসির পেয়ারের বেড়াল ফন্টে কখন এসে হাজির। তুতানের প্রশ্ন শুনে ফন্টে পিচ করে কেমন শব্দ করল। 'তুই কী বলিস রে ফন্টে?' এবার সরাসরি ওকেই জিজ্ঞেস

করাতে ফন্টে দারুণ ব্যস্ত হয়ে কতকগুলো শালিখের দিকে দৌড় দিল। ‘ধুত্তোর!’ বলে তুতান যেই না চলে যেতে গেছে অমনি ধুম-ধপাস। কী একটা ভারী মতো জিনিস পায়ের কাছে এসে পড়ল। প্রথম মনে হল বল। কিন্তু ফুটবলের চেয়ে ছোট্ট ক্রিকেট বলের চেয়ে বড়ো এ কোন দেশি বল? ভালো করে কাছে গিয়ে দেখি-আরে সর্বনাশ! এ তো একটা পাকা বেল। হলদে রং। বেদম শক্ত খোলা। কিছু একটা পড়তে দেখলেই ফন্টের স্বভাব সেখানে হাজির হওয়া। বেলটাকে শুঁকে-টুঁকে দেখে বুঝল কামড়ে সুবিধে হবে না-সুতরাং ফন্টেচরণ আবার চড়াই ধরতে ছুটল। আমার এখন কী করা উচিত? তুতান চিন্তায় পড়ে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে তুলে নিল বেলটা। ভালো করেছিল। কেননা বাড়ি নিয়ে যাবার পর ঠাকুমা মহা খুশি। পাকা বেল নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো।

এইরকম ভাবে চলছিল। থেকে থেকেই ওদিকের বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে হুংকার ওঠে, ‘এই যে ক্যাপ্টেন!’ সেই শুনে চমকে গিয়ে দুটো-চারটা দুর্ঘটনা ঘটে-কারও হাত থেকে চায়ের কাপ ছিটকে যায়, চমকে জেগে ওঠে কেউ কেউ-তারপর পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। বেলতলা দিয়ে তুতান যখন স্কুলের দিকে রওনা হয় দু-চারটি ডাল তাকে হাত নাড়ে, তখন বাধ্য হয়ে তুতানকে হাত নাড়তে হয়। এইভাবে আস্তে আস্তে তার সঙ্গে বেলগাছের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছিল।

ভালোই হল একদিক দিয়ে। ছোট্ট আমগাছের চারার বড়ো হয়ে উঠতে এখন অনেক দেরি। মা বলেন, ‘যতদিনে ওতে আম ফলবে ততদিনে তোর গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে যাবে।’ তাই কি? হবেও বা। ভালো করে গাছের গোড়ায় সার দিলে যদি তাড়াতাড়ি করে বড়ো হয়।

বাবা বলেন, ‘দরকারই নেই। কড়া রোদ পায় না-সেটাই তো ওর খাবার। বড়ো হবে কী করে? ওইরকমই থাকবে চিমসেপানা। বেল গাছটা তিনতলা সমান উঁচু হল কী করে? ওই রোদ পাবার জন্যেই তো!’ সালোকসংশ্লেষ কাকে বলে, পড়ার বইতে আছে-তাই ওসব জানে তুতান। মানুষও যদি ওইভাবে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত তাহলে কেমন হত? এ বিষয়ে মাঝে মাঝে মাথা ঘামায় সে। বড়ো হয়ে তুতান যখন একজন ডাকসাইটে বিজ্ঞানী হবে তখন ওরকম একটা আবিষ্কার করার জন্য জোরদার চেষ্টা চালাবার ইচ্ছে আছে তার।

বেল গাছের সঙ্গে তুতানের কথার আদানপ্রদান ক্রমেই বাড়ছিল। ফন্টের সঙ্গে মানুষের ভাষায় কথা বললে ও ঠিক বুঝে নেয়-বেড়াল হলে কী হবে, মানুষের কাছাকাছি ঘুরঘুর করা অভ্যেস তো! বেল গাছের ডালে কতরকম পাখির আসা-যাওয়া। সত্যি বলতে কী বেল গাছের পক্ষে বরং পাখির ভাষা বোঝা সম্ভব কিন্তু মানুষের ভাষা একেবারেই নয়। কোনো লোক তো ওর ডালে চড়ে না। সেই চোরেদের ঘটনার পর থেকে লোকজনেরা বেল গাছতলা একটু এড়িয়ে এড়িয়েই চলে।

তবে তুতান তাদের দলে নেই। তার ইচ্ছে করে রাত গভীর হলে চুপচাপ গাছটার তলায় গিয়ে হাজির হয়, সেখানে আরও কী ঘটনা ঘটে দেখবার জন্য। সত্যি যদি কেউ গাছের ডালে থাকে সে এখনও কি পা ঝুলিয়ে বসে দোল খায়, না নাক ডাকিয়ে ঘুমায়? এই কাজে ফন্টেকে সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে-ফন্টের তো সর্বত্র অবাধ গতি। ইচ্ছে হলেই সাঁ করে মগডালে চড়ে যেতে পারে। কখনো সেরকম ইচ্ছে ওর হয়নি অবশ্য।

আর ফন্টেটা বেজায় ছটফটে। তার সঙ্গে বসে খানিক শলা-পরামর্শ করবে তুতান, সে রকম পাত্রই নন তিনি। এই এখানে দাঁড়িয়ে, তারপরেই ভোঁ দৌড়-কোথায় কোন পাখি উড়ল, না পোকা নড়ল, তাদের ধরতে। নাঃ, ওকে দিয়ে কোনো সুবিধে হবে না। ইস,

তুতানের যদি একটা কুকুর থাকত। কুকুরেরা খুব চালাক। তাকালেই মনের কথা ধরে ফেলে।

তুতানের দৃঢ় বিশ্বাস বেল গাছটারও এই ক্ষমতা আছে। তা না হলে তুতানকে দেখে মাথা দুলিয়ে মিটিমিটি হাসে কেন? ও কী করে বুঝতে পারে, তুতান এখন মনে মনে কী ভাবছে? সে সব কথা জোরে জোরে বলা যায় না। কিন্তু বেল গাছ তার আশ্চর্য ক্ষমতার জোরে ঠিক বুঝে ফেলে। তুতান মনে মনে ভাবে যদি বুঝতেই পেরেছ তাহলে কিছু করে দেখালে তো পার বাবা। যখন-তখন কেউ যদি আকাশ ফাটিয়ে 'এই যে ক্যাপ্টেন' বলে হুমকি দিয়ে ওঠে তাহলে কারও পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব? হোমওয়ার্ক করার কথা তো বাদই দাও, এমনি ঘুড়ি ওড়াতে গিয়েও চমকে গিয়ে ঘুড়ি কেটে যায়। খুব কষ্ট হয়েছিল সেবার-কত সাধের চাঁদিয়াল!

যাক গে ভেবেই বা কী হবে-এই মনে করে অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করে তুতান। তবু বেল গাছ তাকে দেখলে এমন করে চোখ মটকায় যেন দু-জনে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের শরিক! তুতানের খুব ইচ্ছে এই বিষয়ে কারও সঙ্গে একটু আলোচনা করার। কিন্তু করবে কার সঙ্গে? ফন্টে? নাঃ, ওকে বিশ্বাস নেই। বেল গাছকে বিশ্বাস করা যায়। কেন যেন তুতানের খুবই মনে হয় বেল গাছের স্বভাব শান্ত ধীর-স্থির। সে হঠাৎ করে এখানে-ওখানে দৌড়ে পালায় না। যেখানে আছে সেখানে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর মাঝে মাঝে ডাল নাড়িয়ে হাওয়া খায়।



সেদিন বিকেল বেলা তুতান পষ্ট দেখল গাছটা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। ব্যাপার কী? সাইকেল থামিয়ে গুটিগুটি গাছটার কাছে এল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কেন ডাকছ?' বেল গাছের ডালগুলো একবার এদিক হল একবার ওদিক হল। তারপর গাছ বলল, 'বুঝেছ।' কিছুই বুঝল না তুতান। সে বোকার মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে যেই সাইকেল চড়তে যাবে সাঁই করে একটা পাতলা ডাল নেমে এল, তারপর আলতো করে ওর পিঠে হাত বুলিয়েই আবার নিজের জায়গায় গিয়ে ঝুলতে লাগল। কিছু বুঝলাম না-ভাবতে ভাবতে সাইকেলে স্পিড নিল তুতান। একবার পিছন ফিরে দেখে লুটোপুটি করে ডালগুলো নিজেদের মধ্যে খুব হাসাহাসি করছে।

হাসির মানেটা বোঝা গেল ক-দিন পর। তুতান স্কুল থেকে ফিরে অভ্যাসমতো বারান্দায় গিয়ে চারদিকে দেখছে, এমন সময় দেখে সামনের বাড়ির বারান্দা খালি। চেয়ারে খালি

গায়ে লুঙিপরা কেউ বসে নেই। এখনও দুপুরের ঘুম ভাঙেনি বোধ হয়। মা ডাকলেন জামাকাপড় ছেড়ে খেয়ে যেতে! খেতে খেতে তুতান শুনল-একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেছে এর মধ্যে।

'জানিস তো কী কাণ্ড!' মা বললেন টোস্ট করতে করতে।

টেবিলে তুতানের প্রিয় খাবার আলুর দম। একসঙ্গে তিনটে আলু মুখে পুরে সে জিজ্ঞেস করতে গেল 'কী কাণ্ড?' কিন্তু মুখ দিয়ে যে আওয়াজটা বেরোল সেটা শোনাল এইরকম- 'চকম চকম চকম'। মা ভাবলেন তুতান লুচি চাইছে।

তিনি বললেন, 'কালই তো লুচি হয়েছিল-আবার আজকেও?'

'না না,' ততক্ষণে আলুগুলো পেটে চালান হয়ে গেছে-কাজেই কথা বলতে কোনো অসুবিধে হল না, 'তুমি বললে কী কাণ্ড, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'সামনের বাড়ির নেড়ুকাকু কথা বলতে বলতে ঢিব করে চেয়ার থেকে গড়িয়ে অজ্ঞান। সবাই ধরাধরি করে শুইয়ে দিল, মাথায় জল-টল ছিটে দিতে জ্ঞান ফিরল। উনি বলছেন- কেউ ওঁকে ঢিল মেরেছে অথচ বারান্দায় কোনো ঢিল-পাটকেল কিছুই পাওয়া গেল না।'

তুতান খাওয়া বন্ধ করে কান খাড়া করল, 'কিছুই পাওয়া গেল না? ভালো করে দেখেছে সবাই?'

'ও হ্যাঁ, একটা আজব জিনিস-বেশ মোটাসোটা একটা বেল মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে! কোথা থেকে এল কে জানে?'

'কেন?' তুতান খাওয়ার দিকে মন দিল, 'ওই তো ওখানে একটা বেল গাছ আছে। সেখান থেকে আসতেই পারে।'

'তুই কি পাগল হলি, ওই গাছ থেকে নেড়ুকাকুর বারান্দা অত দূর? তাহলে বলতে হয়, গাছের মধ্যে একটা ভূত আছে।'

তুতান প্লেটের দিকে চোখ নামিয়ে বলল, 'ভূত কেন? অত বড়ো গাছ, তার গায়ে কী কম জোর। গাছটাই ছুড়েছে।'

'হ্যাঁ, গাছের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। তোর জন্য আরও টোস্ট করব?'

ততক্ষণে তুতানের খাওয়া হয়ে গেছে, আঙুল চাটতে চাটতে সে উঠে পড়ল।

'ও কী, হাত না ধুয়ে কোথায় চললি?'

এক সেকেন্ডের জন্যে বাথরুমে কল খোলার ভান করে পর মুহূর্তেই হুড়মুড় দুদ্দাড় করে তুতান ছুটল নীচে। ওকে ঢুকতে দেখে ফন্টে বুঝল কিছু একটা ব্যাপার আছে। সেও ছুট লাগাল সঙ্গে সঙ্গে।

হাঁপাতে হাঁপাতে তুতান একেবারে বেল গাছতলায়। পিছন পিছন ফন্টে।

কিছু বলতে হল না। একবার বেল গাছের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসল তুতান- 'শাবাশ! একেই বলে বন্ধু। কিন্তু আবার তো শুরু হবে সেই হেঁড়ে গলায় হুংকার-তখন কী হবে?'

হুশ করে একটা বেল উড়ে গেল তুতানের মাথার ওপর দিয়ে। ঘাবড়ে গিয়ে ফন্টে লাফাতেও ভুলে গেল। বেলটা একটা টার্ন মেরে তিনটে বাড়ি পার হয়ে সোজা গিয়ে ল্যান্ড করল নেড়ুকাকুর বারান্দায়। শব্দ হল-ঝন-ঝন-ঝনাৎ! জানলার শার্সি চুরমার।

'বুঝলাম!' বলল তুতান। তারপর অ্যাবাউট টার্ন করে চলল খেলার মাঠের দিকে, পিছনে কিন্তু ফেউয়ের মতো লেগে আছে ফন্টে-একবার ডানদিকে যায়, একবার বাঁ-দিকে। আর কেবলই তুতানের পায়ের কাছে ঘেঁষে আসে।

'কিছু বুঝতে পারলি না তো?' জিজ্ঞেস করল তুতান।

ফন্টে মাথা নাড়ল।

'বলিস কী রে ক্যাপ্টেন?' বলে হো-হো করে হেসে উঠল তুতান। গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসল ফন্টেও।

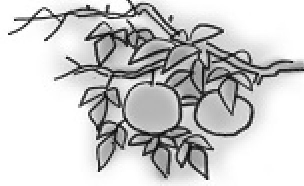
'আর ডাকতে হবে না। এই যে ক্যাপ-বলার সঙ্গেসঙ্গে যদি দমাস করে বেল পড়ে-আর কাচ ভাঙে তাহলে?'

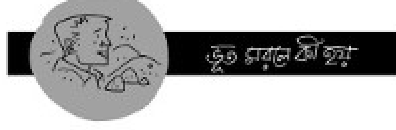
তাহলে? ফন্টের শুধু দু-চোখে নয় মাথা থেকে লেজের ডগা অবধি জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

'ন্যাড়া বেলতলায় যায় ক-বার?' প্রশ্ন করে তুতান।

'কাকতালীয়,' জবাব দিল ফন্টে।

*গল্পসংখ্যা ১৪০৭*






## মহাশ্বেতা দেবী

একটা সমস্যা বটে! এর উত্তর কেউ জানে বলে আমি তো জানি না। কে বা ভেবেছে এ সমস্যা নিয়ে? কিন্তু এই অজানা রহস্য আমার কাছে এখন জলের চেয়ে পরিষ্কার। অনেক কাল আগে ভাগীরথীর জল যেমন পরিষ্কার ছিল।

গরমের সময় ভাগীরথীর জল কমে যেত। আমরা স্নান করতে যেতাম। সাদা বালির ওপর দিয়ে বয়ে যেত জল। চোখ নামালে দেখা যেত বালির ওপর বেলে মাছ খেলা করছে জলে। ফলগু বলত, তাদের নাম যখন বেলে, ওরা বালির একটু ওপরেই খেলে বেড়াবে।

যা হোক, ভূত মরলে কী হয়, এ নিয়ে আমার গভীর চিন্তা ছিল।

এখন আর নেই।

আমার চেয়ে অনেক ছোটো দেবর্ষি, অথবা দাড়ুর ছেলে রাজর্ষি অথবা ঢ্যাবা, টাউনের 'কুন্তল সু স্টোর্স' থেকে 'বাই অ্যান্ড ফ্লাই', অর্থাৎ 'কেনো এবং ওড়ো' নামের টেকসই অথচ আরামদায়ক জুতো না কিনলে এ সব কথা জানাই যেত না।

দোকানটি অশান্ত মাসচটকের। ঢ্যাবা ওর দোকান থেকেই জুতো কেনে। একটু ঘন ঘনই কেনে। কেন না হাঁটাই ওর নেশা। যখন-তখন শুনবে, 'ঢ্যাবা? ও তো তিন দিন আগে হেঁটে অযোধ্যা পাহাড় গেছে।'

নয়তো চাইবাসা।

নইলে কাঁদোডাবর।

দাড়ু দুঃখ করে, 'কেন যে হাঁটে, কে জানে! আমার সাতটা বাস, আটটা ট্রাক আছে। তুই হেঁটে মরিস কেন? কাঁদোডাবরে কে যায়? সেখানে দেখার মতো আছেটা কী? ছোট্ট একটা গ্রাম?'

যদি বলো, ঢ্যাবা নির্ঘাত বলবে, 'পা আছে তাই হাঁটি। সব সময়ে মন্দির রে, পিকনিকের জায়গা রে, বেছে বেছে যেতে হবে?'

দাড়ুর বউ বলে, 'হাঁটছে হাঁটুক না।' বলবেই। বউ আরও বলে, 'তোমার মতো আলসে হয়নি তো। ও একটা কেউকেটা হবেই হবে, আমার মামা তাই বলেছেন।'

বকাঝকাও চলে না। ঢ্যাবা হল বাড়ির একমাত্র সাতরাজার ধন এক মানিক। একদিন ও 'শ্রীগুরু রোড ট্রান্সপোর্ট'-এর মালিক হবে। তবে ঢ্যাবা বলে, 'বয়ে গেছে। চালায় তো বিনোদজ্যাঠা। তখনও বিনোদজ্যাঠাই চালাবে।'

বলেই ও ডায়েরি লিখতে বসে। কোথায় যাচ্ছে, কী করছে স-ব লিখে রাখে।

টাউন থেকে কত কত লোক প্যাকেজ ট্যুরে ভারত ভ্রমণ করছে, তেমন ভ্রমণ ও করবে না।

বাবাকে বলে, 'আমাদের জেলায় কত রাস্তা, কত জায়গা পাহাড়ের মতো ঢেউ খেলানো, কত পরব হয়, মেলা হয়, হেঁটে না দেখলে দেখা হত?'

বিনোদ বিয়ে করেনি। ভূতের মতো খাটে, বাস ও ট্রাকের ব্যাবসার ওপর নজর রাখে। কবে যেন এসেছিল, থেকে গিয়েছিল দাড়ুর বাবার কাছে। বলেছিল, বর্ধমানে বাড়ি। বাপের জমিজমা আছে, ভাইরা দেখে। ওর ও সবে মন নেই। তাই ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে।

তারপর তো বাড়ির অভিভাবক হয়ে বসল। এই যে ঢ্যাবা বলল, 'মিশন স্কুলে উচ্চ-মাধ্যমিক পড়লাম। এখন আমি টাউনের কলেজে পড়ব। সবাই কলকাতা যাবে কেন?'

বিনোদ বলল, 'কী বুঝলি দাড়ু। একে বলে দেশপ্রেম! তোর বাবা থাকলে বুঝতেন।'

'হেঁটে হেঁটে দেশপ্রেম হচ্ছে?'

'গাড়ি চেপে কি দেশ দেখা যায়?'

'দেশ আবার কী? কাঁদোডাবর, বেগুনকোদর, আরসা, এ সব কি, যাকে বলে হিমাচল, ব্যাঙ্গালোর, হেন তেন? দেশ!!!'

হাজার হলেও দাড়ুর বাবার স্বরচিত কবিতা বিনোদ এক সময়ে প্রত্যহ শুনেছে। ও বলল, 'এই জন্যেই দেশের এই দুর্দশা! ছোটো ছোটো জায়গা, পায়ে-হাঁটা পথ, কংসাবতী ড্যাম, কেশরগড়ের জঙ্গল, এ সবই হল গে দেশ! গাল দিচ্ছ যে! জেলার রাস্তা এমন ভালো না হলে, বাস-ট্রাক এত কম না হলে তোমার কোম্পানি চলত?'

'যত্তো সব!'

'আরে, আমি বলে দিচ্ছি ও পায়ে হেঁটে দুনিয়া ঘুরবে। দাড়ুর নাম লোকে ভুলে যাবে। দাড়ুর ছেলে ঢ্যাবা নয়। ঢ্যাবার বাবা দাড়ু, এ জন্যেই তোর নাম হবে।'

ইত্যাদি বলে বিনোদ কাটল।

আর দাড়ু ঢ্যাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'মিশনে পড়লে। বন্ধুরা গেল কলকাতা। তুমি বললে টাউনের কলেজে পড়ব। তা কলেজে কি যাও?'

ঢ্যাবা কোনোদিন চেঁচিয়ে কথা বলে না। ওর চেহারা ছিপছিপে, রং শ্যামলা, চুল সদাই নেড়ামুড়ো করে ছাঁটা। একটু বড়ো হতেই ছেঁটে নেয়। নিজেই ছাঁটে। ওর হন্টন-সঙ্গী জিন কাপড়ের ব্যাগ নিজেই মেরামত করে। ব্যাগে ছুঁচ সুতো, তেলের শিশি, গামছা, 'বহু উদ্দেশ্য' সাধক লাইফবয় সাবান (স্নানও করো, কাপড়ও কাচো) এ সবই পাবে।

ওর চোখে সর্বদা গভীর চাহনি। ও আস্তে বলল, 'মাঝে মাঝে যাই।'

'এই যে বহরমপুর থেকে দিদিমা, মঃজফরনগর থেকে বড়োপিসি, আসানসোল থেকে ছোটোপিসি, এরা তোকে একবারটি যেতে লেখে, যাস না কেন? ও, তুই তো আবার ট্রেনে চাপবি না।'

ঢ্যাবা বলল, 'জুতো কিনব বাবা।'

'ছিঁড়ে গেছে তো?'

ঢ্যাবার মা বলল, 'হচ্ছেটা কী? একমাত্র সন্তান তোমার! টাকায় ছাতা পড়ছে! এক জোড়া জুতো কিনবে তাতে এত কথা? আমি ওকে দশ জোড়া জুতো কিনে দেব।'

তারপর বলল, 'যা ঢ্যাবা, নাইতে যা!'

স্বামীকে বলল, 'দেখো, ওর কুষ্ঠীতে লেখা আছে, ও জগজ্জয় করবে। তুমি এত খুঁটো না তো। কী-বা বয়েস, সবে উনিশে পড়েছে। সিগারেট খায় না, টি.ভি. দেখে না, আড্ডা মারে না। ভিজে ছোলা খায়, ব্যায়াম করে, ওর মতো হাঁটতে পারে ক-জন?'

দাড়ু বলল, 'তুমি বুঝবে না।'

কিন্তু জুতো কেনার সময়ে বিনোদ বলল, 'ও কিনবে বাই অ্যান্ড ফ্লাই। কেনো আর ওড়ো। কী সুন্দরী জুতো! দেখলে মনে হয় ফেয়ার্যান লাবলি মেখেছে। বুঝলে?'

'দাম?'

'তেমন আর কি! বুঝি সাত-শো না আট-শো! অশান্তর দোকানে দেখগে ছেলেদের ভিড়।'

'বটে?'

'অশান্ত বলেছে, ঢ্যাবা হল পয়মন্ত খদ্দর। ও আগে কিনবে, মানে যাকে বলে উদবোধন গো! তারপর সবাই আপসে কিনবে।'

'পয়মন্ত তো বলবেই। বছরে দশ জোড়া জুতো কেনে তো! সব্যস্ব টাকা ওই অশান্ত নিয়ে যাচ্ছে।'

'বাজে বোকো না দাড়ু। কিছু ভক্তিগীতির ক্যাসেট চাই। তারকেশ্বর যাবে নন্দরা।'

'ধুত্তোরি!'

তা ঢ্যাবা গেল, ফেব্রুয়ারির বাইশ তারিখে জুতো কিনল। মাকে বলল, 'জুতোটা দেখেই মা আমি কেমন হয়ে গেলাম। মনে হল, ওই জোড়াটাই কিনতে হবে। এবার দৌড়ের রেসে নামব।'

'নামিস।'

'উড়ে বেরিয়ে যাব।'

এসব কথাবার্তা হয় বাইশ তারিখ রাতে। মনে রাখতে হবে, অত রাতে কোনো ট্রেন ছাড়ে না। খেয়ে দেয়ে জুতো জোড়া বিছানার পাশে টেবিলে রেখে ঢ্যাবা ঘুমিয়ে পড়ল।

দেখো, এ পর্যন্ত যা বললাম, সবই বিনোদের কাছে শোনা কথা।

পরের ব্যাপারটা হল, 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।' ঘটনাটা যদি কলকাতা-দিলি×-বোম্বে-ব্যাঙ্গালোরে ঘটত, ঢ্যাবা ঋত্বিক রোশনের চেয়ে অনেক নাম করে ফেলত। আমেরিকা থেকে লোকজন চলে আসত। শহরটা পুরুলিয়া বলেই কেউ গুজব ছড়াচ্ছে না। শহরটার বুদ্ধি আছে তো!

তেইশে সকালে দেখা গেল ঢ্যাবা তার জুতো, ব্যাগ, সোয়েটার নিয়ে উধাও। নেই মানে কোথাও নেই।

নতুন জুতো পরে হাঁটতে গেছে, তাও বলা যাবে না। বড়ো দরজা তালা বন্ধ, কোলাপসিবল গেট তালা বন্ধ, শুধু ছাতের দরজাটা খোলা।

ঢ্যাবা এবং নতুন জুতোর যোগাযোগে এমন ব্যাপার হতে পারে। তবু রেগেমেগে দাড়ু ছেলেকে গাল দিল না। বউকে বলল, 'এই তো ফিরল দলমা পাহাড় থেকে সেদিন। এসে যাবে। এসে যায় তো।'

আর বিনোদকে বলল, 'থানা গারদের মতো একটা ঘর বানাব। রাতদিন আটকে রেখে দেব।'

বিশ্বাস করবে, পঁচিশের ফেব্রুয়ারি সৈদাবাদ থেকে ঢ্যাবার দিদিমা ফোন করলেন।

'হ্যাঁ বাবা দাড়ু! এ কী ব্যাপার? কাল রাত এগারোটায় ঢ্যাবা এসে হাজির!'

'যাক, আপনার কাছে গেছে!'

'আমার কাছে! রাতে ফুলকো লুচি, আলুর দমপোক্ত, ছানার পায়েস খেল। সকালে লিখে গেছে, আমি হাজারদুয়ারি দেখব, খোশবাগ দেখব। তারপর যাব রাজমহল। চিন্তা করো না।'

'গেল কীসে?'

'বলে, হেঁটে এলাম। কী জুতো কিনেছি দিদিমা! যেন উড়িয়ে নিয়ে চলে এল। বলে কি, জুতোটাই বলল, ছাতে চলো, আমি তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যাব। দেখো বাবা! কাপালিকের কবলে পড়েনি তো?'

দাড়ুর প্রাণ উড়ে গেল। কোথায় পুরুলিয়া, কোথায় বহরমপুর! এ কি অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার! দাড়ু আর দাড়ুর বউ দৌড়োল পুজো দিত। বিনোদ কী যেন ভাবতে থাকল। বলল, 'আমি ধরে ফেলব কী হচ্ছে।'

তা বিনোদ পারে বটে। একসময় ছানাভূতদের বোতলে পুরে গৌরীকুণ্ডে ফেলে এসেছিল বলে গল্প মারে।

কিন্তু আঠাশে ফেব্রুয়ারি আসানসোল থেকে ঢ্যাবার ছোটো পিসে এসে হাজির। বলল, 'পরশু ভোরে ঢ্যাবা গিয়ে হাজির। আমরা তো জানি ওকে। বললাম, কোথা থেকে?'

ও বলল, 'বহরমপুর থেকে।' আপনার বোন চোখ টিপল আমিও কথা বাড়ালাম না।'

'সে কোথায়?'

'তাই তো জানতে ... এবং জানাতে এলাম। পরশু ভোরে ... মানে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি। দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করল। বলল, আসতে বল, এসে গেলাম। তারপর মুর্শিদাবাদে কী কী দেখেছে, সে সব গল্প করল। খুব ঝরঝরিয়ে হাসছে, অনর্গল কথা বলছে, যেন বদলে গেছে। বহরমপুর থেকে আসানসোল কী করে এলি। বলে কী, কী জুতো পরেছি, দেখছ? যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়।'

'সে কোথায়?'

'আস্তে বউদি! পরশু দিন রাত, কাল সারা দিন, তারপর সন্ধ্যে থেকে নেই। এই দেখুন, লিখে রেখে গেছে, পিসি! মা-বাবাকে বলে দিয়ো যেন চিন্তা না করে। ও কি না বলে ... মানে ...'

বিনোদ বলল, 'চেহারা কেমন দেখলে?'

'ঝকঝকে, ফিটফাট।'

দাড়ু বলল, 'পুলিশে যাবে না কি?'

‘এই চিঠিটা দেখুন।’

‘আমাকে খোঁজার চেষ্টা কোরো না। আমি ঠিক ফিরে আসব। হইচই বাধালে জাওরে-বিশপুর চলে যাব।’

‘সে কোথায়?’

‘কোরাসে চেঁচাবেন না। আমি জানি না।’

অঃতপর মজফফরনগর-উত্তরপ্রদেশ থেকে বড়োপিসির টেলিফোন পাঁচই মার্চ।

টেনশানে দাড়ুর মাথায় ভিজে গামছা। বড়দির গলা কী গদগদ। রাত বারোটায় স্বয়ং ঢ্যাবা। বলল, কাদের গাড়ি চেপে এসেছে। তোরাও আচ্ছা! একটা ব্যাগ দিয়ে ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছিস?’

‘সে কোথায়?’

‘তা কী করে জানব? বলল, কোথায় কোন জায়গায় যাবে।’

‘কোথায়?’



‘দাড়ু! টাকাই বানিয়ে গেলি। তোরা দু-জন কোথাও বেড়ালি না, দেশ দেখলি না, যাক গে! ওর পিসে বলছে, এমন ছেলে আর দেখিনি। বাসে উঠব না, ট্রেনে উঠব না, পায়ে হেঁটে ভারত দেখব। উচ্চাদর্শ যাকে বলে!’

‘উচ্চাদর্শ। এবার ফিরলে ওর ঠ্যাং কেটে দেব।’

দাড়ু বউকে বলল, ‘আর কি! জুতো পরে উড়ছে, এ কথা পুলিশকে বলা যায়?’

‘জানি না। ঢ্যাবাকে এনে দাও।’

‘বিনোদ। অশান্তর দোকানে ক-জোড়া জুতো আছে দেখ। সবগুলো কিনে আন, তারপর ওগুলো জ্বালাব।’

‘মাথা ঠান্ডা করো। যতজনা জুতো কিনেছে, সবাই কি দৌড়োচ্ছে?’

‘এ সব ভাগ্যের প্রহার।’

বুঝতেই পারছ, সে সময়টা কী অশান্তিতে না কেটেছে ওদের। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, বেজায় অশান্তি।

ভাবতে পারবে না, মার্চ মাসের বিশ তারিখে বিনোদ বলল, 'আমি ক-দিন বাইরে যাব।'

'তা আর যাবে না, কোথায় যাবে শুনি?'

'বেনারস যাব।'

'কেন? তুমি তো চটি পরো।'

'অত জবাব দিতে পারব না।'

দাড়ুর বউ স্বামীকে ফিসফিস করে বলল, 'উনিও তো পাগল হয়ে যাচ্ছে। যাক। ঘুরে আসুক! আর পনেরো দিন দেখব, তারপর আমিও নিরুদ্দেশ হয়ে যাব।'

'আমিও যাব, চিন্তা নেই।'

সত্যি বলতে কী, শহরে ওদের চেনামহলে টেনশান এসে গিয়েছিল। অশান্ত তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাচ্ছিল। গ্যারেজের লোকজন পাত্তা লাগাচ্ছিল। ড্রাইভার নরসিং বলছিল, ও স্বপ্ন দেখছে, ত্রিশূল হাতে ঢ্যাবা হরিদ্বারে হাঁটছে।

দাড়ু বলছিল, 'সব আমার বাবার দোষ! চিরকাল মুনি ঋষির নাম দেবার ঝোঁক। বাড়িতে জ্যেষ্ঠ, কেউ কিছু বলতে গেলে দু-বার ভাবত। গুষ্টিতে ছেলে জন্মালেই কণ্ব, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, শেষে আমি দেবর্ষি, ছেলে রাজর্ষি। ও ঋষি তো হবেই। নইলে ঘর ছেড়ে হেঁটে বেড়ায়?'

ঢ্যাবার মা কাঁদল, 'অমন কথা বোলো না গো। সেদিনই টি.ভি.তে দেখেছি নিমাই সন্ন্যাস নিচ্ছে!'

'তিনি তো আর জুতো পরে হাঁটত না! ওঃ, টুপি পরায় এ কথা শুনিও বটে, বলিও বটে। অশান্ত কী সর্বনেশে জুতো পরাল বলো তো? ছি ছি ছি! তোর দোকানে ঢ্যাবা বছরে এত জোড়া জুতো কেনে, কী জুতোই না পরালি!'

বলে রাখাই ভালো, ঢ্যাবার মা আর বাবা এ সময় ঝগড়া করছিল না। দাড়ু ঢ্যাবার কোষ্ঠী জেরক্স করিয়ে জ্যোতিষীদের কাছে পাঠাচ্ছিল, ওদের বাড়ি মাংস ঢুকছিল না। দাড়ু বিড়বিড়িয়ে বলছিল, 'আর জুতো নয়। চটি!'

এমন সময়েই বিনোদ একদিন ঢ্যাবাকে নিয়ে ফিরে এল।

মুখ তুলে ঢ্যাবাকে দেখে দাড়ুই মূর্ছা গেল। ঢ্যাবার মা? সে যে কী করল, তা ভেবে নাও।

বিনোদ বলল, 'ওর পা দেখো। চটি কিনে পরিয়ে এনেছি।'

ঢ্যাবা ফোন করেছিল বিনোদকে?

নয় তো কি ওর বাবাকে ফোন করবে? বিনোদ কখন গ্যারেজে, কখন বাড়িতে, সে তো ঢ্যাবা জানত, ঢ্যাবা ফোনে যেই বলল, 'জ্যাঠা, আমি রাজর্ষি!' তখনই বিনোদ বুঝে গেল।

বিনোদ ঢুকেই বলেছিল, 'কেউ ওকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করবে না। স্নান করে নিক। ট্রেনে আমি ওকে খাওয়াতে খাওয়াতে এনেছি। স্নান করে ঘুমোক।'

এ পর্বে সবটাই বিনোদ কাহিনি। ঢ্যাবা দশাশ্বমেধ ঘাটেই বসেছিল, আর বিনোদের হাত ধরে বাধ্য ছেলের মতো চলে এসেছিল হোটেলে। সেদিন রাতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ও সব কথা বলেছিল।

সব একরকম জুতো। কিন্তু ঢ্যাবা জানত ওকে ওই জোড়াটাই কিনতে হবে। কেমন করে জানল, তা ঢ্যাবা জানে না। পরে শুনেছে, কার কাছে যেতে চায়, তা কোনো কোনো জুতো জানতে পারে। তখন একটা জাদু ঘটে যায়।

বিনোদ বলেছিল, 'এসব তোকে বলল কে?'

'কেন, ও?'

বিনোদ ভেবেছিল, ওকে খুঁচিয়ে লাভ নেই। মাথারই ঠিক নেই ওর। আবার মায়াও হচ্ছিল। ঢ্যাবা ওর গায়ে হাত রেখে চোখ বুজে এমন স্বপ্ন দেখা গলায় কথা বলছে! দুগগা! দুগগা! কালই ফিরতে হবে।

'ও কে?'

'আমার ... জুতো ...'

'জুতো কথা বলে?'

'বলে তো! ও অনেক কথা বলত। যেদিন কিনলাম, সেদিনই ঠিক একটা ছোট্ট ছেলের গলায় বলেছিল, বাব্বা! বাঁচলাম তোমার চোখ কখন পড়বে তাই ভাবছিলাম, এখন নিশ্চিন্ত।

'তারপর বলল, ভয় পেয়ো না। আমি তোমায় ... হাঁটাব, কিন্তু মনে হবে উড়ে চলছ।'

'হ্যাঁ রে, তুই আসানসোল ... বহরমপুর ... মজফফরনগর ... অতগুলো জায়গা ...'

ঢ্যাবা স্বপ্ন স্বপ্ন দুঃখী গলায় বলল, 'হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, হরিদ্বার ... চামোলি ... কত জায়গা ... যেই পা দিতাম রাস্তায় ... ঝড়ের মতো চলতাম ... জানো বাসের চেয়ে জোরে ... ট্রেনের মতো স্পিডে ...'

'শেষে এখানে এলি?'

'ছিঁড়ে যাচ্ছিল ... ও আসতেও চাইল ... বলত, যেদিনে ছিঁড়ে যাব ... সেদিনে একটা নদীতে ফেলে দিয়ো ... সেই জন্যেই ...'

'গঙ্গায় ফেলে দিলি?'

'গায়ে হাত বুলিয়ে ... আদর করে ...'

'কী বলছিস ঢ্যাবা?'

'কেন বলব না জ্যাঠা? শোনো, ও কী, তা জানো? ও একটা ছোট্ট ভূত। ছোটো ভূতরা মরলে জুতো হয়, বড়ো ভূতরাও।'

'ভূত মরলে জুতো হয়?'

'কিছু তো একটা হতে হবে। ওরা জুতোই হয়, সবাই ওদের কিনতে পারে না। মনের মতো খদ্দের ঢুকলেই ওরা টের পায়। তখন তোমার বাঁচোয়া নেই। ওই জুতোই কিনতে হবে।'

'আর হাঁটতে হবে।'

'নিশ্চয়।'

'আর ছিঁড়ে গেলে?'

'ও তো নদীতে ভেসে যেতে চেয়েছিল।'

'তোকে ভয় দেখায়নি?'

'না না। ও তো ভালো ছিল। দুষ্টু ভূতরা যখন জুতো হয়, তখন ... কতরকম অ্যাকসিডেন্ট না হয়! সেরকম তো ছিল না ও।'

'তোর দুঃখ হয়েছে!'

'ভীষণ! নীলতাপুরের মেলায় নাগরদোলা চড়ে ও কী খুশি না হয়েছিল ...'

'আর ভাবিস না। ও তো সমুদ্রে চলে যাবে, তাই না?'

'জানি। কিন্তু দুঃখ তো হবেই। বেরোবার দিন ছাত থেকে এক লাফে রাস্তায় নেমেছিলাম!'

'ভাগ্যে আমায় ফোন করেছিলি।'

'ও বলেছিল। তোমার গল্প তো ওকে করতাম। তুমি শালিকের ডানা ভাঙলে সারিয়ে তুলতে ... শীতকালে লালটুকে সোয়েটার কিনে দিয়েছিলে ... ও বলেছে, এরপর ভালো জুতোরাই, মানে ভালো ভূতেরা আমাকে খুঁজে নেবে। জানো, নৌসেরাবাগে টিয়া পাখি আসে, তাদের ডানাগুলো লাল!'

'কী খেতিস?'

'জন্মদিনের টাকাটা দিদমা ... ছো-পিসি ... দিয়েছিল না? জ্যাঠা! ওর কথা তুমি কাউকে বোলো না। কেমন?'

ঢ্যাবা ঘুমিয়ে পড়ল।

হাঁটে, ঢ্যাবা এখনও হাঁটে। তবে এমন অ্যাডভেঞ্চার করে আর হাঁটে না। কী জুতো পরে তাও জানা নেই। তবে বিনোদ এখন জানে, আবার ও তেমনি কোনো জুতো কিনবে।

আর আজ মনিপুর, কাল জম্মু, পরশু বিজয়ওয়াড়া তো তরশু অমরনাথ ঘুরে বেড়াবে।

ওই জুতোটা ঢ্যাবা কিনল বলেই না জানা গেল, ভূত মরলে জুতো হয়!

*শারদীয়া ১৪০৮*




# হিমানীশ গোস্বামী

জাদুকর বিশু বসু পুজোর কয়েক দিন পর পাড়ার ইশকুলের ছোটো মাঠে জাদু দেখাবেন। ইশকুলের খেলার জায়গার একদিকে একটি মঞ্চও তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে গানবাজনা হবে, পাড়ার অনেক ছোটো ছেলে-মেয়ে গান গাইবে, বাজাবে, কেউ নাচবে, কেউ-বা কবিতা আবৃত্তি করবে। বিশু বসুমশাই বলেছিলেন ঠিক সাতটায় এসে পৌঁছোবেন, আর ঠিক দেড় ঘণ্টা জাদু দেখিয়ে তিনি চলে যাবেন, কারণ এ সন্ধ্যেয় তো আরও একটি জায়গায় জাদু খেলা দেখানোর কথা আছে। কিন্তু বিশু বসু ঠিক সময়ে আসতে পারলেন না।

সাড়ে সাতটা বেজে যাওয়ার পর একজন টেলিফোন করে জানলেন জাদুকরমশাই প্রায় ঘণ্টা খানেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। তখন সকলে ধরে নিলেন আজকাল কলকাতার রাস্তায় যা ট্র্যাফিক জ্যাম হচ্ছে তাতে দেরি হওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়। এর মধ্যে গানবাজনা নাচ আবৃত্তি চলছে। আটটা বেজে গেল, বেজে গেল সাড়ে আটটাও। শেষ পর্যন্ত ন-টা বাজতে যখন মাত্র দশ মিনিট বাকি, তখন বিশু বসু এসে হাজির হলেন, সঙ্গে দুই সহকারী আর দুটো সুটকেস। ওর মধ্যে জাদুর খেলা দেখানোর জিনিসপত্র আছে।

বিশু বসুর জন্য তৎক্ষণাৎ মঞ্চ ছেড়ে দেওয়া হল। ফেলে দেওয়া হল ড্রপ-সিন। তিন-চার জন ছেলে-মেয়ে মঞ্চ থেকে একটু দূরে বসে কেউ হারমোনিয়াম কেউ-বা তবলা বাজাতে লাগল-নেহাত সময় কাটানোর জন্যই। ড্রপ-সিনটা উঠে গেল। জাদুকর বিশু বসু রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, ‘দেরির জন্য দুঃখিত, কিন্তু কী করব বলো, যখন আমার গাড়িটা গড়ের মাঠে জাদুঘরের কাছ দিয়ে আসছিল তখন গাড়িটার স্টার্ট হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মহা মুশকিল-ড্রাইভার গাড়ির পেছনের যন্ত্রপাতি রাখবার জায়গাটা খুলতেই আমার দু-টি সুটকেস থেকে সমস্ত কথা বেরিয়ে গেল!’

‘কথা বেরিয়ে গেল?’ সকলেই প্রশ্ন করল। ‘কথা আবার কেমন করে বেরোয়-বিশেষ করে সুটকেস থেকে?’

বিশু বসু বললেন, ‘তোমাদের কথার খেলা দেখাব বলে কতকগুলি কথা সঙ্গে করে আনছিলাম। এদিকে হয়েছে কী জান? ভুল করে দু-টি বাক্সই বন্ধ করা হয়নি ভালো করে। আর কি রক্ষে আছে? দুষ্ট কথাগুলি সব বোধ হয় গরমের ঠেলায় বাক্সবন্দি হয়ে ঘামছিল, গড়ের মাঠের চমৎকার হাওয়ায় তারা সব দুপদাপ করে বেরিয়ে হি-হি হা-হা করে ঘাসের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে লাগল আর ছোটাছুটি করতে লাগল। আধা অন্ধকার জায়গা-কে যে কোথায় ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে টর্চ নিয়ে-আমি তখন খুবই বিপদে পড়ে গেলাম। বললাম, ওরে কথার দল, তাড়াতাড়ি আয় বাবারা, বড়ো দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। ছোটোরা সব তোদের কেরামতি দেখবে বলে কতক্ষণ অপেক্ষা করছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

'ওরা ভারি আমোদ পেয়েছে খোলা হাওয়ায়। কাছে একটা গাছ ছিল, বুঝলাম কয়েকটি কথা সেই গাছে উঠে হাসাহাসি করছে। তাদের সব অনেক করে বুঝিয়ে-সুজিয়ে যখন কেউ এসে সুটকেসে ঢুকল না, তখন বললাম ওরে চলে আয় রে, আমাকে আর জ্বালাস নে, আমি কথা দিচ্ছি এর পর তোদের সপ্তাহে দু-একদিন খোলা হাওয়ায় খেলতে দেব আর কিছু কিছু খাবারও দেব। বোধ হয় এই কথাতেই কাজ হল, তারা তখন একে একে খিক খিক করে হাসতে হাসতে ফিরে এল। মনে হল সবাই ফিরে এসেছে-কিন্তু ওদের ওই খিক খিক হাসিটা আমার ঠিক পছন্দ হল না। ও হাসির মধ্যে একটু ইয়ার্কির গন্ধ ছিল। এর মধ্যে ড্রাইভারের গাড়ি মেরামত হয়ে গেছে-ওর কাছ থেকে টর্চ নিয়ে দেখি সর্বনাশ! কথারা যে ভাবে আগে ছিল সে ভাবে আর নেই। তারা সব নিজেদের আলাদা করে নিজেদের চেহারাই বদলে ফেলেছে। এই দেখো কী কাণ্ড!'

এই বলে জাদুকর বিশু বসুমশাই দুটো সুটকেসই খুলে ফেলে তা থেকে কথাগুলোকে একে একে বার করতে শুরু করলেন। সাহায্য করতে লাগলেন তাঁর দুই সহকারী। একটু পরে জাদুকর বললেন, 'তোমরা ওদের বার করে গুছিয়ে রাখো, আমি ততক্ষণ দু-একটা তাসের খেলা দেখাই!' সবাই দেখল কই কোনো কথা তো ছুটোছুটি বা হুটোপুটি করছে না! কথাগুলো সব বড়ো বড়ো কার্ডবোর্ডে চমৎকার করে লেখা যাতে দূর থেকে পড়া যায়।

ছোটো মাঠটিতে ইশকুলের সব বেঞ্চ এনে পাতা হয়েছে-কেবল সামনের দিকে কিছু চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য। জাদুকর টুপির ভেতর থেকে দু-প্যাকেট তাস বার করে টেবিলের এক ধারে রাখলেন, আর দেখিয়ে দিলেন দু-প্যাকেট তাসে কেবল সত্যি সত্যি এক-শোরও বেশি নানা রঙের তাসই আছে, অন্য কিছু নেই। এবার সবগুলো তাস মিশিয়ে শাফল করে টুপির মধ্যে রেখে কান পেতে কী শুনলেন। তাঁর একটি কানকে টুপির খুব কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'দুষ্টুমি করা হচ্ছে, না? সব চুপ করে থাকো বলছি!' এই সময় টুপির ভেতর থেকে খস খস কী সব আওয়াজ হতে লাগল। জাদুকর বললেন, 'আমি খুবই দুঃখিত ভাই-বোনেরা-আমার তাসেরা অস্থির হয়ে পড়েছে। যদি ওদের জন্যে কেউ এক ঠোঙা মুড়ি কিনে আন তো ভালো হয়।' এই বলে তিনি একটি ছেলেকে একটা টাকা দিলেন। ছেলেটি মুড়ি কিনতে চলে গেল।

এ দিকে দুই সহকারী বলছেন, 'বাবু, সর্বনাশ হয়ে গেছে। কথাগুলো আর আস্ত নেই। ওই যে বিচ্ছিরি রাস্তায় আসবার সময় গাড়িটিতে ঝাঁকুনি লেগেছিল তাতে বোধ হয়, এরা সব ভেঙে গেছে!'

জাদুকর কথাগুলোকে দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, 'ওদের দিয়ে আজ আর খেলা দেখানো সম্ভব হবে না, এটা অতি দুঃখের বিষয়, অতীব দুঃখের বিষয়, অতিশয় দুঃখের বিষয়। আস্ত আস্ত কথাগুলো সব ভেঙে গেছে, হায় হায়, এখন আমি কী করি? ভাঙা কথাগুলোকে বোধ হয় ফেলেই দিতে হবে।'




এই শুনে একজন সহকারী বললেন ‘বাবু ফেলে দেবেন না। ওদের ফের জুড়ে দেওয়া যেতে পারে।’

জাদুকর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ‘বলছ? জুড়তে পারবে তো? দেখো যদি পার।’

তখন সহকারী দু-জন বললেন, ‘আমরা তো বেশি ল্যাখাপড়া করিনি তাই ঠিক ঠিক করতে পারব কি না কে জানে।’

জাদুকর তখন বললেন, ‘যা পার তাই করো দেখি কী দাঁড়ায়। দেখি ভাঙা কথাগুলো কী রয়েছে?’ সহকারী দু-জন তখন কথাগুলোকে দেখাতে লাগলেন। একজন সহকারী ধরে দেখালেন লেখা সন্দেহ অন্যজন দেখালেন সর। জাদুকর বড়ো একটা ব্ল্যাকবোর্ড আনিয়ে তাতে একদিকে লিখলেন ‘সন্দেহ’ আর তার ডান পাশে লিখলেন ‘সর’। পাশাপাশি দুটো কথা মিলে হল ‘সন্দেহ সর’! জাদুকর বললেন, ‘এর মানে হয় না কিছু। সন্দেহ সর! সন্দেহ যার হলে একটা মানে হত। যাক এবারে দেখি আরও দুটো ভাঙা কথা।’ এবারে পাশাপাশি দুটো কথা দর্শকেরা দেখলেন-‘অপ লংকা’। ‘হায় হায়!’ জাদুকর বলেন, অপ লংকা আবার কী বস্তু? যাক এরপর আরও দুটো ভাঙা কথা দেখাও!’ এবারে এল ‘বংশ’ আর ‘তেল’। জাদুকর বললেন, ‘হায়, হায় বাঁশের আবার তেল কবে থেকে হতে শুরু করল। যাক তারপর?’ (তিনি বোর্ডে লিখেই চলেছেন) এবারে এল গোলাপ আর প্রতি। এইভাবে যত কথা আসতে লাগল আর জাদুকর বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন-কিন্তু বোর্ডে লেখাও চলতে লাগল। এর পর এল কথাগুলো এইভাবে (পাশে বন্ধনীর মধ্যে জাদুকরের মন্তব্য) :

১. গুল মন্দ (‘গাল মন্দ হলেও নাহয় একটা মানে হত!’)

২. শাখা জল (‘এ আবার কী রে বাবা!’)

৩. রব চপ (‘বাপ-রে বাপ!’)

৪. রজনী দেব (‘এ-কার নাম, রজনী দেবতা কী করে হয়।’)

৫. কান দম (‘হুঁ কানে দম দেওয়া যায় বটে!’)

৬. বন অঞ্চল (‘হুঁ এটার কিছু মানে হচ্ছে!’)

৭. জনক খাস (‘আমি হতাশ!’)

৮. কর্ম বরাহ ('কর্ম বরাহ? আমি কোথায় যাই?')

৯. ধর কাণ্ড ('কী কাণ্ডরে বাবা!')

১০. মন্দ ভাত ('ভাত আবার মন্দ হয় না কী?')

১১. মৃগ পান ('মৃগ কি তরল পদার্থ কিংবা তালের রস যে পান করা যাবে? বোধ হয় মৃগ পান খায় তাই!')

১২. বেগুন বাজ ('বাজ কি বেগুন খায়?')

১৩. ইন্দ্রনাথ প্রধান ('বাজে কথা-শ্রীকান্ত প্রথমে, তারপর ইন্দ্রনাথ ... কিংবা ... কে জানে এর কী মানে?')

১৪. দারু কম ('বাবা রে বাবা! অর্থহীন সব কারবার! দারু মানে তো মদ, আর মদ ওলটালে দম!')

জাদুকর বলতে থাকেন, ফের রুমাল দিয়ে দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন। বললেন, 'একটু জল বাকি আছে খেয়েনি।' গেলাস থেকে জল খেতে গিয়ে অবাক হন। অনেকক্ষণ বিহ্বল হয়ে থাকেন, বলেন-'সব্বোনাশ! খানিকটা জল ছিল কে খেল রে অ্যাঁ? তোরা খেয়েছিস কেউ?' সহকারী দু-জনও তাজ্জব হয়ে যাওয়ার ভঙ্গি করেন। এর মধ্যে ফের টুপির ভেতর থেকে কিচকিচ শুরু হয়। জাদুকর বলেন, 'কাকে যেন মুড়ি আনতে দিলাম সে মুড়ি তো আনেনি মনে হচ্ছে।' এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ছেলেটির প্রবেশ মুড়ির ঠোঙা নিয়ে। জাদুকর মুড়ির ঠোঙার সব মুড়ি টুপির ভেতর ফেলে দিয়ে বলল, তাস বন্ধুরা তোরা হতাশ হস না। কিন্তু আমার জল কে খেয়ে নিল? একজন আরও একটা গ্লাস জল এনে টেবিলে রাখল। একটু পরে জাদুকর সেই গ্লাস নিয়ে খেতে গিয়ে দেখেন কী ব্যাপার! এই গ্লাসের জলও যে নেই। জাদুকর বললেন, 'না আজ আর খেলা দেখাতে পারব না-গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। এদিকে জল আসছে আর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে-এ তো অবাক করা জল, এ জল পান করা অসম্ভব!'

এবারে কে একজন এনে দিল একটা বোতলে করে জল। জাদুকর সেটি আর হাতছাড়া করলেন না-তাড়াতাড়ি চক চক করে আধ বোতল ফাঁকা করে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, 'আঃ ' তারপর টুপির কাছে গিয়ে বললেন, 'মুড়িগুলো খেয়ে তোরা আরাম কর আমি এখন কথার খেলাটা শেষ করে নিই। তিনি সহকারীদের ইঙ্গিত করতেই তাঁরা ফের ভাঙা কথাগুলো তাঁদের মতো করে জুড়তে লাগলেন। এবারে দেখা গেল :

১৫. গঙ্গা ধজ ('এটা কী হল-এত একজনের নাম হল-মহামুশকিল-এখন আমি করি কী?')

১৬. রস পোনা ('আর পারছি না! রসগোল্লা হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু রস পোনা? একী কার কার?')

১৭. ছানা আনা ('ছানা আনা? এর একটা অর্থ দাঁড়াচ্ছে বটে ঠিক আছে। তারপর?')

১৮. বার তত্ত্ব ('বার মানে বাইরে আর তত্ত্ব মানে বিদ্যে-টিদ্যে কিছু হবে হয়তো, কিন্তু দুটো মিলে মানেটা কী হল?')

১৯. পুরা আম ('বেশ কথা-পুরো একটা আম ছিল-খাওয়ার মতো একটা জিনিস মন্দ কী? আমের যা দাম-বেশ তা এটা ভালোই হল!')

জাদুকর এবারে বললেন, 'কই তাড়াতাড়ি করো-কত আর দেরি হবে?' সহকারীরা তখন ব্যস্ত হয়ে ফের ভাঙা কথাগুলোকে তাঁদের মতো করে সাজাতে লাগলেন :

২০. ধামা পেটা ('ধামা পেটা আবার কী বস্তু রে! আমাকে উদবাস্তু করে ছাড়বে সব!')

২১. কর ধরা ('মানে খাজনা ধরা কিংবা হাত ধরা? হতে পারে, হতে পারে, হতে পারে!')

২২. গড়া চা ('কী কথা! গড়া চা-চা তৈরি করা বললেই ঠিক হত!')

২৩. দেশ দর সন ('অ্যাঁ-এ কী কাণ্ড? তিন-তিনটে ভাঙা কথা এসে হাজির? দেশ দর সন! বানানে হচ্ছে না দেশ দর্শন বানান ঠিক। এবারে সবাই পড়ুন-')

জাদুকর এবারে চেয়ারে বসে পড়লেন। তিনি নিজেই পড়তে শুরু করলেন। আর বলতে লাগলেন-'অসম্ভব কথাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। তোমরা কেউ পারবে কি?'

জাদুকর এই কথা বলে ফের বোতল থেকে জল খেতে গিয়ে দেখেন বোতলই নেই! তিনি বলে উঠলেন, 'এই জায়গায় নিশ্চয় ভূত আছে! আমি চললাম এমন স্থান ছেড়ে!'

গল্প তো এখানেই শেষ হল-আসল ব্যাপারটা সমাধান তো জাদুকর পরে অবশ্য করেছিলেন-কিন্তু তোমরা যারা এই গল্পটি এতখানি পড়েছ তারা কি ভাঙা ভাঙা কথাগুলোকে ফের ঠিক মতো সাজিয়ে দিতে পারবে? চেষ্টা করলে পারবে ঠিকই, কিন্তু যারা চেষ্টা করবে না তাদের বলে দিচ্ছি : উত্তর (১) সন্দেহজনক (২) অপকর্ম (৩) সরবরাহ (৪) লংকাকাণ্ড (৫) বংশধর (৬) গোলাপখাস (৭) প্রতিভাত (৮) তেল-বেগুন (৯) মন্দ মন্দ (১০) জলপান (১১) শাখামৃগ (১২) রব-ইন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ!) (১৩) দেব দারু (১৪) চাপকান (১৫) দম দম (১৬) বনধন (বন্ধন) (১৭) অঞ্চল প্রধান (১৮) রজনীগন্ধা (১৯) আনারস (২০) ছানা-পোনা (২১) আম দরবার (২২) পুরাতত্ত্ব (২৩) ধামা-ধরা (২৪) চাকর (২৫) গড়া-পেটা (২৬) সনদেশ (সন্দেশ)। শেষে কী হল বলি-জাদুকর বললেন, 'সন্দেশ যখন লেখায় এসেছে, তখন এসো সকলে সন্দেশ খাওয়া যাক।' এই বলে তিনি একটা থলে নিয়ে মন্ত্র পড়লেন, তারপর থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা-একটা করে সন্দেশ বার করে বিলি করতে লাগলেন।

সকলেই খুশি হল। ছোটোরা হইচই করতে লাগল আনন্দে।

*বইমেলা সংখ্যা ১৪০৮*



# অশোক দাশগুপ্ত

‘জন্টি রোডসকেও কিন্তু রানটা করতে হয়, আর তুই তো নন্তু বোস!’ দেশপ্রিয় পার্ক ক্রিকেট ক্যাম্পে এই ঝাঁকুনি গোপাল স্যারের। নেটে ব্যাট করানোর সময়েও মনে মনে নম্বর দিতেন। পরপর চারদিন আমি ফেল। গোপাল স্যার বললেন, ‘এ সপ্তাহে যা ব্যাট করলি, তোর অ্যাভারেজ বড়োজোর চোদ্দো। যতই ভালো ফিল্ডিং করিস আর সে জন্য যতই হাততালি পাস, ব্যাটে বা বলে কিছু না করে গেলে তোকে টিমে নেবে কেন? ফিল্ডিংটা তখনই প্লাস পয়েন্ট, যখন চল্লিশ-পঞ্চাশ রান বা দু-তিনটে উইকেট টিমকে দিয়ে যেতে পারছিস। দশ বছর আগে ছেলেদের বোঝাতে হত, ফিল্ডিংয়ে জোর দে, না হলে এখন চলবে না। তোকে আর লাল্টুকে দেখে মনে হচ্ছে, এখন এক্কেবারে শুরুতেই সবাইকে বলে দিতে হবে, যতই ভালো ফিল্ডিং কর বাবা, ব্যাটিং-বোলিং ছাড়া চলবে না।’

তিন বছর আগের কথা। ষোলো বছর বয়সেই বেশ লম্বা হয়ে গেছি, সবাই ফিল্ডিংয়ের প্রশংসা করে, কিন্তু ব্যাটে-বলে একদম ছিলামই না-তা নয়। একটু জোরের ওপর অফব্রেক বল করি ছোটোবেলা থেকে, সোজা ব্যাটেই তবে একটু চালিয়ে খেলি, নেটে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে ফেলতেন স্যার। যখন তেরো-সাড়ে তেরো বয়স, উইকেটকিপার হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। বাবার বন্ধু বাদশাকাকা লন্ডন থেকে উইকেট কিপিং গ্লাভস এনে দিয়েছিলেন, কেন এনেছিলেন বাদশাকাকাই জানেন, দেখতে এত ভালো যে উইকেটকিপার হওয়ার ইচ্ছে হল। সম্বরণ ব্যানার্জি একাডেমির সঙ্গে খেলা যাদবপুর স্টেডিয়ামে, আমাদের উইকেটকিপার সায়ম জ্বরে ফ্ল্যাট, চান্স এসে গেল। দুটো ক্যাচ নিলাম, তার মধ্যে একটা যাকে বলে ডাইভিং ক্যাচ। চুয়াল্লিশ করেছিলাম সেদিন, লাল্টু একান্ন, কিন্তু পাঁচ রানে হেরে গেলাম। মন খারাপ। আবার মনটা ভালোও হয়ে গেল, যখন সম্বরণ ব্যানার্জি নিজে এসে আমাকে ডাকলেন। বললেন, ‘আজ বেশ ভালো ব্যাট করেছ। আগে একদিন দেখেছি, খুব ভালো ফিল্ডিং কর। বলটাও মন্দ নয়। তুমি উইকেটকিপিং করতে যেয়ো না। ব্যাটে যা করার করবে, বলে একটু, ফিল্ডিংয়ে অনেকটা। কিপিং সবার জন্য নয়। একটা ভালো ক্যাচ নিয়েছ, তবু বলছি। লম্বাটে গড়ন তোমার, আরও অনেক লম্বা হবে-অ্যাটলিস্ট পাঁচ দশ, সাধারণত লম্বারা ভালো কিপার হয় না। তা ছাড়া, তোমার ধৈর্য মনে হল একটু কম, বেশ ছটফটে, উইকেটকিপারের কিন্তু প্রচণ্ড ধৈর্য লাগে।’ বাড়ি ফিরে ফোনে বড়দাকে কথাগুলো বললাম। বড়দা বলল, ‘একদম ঠিক বলেছে। তা ছাড়া, তুই যখন কিছুতেই অ্যালান নট বা কিরমানি হচ্ছিস না, টিমকে তোর ভালো ফিল্ডিংটা দিবি না কেন?’ এত কথা বড়দা বলে না। পাঁচটা কথার জবাবে একটা কথা বলে। বড়দা মানে, আমার জেঠতুতো দাদা। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে। ভালো ব্যাট করত, দুটো রনজি ম্যাচও খেলেছে পঁচিশ বছর আগে। বাবা বলে, ‘আমাদের ফ্যামিলিতে অনেক ভালো ভালো ক্রিকেটার, কিন্তু শক্ত বলে ফেলুর পরেই নন্তু। বাদবাকি

আমরা টেনিস বল ক্রিকেটার।' কিন্তু বাবা, জেঠু, কুট্টিকাকু-এই টেনিস বল ক্রিকেটারদের কাছে যত টিপস পেয়েছি, বড়দার কাছে নয়। একে তো মামলা-টামলায় ব্যস্ত, তার ওপর, এখনকার ক্রিকেটের ওপর ভীষণ রাগ বড়দার। নানা কারণে রাগ। তবু মাঝে মাঝেই ফোন করি, বুঝতে পারি, কিছু লিখতে লিখতে বা পড়তে পড়তে 'হুঁ হ্যাঁ' করে যাচ্ছে, তবু সব কথা বলি। আমার ক্রিকেটের কথা। আমার যে উইকেটকিপার হওয়া উচিত নয়, সেটা অবশ্য বেশ মন দিয়ে বলেছিল। এত কথা বলে না বড়দা।

আমার মা কেমন? এক কথায়, সবার মা যেমন। বলে, আরও খাওয়া-দাওয়া করা উচিত। বলে, আরও পড়াশোনা করা উচিত। বলে, পাশের ফ্ল্যাটের অঙ্কুর অনেক বেশি পড়ে (অঙ্কুরের মা-ও বলে, আমি অনেক বেশি পড়ি)। মা বকে রোজ, গায়ে লাগে না। বাবা বকে বছরে দু-তিনবার, ঠান্ডা বকুনি, কিন্তু কী মারাত্মক! দু-চারটে কাপ মেডেল তো কবে থেকেই পাচ্ছি। মা গুছিয়ে রাখে। সাজিয়ে রাখে। টেলিভিশনে যখন খেলা চলে, মা-ও দু-একবার চোখ রাখে। হয়তো ভাবে, একদিন আমাকেও টিভিতে দেখা যাবে। শুধু একটা দুঃখ, ফেলু কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো কাপ পেত। তা পেত। বড়দার বাড়িতে এখনও ক্রিকেটের বই প্রচুর। আর প্রচুর বড়ো বড়ো কাপ, দুটো শিল্ডও। বড়োবউদি পালিশ করায় প্রতি বছর। বড়ো কাপ না, আন্ডার থার্টিনের একটা ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে যা পেলাম, মার হাতে দিলাম, তা বড়দা কখনো পায়নি। টাকা। পাঁচ-শো টাকা। মা খামটা গুছিয়ে রেখে দিল, ছোটো ছোটো কাপগুলোর পাশে। বাবা বলল, 'পাঁচ-শো টাকার নোটটা বাঁধিয়ে রাখবে নাকি!' তিন-চার বছরের মধ্যে আরও টাকা। মা একদিন হিসেব করে বলল, 'সাড়ে পাঁচ হাজার, এবার তো ব্যাঙ্কে রাখতে হয়।' পাঁচ-শো টাকা জুড়ে অ্যাকাউন্ট খুলে দিল বাবা। বলল, 'আর লেখাপড়া করে কী হবে, তোমার রোজগেরে ছেলে।' যখন-তখন কাঁদতে ভালোবাসে মা, কিন্তু কাঁদল না। বলল, 'এ আবার কেমন কথা! যদি দেয়, নেবে না!' আর তারপর আমাকে বলল, বলতেই থাকল, চার-পাঁচদিন টানা বলে গেল, 'নন্তু, পড়ছিস না, একদম পড়ছিস না।' ... একদম পড়ছি না, তা নয়। কিন্তু যতটা পড়লে বাবার ভালো লাগত, যতটা পড়লে আমার মার্কশিট সবাইকে দেখাতে পারত মা, ততটা নয়। হায়ার সেকেন্ডারিতে বিচ্ছিরি কিছু করিনি। ফার্স্ট ডিভিশন। আমার বন্ধুরা অনেকে অনেক বেশি পেয়েছে। কিন্তু মা-বাবাকে তো বলা যায় না, অনেকে কমও পেয়েছে। কিন্তু, কলেজে আসার পর বুঝেছি, মন দিয়ে ক্রিকেট খেললে মন দিয়ে পড়াশোনা করা কঠিন। রীতিমতো মিটিং হয়ে গেল একদিন। সন্ধ্যের মধ্যে এসে গেল জেঠু, বড়োমা, কুট্টিকাকু, কাকিমা, দিদি, জামাইবাবু। একটু দেরিতে বড়দাও। জন্মদিন-টন্মদিন নয়, তবু হেভি ডিনারের ব্যবস্থা কেন, বাবা নিজে সকালে গোটা বাজার তুলে আনল কেন, মা একেবারে মুগডাল থেকে বড়ো ম্যাচ ধরে এগোচ্ছে কেন, বুঝিনি। ডিনারের আগে মিটিং। সাবজেক্ট আমি। এত রান্না করে শুয়ে পড়ার কথা, কিন্তু আমার মা তোমার মা (সবার মা-ই বোধ হয় এরকম), মিটিংয়ের ফাটাফাটি শুরুটা করল এইভাবে 'নন্তু পড়ছে, কিন্তু পড়ছে না। খেলছে, খেলেই যাচ্ছে। ওর বাবা মাঝে মাঝে কিছু বলছে, কিন্তু বলছে না। তোমরা সবাই মিলে ঠিক করো, নন্তু কী করবে, কীসে ওর ভালো হবে।' একেবারে ম্যাকগ্রাথের ফার্স্ট ওভার! দিদি বলল, 'ফাজলামি নাকি, পড়বে, পড়বে, একটু একটু খেলবে। খেলবে না পড়বে, এটা কোনো প্রশ্ন হল?' জামাইবাবু ঠান্ডা মানুষ, কলেজে ইতিহাস পড়ায়, বলল, 'কে কী করবে, সেটা অন্যরা বলে দিচ্ছে বুঝি আজকাল!' কিন্তু মিটিং প্রবল বেগে এগোল পড়াশোনার দিকেই। বড়দা, ক্রিকেটার বড়দাও মনে হল ওইদিকে। বাবা প্রায় কিছুই বলছে না কেন? বোঝা গেল, প্রায় শেষে এসে। মা-র দিকে তাকিয়ে বলল, 'খেতে দাও, সবার খিদে পেয়েছে।

মিটিংটা খুব ভালো। কিন্তু যাকে নিয়ে মিটিং, তাকেই কিছু বলতে দেওয়া হল না। বলতে দেওয়ার দরকারও নেই। লেখাপড়াটা চালিয়ে খেলে যেতে পারে, ক্ষতি কী?'

ব্যাটে এখনও হয়নি, কখনো হবে কি না জানি না, কিন্তু লোগোওয়ালা টুপি তো এসে গেছে সেই কবে। এখন নতুন ক্যাপ এলেই মা জিজ্ঞেস করে, এটা কোন কোম্পানির? আমার খেলার শার্টেও লোগো। বড়দা কম কথা বলে, তবু একদিন বলে ফেলল, 'শেন ওয়ার্নের দুঃখটা ভেবে নে, ব্যাটে লোগো লাগানোর জন্য টাকা পাচ্ছে না, বলে তো লোগো লাগানো যায় না!' বাবা বলে, 'বুটে লোগো লাগায় না কেন? বুটটা বড়ো করে নিলেই তো হয়!' আমি কিছু বলি না। ভাবি, এ সব কথার কোনো মানে হয়? আন্ডার থার্টিনে যখন পঞ্চাশ করছি কি না করছি, তখন থেকেই আমার জামা, প্যান্ট, টুপি সব কোম্পানির। সেই যে একদম ছোটোবেলা থেকেই প্রাইজ মানি পাচ্ছি, সেও তো কোম্পানির। টিম ট্রফি পায়, কোম্পানির। পঙ্কজ রায় পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ট্রফি দিচ্ছেন কোম্পানির মালিক, খারাপ লাগলে তো কিছু করার নেই। দিচ্ছে যখন। ট্র্যাকস্যুট, ব্যাগেও লোগো। এখনই। কুট্টিকাকু মজা করে বলে, 'ইন্ডিয়া প্লেয়ারদের বুক চিরলেও লোগো পাওয়া যাবে।' গত বছর যখন বুচিবাবু টুর্নামেন্টে সি.এ.বি. টিমের হয়ে একদিন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে পনেরো হাজার টাকা পেলাম, প্রথম ফোন করলাম বড়দাকে। পনেরো হাজারটাকে গুরুত্বই দিল না, বলল, 'বাঃ, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ? কত করেছিস? কত ঠেকিয়েছিস?' হায়দরাবাদ থেকে ফিরে যখন মা-র হাতে চেকটা তুলে দিলাম, খুশিই দেখাল। বাবার ব্যাপারটা বোঝা কঠিন, বোঝা গেল না। দিদি অবশ্য বলে গেল, 'নন্তুর খেলা নিয়ে উলটোপালটা বলেছি আগে, আজ ভালো লাগছে-ভাগ্যিস মন দিয়ে খেলছিস।' জামাইবাবু, মনে হয়, বড়দাপন্থী। মেডেলটা হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখল, পনেরো হাজার নিয়ে একটা কথাও না। গত বছর যখন আন্ডার নাইনটিন বেঙ্গল টিমের হয়ে সেঞ্চুরি করলাম, বড়দা ফোন করল। বলল, 'কনগ্র্যাটস। এ জন্য কত পেলি, বলিস না, প্লিজ।' রাগ হয়। কষ্টও হয়। আমি যদি খেলে, ভালো খেলে কিছু টাকা পাই, খারাপ কী? কথাটা একদিন সাহস করে বলেই ফেললাম বড়দাকে। সাহস মানে, ফোনে সাহস। বড়দা বলল, 'খেলে টাকা তো খারাপ নয়। এখন আর খেলে ভালো চাকরি পাওয়া যাবে না, যে খেলে তাকে তো খেলেই রোজগার করতে হবে। তবে, আমি চিরকাল রান, উইকেট আর ক্যাচের কথাই জানতে চাইব।' কার ঘাড়ে ক-টা মাথা, কে বোঝাবে বড়দাকে, দিনকাল পালটে গেছে। বড়দারা খেলেছে খেলার জন্য, খেলার মজায়। এখন খেলাটাও একটা কাজ। কঠিন কাজ। আর কাজ তো মানুষ করে কিছু পাওয়ার জন্যই। এবার মোহনবাগানে সই করে আমি যে নব্বই হাজার টাকা পেয়েছি, তা আর বলিনি বড়দাকে। মা বলেছে। বাবা ইদানীং আমার লেখাপড়া নিয়ে প্রায় কিছুই বলে না, খেলা নিয়েও না। শুধু মাঝেমাঝে বলে, কেন বলে বাবাই জানে, 'ডিসিপ্লিনটাই আসল নন্তু, সে যা-ই করিস।' আমার রাগ হয়। কষ্টও হয়। ডিসিপ্লিন ছাড়া এগোচ্ছি? খাটতে হয় না আমাকে? শরীরটাকে এক-শোয় এক-শো রাখতে হয় না? মনটাকে এক-শোয় অন্তত আশি রাখতে হয় না? বিরাট একটা কথা-সাধনা, আমার নেই? কুট্টি কাকিমার অপারেশনের সময় আমার টাকা থেকে যে মা পঁচিশ হাজার দিয়ে এল, তা কি আমার খেলার জন্য নয়? টাকা কি এতই ঘেন্নার জিনিস? বড়দাকে বলতে পারিনি। পারি না।

শুধু টাকা বা লোগো-টোগোই তো নয়, বড়দার আসল আপত্তি ওয়ান ডে ক্রিকেট নিয়েই। অনেকেই বলে, বড়দা বড়ো জোর দিয়ে বলে, 'এটা কোনো ক্রিকেট নয়।' তারপর বলে, 'হতে পারে এটা একটা মজার খেলা, তবে ক্রিকেট নয়।' তর্ক করে পারব না, করার দরকারও নেই। বেঙ্গসরকার লিখেছেন, এবার হাফ-ডে ক্রিকেট আসবে এবং

জমবে। আমি ছোটোবেলা থেকেই ওয়ান ডে ক্রিকেট ভালোবাসি, মনে মনে ভেবেছি একদিন বাংলার হয়ে খেলব, ভারতের হয়ে খেলব, একদিনের ম্যাচেই খেলব। টিভিই ছোটোবেলাতেই মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে, বড়দা হয়তো ভাবে, বলেনি কখনো। আমিও কিছু বলিনি। কাউকেই বলি না। কিন্তু জানি, টিভিতে খেলা দেখে আমার মাথা খারাপ হয়নি। বরং উৎসাহ পেয়েছি, বড়ো বড়ো ক্রিকেটারদের খেলা দেখে আর কথা শুনে টুকটুক করে বেশ কিছুটা জেনেছি। গোপাল স্যার বলেন, এরকম হতেই পারে যে, কোনো ক্রিকেটার ওয়ান ডে স্পেশালিস্ট, যেমন মাইকেল বিভান, যেমন রবিন সিং, যেমন নিকি নাইট, কিন্তু সেটা তো অনেকদিন খেলার পর বোঝা যাবে। শুরু থেকেই নিজেকে ওয়ান ডে ক্রিকেটার ভাবার কী মানে হয়? একসঙ্গে গাভাসকার আর ভিভ রিচার্ডসের সই-করা একটা ব্যাট আছে গোপাল স্যারের কাছে। আমাকে বলে রেখেছেন যে, কোনো ম্যাচে আমি যদি সেঞ্চুরি করি অন্তত ১০০ বলে (৯৯ বলে করা চলবে না), ব্যাটটা পেয়ে যাব। মানে, ১০০ করলেই হবে না, ধৈর্য ধরে করতে হবে, সময় নিয়ে করতে হবে। পরীক্ষায় এখনও পর্যন্ত পাশ করতে পারিনি। গতবার এরিয়ানের সঙ্গে ম্যাচে যখন ১০৩ বলে ৯৯, ওই ব্যাটটা দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার তো ১০০ বল পার করা নিয়ে চিন্তা, করে দিয়েছি, কিন্তু ১০০ রান যে হল না। ৯৯, রান আউট।

এবার বুচিবাবু টুর্নামেন্টে সি.এ.বি. টিমে রেখেছিল। একটা ম্যাচে চান্স পেলাম, ম্যাচটা হেরে যাওয়ায়, আমাদের শেষ ম্যাচ। পাঁচ নম্বরে নেমে ৫৭ বলে ৬৬ করেছি, সাত ওভারে ১৯ রানে দুটো উইকেট পেয়েছি, ক্যাচ না পেলেও রান বাঁচিয়েছি অনেক। একদিনের ম্যাচে বাংলা দলে জায়গাটা মনে হয় করে নিতে পারব এবার। গত বছর সিজনের শেষ দিকটা ভালো গেছে। মোহনবাগান তখনই কথা বলে নেয়, এবার ওরা নিতে চায়, ভালো টাকাও দেবে। এবার ক্রিকেটেও দারুণ স্পনসর ওদের, অন্য অনেক সুবিধেও পাওয়া যাবে। ঢাকায় তিনটে ম্যাচ খেলে এলাম আবাহনীর হয়ে। কিছু রান পেলাম, কিছু উইকেট, বেশ কিছু টাকা। টাকা আরও, টাকিতেও। লোকাল দুটো ক্লাব ফাইনালে, দু-দিকেই বেশিরভাগ ক্রিকেটার কলকাতার। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে পেলাম একটা টিভি আর পাঁচ হাজার টাকা। টাকা উড়ছে!

এবার ঠিকঠাক সিজন শুরু হতে এখনও দেরি আছে। নিজেকে তৈরি রাখছি, ওয়ান ডে ম্যাচ শেষ টিমে থাকতেই হবে। নতুন একটা টুর্নামেন্ট চালু করল সি.এ.বি.। পঙ্কজ রায় কাপ। ইস্ট জোনের সব টিম নিয়ে, তিন দিনের খেলা, আসলে ফার্স্ট ইনিংস লিডের খেলা। পনেরো জনের স্কোয়াডে আমার নাম দেখে অবাক হলাম। গোপাল স্যার হননি। বললেন, তুই ভাবছিস তুই শুধু ওয়ান ডে ক্রিকেটার, সিলেক্টররা ভাবছে না। হয়তো ফার্স্ট টিমে থাকবি না, কিন্তু এটা বুঝে নে যে, বেশি সময়ের ক্রিকেটেও তুই আছিস। থাকতে হবে। আসামকে হারিয়ে এক ধাপ এগোল ত্রিপুরা, সেমিফাইনাল ওড়িশার সঙ্গে। এদিকে বাংলা আর বিহার। ওড়িশা হেসেখেলে জিতে ফাইনালে। বাংলা চার উইকেটে হারাল বিহারকে। আমি খেলিনি। খেলানোর কথাও নয়। ফাইনালে মুখোমুখি বাংলা আর ওড়িশা। ঠিকই ধরেছেন, ফাইনালে টিমে ঢুকে গেলাম। খেলার দিন সকালে হঠাৎ, এসব হঠাৎই হয়, পেটে গণ্ডগোল ক্যাপ্টেন রোহন গাভাসকারের। সামলে মাঠে এল, কিন্তু চিনচিনে ব্যথা, খুব দুর্বল। বলল, ফিট কেউ খেলুক। উৎপল চ্যাটার্জি ক্যাপ্টেন। ম্যাচটা তো জিততে হবে। টসে জিতে আমাদের ব্যাট করতে বলল ওড়িশা। বলবে না কেন? ইডেনের সকাল, ওদের নতুন বলের লোক দেবাশিস মোহান্তি। ছ-নম্বরে গেলাম, তখন বাংলার চার উইকেটে ৭৩। দেবাংদা দারুণ শুরু করেছিল, কিন্তু বিচ্ছিরিভাবে রানআউট হয়ে গেল। নিখিল হলদিপুর বলল, 'শোন নন্তু, উলটোপালটা চালাস না, আমি যতটা পারি দেখছি,

তুই ধরে খেলে যা। অ্যাট লিস্ট ৩০০ করতে হবে আমাদের।' ধরে খেলা? আমি? চেষ্টা করলাম। উইকেটে একেবারে পিঁড়ি পেতে বসে গেলাম তা নয়। প্রথম দিন চায়ের সময় বাংলা ১৪৫, চার উইকেটেই। মাঝে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলে ফেলছিলাম, রানও আসছিল এবং হলদিপুর বলে যাচ্ছিল, হচ্ছেটা কী? কিন্তু ও-ই আউট হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। উৎপল চ্যাটার্জি, ডেভিডদা, ক্রিজে এসে বলল, 'দু-শোর কাছাকাছি তো এসেই গেছি, ৩০০ হবে না কেন? দেখেশুনে, তবে তুই তোর খেলা খেলে যা।' ক্যাপ্টেনের কথা বলে কথা, কিছুটা চালালাম। মিড উইকেটে একটা হাফ চান্স বাদ দিলে, ভালোই। দিনের শেষে নট আউট ৭৩, ডেভিডদা নট আউট ২১। বাংলা ৫ উইকেটে ২২৩। না। সেঞ্চুরি হয়নি। তবু বাংলার ৩০০ হল, ৩১৩, আমি ৮২, উৎপল চ্যাটার্জি ৫৫। দেবাশিস মোহান্তির পাঁচ উইকেট ৬৩ রানে, কিন্তু আমি ওই পাঁচের মধ্যে নেই, ডেভিডদাও না। দেবাশিস মোহান্তির পালা চুকল, কিন্তু এবার শিবসুন্দর দাস। সৌরভ গাঙ্গুলির পর ইস্ট জোনের বেস্ট ব্যাটসম্যান। আমি বড়ো প্লেয়ার, তোমরা কে হে, এরকম হাবভাব নেই। তিন ঘণ্টায় ওড়িশা এক উইকেটে ১০১। শিবসুন্দর দাস ব্যাটিং ৫৪। ডেভিডদা একবার কাছে এসে বলল, তোকে দু-তিন ওভার দেব কি না ভাবছি। দেখেনি তো তোকে, গোলমাল করে ফেলতে পারে। বলল, কিন্তু বল দিল চায়ের পরে। ততক্ষণে ওড়িশা দু উইকেটে ১৩৭, শিবসুন্দর দাস ব্যাটিং ৭৪। চমৎকার বল করছিল রণদেব, রণদেব বসু। কাঁটায় কাঁটায় বল করে যাচ্ছিল ডেভিডদা, কিন্তু নড়ানো যাচ্ছিল না শিবসুন্দর দাসকে। চায়ের পর সঞ্জীব সান্যালকে বলটা দিতে গিয়েও হঠাৎ কী মনে হল ডেভিডদার, আমাকে ডাকল। বলল, 'তিন ওভার পাবি, পারলে শিবসুন্দরকে নে, অন্তত প্রহরাজকে নে। চার নয়, তিন ওভার। আঠারো বল। যা করিস, তা-ই করবি। তেড়ে অফ ব্রেক। চল নন্তু।'

চল নন্তু। গোপাল স্যারের কথা মনে পড়ল, আউট করার মতো বল করতে পারলে আউট করা যাবে, সে একদিনের ম্যাচে হোক বা লম্বা ম্যাচে। চেনে না তো আমাকে, গোলমাল করে ফেলতেও পারে, ডেভিডদা ঠিকই বলেছে। মনের জোরে গায়ের জোরে তিনটে বল ফেললাম বেশ ভালো জায়গায়। ঢোকার মুখে দুটো বল ঠেকাল। তিন নম্বর বলটা স্কোয়ার লেগে ঘোরাল এমন জায়গায়, যেখানে কোনো লোক নেই। বাউন্ডারি। বলটা, সত্যি বলছি, বেশ ভালো ছিল। ডেভিডদা পিঠে হাত রেখে বলল, ঘাবড়াস না, এটাই দিয়ে যা, হয়ে যেতে পারে। এতটা ভণিতা করলাম বলে নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন, পরের বলটায় কিছু ঘটতে চলেছে। কিছুই ঘটল না। বাকি ওভারটা দেখেশুনে ঠেকিয়ে গেল। এমনি এমনি ইন্ডিয়া খেলছে? সঞ্জীব সান্যাল এল উলটো দিক থেকে, ওভারে মাত্র একটা রান। আমার সামনে প্রহরাজ। যথেষ্ট পেটাতে পারে। এবং পেটাতে গেল। এবং প্রথম বলটাতেই গোলমাল হয়ে গেল। ব্যাটের কোণায় লেগে উঁচু ক্যাচ, অনেক উঁচু, অনেক পেছনে, প্রায় পঁচিশ মিটার দৌড়ে দুর্দান্ত ক্যাচ দীপ দাশগুপ্তর। দৌড়ে ব্যাটিং এন্ডে এসে গেছে শিবসুন্দর দাস। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, কথা হল, পরের বলেই শিবসুন্দর দাস বোল্ড। ওড়িশা চার উইকেটে ১৪৫। ডেভিডদার দুর্দান্ত ক্যাপ্টেন্সি। আমাকে তিন ওভারও দিল না। দু-জন নতুন ব্যাটসম্যান, দু-দিকে জোরে বোলার এসে গেল, রণদেব আর শিবশঙ্কর, শিবশঙ্কর পাল। দ্বিতীয় দিনের শেষে ওড়িশা ৭ উইকেটে ১৯৩। বাকি তিন উইকেটে বাকি ১২০-১২১ রান করা কঠিন। তিন দিনের ম্যাচ, যা হওয়ার ফার্স্ট ইনিংসেই হবে। শেষ দিনে একটু লড়ল ওড়িশা, হীরেন ধল মারকাটারি ৪৩ করল, ওকে চিনি, কলকাতা লিগে সালকিয়া ফ্রেন্ডসের হয়ে খেলতে আসে। চমৎকার খেলে গেল। কিন্তু ওড়িশা অল আউট ২৫২। আমরা জিতে গেছি। পেয়েই গেছি পঙ্কজ রায় কাপ। গড়াতে

গড়াতে খেলা শেষ। ফার্স্ট ইনিংস লিডেই বাংলা চ্যাম্পিয়ন। উৎপল চ্যাটার্জির হাতে যখন ট্রফি, ইডেনে কম করে দশ হাজার দর্শক। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ? ২ ওভারে ২ উইকেট, ৮২ রান, তিনটে ক্যাচ। বেশ বড়ো কাপ আমার হাতে তুলে দিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বেশ বড়ো, বড়দার বাড়িতে যেমন আছে-তেমন। টাকা-ফাকার ব্যাপার নেই। দশ হাজার দর্শকের হাততালি, হইহই। চাপড়ানিতে পিঠে ব্যথা। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত অভিনন্দন উৎপল চ্যাটার্জির। ক্যাপ্টেন। ডেভিডদা বলল, 'পারিস তো!'

বাড়িতে ঢুকেই কাপটা তুলে দিলাম মা-র হাতে। বড়দার পাওয়া কাপগুলোর মতোই বড়ো। বাবার হাসির মাপটাও যেন একটু বড়ো। 'খেতে দাও' তো বলতে হয় না, খেতে বসে গেলাম। বড়দার ফোন, 'কীরে, কত টাকা পেলি আজ? টিভির খবরে দেখলাম, কাপটা বড়ো, তাতেই বা কী এসে যায়? এত দর্শক তোকে ভালোবাসল, বাংলার হয়ে একটা বড়ো ম্যাচ জিতে দিলি, এর চেয়ে বড়ো কিছু হয়? ... বেশ, বেশ, শুনে ভালো লাগছে, উৎপল চ্যাটার্জি তোকে বলল যে, পারিস, এর চেয়ে বড়ো কিছু হয়? এর পরেও না পারলে তোকে ক্রিকেটার বলা যাবে নাত্ত?'

*শারদীয়া ১৪০৯*



# সুনীল জানা

ডাকনামটা তার ভোলা হলে কী হবে, ভালো নামটা কিন্তু দিব্যি জমকালো। দাদু অনেক খুঁজে-পেতে সাধের নাতির নাম রেখেছিলেন-সারস্বত! বোধ হয় ভেবেছিলেন একদিন সরস্বতীর বরপুত্র-টুত্র হবে তাঁর নাতি!

মা কোথায় এতে খুশি হবেন, তা না! উলটে তিনি চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'নিজের নামটা নিজে উচ্চারণ করতে পারবে তো?'

বাবাও সমান তালে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, 'নামের বানানটা ঠিকমতো লিখতে পারবে কি না কে জানে।'

দাদু মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'সে তোমাদের দায়িত্ব!'

কিন্তু সে দায়িত্বটা কত কঠিন, তখন বোঝা যায়নি। ছেলে যত বড়ো হতে লাগল, বাবা-মা তত হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছিলেন। নামে সারস্বত হলেও সরস্বতীর ধারে-কাছেই ভিড়তে চায় না ছেলে। বাংলা আর ইংরেজি বর্ণমালা শেখাতে শেখাতেই মার হাঁপানি ধরে গেল, আর বাবার চোখের পাওয়ার বেড়ে গেল। বরং ওই ভোলা নামটাই ঠিক ছিল। আজ যা লেখে, কাল দিব্যি ভুলে যায়। কত কষ্টে যে ভোলাবাবু এখন ক্লাস সেভেন অবধি উঠেছে, তা শুধু সে ছাড়া আর সবাই জানে।

তবে আর বোধ হয় উঠবে না। বাড়ির মাস্টারমশাই বাবা-মাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'আমি ছাত্র পড়াই। ছাগল চরাই না। গালভরা নাম রাখলেই ছেলে বিদ্যের জাহাজ হবে মনে করবেন না।'

বাবা রাগ করে ভেবেছিলেন, ইশকুলে গিয়ে ছেলের নাম কেটে হাঁদা-ভোঁদা গোছের একটা নতুন নাম দিয়ে দেবেন। শুধু লজ্জার বশে পারেননি। তা ছাড়া দাদুর দেওয়া নাম তো! মা তাই খুব আপত্তি করেছিলেন।

কিন্তু এত কাণ্ড যাকে নিয়ে, তার কোনো বিকার নেই। দিব্যি ফুর্তিতে আছে সে। খেলাধুলা দুষ্টুমি বাঁদরামি কোনো কিছু বাদ যায় না। বাদ শুধু লেখাপড়াটা। ওটা ওর ধাতে নেই। ইশকুলে যায় শুধু টিফিন খেতে আর বন্ধুদের সঙ্গে লাফালাফি করতে। বাড়ি ফিরেই নানান বায়নাক্কা আর বাঁদরামি। লেখাপড়াটা করবে কখন? বাবা নাহয় অফিস গিয়ে বেঁচে যান ছেলের হাত থেকে। মাকে তো ছেলে সামলাতে হয় কিনা সারাদিন! মা হওয়ার সুখটা তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন এখন!

এদিকে যত বড়ো হচ্ছে ছেলে, তত গুণও বাড়ছে দিন দিন। মাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যেই বোধ হয় বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকে না আজকাল। ইশকুল থেকে ফিরেই রাস্তায়-টাস্তায় খেলতে-টেলতে বেরিয়ে পড়ে। মার বারণ শুনতে তার বয়ে গেছে!

সন্ধ্যে বেলা মাস্টারমশাই যখন পড়াতে আসেন, বেশির ভাগ দিনই রাস্তা থেকে তিনি ধরে আনেন গুণধর ছাত্তরটিকে। একদিন তো সোজা তিনি বলেই বসলেন, 'আমার ফিসটা এবার একটু বাড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু।'

বাবা তখনও অফিস থেকে ফেরেননি। মা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'কেন মাস্টারমশাই? আপনি যা বলেছেন, তাই তো দিচ্ছি আমরা।'

'তা ঠিক।' মাস্টারমশাই বললেন, 'কিন্তু তখন আমার শুধু পড়ানোর কথা ছিল। রোজ রোজ খুঁজেপেতে ধরে আনবার কথা ছিল না তো!'

মার মুখে আর কথা জোগায়নি।

কিন্তু পয়সা দিয়ে কি সব হয়? মাস্টারমশাই রাখলেই কি লেখাপড়া শেখা যায়? তাঁরা তো অসাধ্য সাধন করতে পারেন না। স্বয়ং সরস্বতীকেই যদি শ্রীমান সারস্বতবাবুর লেখাপড়া শেখানোর ভার দেওয়া হত, তিনিও শেষ অবধি ফেল মেরে যেতেন বোধ হয়!

একটা অঙ্ক আগে আঠারো বার করিয়েছেন, সেই অঙ্কটাই পরের দিন আবার ভুল করে বসল ভোলাবাবু-মানে আমাদের সারস্বত। মাস্টারমশাই খাতা-কলম ফেলে উঠে পড়লেন। দমকা হাওয়ার মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে গেলেন, 'তোকে লেখাপড়া শেখানো, পাশ করানো শিবেরও অসাধ্যি!'

ভোলা শুধু একটু মুচকি হাসি হেসে দিল। ভাবটা এই যে, তাতে তার কী! কে ঝুলোঝুলি করছে বিদ্যা-দিগগজ পণ্ডিত হবার জন্য!

এখন হল কী, ভোলার পড়ার টেবিলের পাশে একটা বাংলা ক্যালেন্ডার ঝুলছিল। তাতে ধ্যানে বসা শিবঠাকুরের ছবি আঁকা। ছবিটা হঠাৎ কেমন দুলে উঠল। মাস্টারমশাইর কথাটা কানে গেছে শিবঠাকুরের। ধ্যান-ট্যান ভেঙে তাই নড়েচড়ে বসলেন তিনি। তাঁর নামে কিনা এমন একটা বদনাম দিয়ে গেলেন মাস্টারমশাই! আজ পর্যন্ত কতরকম দারুণ দারুণ কাণ্ড করেছেন তিনি! কত বাঘা বাঘা ঠাকুরদেবতার কতরকম উপকার করেছেন, কত শত দত্যি-দানোদের জব্দ করেছেন, কতবার জগৎসংসার লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন! আর এই একটা পুঁচকে ছেলেকে পরীক্ষায় পাশ করাতে পারবেন না তিনি! ফুঃ! বললেই হল আর কি!

ক্যালেন্ডারের ছবি থেকেই তিনি একবার কটমট করে তাকালেন ভোলার দিকে। পড়ার ঘরে ভোলা এখন একলা। ওর মা বোধ হয় রান্নাঘরে। বাবাকেও আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মাস্টারমশাই চলে যাওয়ায় ভোলা ফুর্তিতে টেবিলের ড্রয়ার থেকে কয়েকটা নারকোল নাড়ু বার করে ফেলেছে, নির্ঘাত মা-র রান্নাঘর থেকে চুরি করা। সবে বিকেল বেলা মা বানিয়েছিলেন। এখনও হাতে গরম আছে বোধ হয়। আর কী ভুরভুরে গন্ধ ছড়াচ্ছে কপ্পুর আর এলাচদানার।

ক্যালেন্ডারের ছবিতে আর সেঁটে থাকতে পারলেন না শিবঠাকুর। সড়াৎ করে সোজা নীচে নেমে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাই ভোলা, নারকোল নাড়ু কোথায় পেলে শুনি? রান্নাঘর থেকে চুরি করে নিশ্চয়ই!'

'করেছি তো বেশ করেছি।' ঘাড় ফিরিয়ে ট্যারা চোখে শিবঠাকুরকে একবার দেখে নিল ভোলা। জলজ্যান্ত অমন আস্ত শিব দেখেও সে এতটুকু ঘাবড়াল না। সিনেমা-টিভিতে অমন শিবঠাকুর সে ঢের দেখেছে। ব্যস্ত হয়ে গোটা দুয়েক নাড়ু তাড়াতাড়ি মুখে পুরতে পুরতে বলল, 'তাতে তোমার কী শুনি?'

শুকনো ঢোক গিলতে গিলতে শিবঠাকুর বললেন, 'না-আমার কিচ্ছু না। তবে তোমার গলায় আটকে যেতে পারে, এই আর কি। তাই বলছি একা খেয়ো না অতগুলো।'

'অতগুলো আবার কোথায়? মাত্র তো পাঁচটা!' বলতে বলতে আর একটা নাড়ু মুখের মধ্যে দিব্যি চালান করে দিল ভোলা। হাঁ করে দেখতে দেখতে শিবঠাকুর বললেন, 'বেশ নরম নরম আর মিহি হয়েছে মনে হচ্ছে! সাইজগুলোও তো বেশ বড়ো বড়ো দেখছি। মিষ্টি হয়েছে তো ঠিকমতো?'

'কেন হবে না? আমার মার হাতের নাড়ু তো খাওনি কখনো।' বলতে বলতে ভোলা বেশ আয়েস করে নাড়ু চিবোতে লাগল।

শুকনো মুখে শিবঠাকুর বললেন, 'দিলে কোথায় যে খাব! সব তো একাই মেরে দিচ্ছ দেখছি।'

ভোলা চটে গিয়ে বলল, 'বড্ড হ্যাংলা তো তুমি! খালি খাই খাই করছ তখন থেকে।'

শিবঠাকুরও খুব খেপে গেলেন এবার। বললেন, 'আস্ত পেটুক একটা কোথাকার! এই জন্যেই তো তোমার লেখাপড়া কিসসু হয় না।'

'হয় না তো হয় না, তাতে তোমার কী! ইসস, কোত্থেকে আমার গুরুঠাকুর এলেন রে!' বলেই শিবঠাকুরের দিকে একটি ভেংচি কেটে দিল ভোলা।

'খুব যে ভেংচাচ্ছ আমাকে! এক্ষুনি কী বলে গেলেন তোমার গুরুঠাকুর? কানে যায়নি কথাটা?' শিবঠাকুর এবার রীতিমতো ধমক লাগালেন।

'কী বলে গেলেন?' ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ভোলা।

'বললেন না, তোমাকে পাশ করানো শিবের অসাধ্যি!'

'তাতে কী!' একগাল হেসে ভোলা বলে উঠল, 'ওসব কথায় কান দিতে নেই।'

'সে তুমি নাহয় নাই দিলে। কিন্তু দোষটা যে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল, সে খেয়াল আছে?' ব্যাজার মুখে শিবঠাকুর বলতে লাগলেন, 'এসব কথা লোকের কানে গেলে আর কেউ আমার পুজো করবে? কেউ ভক্তি করবে? কোনো মান-সম্মান থাকবে আমার?'

বলতে বলতে মাস্টারমশাইর খালি চেয়ারটাতেই বসে পড়লেন শিবঠাকুর। নাড়ু চিবোনো থামিয়ে ভোলা খানিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর হঠৎ হো-হো করে হেসে উঠল। হাতের ত্রিশূলটা ঠক ঠক করে মেজেতে ঠুকতে ঠুকতে ঠিক মাস্টারমশাইর মতো ধমকে উঠলেন শিবঠাকুর, 'কী হল? অসভ্যের মতো হাসছ যে?'

হাসির ধমক আরও বেড়ে গেল ভোলার। হাসির চোটে বিষম খেতে সে বলতে লাগল, 'তোমার মতো চেয়ারে বসা শিবঠাকুর কখনো দেখিনি। বোসো, মাকে ডেকে এনে দেখাই।'

সত্যি সত্যি ভোলা মাকে ডাকতে ছোটে আর কি। শিবঠাকুর ওই ত্রিশূল উঁচিয়ে কোনো রকমে দরজা আটকালেন। বললেন, 'থাক আর পাকামো মারতে হবে না। চেয়ার ছাড়া তোমাদের বাড়িতে সিংহাসন আর পাব কোথায়? পুজো-আচ্চার পাট বলে তো কিছু রাখেননি তোমার মা। ওই ক্যালেন্ডারের ছবিতে তো ফাঁসির আসামির মতো ঝুলে আছি অ্যাদ্দিন। নেহাত তোমার নামটার সঙ্গেই যা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক!'

রেগে-মেগে চেয়ারটায় একটু নড়েচড়ে বসলেন শিবঠাকুর। ত্রিশূলটা সামনের টেবিলে ঠেস দিয়ে রাখলেন। ভোলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার নামের সঙ্গে আবার কী

সম্পর্ক তোমার?'

'বারে!' তিন চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে শিবঠাকুর বললেন, 'তুমিও ভোলা, আর আমিও ভোলা, এই ভোলাবাবাই শেষপর্যন্ত তোমাকে পার করেগা! বুঝলে, ভোলাকান্ত!'

মুখ গোমড়া করে ভোলা বলল, 'অমন ভোলা ভোলা করবে না তো। আমার ভালো নাম সারস্বত।'

ফিক করে অমনি হেসে ফেললেন শিবঠাকুর। মাথায় জটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'সেটাই তো হয়েছে মুশকিল! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। ছোটো খুকিটা প্রায়ই দুঃখ করে বলত-'

'ছোটো খুকি?' আর একটা নাড়ু প্রায় মুখে পুরে ফেলেছিল ভোলা। বিষম খাওয়ার মতো হঠাৎ যেন তার দম আটকে গেল। কীরকম ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কে ছোটো খুকি?'

শিবঠাকুর ভেংচি কাটলেন, 'কে ছোটো খুকি। তা চিনবে কেন? তার সঙ্গে তো আড়ি তোমার। আরে ছোটো খুকি মানে আমার ছোটো মেয়ে সরস্বতী! বুঝলে হাঁদারাম।'

'কে হাঁদা! খবরদার আমাকে গাল দেবে না বলছি?' রেগে-মেগে কচকচ করে নাড়ু চিবোতে শুরু করলে ভোলা।

'গাল আবার দিলাম কোথায়?' বলতে বলতে শিবঠাকুর বোধ হয় জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চাটলেন। ভোলার নাড়ু চিবোনোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও ঠোঁট যেন একটু একটু নড়তে লাগল। তখনও একটা আস্ত নাড়ু ভোলার হাতে। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শিবঠাকুর বলতে লাগলেন, 'লেখাপড়ার নামগন্ধ নেই, কচকচ করে নাড়ু চিবোতে তোমার লজ্জা করে না? আমার মেয়ের নাম ভাঙিয়ে নিজের গালভরা নাম জাহির করছ, আমাকে একটা নাড়ু দিতে পার না? কিন্তু এই ভোলাবাবাই তোমাকে পার করাবে, মনে রেখো।'



'অ্যাঁ! তুমি আমাকে পার করাবে মানে?' ভোলা ব্যাপার-স্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার মুখের ভেতরে নাড়ুর খানিকটা অংশ তখনও দেখা যাচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিবঠাকুর বললেন, 'পার করাব-মানে পাশ করাব আর কি! আমার অসাধ্যি বলে কিছু নেই, বুঝেছ বোকচন্দর! পরীক্ষায় এবার ফার্স্ট হবে তুমি!'

এত অবাক হয়েছিল ভোলা যে, তার হাঁ-করা মুখটা আরও হাঁ হয়ে গেল। এমন আজগুবি কথা জন্মেও সে ভাবেনি। খানিক বাদে কোনোরকমে বলতে পারল, 'আমাকে পাশ করাবে মানে? আমাকে তুমি প্রাইভেট পড়াবে নাকি?'

'ও সব প্রাইভেট টিউশনি-ফিউশনি আমি করি না। আমি বর দান করি। আমার বরে তুমি'-বলতে বলতে শিবঠাকুর বোধ হয় চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলেন, বোধ হয় ভোলার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ফস করে লোডশেডিং হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ভোলা বলে উঠল, 'একদম নড়বে না, শিবুদাদু। আমি একটা মোমবাতি নিয়ে আসি।'

'কিছুটি লাগবে না। মোমবাতির ঠাকুরদা আছে আমার কাছে।' বলতে বলতে শিবঠাকুর খুট করে কী একটা শব্দ করলেন, অমনি সারা ঘরটা ভারি নরম একটা ঝলমলে আলোয় ভরে গেল। ভোলা তাকিয়ে দেখে, শিবঠাকুরের জটার কাছের একফালি চাঁদ থেকে ধবধবে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। ঠিক একখানা এমার্জেন্সি লাইটের মতো!

কাণ্ড দেখে ভোলা তো একেবারে হাঁ। খুশিতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাহ! দারুণ তো?'

'তোমার পছন্দ হয়েছে? তাহলে এটা দিয়ে দেব তোমাকে। লোডশেডিং হলে এটা জ্বেলে দিব্বি লেখাপড়া করতে পারবে। যা লোডশেডিং তোমাদের শহরে।'

'লেখাপড়া! ধুস!' শিবঠাকুরের কথা শুনে ঠোঁট বাঁকালো ভোলা। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

শিবঠাকুর তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'কেন হবে না? খুব হবে। ছোটো খুকিকেও আমি বলে দেব, বাপ-বেটি মিলে তোমাকে টপাটপ পাশ করিয়ে ছাড়ব। শুধু পাশ নয়, বছর বছর ফার্স্ট একেবারে-'

'কে চায় ফার্স্ট হতে!' শিবঠাকুরকে একদম পাত্তাই দিল না ভোলা। বলল, 'আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয়টা এক্কেবারে হাঁদা! গাছে চড়তে পারে না, সাঁতার কাটতে জানে না, ক্যারাম খেলায় খালি হেরে যায়, ভূতকে বেজায় ভয় পায়-'

'তুমি ভূতকে ভয় পাও না?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন শিবঠাকুর। 'কিচ্ছুতে ভয় পাই না। শুধু-' বলতে বলতে ভোলার মুখটা কেমন কাঁচুমাচু হয়ে গেল।

শিবঠাকুরও একটু অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'শুধু কী?'

ভোলা আর কিছু বলে না। শুধু কচর কচর নাড়ু চিবোতে থাকে। তবে শিবঠাকুর সবজান্তা তো! তিন চোখ একটুখানি কপালে তুলেই তক্ষুনি হেসে ফেললেন। বললেন, 'ওহ বুঝেছি! লেখাপড়াকেই তোমার যত ভয়। আরে-অত ভয় কীসের? আমি আছি তবে কী করতে? কত হাবিজাবি লোককে কেমন রাজা-গজা বানিয়ে দিলাম, আর তোমাকে সামান্য পাশ করাতে পারব না? নাড়ু দিলে না তো দিলে না, তাই বলে-'

একটা নাড়ু তখনও ভোলার হাতে। হঠাৎ ভোলার কী হল, নাড়ুটা শিবঠাকুরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও। খাও। তখন থেকে যা নজর দিচ্ছ, খেলে নির্ঘাত পেট খারাপ হবে আমার।'

নাড়ুটা নিয়ে অমনি টপ করে মুখে পুরে দিলেন শিবঠাকুর। সেটা চিবোতে চিবোতে বললেন, 'ভারি লক্ষ্মী ছেলে! সবাই আমার প্রসাদ পায়, আজ আমি তোমার প্রসাদ পেলাম। এই নাও আমার রুদ্রাক্ষের মালা। সবসময় গলায় পরে থাকবে এটা। দেখি, কার সাধ্যি তোমাকে ফেল করায়!'

'ধ্যাত!' ভোলা প্রায় ঠিকরে উঠল। মুখ ভেটকে বলল, 'আমি কি তোমার মতো বুড়ো যে, রুদ্রাক্ষের মালা পরব! বরং তোমার ত্রিশূলটা আমাকে দিয়ে যাও। ওটা খুঁচিয়ে গাছ থেকে পেয়ারা পাড়তে সুবিধে হবে।'

দেওয়ালে ঠেস দেওয়া ত্রিশূলটার দিকে সবে ভোলা হাত বাড়িয়েছে তক্ষুনি দরজার বাইরে মার গলা শোনা গেল, 'ঘরে কী জ্বালিয়েছিস রে ভোলা? এত আলো কীসের?'

'ব্যাস, ফস করে অমনি আবার ঘর অন্ধকার। শিবঠাকুরের চাঁদ নিভে গেল। মা একটা মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ভোলা চেঁচিয়ে উঠল, 'দিলে তো সব মাটি করে! ত্রিশূলটা প্রায় বাগিয়ে এনেছিলাম-'

'ত্রিশূল!' অবাক হয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কার ত্রিশূল?'

'কার আবার! তোমাদের শিবঠাকুরের!' বলতে বলতে দেওয়ালের ছবিটার দিকে তাকাল ভোলা। ছবিতে শিবঠাকুরের ঠোঁটটা তখন নড়ে যাচ্ছে। ভোলার নাড়ুটা তখনও চিবোচ্ছেন বোধ হয়!

*শারদীয়া ১৪০৯*

## জয়রামের সিন্দুক

# অনিতা অগ্নিহোত্রী

'জয়রাম, ও জয়রাম ...'

'বলেন কী বেপার ...'

'জয়রাম, আমাদের দরজার ছিটকিনিটা ঢিলে হয়ে গেছে!'

'আসছি আমি ...'

'জয়রাম, নোটিশ বোর্ডটাও টাঙাতে হবে বাইরের দেওয়ালে!'

'দাঁড়ান, আসছি ...'

জয়রাম হনহন করে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গেল, রোদের মধ্যে, তার হাতে দেড়ফুট তার।

জেনারেটার রুমে কারিগর দাঁড়িয়ে আছে, জয়রাম এলে বিজলি বাতির ছেঁড়া কানেকশন জুড়ে দেবে।

জয়রামের মুখখানি গোল, দু-টি চোখ সবসময়েই বিস্ময়ে বড়ো হয়ে আছে, বড়ো কপাল, চ্যাপটা নাকের নীচে পুরু গোঁফ। গায়ে সারাবছর নীল শার্ট, নীল ফুলপ্যান্ট। যেভাবে হাত দুলিয়ে বেরিয়ে গেল জয়রাম, তাতে মনে হল, সে কিছুই শোনেনি, এবং ফিরেও আসবে না শিগগির। পৃথিবী জুড়ে শয়ে শয়ে লোক নানা দিক থেকে জয়রামকে ডাকছে। এবং জয়রাম তাদের কাউকেই 'না' বলছে না। কাজেই, পরদিন সকালে যখন একতলার করিডরে আবার জয়রামের সঙ্গে দেখা হল, তখন প্রথমেই বললাম, 'জয়রাম, ছিটকিনিটা আজ টাইট না করে কিন্তু ...' জয়রাম জুতো রাখার মস্ত র্যাকের একটা দিক পালিশ করছিল, আমার দিকে চোখ গোল করে তাকিয়ে রইল।

'উপরে গেছলেন আপনি?'

'না এখনও যাইনি, এবার যাব।'

'তাহলে, আগে উপরে যান, তারপর কথা বলব-'

সকাল দশটা। তিনতলায় গিয়ে দেখি ঝকঝকে নতুন নোটিশ বোর্ড টাঙানো হয়ে গেছে, ছিটকিনিটাও দিব্যি টাইট।

জয়রাম নিশ্চয়ই গতকাল ঘোর সন্ধ্যে বেলা ফিরে এসেছিল, অথবা আজ সকালে। কাজ সেরে না ফেললে তার নিশ্চিন্তি নেই। ইতিমধ্যে ও আবার উঠে এসেছে, পকেটে রাখা ছোট্ট হাতুড়ি বার করে নোটিশ বোর্ডের কোনায় মারছে ঠক ঠকাং ...

ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে ...

‘কী করছ কী, জয়রাম, নতুন বোর্ড ...’

‘কোনায় প্রেক (পেরেক) উঠে রয়েছে একটা, সমান করে দিচ্ছি-কারও হাতে লেগে গেলে তখন তো বলবেন জয়রাম এটা কীরকম কাজ করল ...’

‘তা তো বটেই।’

‘ভালো গামার কাঠ দিইছি, ভেলবেট কিনেছি চাঁদনি থেকে। কোনায় কোনায় বিট দিইছি ... এবার পঁচিশ-ত্রিশ বছর মজাসে চলে যাবে ...’

‘একটু ভারী হয়ে গেল না কি, নোটিশ বোর্ড হিসেবে ...’

‘হালকা কাজ তো হামিও করতে পারি, পাঁচ-ছ বরসের মধ্যে ভেঙেচুরে যাবে ... তখন তো জয়রামের বদনাম হয়ে যাবে ...’

জয়রাম কোনো কাজই অল্পদিন টেকার জন্য করে না ... তার কাজ মানেই পঁচিশ-ত্রিশ বছর ... অথবা পচাস-ষাট বছর আর বদনাম হবে এমন কোনো কাজ সে হাতেই নেবে না ...। তবু হাজার রকম ফন্দি-ফিকির জানে বলে সবাই তাকে ডাকাডাকি করে। আর ওই সব ছোটোখাটো কাজে জয়রাম কখনো না বলে না। কাজেই নীল শার্ট-নীল প্যান্ট সারাদিন এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। পকেটে হাতুড়ি, চকখড়ি, ছোটো তার, বাটালি, লাট্টুর সুতো ...

‘জয়রাম, দেখ তো দেওয়াল ঘড়িটা চলছে না কেন ...’

‘জয়রাম, যামিনী রায়ের প্রিন্টটা টাঙাতে হবে ...’

‘কাচে কালো ফিলম না লাগালে কিন্তু গরমে বসা মুশকিল হবে এবার ...’

জয়রাম কাউকে তক্ষুনি সমাধান বাতলে দেয়, কাউকে বলে-‘চাঁদনি যেতে হবে ... মাল না আনলে কী করে করব হামি ...’ তার আসল কাজ যেখানে, সেখানে সে একটা মস্ত বট গাছের মতনই অনড় ... যদিও গাছেদের নাম্বার ওয়ান দুশমনই বলা যায় তাকে। জয়রাম আসলে ছুতোর। তার জাতব্যাবসা কাঠের কাজের। কিন্তু এত চটপটে আর সমাধান-প্রিয় জয়রাম যে, মেরামতি ডিজাইন কাচ কাঠ লোহা চুন সুরকি যেকোনো মালমশলা দিয়ে তাকে মাতিয়ে দেওয়া যায় ...

শহরের এদিকটায় বসন্ত আসে অনেক বেশি টগবগিয়ে। শীতও অবশ্য পড়ে জাঁক করে। সন্ধ্যের পর বেরোতে গেলে পৌষ-মাঘে মনে হয় নাকের ডগা জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। শীত ফুরোনো-গরম না পড়া দিনগুলো কাটে দিব্যি মৌরসি পাট্টায়। প্রথমে তো ফুটে ওঠে নানারঙের গাঁদা, ডালিয়া, জিনিয়া ও প্রজাপতির মতো দেখতে সব বিলিতি ফুল যাদের গালভরা নাম মালিরা জিভেই আনতে পারে না। এরপর আসে সূর্যমুখী ফুলেরা; তারা সূর্যের দিকে আহ্লাদি গাল ফিরিয়ে হাসাহাসি করে সারাদিন। তেঁতুল, শিরীষ ও গুলমোহরের পাতা হাওয়ায় জড়িয়ে উড়তে থাকে। এইরকম একটি দিনে হঠাৎই বাতাস চিরে ডেকে ওঠে বসন্তের কোকিল। তার ডাকে হিমঘুম ছেড়ে সাপেরা আড়ামোড়া ভাঙে। কু-উ-কু-হু-উ ... কোকিল ডাকে। তার ডাকে অন্য সব গাছ থেকে কোকিলদের ডাকাডাকি আরম্ভ হয়ে যায়। তারপর পর্দা চড়তে থাকে সুরের, হাওয়ায় রোদের তেজ যতই বাড়ে, ততই যেন পাগলা হয়ে ওঠে কোকিলরা, তাদের ডাক হয়ে যায় হুংকার কিংবা হাহাকারের মতন ... যে শোনে তারই কষ্ট হয় বড্ড।

ওই সব ডাকাডাকির সময় জয়রামকে দেখা যাবে কখনো-সখনো ঘাড় কাত করে ছায়ায় দাঁড়িয়ে। ও কি জানে যত গাছ আছে এ তল্লাটে সবাই নিজেদের জয়রামের শত্তুর বলে জানে? শিরীষ, আম, জাম, বকুল … এরা কেউ দু-চক্ষে দেখতে পারে না জয়রাম ছুতোরকে। জয়রামের বয়স এখন পঞ্চান্ন। গত তিরিশ বছরে যত টেবিল চেয়ার আলমারি সিন্দুক দরজা জানালার ফ্রেম আর পার্টিশন তৈরি করেছে জয়রাম, তাতে কত যে নিরীহ গাছের গুঁড়ি ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে করাতে চেরা হয়েছে ভাবতে শিউরে ওঠে গাছেরা। এই বাড়ি ও বাগানের চৌহদ্দিতে দাঁড়িয়ে তারা অনবরত ফিসফিসিয়ে জয়রামকে শাপশাপান্ত করে।

জয়রাম অবশ্য সে শাপমন্যি শুনতে পায় না। শুনতে পায় মোতি কুকুর, যে এই বড়ো বাড়িটার চৌহদ্দিতে ছানাপোনা নিয়ে থাকে। হাওয়া বইলে এবং সে হাওয়ায় গাছেদের ফিসফাস ভেসে এলে মোতি কট কট করে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে, আর জয়রামের দিকে মুখ তুলে হুঁউ হুঁউ করে ডাকে। জয়রাম কিছু বোঝে না। ততক্ষণে গোটানো মাপের ফিতে দিয়ে তার লম্বা বারান্দার লম্বাই-চওড়াই মাপা হয়ে গেছে। ছোটো পেনসিল দিয়ে সে কাগজে মাপের হিসেব কিতেব লিখতে লেগেছে। দাঁড়িয়ে, বসে, হাঁটতে হাঁটতে, যেকোনো সময় জয়রাম কাজ করতে থাকে। গাছেদের শাপশাপান্ত শুনতে পেলেও জয়রাম বলত, হামি কী করব? হামি কাঠ না কাটলে দুসরা কেউ কাজ করত; সে যদি আচ্ছা কার্পেন্টার না হত, তবে গাছেদের আরও বেশি কষ্ট হত। ‘গাছ মরল, কাম ভি ভালো বনল না …।’

মোতি জয়রামকে বেশ পছন্দ করে। নতুন তৈরি করা বারান্দার এক কোণে সে দিব্যি ছিল, তার ছোট্ট ছোট্ট তিনটি ছানা হয়েছে তখন। এমন সময় অর্ডার হল ওখানে নতুন পার্টিশন হবে। জানালায় এসি মেশিন বসবে। খ্যাঁস খ্যাঁস কাঠ চেরার শব্দে, কাঠের গুঁড়ো আর রঙের গন্ধে সদ্য-জন্মানো বাচ্চারা অতিষ্ঠ। জয়রাম সেটা লক্ষ করেছিল, অন্য কেউ না করলেও। দেখা গেল ওরই মধ্যে সে বাড়তি কাঠ, পেরেক, বাঁশের টুকরো এইসব জুড়ে মোতির জন্য একটা থাকার ঘর বানিয়ে ফেলেছে। গুলমোহরের নীচে দিব্যি বাড়ি, জলখাবার কাঠের গামলা, খাবার রাখার বাঁশের প্লেট।

মোতি খুব খুশি। জয়রামকে দেখলেই সে প্রথমে একছুটে এসে ‘ভু-উ-উ’ করে ডেকে নেয়। পরপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ে, শেষে, জয়রামের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বালিভরা মাটিতে কুণ্ডলি পাকিয়ে একটু শুয়ে নেয়।

আমরা যখন বললাম, ‘বাঃ, জয়রাম, দারুণ কাজ করেছ একখানা …’ তখনও জয়রামের মুখে কোনো বদল দেখা গেল না। জয়রাম একটা স্ক্রুর মাথা পরিষ্কার করতে করতে বলেছিল, ‘তা, ওর ঘরটা নষ্ট করে দিলাম, ওকে একটা জাগা না দিলে কী করে চলবে? ফেমিলি আছে, বাচ্ছারা আছে …’

যেকোনো নতুন কাজ আরম্ভ করার সময়টা ভীষণ মুশকিলের-একবার আরম্ভ হলে অবশ্য আর কোনো চিন্তা নেই।

কারণ, জয়রাম ফাঁকি দেয় না, গল্প করে না, রেডিয়ো শোনে না, সাত বার পানের পিক ফেলতে বাইরে যায় না, কর্মসংস্কৃতি তার মজ্জায় মজ্জায়। কিন্তু গোড়াতে-

‘ছ-টা আলমারি হবে, জয়রাম, কী কাঠ দেবে ভাবছ-‘

‘ভালো সিজনড টিক দেবেন …’

‘সেগুন কাঠের আলমারি, অফিসে …’

‘তাহলে রোজউড দিন …’

‘নাহলে শালকাঠেও চলবে …’

‘অত খরচ করবেন না? তবে স্টিল কিনে নিন না …’ শেষে যখন আমকাঠে রফা করার চেষ্টা হচ্ছে, জয়রাম হতাশ হয়ে চলেই গেল।

‘ও আমি পারব না … ভালো হবে না … লোকে দেখে বলবে জয়রাম এটা কী করল? দু-পাঁচ বছরে ভেঙে যাবে … বদনাম হবে আমার …’

মাঝে মাঝেই জয়রাম নানা রঙের শেড নিয়ে আসবে অ্যাপ্রুভ করাতে, নানা ধরনের সানমাইকা মেলে ধরবে, বলবে, বেছে নিন, পালিশ নিয়ে কথা বলতে আসবে দশ বার … যতক্ষণ জিনিস রেডি না হবে জয়রামের সঙ্গে অফিসের কর্তারা খেটে অস্থির। জয়রামের বাড়ির লোককে কেউ কখনো দেখেনি। মালিও বাড়ি যায়, ওয়াচম্যান শম্ভু সিং ছেলের পইতে দিয়ে ন্যাড়ামাথা ছেলে আর বেণী দোলানো মেয়েকে নিয়ে ফিরল, এসি অপারেটারের বউ মাঝে মাঝেই হলুদ ফুল ফুল শাড়ি পরে লুচি ভাজে দুপুর বেলায়। জয়রাম না বাড়ি যায়, না তার বাড়ির লোককে কেউ দেখেছে। তা নিয়ে জয়রামের অবশ্য কোনো দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। কারণ সবার বাড়িতেই তার যাতায়াত, সত্যনারায়ণের সিন্নি থেকে আরম্ভ করে ইদের ফিরনি, সবতাতেই তার বরাদ্দ বাঁধা।

মস্ত বড়ো এই অফিস বাড়িটা আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে জয়রামকে। কত কাজ এখানে। কোন কাজটা করে-তা নিয়ে জোর হিসেব কিতেব চলতে থাকে, তখন জয়রামই গায়ে পড়ে করে দেয়। কাজ করতে কত সময় লাগে? ঝগড়া করতে তার চেয়ে ঢের বেশি সময় বরবাদ- এই হচ্ছে জয়রামের মত।

কোথাও জলের পাইপ লিক করছে, কোথাও শার্সি ভাঙল ঝড়ে। চেয়ারের হাতল ভেঙে ক্যাশিয়ারের জামা ছিঁড়েছে, ক্যাশিয়ার জামা নিয়ে জয়রামের কাছে হাজির। ‘দেখো, জয়রাম দেখো, পুজোয় নতুন কিনলাম, ‘ফাল্গুনী’ মিলের কাপড় …’ দোষটা যেন জয়রামের! মেঝের চটা উঠেছে কোথাও, নতুন ঘড়ি টাঙানো হবে লাইব্রেরিতে, লাইব্রেরিয়ান বেরোবার আগে জয়রামকে ঘড়ি গছিয়ে গেল … অফিস যখন চলে তখন ঠক ঠক শব্দ অথবা আসবাব টানাটানি করলে বিরক্ত হয় লোকজন, তাই সবাই বাড়ি যাবার পরও অনেকটা কাজ বাকি থাকে জয়রামের।

অন্ধকার রাস্তা পেরিয়ে মোড়ের ঠেলাওয়ালার রুটি-সবজি খেয়ে জয়রাম ঘুমোতে যায়। যতক্ষণ ফিরে না আসে, মোতি দাঁড়িয়ে থাকে গেটের কাছে।

অফিসের চৌহদ্দিরই মধ্যে ছোটো ছোটো পাঁচ-ছ-খানি ঘরের একটি কামরা জয়রামের। তক্তপোশে বিছানা পেতে সে শোয়। সারা ঘরে ছড়ানো থাকে তার কাজের সরঞ্জাম, দড়ি, মোমবাতি, দেশলাই, তার, করাত, কাঠের টুকরো, বার্নিস, কাঁচি, স্ক্রু-ড্রাইভার, টেস্টার …

সেবার অফিসের হেড হয়ে এলেন ত্রিবিক্রম সিং সান্ধু। এর আগে হেড ছিলেন জয়মঙ্গল ভট্টাচার্য, রিটায়ার করেছেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, আদ্যোপান্ত ভালো মানুষ। ত্রিবিক্রম সিং এসেই লাফঝাঁপ হম্বিতম্বি করে অফিসের ভোল পালটাতে আরম্ভ করলেন। ‘অ্যাকটিভ ইয়াং ম্যান’ জয়রামের ডাক পড়তে লাগল ঘন ঘন। শিগগির সাহেব বুঝলেন, ‘ওয়ার্ক কালচার’ যাকে বাংলায় বলে ‘কর্মসংস্কৃতি’ তা আছে এই একটি লোকেরই। ‘সিন্দুক’ পর্বের আরম্ভও এই সময়েই। নানারকম দুষ্প্রাপ্য মেশিন পার্টস-এর একটা সংগ্রহ ছিল অফিসে। ত্রিবিক্রম সিং বললেন, এর জন্য চাই বড়ো ও মজবুত সিন্দুক। ওই সব ফঙ্গবেনে স্টিলের আলমারি কোনো কাজের নয়। মুখের কথা খসার যা অপেক্ষা-আর

জয়রামকে পায় কে? সাহেব নিজে বলেছেন, শক্ত, বড়োসড়ো, মজবুত ... ভালো সিজনড সেগুন কাঠ, ঝকঝকে নীল-সবুজ রং, কারুকার্য করা হাতল সব দিয়ে জয়রাম বিস্তর খেটে একখানা সিন্দুক বানিয়ে ফেলল। যত সহজে লেখা হল, তত সহজে অবশ্য কাজটা হয়নি। এর মধ্যে জয়রাম দশ বার ফরেস্টের কাঠ ডিপো গেছে কাঠ বাছতে, একুশ বার বউবাজার গেছে ভালো মিস্ত্রির খোঁজে, চাঁদনি গেছে তিপ্পান্ন বার, বারবার 'কোটেশন' তৈরি হয়েছে, তিন বার 'অডিট' পার্টি এসে অবজেকশন দিয়েছে, পরিবেশবাদীদের মোর্চা 'জয়রাম গো ব্যাক' 'জয়রাম হায় হায়' লিখে গেছে কম্পাউন্ডওয়ালে।

ছ-মাস লেগেছে সিন্দুক শেষ হতে। ত্রিবিক্রম সিংহ আর জয়রাম দু-জনেই নির্বিকার।

শেষ হবার খবর পেয়ে সাহেব বলেন, 'সিন্দুকটা তাহলে আনো, এবার দেখা যাক।' জয়রাম আরও দিন সাতেক নিল পালিশের ফিনিস ও নানা খুঁটিনাটিতে। সোমবার, বেলা বারোটায় ঠিক হল সাহেব সিন্দুক ইন্সপেকশন করবেন। সেদিন জয়রাম কাচা নীল জামা-প্যান্ট পরে এসেছে, সাহেবের পরনে কোট, নেকটাই, গ্রে ট্রাউজার্স। খিদিরপুরের ছ-জন খালাসি এসেছে, বাঁশ দড়ি-দড়া নিয়ে। সিন্দুক তুলবে দোতলায়।

সারা অফিসে ছুটির আমেজ, আমরা চীনেবাদাম মুড়ি খেয়ে কম্পাউন্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ বকছে না, অনেকটা বিশ্বকর্মা পুজোর মেজাজ চারদিকে ...

বলতে ভুলে গেছি, ফাঁকা জায়গা দরকার বলে জয়রাম সিন্দুকটা বানাচ্ছিল অফিসের গেটের কাছে, যেখানে সিকিউরিটির লোকেরা বসে; গেটটা অফিস বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজের মতো দূর। যাই হোক, দড়িদড়া দিয়ে বাঁশের চৌদোলা হল, সিন্দুকটা (দশ ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া, ঘনত্ব সাড়ে তিন ফুট) ধাক্কাধাক্কি দিয়ে টানাটানি করে নানাভাবে দেখা হল-সেটা একচুলও নড়ল না। সিন্দুকটা না নড়ায় জয়রামের মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল, ভাবখানা, এইরকমই তো হওয়া দরকার ... শক্তপোক্ত জিনিস, পচাস-ষাট বছর টিকবে . .. কিন্তু ঘণ্টা খানেক পর যখন কুলিরা হয়রান হয়ে ঘামতে ঘামতে বসে পড়েছে, জয়রামের ভুরু কুঁচকোনো, মুখ গম্ভীর বিড়বিড় করে কিছু বলছে ... হয়তো ভাবছে গাছের ভূত তার উপর শোধ তুলল কি না! দিন গড়িয়ে বিকেল হল। সাহেবের কাছে খবর গেল, সিন্দুক তোলা যাচ্ছে না। সাহেব আশ্চর্য হয়ে নিজেই গেটের কাছে নেমে এলেন, সিকিউরিটির গানম্যান নার্ভাস হয়ে আকাশে গুলি চালায় আর কি ... আমরা অবাকই হলাম, যখন ত্রিবিক্রম সিং সান্ধু খুব তারিফ করতে লাগলেন সিন্দুকটার, লম্বা চওড়া মজবুতির, তার কাঠের পালিশের, রঙের হাতলের ...

জিনিসটা নড়ানো যাচ্ছে না দেখে তিনিই সিদ্ধান্ত নিলেন, 'হাউ ডাজ দ্যাট ম্যাটার? টুলসগুলো বরং নিয়ে এসো, ওগুলো নাড়ানো সোজা, এখানেই থাকবে, তালাবন্ধ অবস্থায়।' তাই হল।

অনেকদিন পর আমি ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। বছর পঁচিশ কেটে গেছে এর মধ্যে। বছর পনেরো আগে আমিই অফিস বদলেছি। আমাদের পুরোনো অফিসটার কাজকর্ম কমে যাওয়ায় সেটা ছোটো হয়ে গেছে। বাড়িটা এখন বেশ পুরোনো। একটা ব্লক ভেঙে নতুন মাল্টিস্টোরিড তোলার কাজ চলছে। সিন্দুকটা নিয়ে কৌতূহল ছিল। তাই গেটের সামনে দাঁড়ালাম। নতুন সিকিউরিটির লোকেরা আমাকে কেউ চেনে না। আশ্চর্য সিন্দুকটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। রং আগের মতনই জ্বলজ্বলে, ভালো পালিশ, তালাবন্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। তবে কি জয়রামও আছে? যত্ন নেয় সিন্দুকের?

পাঁচিলের ধারে এত গাছগাছালি আগে ছিল না। আমাদের সময়ে তো নয়ই। সুবলমালি ফুলগাছের যত্ন করেই কুলিয়ে উঠতে পারত না।

এখন দেখছি কম্পাউন্ডের দেওয়াল ঘেঁষে সুপুরি গাছের সারি, ভিতরে আম, জাম, আতা, নিম ইত্যাদি বড়ো হচ্ছে। রোদ কমে গেছে। গাছের ছায়ায় ঝুপসি জায়গাটা। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। ভিতর থেকে মাঠ পেরিয়ে হনহন করে যে হেঁটে আসছে তাকে প্রথমে চিনতে পারিনি। তারপরে বুঝলাম, জয়রাম।

একটু কুঁজো হয়ে গেছে এই যা, চেহারা বদলায়নি। আগের মতনই গোল গোল চোখ, বড়ো কপাল, নির্বিকার চেহারা। তফাত এই যে, হাফপ্যান্ট পরেছে। হাতে, কনুইয়ে, পায়ের পাতায় মাটি লাগা।

‘কী করছ এখানে জয়রাম?’

‘আমি এখন মালির কাজ করি।’ জয়রাম যেন মজার খবর দিচ্ছে এইভাবে বলল। ‘কত গাছ লাগিয়েছি দেখেন। নার্সারি বানিয়েছি এখানে, দেখুন।’ সত্যিই, পলিথিনের ঠোঙায় কত ছোটো ছোটো গাছ বাড়ছে।

‘এত গাছের কাঠ কেটেছি, গাছেরা কত গালমন্দ করেছে আমাকে বলেন তো! তাই এখন পুণ্যকাম করছি, নতুন গাছ লাগাচ্ছি।’

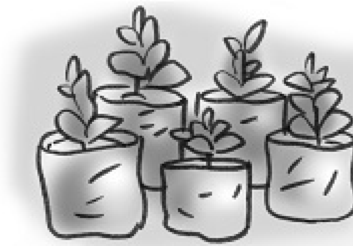
‘ওই পিছনে সেগুন বাগান হচ্ছে বড়ো। দু-শো, আড়াই-শো সেগুন গাছ … আসুন না, দেখুন …’

‘গাছ বড়ো হলে তো আবার কে কেটে নেবে …’

‘আরে না, আমি থাকতে কে কাটবে …’

জয়রাম আমাকে উৎসাহের সঙ্গে বাগান দেখাতে নিয়ে চলল।

*শারদীয়া ১৪১০*






# শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভুর গল্প লিখতে খুব ভালো লাগে। একটা ছোটো গল্প লিখে সাহিত্য-সম্পাদক আশুদার হাতে দিয়েছিল। ভেবেছিল, গল্পটা আশুদার ভালো লাগলে ছাপা হবে তখন সকলে জানতে পারবেন। ছাপা না হলে কেউ জানতেও পারতেন না।

কিন্তু নিউজ এডিটর ঠিক জানতে পারলেন। সন্ধ্যে বেলায় রিপোর্টার সাব এডিটরে ভরা অফিস, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিজয়দাকে বললেন, 'বুঝলেন বিজয়বাবু, বিভুবাবু আজকাল গল্পও লিখছেন!'

শ্যামদার নিউজটা লিখে দিতে গিয়ে বিভু কলেজের প্রথম ক্লাসটা মিস করছে। দ্বিতীয় ক্লাসের আগে পৌঁছোবার জন্য ও উঠব উঠব করছিল, তখনই নিউজ এডিটর কথাটা বললেন।

বিভু মাথা নীচু করে বসে আছে। লজ্জায় মুখ-চোখ লাল। যেন বিরাট একটা অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছে। ওর মনে হল, গোটা ডিপার্টমেন্ট ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। আশুদার ওপর রাগ হয় বিভুর। গল্পটা ভালো লাগেনি, ছাপবেন না। ব্যাস ফুরিয়ে গেল। নিউজ এডিটরকে বলার কী দরকার। হঠাৎ নিউজ এডিটরের পরের কথা কানে যেতে চমকে উঠল বিভু, 'তা গল্পটা ভালোই লিখেছে বুঝলেন বিজয়বাবু।'

'আপনি পড়েছেন?' বিজয়বাবুর প্রশ্ন।

'বিভুর নাম দেখে পড়ে ফেললাম। সানডে ম্যাগাজিনের ট্রায়াল রানের পর একটা কপি দেখতে দিয়ে গিয়েছিল সে। তা আমি বলেছিলাম, বিভু ছেলেমানুষ আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন, গল্প লিখতে যতটা সময় ও খরচ করছে সেই সময়ে সে যদি দু-একটা জব্বর খবর জোগাড় করে আনে তাহলে যে কাগজের উপকার হয়।'

গল্পটা ছাপা হচ্ছে জেনে বিভুর খুব ভালো লাগছিল, ও সংকোচে মুখ তুলতে পারছিল না। সুনীলদা বলল, 'তুই মুখ নীচু করে বসে আছিস কেন? কোনো অন্যায় তো করিসনি।' তখনই নিউজ এডিটরের খাস বেয়ারা এসে সানডে ম্যাগাজিনটা বিভুর হাতে দিয়ে বলল, 'এন ই দিয়েছেন।'

বিভু তাড়াতাড়ি পাতা উলটে দেখল, গল্পটা কী সুন্দর ছবি দিয়ে ছাপা হয়েছে। ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার। সমীর সরকারের নাম বিভু জানে। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার গল্পের ছবিও সমীর সরকার একবার এঁকেছেন। সেই সমীর সরকার ওর গল্পের ছবির ইলাসট্রেশন করেছেন। সকলকে দেখায়। হঠাৎ বিজয়দার ডাক কানে এল, 'বিভু কাগজটা একটু নিয়ে এসো তো, দেখি কেমন গল্প লিখেছ।'

'ভালো হয়নি বিজয়দা।' বিভু মিনমিন করে উত্তর দেয়।

'না হোক দেখি একবার।'

বিভু কাগজটা বিজয়দার হাতে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কখন যে আজ ছাড়া পাবে কে জানে! বিজয়দা উলটে-পালটে দেখে চাপা গলায় বললেন, 'বিভু একটা ভালো খবর জোগাড় করে ফেলো। এন ই-র মেজাজ ঠিক করার জন্যে দারুণ একটা খবর তোমায় দিতেই হবে। কথা মনে রেখো। পারলে কালই ...।'

বিভু বুঝল, গল্প পড়াটা আসল নয়, এই কথাটা বলার জন্যেই বিজয়দা ডেকেছেন। ও বলল, 'আমি চেষ্টা করব বিজয়দা।'

'চেষ্টা নয় একটা ভালো খবর কাল তোমায় জোগাড় করতেই হবে।'

'আমি যাব বিজয়দা? এখন গেলে তিনটে ক্লাস করতে পারব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও। খবরটার কথা কিন্তু ভুলো না।'

'দেখি, কাল-কিছু পাই কি না।'

বিভু তাড়াতাড়ি কলেজে পৌঁছোতে চাইছে। ওর হাতে সানডে ম্যাগাজিনটা। ওর গল্প ছাপা হচ্ছে, বন্ধুদের দেখাতে হবে তো! কিন্তু গল্প ছাপা হবার সব আনন্দ মাঠে মারা গেল। কাল একটা ভালো খবর চাই, নিউজ এডিটরের কড়া গলার স্বর বিভু যেন শুনতে পায়। এবার অনুরোধটা চিফ রিপোর্টারের।

পরদিন সকালে বিভু বেরোবে বেরোবে করছে দমদম থেকে দিদির ফোন এল। দিদি বললেন, 'বিভু একবার বেহালায় গিয়ে সোনাদা আর গৌরীদিকে একটা খবর দিয়ে আসবি?'

'আজ! আজ যে আমার একটা জরুরি খবরের জন্যে একজায়গায় যেতে হবে। খুব জরুরি খবর।'

'এখানে তোর জামাইবাবুর মার খুব বাড়াবাড়ি চলছে। গৌরীকে দেখতে চাইছেন।'

'ফোন করে দিলে হয় না!'

'ওদের ফোন সেই কবে থেকে খারাপ। ফোন ঠিক থাকলে কি আর তোকে খোশামোদ করতাম!'

বুঝলাম, আজ আর নিস্তার নেই। দিদি চটেছেন। মেজদাকে যে বলব সে উপায় নেই। মেজদা হাসপাতালে। বললাম, 'বেহালায় যেতে যদি একটু বেলা হয় ক্ষতি নেই তো?'

'না, তা নেই। তবে আগে খবর পেলে ওরা হয়তো আজই আসতে পারে।'

আজ যে আসতে পারবে না সে আমি জানি। সোনাদা অফিসে চলে গেছেন ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে। সে কথা আমি আর মুখে বললাম না। বললাম, 'দেখি, যত তাড়াতাড়ি পারি যাচ্ছি।'

ভেবেছিলাম মেজদার বন্ধু হোম সেক্রেটারি ঘটকদার বাড়ি হানা দেব। সে আর হবে না। ভালো একটা খবরও আজ জোগাড় করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। মাথায় কিচ্ছু আসছে না। আমাদের মানে রিপোর্টারদের সব সময় মনে করিয়ে দেওয়া হয়, চোখ-কান খুলে চলবে। খবর ঠিক ভেসে আসবে। আমি তো চোখ-কান খুলেই রেখেছি, খবর ভেসে আসছে কই, শ্যামদারা কেমন খবরের গন্ধ পান। আমি পাই না কেন কে জানে। কিন্তু আজ কী হবে! একবার মনে হল, আজ আর অফিসে যাব না। কথা মনে হতেই নিজের

ওপর বিরক্তি লাগে। এ তো নিজের কাছ থেকে, খবরের কাছ থেকে পালানো। সাংবাদিকরা কখনো কোনো কিছু থেকে পালায় না। ফেস করে। তাহলে? খবর পাই ভালো, না পেলেও আমি অফিসে যাব। তারপর যা হবার হবে-নিউজ এডিটর যদি কথা শোনান, শোনাবেন!

তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক করলাম বাসে ময়দানে যাব। তারপর ট্রামে। গড়ের মাঠের ওপর দিয়ে ট্রাম যখন হু-হু করে ছোটে তখন ভীষণ ভালো লাগে। ম্যানটনের আগের স্টপেজে নেমে একটু পিছিয়ে এসে বাঁ-দিকের গলির মধ্যে সোনাদাদের বাড়ি। আমি যখন পৌঁছোলাম গৌরীদিরা তখন খেতে বসে গেছেন। আমায় দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই সময়ে?'

বললাম, 'তোমরা খেয়ে নাও। তারপর বলছি।'

'কোনো খারাপ খবর?'

'না, না! তুমি খেয়ে নাও।'

'ধ্যাস, খাওয়া যায় কখনো? তুমি বলো, কী বলতে এসেছ।'

'বলছি তো তেমন কিছু নয়।'

'না, আগে বলো। আমি সব সইতে পারব।'

'এই মুহূর্তে তো বলার মতো কিছু নেই।'

'এই যে বললে খারাপ খবর নয়!'

'খারাপ খবর তো তেমন কিছু নয়। মাসিমার শরীর খারাপ হয়েছ জান তো?'

'হ্যাঁ জানি।'

'এখন আর একটু বেশি খারাপ হয়েছে। তোমায় দেখতে চাইছেন।'

'ওর আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে, তাহলে তো আর যাওয়া যাবে না। কাল যাব। আমাদের ফোন খারাপ। তুমি একটু জানিয়ে দিয়ো।'

'ফোন খারাপ বলেই তো আসতে হল! আমি দিদিকে বলে দেব, আমি তাহলে উঠি!'

'সে কী! একটু বোসো। মিষ্টি-টিষ্টি খেয়ে তবে যাবে। এখানে কোনো দোকান থেকে কিছু কিনে খাবে না!'

'কেন?'

'সে সাংঘাতিক ব্যাপার। দুটো দোকান থেকে কীসব মিশিয়ে সরষের তেল বিক্রি করেছে। অনেক লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তিরিশ-চল্লিশ জনকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছে।'

'কী বলছ, এ তো বিরাট খবর।' নিউজের গন্ধ পেয়ে আমি নড়েচড়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'দোকান দুটো কোথায়?'

'ওই তো মোড়ের মাথায়! সকাল থেকে হইচই হচ্ছে! পাড়ার ছেলেরা দোকান দুটো বন্ধ করে দিয়েছে। পুলিশ দোকানের মালিকদের ধরে নিয়ে গেছে।'

'কেউ মারা যায়নি তো?'

'মারা যায়নি। তবে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'কখন থেকে গোলমাল চলছে?'

'তা দশটা-টশটা হবে।'

ততক্ষণে আমি ঠিক করে ফেলেছি আমায় কী করতে হবে।

গৌরীদি ছাড়লেন না। মিষ্টি-টিষ্টি খাইয়ে দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি করে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মোড়ের মাথায় ওইরকম কোনো দোকান না দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাজে তেল বিক্রি করে ধরা পড়ছে যে দোকান সে দুটো কোথায়?'

ভদ্রলোক কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাজে তেল নয়, বিষ তেল। তা তোমার দরকার কী? তোমায় দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না!'

'আমায় আপনি আগে দেখেননি।' সোনাদার নাম বলে আমি বললাম, 'আমি ওঁর বাড়িতে এসেছি। বিষ তেল বলছেন যখন, তখন কেউ মারা গেছেন বোধ হয়!'

'এখনও যায়নি, তবে যাবে।'

'কোন হাসপাতালে আছে তারা?'

'জেনে কী করবে, দেখতে যাবে?'

'তা তো যেতেই হবে।'

'মানে? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে!'

ভদ্রলোকের মেজাজ চড়ে যাচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে ওকে দেখালাম। কার্ডে আমার ছবি। অশোক স্তম্ভ দেওয়া সরকারি পরিচয়-পত্র-হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে ইস্যু করা।

'ওটা কীসের কার্ড?'

'আমার পরিচয়পত্র। সরকারি। আমি একজন রিপোর্টার।'

'রিপোর্টার ... তুমি? এইটুকু ছেলে ...'

'দোকান দুটো কোথায় একটু বলে দিন-আমার সময় নষ্ট হচ্ছে।'

ততক্ষণে দু-চারজন লোক এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি ছেলেও ছিল। তাদের একজন বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন! আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

আমি ছেলেটির সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম একজন বলছেন, 'ছেলেটা গুল মারছে না তো! এইটুকু ছেলে রিপোর্টার হতে পারে!'

ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে সন্দেহের দৃষ্টি দেখে বললাম, 'এ ভুল সবাই করে। ওঁদের দোষ নেই। আমি তো এখনও কলেজে পড়ছি।'

'কোন কলেজ, কোন ইয়ার?'

'সিটি মেন। এবার ফোর্থ ইয়ারে উঠব।'

'আমিও তো তাই। তবে আশুতোষে ... নাম সোমেন ঘোষ!'

'তাহলে তো আমরা তুমি বলতে পারি।'

আমার কথা শেষ হল না, ছেলেটা বলল, 'তোমার নাম কী?'

'বিভু রায়।'

‘দৈনিক সমাচার?’

‘হ্যাঁ! ও সব কথা থাক, এখন একটু ডিটেলসে বলো দেখি!’

‘শোনো, ওই দুটো দোকান থেকে গত ক-দিন ধরে বিষ তেল বিক্রি করছে। ওই তেল খেয়ে ইতিমধ্যে প্রায় শ-খানেক লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জনা পনেরো-কুড়ির অবস্থা সংকটজনক ... ওই যে দোকান দুটো! পুলিশ সিল করে দিয়ে গেছে।’

দোকান দুটোর সামনে তখনও বেশ ভিড়। আমার ছোট্ট ক্যামেরা দিয়ে চটপট দোকান দুটোর ছবি তুলে নিয়ে নতুন বন্ধুকে গিয়ে বললাম, যাদের বাড়ি থেকে বেশি অসুস্থ হয়েছে সেরকম একটা বাড়িতে নিয়ে যেতে পার?

‘বস্তিতে কিন্তু! পেছনের বস্তিটা দেখছ, ওখান থেকেই বেশি খদ্দের আসে এই দোকান দুটোয়। আমি একটা বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, যে বাড়িতে একজন ছাড়া সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যে সুস্থ আছে তার এক সপ্তাহ ওপর জ্বর। ভাত-টাত খাচ্ছে না বলে বেঁচে গেছে।’

ওই বাড়ি থেকে দারুণ হিউম্যান স্টোরি পাওয়া গেল। নামধাম সব বিভু লিখে নিল। তিনজন নাকি মর মর। ডাক্তারবাবুরা বলেছেন, বাঁচলেও সম্পূর্ণ সুস্থ আর কখনোই হতে পারবে না।

বস্তির ঘরে ঘরে কান্নার রোল। সোমেনকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার ক-জন বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথা বললাম। এলাকার কাউন্সিলরের সাক্ষাৎকার নিয়ে থানায় গেলাম। ওসির সঙ্গে দেখা করতে উনি সহযোগিতাই করলেন। পুলিশের বক্তব্য নোট করে নেওয়ার পর বললাম, ‘একটা অনুরোধ করব?’

ওসি আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, ‘অনুরোধটি কী আগে শুনি।’

‘তেমন কিছু নয়, দুই গণশত্রুর ছবি তুলে নেব?’

‘ওরা লকআপে। সেখানে ছবি তোলার পারমিশান দেওয়া যাবে না।’

‘তার মানে আপনি চান না, দেশের শত্রুদের মানুষ চিনে রাখুক।’

‘হোয়াট ডু ইউ মিন?’

আমার উত্তর শুনে ওসি কড়া চোখে আমার দিকে তাকালেন।

‘ভেরি সিম্পল। আপনি আমায় ছবি তোলার পারমিশানটুকু শুধু দিন। এই সব স্টোরিতে ছবি মাস্ট। সেই ছবি দেবার মালিক শুধু আপনিই। কেউ জানতেও পারবে না, অথচ আপনার একটা বিশাল সোসাল ওয়ার্ক করা হয়ে যাবে ...’

‘জ্ঞান দিচ্ছ নাকি ভাই। তা দাও। তা কীভাবে ওদের ছবি তুলতে চাও?’

‘আপনি ওদের ডেকে পাঠান। আমি এই ঘরেই ওদের ছবি তুলে নেব। প্লিজ আমায় হেল্প করুন। ওদের ছবি না পেলে রিপোর্টটা ঠিক দাঁড়াবে না। তা ছাড়া ওদের মুখ থেকে দু-একটা কথা বের করতে হবে তো।’

‘সর্বনাশ। তুমি ভাই কেটে পড়ো।’

‘লালবাজার থেকে পারমিশান আনলে দেবেন তো?’

‘সে তো দিতেই হবে।’

‘ঠিক আছে আমি অনুমতি আনিয়ে নিচ্ছি। আপনার টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি?’

‘তা পার! কিন্তু কাকে ফোন করবে?’

‘খোদ হোম সেক্রেটারিকে!’

কথা বলতে বলতে মোবাইলে ঘটকদাকে ধরে ফেললাম, ‘ঘটকদা আমি বুনো। ... বেহালা থানা থেকে! ... না না সে সব কিছু নয় ... তোমায় একটা উপকার করতে হবে ... আমি দুটো ক্রিমিনালের ছবি তুলে নিতে চাই। ওসিকে একটু বলে দাও না ... কী বললে তোমার বলাটা ঠিক নয় পুলিশ কমিশনারকে বলে দিচ্ছ ... ঠিক আছে থানায় ফোন করতে বলো। আমি ওয়েট করছি।’

কথা শুনতে শুনতে ওসির চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গিয়েছিল। বললেন, ‘হোম সেক্রেটারি তোমার রিলেটিভ নাকি?’

‘রিলেটিভের চেয়ে বেশি। একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? রেডি থাকুন এক্ষুনি পি সি-র ফোন আসবে।’

‘আর ফোনের দরকার নেই ভাই। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনি ছবি তুলে নিন।’ তুমি থেকে বিভু প্রমোশান পেয়ে আপনি হয়ে গেল।

ওসির কথা শেষ হতে-না-হতেই ফোনটা ঝন ঝন শব্দ করে বেজে উঠল, বিভু ভালোভাবে জানে, ফোনটা কার। ওসি ফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিতেই ও-প্রান্ত থেকে পিসি-র গলার স্বর শোনা গেল। বিভুর নাম বলে ওসিকে বললেন-যা হেল্প দরকার যেন উনি করে দেন।

‘হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর যা দরকার আমি স্যার এক্ষুনি করে দিচ্ছি। না স্যার, ওঁর কোনো অসুবিধে হবে না।’

ফোনটা রেখে ওসি সেকেন্ড অফিসারকে ডাকলেন, ‘স্যারের জন্য এক্ষুনি চা মিষ্টি আনতে বলুন আর কাউকে দিয়ে তেলের দোকানের মালিক দুটোকে এখানে পাঠিয়ে দিন। যান যান, স্যার অনেকক্ষণ বসে আছেন।’

‘না, না, ওসব দরকার নেই। লোক দুটোকে নিয়ে আসুন তাহলেই হবে। ওদের সঙ্গে একটু কথা বলব।’

আর কোনো অসুবিধা হল না। দুই দোকানদারের সঙ্গে কথা বলে ওদের দু-জনের ছবি তুলে নিয়ে বিভু উঠে দাঁড়াতেই ওসি বললেন, ‘স্যার, একটু বসুন চা-টা এল বলে।’

‘ওসব থাক। আপনি আমায় আর একটা ইনফরমেশান দিন। অসুস্থ লোকগুলো কোন হাসপাতালে আছে?’

‘যাদের অবস্থা ভালো নয় তারা সব পিজিতে। জনা-চারেক বাঙ্গুরে আর দু-জন এখানকার নার্সিং হোমে।’

‘আমি তাহলে একবার নার্সিং হোমে যাই।’

‘দাঁড়ান স্যার, আমি একজন ইন্সপেক্টারকে সঙ্গে দিচ্ছি। তাতে আপনার সুবিধে হবে।

‘সুনীলবাবু, আপনি স্যারের সঙ্গে যান। প্রথমে নার্সিং হোম তারপর পিজি। জিপসিটা নেবেন। দেখবেন ওঁর যেন কোনো অসুবিধে না হয়।’

জিপটা থানা থেকে বেরোতেই সুনীলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার একটা কৌতূহল মেটাবেন?'

আমি হাসিমুখে তাকালাম, 'কী ব্যাপার, বলুন।'

'না, ওসি তো আপনাকে পাত্তা দিচ্ছিলেন না। তারপর হঠাৎ কী হল?'

'কী আর হবে, বাধ্য হয়ে আমাকে ওপর মহলের হেল্প নিতে হল!'

'ওপর মহল?'

'ওই আর কি, হোম সেক্রেটারি, পিসি ...'

'ওরে বাব্বা! আপনি তো ডেঞ্জারেস লোক মশাই। দেখে তো বাচ্চা ছেলে মনে হয়।'

'সেটাই তো ঠিক-আমি কলেজে পড়ি।'

'মাই গুডনেস, এদিকে আবার রিপোর্টার।'

সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার থাকায় সুবিধেই হল। নার্সিং হোমে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে কথা বলে দারুণ তথ্য পেল বিভু। বিষ তেল খেয়ে অসুস্থ চারজনের প্রাণের আশঙ্কা কেটে গেলেও ওদের প্রত্যেকেরই প্যারালিসিসের সিম্পটম দেখা যাচ্ছে। সারা জীবন ওদের পঙ্গু হয়ে থাকতে হতে পারে। ভালো হবার অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হবার চান্স কম। পিজির ডাক্তারবাবুরাও একই কথা বললেন। সেই সঙ্গে একটা দুঃসংবাদ দিলেন, এদের যা অবস্থা তাতে মরে গেলেই বেঁচে যেত।

'কেন?'

'অল্পবয়স্ক কিছু ছেলে-মেয়ে আছে তাদের সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। কাজকর্ম কিছু করতে পারবে না। এ কত বড়ো শাস্তি বলুন দেখি। ওদের প্রত্যেকের ড্রিপ চলছে, অক্সিজেন দিতে হচ্ছে কয়েকজনকে।'

'কেউ মারা যেতে পারে?'

'বললাম তো, মারা গেলেই এরা বেঁচে যাবে।'

'তার মানে এদের কারও মারা যাবার চান্স নেই?'

'সে কথা তো বলিনি, কয়েকজনের অবস্থা খুবই খারাপ। এনি মোমেন্ট এক্সপায়ার করতে পারে। রাত্তিরে ফোন করলে বলে দিতে পারব।'

হাসপাতাল থেকে বিভু যখন বেরিয়ে এল তখন ঘড়ির কাঁটা ছ-টার ঘর ছুঁই ছুঁই। সূর্যদেব হাওড়ার দিকে গাছগাছালির আড়ালে ডুব দিলেন বলে। পিজি আর ময়দানের গাছে গাছে পাখিদের ঘরে ফেরার তাড়া চেঁচামেচি। রবীন্দ্রসদনের সামনে ফ্লাইওভার তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। বাস-টাস বন্ধ; সুনীলবাবু বললেন, 'আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিই?'

'না, না-আপনি ফিরে যান। আমার জন্যে আপনার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।'

'ওসি আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিতে বলেছেন।'

'বেহালায় টেনশন আছে। সকালে তো থানার সামনে স্থানীয় লোক বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। আবার গোলমাল হতে পারে। তাহলে কিন্তু খবর দেবেন!'

'সে আর বলতে! তাহলে আমি ফিরে যাব? আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

'কী যে বলেন। থ্যাঙ্ক ইউ ফর কোঅপারেশন।'

'ওয়েলকাম ইউ স্যার!' সুনীলবাবু চলে গেলেন। জিপসিটা চোখের আড়ালে চলে যেতেই বিভু অফিসের পথ ধরল।

বিভু যখন অফিস পৌঁছোল তখন প্রায় সাতটা বাজে। বিজয়দারই চোখ সবার আগে ওর ওপর পড়েছিল। বললেন, 'বিভুবাবু তাহলে অফিসে এলেন। এত রাত দেখে ভেবেছিলাম বুঝি ডুব মারলেন।'

বিভু বিজয়দার কাছে জিজ্ঞেস করল, 'কানাইদা আসেননি? অফিসে দেখছি না তো?'

কানাইদা দক্ষিণ ২৪ পরগনার করেসপনডেন্ট। বেহালা ওঁর বিটেই-'উনি কোনো খবর করেছেন কি না জানার দরকার।'

বিজয়দা বললেন, 'আজ বিশেষ কোনো খবর নেই বলে সন্ধ্যে বেলায় চলে গেছে। তা ওকে খুঁজছ কেন?'

'না, মানে, বেহালায় একটা বড়ো খবর ... উনি কি কিছু দিয়েছেন?'

'বেহালার খবর। কই না তো! কানাই তো কিছু দেয়নি। তা খবরটা কী?'

'বিভুর তো আজ একটা বড়ো খবর দেবার কথা! কিছু বলছে নাকি বিজয়বাবু?'

'হ্যাঁ, বেহালার কী একটা খবরের কথা বলছে। কানাইকে খুঁজছিল ও কিছু দিয়েছে কি না জানতে চাইছিল।'

'দ্যাটস গুড। বেহালা কানাইয়ের বিট ও জানে। তা খবরটা কী?'

'বিষ তেল খেয়ে দেড়-শোর ওপর মানুষ অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে, কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। থানায় বিক্ষোভ, গণ অবস্থান। দু-টি দোকানের মালিক গ্রেপ্তার। ওই অঞ্চলের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত।'

'বল কী, এ তো বিরাট খবর! ক-টা স্টোরি দেবে?'

'মিনিমাম চারটে। পাঁচটা হতে পারে।'

'ছবির কী হবে?'

'আমি কয়েকটা তুলেছি। ভালো হবে না।'

'যা হবে তাই যথেষ্ট। নৃপেনকে ডাকছি, রোলটা ডেভালাপ করুক, তুমি লিখতে শুরু করে দাও। এইটাই লিড নিউজ হবে।'

বিভু নিজের সিটে গিয়ে বসতেই শ্যামদা বললেন, 'এন ই কী বলছিলেন রে?'

'মেন নিউজ চাইছিলেন।'

'তোর কাছে মেন নিউজ? কোথা থেকে এলি?'

'বেহালা।'

'বেহালা! ওটা তো কানাইয়ের বিট! ও তো বেহালার কোনো খবরের কথা বলল না।'

বিভু আর কথা বাড়াল না। দ্রুত লিখতে লাগল। মেন নিউজটা একটু বড়ো করে লিখতে হবে। কী লিখবে, অফিসে আসতে আসতে বিভু তা ঠিক করে নিয়েছে। মনে মনে একটা হেডিং ঠিক করে নিয়েছে বিভু, বেহালায় বিষ তেল খেয়ে দেড়শতাধিক মানুষ

অসুস্থ, সংকটজনক অবস্থায় কুড়ি জন, থানায় বিক্ষোভ, দুই দোকানদার গ্রেপ্তার। দ্বিতীয় স্টোরি, ওই অঞ্চলের মানুষের মনে আতঙ্ক, তৃতীয় : দুই দোকানদারের সাক্ষাৎকার ও ওসির বক্তব্য, চতুর্থ: হাসপাতালের দৃশ্য, পঞ্চম : ডাক্তারদের মতে সকলেই পঙ্গু হয়ে যাবে।

পাঁচটা স্টোরি লিখতে লিখতে ন-টা বেজে গেল। ইতিমধ্যে ছবিগুলোর প্রিন্ট হয়ে গেছে। নৃপেন এসে ক্যাপশান করিয়ে নিয়ে গেছে। ছবিগুলো ভালোই এসেছে। নিউজ এডিটর নিজে পেজ ওয়ানের জন্য তিনটে ছবি বেছে নিয়েছেন। বাকি ছবি দুটো যাবে ভেতরের পাতায়।

বিভু উঠে গিয়ে বিজয়দার হাতে নিউজগুলো দিল। নিউজগুলোর সাজেসটিভ হেডিং দেখতে দেখতে বিজয়দা নিজের মনে বললেন, 'এত বড়ো ঘটনা ঘটে গেছে। কানাই কোনো খবরই পায়নি। আশ্চর্য!'

কল্যাণ আজ সারাদিন রাইটার্সে ছিল। তাকে ডাকলেন বিজয়দা-বললেন, 'কল্যাণ বেহালার ব্যাপারে কেউ কোনো খবর দেননি?'

'না বিজয়দা!'

'তোমার সঙ্গে ফুড মিনিস্টারের দেখা হয়েছে আজ?'

'হ্যাঁ, কীসব গম কেনার কথা বলছিলেন।'

'আশ্চর্য, রাইটার্সেও কেউ কিছু জানে না। নেহাত ছবিগুলো সঙ্গে আছে তাই, নাহলে বিভুর খবরটা বিশ্বাস করতে চাইত না। এত বড়ো ঘটনা-কেউ কিছু জানল না এটাই-বা কী করে হবে!' বিভুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বেহালায় কখন গিয়েছিলে?'

'তা তখন প্রায় একটা বাজে! তারপর থানায় গিয়ে কাজ সারতে সারতে সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছিল।' ওসি সঙ্গে একজন অফিসারকে দিয়ে দিয়েছিলেন বলে নার্সিং হোম আর হাসপাতালে ও যে খানিকটা বাড়তি সুবিধে পেয়েছিল সে কথাও জানায় বিভু।

'অতবড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেছে তুমি জানলে কী করে?'

'আমি এক আত্মীয়র বাড়ি গিয়েছিলাম। ওখানেই প্রথম শুনি। তারপর একে ওকে জিজ্ঞেস করে আর সাক্ষাৎকার নিয়ে ডিটেলস পেয়ে গেছি। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন বিজয়দা?'

'কানাই কেন খবরটা পেল না তাই ভাবছিলাম। রাইটার্সে কোনো খবর নেই। ব্যাপারটা কেমন যেন একটু ফিশি লাগছে।'

'তা লাগতে পারে, তবে খবরটার একটা শব্দও যে বানানো নয় তা আমি জোর গলায় বলতে পারি।'

'না, না সে কথা নয়। আমি ভাবছিলাম, এত বড়ো খবর আর কেউ কিছু পেল না, এটা অবাক হবার বিষয় নয়?'

'আমাদের কাগজের দিক দিয়ে তো ভালো।'

'তা ঠিক! যদি স্কুপ হয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই।'

প্রায় তাই হল। বিভুর খবর প্রায় স্কুপ। একটা কাগজে শুধু ছোটো একটা নিউজ ছিল, তেল খেয়ে অসুস্থ-তাও ভেতরের পাতায়। ব্যাপারটা যে এত মারাত্মক ছোট্ট ওই খবরটা পড়ে তা বোঝার উপায় ছিল না।

প্রথম ফোনটা এল ঘটকদার, 'হ্যাঁরে, এত বড়ো খবর আমায় একটু জানালি না তো?'

'আমি ভেবেছিলাম তোমরা জান। থানায় বিক্ষোভ হল-তাও লালবাজারে জানায়নি। আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

'তুই আজ যাবি নাকি? দু-জন মিনিস্টার যাবেন। সি এম ডিটেলস রিপোর্ট চেয়েছেন, থ্যাঙ্ক গড, এখনও কেউ মারা যায়নি।'

সাউথ ২৪ পরগনা কানাইদার বিট। তাই আমি আর ও মুখো হচ্ছি না। আজ তাড়াতাড়ি কলেজে যাব। প্রথম ক্লাসটা না করলে নয়। অনেকদিন কামাই হয়ে গেছে।

ঘটকদা ফোন রাখতেই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। নিউজ এডিটরের ফোন, 'কনগ্রাচুলেশন্স। দারুণ খবর হয়েছে। কানাই ফোন করেছিল। ওকে ফলোআপ করতে বলেছি। কাল খুব খাটাখাটনি গেছে। আজ একটু বিশ্রাম নাও। বিকেল বেলায় অফিসে এসো। তারপর কলেজে চলে যেয়ো।'

বিভু ভীষণ অবাক হল। নিউজ এডিটর তো খবর ছাড়া কিছু বোঝেন না। তিনি বিশ্রাম নিতে বললেন। বিভুর মনে হল, নিউজটা তাহলে খুব খেয়েছে!

*অগ্রহায়ণ ১৪১০*



# মিমি রাধাকৃষ্ণণ

গরমের ছুটিতে সদলবলে যখন পাহাড়ে যাবার প্ল্যানটা একেবারে পাকা হয়ে গেল তখনও কিন্তু আমরা জানতাম না যে এবারের গ্রীষ্মাবকাশটি ঠিক কোন জায়গায় হবে, তবে দার্জিলিং-এর দিকে একেবারেই নয়। কারণ, মিঠুদিদের ওখানে বাড়ি থাকায় গত চল্লিশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত শুধু আমাদের পরিবার নয়, বন্ধু তৎবন্ধু, তৎসহ তাদের আত্মীয় অনাত্মীয়, চেনা আধাচেনা পুরোপুরি অচেনা প্রত্যেকে, রিচি রোডের মামার বাড়ি থেকে চাবি নিয়ে গিয়ে পাইনবনের হাওয়া খেয়ে এসেছে। আর আমাদের তো কথাই নেই। গড়িয়াহাটের মোড়েও বুঝি অতবার যাইনি, যতবার গিয়েছি দার্জিলিং। বারবার গিয়ে, অলিগলির সাইনবোর্ড, লাইটপোস্টও সব চেনা।

গাড়োয়ালের দিকে যাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু বেবিদি একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠল 'খেপেছিস? খবরের কাগজ পড়িসনি, দু-দিন অন্তর ওইদিকে ভূকম্প। অত কষ্টে পাহাড়ে উঠে, শেষে ঝাঁকানিতে টুপটাপ ঝরে পড়ি আর কি! আর একবার সমতলে পড়লে আবার কী বেয়ে-ছেয়ে ওপরে ওঠার এনার্জি থাকবে? তার চেয়ে চল নীলগিরি।'

খুকুদি বলল, 'বেবির মাথাটা গিয়েছে। এই গরমে, ওই সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত জ্বলতে জ্বলতে যাব? পৌঁছোনোর আগেই হিট স্ট্রোক। নীলগিরি, লালগিরি ওসব একেবারে বাদ।'

বুড়িমাসি বলল, 'কুলু-মানালি।' এবার তো সবাই ছ্যা ছ্যা করতে শুরু করল। গরমের সময় বড়ো বড়ো হিল স্টেশনগুলো নাকি একেবারে ছাব্বিশ পল্লির পুজো প্যান্ডেল। শুধু ভিড় এবং তার নব্বই ভাগই অবশ্যই বাঙালির, মারামারি ঠেলাঠেলি। তা তার জন্য অতদূর যাবার দরকার কী, ভবানীপুর, শেয়ালদা, মানিকতলা যেখানে ইচ্ছে থাকা যায় হোটেল ভাড়া করে।

শেষে অনেক কাপ কফি, দুশোগ্রাম ডালমুট, তার সঙ্গে ঘুগনি, নিমকি, জিভেগজা একেবারে তলানিতে আসার পর মোটামুটিভাবে ঠিক হল, হিমাচলেই যাওয়া হবে। তবে বড়ো শহরে নয়। ছোটোখাটো কোনো সুন্দর পাহাড়ে।

বেচারা টুনুদি জানতেও পারল না যে তাকে ঘুণাক্ষরে না জানিয়েই সব ঠিক করা হল। আর সেই নাকি দিল্লি থেকে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। কারণ, টুনুদির বর বেশ হোমরাচোমরা সরকারি আমলা।

আমরা প্রথমে দিল্লি যাব। সেখান থেকে কালকা হয়ে একেবারে পাহাড়ে। দিন দশেকের ট্রিপ, আবার দিল্লি হয়ে ফেরা। এত চেঁচামেচি, হল্লাবাজির পর, এই সিদ্ধান্তটুকুতে অন্তত আসবার পর সবাই এমনই নিশ্চিন্ত হল যেন হাতে টিকিটই এসে গিয়েছে, সঙ্গে হোটেল বুকিংও। আয়েশে হাই তুলে আর একপট গরম চা শেষ করে সভাভঙ্গ হল-তাহলে সেকথাই রইল, বিশ তারিখ রিচিং, ত্রিশ তারিখ ব্যাক? ডান।

সত্যি এলেম আছে টুনুদির। ওই ক-দিনের নোটিশে এই গরমের আক্রায়, কোথা থেকে কী করে যে এমন চমৎকার ব্যবস্থা করে ফেলল, ভাবতেও অবাক লাগে।

গতকাল সকালে দিল্লি পৌঁছে, সারাটা দিন টুনুদির বিরাট সরকারি বাংলোয়, গা মুড়মুড়ি দিয়ে, হাই তুলে, আঙুল মটকিয়ে আড্ডা হল। শেষে, রাতে ট্রেনে চেপে কালকায়।

ওখান থেকে গাড়ি চেপে সোজা নাড়কান্ডায় আসতে পারতাম, কিন্তু বাচ্চাদের এবং বড়োদের এবং প্রায় বুড়োদের প্রবল ইচ্ছেতে, টয়ট্রেনে চেপে এলাম সিমলা। সেখানে একটু ঘোরাঘুরি করে, গাড়ি আগেই ঠিক করা ছিল, তাতে করে একেবারে গন্তব্যে।

তবে আমরা যে জায়গাটাতে আছি সে ঠিক নাড়কান্ডাতে নয়। নাড়কান্ডা থেকে সামান্য পথ গিয়ে যে সরকারি অতিথিশালা 'হোটেল হাটু' তার থেকেই বাঁ-হাতে সরু একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে মনে হয় যেন গ্রামের দিকে চলে গিয়ে বুঝি বা হারিয়ে গিয়েছে, সেই রাস্তার শেষে একটা বিরাট পাহাড়ের গায়ে ছোটো উপত্যকা। তার মাঝে আপেল, নাশপাতি, চেস্টনাটের বাগান। আর তারই ভিতর বিরাট, যাকে বলে কলোনিয়াল বাংলো।

সবুজ রং-করা টিনের ছাদ, ফায়ার প্লেস, আলিসান সব আসবাব, পোর্সেলিনের ক্রকারি, বাথটাব। খাবার ঘরের বিশাল ওভাল টেবিলে, যখন রাতে আমরা বসলাম, মনে হল, বুঝি-বা টেবিলের অর্ধেকও ভরেনি।

আমরা বলতে অবশ্যই আমি, আমার জেঠতুতো দিদি বেবিদি, আর মাসতুতো দুই বোন, মিঠুদি, নুটুদি। আমাদের আরেক কাকার মেয়ে খুকু। তার বুড়িমাসি, বুড়িমাসির হস্টেলতুতো বোন ছুটকি, আর কে না জানে হস্টেলতুতো বোনেরা নিজের বোনের থেকেও কোনো কোনো সময় বেশি বোন হয়। টুনুদি আসতে পারল না, তবে তার প্রাণের বন্ধু কাজরি, ওরফে কাজুদি এসেছে। আর তার সঙ্গে খান কয়েক বাচ্চা। আমার তেরো বছরের ছেলে ভুটিয়া, খুকুদির পনেরো বছরের মেয়ে বেগম, ছুটকি আর কাজুদির আঠারো আর ষোলো বছরের ছেলে পাবলো আর ঘন্টু।

প্রথমদিন আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে গেল। চা, কেক খেয়ে যে যার মতন প্রকৃতি পরিদর্শনে বেরোলাম। পাহাড়ের তুলনায় বেশ বড়ো লন সামনে। বাচ্চারা ব্যাডমিন্টন খেলতে শুরু করল। বেগম আবার খানসামার ঘর থেকে এক কুকুর জোগাড় করেছে, সাদা লোমওয়ালা, তারও নাম নাকি বেগম। পাবলো খেপাচ্ছে, ওকে দেখার আগেই ওর নামে কুকুর পুষছে ব্যাপারটা কীরকম? বেগম প্রচণ্ড প্রতিবাদ করছে যে, মুখ ফসকে নাকি বলে ফেলেছে, আসলে নাম নাকি পাবলো। তা নাকি কেউই মানছে না। আর যাকে নিয়ে এত হুল্লোড় সে বেচারা দুই নামেই লেজ নাড়ছে। এমনকী ভুটিয়া বা ঘন্টু বলাতেও ততটাই উৎসাহ। আসলে এমন পাণ্ডববর্জিত পাহাড়ে একসঙ্গে এতগুলো লোক দেখে বেচারা একেবারে দিশাহারা।

কথাটা ঠিকই। নাড়কান্ডা থেকে আর কতটুকুই-বা পথ, দু-তিন কিলোমিটার হবে, পাহাড়ে ঠিক আন্দাজ করতে পারি না। তবে এই সামান্য দূরত্বেই জায়গাটা যেন কোন সুদূর বলে মনে হয়। এর পজিশনই এমন, আশপাশে কোনো লোকালয়ই দেখা যায় না। নাড়কান্ডার আলো দেখতে হলেও, মাইল খানেক এগিয়ে যেতে হবে 'হাটুর' দিকে।

তবে লোক দেখতে তো আমরা আসিনি হাঁচড়েপাঁচড়ে এতদূর? কলকাতায় যেন লোকের অভাব! লোকের ঘাড়ের পাশ দিয়ে বগলের ফাঁক দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে যা দেখা যায়, তাও ওই লোকই। সুতরাং এই নিরিবিলি পাহাড়ে আমরা দশ দিন ধরে শুধু

ঠান্ডায় কেঁপে কেঁপে পাহাড় দেখব, আর ঘুরে বেড়াব, তৈরি খাবার খাব, তৈরি বিছানায় ঘুমাব। আর পায়ের উপর পা দিয়ে গপ্পোগুজব করব।

গল্পের আমাদের শেষ নেই। নামকরা আড্ডাবাজ বাড়ি আমাদের। ছেলেরাও যাদের বিয়ে করে আনে তারাও আড্ডাবাজ হয়, আবার মেয়েরা যে বাড়িতে বিয়ে হয়ে যায় তারাও আড্ডাবাজ হয়। এককথায় রসিক মানুষেরাই আমাদের বাড়ির বন্ধু হয়। ফলে এ বাড়ির বারোজন বোঝাই হয়ে যেখানে যাবে, সেখানে আর কারোর দরকারই নেই। দরকার শুধু জোগানদারের। সে এখানে আছে। এ বাড়ির রক্ষক-জন। কেরালার ক্রিশ্চান, কুক কাম কেয়ারটেকার, বউ মেরিয়াপ্পা তার সহকারী, সপরিবারই থাকে এখানে।

ঘরদোর ঝকঝকে, বেল টিপলেই বাথরুমে গরমজল থেকে খাবার টেবিলে গরম গরম চিকেন রোস্ট তৈরি। আমরা আহ্লাদে একেবারে আটখানা।

নুটুদি সঙ্গেসঙ্গে ঠিক করল, আগে কলকাতায় জানিয়ে দিতে হবে আমরা আরও এক মাস ছুটি বাড়ালাম, পরে সময় মতো টুনুদেরকেও জানিয়ে দিলেই হবে, ব্যবস্থা পাকা করে দিতে। সরকারি বনবাংলো, শেষে গরমের ছুটি দেখে কোনো মিনিস্টারের শ্যালক এসে, দরজায় খটখটাবে। দরকার কী?

তবে এর খবর বোধ হয় তেমন কেউ জানে না। এমনকী নাড়কান্ডার মানুষেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। কেবল 'হাটুবাংলো'র চৌকিদারের বুড়োবাবা ভাগ্যিস হাত তুলে এদিক পানে দেখিয়ে দিল। এ জায়গার কী একটা যেন নাম আছে, পানকা, নাকি নানচি বা গামপু। অদ্ভুত নাম মনেও থাকে না। বুড়ো বলেছিল বটে। তবে এটা যে রুলেট সাহেবের বাংলো মনে আছে।

সন্ধ্যে হবার আগে আমরা যখন বেড়াতে বেড়াতে নাড়া ফটক পর্যন্ত হেঁটে এলাম, বোর্ডে দেখলাম 'রুজভেল্ট কটেজ' উনিশশো বিশ।

এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ঝুপ করে সন্ধ্যে নামল, আর আমরাও বাড়ি ফিরে যার যার ন্যাপথলিনের গন্ধমাখা গরমজামা মোজা টুপি মাফলারে নিজেদের সাজিয়ে গুজিয়ে হলঘরের ফায়ার প্লেসের সামনে বসলাম। যদিও আগেই বলা ছিল। তবু কায়দা করে 'টিং' করে বেল টিপে জনকে বলা হল, ঠিক সাড়ে আটটায় ডিনার লাগাতে। জন যেন দরজার বাইরেই ছিল 'জি মেমসাব' বলে বেরিয়ে গেল। অবশ্য বেরিয়ে গেল না বলে মিলিয়ে গেলই বলা যায়। কারণ, আমাদের ঘরে ছাড়া কোথাও আলো নেই। বড়ো দরজার বাইরেটা ঘন অন্ধকার। ওদিকটাই তো খাবার ঘর, প্যানট্রি। রান্নাবান্নাই বা হচ্ছে কোথায় কে জানে, এই ঘুরঘুটে অন্ধকারে?

সকাল থেকে কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! আকাশ কালো, যেন গভীর রাত। দু-হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। জানলা দরজা বন্ধ, তবু মনে হচ্ছে বৃষ্টি যেন আছড়ে পড়ছে। এমন বৃষ্টি পাহাড়ে কমই হয়। আর যদি হয় তো চিন্তার বিষয়।

আমাদের চিন্তা অবশ্য তেমন নেই, কারণ রাস্তায় ধ্বস নামলেও দশ দিনে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর খাবারদাবার নিশ্চয়ই মজুদ আছে, নয়তো এমন এলাহি ব্যবস্থাটা হচ্ছে কী করে? এসব নিয়ে চিন্তা না করলেই হয়। যত চিন্তা তত মাথা ব্যথা।

সকালে চা কফি দুধ ওভালটিন যার যার মতন খেয়ে, ন-টা নাগাদ আকাশ একটু পরিষ্কার হতে, জন টেবিল সাজিয়ে ডাকল। ব্রেকফাস্টে বিশাল টেবিলে কী নেই? জ্যাম

বোধ হয় পাঁচ রকমের, ক্রিস্পি টোস্ট, গরম পরিজ, যার যার পছন্দমতন ডিসের বাহার। জন তৎপর হয়ে সাজিয়ে যাচ্ছে সব।

নুটুদি একবার থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসাও করল, 'জন, এত সব জোগাড় করলে কোথা থেকে, বাজার হাট ধারেকাছে আছে?'

জনের সেই একনাগাড়ে মিষ্টি হাসি আর একটু বিস্তৃত হল। 'বাঃ, আপনারা সব আসবেন। এটুকু জোগাড় তো করতেই হয়।' এ যদিও কোনো উত্তর নয়, তবু তা শোনার আগ্রহও আমাদের নেই। নিজেদের গালগল্পে মেতে আছি, বাইরে তুমুল বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সকালের টেবিল যখন ছাড়লাম, তখন এগারোটা প্রায় বাজে। যদিও তা বুঝবার কোনোই উপায় নেই।

দুপুরে খাবার পর বেবিদি একবার বলল, 'কলকাতায় একবার ফোন করা উচিত ছিল, আমরা যে সব ভালোমতো পৌঁছেছি।'

খুকুদি সঙ্গেসঙ্গে বলল, 'টুনুদি নিশ্চয়ই জানিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে।' পাবলো যখন বলল টুনুমাসিই বা জানবে কী করে, খুকু জবাব দিল, সে নাকি ওরা সব জানে, দিল্লির সরকারি আমলা বলে কথা। আমরাও আর কিছু বললাম না, কারণ এটা মেনে নেওয়াই সব থেকে সুবিধের। এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে কে যাবে ফোন করতে? আর যাবেই বা কেমন করে?

জন ফায়ার প্লেসে দুটো কাঠ গুঁজতে এসেছিল, বলল, ওকে নাম্বার দিলে ও জানিয়ে দেবে। কাজুদি সঙ্গেসঙ্গে টুনুদির দিল্লির ফোন নাম্বার লিখে ওর হাতে দিয়ে দিল। ওখানে করাই সব থেকে ভালো, একজন খবর পেলে সব বাড়িতে জানিয়ে দেবে। সরকারি ফোনে তো আর পয়সা লাগে না!

ছুটকিদি হঠাৎ বলল, 'এই বাদলায় ওকে পাঠালি, বুথ কি আর খোলা থাকবে, আর সেও তো সেই নাড়কান্ডায়। অতদূর যাবেই বা কী করে?'

বুড়িমাসি বলে উঠল, 'আমরা তো আর ঠেলে পাঠাইনি, ও-ই তো যেতে চাইল, পাহাড়ে থাকে। চৌপর পাঁচ-সাত মাইল ওঠানামা করে, এতে ওদের মোটে কষ্ট হয় না।'

আমরাও কথাটা স্বীকার করলাম, সত্যি তো আমাদের মধ্যে কে-ই বা যাবে! অচেনা রাস্তায় এই বৃষ্টিতে, পা পিছলে কোথায় যেতে কোথায় যেয়ে পড়বে। ওদের সব অভ্যাস আছে।

ফায়ার প্লেসের আগুনের তাতে আমাদের বড়ো আরাম লাগছিল। স্যাঁতসেঁতে ভাব চলে গিয়ে ঘরটা গরম আর আমরাও হাত-পা সেঁকে, সোফা-টোফায় বসে গল্পের জন্য তৈরি।

ছুটকিদি বলল, 'আমি বিছানায় যাব না, তবে এখানে বসেই একটু জিরিয়ে নেব। কাল রাতে তোরা কে কেমন ঘুমিয়েছিস জানি না, আমি মোটে ঘুমোইনি। সারারাত কুকুরটা কেমন কেঁদেছে, আর কেউ যেন হাঁটাচলাও করেছে বাপু বারান্দায়। চৌকিদারই হবে। টর্চের আলো একেকবার চোখে পড়ছিল। আমি জানালার ধারেই ছিলুম কিনা?'

আমরা সমস্বরে বললাম, 'সকালে দেখেছি, ছুটকিদির চোখমুখ ফোলা, খুব ঘুম হয়েছে সারা রাত, এখন মোটেই ঘুমালে চলবে না।'

মুখে বললাম বটে, তবে, মন থেকে খুব একটা চেঁচাতে পারলাম না। কারণ, ঘুম আমারও ভেঙেছে কয়েকবার। শুধু তাই না একবার জানলার ধারে গিয়ে বাইরেটা দেখারও চেষ্টা করেছিলাম। ঘুমের ঘোরের জন্যই বোধ হয়, কিচ্ছুটি দেখতে পাইনি, বাদে কিছু এর-ওর ঘাড়ে পড়া বড়ো বড়ো গাছ। ও ঘর থেকে বুঝি বাগান মোটেই দেখাই যায়

না। কেবল পেছনের বিটকেল খাদ। হাঁটতে চলতে কাউকে দেখিনি অবশ্য, কিন্তু একটা টিবির ওপর, বিকেলের দেখা সাদা ফুটফুটে কুকুরটাকে দেখেছিলাম, ওপর পানে মুখ তুলে কাঁদছে। এমন অলুক্ষুণে কান্না কাঁদে শুনেছি এদের মনিব-টনিব মরে গেলে। শুনেও কেমন জানি গা ছমছম করে বাবা!

এই কুকুরের কান্না থেকেই শুরু হল আমাদের আষাঢ়ে ভূতের গল্প। যার কাছে যত স্টক, অফুরন্ত। বাচ্চারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে, আমরাও হাত-পা কম্বলে ঢেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

কবে, কার ছাতে এক পায়ে ঠক ঠক শব্দ হত, রোজ রাতে। শেষ দেখা গেল ডাক্তারি পড়া ছোটোপিসি, যে কঙ্কালটা এনেছিল অ্যানাটমি পড়তে, তার একটা পা সাদা প্লাস্টিকের হাড় দিয়ে তৈরি। অথবা লাশকাটার ঘরে যে সার বাক্সবন্দি বেওয়ারিশ মরা থাকে, তার মধ্যে একটি দিন দিন আয়তনে বাড়ছে, এদিকে স্টুডেন্টদের টিফিন বাক্স ফাঁকা।

এসব গল্প হচ্ছিল বটে, তবে বেশিটাই হাসাহাসি। কঙ্কালটা একপায়েই হাঁটত, নাকি ক্রাচ নিয়ে; ছেলেপুলেদের ঘেন্নাপিত্তি বলেও কি কিছু নেই, মড়া-কাটা টিফিন বাক্স ঘরে নিয়ে খায় কোনো বিটকেল শখে, ইত্যাদি।

এই কথা সেই কথা, হাজার কথার মাঝে, কথায় কথায় জনের কথাও উঠল। এই যে নির্বান্ধব পুরীতে পড়ে আছে, এ কেমন কথা, বলি সরকারি চাকরিই তো, তা বদলি নেয় না কেন? আর লাটসাহেবের ব্যবস্থাই বা হচ্ছে কোথা থেকে, ফরেস্ট বাংলোয় একেবারে সার্কিট হাউসের ব্যবস্থা। শুধু সার্কিট হাউস কেন? বলা যায় গভর্নর'স হাউস। এই খাবার এই বিছানা, এই সুবিধে, এসব ব্যবস্থার জন্য চাই খান দশেক লোক। এখানে তো ওর বউকেও দেখলাম না?

খুকুদি বলল, 'মারিয়াপ্পা কোথায় জিজ্ঞেস করাতে ওদিক পানে হাত তুলে দেখিয়েছে। বর বেচারা খেটে খেটে মরে, বউটি কেন বসে থাকবে সারাদিন?'

ভুটিয়া বলল, জন আঙ্কেল কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করাতেও নাকি ওই দিকটাই দেখিয়েছিল। বল কুড়োতে ওদিকে গিয়ে দেখে, বাড়িঘর কিছু নেই, শুধু আপরুটেড কিছু বিশাল বিশাল গাছ।

কাজুদিরও নাকি চিরকুটটা দিতে জনের হাতে হাত লেগেছিল, বাবারে কী ঠান্ডা, কী ঠান্ডা! ফায়ার প্লেসে কাঠ গুঁজেও অত ঠান্ডা, তো বাসন ধুলে কী হবে, নুটুদি বলল, 'কাঠ দিয়েছিল তো, ভালো করে দেখেছিস, পা গুঁজে দেয়নি তো আবার?' বুড়িমাসি বলল, 'রোসো, ফিরে আসুক, দুটো লেবু পাড়তে বলি।'

বলছি বটে অনেক কথাই, তবে আমার মতন অন্যদেরও মন কী বলছে জানি না। প্যানট্রির দিকে গিয়েছিলাম কৌতূহলবশত, ধুলোপড়া, মাকড়সার জালে ঢাকা অমন প্যানট্রি সচরাচর দেখিনি। রসুইখানাটি দেখার সৌভাগ্য হয়নি অবশ্য। সে নাকি বাংলোর বাইরে। এই ঝড়বাদলায় ওদিক থেকে আসা-যাওয়া ...!

গল্পে গল্পে বিকেলের চা নাস্তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম সব, নাকি জটলা ছেড়ে নড়বে না বলে কেউ। ফলে যা ডালমুট, বিস্কুট ছিল, সে সবই জড়ো করে রেখেছি, যদি বাচ্চারা খায়। এর মধ্যেই কখন নিঃশব্দে জন এসে দুধের জাগ চা কফির পট রেখে সামান্যক্ষণ

দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের সবার কেমন মুখ থেকে কথা বেরোল না। খটখটে শুকনো জামা কাপড়ে বিনীত হেসে জানিয়ে দিল খবর দিয়েছে, আর রাতে কখন খাবার দেবে।

আমরা একবারও জিজ্ঞাসা করলাম না খবরটা দিল কোথা থেকে আর কেমন করেই বা গেল। খুকুদি শুধু কোনোমতে বলল, রাতে যেন শুধু রুটি ভাজি করে, কারোর তেমন খিদে নেই। নামকাওয়াস্তে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়বার কথাই ভাবছিলাম। এমন সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি বাবা জন্মে দেখিনি। গুম গুম শব্দ, হুড়মুড় গাছ ভাঙছে, বিদ্যুতের আলোয় বাইরে সাদা হয়ে যাচ্ছে। ঘরে অবশ্য আলো আছে, আর আছে নির্বাক বেরসিক একডজন ছেলেপুলে আর তাদের মা-মাসিরা।

জন ঘরে ঘরে সেজবাতি রেখে যাচ্ছিল। শেষে বলল, 'এখন মোটে ন-টা বাজে, আরও তিন-চার ঘণ্টা আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমার বারণ করবার ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই করতাম, তবে এসে যখন পড়েইছেন দেখি কতটা কী করতে পারি।' দরজা দিয়ে চলেই যাচ্ছিল, তবু কী মনে করে দাঁড়াল আর একেবারে সরাসরি আমার চোখের দিকেই যেন তাকিয়ে বলল, 'আপনারা ভূতের গল্প করছিলেন না? ভূত বিশ্বাস করেন নাকি?' আমাদের যার যার গলা দিয়ে যা বেরোল তাতে, হ্যাঁ না কিছুই স্পষ্ট হল না। জন আবার হাসল, বেশ করুণই দেখাল হাসিটা। 'বিশ্বাস অবিশ্বাসে কী আসে যায়। গল্পগুলো তো সত্যিও হয়, আবার সত্যি কথাও গল্প হয়ে যায়, গুড নাইট।' বলে বাইরে চলে গেলে আমরা এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, যার যার ঘরে ঢুকে লেপমুড়ি দিলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, ভোরের দিকেই বোধ হয় কীসের আওয়াজে নাকি ধাক্কায় ঘুম-টুম ভেঙে চিৎকার করে সব উঠে বসেছি, বাড়িঘর তখন দুলছে। টিনের চাল যেন উড়ে যাবে, কড়কড় আওয়াজ। গুম গুম শব্দ বেড়েই চলেছে। আলো নেই। সবাই ভয়ে থরথর করে কাঁপছি। সামনে যাকে পেয়েছি তারই হাত ধরে হাতড়িয়ে দরজা খুলে একেবারে বাগানে।

কোথা থেকে কী ভেঙে পড়ছে, ঝনঝন, হুড়মুড় শব্দ। কিন্তু বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে। বিদ্যুতের আলোয় ওরই মধ্যে মাথা গুনে বারোজন হতেই, সামনের পায়ে-চলা নুড়ি পাথরের রাস্তা ধরে প্রাণভয়ে পালাচ্ছি, কোথায় জানি না।

রাত মনে হয় শেষ হতে চলেছে, কারণ অন্ধকার কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। নুটুদি কেবলই বলে চলেছে, আর একটু যেতে পারলেই 'হোটেল হাটু'। ওখানে লোকজন আছে। কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।

যত এগুচ্ছি তত রাস্তা পরিষ্কার, সামান্য ঝিরঝিরে বৃষ্টি, আর আলোও ফুটছে। ভয়ে ভাবনায়, হা ক্লান্ত, ছানাপোনা নিয়ে আমরা যখন পাকা রাস্তায় পৌঁছোলাম, মেঘ কেটে তখন ভোরের প্রথম রোদও দেখা দিয়েছে।

পাহাড়ের মানুষেরা নিজের নিজের কাজে বেরিয়ে কাকভেজা আমাদের দলটার দিকে কৌতূহলে দেখছে। তারাই শেষে রামপুরের বাস হাত দেখিয়ে থামিয়ে, খানিক দূরে আমাদের নাড়কান্ডার ট্যুরিস্ট লজে তুলে দিয়ে গেল। শীতে ভয়ে নীল মুখগুলো খুলে কোনোক্রমে আমরা বলতে পারলাম, 'ভাই আমাদের কাছে পয়সা নেই, শুধু একটু ফোন করতে দাও, দিল্লিতে খবর দেব।'

ধোপদুরস্ত ম্যানেজার হাসিমুখে, আমাদের বড়োদুটো ঘর আর ডর্মিটরি খুলে দিতে বলে 'সামান' ভেতরে রেখে দিতে বলল। ভ্যাবলা চোখে তাকিয়ে দেখি, সার সার আমাদের স্যুটকেস, ব্যাগ, পোঁটলাপুঁটলি।

বাক্যহারা মুখের দিকে তাকিয়ে, ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'কী চিন্তায় যে ফেলেছিলেন, গত পরশু থেকে বুকিং অথচ আপনাদের দেখা নেই। এদিকে এখন রাশের সময়, খালিঘর ঠেকিয়ে রাখাও মুশকিল! দিল্লি থেকে বড়ো সাহেবের তলব, না-ও করতে পারি না গর্দান যাবে।'

একটু থেমে আবার বলল, 'দিল্লি থেকেই নাকি কার ভুলে রুজভেল্ট কটেজে বুক করে দিয়েছিল। অথচ সে বাংলো তো দু-বছর আগে ধস নেমে মাটিতে মিশেছে, সেকথা সরকারি ফাইলে এখনও লিখে উঠতে পারেনি। কোথা থেকে জানতে পেরে তারপর এখানে ফোনের পর ফোন, আর আপনারাও রওনা হয়ে গিয়েছেন। কী চিন্তার কথা!'

কাজুদি উদভ্রান্তের মতন বলল, 'তা এখানের বনবাংলোটা কোথায়, আমাদের তো সেখানে বুকিং ছিল।'

'ওই রুজভেল্ট সাহেবের অবর্তমানে, তাঁর বেওয়ারিশ কটেজ বহুকাল এমনি পড়েছিল, পরে বনবিভাগ সেটি দখল নিয়েছিল, সেও বহু বছর আগে। সাহেবের নামেই চলত এ অঞ্চলে। শুনেছি বহুকাল আগে সাহেব-মেম মারা গিয়েছিলেন মারাত্মক দুর্যোগে গাছ চাপা পড়ে, ওই বাংলোর চত্বরেই। আবার কাণ্ড দেখুন, ওই ফরেস্ট বাংলোর যে কেয়ার-টেকার ছিল জন, অতিথি বৎসল ভালো লোক, সেও গেল ওই বাড়ি চাপা পড়েই। কিন্তু দুই ছেলে দেশ থেকে এসে বাবা-মায়ের কবর দিয়ে গেল পেছনের জমিতেই। কবর তো হয়েই ছিল, অবশিষ্ট কিছু কি আর ছিল? যা পেয়েছে তাই মাটি চাপা দিয়েছে। মনের শান্তি আর কি, যান আপনারা ফ্রেশ হয়ে নিন। চা নাস্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি ঘরে। হেড অফিসেও ফোন করে দিই আপনারা পৌঁছেছেন নিরাপদে। তা একদিন আপনারা ছিলেন কোথায়?'

নুটুদি সঙ্গেসঙ্গে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'সিমলা, সিমলায় ছিলাম আমরা। কী চমৎকার জায়গাটা বল? তা রুজভেল্ট না কার কটেজ বললেন, যখন বুকিং ছিল, একবার নাহয় গিয়ে দেখে আসব সে কেমন ব্যবস্থা?'

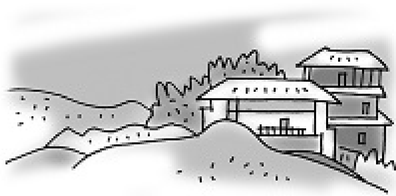
'সে বাংলো কি আর আছে? রাস্তার শেষে গভীর খাদ। গোটা এলাকা ভেঙে গড়িয়ে গিয়েছে নীচে। শুনেছি জনের পোষা কুকুরটা এখনও ওদিকেই ঘুরঘুর করে। শত ডাকলেও কারোর কাছে যাবে না। মনিবরা মরল, তাদের কবরের ওপর বসে সারারাত কাঁদে।'

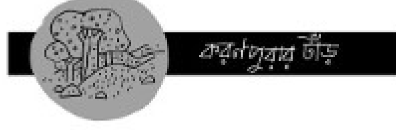
বেবিদি বলল, 'সে কাঁদুক, কিন্তু আমাদের লাগেজ কে দিয়ে গেল ভাই?'

ম্যানেজার বলল, 'ম্যাডাম, সে তো চিনি না। আমি এখানে নতুন। কালো মতন, লম্বা কোট গায়ে। সে কালও বিকেলে এসে এখান থেকেই দিল্লিতে ফোন করে আপনাদের কথা জানিয়ে দিয়ে গেল। আপনারা ভালোভাবে পৌঁছে গিয়েছেন চিন্তার কারণ নেই।'

আমি বললাম, 'চিন্তার আর কী, ভুল করে অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম, ভুল ভাঙতেই চলে এসেছি। তবে পাহাড় আমাদের সুট করছে না। পেট গুরগুর, গলা খুশখুশ। তাই ভাবছি দিল্লিই ফিরে যাই। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। আর এ বাংলোও দু-বছর আগে ধস চাপা পড়েছিল কি না, সেও তো আমাদের জানা নেই!'

ম্যানেজার কী বুঝলেন কে জানে, কেমন অদ্ভুতভাবে মুচকি হাসলেন। তবে মিলিয়ে গেল না, এই যা রক্ষে!






## বুদ্ধদেব গুহ

হাজারিবাগ শহর থেকে বেরিয়ে বড়োবাজারের দিক থেকে এসে গোরস্থানের পাশ দিয়ে গিয়ে লালমাটির উঁচু-নীচু করোগেটেড একটা পথ মেঘের মতো গোন্দা বাঁধকে ডান দিকে রেখে চলে গেছিল টুটিলাওয়া হয়ে সীমারিয়ার দিকে। সেই পথেই হাজারিবাগ থেকে মাইল তিনেক গেলেই একটি লালমাটির পায়ে-চলা পথ ঝাঁটিজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে শীর্ণ বোকারো নদী পেরিয়ে পৌঁছে গেছিল কুসুমভা বস্তিতে। বনাদাগ থেকে দু-আড়াই মাইল পথ হবে।

পথের দু-পাশে বেশিই শালের এলোমেলো চারাগাছ আর ঝাঁটিজঙ্গল, যাতে অগণ্য কালি তিতির বর্ষার দুপুরে কোমরসমান উঁচু ঝোপে বসে ডাকত। তিতির এমনিতে জমিতে চরে বেড়াতেই ভালোবাসে, কিন্তু কালি তিতিরদের স্বভাব দেখে মনে হত তারা ব্যতিক্রম।

এই কুসুমভা গ্রামের কথাই আছে বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ মশায়ের লেখাতে। তাঁর যৌবনে তিনি এই পথেই চাতরার রুটের বাসে কনডাক্টর ছিলেন কিছু সময়ে। তখন যে-পথ দিয়ে বাস চাতরা যেত, তাকে-আমি যে-সময়ের কথা বলছি, প্রায় ৫০ বছর আগের কথা-বলত ওল্ড চাতরা রোড। ওই সমস্ত এলাকাই গভীর জঙ্গলময় ছিল, কিন্তু ওল্ড চাতরা রোড তখন কেউই ব্যবহার করতেন না বলে তার দু-পাশের জঙ্গল ছিল ভয়ানক। সেই চাতরা রোডেই সুবোধবাবু বাসের সামনে একটি বাঘের বাচ্চা দেখতে পেয়ে তাকে তুলে আনেন, পোষেন এবং তার নাম দেন ‘বিলি’। এই বিলি পরে বড়ো হয়ে বিপজ্জনক হয়ে ওঠাতে প্রতিবেশীদের অনুরোধে উনি তাকে ওই কুসুমভা গ্রামে এনে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেন, মস্ত একটি অশ্বত্থ গাছের তলায়। সেই অশ্বত্থ গাছ আমিও দেখেছি ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০ দশকের শেষ অবধি। তার নীচে একটি বনদেবতার থান ছিল। গাঁয়ের মানুষেরা পুজো দিত। আর তার আগে গ্রামের ভিতরেই ছিল মস্ত একটি তেঁতুল গাছ। যার তলাতেই কাড়ুয়ার সঙ্গে আমার প্রথমবার আলাপ হয়।

কাড়ুয়া ছিল কাকতাড়ুয়ার মতো দেখতে। সাড়ে পাঁচ ফিট মতো লম্বা, মাথায় কদমছাঁট চুল। কিন্তু পেছনে চার ইঞ্চি একটি টিকি-যা সে দৌড়ে গেলে বা এলে, লাফাতে থাকত। কাড়ুয়ার মুখ ছিল শ্রীহীন। কিন্তু তার ধবধবে দাঁত থার্টি-টু অল-আউট করে সে যখন হাসত, তখন সে-যে ভারি সরল এবং ভালো একজন মানুষ, তা বুঝতে কারোই অসুবিধে হত না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বন-পাহাড়ে, নদীতে, হ্রদে, নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছি গত ষাট বছরে, কিন্তু কাড়ুয়ার মতো জঙ্গলের মানুষ খুব কমই দেখেছি।

তার পরনে থাকত হাঁটু অবধি খেটো মোটা ধুতি। গা প্রায় খালিই থাকত গরমের সময়ে। বর্ষাতেও। শীতে আমাদেরই কারও দেওয়া পুরোনো জামা বা গেঞ্জি। তার কাঁধে

থাকত তার মুঙ্গেরি একনলা নড়বড়ে গাদা বন্দুকটা। তাতে 'হুম্মচকে' বারুদ ঠেসে, তার মুখে সিসের গুলি দিয়ে পেছনে পারকাসান-ক্যাপ লাগিয়ে বন্দুকের ঘোড়া তুলে ঘোড়া দাবত। জন্তুজানোয়ারের 'রাহান-সাহান', হাল-হকিকত তার নখদর্পণে ছিল। মাটির দেওয়াল, খাপরার চালের মাটির মেঝের ঘরে থাকত সে, গ্রামের পথের একপাশের একসার ঘরের একটি ঘরে। তার স্ত্রী ছিল, ছেলে-মেয়েও ছিল, কিন্তু সে সংসারী আদৌ ছিল না। তার সংসার যে কী করে চলত, তাই ছিল এক রহস্য আমাদের কাছে। তার জমিজমা বলতেও প্রায় কিছুই ছিল না। আমরা যারা ওকে ভালোবাসতাম, তারাও আর সারা বছর তাকে দেখতে পারতাম না। যখন যখন যেতাম তখন তখন যতটুকু পারি করতাম।

কাড়ুয়ার দারিদ্র্য, তার জাগতিক সব অসুবিধের কোনোকিছুই তাকে ছুঁতে পারত না। সে ছিল অরণ্যপুত্র। কুসুমভার সেই বনদেওতার থান পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই অরণ্যের শ্যামলিমা মনকে স্নিগ্ধ, প্রসন্ন এবং উদাস করে দিত। সেই জঙ্গলে আমরা যে কত কিছুই শিকার করেছি একসময়ে! রাতে পায়ে হেঁটে ঘুরে এবং দিনে ছোটো ছোটো হাঁকোয়া করে। নানা জাতের হরিণ, শুয়োর, শম্বর, নেকড়ে ও চিতা ছাড়াও তিতির, বটের, বনমুরগির ঘাঁটি ছিল সেই অরণ্য। সেই অরণ্যের শেষে এক দিগন্তবিস্তৃত টাঁড় ছিল। আকাশের সঙ্গে গিয়ে মিশেছিল সে টাঁড়। কাড়ুয়া সেদিকে দেখিয়ে বলত, 'তারও পরে আছে করণপুরার টাঁড়। সে এক স্বর্গরাজ্য।' আমরা কখনো সেখানে যাওয়ার সময় করতে পারিনি। এমনকী কাড়ুয়া নিজেও নয়। করণপুরার টাঁড় আমাদের কাছে এক স্বপ্নই রয়ে গেছে। করণপুরার টাঁড়ের দিকে তাকিয়ে কাড়ুয়া উদাস হয়ে যেত।

কাড়ুয়ার এক জিগরি দোস্ত ছিল, তার নাম ছিল টাবড়। টাবড়কে একটা মস্ত বড়ো দাঁতাল শুয়োর পেট ফাঁসিয়ে মেরে ফেলেছিল। এক গ্রীষ্মের দিনে সন্ধ্যে নামার আগে আগে কাড়ুয়া যখন বনাদাগ থেকে কুসুমভার দিকে আসছিল, তখন বোকারো নদীটা পায়ে হেঁটে পেরোবার সময়ে সে নাকি এক আশ্চর্য এবং দুঃসাহসী কাড়ুয়ার কাছেও ভয়াবহ এক দৃশ্য দেখেছিল। বোকারো নদীটা সেখানে শীর্ণ এবং তার নাম বোকারো হলেও, বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে যে নদী, এ নদী সে নদী নয়। আমাদের দেশে একই নামের অগণ্য পাহাড় ও নদী আছে বিভিন্ন অঞ্চলে। এই বোকারো দুই উঁচু ও খাড়া পাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছিল। তার দু-দিকেই খোয়াই। ভরা বর্ষা ছাড়া অন্য সময় এ নদী প্রায় শুকনোই থাকত।

আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। তবে সবে উঠেছে। সন্ধ্যে বেলায় তার আলো তেমন জোর হয়নি। কাড়ুয়া-নদীতে নামার সময়েই লক্ষ করল যে, তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হওয়া উলঙ্গ টাবড় একটি শুয়োরের মৃতদেহের উপরে বসে আছে। তার মাথাতে লম্বা লম্বা এলোঝেলো চুল। তার হাতের নোখগুলো বিরাট লম্বা লম্বা আর তার দু-টি চোখ জ্বলছে ভাঁটার মতো। আর তার মাথার উপরে অনেকগুলো প্যাঁচা ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে কিঁচি-কিঁচির করে ডাকছে।

মুহূর্তের জন্যে ভয় পেলেও, কাড়ুয়া টাবড়ের নাম ধরে যেই ডেকে উঠল, অমনি তার চোখের সামনে থেকে সেই দৃশ্য উধাও হয়ে গেল। আর, একটা হায়না খুব জোরে ডাকতে ডাকতে নদীর বুক ধরে দূরে দৌড়ে গেল।

তার বন্ধুর মৃত্যুর বদলা নেওয়ার জন্যে কাড়ুয়া তার মৃত্যুর পর থেকেই হন্যে হয়ে সেই শুয়োরটাকে খুঁজে বেড়াত, কিন্তু তখনও দেখা পায়নি।

বোকারো নদীর বুকে সেই সন্ধ্যার ভৌতিক ঘটনা কাড়ুয়াকে আরও জেদি করে তুলল, বন্ধুর মৃত্যুর বদলা নেওয়ার জন্যে। টাবড়ও নিশ্চয়ই চায় যে, কাড়ুয়া প্রতিশোধ নিক, নইলে শুয়োরের উপরে সে বসে থাকবে কেন? তার মাংস খাবে কেন?

ভাবত কাড়ুয়া। কেবলই ভাবত।

এক বর্ষার রাতে কাড়ুয়া তার মাটির ঘরে শুয়েছিল। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঠান্ডা, ভেজা হাওয়া বইছে বাইরে বৃষ্টির কণা উড়িয়ে। তার গাদা বন্দুকটি মাটির ঘরের দেওয়ালে একটি গজালের গায়ে ঝুলছিল। হঠাৎই কাড়ুয়ার মনে হল-কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কান খাড়া করে শুনল কাড়ুয়া। ফিসফিসানিটা আসছিল তার বন্দুকের কাছ থেকে। বন্দুক বলছে, 'এ কাড়ু। কাড়ু হো!'

অবাক হয়ে কাড়ুয়া বন্দুকের দিকে চোখ তুলে তাকাল অন্ধকার ঘরে। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছিল। বন্দুক আবার বলল, 'এ কাড়ু, শটি খেতোয়ামে বড়কা শুয়ার আওলথু। নয়া তালাওকি পাস।'

গাঁয়ের শেষপ্রান্তে একটি নতুন পুকুর খোঁড়া হয়েছিল গত গ্রীষ্মে। তখনও জলে ভরেনি। নতুন বর্ষায় জল জমে তাতে কোমরসমান জল হয়েছে, লালমাটি-ধোওয়া ঘোলা জল। তারই পাশে গাঁয়ের লোকেরা অনেকখানি জায়গা নিয়ে শটি বুনেছে।

কাড়ুয়া আর সময় নষ্ট না করে তার বন্দুকটা নামিয়ে নিয়ে, তাতে চার আঙুল বারুদ গাদল। তারপর একটা মস্ত বড়ো সিসের গোল গুলিও গাদল। তারপর একটা পারকাসান-ক্যাপ লাগিয়ে, বন্দুকটা ঘাড়ে নিয়ে, শাল কাঠের দরজার হুড়কো খুলে বেরিয়ে পড়ল নয়াতালাও-এর দিকে।

খুব সন্তর্পণে গুটিগুটি পায়ে সেখানে পৌঁছে দেখল যে তার বন্দুক যা বলেছিল, তাই ঠিক। সেই মস্ত বড়ো শুয়োরটা খেত তছনছ করে শটি খাচ্ছে। মেঘ-ছেঁড়া চাঁদের আলোতে তার বিরাট সাদা দাঁত দু-টি একবার চিকচিক করে উঠল। শুয়োরটা মনোযোগ দিয়ে মুখ নীচু করে শটি খাচ্ছে। অন্য কোনোদিকেই তার নজর ছিল না। কাড়ুয়া বন্দুক বাগিয়ে এক-এক পা করে এগিয়ে গিয়ে, শুয়োরের 'কানপাট্টিয়ামে' নিশানা নিয়ে হুম্মচকে দেগে দিল তার বন্দুক। চিতপটাং হয়ে মাটিতে পড়ে চরকির মতো ঘুরপাক খেতে লাগল শুয়োরটা, ওঠবার বৃথা চেষ্টাতে। আবার তার গাদা বন্দুক ভরতে অনেক সময় লাগত। তবে কানে গুলি লাগাতে শুয়োরের আর ক্ষমতা ছিল না উঠে দাঁড়াবার। যতক্ষণ না শুয়োর নিথর হয়ে যায়, ততক্ষণ কাড়ুয়া সেখানে দাঁড়িয়ে তার বন্ধুর খুনির শেষযাত্রা দেখল খুশি হয়ে। টাবড়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পেরে বড়ো খুশি হল কাড়ুয়া।

একবার আমি আর আমার হাজারিবাগের বন্ধু গোপাল সেন, মহম্মদ নাজিম আর কাড়ুয়ার সঙ্গে হাজারিবাগ থেকে বাসে চাতরা হয়ে এক প্রচণ্ড শীতের শুক্লপক্ষের রাতে গয়া জেলার জৌরিতে এসে নামলাম। শীতার্ত রাতে ছোটো ঘুমন্ত জায়গা জৌরিতে এক গরিব মৌলবির বাড়িতে বাজরার রুটি আর মুরগির ঝোল কবজি ডুবিয়ে খেয়ে, খালি মাদ্রাসাতে খড়ের উপরে শুয়ে রাত কাটিয়ে, ভোর হবার আগেই গোরুর গাড়িতে করে ফল্গু নদীর দুই শাখানদী জাঁম আর ইলাজান পেরিয়ে, সিজুয়াহরা পাহাড়ের উপরে রঘু শাহ-র ভাণ্ডারে গিয়ে পৌঁছোলাম। যেখানে ডেঁটে নাস্তা করে, সারাদিন ছুলোয়া শিকার করলাম, কিন্তু একটিও পশুপাখি শিকার হল না। সারাদিন পাহাড়ে উপত্যকায় বন্দুক

ঘাড়ে করে, প্রায় মাইল দশেক হেঁটে ভাণ্ডারে ফিরে, রাতের খাবার খেয়ে, আবার জৌরির উদ্দেশে রওনা হলাম। ভোরে পৌঁছে বাস ধরব হাজারিবাগের।

আমরা তিন জন গোরুর গাড়ির উপরে আর কাড়ুয়া আমাদের পেছন পেছন তার বন্দুক কাঁধে ওই প্রচণ্ড ঠান্ডাতে খালি গায়ে গান গাইতে গাইতে আসতে লাগল। ইলাজান আর জাঁম নদীর কাছে পৌঁছোবার পরে, রেফ্রিজারেটরের দরজা খুললে যেমন ঠান্ডা ধোঁয়া বেরোয়, তেমন ধোঁওয়া বেরোতে লাগল। সেই দুই নদীও কাড়ুয়া খালি পায়েই পেরোল। ও জুতোতে অভ্যস্ত ছিল না। দু-দু-বার দেওয়া সত্ত্বেও সে পরেনি। খালি পায়েই কাঁকর, কাঁটা উপেক্ষা করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত সে। গয়া জেলার চাঁদনি রাতের পঞ্চাশ বছর আগের সেই সফর যেন মনে হয় গতকালেরই কথা। কাড়ুয়ার সেই গানটি এখনও মনে আছে। ক-দিন আগে জি-টিভির 'খোলা মনে' অনুষ্ঠানেও ওই গানের কয়েক কলি গেয়েছি; 'তু কেহরো কচমচ ছাতি... তেরা সুরত দেখি মোরা বসল নজারিয়া হো বসল নজারিয়া...'

ভোররাতে জৌরিতে পৌঁছে কাড়ুয়া বলল, 'কব যাইয়েগা আপলোগ? করণপুরাকি টাঁড়মে?'

আজকে জঙ্গলের সাথ-সঙ্গী কাড়ুয়া নেই। নাজিমসাহেব নেই। আমার বন্ধু গোপালও নেই। কিন্তু চোখ বুঁজলেই যেন দেখতে পাই কাড়ুয়া আমার পাশে দাঁড়িয়ে করণপুরার টাঁড়ের দিকে আঙুল তুলে বলছে, 'ইকদফে টাইম লেকর আইয়ে, চলেগা হামলোগ সব মিলকর করণপুরাকি টাঁড়মে।'

আমার টাইম আজকেও আছে। কিন্তু ওদের টাইম শেষ হয়ে গেছে। প্রত্যেকের জীবনেই এমন কিছু স্বপ্ন থাকে, যা পূরিত হয় না। কিন্তু সেই স্বপ্ন ঠিকই বেঁচে থাকে, যতদিন জীবন থাকে। যদিও জানি, আর হবে না করণপুরার টাঁড়ে যাওয়া। আজ করণপুরার টাঁড়ে হয়তো ঘিঞ্জি জনপদ হয়ে গেছে।

সারা পৃথিবী বড়ো দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কিন্তু কাড়ুয়ার করণপুরার টাঁড়ের স্বপ্নকে তো কেউই কেড়ে নিতে পারবে না। শুধু কাড়ুয়ার একারই-বা কেন? সে-স্বপ্ন তো আমারও ছিল। কাড়ুয়াই দেখিয়েছিল।

*শারদীয়া ১৪১২*






# শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

চাংরিপোতা থেকে হরিনাভির গঙ্গার ঘাট বড়োজোর দেড়-দু ক্রোশ পথ। এ পথটুকু হাঁটতেই সার্বভৌম মশায়ের পায়ে ঝিনঝিন ধরে গেল। বড্ড বয়স হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় হারজিচণ্ডীতলার মাঠ, গোড়ের খাল, ঠাকুরজি পুকুর পেরিয়ে কালীখেত সুতানুটি অবধি হেঁটে যেতেন তুড়ি মেরে। পালকি আর নৌকো থাকলেও পয়সা লাগত বলে চড়তেন না। আর আজকালকার বাবুদের তো এপাড়া থেকে ওপাড়া যেতেও পালকি চাই। পোড়ারমুখো সাহেবরা আবার ঘোড়ায় টানা হাওয়া গাড়ি বার করে ছেলেছোকরাদের মাথা খেয়েছে। তবিলে কড়ি থাকলে অমন আরও কত কী বার হবে! তালপাতার ছাতাখানা পুরোনো হয়ে প্রায় খসে পড়ছে, এবার নতুন আর একখানা না হলেই নয়। খড়মটাও পালটানো দরকার। পাঠশালের চাল ছাইবার খড়ও চাই কয়েক কাহন। চাই বললেই তো হবে না। তার জন্য কড়িও চাই ঢের। শুধু তাঁরই নয়, এ তল্লাটের আরও দশ-বিশটা পাঠশালে ওই একই অবস্থা। পালাজ্বরে গাঁয়ের পর গাঁ উজাড়, পোড়ো আসবে কোত্থেকে। বারুইপুরের সদর কাছারিতে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে। নৈহাটির চাটুয্যে। বড়ো ভালো ছোকরা। এত বড়ো চাকুরে তার কোনো দেমাক নেই। ওই ভরসা। চাটুয্যে ছোকরা কথা দিয়েছে কোম্পানি না করলে ও নিজের থেকেই সাহায্য করবে। আহা বেঁচে থাক, এটুক ভরসাই বা কে দেয় আজকাল।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে টুক টুক করে হাঁটছেন বুড়ো মানুষটা। পথে দেখা হল দুকড়ি ডোমের সাথে। দুকড়ির ছায়া হয়ে সেঁটে আছে ওর ছেলে পরাণ। পথের ধুলোর ওপরেই সাষ্টাঙ্গ পেন্নাম করলে দুকড়ি। তাড়ির গন্ধে বাতাস ভরপুর।

'পেন্নাম হই গো পণ্ডিতমশাই।'

'ওরে ধুলোর ওপর গড়াসনা, বেঁচে থাক বেঁচে থাক। শরীর গতিক ভালো তো?'

'আপনাদের কিপায় ভালোই আজ্ঞা। বউটার সান্নিপাতিক হয়ে যাই যাই হয়েছিল, দয়াময়ী সতীমায়ের থানে হত্যে দেবার পর থেকে অষুধ ধরতেছে। কবরেজ মশাই আজ্ঞা করেছেন গেল হপ্তায় ঠিক হয়ে যাবেখন।'

দয়াময়ী সতীমায়ের কথা শুনে সার্বভৌম ঠাকুর আনমনা হয়ে পড়লেন। চোখের কোনায় জল। ছেলেবেলায় দয়াময়ী ঠাকরুণকে সতী হতে দেখেছেন তিনি। দশ বছরের কচি মেয়েটাকে কড়া সিদ্ধি খাইয়ে বুড়ো বরের সাথে চিতায় পুড়িয়ে মেরেছিল সামন্তরা। ধর্মের নামে কত বড়ো অন্যায়! তাঁর নিজেরও তখন দশ-বারো, দয়াময়ীর খেলার সাথি। দয়াময়ীর বুড়ি সতীনের ছেলে পিতেম্বর সামন্ত সেই চিতার ওপর মঠ বানিয়েছিল। টাকাকড়ির মুখে আগুন! আশি বচ্ছর আগেকার সেই তুমুল ঢাক ঢোলের শব্দ আজও

তাঁকে অসাড় করে দেয়। রাগে আপাদমস্তক জ্বলতে থাকে। দয়াময়ীর পর আর কেউ সতী হয়নি, এ গাঁয়ে ছোকরা পণ্ডিতের দল লাঠি হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

'হত্যে দিয়ে আর মন্তর দিয়ে কিছু হয় না রে ব্যাটা, কবরেজের ওষুধই সব। সান্নিপাতিক বড়ো সাধারণ অসুখ নয়! সাবধানে রাখিস।'

বেলা পড়ে আসছে। হেমন্তের বিকেলে বাতাসে শীত শীত ভাব। গঙ্গার জলে জোয়ারের বান লেগেছে। বুড়ো বট গাছের ছায়ায় চওড়া বাঁধানো ঘাটে বসে হাঁপ ছাড়লেন নব্বই বছরের ভবনাথ সার্বভৌম। লাল কাপড়ে যত্ন করে বাঁধা তলপি কপালে বুকে ঠেকিয়ে নামিয়ে রাখলেন পাশে। দেড়-শো বছরের পুরোনো চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি আছে এতে। ভবনাথের ভুরু কোঁচকানো। দুকড়িকে বলা হয়নি। কথাটা গেল হপ্তায় নয়, বলতে হবে 'আসছে হপ্তায়'। বামুন কায়েতরাই ভুল করে, এ হতভাগ্য তো ডোম। এদের লেখাপড়া শেখাবে কে?

'নমস্কার পণ্ডিতমশাই।'

অবেলায় নজর ঠিক থাকে না, তবু গলার আওয়াজে চিনতে পারলেন ভবনাথ।

'আরে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মশাই! আসতে আজ্ঞা হোক, আসতে আজ্ঞা হোক!'

'ঠাকুরদা। দয়া করে আপনি আজ্ঞে করবেন না। তার চাইতে গাল বাড়িয়ে দিচ্ছি, চড় মারুন একটা।'

'আয় আয় বোস। তুই তোকারি করলেই কি আর পাণ্ডিত্য কমবে তোর! তুই আমার বিদ্যার জাহাজ।'

'আর তোমার বিদ্যের সাগরটি কী রকমের?'

'কে, ঈশ্বর! ওরে বাবা ও তো জলবিছুটি, বুনো ওল। মাথাটি দেখেছিস। কসুরে জই! ওর তো আজ আসবার কথা এখেনে। এত দেরি তো করে না সে!'

'বলেছে যখন আসবেই। হাঁটা পথে পটলডাঙা থেকে হরিনাভি, অনেকটা দূর। তোমার তলপিতে আজ কার অধিষ্ঠান? মনসা, কালিকা না চণ্ডী?'

'ওদিকে নজর দিসনে ছোঁড়া। ঈশ্বরের বায়না করা আছে।'

'কার রচনা?'

'তার নামের জায়গাটি উই বা ইঁদুরে রসিকতা করে খেয়ে রেখেছে, অবশ্য মূল অংশটা ঠিক আছে এখনও। দেড়-শো বছরের প্রাচীন পুঁথি, চণ্ডীমঙ্গল।'

'কালকেতু ফুল্লরা!'

'ফুল্লরার বারোমাস্যার জায়গাটি খাসা! ঠিক যেন আমাদের ঘরের ঠাকুরানিদের চোপা থেকে তুলে সাজানো। পদকর্তার গিন্নিটি নির্ঘাৎ কুঁজলে ছিল। আহা;

'আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি।

ক্ষুধায় আকুল হই লোটাই আক্ষি ক্ষিতি।

ক্ষণে ক্ষণে ঊর্ধে আক্ষি চারিদিকে চাহি।

হেন সাধ করে সনে অন্য জাতি যাই।'

'জয় মা কালী ঘ্যাচাং!'

কচি গলার শির ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে পরাণ। কলাগাছের থোরের গায়ে কাঠের টুকরোর ঘা পড়ছে ধপাধপ। পরনের ত্যানাটুকু কোথায় গেছে কে জানে। কালো হাড় জিরজিরে শরীরে তেজের অবশ্য কমতি নেই। কম নেই কাদা মাটিও। হুঁকোর কলকিতে ফুঁ দিতে দিতে হাসছে দুকড়ি।

'চুপ করবি রে ছোঁড়া!'

'পাঁঠা বলি দিচ্ছি যে!'

'এখন চুপ কর। কালীপুজোর দেরি আছে আরও এক হপ্তা, তখন পাঁঠাবলি দিস।'

হুঁকোর মাথায় কলকি চড়িয়ে কলাপাতের নল বসিয়ে একটু দূর থেকে হাত বাড়াল দুকড়ি।

'বাবাঠাকুর, আজ্ঞা হোক।'

ভবনাথ হাত বাড়িয়ে হুঁকো নিলেন। গুর গুর করে শব্দ হচ্ছে। আবছা অন্ধকারে কালচে দেখাচ্ছে গঙ্গার ঘোলা জলে দুলন্ত কলসির দাম। তারা ফুটে উঠছে একটি দু-টি। হুঁকোর নীলচে ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে হেমন্তের জোলো বাতাসে। একটা বজরা ভেসে যাচ্ছে সুতানুটি কলকাতার দিকে। বজরার জানলায় লণ্ঠন জ্বলছে। লালচে আলোয় কে একজন সাহেবি পোশাকের মানুষ মাথা নীচু করে বসে আছেন। দুই পণ্ডিত চেয়ে দেখলেন। বজরার গুনটানা মাঝি একটু বসল এসে ঘাটের পৈঠেতে।

'কে যায় হে মাঝির পো?'

'বারুইপুরের কাছারিসাহেব আজ্ঞা।'

আবার উঠে হাঁটা দিয়েছে মাঝি। বজরা ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে ঘর ফিরতি ক্লান্ত রাজহাঁসের মতো। দেখতে দেখতে ডাইনে রাজপুর জগদ্দলের ঘাট পেরিয়ে গেল। জানলার আলো এখনও দেখা যায় মিটমিটে আকাশ পিদিমের মতো। ছোটো হতে হতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আলো নেই আর একটুও। আকাশে অগুন্তি তারা ফুটে উঠেছে। রাজপুর শ্মশানে চিতা জ্বলে উঠল কারও। আকাশে আগুনের ফুলকি উড়ছে, উড়ছে অনেক জোনাকিও। গঙ্গার ওপাড়ে মানিকপুর। কয়েক ঘর লোকের বাস সেখানে। তাদের ঘরে সাঁঝবাতি জ্বলে উঠল। গেরস্তঘরের শাঁখে ফুঁ পড়ল।

দ্বারকানাথের দিকে হুঁকো বাড়িয়ে দিলেন ভবনাথ। দ্বারকানাথের দাড়ি উড়ছে ফুরফুর বাতাসে। কলকের টানে টানে উলপে ওঠা আগুনে আনমনা চোখ দু-টি দেখা যায়। গলার স্বর চাপা গম্ভীর।

'বঙ্কিম চাটুয্যে মশাই কলকেতা চললেন। এই অবেলায়, কে জানে কী কারণ? কোম্পানির বড়ো কুটুমদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তো ভালো নয় একেবারেই। বেশিদিন এখানে তাঁকে পাব বলে মনে হয় না ঠাকুরদা।'

'ঠিকই আন্দাজ করেছ।'

অন্ধকারে চেহারা দেখা যায় না, যেন আর একটা জমাট অন্ধকার এসে বসল গা ঘেঁষে। মাথায় খাটো, গলার আওয়াজ রুক্ষ আর জোরালো। ভবনাথ নড়েচড়ে বসলেন।

'কে গো, ঈশ্বরচন্দ্র মশাই নাকি? স্বাগতম!'

'প্রণাম নাও ঠাকুরদা, বেঁচে আছ দেখছি। একটুও টসকাওনি!'

‘বুড়ো আরও বিশ বছর বাঁচবে। তারপর কী বলছিলি?’

‘বলছি ঠিকই ধরেছ। বঙ্কিম বোধ হয় চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। অবশেষে ভালো করে বললে কোম্পানি চাকরি ছাড়তে বাধ্য করল।’

‘সে কী!’ বৃদ্ধ সার্বভৌম বিচলিত হলেন। দ্বারকানাথ নড়েচড়ে বসলেন।

‘ছোকরার মর্যাদাবোধ খুব। রসবোধেরও তুলনা নেই। তবে লেখায় এখনও বড়ো ম্লেচ্ছভাব।’

‘চাটুয্যের পোকে চিনি অনেকদিন। ভারি মিশুকে। আমার তালপাতার চটির মাথা কেমন বেঁকে বেঁকে যায়। বঙ্কিম আমায় বললে, ‘বিদ্যেসাগর মশায়ের চটি তো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে স্বর্গবাসি হতে চাইছে’।’

‘তুই কী বললি?’

‘আমি বললাম ‘চট্টোপাধ্যায় বুড়ো হলেই বঙ্কিম হয়’।’ দুই পণ্ডিত হা-হা করে হাসছেন। বেদম হয়ে হাসলেন ভবনাথ।

‘রসিক বটে! তা কোম্পানি তো হাতে ময়লা কাটছে, সাদা শকুনের দল যাকে বলে।’

‘দেরি আমার এ জন্যেই। ঝগড়া করে এলেম সাহেবগুলোর সঙ্গে। চব্বিশ পরগনা অন্ধকার হয়ে গেল হে!’

‘একে কি এঁটে উঠতে পারবে সায়েবরা? মামলা করবে না?’

‘ওকে ওর কথা ভাবতে দাও ঠাকুরদা। বঙ্কিমের ধাত আলাদা। শান দেয়া ইস্পাত। ঠাকুরদা আমার চণ্ডীমঙ্গল?’

ভবনাথ অন্ধকারে তলপি বাড়িয়ে দিলেন। ঈশ্বর দু-হাতে যত্ন করে মাথায় ঠেকিয়ে পাশে রেখে গুছিয়ে বসলেন। ভবনাথ নরম হাতে ছুঁলেন ঈশ্বরকে।

‘এত দেরি করে এলি যে, কলকেতা ফিরবি কী করে?’

‘কাল ফিরব। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে ঢের। দ্বারকা দুকড়িকে পাঠাও তো, পালকিতে আলো এনেছি, নিয়ে আসুক।

‘পালকি কোথায়?’

‘রাজপুরের ঘাটে। পালকি চড়তে দেখলে বুড়োটা গাল দেয় বলে এ অবধি আনতে ভরসা পাইনি। দোখনো বুড়োর ঝাঁঝ খুব।’

পরানকে পণ্ডিতমশাইদের পাশে বসিয়ে দুকড়ি গেল আলো আনতে। রাত হলেই পরানের জারিজুরি খতম। ঢুলে পড়ছে ঘুমে। ঈশ্বর ওকে দ্বারকার কাছ থেকে নিজের কোলের কাছটিতে নিয়ে বসালেন। ভবনাথ দ্বারকার সাথে চোখাচুখি করে মুচকি হাসলেন।

‘বিদ্যেসাগর, পোলাটি কিন্তু চণ্ডালের।’

‘আরে আমরা তিনমূর্তিই বুঝি বড্ড বামুন? জাতপাত মানো না বলে তোমাদের চতুষ্পাঠিতেও তো পোড়ো পাঠাতে চায় না লোকে। ডোমের হাতে হুঁকো খাও।’

‘বেশ করি জাত মানি না। মানুষে মানুষে ভেদ থাকা উচিত শুধু জ্ঞান আর অজ্ঞানে, বোধ আর নির্বোধে।’

আকাশ থেকে তারা খসে পড়ল একটা। কথা নেই কারও মুখে। গঙ্গায় বুঝি জোয়ার এল, ছলছলাৎ শব্দ নৈঃশব্দ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পরানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ঈশ্বর পণ্ডিত। ঘুমিয়ে কাদা পরান।

'আমার নতুন বই করছি এদের সবার জন্য। বাংলার হরফ, বানান, চলতি কথা লিখতে শেখা এসব ব্যাপার আর কি। নাম দিয়েছি 'বর্ণপরিচয়'। বামুনের তবিলের তালপাতা নয়, কাগজে ছাপা বই হবে। সব জাতের ছেলে-মেয়েরা পড়বে।'

'তালপাতের মতো টিকবে তো?'

'টিকবে টিকবে। তা ছাড়া দু-চারখানি না ছিঁড়লে আমার বিক্রি বাড়বে কী করে।'

'ব্যাটা বামুন-ব্যাপারী!'

'ওরে শালা, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। দু-বোনের ভাব না হলে লেখাপড়া এগোবে?'

দুকড়ি ফিরে এল আলো নিয়ে। পিছু পিছু যমদূতের মতো পালকি বেহারাদের সর্দার ধরনী সাঁতরা, হাতে সড়কি মাথায় পাগ। তার লাল চোখ, গম্ভীর আওয়াজ।

'বেহারাদের রেতে থাকবার ব্যবস্থা করে এলাম আজ্ঞা। আমি এলাম আপনাকে পাহারা দিতে, জায়গা তো ভালো নয়।'

'কোনো দরকার নেই, তুই যা। বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করিস, বড়ো শেয়ালের ভয় আছে এদিককার জঙ্গলে। দুকড়ি চকমকি আন।'

হেমন্তের রাত বাড়ছে। দূরে দূরে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। ঘাটের পৈঠের গায়ে ভরা জোয়ারের ঢেউ ভাঙছে কুল কুল। বিন্দু বিন্দু হিম জমা হচ্ছে গাছের পাতায় পাতায়।

ঘাটের ফাঁকা চত্বরে তিন পণ্ডিত বাতি ঘিরে গুছিয়ে বসেছেন। দুকড়ি নতুন করে কলকে সাজাচ্ছে। ন্যাংটা শিশু পরান ঘুমিয়ে পড়েছে ঈশ্বরের চাদরের ওপর, ভবনাথের কোলে তার মাথা। কাঁধের ঝোলা থেকে নতুন লেখা কাগজের তাড়া বার করছেন ঈশ্বর। মুখপাতে খয়েরের রঙে বড়ো করে লেখা 'বর্ণপরিচয়'।

দ্বারকা আস্তে আস্তে ঠেলা দিলেন পরানের গায়ে।

'ওঠ বাবা ওঠ। পড়তে হবে যে!'

বড়ো বড়ো চোখ করে উঠে বসেছে পরান। চোখ কচলাচ্ছে কচি দু-হাতে। কাঁপা কাঁপা প্রদীপের আলোয় মন্দির কাঁপছে, ছায়া কাঁপছে। ঈশ্বর পণ্ডিত বলছেন;

'বল তো পরান, আমার সাথে সাথে বল-

'কাক ডাকিতেছে।

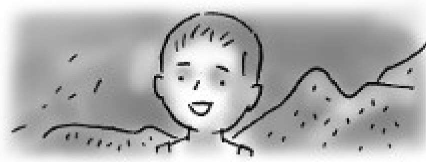
গোরু চরিতেছে।

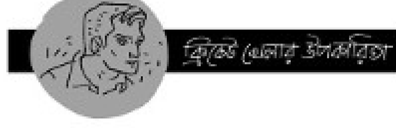
পাখি উড়িতেছে।

জল পড়িতেছে।

পাতা নড়িতেছে।'

*বৈশাখ ১৪১৫*






# প্রসাদরঞ্জন রায়

নাঃ একথাটা মানতেই হবে যে ক্রিকেট খেলাটা ঠিক আমার ধ্যান-জ্ঞান-মোক্ষ নয়, যদিও খেলাটা আমি ভালোবাসি। পড়াশোনা নিয়েই জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়েছি, বাকি অর্ধেকটাও নিশ্চয় কেটে যাবে। তবে স্বীকার করতেই হবে যে ক্রিকেট খেলার জন্যই আমি আজ এখানে পৌঁছেছি, যেখানে আমার প্রায় জগৎ-জোড়া নাম। তাও আবার, সত্যি কথা বলতে, স্রেফ একদিনের একটা খেলার জন্য। সে গল্পটাই আজ তোমাদের বলব।

আমি অর্থাৎ রাজেন রায়চৌধুরি, রাজা নামেই পরিচিত। কেমব্রিজ আমি গণিতের অধ্যাপক ও গবেষক, বেশ নামও করেছি। ক্রিকেট খেলাটাও ভালোবাসি, শুধু খেলতে পারি না। আমাদের পরিবার কিন্তু ক্রিকেটের জন্য এককালে বেশ নাম করেছিল। আমার ঠাকুরদা নাটোরের রাজার টিমে খেলতেন। ব্যাট হাতে তাঁর বেশ জবরদস্ত চেহারার একটা বাঁধানো ছবিও আছে আমাদের বাড়িতে। আমার বাবা ইউনিভার্সিটি দলে রহিন্টন বারিয়া ট্রফিতে খেলে এসেছেন। দুই কাকাও টাউন ক্লাব, গ্রিয়ার, টালিগঞ্জ অগ্রগামী, দক্ষিণ কলিকাতা সংসদ এসব ক্লাবে খেলেছেন চুটিয়ে। শুধু আমারই খেলাটা ঠিক আসে না, তবে ভালোবাসি খুবই।

আসলে খুব ছোটোবেলায় হারিয়েছি বাবাকে, তাঁর স্মৃতিটাও আমার কাছে ঝাপসা। হয়তো, বাবা থাকলে ক্রিকেটের প্রতি টানটা আর একটু বাড়ত। স্কুলে বন্ধুবান্ধবের ঘাটতি ছিল না কখনো, আর তাদের অনেকেই ক্রিকেট বলতে পাগল। নিজেও যে একটু-আধটু খেলিনি তা নয়, তবে স্বীকার করতেই হবে আমার ফিল্ডিংটা বেশ খারাপ। রোগাপটকা চেহারা, তায় একটু উঁচু ক্লাসে পা দিতেই মাইনাস থ্রি পাওয়ারের চশমা জুটে গেল। ব্যাটিঙের সময় এলেই বন্ধুরা বলত, ‘তুই ক্লাসের ফার্স্ট বয়, তুই আবার ব্যাট করবি কী? বরং স্কোর লেখ, বা আম্পায়ারিং কর।’ তাই করতে হত। আর একথাটাও ঠিক যে পড়াশোনায় আমি ছিলাম বিচ্ছিরি রকমের ভালো, প্রায় সব সাবজেক্টেই ফার্স্ট হতাম, তবে অঙ্কটা বরাবরই আমার ফেভারিট। শুনেই আমার বন্ধুরা বলত, ‘বাব্বা পারিস বটে!’ আবার পরীক্ষার আগে আমার কাছেই বুঝতে আসত। যখন সুজিত-সমরজিৎরা বেঙ্গল স্কুলের ক্যাম্পে ডাক পেল, আমি তখন মোহিত কোঅর্ডিনেট জিয়োমেট্রিতে। আবার যখন আমার বন্ধু লাড্ডু ইউনিভার্সিটি ট্রায়ালে গেল আমি তখন মশগুল ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশনে। এমনি করেই ক্রিকেট মাঠ থেকে ক্রমে দূরে সরে গেছি, চোখের পাওয়ারও বেড়েছে। তবে টিভিতে খেলা দেখি-ওখানে কী সুন্দর সবুজ সব মাঠ দেখা যায়, বাস্তবের ক্রিকেট মাঠ অনেক ন্যাড়া আর সব বই-ই গোগ্রাসে গিলতে আমি ওস্তাদ-বাবার ক্রিকেট লাইব্রেরিও গুলে খেয়েছি, অন্যান্য লাইব্রেরিও আছে। তবে ক্রিকেটের বই পড়া আর ক্রিকেট খেলা তো এক জিনিস নয়!

অ্যাপ্লায়েড ম্যাথেমাটিকসে এম.এসসি. শেষ করছি, তখন ডুব দিয়েছি লাগ্রাঞ্জিয়ান, হ্যামিলটনিয়ান আর বেসেল ফাংশনে। সে বছরই লাড্ডু ইউনিভার্সিটি খেলে বেঙ্গল ট্রায়ালে ডাক পেল। আমার দিদি বলত যে অঙ্কের নম্বর থেকেই নাকি ওর এরকম নাম হয়েছে। মেয়েরা এত হিংসুটি হয় না! চমৎকার চেহারা লাড্ডুর, জিম করে স্বাস্থ্যটাও দারুণ বানিয়েছে। বি.কমের গণ্ডি পেরোতে পারেনি অবশ্য, কিন্তু পড়াশোনায় অত খারাপ ও নয়। দু-জনের মধ্যে প্রায় কিছুতেই মিল নেই, কিন্তু বন্ধুত্বটা টিকে আছে আজও। ওর জীবনের স্বপ্ন বেঙ্গল আর ইন্ডিয়া খেলা-আর আমার স্বপ্ন কেম্বিÑজে ট্রিনিটি বা কিংস কলেজ যাওয়া। এ স্বপ্নটা বোধ হয় অধরাই থেকে যাবে কারণ ওখানে প্রথম দিকে স্কলারশিপ প্রায় নেই-ই আর স্কলারশিপ ছাড়া আমার পক্ষে বিদেশ যাওয়া সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে বিয়ের পর দিদি পাড়ি দিয়েছে আমেদাবাদ। মাও যাবেন কয়েকদিনের জন্য, চিন্তা আমাকে নিয়ে। আমি তখন এদিকে-ওদিকে অ্যাপ্লিকেশন ছাড়ছি, কেমব্রিজেও একটা ঠুকে দিয়েছি যদিও কোনো আশা নেই। মা আমাকে একা ছেড়ে যেতে চান না। আমিও নাছোড়বান্দা! শেষে মা-ই উপায় বাতলালেন, 'মামার বাড়ি থাক না ক-টা দিন!' আমার মামা জুট মিলের ডাক্তার। থাকেন হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের কাছে, রসুলপুর না কী যেন নাম! মামা বলেন ওটা গণ্ডগ্রাম। তবে কলকাতা যাতায়াতটা সহজ। মামা-মামি দু-জনেই লোক খুব ভালো আর মামাতো ভাই দুটো শিবু আর শম্ভু আমায় খুব ভালোবাসে। অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম।

নভেম্বর শেষ। একটু শীতের আমেজ এসেছে। বইপত্র, বাক্স-বিছানা গুছিয়ে মামাবাড়ি। সেখানে আদরযত্নের অভাব কোনোদিনই হয়নি, এবারও হল না। মামি আবার দারুণ রান্না করেন-যেমন ভুনি খিচুড়ি, তেমন ভাপা ইলিশ বা মাংসের রোস্ট! শিবু শম্ভুতো আমাকে দেখেই নাচছে। ওদের সঙ্গে গল্প করে আর কলকাতার গল্প ওদের শুনিয়ে বেশ দিন কাটছে। হপ্তায় বার দুয়েক কলকাতায় যাই। ওদের দেখি ক্রিকেটে দারুণ উৎসাহ। কলকাতার ছেলে হয়ে, বিশেষ করে এই পরিবারের, খেলা ছেড়ে কেমন করে আছি বুঝতেই পারে না। অনেক করে বোঝালাম যে ক্রিকেটের থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জীবনে অনেক আছে। ওরা ঠিক বুঝল বলে মনে হল না-কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। মামারও এ ব্যাপারে উৎসাহ কম নয়। মেডিকেল কলেজে পড়তে ক্রিকেট খেলতেন, এখন টিভিতে দেখেন আর বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন। মামার মতে শচীনের থেকে গাভাসকার অ-নেক উঁচু পর্যায়ের ব্যাটসম্যান আর তাঁর পুত্রদের মত ঠিক তার উলটো। ফলে তর্ক জমে উঠত খুবই আর উচ্চ গ্রামের কথার জন্য দু-পক্ষই বকুনি খেত মামির কাছে। ডিসেম্বর মাস পড়তেই দেখি শুধু মামাবাড়ি নয়, গোটা গ্রামটাই উত্তেজনার আগুনে টগবগ করে ফুটছে। শুনলাম আট মাইল দূরের গ্রাম রাঘবপুরের সঙ্গে রসুলপুরের একটা বার্ষিক প্রীতি ম্যাচ হয় খ্রিস্টমাসের সময়। সেটাই এখানকার স্থানীয় 'অ্যাশেজ'! গত কয়েক বছর রসুলপুর জিতেছে। এবার তাদের দু-তিন জন ভালো প্লেয়ার নেই, কাজেই এবার পাল্লা রাঘবপুরের দিকে ভারী! মামি অবশ্য বললেন 'প্রীতি ম্যাচ না ছাই! ম্যাচের সময় ওরা এ ওকে খুন পর্যন্ত করতে পারে। আম্পায়ারকে ঘুষ, প্লেয়ার ছিনতাই, খাবারে জোলাপ মিশিয়ে দেওয়া-কী না হয়েছে এই ম্যাচ নিয়ে? ভাবতে পারিস, সারাটা বছর যাদের গলাগলি ভাব, তারা পর্যন্ত এ সময় পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে! ক্রিকেট খেলে নাকি চরিত্রগঠন হয়-কচু পোড়া হয়!' মামা তাঁকে থামাতে গিয়ে এক ধমক খেয়ে চুপ, শিবু-শম্ভু ভয়ে কেঁচো। আমি বললাম, 'যাক গে, আমি তো আর ওদিকে নেই।' মামি একগাল হেসে বললেন, 'তাই রক্ষে! সেদিন বাড়িতে ঘি-ভাত মাংস করব, ওরা মাঠে গিয়ে শুকনো রুটি গিলুক গে।' আমার অবশ্য একটু মাঠে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ক্রিকেট

সাহিত্যের ‘ক্লাসিক’ বলে স্বীকৃত হিউ দ্যা সেলিনকোর্টের ‘দ্য ক্রিকেট ম্যাচ’ আর মেরি রাসেল মিটফোর্ডের ‘দ্য ভিলেজ ক্রিকেট ম্যাচ’ পড়াই ছিল-এবার খাঁটি দেশজ গ্রাম্য ক্রিকেট ম্যাচের স্বাদ পাওয়া যাবে। অবশ্যই মাঠের বাইরে থেকে এবং নিরাপদ দূরত্বে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর! গ্রামের পুরোনো জমিদারবাড়ি, এখন চৌধুরিবাড়ি বলে পরিচিত, রসুলপুরের ক্রিকেট-চর্চার কেন্দ্র। চৌধুরিমশাইয়ের বয়স ৫৬, মাথা জোড়া টাক, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান, কিন্তু ক্রিকেটে প্রবল উৎসাহ-এককালে নাকি ভালো খেলতেন। ওঁর দুই ছেলে আর ভাইপো বেশ ভালো খেলে। ডাক্তারবাবু (অর্থাৎ আমার মামা) আর পোস্ট মাস্টারমশাইও প্রবীণ ও বিচক্ষণ খেলোয়াড়, মানে ‘হ্যাজ-বিন’দের দলে। আশরাফউদ্দিন নামে এক বেজায় জোরে বোলার আছে, অবশ্য তার কন্ট্রোলের বড্ড অভাব। এ ছাড়া গ্রামের দু-তিনটি কলেজে পড়া ছেলে আছে, বাকিরা স্রেফ টিমের শোভা। রাঘবপুর নাকি ভালোই টিম গুছিয়ে নিয়েছে, তাদের বক্তব্য ‘রঘুপতি রাঘব রাজা রাম’-সেই রামের কৃপাতেই রাঘবপুর নাকি তরে যাবে। শুনেই চৌধুরিমশাই বললেন, ‘কী! আমি কি ডরাই কভু ভিখারি রাঘবে? আর আল্লা সর্বশক্তিমান, তাঁরই দূত পয়গম্বর বা রসুল। রসুলপুর যে গ্রামের নাম তারা কখনো হারতে পারে?’ এত জোর দিয়ে যখন কথাটা বললেন তখন খেয়ালই হল না যে এ গ্রামের দোল-দুর্গোৎসবের মাথা তিনি, আর এখানে মুসলমান বলতে ওই আশরাফ মিঁয়া। সে অবশ্য মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে বলল, ‘সবই পয়গম্বরের ইচ্ছা, হুজুর।’ এমনি করেই চৌধুরিবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের সামনে নেট প্র্যাকটিসকে কেন্দ্র করে বেশ ক্রিকেট আড্ডা জমে ওঠে। শিবু শম্ভু তো এখানেই পড়ে থাকে, আমিও বিকেলের দিকে একটু ঘুরে যাই। মামিমা গজগজ করেন- তবে দেখলাম রাগ করলে ওঁর রান্নার হাতটা আরও খুলে যায়।

এদিকে খেলার দিন যত এগিয়ে আসছে, চৌধুরিমশাইয়েরও খুঁতখুঁতানি বাড়ছে। একজন চৌখস প্লেয়ারের বড্ড অভাব। বলেন আর আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকান। আমি অবশ্য আমার বক্তব্য দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দিয়েছি। আর করবই বা কী, খেলতেই তো পারি না ছাই। তিনি অত্যন্ত অখুশি, বারংবার বলেন, ‘অত বড়ো ক্রিকেট পরিবার। আর উনি নাকি খেলতেই পারেন না। কী করতে পড়াশোনা শিখেছিলে, বাপু? ও সব অঙ্ক-টঙ্ক কষে কোনো মহৎ কাজ হয় না, ক্রিকেটেই জীবনের সব সমস্যার সমাধান, বুঝলে?’ অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল- হায় রে, ক্রিকেট থেকে যদি সব সমস্যা সমাধান হত! হঠাৎ কানে এল মামা বলছেন, ‘হ্যাঁ রে তোর ওই বন্ধুটি-লাড্ডু না গাড্ডু কী যেন নাম! ও এসে খেলে দিতে পারে না? একটাই তো ম্যাচ!’ আরে, এটা তো মাথায় আসেনি। তক্ষুনি লাড্ডুকে ফোন, সেও এককথায় রাজি। ওই সময়টায় নাকি বেঙ্গল টিম ধানবাদ যাচ্ছে টি টোয়েন্টি খেলতে, তখন লিগ বা নক-আউট খেলাও বন্ধ। ও সে-দলেও নেই। সুতরাং একদিন এসে খেলে যাবে ম্যাচটা। আর একবার কলকাতা গিয়ে ব্যাপারটা পাকা করে এলাম। ২৩শে লাড্ডু আসবে, ২৪শে ম্যাচ, ২৫শে আমরা দু-জনেই ফিরব। একটা রাত ওর বাড়িতে থাকব, ২৬শে সকালে মা-র ট্রেন হাওড়া ঢুকছে। চৌধুরি মশাইয়ের উৎসাহ দেখে কে? বারবার বললেন, ‘ভাই, তুমি আমাদের গ্রামের মান বাঁচালে। ম্যাচটা বাঁচুক, তুমি যা চাইবে তাই দেব, আমাদের চৌধুরি বংশে মরদকা বাত, হাতিকা দাঁত!’ অবশ্য উত্তেজনায় তিনি ভুল করে ‘মরদকা দাঁত, হাতিকা বাত’ বলে ফেলেছিলেন। সে যাক গে। সবাই আনন্দে মাতোয়ারা। আসলে, লাড্ডুর নামের সুরভি এ গাঁয়েও পৌঁছে গেছে আর সেই সঙ্গে আমারও খাতির বেড়ে গেছে। আশরাফ মিঁয়া পর্যন্ত ওর বাড়িতে বানানো বিরিয়ানি, চাঁপ আর ফিরনি খাওয়াল একদিন। খুবই উমদা! তারপরেই ফিসফিস করে বলে ‘লাড্ডু সাহেবের ইন সুইং-এর গ্রিপটা একটু দেখাবেন?

ওটাই সবচেয়ে খতরনাক। অসতর্ক হলেই বোল্ড বা এল বি!' আমি তো অবাক! গ্রিপ দেখাব আমি? অবশ্য সুইং বোলিং-এর ফিজিক্সটা আমি বুঝি, ইন্টারনেটে রিভার্স সুইং-এর উপর লেখা একটা আর্টিকলও পড়েছি। কিন্তু সিম কোথায় থাকবে, আঙুল কোথায়, এসব আমি কী করে বলব? আশরাফের তাৎক্ষণিক জবাব 'এ সব পড়ি-লিখি আদমিদের নিয়েই যত মুশকিল!' চৌধুরিমশাইও তেরিয়া হয়ে বললেন 'এ তোমার ভারি অন্যায়। এত দিন পাশাপাশি আছ, ইন সুইংগারটা শিখতে পারলে না?' কী বিপদ! লাড্ডুও তো আমার কাছে ক্যালকুলাস বা কোঅর্ডিনেট জিয়োমেট্রি শিখতে পারেনি, আমি কি সেজন্য কিছু বলেছি?

এদিকে বিপদের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। ২১শে খবর এল যে চৌধুরি মশাইয়ের বড়ো ছেলেকে ব্যাঙ্গালোর থেকে জার্মানি যেতে হবে। সে আসতে পারবে না। ২২শে কলকাতায় এসেই দেখি কেম্ব্রিÑজের চিঠি। তারা আমাকে ট্রাইপস প্রোগ্রামে ভরতি করতে রাজি, আগাম অভিনন্দনও জানিয়েছে। কিন্তু এখন ফান্ডিং নেই, একটি বছর কাটালে কিছু জোটা সম্ভব। এক বছরের রাহা খরচ পাঁচ লাখ, তা আমার কল্পনার বাইরে। মনটা খারাপ হয়ে গেল, কেমব্রিজ হাতছানি দিয়েও নাগালের বাইরে রয়ে গেল। দেখি, যদি আই.আই.টি. কানপুরটা লেগে যায়। ২৩শে ভোর বেলা ফোনটা বেজে উঠল। ধরেই শুনি লাড্ডুর উত্তেজিত গলা! হঠাৎ নাকি লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মনোজ তেওয়ারি আর সৌরভ সরকার ভাইরালে কাবু। ওকে এখনই ছুটতে হবে ধানবাদ। জামাডোবায় ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে ম্যাচ, টিমেও হয়তো চান্স পেয়ে যাবে। কংগ্রাচুলেট করে ফোনটা রাখলাম। লাড্ডুর তো হিল্লে হয়ে গেল, এবার রসুলপুরের কী হবে? বেলা বাড়তেই খবরটা দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ল। চৌধুরিমশাই উদভ্রান্তের মতন ছুটে এসে বললেন, 'তোমার বন্ধুটির যখন এই অবস্থা, তোমাকেই খেলতে হবে। একটু প্র্যাকটিস করে নাও, ম্যাচটা বাঁচাতে হবে বাবা-তোমাকে খুশি করে দেব।' ভদ্রলোক দেখলাম, যাকে বলে, 'ইনকরিজিবল অপটিমিস্ট'!

বেলায় বাধ্য হয়েই গেলাম ওদের নেট প্র্যাকটিসে। একজোড়া কেডস পর্যন্ত নেই, মামার পুরোনো জুতো জোড়ায় সামনে তুলো গুঁজে চালিয়ে দিতে হবে। কারোকে বোঝাতে পারলাম না যে আমার নেট প্র্যাকটিস দরকার নেই, ক্রিকেটের সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পর্ক নেই কতকাল! কে কান দেয় এসব কথায়? যাক, শেষ পর্যন্ত আধ ঘণ্টার ব্যাটিঙে ১৯ বার আউট হলাম। যেন সেই গঙ্গারাম-'উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে, ঘায়েল হয়ে থামল শেষে'। কিন্তু থামার কোনো লক্ষণই নেই। তারপর ফিল্ডিং প্র্যাকটিস, তার পরে বিশ্লেষণ ও আলোচনা। তবে ঘায়েল হয়েছিলাম বটে-কনুই ছড়ে গেছে, হাঁটুতে প্রবল ব্যথা, কোমর টাটাচ্ছে, ঘাড় কনকন, কান ভনভন। শরীরের কোন অঙ্গটা যে ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম না। সন্ধ্যায় মামাবাড়ি ফিরতে ব্যথাটা আরও বাড়ল। মামি বললেন, 'ছেলেটাকে খুন না করে তোমাদের স্বস্তি নেই। আহা, কী অবস্থা বেচারার! কাল যদি তেমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়, এই রোগা শরীরে ও কি আর টিকে থাকবে? পুলিশ কেস হবে আর তোমাদের নাটের গুরু চৌধুরিমশাইকে হাজত-বাস করতে হবে, হ্যাঁ!' মামা চিন্তিত মুখে দুটো ব্যথার বড়ি দিলেন। রাত্রে টোস্ট আর স্যুপ খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

আশ্চর্য, পরের দিন দেখি শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে, মনেও একটা ফুর্তির ভাব! ভাবলাম, কী আর হবে? একটা খেলা বইতো নয়। ওদিকে মামা বলেই যাচ্ছেন, 'জিততেই হবে। মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পাতন ...'। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরোলাম। মামিও দেখি ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। বললেন, 'পুলিশে খবর দিতে সুবিধা হবে।' মুচকি হেসে বললাম, 'মামি, স্বেচ্ছায় খেলছি তো! যদি মরি, আত্মহত্যাই হবে-খুনের

মামলা টিকবে না।' মামি বললেন, 'বালাই ষাট! তবে তা হলেও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেবার একটা ধারা আছে না? তাতেই ফাঁসবে চৌধুরি বুড়ো আর এই ছোঁড়াগুলোও বাদ যাবে না,' বলেই কটমট করে ছেলেদের দিকে তাকালেন। বুঝলাম, তিনি বেশ মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজের আইন-আদালতের পাতাটা পড়েন।

ফুর্তির ভাবটা খানিকটা কাটল মাঠে পা দিয়ে। মাইল চারেক দূরে নদীর ধারে বিশাল মাঠ। সেখানে রোলার চালিয়ে একরকম পিচ তৈরি, ম্যাটিং পাতা, দু-ধারে উইকেট পোঁতা। দু-পাশে বিরাট সামিয়ানা, গিজগিজ করছে ভিড়। থেকে থেকে এরা গর্জে ওঠে, 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম', আবার ওরা হাঁক পাড়ছে 'আল্লা রসুল'। উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। শিবু আর শম্ভুর দেখি খুব আনন্দ, আমাকে বলল, 'বেশ জমেছে, আজ মারপিট না হয়েই যায় না।' আমার তো আক্কেল গুড়ুম-'মারপিট হয় নাকি রে?' উত্তরে শুনলাম 'এমনিতে হয় না, তবে হলে জব্বর হয়।' ওদিকে আম্পায়ারদের উপর চোখ বুলিয়ে চৌধুরিমশাই ফিসফিস করে বললেন, 'হাইলি সাসপিশাস! একটা বোধ হয় পার্চেজড!' সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা!

একটু পরেই টস। চৌধুরিমশাইয়ের সঙ্গে টস করতে নামলেন ও গাঁয়ের মিত্তিরমশাই, তাঁর বয়স ও চেহারা তথৈবচ। একটু বাদেই ঢাকঢোল জগঝম্প বেজে উঠল, রাঘবপুর টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছে। চৌধুরিমশাই অবশ্য দমবার পাত্র নয়, গোঁফে চাড়া দিয়ে বললেন, তিনিও তাই চাইছিলেন। সকালের উইকেটে নাকি ব্যাট করা শক্ত, পরে উইকেটটা 'ইজি' হয়ে যায়। সকলেই ঘাড় নাড়ল, অগত্যা আমিও। শুনলাম একদিনের ম্যাচ বটে, তবে ওভার সংখ্যা বাঁধা নয়। সকাল ন-টায় শুরু করে সাড়ে বারোটা অবধি ব্যাট করবে রাঘবপুর, যদি অল আউট না হয়ে যায়। তারপর এক ঘণ্টা লাঞ্চের বিরতি। ফের রসুলপুর খেলবে সেই সাড়ে তিন ঘণ্টা। সরাসরি হার বা জিত, তবে ড্র-ও হতে পারে। সাধারণত নাকি হার-জিতের ফয়সালা হয়েই যায়।

এবার খেলা শুরু। রাঘবপুরের দু-টি অল্পবয়সি ছেলে ব্যাট করতে এল। আমাদের বোলিং শুরু করল আশরাফ আর চৌধুরিমশাইয়ের ভাইপো। আশরাফের প্রথম ওভারেই একটা বল নীচু হল, ব্যাটসম্যান বোল্ড। পরের ওভারে আরেকজন! প্রবল উৎসাহে আশরাফ পরপর দুটো বাই ৪ দিল। আর চৌধুরিমশাইও প্রবল উৎসাহে আমার সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে আমাকে টেনে আনলেন থার্ড স্লিপে। কিছু বোঝার আগেই একটা বল ব্যাটের কানায় লেগে আমার বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে লেগে বিদ্যুৎবেগে চলে গেল বাউন্ডারিতে। আশরাফ হাত তুলল আকাশে, আমি হাত তুললাম চোখের কাছে-ও কী দেখল জানি না, আমি দেখলাম হাড়ে চোট ছাড়াও খানিকটা চামড়া উঠে বেশ জ্বালা করছে। এবার চৌধুরিমশাই বাধ্য হয়েই আমাকে সরিয়ে দিলেন বাউন্ডারি লাইনে। আর রান উঠতে লাগল ঝড়ের বেগে, দুই ব্যাটসম্যান ধড়াদ্ধড় চালাচ্ছিল আর ফি ওভারে দু-তিনটে করে চার হচ্ছিল বোলারকে রেয়াত না করেই। আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, মাঠের মধ্যে যেখানেই দাঁড়াই না কেন, বল আসে মোটামুটি আমার দিকেই। দু-তিনটে বাচ্চা ছেলে হাততালি দিয়ে 'খনি, খনি' বলে চিৎকার করছিল। তাতে ঘাবড়াইনি, কারণ এরকম শোনার অভ্যাস ছিল এককালে। কিন্তু ওদের রান চড়চড় করে ১০-২ থেকে ১৫০ ছাড়িয়ে গেল। তখন একদিকে বল করছেন মামা-যাকে বলে 'জেন্টল অফস্পিন', অন্যদিকে চৌধুরিমশাই উঁচু উঁচু লোপ্পা বল ছাড়ছেন-দেখেই কনান ডয়েলের সেই 'স্পেডেগুর ড্রপার'-এর গল্পটা মনে পড়ে গেল। তখনই সেই ঘটনাটা ঘটল! মামার বলে দাড়িওয়ালা ব্যাটসম্যানটি সপাটে চালিয়েছিল লং অনের দিকে। আমি লং অফ থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটছি, হঠাৎ কী করে যেন আমার হাতে বলটা জমে গেল। কে যে বেশি

আশ্চর্য হল, দাড়িওয়ালা না আমি, ঠিক বোঝাই গেল না। আর একটু বাদেই আরেকটা বল কেমন ভাবে জানি আমার হাতেই জমা পড়ল! ওদের রান তখন ১৭৮-৪। বেশ মজা লাগছে এবার। একটু বাদেই চৌধুরিমশাইয়ের একটা লোপ্পা বলকে হাঁকড়াল ব্যাটসম্যান। কানায় লেগে বলটা উঠে গেল মহাশূন্যে, তারপর নেমে আসতে লাগল সোজা আমার দিকে। 'ক্যাচ ইট' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন চৌধুরিমশাই! একী স্বপ্ন না সত্যি? আমি রাজেন রায়চৌধুরি, ম্যাথেমেটিশিয়ান, কি সত্যি সত্যি পরপর তিনটে ক্যাচ ধরে ফেলছি? তবে স্বপ্ন থেকে রূঢ় বাস্তবে ফিরে আসতে সময় লাগল না। বলটা আকাশ থেকে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল। তার পরেই হাতের কানায় লেগে কপালে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা আর সব কিছু অন্ধকার। আমিও পপাত ধরণীতলে!

জ্ঞান ফিরতে দেখি মাঠের বাইরে একটা ইজি-চেয়ারে আধশোয়া। রক্তে ভেসে গেছে শার্ট ও সোয়েটার, আমাকে ঘিরে মামা-মামির উদবিগ্ন মুখ। মামা কপালে একটা বড়ো ফেট্টি লাগাচ্ছেন, বললেন, 'স্টিচ লাগবে না, টিংচার বেনজিন সিল করে দিয়েছি। একটু বিশ্রাম কর, ঠিক হয়ে যাবি।' সেরকম কোনো সম্ভাবনা দেখলাম না, মাথাটা বেশ ঝিমঝিম করছে। তার মধ্যে মামা দৌড়োলেন মাঠে, আবার বোলিং শুরু হচ্ছে। আমার জায়গায় বোধ হয় শিবু ফিল্ড করছে। কিন্তু আর ক্যাচ উঠল না, রান উঠল-অনেক! সাড়ে তিন ঘণ্টায় রাঘবপুর করল ২৮৭-৪! এত রান নাকি কখনো হয়নি।

এবার লাঞ্চের পালা। এই পর্বতপ্রমাণ রানের বোঝা দেখে সবাই কেমন ম্রিয়মান, খেতেও পারছে না ভালো করে। টম্যাটো স্যুপ, চিকেন স্টু, পাঁউরুটি আর স্যালাড। খেতে বেশ লাগল কিন্তু। রাঘবপুরের ব্যবস্থা আলাদা, ওরা বেশ হইচই করে খাচ্ছে। মামিমা বললেন, 'যাক, প্রাণে বেঁচে আছিস এই ঢের! এবার চল, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করবি।' দোনামোনা করছি, চৌধুরিমশাই বললেন, 'না বউমা। আমি যখন ক্যাপ্টেন তখন ম্যাচের শেষ অবধি ও আমার কন্ট্রোলে। এ ম্যাচ জেতা সম্ভব না হতে পারে, ড্র তো করা যায়। যদি ওর প্রয়োজন পড়ে ...।' ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মামা বললেন, 'হ্যাঁ, এখন মাঠ ছেড়ে যাওয়াটা ... ইট ইজ নট ক্রিকেট। তা ছাড়া, চোট লেগেছে বটে, কিন্তু তেমন প্রয়োজন হলে দু-চারটে বল খেলে দিতে পারবে। কী রে, পারবি না?' অগত্যা মাথা নাড়লাম। চৌধুরিমশাই বললেন, 'আশা করি তার দরকার পড়বে না।' মামিমা ওঁর সামনে তেমন কিছু বললেন না, চাপা গলায় আমাকে বললেন, 'হুঁঃ! তোর মামা আবার ডাক্তার! ভাগনেটা আধমরা হয়ে আছে, এখন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে চায়। কালই আমি কলকাতার ভালো ডাক্তার দেখাব।' মামা চুপ, শিবু-শম্ভু একযোগে বলল, 'সে কী মা, সবাই যে বলে বাবা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী!' মামি একবার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে ওদের দেখলেন।

খেলা শুরু হল। একটু পরেই বোঝা গেল যে চৌধুরিমশাইয়ের আশা নেহাতই দুরাশা মাত্র! প্রথমে একটা উইকেট পড়ার পর মামা আর চৌধুরিমশাইয়ের ছোটোছেলে বেশ দেখেশুনে খেলছিল। এক ঘণ্টায় ৪০-১। তবে কি ম্যাচটা বেঁচে যাবে? ঐকিক নিয়মে তিন ঘণ্টায় রান দাঁড়ানো উচিত ১২০-৩। কিন্তু স্পষ্টই দেখা গেল; ক্রিকেট ম্যাচ সে নিয়ম অনুসরণ করে চলে না। একটি ঢ্যাঙা মতন ছেলে বল করতে এল, তরফদার না কী যেন নাম! রাঘবপুরের সমর্থকরা তাকে দেখেই নড়েচড়ে বসল। তার বলেও দেখি বেশ তেজ। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাটসম্যানরা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ল। কিন্তু মধুসূদন কি রাঘবকে ছেড়ে রসুলের দিকে আসবেন? দেখতে দেখতে ধস নেমে গেল-৪০-১ থেকে ৬৮-৬। রাঘবপুরের চিৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। আর তরফদারের পরের ওভারে যা ঘটল, তা না বলাই ভালো। সেকেন্ড, থার্ড আর ফোর্থ বলে আমাদের তিন ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নমুখী। অবশ্য মামার মতে একটা ডিসিশন 'ডাউটফুল'।

কে কোথা থেকে প্যাড পরিয়ে দিল, গ্লাভস আর প্রোটেক্টর এনে দিল জানি না। মামিমা প্রায় অস্ফুটে বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা!' ধীরে ধীরে মাঠে নামছি, স্থির নিশ্চিত জানি একটাই কথা-দেড় ঘণ্টা ব্যাট করা আমার পক্ষে অসম্ভব, এক বল টিকব না দুই ওভার সেটাই দেখবার। মাঠ জুড়ে রাঘবপুরের জয়গান, হঠাৎ শুনি 'আল্লা রসুল'। দেখি আমার উলটো দিকে ব্যাট-প্যাডে সুসজ্জিত চৌধুরিমশাইয়ের বিরাট বপু। এমনিতেই তিনি ছুটতে পারেন না, তায় নাকি পায়ের মাসলে স্প্রেন-তাই আশরাফকে রানার নিয়ে খেলছেন। মাসলের আর দোষ কী? ৯৫ কেজি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে তো! মাঝমাঠ থেকে বললেন, 'ম্যাচটা বাঁচাতে হবে ভাই, একটু দেখে খেলো।' ফিল্ডারদের মুখে দেখি চাপা হাসি। কোনো মতে ক্রিজে এসে দাঁড়ালাম, আম্পায়ারকে বললাম, 'লেগ গার্ড'-মানে টিভি থেকে এটাই জানা ছিল। মন স্থির করে নিলাম, বাঁ-পা বাড়িয়ে ডিফেন্সিভ খেলব-গাভাসকরকে যেমন খেলতে দেখেছি। পঞ্চম বল-সোজা ডিফেন্সিভ ব্যাটটা বাড়ালাম কিন্তু বলটা কেমন যেন ঘুরে গেল। খুচ করে একটা শব্দ আর হো-ও-ও চিৎকার, শেষে শুনি ওঃ! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি বলটা ফার্স্ট স্লিপের হাতে লেগে দুই স্লিপের মাঝখান দিয়ে বাউন্ডারি পার। ষষ্ঠ বল-ঠিক একই অভিজ্ঞতা, তবে বলটা গেছে উইকেট কিপার আর ফার্স্ট স্লিপের মাঝখান দিয়ে। আমি হতবাক, ৮ রান হয়ে গেল প্রায় অক্লেশে। রাঘবপুর স্তম্ভিত, রসুলপুর হাততালি দিতে ভুলে গেছে, চৌধুরিমশাই বেশ বিরক্ত 'সোজা খেলছ না কেন?' কী করে বোঝাই সে চেষ্টাই তো করছিলাম। পরের ওভার, বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখি চৌধুরিমশাইয়ের বিপুল পরিধি সত্ত্বেও ব্যাটিং-এ বেশ মুনশিয়ানা আছে। প্রত্যেকটা বল সোজা খেলছেন, দু-চারটে বেশ জোরেও মেরে দিচ্ছেন। আশরাফ ভালো ছোটে, আমারও হালকা চেহারা-অক্লেশে দু-রান তুলে নিচ্ছি। আশরাফ বলল, 'বহুত উমদা,' আমি বললুম, 'সে তো তোমার বিরিয়ানিও।' তবে সব ভালো যার শেষ ভালো, কিন্তু অবাক হয়ে দেখি, পরের ওভারে সব বলগুলো দিব্যি সোজা ডিফেন্সিভ খেলে দিলাম। তার পরের ওভারেও তাই। শুধু একটা বল পায়ে লাগল সজোরে, প্যাডের মধ্যে দিয়েও পাটা ঝনঝন করে উঠল। বিরাট মুখব্যাদান করে তরফদারের অ্যাপিল, কিন্তু আম্পায়ার সাড়া দিলেন না। কেন কে জানে? ও দিকে চৌধুরিমশাই বেশ খেলছিলেন, আরও ক-টা রানও উঠল। একবার অ্যাপিলও হল ওঁর পেটে লাগায়। একী বি বি ডব্লু বা ভুঁড়ি বিফোর উইকেট নাকি রে, বাবা। উনি কটমট করে তাকালেন, আম্পায়ারও আঙুল তোলেননি।

এবার জলপানের বিরতি। জল খেতে খেতেই চৌধুরিমশাই বললেন, 'এইরকম দেখে খেলো। আর এক ঘণ্টা, ব্যাস! কোনোমতে ম্যাচটা বাঁচালেই ...' ওঁর কথা শেষ হবার আগেই রাঘবপুরের রণহুংকার। দেখি আবার তরফদারের হাতে বল। ফিরে এলাম বাস্তবে। প্রথম দুটো বল ঠিক ডিফেন্সিভ খেলেছি। থার্ড বলটা একটু ঠুকে দিয়েছিল। সোজা বাঁ-হাতের কনুইয়ে লাগল। ঝনঝন করে উঠল, দেখেই বুঝলাম কালসিটে পড়ে যাবে। আবার ফোর্থ বলটা সাঁত করে ঢুকে এসে বাঁ-গ্লাভসে লাগল, ঠিক যেখানে স্পাইকটা ভাঙা। আঙুলটা প্রায় থেঁতলে গেল। বরফ আর আর্নিকা মাদার টিংচার নিয়ে আসছিল, বারণ করলাম। এমনিতে আমি শান্ত লোক, হঠাৎ মাথায় আগুনের হলকা অনুভব করলাম। এরা পেয়েছে কী? লাস্ট ম্যানকে আউট করতে পারে না? বারবার মারবে নাকি?

রাগের চোটে পরের বলটায় সজোরে ব্যাট চালালাম। বল বাউন্ডারির পার। আবার চালালাম লাস্ট বলে, এবার ব্যাটে বলে হয়নি। উদবিগ্ন চৌধুরিমশাই বললেন, 'করছ কী ভাই! দেখে খেলো!' আর দেখে খেল! পরের ওভারে তিনটে চার মারলাম-একটা কভার দিয়ে, একটা মিড অফ দিয়ে, অন্যটা স্লিপের পাশ দিয়ে। তার পরের ওভারে সপাটে

মারলাম এক্সট্রা কভারের হাতে। সে তৎক্ষণাৎ ফেলে দিল, আর দৌড়ে ২ রান নিলাম। আবার পরের বলটা হাঁকড়ালাম ওর দিকে। ল্যাঠা মাছ ধরার মতন ছটফট করে বলটা বাউন্ডারি পার করে দিল। 'হ্যাঁ, খনি বলছিলে না? ওই দিকে খনি' বলে দেখালাম ওর দিকে। ক্যাপ্টেন ওকে সরালেন লং অফে, আর তখুনি গগন-গগনে মারলাম ওর দিকে। রাঘবপুরের সিংহ-গর্জন থেমে গেল যখন বলটা ওর আঙুলে লেগে চার হয়ে গেল। ফিল্ডারও চোট খেয়ে মাঠের বাইরে। পরের ওভারে, তরফদারকে দুটো সোজা চার। কোত্থেকে এসব যুৎসই মার আসছে? এবার পরের বলটা সে ছুড়ে দিল আমার চোট খাওয়া মাথার দিকে। চোখে দেখলাম কি দেখলাম না, ব্যাটটা চলল গদার মতন-বলটা ডিপ স্কোয়ার লেগের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ছয়! তরফদার দেখি দু-হাতে মাথা চেপে ধরে টলছে। চৌধুরিমশাইও চুপ। আধ ঘণ্টায় ৭২ রান উঠল, আমি ৪৮, চৌধুরিমশাই ২৪। তরফদার আগে ৮ ওভারে ১৬ রানে ৮ উইকেট নিয়েছিল, এখন ১১ ওভারে ৫৬ রানে ৮ উইকেট।

এবার ওরা বেশ ঝিমিয়ে পড়েছে। মাঠ জুড়ে 'আল্লা রসুল' চিৎকার। এবার চৌধুরিমশাইকে বললাম, 'একটু দেখে খেলুন,' তিনি বাক্যহারা। আমাকে তখন খুনের নেশায় পেয়েছে, বোলিং খুনের নেশায়। শেষ আধ ঘণ্টায় ছয় ওভার বোলিং হল-চৌধুরি ৬ রান করলেন, এক্সট্রা ১৫ (তিনটে ওয়াইড চার) আর আমি ৫৫-তিনটে ছয়, আটটা চার, পাঁচটা সিঙ্গলস। অবশ্য আমার আরও তিনটে ক্যাচ ওরা ফেলেছে। খনি আর কাকে বলে? দিনের শেষে আমরা ২১৬-৯, আমি ১০৩ নট আউট, চৌধুরি ৩০ নট আউট। ম্যাচ ড্র!

ওরা আমাকে কাঁধে করেই মাঠের বাইরে আনল। চৌধুরিমশাই তখনও স্পিকটি-নট, আমি ঢকঢক করে দু-গেলাস জল খেয়ে একটু স্বস্তি বোধ করছি। মামি বরফ নিয়ে এলেও আর লাগালাম না। চৌধুরিমশাইকে বললাম, 'সরি, মাথাটা বড্ড গরম হয়ে গেছিল।' উনি কোনোমতে বললেন, 'গ্রেট ইনিংস! উইথ সাম ব্লেমিশেজ, বাট এ ট্রুলি গ্রেট ইনিংস।' বলবেন নাই-বা কেন? সাতটা ক্যাচ ফেলেছে ওরা, আরও চারটে ক্যাচ হতে পারত। যা হোক, ট্রফি শেয়ার! ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অবশ্যই তরফদার। চৌধুরিমশাই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'পার্শিয়ালিটি,' আমি হাসলাম। এতক্ষণে মাথাটা হালকা লাগছে, সেই খুনে মেজাজটাও কোথায় সরে পড়েছে।

বাড়ি ফিরছি সদল বলে। শিবু-শম্ভু তো নাচছে, ওদের বোঝাতেই পারি না ক্রিকেট খেলাটা আসলে ঠিক আমার আসে না, শুধু এই ম্যাচে কী যে হল! ওরা মানতে চায় না, রাতারাতি আমাকে হিরো বানিয়েছে। মামা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, এবার প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'তোর বাবারও এটা ছিল, জানিস! এমনিতে মাটির মানুষ, যদি বোলারের বলে হাতে চোট পেত বা বাইরে কেউ টিটকিরি দিত, একেবারে খেপে উঠত। আর তখন লোপ্পা ক্যাচ দিলেও কেউ ধরতে পারত না।' আমি তো স্তম্ভিত! শিবু-শম্ভুকে বললাম, 'আমাকে বোধ হয় কিছুতে পেয়ে বসেছিল, জানিস!' ওরা বুঝতেই পারে না। মামি বললেন, 'ও সব কথা থাক না এখন, দুর্গা দুর্গা!'

রাতে চৌধুরিমশাইয়ের বাড়ি সবার নেমন্তন্ন। ভেবেছিলাম সারা দিনের ধকলের পর যেতে পারব না, কিন্তু শরীরটা ভালোই লাগছিল। দারুণ খ্যাঁটের ব্যবস্থা-মাছের মাথা দিয়ে ডাল, বেগুনি, আলু-কপির ডালনা, পোলাও, মাংস, টম্যাটোর চাটনি, দই, মিষ্টি। ওদিকে আশরাফ আবার আমার জন্য, 'এস্পেশাল' এনেছে রোগন জোশ। সে বলেই চলছে

‘উমদা ব্যাটিং, বহোত উমদা ব্যাটিং!’ আমি বলি ‘খানাও তো বহু উমদা, কিন্তু পেটের খোলে আর আঁটে না যে!’

এবার বৈঠকখানায় চৌধুরিমশাই দণ্ডায়মান। বক্তৃতা হবে নাকি রে, বাবা! ওঁর বক্তব্য অবশ্য বেশ সংক্ষিপ্ত : ‘বন্ধুগণ, আমরা রসুলপুরের মানুষ সারাটা বছর এই একটি ম্যাচের মুখ চেয়ে থাকি। গত ক-বছর ভালোই কেটেছে। কিন্তু এবার আমাদের সম্মান ধুলায় লুটিয়ে যাচ্ছিল, তা রক্ষা করেছে এই ছেলেটি। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ এরই হওয়া উচিত ছিল, কলকাঠি নেড়ে তা পেয়েছে ওই তরফদার ছোঁড়া! রসুলপুরের সম্মানার্থে আমি রাজেনকে একটা পুরস্কার দেব। এমন পুরস্কার, যা আমাদের বংশের প্রাচীন সম্পত্তি এবং বাস্তবিকই অমূল্য।’ বলতে বলতে বাড়ির চাকর-বাকরেরা একটা পুরোনো তোরঙ্গ নিয়ে এল। আমি তো হতচকিত! পুরোনো জমিদারবাড়ির প্রাচীন সম্পত্তি, একী সোনাদানা নাকি রে, বাবা? তবে কী... ? আবার সেই পুরোনো স্বপ্নটা দেখছি, আবার কেমব্রিজের হাতছানি! যদি এটা থেকে প্যাসেজ আর মাস-দুয়েকের খরচটা জুটে যায়, তবে কি ততদিনে একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারব না? নিজেই নিজেকে বলছি, ‘রাজেন, স্বপ্ন দেখিস না। এ স্বপ্নের জগৎ নয়, রূঢ় কঠিন বাস্তব।’ তবু আমার অজান্তেই স্বপ্নটা ডানা মেলছে। স্বপ্নের চটকাটা ভেঙে গেল এক লহমায় যখন তোরঙ্গটা খুলে চৌধুরিমশাই সাদা কাপড়ে মোড়া কী একটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। এ তো সোনাদানা কি হিরে জহরত নয়। সাদা কাপড়টা খুলে চৌধুরিমশাই আমার হাতে তুলে দিলেন একটি সুপ্রাচীন ব্যাট, পলেস্তারা খসা পুরোনো বাড়ির মতন তার চেহারা। কাঁপা গলায় বললেন ‘এটি আমাদের বংশের প্রাচীন সম্পদ, ঠাকুরদা এনেছিলেন বিলেত থেকে। তুমিই এর যোগ্য উত্তরাধিকারী, তাই তোমাকে দিলাম।’ হাততালি ও সাধুবাদ হল। আমার স্বপ্ন তখন একেবারে ধূলিসাৎ, তবু দু-চারটি কথায় ওঁকে ধন্যবাদ দিয়ে কাপড়ে মোড়া ব্যাটটি বগলে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

মামা একদম চুপ। মামি বিরক্তির সঙ্গে বললেন ‘চৌধুরি বুড়ো দিল তো দিল একটা পুরোনো ব্যাট। ও ব্যাটে কী আর খেলা যাবে?’ বললাম, ‘না মামি। প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো ব্যাট, একটা বল খেললেও ভেঙে যাবে।’ শিবু-শম্ভু ধরে বসল-১০০ বছরের পুরোনো ব্যাট তাদের দেখাতে হবে। কাপড়ের মোড়ক খুলে টেবিলে রাখলাম। আহা বেচারা, সব ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে। মাঝখানটায় লাল লাল বলের ছাপ, সেও ফেড করে গেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল নীচে কার সই। একটু অস্পষ্ট, একটা অক্ষর উঠেই গেছে। ভালো করে দেখি লেখা J. B.–obbs, মাঝখানে অক্ষরটা পড়া যাচ্ছে না, নীচে তারিখ 22.8.1930। বুকটা ধক করে উঠল, একি জ্যাক হবসের পুরোনো ব্যাট নাকি রে, বাবা? মামার পুরোনো উইসডেন ঘেঁটে দেখি ওটা তাঁর শেষ টেস্টের শেষ দিন। মনে পড়ে গেল নব্যযুবক ব্র্যাডম্যান খেলছিলেন সেই টেস্টে। তাঁর মনে হল ‘শেষ ইনিংসে মাত্র ৯ রান। বড়ো কষ্ট লাগল হবসের জন্য, তখন কি জানতাম যে আমার শেষ ইনিংসে এর থেকে ঠিক ৯ রান কম করব?’ কে জানে ক-হাত ঘুরে সেই আশ্চর্য ব্যাট আমার কাছে এল। মামা বললেন, ‘এ সত্যি অমূল্য সম্পদ রে, রাজা!’

এর পরের কাহিনি বেশ সংক্ষিপ্ত। ভারতেই এখন সথেবি আর ক্রিস্টির মতন বড়ো অকশন হাউস এসে গেছে। ই-মেল করতেই ওদের ভ্যালুয়ার কলকাতায় এসে দেখে গেল। বলল, ‘জিনিসটা জেনুইন বলেই মনে হচ্ছে। একটু ভালো কন্ডিশনে থাকলে দাম আরও ভালো পাওয়া যেত। তবে এখানে দাম নেই, বিলেতে পাঠাতে হবে।’ অগত্যা রাজি হলাম, যদিও ইনসিয়োরেন্সেই খরচ পড়ে গেল অনেক। আর তারপর? শুধু স্বপ্নপূরণের খেলা। প্রথম ই-মেলে খবর এল অকশনে ওর দাম উঠেছে, ৮৭,০০০ পাউন্ড।

কল্পনাও করতে পারিনি, এত টাকা। তার পরে কেমব্রিজে ই-মেল, কিংস কলেজে ভরতি, ট্রাইপস, তারপর ডি.ফিল.। এ তো বিশ বছর আগের কথা। এখানেই গবেষণা আর পড়ানোর কাজে ব্যস্ত আছি। অঙ্ক কষতে ভালোবাসি, এখন কাজ করি স্ট্রিং থিয়োরি নিয়ে, দেখি আইনস্টাইনের স্বপ্নপূরণ হয়ে কি না। বিকেলের দিকে হাঁটতে বেরোই। ক্যাম নদীর পাশে ব্রিজ পেরিয়ে হেঁটে যাই ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরি হুইপল মিউজিয়াম বা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির পাশ দিয়ে। কিন্তু কোনোদিনও ভুলি না ফেনার্সের ক্রিকেট মাঠে একটু থামতে। এখানে সত্যিই সবুজ গালচের মতন মাঠ।

শুধু ভাবি, কী করে এসব সম্ভব হল? এর জন্য দায়ী কে-আমি, না চৌধুরিমশাই, না তাঁর অদেখা ঠাকুরদা, না যিনি আমার উপর ভর করেছিলেন তিনি, নাকি পয়গম্বরের দোয়া। নাঃ, এখন ঠিক জানি দায়ী একমাত্র ক্রিকেট। তাই বলি, পড়াশোনা কর আর যাই কর, ক্রিকেটকে অবহেলা কোরো না। ক্রিকেটই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে!

*শারদীয়া ১৪১৫*




## স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘কী বললেন সুলতান, আপনি এই দিন-দুনিয়ার নতুন পয়গম্বর হতে চান? নতুন ধর্মের প্রচারক হবেন আপনি?’ আলাউদ্দিনের সামনে বসে প্রশ্ন করলেন কাজি আলা-উল-মালিক। এ সময়ের হিন্দুস্তানের সবচেয়ে জ্ঞানী এবং শ্রদ্ধেয় মানুষ।

‘কেন কাজিসাহেব, আমি কি যোগ্য নই?’ সুলতান আলাউদ্দিন সুরার পাত্রে চুমুক দিয়ে বললেন, ‘একমাত্র আপনিই পারেন আমার এ স্বপ্ন পূরণ করতে। আপনি যদি আমার প্রজাদের সামনে ঘোষণা করেন ...।’

কাছেই বসেছিল মালিক কাফুর, সুলতানের প্রধান পার্শ্বচর এবং সেনাপতি। সে বলল- ‘মনে করুন কাজিসাহেব, কাফেররাও মনে করে, রাজা সুলতানরা ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি, তাই যদি হবে ...’

কাফুর কথাটা শেষ করার আগেই তাকে হাত তুলে নীরবে নিরস্ত করলেন কাজি আলা-উল-মালিক। সারা দেশ তাঁর পাণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধা জানায়। আর সে কারণেই আজ দিল্লি সুলতান আলাউদ্দিন তাঁকে এই দরবার-ই-খাশে আমন্ত্রণ করে এনে কাজিসাহেবের সাহায্য চেয়েছেন।

কাফুরকে কিন্তু থামানো যায় না, গদগদ কণ্ঠে সে বলতেই থাকে-‘এই সঙ্গে আমাদের আর একটা নিবেদন আছে কাজিসাহেব। এ আমাদের সবার দাবি। আমাদের আলা হজরত সুলতানকে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ঘোষণা করা হোক।’

‘দ্বিতীয় আলেকজান্ডার?’ বিস্মিত প্রশ্নটা যেন ছিটকেই বেরিয়ে আসে কাজিসাহেবের প্রশ্ন থেকে।

‘হ্যাঁ হুজুর, মনে করুন আমাদের দিগ্বিজয়ী সুলতান ইতিমধ্যে প্রায় সারা হিন্দুস্তান জয় করে ফেলেছেন। খুব শিগগির দুনিয়া জয় করতেও বেরোবেন, হিন্দুস্তানের অন্য কোনো সুলতান আজ পর্যন্ত যা পারেননি ...।’

হ্যাঁ, একথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়! কথাটা ভাবতেই একটা তীব্র ঘৃণা যেন কাজী আলা-উল-মালিকের বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠে।

আজ সারা হিন্দুস্তানের মাটি ভিজে আছে রক্তস্রোতে। মাটি খুঁড়লেই উঠে আসছে দুর্গন্ধযুক্ত পচা লাশ। বাতাসে কান পাতলেই শোনা যায় স্বজনহারা অসহায় মানুষের কান্না। বনাঞ্চল থেকে হিংস্র শ্বাপদকুল বেরিয়ে আসছে লোকালয়ের মধ্যে। মাটি খুঁড়ে প্রকাশ্যে খুবলে খাচ্ছে মানুষের পচা শরীর।

ভারত ইতিহাসে সময়টা ত্রয়োদশ শতাব্দী। সেদিন দিল্লির মসনদে ছিলেন আফগানবংশীয় সুলতান জালালুদ্দিন খিলজি। তখন তিনি বয়সে বৃদ্ধ। স্বভাবে সাদাসরল

মানুষ। নিজের দুই পুত্র আরকালি আর রুকনউদ্দিনের চেয়েও সুলতানের প্রিয় ভাইপো আলাউদ্দিন। সেদিন আলাউদ্দিন ছিল প্রকৃতই সুলতানের আলালের ঘরের দুলাল। তার বায়নার শেষ নেই। তবে হ্যাঁ, এই ভাইপোটি কর্মঠ, দক্ষ যোদ্ধাও বটে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তা সুলতান জালালুদ্দিন ভাইপোর সব বায়নাই মিটিয়ে চলতেন। তবে একটা মিটলে আবার নতুন বায়না। আর এ ব্যাপারে তার প্রধান পরামর্শদাতা মালিক কাফুর। একসময় সুলতানই এক দাস বাজার থেকে এই তরুণ দাসটিকে কিনে ভাইপোকে উপহার দিয়েছিলেন। কে জানে, কী জাদুতে প্রথম দিন থেকেই এই ক্রীতদাসটি আলাউদ্দিনকে বশ করেছে। এখন তো তার পরামর্শ ছাড়া একপাও নড়ে না আলাউদ্দিন।

দিনে দিনে আলাউদ্দিনের এই বোলবোলাও কিন্তু জালালুদ্দিনের প্রধান বেগম মালিকা জাহান গোড়া থেকেই পছন্দ করতেন না। বারবার তিনি তাঁর স্বামীকে সতর্ক করেছেন- ‘সুলতান, আপনি কিন্তু নিজের দুই ছেলে থাকতেও ভাইপোকে বড্ড বেশি মাথায় তুলছেন। এজন্য একদিন হয়তো আপনার মাথার তাজটাই ...।’

‘না, না, এ তুমি কী বলছ মালিকা।’ বৃদ্ধ সুলতান প্রশ্রয়ের হাসি হেসেছেন। ‘আলাউদ্দিনের ক্ষমতাটাও দেখ, সারা হিন্দুস্তানে একটার পর একটা জং ফতে করে আমার রাজ্যের সীমানা বাড়িয়েই চলেছে।’

‘সুলতান আপনি স্নেহে অন্ধ, তাই বুঝতে পারছেন না। আলাল আপনার জন্যে লড়ছে না। লড়ছে ভবিষ্যতে নিজের ফায়দার জন্য।’

এবার জালালউদ্দিন একটু গম্ভীর হন। নিজের পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন-‘তোমার আশঙ্কার কারণ বুঝতে পারছি মালিকা। ঠিক আছে, এর বিহিত আমি করব।’

কী বিহিত করলেন সুলতান? নিজের এক মেয়ের সঙ্গে ভাইপো আলাউদ্দিনের বিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মে এ বিবাহে বাধা নেই। সরল ভালো মানুষ সুলতান ভাবলেন এভাবেই তিনি ভাইপোকে আরও নিবিড় বন্ধনে বেঁধে বেগমকে আশঙ্কামুক্ত করতে পারলেন। কিন্তু বাঘ যে ততদিনে সত্যিই রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছে। সে রক্ত ক্ষমতার।

আলাউদ্দিন বিয়ের পরই তার বেগমকে নিয়ে চলে গেল কারায়। এলাহাবাদের কাছে যমুনার তীরে এক বিশাল কেল্লায় বাস করে সে তার হুকুমত চালাতে শুরু করল। মালিক কাফুর এখন তার ক্রীতদাস নয়, প্রিয় পার্শ্বচর, সেনাপতি। সে নিয়মিত আলাউদ্দিনের কানে বিষ মন্ত্রণা দিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে অবশ্য আলাউদ্দিন তার রাজ্য জয়ের ভেলকিও দেখিয়ে চলল। সুলতানি সেনার নেতৃত্ব দিয়ে একে একে জয় করল মালোয়া, ভিলসা, দেবগিরি। শুধু দেবগিরি জয় করে সে লুঠ করল পঞ্চাশ মন সোনা, সাত মন মুক্তো, চল্লিশটা হাতি আর কয়েক হাজার ঘোড়া।

দূতের মুখে একথা শুনে বৃদ্ধ সুলতান জালালুদ্দিন আনন্দেই আটখানা। বললেন- ‘আলাল আমার গর্ব, আমি নিজে যাব কারায় তাকে অভিবাদন জানাতে।’

সেখানে অপেক্ষা করছিল আলাউদ্দিনের আর এক ভেলকি। বেগম মালিকা জাহান কিন্তু পইপই করে বারণ করলেন। গুপ্তচরের মুখে তিনি তাঁর এই ভাইপো-জামাইটির মতিগতির যে খবর পাচ্ছেন তা মোটেই ভালো নয়।

জালালুদ্দিন বেগম মালিকা বা অন্য কোনো হিতাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শকে পাত্তাই দিলেন না।

কিন্তু রাজনীতিতে অন্ধ বিশ্বাস আর স্নেহের বুঝি সত্যি কোনো স্থান নেই। আলাউদ্দিনও সেই সুযোগটাই নিল। এ ব্যাপারে তার দোসর এবং প্রধান পরামর্শদাতা অবশ্যই মালিক কাফুর।

দিল্লি থেকে যাত্রা শুরু করে ১২৯৬ সালের ১৯ জুলাই তারিখে সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির বজরা এসে হাজির হল এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমে। এ মহা পবিত্র স্থানে সুলতানকে অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষা করছিল ভাইপো আলালের বজরা। সুলতানের বজরা এগিয়ে আসতে দেখে আলাউদ্দিন তার বজরায় দাঁড়িয়ে বার বার কুর্নিশ করে কাকা সুলতানকে নিজের বজরায় আমন্ত্রণ জানাল।

জালালুদ্দিন ভাইপোকে দেখে এতই অভিভূত হলেন যে তাঁর প্রিয় দেহরক্ষী আদম খাঁকে পর্যন্ত সঙ্গে না নিয়ে ভাইপোর বজরায় গিয়ে উঠলেন।

সেখানে বজরার মধ্যে ভাইপো বৃদ্ধ সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য হরেক ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। উত্তম সুরা, নর্তকী, সংগীত ... জালালুদ্দিন ভাইপোকে পাশে নিয়ে ফুর্তিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন সারা রাত ধরে।

এদিকে বজরা ছুটে চলেছে কোনো অনির্দিষ্ট পথে।

এরপর যখন রাত শেষ হয়ে এল, নর্তকীরা পায়ের ঘুঙুর বাজাতে বাজাতে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল, গায়িকার কণ্ঠ স্তব্ধ হল। সুলতান জালালুদ্দিন সুরার নেশায় এলিয়ে পড়লেন সুখাসনে ...। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মালিক কাফুর, তার দু-চোখে হিংস্র দৃষ্টি, হাতে চকচকে ধারালো ছুরি। সে ছুরি আমূল বিদ্ধ করল সুলতানের বক্ষ পিঞ্জরে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সে রক্ত বজরা থেকে চুঁইয়ে গিয়ে মিশে গেল পবিত্র গঙ্গার জলে। জেগে ওঠার আগেই চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন সুলতান।



এবার আলাউদ্দিন বজরার কক্ষে ঢুকে মালিক কাফুরের দিকে তাকিয়ে বলল-‘শাবাশ! বহুৎ খুব।’

মালিক কাফুর সোৎসাহে উচ্চ কণ্ঠে প্রভুর জয়ধ্বনি করল-‘সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি জিন্দাবাদ।’

অলক্ষ্যে হাসল মহাকাল!

কিন্তু তখনও তো শুরু। বেগম মালিকা জাহান তাঁর সুলতান স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে সাত-তাড়াতাড়ি ছোটো ছেলে রুকনউদ্দিনকে দিল্লির মসনদে বসিয়ে দিয়েছিলেন। বড়ো ছেলে আরকালি অবশ্য সুফিসন্ত ধরনের মানুষ। এসব রাজনীতির হানাহানি তার ধাতে সয় না। তাই আল্লার নাম জপতে জপতে সে মুলতানে চলে গেল। সেখানে সাধন ভজনেই দিন কাটাবে এই বাসনায়।

কিন্তু তাতে কি সব দিক রক্ষা হল?

বাঘ যখন তাজা রক্তের স্বাদ পেয়েছে, দিল্লির তাজ মাথায় না তোলা পর্যন্ত তার শান্তি কোথায়?

খুব শিগগির আলাউদ্দিন তার বিশাল ফৌজ নিয়ে দিল্লি আক্রমণ করল। মালিকা জাহান বুঝলেন এই রক্তলোভী হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না। সুতরাং দিল্লির মসনদ ছেড়ে ছোটো ছেলে রুকনউদ্দিনকে নিয়ে চলে গেলেন বড়ো ছেলে আরকালির কাছে, তার মুলতানের আশ্রমে।

কিন্তু আলাউদ্দিন পিছু ছাড়ল না। প্রয়াত সুলতানের বংশধর বেঁচে থাকতে সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। তার হুকুমে ছোটো ভাই উলুঘ খাঁ সৈন্য নিয়ে ছুটে গেল মুলতানে।

আরকালি তখন সবেমাত্র দিনের নামাজ শেষ করেছে, আলাউদ্দিনের সেনাদল ঘিরে ফেলল আরকালির আশ্রম। তারপর আর দেরি না করে উলুঘ খাঁ নিজে সেই আশ্রম থেকে টেনে বার করে নিয়ে এল প্রয়াত সুলতানের বেগম আর দুই ছেলেকে। হিংস্র উল্লাসে তাদের অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হল।

এ সংবাদ নিয়ে উলুঘ খাঁ যখন দিল্লি ফিরল, নতুন সুলতান আলাউদ্দিন ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে বলল-'শাবাশ ভাইজান। আর আমার কোনো পথের কাঁটা রইল না।'

এবারও অলক্ষ্যে হাসল মহাকাল।

এরপর শুধু সেনা অভিযান। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে বইতে লাগল রক্তস্রোত। একের পর এক শত্রুর দুর্গের পতন ঘটতে লাগল-গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালোয়া ... এমনকী সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হল আলাউদ্দিনের রাজ্যসীমা।

এ সময়ই একদিন তার প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুর আলাউদ্দিনকে প্রস্তাবটা দিয়েছিল- 'আল্লা হজরত, আমার একটা আবেদন আছে আপনার কাছে।'

'কী আবেদন, বলো কাফুর?' পানপাত্রটা ঠোঁটের কাছে তুলে প্রশ্ন করেছিল আলাউদ্দিন।

'শুনেছি কাফেররা তাদের রাজা-মহারাজকে বলে ঈশ্বরের প্রতিনিধি।'

'বেশখ! আমি সুলতান, আমিও তো পয়গম্বরের দূত,' আলাউদ্দিন জড়িত কণ্ঠে বলল।

'তাহলে হুজুর আপনি পয়গম্বরের মতো একটা নতুন ধর্ম প্রচার করুন না কেন?'

'নতুন ধর্ম!'

'হ্যাঁ হজরত। মনে করুন আপনার এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রজাকে সে ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। আপনি হবেন দুনিয়ার নতুন পয়গম্বর।'

‘আঁ!’ মালিক কাফুরের প্রস্তাবটা শুনে প্রথমটা একটু বুঝি-বা বিষম খেয়েছিল আলাউদ্দিন। তারপর ভেবে দেখল মতলবটা মন্দ নয়।

‘আর জাঁহাপনা, এই সঙ্গে আপনি নিজেকে দ্বিতীয় আলেকজান্ডারও ঘোষণা করে দিন।’

‘আলেকজান্ডার! সে আবার কে হে?’

মালিক কাফুর দাস ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ার আগে এককালে পাঞ্জাব অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। সেখানে সে দিগ্বিজয়ী গ্রিক আলেকজান্ডারের কাহিনি শুনেছিল। সারা বিশ্বজয়ের চমকপ্রদ সে সব ঘটনার কথা এতযুগ বাদেও সেখানকার মানুষ মনে রেখেছে। মালিক কাফুর সে সব গল্প শোনাল আলাউদ্দিনকে। তারপর বলল-‘সুলতান হজরত, আলেকজান্ডারের চেয়ে আপনার কৃতিত্বও কি কম কিছু? সারা হিন্দুস্তান আপনি জয় করেছেন। আপনার আগে অন্য কোনো সুলতান কি ...।’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও হে।’ সুরার পাত্রটা ঠক করে নামিয়ে রেখে আলাউদ্দিন বলল-‘তোমার সব কথা সত্যি কাফুর। কিন্তু এসব ঘোষণা তুমি বা আমি করলে হবে না। এমন একজনকে চাই, যার কথা বিশ্বাস করবে সারা হিন্দুস্তানের মানুষ। এ কাজটা তো শুধু তলোয়ার ধরে হবে না হে ... বলো, আছে কেউ এমন মানুষ, যে আমায় সাহায্য করতে পারে?’

‘আছে জনাব।’ একটু ভেবে মালিক কাফুর বলল-‘কাজি আলা-উল-মুলুক। লোকটার শুধু দিল্লি নয় সারা হিন্দুস্তানে খুব প্রভাব সৎ আর জ্ঞানী মানুষ হিসাবে। তার ভাইপো জিয়া বারনি একজন নামকরা ঐতিহাসিক।’

‘হ্যাঁ, এই লোককেই আমার চাই। কখনো কখনো কলম তলোয়ারের চেয়েও বেশি ধারালো হয়ে ওঠে। কাফুর, তুমি আজই নিজে যাও। কাজিসাহেবকে আমার ‘পয়গামভেজ’। আমন্ত্রণ করে আনো আমার কাছে।’

‘জি হজরত।’

‘কী হল কাজিসাহেব, কিছু বলছেন না যে?’

কাজি আলা-উল-মালিকের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। এতক্ষণ তিনি এই সুলতানের সামনে বসে ভাবছিলেন এর যাবতীয় কীর্তির কথা। ভাবতে ভাবতে মনের ভেতরটা বিরূপ হয়ে উঠছিল। কী স্পর্ধা! শুধু নিষ্ঠুরতা আর ক্ষমতার দম্ভে সুলতান ঈশ্বরের আসনে বসতে চায়!

‘কাজি সাহেব কিছু বলুন। আলা হজরত আপনার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন।’

এবার মালিক কাফুর বলল-‘সুলতানকে পয়গম্বর ঘোষণার দায়িত্ব তো আপনাকেই নিতে হবে।’

‘হ্যাঁ, সে দায়িত্ব আমি নিতে পারি।’ কাজি আলা-উল-মালিক বললেন-‘কিন্তু এজন্যে প্রথমেই সুলতানকে একটা কাজ করতে হবে। অভয় দেন তো বলি।’

‘হ্যাঁ, নির্ভয়ে বলুন।’

‘আপনাকে মসনদ ত্যাগ করতে হবে সুলতান। কারণ পৃথিবীর কোনো ধর্মপ্রচারক বা পয়গম্বর কোনোদিন মসনদে বসেননি।’

শুনে চমকে উঠল আলাউদ্দিন। ফিরে তাকাল মালিক কাফুরের দিকে।

মালিক কাফুর শশব্যস্তে বলল-'না, না। সুলতানের পক্ষে মসনদ ত্যাগ করা সম্ভব নয়।'

'তাহলে উনি পয়গম্বর হবেন কী করে?'

'দরকার নেই তবে পয়গম্বর হয়ে।' আলাউদ্দিন বলে, 'কিন্তু দ্বিতীয় আলেকজান্ডার তো হতে পারি? খুব শিগগির আমি তার মতো দুনিয়া জয় করতে বেরোব।'

'কিন্তু কার ভরসায় সুলতান?' আলাউদ্দিনের কথা শেষ হবার আগেই কাজি আলা-উল-মুলুক বললেন।

'তার মানে?'

'তার মানে, আলেকজান্ডারের এক শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁর নাম অ্যারিস্টটল। গ্রিস দেশের সেরা পণ্ডিত। অত্যন্ত সৎ এবং বুদ্ধিমান মানুষটি ছিলেন একাধারে আলেকজান্ডারের প্রধান মন্ত্রী এবং পরম ভরসাপাত্র। আলেকজান্ডার তাঁর হাতেই রাজ্য এবং সিংহাসনের সব দায়িত্ব ছেড়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্বজয়ে বেরোতে পেরেছিলেন। সুলতান, আপনি কি কারও ওপর এমন ভরসা করতে পারবেন?'

আলাউদ্দিন মাথা নীচু করলেন-না, এমন কোনো বিশ্বাসী মানুষ তার কাছে নেই। কারণ বিশ্বাসের মর্যাদা সে নিজেই কোনোদিন রাখেনি। কাজি আলা-উল-মুলুক বুঝলেন তার মনের কথা। নিঃশব্দে শুধু হাসলেন।

আলাউদ্দিনের দ্বিতীয় আলেকজান্ডার আর হয়ে ওঠা হল না। তবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে সুলতান তার মুদ্রায় এক নতুন খেতাব নিজেই মুদ্রিত করল, 'দ্বিতীয় সেকেন্দার শাহ'।

আলাউদ্দিনের শেষ পরিণতিও হয়েছিল ইতিহাসের অনিবার্য রায় মেনেই। যে ভাবে এই সুলতান তার কাকা জালালউদ্দিনকে তাঁর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে হত্যা করে মসনদ দখল করেছিল, ঠিক তেমনই তার প্রিয় পার্শ্বচর মালিক কাফুর একদিন তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে দিল্লির মসনদ কেড়ে নিয়েছিল।

সেদিনও আর একবার অলক্ষ্যে হেসেছিল মহাকাল!

*শারদীয়া ১৪১৯*

# লেখক-পরিচিতি

## সন্দেশ ১৯১৩-২০১৩

**অখিল নিয়োগী** (১৯০২-৯৩) জন্ম ময়মনসিংহ জেলার সাকরাইল গ্রামে। ছদ্মনাম স্বপনবুড়ো। সাহিত্যিক, নাট্যকার, অলংকরণশিল্পী, সংগঠক। দৈনিক *যুগান্তর* পত্রিকায় ছোটোদের বিভাগ, ছোটোদের পাততাড়ির পরিচালক ও সব পেয়েছি-র আসরের প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *বেপরোয়া, শশী শ্যামলের সাঁকো, বাবুই বাসা বোর্ডিং, বাণী* (নাটক), *স্বপনবুড়োর রকমারি গল্প*±। শিশু সাহিত্যে বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন।

**অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য** (?-?) গল্প লেখক। *সন্দেশ* পত্রিকায় প্রথম পর্বের শেষের দিকে লিখতেন।

**অজয় হোম** (১৯১৩-৯২) জন্ম কলকাতায়। প্রধানত পাখি ও জীবজন্তু বিষয়ের প্রবন্ধ ও ক্রিকেটের আলোচনা লিখতেন। ফ্যান্টাসি লেখাতেও পারঙ্গম। কিছু চমৎকার গল্পও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই : *বাংলার পাখি, মরণ ঘুম* ইত্যাদি। প্রধান সম্পাদক-*প্রকৃতি জ্ঞান*।

**অজেয় রায়** (১৯৩৭-২০০৮) জন্ম শান্তিনিকেতনে। তৃতীয় পর্বের *সন্দেশ*-এ গল্প লেখা শুরু। দুঃসাহসিক অভিযান ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস রচনা করেছেন। গোয়েন্দা রহস্যের গল্পও লিখেছেন। শিশু সাহিত্য রচনার স্বীকৃতিতে বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মঙ্গু, কেল্লা পাহাড়ের গুপ্তধন, আমাজনের গহনে, ফেরোমন* ইত্যাদি।

**অনিতা অগ্নিহোত্রী** (১৯৫৬) উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক। ছোটোবেলায় *সন্দেশ* পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন এবং *সন্দেশ*-এর হাত পাকাবার আসরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা।

**অরুণিমা রায়চৌধুরী** (১৯৩৮) জন্ম ঢাকায়। খুব ছোটোদের জন্যে লেখায় পটু। *সন্দেশ*-এর নিয়মিত লেখক। তাঁর গল্প-উপন্যাস-কবিতার উল্লেখযোগ্য বই : *সেতু বন্ধন, তিড়িং, বংশীধর বাগাল, বন-পাহাড়ের কথা, টুকুস*। বিদ্যাসাগর পুরস্কারে সম্মানিত।

**অশোক দাশগুপ্ত** (১৯৪৮) জন্ম কলকাতায়। *আজকাল* পত্রিকার সম্পাদক। ৭০-এর দশকে *আনন্দমেলায়* প্রথম খেলা সংক্রান্ত ফিচার লেখেন। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় নতুন জোয়ার এনেছিলেন। ১৯৮১-তে আজকালের ক্রীড়া সম্পাদক এবং ১৯৮৬ থেকে আজকালের সম্পাদক। রাজনৈতিক নিবন্ধ, খেলার ফিচারের পাশাপাশি লিখেছেন বেশ কিছু অসাধারণ খেলার গল্প এবং গোয়েন্দাকাহিনিও। গোয়েন্দার নাম সিদ্ধার্থ সেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *নেপথ্য ভাষণ* (কয়েক খণ্ডে), *উটকো সাংবাদিকের ডায়রী, আরো জোরে, রঞ্জির ব্যাট* ইত্যাদি।

**অসিতকুমার হালদার** (১৮৯০-১৯৬৪) জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তাঁর মা সুপ্রভাসুন্দরী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী। তিনি ছিলেন কলাশিল্পী। শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ। জয়পুর ও লক্ষ্ণৌ সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের

পদে বৃত ছিলেন। চলিত বাংলায় চমৎকার লিখতেন। হো-দের গল্প লিখেছেন ছোটোদের জন্য। *অজন্তা, বাঘগুহা* ও *রামগড়* ইত্যাদি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

**আশাপূর্ণা দেবী** (১৯০৯-৯৫) জন্ম কলকাতায়। বালিকা বয়সে কবিতা লিখে পুরস্কৃত হয়েছেন। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। রবীন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার সহ অনেক সাহিত্য সম্মানও পেয়েছেন। ছোটোদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা, রাজকুমারের পোশাকে, গজু উকিলের হত্যা রহস্য, ভাগ্যি যুদ্ধ বেঁধেছিল, কিশোর সাহিত্য সম্ভার* ইত্যাদি।

**ইলা রায়** (১৯০০-প্রয়াত) জন্ম কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোরের চতুর্থ ভ্রাতা কুলদারঞ্জনের কন্যা। ছোটোদের জন্য লেখার হাত ছিল চমৎকার। প্রথম পর্বের *সন্দেশ*-এ প্রচুর গল্প ও অন্যান্য লেখা অনেক লিখেছেন।

**উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী** (১৮৬৩-১৯১৫) জন্ম ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে। মেধাবী ছাত্র, সংগীত শিল্পী, বাঁশি, হারমোনিয়াম, বেহালা, পাখোয়াজ বাজনায় পারদর্শী। ফোটোগ্রাফি চর্চা থেকে ব্লক নির্মাণ শিল্পী। গল্প লেখায়, ছবি আঁকায় অতুলনীয়। ছোটোদের স্বপ্নের পত্রিকা *সন্দেশ* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত। উল্লেখযোগ্য ছোটোদের গ্রন্থ : *টóনটুনির বই, সেকালের কথা, ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, ছোট রামায়ণ, মহাভারতের গল্প* ইত্যাদি।

**উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** (১৮৮৩-১৯৬০) জন্ম ভাগলপুরে। ওকালতি পেশা ত্যাগ করে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। *বিচিত্রা* নামে একটি বিশিষ্ট পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পরে *গল্প ভারতী*-রও সম্পাদক হন। কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *বিদূষী ভার্যা, ছদ্মবেশী* প্রভৃতি।

**এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩৪-) জন্ম কলকাতায়। ছড়া, প্রবন্ধ, গল্প লেখেন। সহ-লেখক স্বামী শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে *পরমাণু জিজ্ঞাসা* গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। ছোটোদের জন্য লেখায় বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বই : *মানুষ যেদিন হাসবে না, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা* ইত্যাদি।

**কল্যাণী চক্রবর্তী** (১৯১১-২০০২) উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয়া কন্যা পুণ্যলতার জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণী প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের *সন্দেশ*-এ বেশ কয়েকটি গল্প ও অন্যান্য ধরনের লেখা লিখেছেন। পরে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমান পর্বের *সন্দেশ*-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

**কুলদারঞ্জন রায়** (১৮৭৩-১৯৪৮) জন্ম ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে। উপেন্দ্রকিশোরের চতুর্থ ভ্রাতা পেশায় ফোটোগ্রাফার ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর পরিকল্পিত *সন্দেশ* পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি ক্যামেরার সাটারের সঙ্গে কলমও হাতে তুলে নেন। দেশ-বিদেশের পুরাণ কথা, লোককথা অতি সরস ভাষায় লিখে বাংলার ছেলে-মেয়েদের উপহার দেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর, ইলিয়াড, ওডিসিয়ুস, আশ্চর্য দ্বীপ* ইত্যাদি।

**কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়** (১৮৯১-১৯৬৫) জন্ম বাঁকুড়া জেলার পাঠকপাড়ায়। পিতৃদেব বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কেদারনাথ উচ্চশিক্ষার্থে বিলেতে গিয়েছিলেন, সুকুমার রায়ও তখন ওদেশে। সুকুমারের অনুরোধে তিনি *সন্দেশ*-এর জন্য ‘ভবম হাজম’

গল্পটি লিখে দেন। জগন্নাথ পণ্ডিত ছদ্মনামে বেশ কয়েকটি কিশোর উপভোগ্য চমৎকার গল্প রচনা করেন। *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিয়্যু* পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। ছোটোদের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থ : *জগন্নাথের খেয়ালখাতা*।

**ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য** (১৯০২-৭৬) জন্ম শ্রীহট্ট জেলার নর্তন গ্রামে। কলকাতা আর্ট স্কুলে পাঠকালে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণবোধ করেন। বন্ধু অখিল নিয়োগীর সঙ্গে *মাস পয়লা* নামে দু-পয়সা দামের ছোটোদের মাসিকপত্র বের করেন। পরে বিশু মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গী করে *রবিবার* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও বের করেছিলেন। দু-টি পত্রিকাই অভিনবত্বের গুণে সাড়া জাগালেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

**গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯২২-২০০৪) জন্ম কলকাতায়। প্রতিভাসম্পন্ন গল্পলেখিকা। এঁর স্বামী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ববির বন্ধু, হনুমানুষ, পিকলুর সেই ছোটকা* ইত্যাদি।

**গৌরী ধর্মপাল** (১৯৩১-২০১৪) জন্ম কলকাতায়। গল্প-কবিতা লেখায় সিদ্ধহস্ত। চমৎকার রূপকথা লেখেন। তাঁর গদ্যে আশ্চর্য স্বাদু কোমলতা লক্ষ করা যায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র, ঘোড়া যায়, ইংলে পিংলে* ইত্যাদি।

**জলধর সেন** (১৮৬০-১৯৩৯) জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে। বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা *ভারতবর্ষ*-এর সম্পাদক। হিমালয় ভ্রমণের কাহিনি লিখে ভ্রমণ সাহিত্যকে বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ছোটোদের জন্যও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *কিশোর, আইসক্রিম সন্দেশ, শিশুবোধ* ইত্যাদি।

**জ্যোতির্ময়ী দেবী** (১৮৯০-১৯৪৫) জন্ম কলকাতায়। ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক ও ডিগ্রিধারী চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী সৈনিক। ওই আন্দোলনের এক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে আহত হয়ে মৃত্যবরণ করেন। তিনি ছোটোদের জন্যে কয়েকটি গল্প, কবিতা এবং নাটিকা লিখেছিলেন।

**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৯৮-১৯৭১) জন্ম বীরভূম জেলার লাভপুরে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। জ্ঞানপীঠ সহ ভারতের সকল প্রধান সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। বয়স্ক পাঠ্য রচনার অবসরে ছোটোদের জন্যও গল্প-কবিতা লিখেছেন। *গণদেবতা, কবি, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন*-তাঁর লেখা অসংখ্য গ্রন্থের কয়েকটি।

**দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার** (১৮৭৭-১৯৫৭) জন্ম ঢাকা জেলার উলাইল গ্রামে। বাংলার রূপকথার অন্যতম লেখক। কর্মসূত্রে ময়মনসিংহে থাকার সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে রূপকথা সংগ্রহ করেন এবং তাঁর লিখিত রূপ প্রকাশ করেন। প্রথম গ্রন্থ *ঠাকুরমার ঝুলি*-র ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রূপকথার আরও বই : *ঠাকুরদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে, ঠানদিদির থলে*। রূপকথা ছাড়া শিশুসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য আরও গ্রন্থ : *ফার্স্ট বয়, লাস্ট বয়, চারু ও হারু, সবুজ লেখা* ইত্যাদি।

**দেবাশিস সেন** (১৯৬১) জন্ম আসামের ডিগবয়ে। প্রথম প্রকাশিত গল্প অধুনালুপ্ত *কিশোর মন* পত্রিকায়। বহু বছর ধরেই *সন্দেশ* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সব ধরনের গল্প, উপন্যাস, ফিচার লেখেন। পত্রিকার প্রয়োজনে স্বনামের পাশাপাশি *সন্দেশ*-এর পাতায় বল বয়, থার্ড আম্পায়ার, গ্রন্থবিমুখ গোস্বামী, সন্দেশি নামেও লেখেন। প্রসাদরঞ্জন রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে

সম্পাদনা করেছেন *সন্দেশ*-এর *সত্যজিৎ* গ্রন্থটি। এছাড়াও সম্পাদনা করেছেন বেশ কিছু গল্প সংকলন। নেশা ফটোগ্রাফি।

**দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু** (১৮৬৫-১৯২১) জন্ম ভাগলপুরে। তিনি ছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাই, সম্পর্কে সুকুমার রায়ের মেজো দাদামশাই। সন্দেশিদেরও মেজো দাদামশাই। *সন্দেশ*-এ তিনি জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ নিয়ে অসংখ্য নিবন্ধ লিখেছেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও *সন্দেশ*-এর জন্য লেখাটি শেষ করেছিলেন। প্রথম পর্বের সন্দেশ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : *জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, চিড়িয়াখানা*।

**ধীরেন্দ্রলাল ধর** (১৯১৩-৯১) জন্ম কলকাতায়। বড়োদের জন্য লেখা কিছু থাকলেও মূলত ছোটোদের জন্য লিখতেন। গল্প-উপন্যাস, ভ্রমণকথা, নিবন্ধ, নাটিকা সব ধরনের লেখা লিখেছেন। যুদ্ধ নিয়ে অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। *আমার দেশের মানুষ* নামে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ এবং উদবাস্তু জীবনের ছোটো ছোটো কাহিনি অপরূপ মমতায় পরিবেশন করতেন। তাঁর লেখা অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : *যুদ্ধ নিয়ে গল্প, নীল নায়ের মাঝি, যতরাজ্যের রূপকথা, লালচাঁদের টাকা নিমচাঁদের লাঠি, প্রিয়দর্শী অশোক*। শিশুসাহিত্যের জন্য বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন।

**ননীগোপাল মজুমদার** (১৯১২-প্রয়াত) জন্ম ঢাকায়। বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্মকতা। *স্বাস্থ্য* পত্রিকার সম্পাদক। *সন্দেশ*-এর দ্বিতীয় পর্বে একটি গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন। দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প ছাড়াও নানা স্বাদের গল্প রচনা করেছেন। প্রবন্ধ এবং নাটকও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *রঙ মেশা, ট্যাঁসরুমে, বাহাদুর, তাই নাকি* ইত্যাদি।

**নবনীতা দেব সেন** (১৯৩৮) জন্ম কলকাতায়। বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী দম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর একমাত্র সন্তান। কৃতী ছাত্রী ও অধ্যাপিকা। গল্প-কবিতা-রূপকথা-ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা সব ধরনের লেখাতেই পারদর্শী। উল্লেখযোগ্য কিশোর সাহিত্য গ্রন্থ : *মসিয়ে হুলোর হলিডে, গল্পগুজব, সমুদ্রের সন্ন্যাসিনী, কিশোর সাহিত্য* ইত্যাদি।

**নলিনী দাশ** (১৯১৬-৯৩) জন্ম কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোরের দৌহিত্রী। কৃতী ছাত্রী ও শিক্ষাব্রতী। দীর্ঘকাল *সন্দেশ* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। চার কিশোরী গোয়েন্দার দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের কাহিনি গোয়েন্দা গন্ডালু। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *রা-কা-যে-টে-না-পা, মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার, অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি রহস্য, হাতিঘিসার হানাবাড়ি* ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যে বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রাপক।

**নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়** (১৯১৮-৭০) জন্ম দিনাজপুরে। উজ্জ্বল ছাত্রজীবন, বৃত্তি অধ্যাপনা। ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক। ছোটোদের ও বড়োদের সবার জন্য লেখায় সব্যসাচী। টেনিদা কাহিনি কিশোর পাঠকদের কাছে অতি আকর্ষণীয়। ছোটোদের জন্য উল্লেখযোগ্য বই-*চার মূর্তি, ঝাউবাংলোর রহস্য, টেনিদা সমগ্র, তপন চরিত, পঞ্চাননের হাতি, কম্বল নিরুদ্দেশ, রাঘবের জয়যাত্রা, রামমোহন* ইত্যাদি।

**পুণ্যলতা চক্রবর্তী** (১৮৮১-১৯৭৪) জন্ম কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয় কন্যা। প্রথম পর্বের *সন্দেশ*-এ লিখেছেন, তৃতীয় পর্বেরও *সন্দেশ*-এও। একটি অসাধারণ স্মৃতিকথা লিখেছেন *ছেলেবেলার দিনগুলি*। *ছোটো ছোটো গল্প* তাঁর আরেকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

**পুষ্পলতা রায়** (১৮৯৮-প্রয়াত) উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যম পুত্র সুবিনয় রায়ের স্ত্রী। মধ্যপ্রদেশে ছোটোবেলা কেটেছিল, বিবাহের পর কলকাতাবাসী। গল্প লিখেছেন, নিবন্ধও লিখেছেন। প্রথম পর্বের *সন্দেশ*-এর লেখিকা।

**প্রণব মুখোপাধ্যায়** (১৯৫১) জন্ম হাওড়ার শিবপুরে। অধ্যাপনা করতেন। কবি ও গল্পকার। তৃতীয় পর্বের *সন্দেশ*-এ সম্পাদনার কাজে যুক্ত আছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *জল-মাটি-হাল্‌লা*।

**প্রমদারঞ্জন রায়** (১৮৭৪-১৯৪৯) জন্ম ময়মনসিংহের মসূয়া গ্রামে। চাকরি করতেন ভারত সরকারের জরিপ বিভাগে। কর্মসূত্রে তাঁকে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বের দুর্গম লুসাই, জয়ন্তী, মায়ানমার, থাইল্যান্ডের ঘোর বনজঙ্গল, পর্বত-উপত্যকায় বাস করতে হয়েছে। এই সময়ে তাঁর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনি লেখেন প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের *সন্দেশ*-এ। উপেন্দ্রকিশোর চিত্রিত *বনের খবর* নামে সে কাহিনি পাঠকচিত্তে আলোড়ন তুলেছিল। *বনের খবর* হল প্রমদারঞ্জনের একমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ।

**প্রসাদরঞ্জন রায়** (১৯৪৮) জন্ম কলকাতায়। কৃতী ছাত্র। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব। প্রমদারঞ্জনের পৌত্র প্রসাদরঞ্জন বর্তমান পর্বের *সন্দেশ* সম্পাদনার কাজে যুক্ত। ছোটোদের জন্য গল্প লেখায় তাঁর নৈপুণ্য রয়েছে। তাঁর নানা বিষয়ে লেখা প্রবন্ধে গভীর অধ্যয়ন ও অভিনিবেশ লক্ষ করা যায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন সম্পাদনা করেছেন। ছোটোদের জন্য লেখা প্রকাশিত গ্রন্থ: *যমুনাবতী*। তা ছাড়া কয়েকটি মূল্যবান সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

**প্রিয়ংবদা দেবী** (১৮৭১-১৯৩৫) জন্ম পাবনা জেলার গুনাইগাছায়। তাঁর মা প্রসন্নময়ী দেবী কবিতা লিখতেন। প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার *সন্দেশ*-এ তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রিয়ংবদা দেবীর কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করেছিল। সন্দেশে অনেক কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ লিখেছেন। কার্লো কল্লোদির বিখ্যাত কাহিনি পিনোচ্চিয়োর অ্যাডভেঞ্চার-এর অনুবাদ *পঞ্চুলাল* নামে *সন্দেশ*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, ছবি এঁকেছিলেন সুকুমার রায়।

**ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯০২-৫৫) জন্ম কলকাতায়। ছোটোদের জন্য চমৎকার কবিতা লিখতেন। গান-বাজনায় পারদর্শী ছিলেন। বেশ কিছু গল্পও লিখেছিলেন। বিগত শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকে ছোটোদের সকল প্রধান পত্রিকায় তাঁর লেখা দেখা যেত, অবশ্য ততদিনে চন্দ্র হারিয়ে ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে গেছেন। বাংলা শিশুসাহিত্যের জন্য প্রথম পুরস্কার তিনিই প্রবর্তন করেন-তাঁর মায়ের নামে ভুবনেশ্বরী পদক দেওয়া হয় শিশুসাহিত্যে জীবনকৃতী সম্মান হিসাবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *হেস্‌তনেস্‌ত, খুকুর স্বপন*।

**বন্দে আলি মিঁয়া** (১৯০৬-৭৯) জন্ম পাবনা জেলার রাধানগরে। ছাত্র জীবনেই কবিতা রচনা শুরু। বিগত শতকের ত্রিশ-চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে ছোটোদের পত্রিকাগুলিতে তাঁর কবিতা নিয়মিত দেখা যেত। দেশভাগের পরে পাকিস্তানে চলে যান। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য ঢাকা বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। বড়োদের জন্য কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক রচনা করেছেন। ছোটোদের জন্য রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, গল্‌পের আসর, শিকারের গল্‌প; জীবনীগ্রন্থ : কামাল আতাতুর্ক* প্রভৃতি।

**বলরাম বসাক** (১৯৪৩) জন্ম ঢাকায়। দেশভাগের পর এদেশে চলে আসেন। ছোটোদের এবং বড়োদের সাহিত্যে সমান পারদর্শী। তরুণ বয়সে আনন্দমেলায় *পিঁপড়ে হাতি* গল্প লিখে

রসিক পাঠকের চোখে পড়েন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *পিঁপড়ে হাতি, হালুম, হাতি-খরগোশ, ভালুকের দোলনা, ফুল পরিরা বল খেলে, গণ্ডলুলু ভণ্ডুলুটি, রাজকন্যা কমলমালা* ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য রচনার জন্য সাহিত্য আকাদেমি বাল পুরস্কার, উপেন্দ্রকিশোর স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

**বিজয়চন্দ্র মজুমদার** (১৮৬১-১৯৪২) জন্ম ফরিদপুর জেলার খানাকুলে। সুকবি, ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক। ছোটোদের জন্যও লিখেছেন। *সন্দেশ*-এর প্রথম পর্বে নিয়মিত কবিতা প্রবন্ধ ও গল্প লিখেছেন। বার্ষিক *শিশুসাথী* (১৩৩৫ ব.) সম্পাদনা করেছেন। তাঁর লেখা ছোটোদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *যুগপূজা, হেঁয়ালি* ইত্যাদি।

**বিজয়া রায়** (১৯১৭) জন্ম পাটনায়। উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্রবধূ এবং সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী। বর্তমান পর্বের সন্দেশ প্রকাশনার সঙ্গে শুরু থেকেই যুক্ত এবং কিছুকালের জন্য সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। সুগায়িকা। লেখালিখিতেও আগ্রহ ছিল। প্রকাশিত গ্রন্থ : *আমাদের কথা*।

**বিমল দত্ত** (-প্রয়াত) এক সময়ে প্রচুর লিখেছেন। *সন্দেশ* ছাড়া *মৌচাক*-এও অনেক মজার গল্প লিখেছেন, সিংখুড়ো তাঁর বিখ্যাত চরিত্র। অনেকটা ঘনাদার মতো। তাঁর লেখা গ্রন্থ তালিকাটিও দীর্ঘ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *আগডুম বাগডুম, গ্যাস বেলুন, জঙ্গলের রাজা, নিঝুম রাতের কান্না, সিংখুড়োর গল্প* ইত্যাদি।

**বুদ্ধদেব গুহ** (১৯৩৬) জন্ম কলকাতা। পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আবার বনজঙ্গলের গল্প লেখায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পুরাতনী গান ও রবীন্দ্র সংগীতেরও যশস্বী শিল্পী। বড়োদের জন্য যেমন লিখেছেন, ছোটোদের জন্যেও তাঁর কলম তাল মিলিয়ে ছুটেছে। ছোটোদের জন্য লেখা উল্লেখযোগ্য বই : *জঙ্গল মহল, অ্যালবিনো, ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে, দূরের দুপুর, নিনিকুমারীর বাঘ, রুআহা, কিশোর সাহিত্য* ইত্যাদি।

**বুদ্ধদেব বসু** (১৯০৮-৭৪) জন্ম কুমিল্লায়। উজ্জ্বল ছাত্রজীবন, যশস্বী অধ্যাপক। কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার। ছোটোদের জন্যও অনেক লিখেছেন। *সন্দেশ*-এর দ্বিতীয় পর্বের লেখক। তিনি *মৌচাক, রংমশাল* পত্রিকায় গল্প-কবিতা-উপন্যাস লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য কিশোরপাঠ্য গ্রন্থ : *অন্য কোনখানে, এলোমেলো, জলতরঙ্গ, তাসের প্রাসাদ, হাউই* ইত্যাদি।

**ব্রহ্মদাস গোস্বামী** (?-?) *সন্দেশ*-এর দ্বিতীয় পর্বে বেশ কয়েকজন গল্প লেখকের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। ব্রহ্মদাস গোস্বামী সেই দলের অন্যতম।

**মঞ্জিল সেন** (১৯২৬) জন্ম কলকাতায়। ছোটোদের জন্যই প্রধানত লেখেন। তৃতীয় পর্বের *সন্দেশ*-এ অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। শিশুসাহিত্য রচনার জন্য বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *অভিশপ্ত গুপ্তধন, গঙ্গোত্রী রহস্য, চিতার থাবা, নীল সায়রের আতঙ্ক, বাছাই গল্প* ইত্যাদি।

**মণীশ ঘটক** (১৯০২-৭৯) জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। কল্লোল যুগের কবি ও কথাশিল্পী। ছদ্মনাম যুবনাশ্ব। *পটলডাঙার পাঁচালী* তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন এবং ছোটোদের জন্যও কিছু লিখেছেন।

**মতি নন্দী** (১৯৩২-২০১১) জন্ম কলকাতায়। বাংলার প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী। কিশোরদের জন্য তাঁর লেখায় এক আশ্চর্য জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর গল্প-উপন্যাসের পটভূমি

বাংলার ক্রীড়াজগৎ। সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, সাঁতার এমনকী স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসও। ওই জগতের হাসি-কান্না, লোভ-অসূয়া, আদর্শ ও আদর্শহীনতার ছবি নির্লিপ্তভাবে এঁকে গেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ননীদা নট আউট, কোনি, স্ট্রাইকার, জীবন আরম্ভ, ফেরারি, কলাবতী* ইত্যাদি।

**মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য** (১৯০৩-৩৯) জন্ম ফরিদপুরে। ছোটোদের বিশিষ্ট পত্রিকা *রামধনু*-র সম্পাদক। ছাত্রজীবনেই সাহিত্য সাধনার শুরু। ছোটোদের জন্য রহস্য কাহিনি এবং মজার গল্পে তাঁর বিপুল খ্যাতি। বাংলায় জাপানি গোয়েন্দা হুকাকাশিকে এনে এক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে জীবনাবসানে বাংলা শিশুসাহিত্যের এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি, পদ্মরাগ, সোনার হরিণ, চায়ের ধোঁয়া, নূতন পুরাণ* ইত্যাদি।

**মহাশ্বেতা দেবী** (১৯২৮) জন্ম কলকাতায়। পিতা বিখ্যাত সাহিত্যিক মণীশ ঘটক। বিভিন্ন ধরনের গল্প-উপন্যাস লিখে থাকেন। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের কথা তাঁর লেখায় প্রাধান্য পায়। ছোটোদের জন্য অনেক ধরনের লেখা লিখেছেন। তাঁর লেখা ছোটোদের বই : *আরমানি চাঁপার গাছ, মানিক দুলের বন্ধু, গল্পের গরু ন্যাদোশ, পাথরের সিংহ, কালোমানিক* ইত্যাদি।

**মাধুরীলতা রায়** (১৯০৩-প্রয়াত) উপেন্দ্রকিশোরের চতুর্থ ভ্রাতা কুলদারঞ্জনের কন্যা। প্রথম পর্বের *সন্দেশ*-এ বেশ কিছু লিখেছেন। নানা ধরনের লেখা। বুলা (প্রফুল্লকুমার) মহলানবিশের সঙ্গে বিবাহ হয়। পরেও সুকুমার রায় প্রসঙ্গে চমৎকার স্মৃতিচিত্রণ করেন।

**মিমি রাধাকৃষ্ণন** (১৯৫৫) জন্ম কলকাতায়। শান্তিনিকেতন এবং বরোদায় সোমনাথ হোড় এবং কে.জি. সুব্রমণিয়ামের ছাত্রী। শিল্পকলা বিষয়ে পেয়েছেন বেশ কিছু পুরস্কার ও ফেলোশিপ। ১৯৯৯-তে দেশ পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত। ছোটোদের জন্য প্রথম লিখেছেন *সন্দেশ*-এই। প্রাকৃতিক, সম্পদরক্ষায় সক্রিয় কর্মী ও পশুপ্রেমিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : *নিশির ডাক, ষষ্টেন্দ্রিয়, লবঙ্গলতিকা চরিত*।

**মীরা বালসুব্রমনিয়ম** (১৯২৯-৯৫)। বিভিন্ন দৈনিক ও শিশু কিশোর পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। কর্মসূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদাধিকারী এবং প্রবাসী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *তিনটি তামার পয়সা, প্রবলেম সলভার পুল্লা রেড্ডি* ইত্যাদি।

**মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়** (১৯০৯-৬৯) জন্ম কলকাতায়। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র। পরিসংখ্যানবিদ। ছোটোদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেখক। অবশ্য লেখক জীবনের পূর্ণতার সময়ে সৃজনধর্মী লেখা বন্ধ করে যে স্মৃতিমূলক রচনা লিখেছিলেন, তার সাহিত্যমূল্যও কম নয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার, বোর্ডিং স্কুল, সোনার ঝরণা, দক্ষিণের বারান্দা, চরণিক, অল কোয়ায়েট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট* (অনুবাদ) ইত্যাদি।

**যতীন সাহা** (১৯০৬-প্রয়াত) কর্মসূত্রে স্টেটসম্যান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছবি আঁকতেন, চমৎকার গল্প লিখতেন। দ্বিতীয় পর্বে *সন্দেশ*-এর প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন, কয়েকটি গল্পও লিখেছেন। প্রকাশিত বই : *সোনার ঘর, যাদুঘর* ইত্যাদি।

**রণজিৎ রায়** (১৯০৬-প্রয়াত) জন্ম যশোহরে। আই.সি.এস., দুঁদে সরকারি অফিসার। যেমন পড়াশোনা করেছেন, তেমনি শিকারেও পারদর্শী ছিলেন। এইসব অভিজ্ঞতার কথা তার কলমে সত্যি গল্প হয়ে বেরিয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : *শিকার কাহিনী*।

**রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৮৮-১৯৬১) জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমেরিকার ইলিনয় কৃষি বিদ্যালয়ের কৃষি বিদ্যায় স্নাতক। বিশ্বভারতীর কর্মাধ্যক্ষ ও শেষে উপাচার্যও হয়েছিলেন। পল্লি উন্নয়নে তাঁর আগ্রহ ছিল। নিজে শিল্পী ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *পিতৃস্মৃতি, প্রাণতত্ত্ব, অভিব্যক্তি, On the Edges of Time*।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৬১-১৯৪১) জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনে। ইউরোপের বাইরে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। তাই বিশ্বকবি। সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পসৃষ্টিতে সমান গুণী। নতুন ধরনের নাট্যকার, সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। মানুষের মনের সমস্ত ভাব ও অনুভূতি নিয়ে দু-হাজারেরও বেশি গান লিখেছেন। অদ্বিতীয় গল্পকার। শিক্ষক। ছোটোদের জন্য কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, মজার কথা, ভ্রমণকথা, নিবন্ধ, এমনকী পাঠ্যগ্রন্থও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য ছোটোদের বই : *সে, গল্পগুচ্ছ, মুকুট, ছেলেবেলা, সহজ পাঠ, শিশু, শিশু ভোলানাথ, ছড়া, খাপছাড়া* ইত্যাদি।

**রবীন্দ্রনাথ সেন** (১৮৮৯-প্রয়াত) জন্ম ঢাকা জেলার ভাটপাড়ায়। মূলত ছোটোগল্পের লেখক। *সন্দেশ*-সহ সেকালের অনেক পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই : *ছেলে চুরি, ডিগবাজী খাঁ, জলপরী* ইত্যাদি। ইউ. রায়. এন্ড সনস-এর মালিকানা হস্তান্তরিত হবার পর সেখান থেকে তাঁর সম্পাদনায় *শিশু জগৎ* নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

**রবীন্দ্রলাল রায়** (১৯০৫-৭৮) জন্ম নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। বয়স্কপাঠ্য *কল্লোল* ইত্যাদি পত্রিকায় তরুণ বয়সে গল্প লিখে ফেললেও ছোটোদের প্রতি আকর্ষণে পরে যতদিন লিখেছেন ছোটোদের জন্যই লিখেছেন। হাসির গল্পে হাতখানি ছিল চমৎকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : *হালকা হাসির খাতা, নতুন কিছু, বলি তো হাসব না, বীরবাহুর বনিয়াদি চাল, অভিশপ্ত* ইত্যাদি।

**রেবন্ত গোস্বামী** (১৯৩৬) জন্ম নদিয়ায়। একালের উল্লেখযোগ্য লেখক। নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গল্প ও অন্য ধরনের গদ্য লেখেন। *সন্দেশ*-এর ঘরের লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *কচি পাতার রং, অবু মিতুদের কথা, বাবলা ফুলের গন্ধে, সাহেববাড়ির গুপ্তধন*।

**লীলা মজুমদার** (১৯০৮-২০০৭) জন্ম কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোরের ভ্রাতস্পুত্রী ও প্রমদারঞ্জনের কন্যা। উজ্জ্বল ছাত্রীজীবন, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্রষ্টা। তৃতীয় পর্বের *সন্দেশ*-এর সম্পাদনার দায়িত্ব দীর্ঘকাল বহন করেছেন। লিখেছেন ছড়া-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, স্মৃতিকথা, জীবনী-রম্যরচনা কী নয়! তাঁর লেখার ভঙ্গিটি যেমন সহজ, ভাষাটিও তেমনি সরস। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন, বিদ্যাসাগর পুরস্কারও। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *দিন দুপুরে, পদিপিসির বর্মিবাক্স, নতুন ছেলে নটবর, হলদে পাখির পালক, টংলিং, গুপির গুপ্তখাতা, বাতাস বাড়ি, আর কোনোখানে, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়* ইত্যাদি।

**শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৯৯-১৯৭০) জন্ম পূর্ণিয়ায়। বি.এল. পাশ করার পর ওকালতি ছেড়ে সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ছোটো গল্প রচনায় জুড়ি মেলা ভার। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্পের লেখক। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা ব্যোমকেশকে সকল বাঙালি পাঠকই চেনে। আবার ঐতিহাসিক পটভূমিতে সদাশিবের গল্পগুলির আবেদন কিশোরসাহিত্যে অমোঘ। তাঁর রচিত ছোটোদের বইগুলি : *ছোটোদের*

*ভাল ভাল গল্প, সদাশিবের পঞ্চরঙ্গ, দাদার কীর্তি, জেনারেল ন্যাপলা, ভূমিকম্পের পটভূমি, টিকিমেধ* ইত্যাদি।

**শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯৪২) জন্ম উত্তর ২৪ পরগনার টাকিতে। কর্মজীবনে ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক। *বসুমতী* ও *যুগান্তর* দৈনিকপত্রে চাকরি করেছেন। বর্তমানে দু-টি বিখ্যাত মাসিকপত্র সম্পাদনার কাজে যুক্ত আছেন। ক্রীড়ার পটভূমিতে অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, ক্রীড়াবিদদের জীবনকথাও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *সুন্দর ক্রিকেট, বাদশা গোলাম, দুরন্ত দুর্জয়, নট আউট, মারাদোনা মারাদোনা* ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য রচনার জন্য বিদ্যাসাগর, উপেন্দ্রকিশোর পুরস্কারে ভূষিত।

**শান্তিলতা চৌধুরী** (১৮৯৭-১৯২৯) জন্ম কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোরের কনিষ্ঠা কন্যা। রায়বাড়ির অন্য সদস্যের মতোই সাহিত্যে, বিশেষত শিশুসাহিত্যে গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর লেখা কবিতা 'পাকা রাঁধুনী' পড়লে রায়বাড়ির সরস ঘরানাটি বোঝা যাবে। *সন্দেশ*-এ তাঁর লেখা গল্পও ছাপা হয়েছে।

**শিবরাম চক্রবর্তী** (১৯০৫-৮০) জন্ম মালদহ জেলার চাঁচলে। চাঁচল রাজপরিবারের সদস্য অথচ প্রজার হালে জীবন কাটালেন মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেসবাড়িতে তক্তাপশে শুয়ে। কথায় কথায় pun ব্যবহার তাঁর বৈশিষ্ট্য-কৃতিত্বও বটে। লেখক জীবন শুরু করেছিলেন বড়োদের জন্যে লিখে, তিনি হয়ে ওঠেন মূলত ছোটোদের লেখক। উল্লেখযোগ্য ছোটোদের বই : *বাড়ি থেকে পালিয়ে, মন্টুর মাস্টার, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, বাজার করা হাজার ঠেলা, যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন* ইত্যাদি।

**শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য** (১৯৫৪) জন্ম কলকাতায়। কোনো আর্ট কলেজে শিক্ষা নেননি, কিন্তু অসাধারণ অলংকরণ করেন। একই সঙ্গে গল্প লেখার হাতটিও দারুণ। বহু বছর ধরেই *সন্দেশ*-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। *সন্দেশ* ছাড়াও অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকায় অলংকরণ করেন।

**শিবশঙ্কর মিত্র** (১৯০৯-প্রয়াত) জন্ম খুলনায়। সুন্দরবনের মানুষজন নিয়ে দীর্ঘদিন নিবিড় অনুসন্ধান করেছেন। ওই অনুসন্ধানের ফসল 'আর্জান সর্দার'কে খুঁজে পাওয়া। এদের নিয়েই তাঁর লেখা *সুন্দরবনে আর্জান সর্দার, বনবিবি, সুন্দরবন, রয়্যাল বেঙ্গলের আত্মকথা* ইত্যাদি।

**শিবানী রায়চৌধুরী** (১৯৪৩) জন্ম মুর্শিদাবাদে। তৃতীয় পর্বের *সন্দেশ*-এর গোড়ার দিকে ছোটো ছোটো চমৎকার গল্প লিখতেন, নিজের আঁকা ছবিশুদ্ধু। পরে শিবানী বিলেত চলে যান। ওদেশে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, শিক্ষা বিষয়ক বই লিখেছেন ইংরেজিতে, ছোটোদের জন্য প্রকাশিত গল্পের বইও ইংরেজিতে লেখা।

**শিশিরকুমার মজুমদার** (১৯২৩-) প্রধানত *সন্দেশ*-এর লেখক। অন্যান্য পত্রিকাতেও অনেক লিখেছেন। তবু নিজেকে সন্দেশি-ই ভাবতেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক লেখাই গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *তুফান দরিয়ার পরাণ মাঝি, আকাশে আগুন পাতালে আগুন, পাতালপুরী অভিযান, দালাং মিশনের ঘণ্টা, মামাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার, দান্তাল* ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য রচনার জন্য বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন।

**শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়** (১৯৩৫) জন্ম ময়মনসিংহে। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। বড়োদের জন্য লেখায় যেমন সিদ্ধহস্ত, ছোটোদের জন্য লেখাতে তেমনি নিপুণ। তাঁর লেখা ছোটোদের বইয়ের কয়েকটি-*মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, গন্ধটা খুব সন্দেহজনক,*

*গোঁসাইবাগানের ভূত, পাতাল ঘর, বক্‌সার রতন, হারানো কাকাতুয়া* ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিতে বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন।

**শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ** (১৯০৫-প্রয়াত) জন্ম পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবিতে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল পূর্ব আফ্রিকায়। নামকরা ভূতত্ত্ববিদ। পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরেছেন ও সে অভিজ্ঞতার কথা নানা কাগজে লিখেছেন। বিশেষত ভারতের বন ও খনি বিষয়ে। প্রকাশিত বই : *জঙ্‌গলে জঙ্‌গলে, রবি থেকে নাইরোবি*।

**সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়** (১৯৩৯) জন্ম কলকাতায়। পেশায় চিকিৎসা পরিকল্পনা ও প্রশাসন বিশেষজ্ঞ। ৩০ বছর ভারতীয় নৌসেনার চিকিৎসা বিভাগে এবং তারপরে দেশে বিদেশে বিভিন্ন চিকিৎসা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। মূলত ছোটোদের জন্যই লেখেন। প্রথম প্রকাশিত গল্প চল্লিশ বছর বয়সে *সন্দেশ*-এ। প্রকাশিত গ্রন্থ : *জাম্‌বুবানের মা, ইচ্‌ছে ঘোড়া*।

**সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩৬) জন্ম বরাহনগরে। গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ-নাটক সবই লেখেন। ছোটোদের এবং বড়োদের দু-ধরনের লেখায় সব্যসাচী। দীর্ঘদিন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং লেখনি তাঁর জীবন ও জীবিকাও। ছোটোদের জন্যও অসংখ্য বই লিখেছেন : *রুকু সুকু, সেরা চাঁদের হাট, নবেন্দুর দলবল, আবার বড়োমামা, ইতি পলাশ, বালির ওপর পোল, জনার্দনের জর্‌দার কৌটো* ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য সৃষ্টির স্বীকৃতিতে বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন।

**সত্যজিৎ রায়** (১৯২১-৯২) জন্ম কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র ও সুকুমার রায়ের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার। সংগীতে তাঁর আকর্ষণ, চিত্রাঙ্কণে তাঁর স্মরণীয় দক্ষতা। ১৯৬১ সালে *সন্দেশ* পত্রিকা পুঃন প্রকাশিত হলে তিনি হন তার অন্যতম সম্পাদক এবং অন্য সম্পাদক বদল হলেও তিনি আজীবন সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। মূলত *সন্দেশ*-এর জন্য তিনি লিখেছেন অসংখ্য গল্প-উপন্যাস, অনুবাদ, ধাঁধা এবং পত্রিকার অলংকরণ করেছেন। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল : *বাদশাহী আংটি, সোনার কেল্লা, ফেলুদা এন্‌ড কোং, প্রফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা, ফটিকচাঁদ, যখন ছোট ছিলাম, গল্প ১০১*।

**সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৪২-১৯২৩) জন্ম কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র। প্রথম ভারতীয় আই.সি.এস.। যেমন কিছু দেশাত্মবোধক সংগীত ও ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন, তেমনি সাহিত্য রচনাও করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : *বোম্‌বাই চিত্র, বাল্যকথা* ইত্যাদি।

**সমর দে** (১৯০৭-৮৫) জন্ম ময়মনসিংহের জামালপুরে। কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের সফল ছাত্র। প্রকাশনা জগতে অলংকরণের কাজে বিখ্যাত। দ্বিতীয় পর্বের *সন্দেশ*-এর প্রচ্ছদ এঁকেছেন এবং অনেক রচনার অলংকরণও করেছেন। ছোটোদের জন্য ছড়া ও গল্প লিখেছেন। নিজের চিত্রিত ছড়া-কবিতা পত্রিকাগুলির আকর্ষণ বাড়াত। *আমার শৈশব* গ্রন্থটি তাঁর পরিকল্পিত ও অলংকৃত।

**সলিল চট্টোপাধ্যায়** (১৯৩৭) জন্ম ঢাকায়। পদস্থ সরকারি কর্মী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর সমাজ কল্যাণব্রতী। *সন্দেশ*-এ গল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *জিঙ্‌কাগোল ও অন্যান্য, জাটন মালিদের দেশে, সোনার ঘণ্টা* ইত্যাদি।

**সুকুমার রায়** (১৮৮৭-১৯২৩) জন্ম কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোরে জ্যেষ্ঠ পুত্র। অসম্ভবের ছন্দ রচনায় বাংলা সাহিত্যের সেরা কারিগর। *সন্দেশ*-এর দ্বিতীয় সম্পাদক। গল্প-ছড়া-

কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ-ধাঁধা এবং অভিনব অলংকরণে সন্দেশের প্রতিটি সংখ্যা আশ্চর্য নৈপুণ্যে ভরিয়ে তুলতেন। কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে শেষজীবনে শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও সযত্নে *সন্দেশ* সম্পাদনা করেছেন, লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। তাঁর লেখা বই : *আবোল তাবোল, খাই খাই, ঝালাপালা, হ য ব র ল, পাগলা দাশু* ইত্যাদি।

**সুকুমার ঘোষ** (?-?) সুবিনয় রায়ের সম্পাদনাকালে সুকুমার ঘোষ *সন্দেশ*-এ নিয়মিত কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। দ্বিতীয় পর্বের *সন্দেশ*-এ তাঁর লেখা রোমাঞ্চকর দীর্ঘ উপন্যাস *চাকরির দুর্‌ভোগ* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

**সুকুমার দে সরকার** (১৯১০-প্রয়াত) জন্ম কলকাতায়। জীবজন্তু, পশু-পাখিদের নিয়ে এমন গল্প বাংলায় আর কেউ লেখেনি। রহস্য কাহিনিও লিখেছেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ময়ূরকন্ঠী বন, হিমের পরশ, অরণ্য রহস্য, চব্বিশে এপ্রিল চুপ, দুধ সায়রের পথে, বাঘ মারার গল্প, ভালুকদাদার গল্প, হানাবাড়ি, বনের গল্প* ইত্যাদি।

**সুখলতা রাও** (১৮৮৬-১৯৬৯) জন্ম কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ কন্যা। গল্প-কবিতা-উপন্যাস, ছড়া, প্রবন্ধ, ভ্রমণকথা-সব ধরনের লেখায় পটু। সন্দেশ-এ অজস্র লিখেছেন, এঁকেছেনও। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-'সময় হারা'-র অলংকরণ তাঁরই কীর্তি। উল্লেখযোগ্য বই : *আলিভুলির দেশে, পথের আলো, নানান দেশের রূপকথা, নিজে পড়, ঈশপের গল্প* ইত্যাদি। *নিজে পড়* গ্রন্থটি ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক পুরস্কৃত।

**সুধাবিন্দু বিশ্বাস** (?-?) সুধাবিন্দু প্রথম জীবনে ইউ. রায়. অ্যান্ড সনস-এর কর্মচারী ছিলেন। রায় পরিবারে বিপর্যয়ে তিনি ওই সম্পত্তি কিনে নেন এবং পরবর্তীকালে সুবিনয় রায়কে সম্পাদক করে ১৩৩৮-এর আশ্বিন থেকে *সন্দেশ* পত্রিকা দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করেন। এই পর্বের মাঝামাঝি ১৩৪১-এর বৈশাখ থেকে এককভাবে সন্দেশ-এর সম্পাদক হন। ইউ. রায় অ্যান্ড সনসের মালিক হিসাবে শিশুসাহিত্য প্রকাশক পরিচয় বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। ১৩৪২-এর আষাঢ়-শ্রাবণ যুগ্ম সংখ্যা (৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা) প্রকাশের পর ওই পর্বের *সন্দেশ* বন্ধ হয়ে যায়।

**সুধীন্দ্র সরকার** (১৯৪৮) জন্ম খুলনায়। শিশু ও কিশোরদের জন্য রচনায় দক্ষতা আছে। গল্প-উপন্যাস, ছড়া, কবিতা লিখে থাকেন। বিজ্ঞান বিষয় গ্রন্থও রচনা করেছেন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আয়োজিত উপন্যাস রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *দর্‌জিপাখির জামা, বাঘের বাসা, বাঁদর ভালুক ডুগডুগি, আগডুম ছড়া বাগডুম* ইত্যাদি।

**সুনির্মল বসু** (১৯০২-৫৭) জন্ম গিরিডিতে। বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম রূপকার। কবিতা-ছড়া, গল্প-উপন্যাস, নাটক, স্মৃতিকথা রচনায় পারদর্শী। *আলপনা* নামে একটি মাসিক সম্পাদনা করেছেন। পাক্ষিক *কিশোর এশিয়া* পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। দেব সাহিত্য কুটিরের বার্ষিকীর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। *আরতি* নামে আরেকটি বার্ষিকীও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হুলুস্থূল, কিপটে ঠাকুর্‌দা, আমার ছড়া, কাণাকড়ির খাতা, ঝিলমিল, জীবনখাতার কয়েকটি পাতা* ইত্যাদি। শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে বিদ্যাসাগর পুরস্কার (মরণোত্তর) দেওয়া হয়।

**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়** (১৯৩৪-২০১২) জন্ম ফরিদপুরের একটি গ্রামে। বাংলায় ছোটোদের এবং বড়োদের জন্য লেখার অন্যতম প্রধান লেখক। গল্প-উপন্যাস-কবিতা-ছড়া, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনি, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যকাহিনি দু-হাতে লিখে ফেলতেন। কাকাবাবু ও সন্তুর

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি বাংলাভাষী ছোটোদের অতি প্রিয়। ছোটোদের জন্য সব ধরনের লেখাই লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ভয়ঙ্কর সুন্দর, সবুজ দ্বীপের রাজা, নীল মানুষের সংসার, মিশর রহস্য, সত্যি রাজপুত্র, একটি লাল লঙ্কা, একবাক্স গপপো, গল্পের চকমকি, কিশোর সাহিত্য* ইত্যাদি।

**সুনীল জানা** (১৯৩৭) জন্ম কাঁথিতে। ছোটোদের জন্য লেখায় তাঁর দারুণ হাত। গল্প-নাটক-ছড়া-কবিতা সবেতেই তাঁর নৈপুণ্য লক্ষ করা যায়। বড়োদের জন্য গল্প লিখে থাকেন। ছোটোদের জন্য প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি বইয়ের নাম : *বেড়াল নিয়ে বেড়ানো, আধখানা ভূত, মহিষাসুরের লাল জামা, অফুরন্ত মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, পুরাণ বালকেরা, রবিঠাকুর কবিঠাকুর* ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য রচনায় কৃতিত্বের জন্য বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন।

**সুবিনয় রায়** (১৮৯০-১৯৪৫) উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র। সুকুমার রায়ের অকালমৃত্যুর পর *সন্দেশ* এবং ইউ. রায়. অ্যান্ড সনসের ভার তাঁর ওপর অর্পিত হয়। তিনি যোগ্যতার সঙ্গে সন্দেশ সম্পাদনা করেছিলেন, কিন্তু ব্যবসায়ের জটিলতা সামলাতে পারেননি। তাই ব্যবসায়িক বিপর্যয় রোধ করা যায়নি। পরে দ্বিতীয় পর্বের *সন্দেশ* বেরোনোর পরিকল্পনা হলে তাঁকে সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি যেমন চমৎকার গল্প লিখতেন, কবিতা লেখাতেও তাঁর সুন্দর হাত ছিল। ধাঁধা তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল, তা নিয়ে আস্ত একখানা বই বেরিয়েছিল। তবে বিজ্ঞান বিষয়ক লেখায় তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার ছিল। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তিনি লিখতেন। উল্লেখযোগ্য বই : *কাড়াকাড়ি, রকমারি, তাই তো, জীবজগতের আজব কথা ইত্যাদি* সম্পাদিত গ্রন্থ, *আজব বই*।

**সুবিমল রায়** (১৮৯৭-১৯৭৪) জন্ম কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র। অন্য ভাই-বোনদের মতো সুরসিক হলেও সুবিমল লিখেছেন কম। গল্প ছাড়াও নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : *প্রেত সিদ্ধের কাহিনি ও অন্যান্য রচনা*।

**সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ** (১৯৩০-২০১২) জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোসবাসপুর গ্রামে। ছোটোদের এবং বড়োদের জন্য দু-হাতে লিখেছেন। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছেন। ছোটোদের জন্য তাঁর লেখা কর্নেল কাহিনি খুবই জনপ্রিয়। তাঁকে নিয়ে অসংখ্য গল্প উপন্যাস লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *সবুজ বনের ভয়ঙ্কর, ভয় ভূতুড়ে*।

**স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৯৪৭) জন্ম কলকাতায়। সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন ভাবনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। গোয়েন্দা, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক, হাসি-সবরকমের লেখায় সিদ্ধহস্ত। বেতার ও দূরদর্শনের জন্য নিয়মিত নাটক লেখেন। বহু পুরস্কারে সম্মানিত। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *রহস্যভেদী মেঘনাদ* (কয়েক খণ্ডে), *সেদিন মহেঞ্জোদারো, সেরা রহস্য, সেরা অ্যাডভেঞ্চার* ইত্যাদি।

**স্বাতী ভট্টাচার্য** (১৯৬৯) জন্ম কলকাতায়। শিক্ষা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। একটি দৈনিক পত্রিকায় কর্মরত। ছোটোবেলায় *সন্দেশ* পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন এবং সন্দেশের হাত পাকাবার আসরে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা।

**হিমানীশ গোস্বামী** (১৯২৬-২০১২) জন্ম ফরিদপুর জেলার রতনদিয়ায়। চমৎকার রঙ্গরসের গল্প লেখেন। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে লন্ডনে গিয়েছিলেন। ওদের জীবনযাত্রা এবং এদেশি ছাত্র-বাসিন্দাদের হাঁড়ির খবর নিয়ে লিখেছিলেন : *লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায়, লন্ডনের আড্ডায়, গোয়েন্দা দে গোয়েন্দা দাঁ, অভিধানাই-পানাই*।

**হীরেন চট্টোপাধ্যায়** (১৯৪৪) জন্ম মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। পেশায় অধ্যাপক, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। গল্প-উপন্যাস-নাটক লেখেন, বড়োদের এবং ছোটোদের জন্য। উল্লেখযোগ্য ছোটোদের বই : *পার্কের সেই বুড়ো, খাট্টা বুড়োর মিষ্টি আম*। বেতার ও দূরদর্শনে তাঁর লেখা নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে।

**হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়** (?-?) একসময়ে ছোটোদের জন্য অনেক লিখেছেন। দ্বিতীয় পর্বের *সন্দেশ*-এ নিয়মিত লেখক ছিলেন। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ধেত্তেরি, উঃ রে বাব্বা, চীনের পাখি, তাইত!* ইত্যাদি।